আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)
[৭৯১–৮৬৪ হি. / ১৩৮৯–১৪৫৯ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

২৬, ২৭ ও ২৮তম পারা

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

মূল ❖ আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আঁল মহল্লী (র.)

অনুবাদক ❖ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন

প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

প্রকাশকাল ❖ ১৫ রমযান, ১৪৩১ হিজরি
২৫ আগস্ট, ২০১০ ইংরেজি
১১ ভাদ্র, ১৪১৭ বাংলা

শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৬২০.০০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد -

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ২৬, ২৭ ও ২৮তম পারা [৬ষ্ঠ খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৬ষ্ঠ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

الجزء السابع والعشرون : ২৭তম পারা

[২২৩ – ৪০০]

الجزء الثامن والعشرون : ২৮তম পারা

[৪০১ – ৬২৮]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمِ فِىْ صُنْعِهٖ

٣. مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا خَلْقًا بِالْحَقِّ لِيَدُلَّ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوُحْدَانِيَّتِنَا وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِلٰى فَنَائِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا خُوِّفُوْا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ مُعْرِضُوْنَ ـ

٤. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ مَّا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامِ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ اَرُوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ تَاكِيْدٌ مَاذَا خَلَقُوْا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ مِنَ الْاَرْضِ بَيَانٌ ما اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ مُشَارِكَةٌ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ مَعَ اللّٰهِ وَ اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مُنَزَّلٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَثٰرَةٍ بَقِيَّةٍ مِّنْ عِلْمٍ يُؤْثَرُ عَنِ الْاَوَّلِيْنَ بِصِحَّةِ دَعْوَاكُمْ فِىْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اَنَّهَا تُقَرِّبُكُمْ اِلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ دَعْوَاكُمْ ـ

অনুবাদ :

১. হা-মীম আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

২. এই কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ এই বাক্যটি মুবতাদা আল্লাহর নিকট হতে مِنَ اللّٰهِ হলো তার খবর পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞায় তাঁর কাজ-কর্মে।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলার মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তা বিনাশ হয়ে যাওয়া পর্যন্তের জন্য, যাতে তা আমার ক্ষমতা ও একত্ববাদকে বুঝাতে পারে। কিন্তু কাফেররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪. আপনি বলুন, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে জানিয়ে দাও। তোমরা যাদেরকে ডাক উপাসনা কর আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে। এটা প্রথম মাফঊল। আমাকে দেখাও আমাকে জানিয়ে দাও, এটা তাকিদ হয়েছে। এরা কি সৃষ্টি করেছে এটা দ্বিতীয় মাফঊল পৃথিবীতে এটা مَا -এর বয়ান। অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? আল্লাহর সাথে। আর এখানে اَمْ টা অস্বীকারমূলক হামযার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব আসমান থেকে অবতারিত কুরআনের পূর্বে। অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা, যা তোমাদের মূর্তিপূজার দাবির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আসলাফ তথা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, মূর্তিপূজা তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমাদের দাবিতে।

٥. وَمَنْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا اَحَدَ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَا يُجِيْبُوْنَ عَابِدِيْهِمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْاَلُوْنَهٗ اَبَدًا وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ عِبَادَتِهِمْ غٰفِلُوْنَ لِاَنَّهُمْ جَمَادٌ لَا يَعْقِلُوْنَ.

৫. কে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত এখানে مَنْ টি ইস্তেফহাম যা نَفِىْ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ কেউ নেই। যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে উপাসনা করে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না আর এরা হলো মূর্তিসমূহ, এরা তাদের উপাসকদের কোনো প্রার্থনার কখনোই কোনোরূপ সাড়া দিবে না। তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলো হলো জড় পদার্থ তারা কোনো কিছুই অনুধাবন করে না।

٦. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا اَيِ الْاَصْنَامُ لَهُمْ لِعَابِدِيْهِمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ بِعِبَادَةِ عَابِدِيْهِمْ كٰفِرِيْنَ جَاحِدِيْنَ.

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে অর্থাৎ মূর্তিগুলো তাদের তাদের উপাসকদের শত্রু এবং ঐগুলো আদের ইবাদত তাদের উপাসকদের উপাসনা অস্বীকার করবে।

٧. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ لِلْحَقِّ اَيِ الْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ. بَيِّنٌ ظَاهِرٌ

৭. যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আল কুরআন আবৃত্তি করা হয় بَيِّنٰتٍ টা حَالٌ হয়েছে এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ কুরআন তখন কাফেররা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

٨. اَمْ بِمَعْنٰى بَلْ وَهَمْزَةُ الْاِنْكَارِ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط اَيِ الْقُرْاٰنَ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَرْضًا فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ شَيْئًا ط اَىْ لَا تَقْدِرُوْنَ عَلٰى دَفْعِهٖ عَنِّىْ اِذَا عَذَّبَنِىَ اللّٰهُ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط تَقُوْلُوْنَ فِى الْقُرْاٰنِ كَفٰى بِهٖ تَعَالٰى شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ لِمَنْ تَابَ الرَّحِيْمُ بِهٖ فَلَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ.

৮. তবে কি তারা বলে যে, তিনি এটা অর্থাৎ কুরআন উদ্ভাবন করেছেন। আপনি বলুন, আমি যদি এটা উদ্ভাবন করে থাকি ধরে নাও/ মনে কর। তবে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ যখন আমাকে শাস্তি দিবেন তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কুরআন সম্পর্কে তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল যে তওবা করে তার জন্য। পরম দয়ালু। এ কারণেই তিনি তোমাদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করছেন না।

٩. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا بَدِيْعًا مِّنَ الرُّسُلِ اَىْ اَوَّلَ مُرْسَلٍ قَدْ سَبَقَ مِثْلِىْ قَبْلِىْ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَكَيْفَ تُكَذِّبُوْنَنِىْ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط فِى الدُّنْيَا اُخْرَجُ مِنْ بَلَدِىْ اَمْ اُقْتَلُ كَمَا فُعِلَ بِالْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ اَوْ تُرْمَوْنَ بِالْحِجَارَةِ اَمْ يُخْسَفُ بِكُمْ كَالْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنْ مَا اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَىِ الْقُرْاٰنَ وَلَا اَبْتَدِعُ مِنْ عِنْدِىْ شَيْئًا وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ .

৯. বলুন, আমি কোনো নতুন রাসূল নই, অর্থাৎ আমিই তো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বেও তো অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তবে তোমরা কোন ভিত্তির উপর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে? পৃথিবীতে আমি কি আমার নগরী হতে বহিষ্কৃত হবো নাকি আমি নিহত হবো? যেমনটি আমার পূর্বের নবীগণের সাথে করা হয়েছে। নাকি তোমাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে, না মাটিতে দাবিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ন্যায়। আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তারই অনুসরণ করি। আর আমার পক্ষ থেকে কোনো কিছুই উদ্ভাবন করি না। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

١٠. قُلْ اَرَاَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ مَاذَا حَالُكُمْ اِنْ كَانَ اَىِ الْقُرْاٰنُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ عَلٰى مِثْلِهٖ اَىْ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَاٰمَنَ الشَّاهِدُ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط تَكَبَّرْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ بِمَا عَطَفَ عَلَيْهِ اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ دَلَّ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

১০. আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের অবস্থা কিরূপ? যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ আল কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর এটা جُمْلَة حَالِيَة বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য। অথচ বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষ্য দিয়েছে তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করল। আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে ঈমান হতে অহঙ্কার করলে। আর جَوَاب شَرْط তার উপর عَطْف সহকারে اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ যার উপর اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ বুঝাচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَحْقَافٌ : এটা حِقْفٌ-এর বহুবচন। বালুর লম্বা ও উঁচু টিলাকে حِقْفٌ বলে। اَحْقَافٌ নামে ইয়েমেনের একটি উপত্যকাও রয়েছে, আদ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল 'আহকাফ'। এটা হাযরামাউতের উত্তরে এভাবে অবস্থিত, যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি বলা হয়। পূর্বকালে হাযরামাউত ও নজরানের মধ্যবর্তী স্থানে আদে ইরম অর্থাৎ আদে উলার প্রসিদ্ধ গোত্রের বসবাস ছিল। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নাফরমানির কারণে সাইমুম বা ধূলো ঝড়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার কাসাসুল আম্বিয়ার ৭১নং পৃষ্ঠায় হাযরামাউত অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ওমর ইবনে ইয়াহইয়া আলাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, সে একটি দলের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাচীন আবাসের খোঁজে হাযরামাউতের উত্তরাঞ্চলীয় ময়দানে অবস্থান করেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর টিলাসমূহের কারুকার্যের মধ্যে মর্মর পাথরের কিছু পাত্র পাওয়া যায়, যাতে ধ্বংস স্তূপের মাঝেও কিছু খোদাইকৃত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো পূজির স্বল্পতার কারণে এর গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। –[লুগাতুল কুরআন]

জ্ঞাতব্য : ১৯৯২ সালে খনন কাজের সময় আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষের প্রকাশ পেয়েছে যা ছবিতে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে।

قَوْلُهُ اِلَّا بِالْحَقِّ : بِالْحَقِّ -এর পূর্বে خَلْقًا উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِالْحَقِّ টা مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَلْقًا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ হবে- اِلَّا خَلْقًا مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ وَاَجَلٍ مُسَمًّى : এখানে وَاوْ টি হলো عَاطِفَة অর্থাৎ اَجَلٍ -এর আতফ اَلْحَقِّ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ- بِحَقٍّ وَبِاَجَلٍ مُسَمًّى তথা আমি আকাশ ও পাতালকে সত্যসহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ এগুলো ধ্বংস হওয়ার একটি নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। আর তা হলো কিয়ামতের দিন। আর বাক্যের মধ্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَاِلَّا بِتَعْيِيْنِ اَجَلٍ مُسَمًّى

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا : মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। আর مُعْرِضُوْنَ হলো তার খবর। আর عَمَّا اُنْذِرُوْا টা مُعْرِضُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। مَا হলো اِسْم مَوْصُوْل আর مُعْرِضُوْنَ বাক্য হয়ে সেলাহ আর عَائِدْ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) بِهِ উহ্য মেনে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ عَمَّا اُنْذِرُوْا : عَمَّا -এর মধ্যে مَا টা مَوْصُوْل এবং مَصْدَرِيَّة উভয়ই হতে পারে। মওসূলা হওয়ার সুরতে উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- عَنْ عَذَابِ الَّذِيْ اُنْذِرُوْهُ مُعْرِضُوْنَ

قَوْلُهُ قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : ব্যাখ্যাকারের মতে اَرَاَيْتُمْ -এর অর্থ- اَخْبِرُوْنِيْ; আর تَدْعُوْنَ অর্থ- تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ اَخْبِرُوْنِيْ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ مَا تَدْعُوْنَ এটা اَرَاَيْتُمْ -এর প্রথম মাফউল এবং مَاذَا خَلَقُوْا বাক্য হয়ে মাফউলে ছানীর স্থলাভিষিক্ত। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, اَرُوْنِيْ এটা اَرَاَيْتُمْ -এর তাকিদ এবং অর্থের দিক হতে اَخْبِرُوْنِيْ -এর অর্থে। এ অবস্থায় এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ -এর অন্তর্গত হবে। কেননা اَرَاَيْتُمْ এবং اَرُوْنِيْ উভয়টিই দ্বিতীয় মাফউলকে চায়। উভয়টিরই প্রথম মাফউল রয়েছে- مَا تَعْبُدُوْنَ হলো اَرَاَيْتُمْ -এর প্রথম মাফউল। এবং اَرُوْنِيْ -এর মধ্যে يْ হলো اَرُوْنِيْ -এর প্রথম মাফউল। আর مَاذَا خَلَقُوْا হলো تَنَازُع فِيْهِ উভয় ফে'লটিই তাকে নিজের مَفْعُوْل বানাতে চায়। বসরী নাহবীদের মতে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দিয়ে প্রথম মাফউলকে উহ্য মানা হবে।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا : এটা بِكِتَابٍ -এর সিফত যা সাধারণত مُنَزَّلْ হোক অথবা غَيْر مُنَزَّلْ হোক অর্থাৎ اِيْتُوْنِيْ -কে- مُنَزَّلْ অর্থাৎ خَاصّ কে- مُتَعَلِّقْ এর- مِنْ قَبْلِ -এর- اَبُو الْبَقَاءِ -এর অনুসরণে مِنْ قَبْلِ কিন্তু মুফাসসির (র.) بِكِتَابٍ كَائِنٍ مِنْ قَبْلِ উহ্য মেনেছেন। তবে مُطْلَقْ রাখাটাই অধিক উত্তম। অর্থাৎ- كَائِنٌ مِنْ قَبْلِ هٰذَا

قَوْلُهُ اَثَارَةٍ بَقِيَّةٍ : بَقِيَّة -কে অর্থ বর্ণনার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। اَثَارَةٌ শব্দটি غَوَايَةٌ এবং ضَلَالَةٌ -এর ওজনে মাসদার। এটা আরবদের উক্তি سَمَنَتِ النَّاقَةُ عَلٰى اَثَارَةٍ مِنْ لَحْمٍ اَيْ عَلٰى بَقِيَّةٍ مِنْهُ হতে مُشْتَقّ; আবার কেউ কেউ اَثَارَة -এর অর্থ رِوَايَة এবং عَلَامَة -ও বর্ণনা করেছেন। মোটকথা হলো اَثَارَة -এর মধ্যে তিনটি মতামত রয়েছে। যথা-

১. اَلْاَثَارَة অর্থ- بَقِيَّة এটা اَثَرَتِ الشَّيْءُ اِثَارَةً হতে مُشْتَقّ -
২. اَلْاَثَارَة এটা اَلْاَثَرُ হতে অর্থাৎ اَلرِّوَايَةُ وَالنَّقْلُ
৩. اَلْاَثَرُ হতে অর্থ اَلْعَلَامَةُ

এর দ্বারা সেই জ্ঞান উদ্দেশ্য যা পূর্ববর্তীদের থেকে سِيْنَةً بَسِيْنَه বর্ণিত হয়ে এসেছে।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا : এটা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে بِكِتَابٍ -এর সিফত হয়েছে। আর اِيْتُوْنِيْ এটা بِكِتَابٍ -এর مُتَعَلِّقْ আর اَثَارَه টা كِتَابٍ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : এটা হলো شَرْط -এর, جَزَاء যা فَأْتُوْنِيْ উহ্য আছে। আর صَادِقِيْنَ টা كُنْتُمْ -এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ الخ : এটা نَكِرَه مَوْصُوْفَه -ও হতে পারে। পরবর্তী বাক্য তার সিফত হবে। মূল ইবারত এরূপ হবে যে مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصٍ يَعْبُدُ شَيْئًا لَا يُجِيْبُهُ এবং مَوْصُوْلَه -ও হতে পারে। এ সুরতে পরবর্তী বাক্য তার صِلَه হবে। মূল ইবারত এরূপ হবে যে, مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصٍ يَعْبُدُ الشَّيْئَ الَّذِيْ لَا يُجِيْبُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ

قَوْلُهُ مَنْ لَّا يُجِيْبُ لَهُ : এটা বাক্য হয়ে يَدْعُوْ -এর مَفْعُوْل بِه হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এটা لَا يُجِيْبُ -এর غَايَتْ যার দ্বারা বাহ্যত জানা যায় যে, কিয়ামতের পর اِسْتِجَابَة হবে। এভাবে যে, غَايَتْ টা مُغَيًّا -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়; বরং এখানে غَايَتْ বর্ণনার দ্বারা تَابِيْد উদ্দেশ্য। আর غَايَتْ টা مُغَيًّا -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ جَمَادٌ لَا يَعْقِلُوْنَ : এখানে غَافِلُوْنَ -এর তাফসীর لِاَنَّهُمْ جَمَادٌ الخ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غَفْلَتْ দ্বারা عَدَم فَهْم উদ্দেশ্য عَدَم تَوَجُّهْ بِهٖ উদ্দেশ্য নয়। وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ -এর মধ্যে প্রথম هُمْ যমীর মূর্তির দিকে। আর দ্বিতীয় هُمْ মূর্তিপূজারীদের দিকে ফিরেছে। مَنْ -এর প্রতি লক্ষ্য করে উভয় যমীরকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকরা মনে করত যে, মূর্তিরা অনুধাবন করতে পারে।

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এটা وَضْعُ الْاِسْمِ مَوْضِعَ الضَّمِيْرِ -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা قَالُوْا বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীদের কুফরি সিফতকে বর্ণনা করার জন্য اِسْمِ ظَاهِرْ -কে اِسْمِ ضَمِيْر -এর স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمَّا جَاءَهُمْ : এটা قَالَ -এর ظَرْف হয়েছে। আর هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ হলো مَقُوْلَه -

قَوْلُهُ تُفِيْضُوْنَ : এটা اِفَاضَةٌ মাসদার হতে جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ। এটা যখন পানি, অশ্রু ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এটার অর্থ হয়- বয়ে যাওয়া, প্রবাহিত হওয়া। কিন্তু এটা যখন কথা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার হয় তখন অর্থ হয়- কথাবার্তার মধ্যে খুবই চিন্তাভাবনা করে কথা বলা ও শ্রবণ করা এবং টিপ্পনী কাটা। এখানে টিপ্পনী কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِدْعًا بَدِيْعًا : بِدْعًا এটা মাসদারও হতে পারে। তবে এই সুরতে মুযাফ উহ্য থাকবে। অর্থাৎ ذَا بِدْعٍ আবার এটাও হতে পারে যে, بِدْعًا টা بَدِيْعًا অর্থে হয়েছে সীগায়ে সিফত। যেমন- خَفٌّ যা خَفِيْفٌ অর্থে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ : প্রথম مَا টি نَافِيَه আর দ্বিতীয় مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّة আর তার পরবর্তী অংশ তার খবর এই مَا টা اَدْرِيْ -কে আমল করা থেকে বিরত রেখেছে। এর পরবর্তী অংশ দুই মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ مَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : এটা প্রকৃত حَصْر নয় যে, এই প্রশ্ন করা যাবে যে, তিনি بَشِيْر ও ; তদুপরি نَذِيْر -এর মধ্যে حَصْر কিভাবে হলো। উত্তর হলো- এটা حَصْر اِضَافِيْ হয়েছে। অর্থাৎ আমার ভয় দেখানো ও সতর্ক করা আল্লাহরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আবার নিজের পক্ষ থেকে কিছুই নয়। যেমনটি আপনাদের ধারণা।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ : اَرَاَيْتُمْ বাক্যটি قَوْل -এর مَقُوْل হয়েছে اَرَاَيْتُمْ -এর উভয় মাফঊলই উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে- اَخْبِرُوْنِيْ مَاذَا حَالُكُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ শর্ত এবং তার উপর مَعْطُوْف হওয়ার জবাব উহ্য রয়েছে। আল্লামা মহল্লী (র.) اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ উহ্য মেনে যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন উল্লিখিত জবাবে শর্তের উহ্য মানা আল্লামা যমখশারী (র.)-এর ভাষ্য মতে। কিন্তু আবূ হাইয়ান এটাকে বাতিল করে বলেন যে, যদি যমখশরীর বর্ণিত উহ্যকরণ মেনে নেওয়া হয় তবে তো فَاء আনয়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, যখন جُمْلَه اِسْمِيَّة টা جَوَاب شَرْط হয় তখন তাতে فَاء আনা আবশ্যক হয়ে থাকে। এ কারণেই অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম فَقَدْ ظَلَمْتُمْ 'জবাবে শর্ত' উহ্য মেনেছেন। -[ইরাবুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহকাফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহকাফ মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় ৪ রুকূ, ৩৫ আয়াত, ৬৪৪টি বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ : 'আহকাফ' ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি স্থানের নাম, যেখানে আদ জাতির বসবাস ছিল। 'আহকাফ' শব্দটি 'হকফ' -এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ হলো বালুর স্তূপ। আলোচ্য সূরায় আদ জাতির নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেন পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী নাফরমানদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আহকাফ'।

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় :

১. প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রমাণিত করা, কেননা যতক্ষণ তাঁকে আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে কেউ মেনে নেবে না, ততক্ষণ পবিত্র কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করবে না। এজন্যে সর্বপ্রথম এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে– تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে [হে রাসূল!] আপনার প্রতি মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি কিতাব নাজিল হওয়াই তাঁর রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২. স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে– مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা তিনি এক, অদ্বিতীয়, আর তিনিই উপাস্য, কেননা পৃথিবীর কোনো কিছুই আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, আল্লাহ পাকই তাঁর "কুন" আদেশ দ্বারা সবকিছুকে যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। –[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪২৩]

এ সূরার আমল : সূরা আহকাফ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জিন ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আসবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কিয়ামতের দিনের সত্যতার ঘাষণা রয়েছে। আর এ সূরার সূচনাতেই পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে। কুরআনে কারীমে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রায়শ কাছাকাছিই থাকে, আর এটি উভয় সূরার যোগসূত্র। –[বয়ানুল কুরআন পৃ. ৯৬৭]

قَوْلُهُ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত কানো দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোনো প্রকার দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে– اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمَاوَاتِ

২. ইতিহাসভিত্তিক দলিল। বলাবাহুল্য, আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যেমন– তাওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি। এ দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে– اِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ তোমাদের মূর্তিপূজার কোনো দলিল থাকলে কোনো ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তিপূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোনো উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

اَثَارَةٍ : শব্দটি شَجَاعَة ও سَمَاحَة -এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ– উদ্ধৃত করা, রেওয়ায়েত করা। এ কারণে ইকরিমা ও মুতাকিল (র.) এর তাফসীরে 'পয়গাম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন। –[কুরতুবী]

সারকথা এই যে, দু'রকম দলিল গ্রহণযোগ্য– কোনো পয়গাম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গাম্বরের উক্তি। আয়াতে اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরো কিছু তাফসীর করেছেন, যা কুরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

قَوْلُهُ وَمَآ اَدْرِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰی اِلَیَّ : এ আয়াতে اِنْ اَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক– তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে– تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهَا اِلَیْكَ জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কুরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার মতো নই এবং এসব জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকই বর্ণনা করি।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোনো উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়; বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য কোনো পয়গাম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে– পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা পারলৌকিক বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْۢ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ .... عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ : এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জবাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জবাবই যথেষ্ট; কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করে যাও, তবে তোমাদের পরণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাঈলেরই কোনো মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোনো বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদি আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামসহ যত ইহুদি ও খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে। –[ইবনে কাসীর]

অনুবাদ :

١١. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَىْ فِىْ حَقِّهِمْ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ط وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا اَىِ الْقَائِلُوْنَ بِهٖ اَىْ بِالْقُرْاٰنِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اَىِ الْقُرْاٰنُ اِفْكٌ قَدِيْمٌ -

১১. মুমিনদের সম্পর্কে কাফেররা বলে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে যদি এটা ঈমান ভালো হতো, তবে তারা এর দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না। আর যখন তারা এর দ্বারা অর্থাৎ কুরআন দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়নি অর্থাৎ এর প্রবক্তারা তখন তারা অবশ্য বলবে, এটা তো অর্থাৎ আল-কুরআন এক পুরাতন মিথ্যা।

١٢. وَمِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ كِتٰبُ مُوْسٰى اَىِ التَّوْرٰىةِ اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ حَالَانِ وَهٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِلْكُتُبِ قَبْلَهٗ لِّسَانًا عَرَبِيًّا حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِىْ مُصَدِّقٌ لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق مُشْرِكِىْ مَكَّةَ وَ هُوَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

১২. এর পূর্বে ছিল কুরআনের পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব অর্থাৎ তাওরাত আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ মুমিনদের জন্য। رَحْمَةً এবং اِمَامًا উভয়টি كَائِنٌ مِنْ كِتَابِ مُوْسٰى থেকে حَالٌ হয়েছে, আর এটা কুরআন সত্যায়নকারী কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের আরবি ভাষায় এটা مُصَدِّقٌ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। যেন এটা জালিমদেরকে সতর্ক করে অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদেরকে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় মুমিনদেরকে।

١٣. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّاعَةِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ج

১৩. যারা বলে আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ। অতঃপর অবিচল থাকে আনুগত্যের উপর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

١٤. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج حَالٌ جَزَآءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَىْ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

১৪. তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এখান خَالِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ হয়েছে। তারা যা করত তার পুরস্কারস্বরূপ এখানে جَزَاءً শব্দটি স্বীয় ফে'ল উহ্য থাকার মাধ্যমে মাসদারের ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ يُجْزَوْنَ جَزَآءً

١٥. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ اِحْسَانًا اَىْ اَمَرْنَاهُ اَنْ يُّحْسِنَ اِلَيْهِمَا فَنُصِبَ اِحْسَانًا عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَمِثْلِهٖ حُسْنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط اَىْ عَلٰى مَشَقَّةٍ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ من الرضاع ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط

১৫. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। অন্য কেরাতে اِحْسَانًا রয়েছে। অর্থাৎ আমি তাকে তাদের প্রতি বিনয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। আর اِحْسَانًا টা ফে'ল উহ্য থাকার কারণে মাসদারের ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। حُسْنًا টি অনুরূপই। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতেও তার স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস।

سِتَّةُ اَشْهُرٍ اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْبَاقِيْ اَكْثَرُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَقِيْلَ اِنْ حُمِلَتْ بِهِ سِتَّةً اَوْ تِسْعَةً اَرْضَعَتْهُ الْبَاقِيْ حَتّٰى غَايَةً لِجُمْلَةٍ مُقَدَّرَةٍ اَيْ وَعَاشَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ هُوَ كَمَالُ قُوَّتِهِ وَعَقْلِهِ وَرَأْيِهِ اَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَّثَلٰثُوْنَ سَنَةً وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَيْ تَمَامَهَا وَهُوَ اَكْثَرُ الْاَشُدِّ قَالَ رَبِّ اِلٰى اٰخِرِهِ نَزَلَ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ لَمَّا بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ اٰمَنَ بِهِ ثُمَّ اٰمَنَ اَبَوَاهُ ثُمَّ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَتِيْقٍ اَوْزِعْنِيْٓ اَلْهِمْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَهِيَ التَّوْحِيْدُ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ فَاَعْتَقَ تِسْعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ فِي اللّٰهِ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

ছয় মাস হলো গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় আর দুই বছর বা চব্বিশ মাস হলো দুগ্ধ ছাড়ানোর সর্বোচ্চ সময়। বলা হয়েছে যে, যদি বাচ্চা ছয় মাস বা নয় মাস গর্ভে থাকে তবে অবশিষ্ট সময় তাকে দুগ্ধ পান করানো হবে। ক্রমে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় حَتّٰى টা উহ্য বাক্যের غَايَةً অর্থাৎ وَعَاشَ حَتّٰى আর اَشُدَّ অর্থ হলো– তার শক্তি, জ্ঞান ও মতামতে পূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া। এর সর্বনিম্ন সময় হলো তেত্রিশ বছর এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় অর্থাৎ পূর্ণ চল্লিশ বৎসর। আর এটা হলো পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার সর্বোচ্চ সময়। তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। রাসূল ﷺ প্রেরিত হওয়ার দু'বৎসর পর যখন তাঁর বয়স চল্লিশে উপনীত হলো তখন তিনি রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান আনলেন, এরপর তার পিতামাতা ঈমান আনলেন, অতঃপর তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান এবং নাতি আবূ আতীক ঈমান আনলেন। তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও আমাকে ইলহাম কর। যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য আর তা হলো তাওহীদ তথা একত্ববাদের নিয়ামত। এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তিনি এমন নয়জন মুমিন কৃতদাস মুক্ত করেছেন যাদেরকে আল্লাহর পথে নির্যাতন করা হচ্ছিল। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর সুতরাং তাঁরা সকলেই ঈমান এনেছিলেন। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٦. اُولٰٓئِكَ اَيْ قَائِلُوْا هٰذَا الْقَوْلِ اَبُوْ بَكْرٍ وَغَيْرُهُ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ بِمَعْنٰى حَسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط حَالٌ اَيْ كَائِنِيْنَ فِيْ جُمْلَتِهِمْ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ .

১৬. আমি এদেরই এ উক্তির প্রবক্তা হযরত আবূ বকর (রা.) ও অন্যান্যদের সুকীর্তিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি, তাঁরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ এটা حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ كَائِنٌ مِنْ جُمْلَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য। সেই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে রয়েছে وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ

١٧. وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْإِفْرَادِ أُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ أُفٍّ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنٰى مَصْدَرٍ اَىْ نَتْنًا وَقُبْحًا لَّكُمَآ اَتَضْجَرُ مِنْكُمَا اَتَعِدَانِنِىْٓ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْإِدْغَامِ اَنْ اُخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِىْ ج وَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْقُبُوْرِ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ يَسْاَلَانِهِ الْغَوْثَ بِرُجُوْعِهِ وَيَقُوْلَانِ اِنْ لَمْ تَرْجِعْ وَيْلَكَ اَىْ هَلَاكُكَ بِمَعْنٰى هَلَكْتَ اٰمِنْ ق بِالْبَعْثِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِهِ حَقٌّ ج فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اَىِ الْقَوْلُ بِالْبَعْثِ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكَاذِيْبُهُمْ .

১৭. আর এমন লোক রয়েছে যে তার মাতাপিতাকে বলে অন্য এক কেরাতে إِفْرَادٌ বা একবচনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য। আফসোস তোমাদের জন্য اُفٍّ -এর فَاء টি যের ও যবর উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। মাসদারের অর্থে অর্থাৎ তোমাদের জন্য দুর্গন্ধ ও মন্দতা, আমি তোমাদের থেকে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছি। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, অন্য কেরাতে ইদগামের সাথে اَتَعِدَانِّىْ রয়েছে। আমি পুনরুত্থিত হবো কবর থেকে যদিও আমার পূর্বে বহুপুরুষ গত হয়েছে উম্মত গত হয়েছে। অথচ তাদেরকে কবর থেকে বের করা হয়নি। তখন তার মাতাপিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে অর্থাৎ তার ঈমানের দিকে ফিরে আসার দোয়া করেন এবং বলেন, যদি তুমি ফিরে না আস। দুর্ভোগ তোমার জন্য অর্থাৎ هَلَاكُكَ অর্থাৎ هَلَكْتَ ঈমান নিয়ে এসো/বিশ্বাস স্থাপন কর পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এটা তো অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কিত কথা অতীতকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাদের মিথ্যা উপাখ্যান।

١٨. أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ .

১৮. এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে শাস্তির ব্যাপারে। এদের পূর্বে জিন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মতো। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

١٩. وَلِكُلٍّ مِنْ جِنْسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ دَرَجٰتٌ فَدَرَجَاتُ الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ عَالِيَةٌ وَدَرَجَاتُ الْكَافِرِ فِى النَّارِ سَافِلَةٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ج اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْكَافِرُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَىِ اللّٰهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ اَعْمَالَهُمْ اَىْ جَزَاءَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا يُنْقَصُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُزَادُ لِلْكُفَّارِ .

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা মুমিন ও কাফেরদের মধ্য থেকে। সুতরাং মুমিনের মর্যাদা হলো সুউচ্চ জান্নাত। আর কাফেরের মর্যাদা হলো সর্বনিম্ন জাহান্নাম। তার কর্মানুযায়ী অর্থাৎ মুমিন যারা আনুগত্যের কাজ করেছেন এবং কাফের যারা অবাধ্যতার কাজ করেছেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন। অর্থাৎ তার প্রতিদান। لِيُوَفِّيَهُمْ এটা অন্য কেরাতে نُوْن যোগে لِنُوَفِّيَهُمْ -ও পঠিত রয়েছে। এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। বিন্দুমাত্রও যে, মুমিনদের পুণ্যকর্ম হ্রাস করা হবে আর কাফেরদের পাপের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

২০. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط بِاَنْ تُكْشَفَ لَهُمْ يُقَالُ لَهُمْ اَذْهَبْتُمْ بِهَمْزَةٍ وَبِهَمْزَتَيْنِ وَبِهَمْزَةٍ وَمُدَّةٍ وَبِهِمَا وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ طَيِّبٰتِكُمْ بِاشْتِغَالِكُمْ بِلَذَّاتِكُمْ فِيْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ اَيِ الْهَوَانِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ تَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ بِهٖ وَتُعَذَّبُوْنَ بِهَا .

২০. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে এভাবে যে, তাদের সম্মুখে জাহান্নামের পর্দা খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ। তোমরা এগুলোর স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে। اَذْهَبْتُمْ শব্দটি এক হামযাসহ ও দুই হামযাসহ এবং একই হামযা ও মদসহ এবং উভয়ভাবে এবং দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করে পঠিত রয়েছে। এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি هُوْنٌ টি هَوَانٌ অর্থে হয়েছে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। জাহান্নামের মাধ্যমে তোমাদেরকে তারই শাস্তি দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا : لَوْ টা হরফে শর্ত خَيْر এটা جُمْلَة হয়ে شَرْط আর مَا سَبَقُوْنَا এটা جُمْلَة হয়ে جَزَاء শর্ত ও জাযা মিলে قَالَ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ : اِذْ -এর আমেল উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ظَهَرَ عِنَادُهُمْ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ এখানে اِذْ -এর মধ্যে فَسَيَقُوْلُوْنَ -এর আমেল হওয়া দুই কারণে বৈধ নয়।

প্রথমত উভয়টির কাল ভিন্ন ভিন্ন। اِذْ টা مَاضِىْ -এর জন্য আর فَسَيَقُوْلُوْنَ হলো مُسْتَقْبِلْ -এর জন্য।

দ্বিতীয়ত فَاء টা তার مَا بَعْد -কে مَا قَبْل -এর জন্য প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ مُوْسٰى : مِنْ قَبْلِهٖ টা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে। আর كِتَابُ مُوْسٰى হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اِمَامًا وَّرَحْمَةً : উভয় خَبَر مُقَدَّمْ -এর মধ্যে كَائِنٌ -এর যমীর থেকে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর আবূ ওবাইদ এটাকে جَعَلْنَاهُ উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন। -[ফতহুল কাদীর; আল্লামা শাওকানী (র.)]

قَوْلُهُ لِسَانًا عَرَبِيًّا : এটা مَوْصُوْف এবং صِفَتْ মিলে مُصَدِّقٌ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। আর مُصَدِّقٌ -এর যমীর كِتَابٌ -এর দিকে ফিরেছে। لِيُنْذِرَ হলো مُصَدِّقٌ -এর মুতা'আল্লিক।

قَوْلُهُ اَىْ عَلٰى مَشَقَّةٍ : এ ইবারতের মাধ্যমে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, كُرْهًا টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। মূলত ছিল عَلٰى كُرْهٍ। আবার কেউ কেউ حَالْ হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب বলেছেন। অর্থাৎ ذَاتُ كُرْهٍ আবার কেউ কেউ উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب বলেছেন। অর্থাৎ حَمْلًا كُرْهًا

قوله ثلثون شهرا : এই বাক্যে কিছু জিনিস উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- مُدَّةُ حَمْلِهٖ وَفِصَالِهٖ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا

قَوْلُهُ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ : এটা كَائِنِيْنَ উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে عَنْهُمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন এবং এরূপই যেমন আরবীয়দের উক্তি- اَكْرَمَنِى الْاَمِيْرُ فِىْ اَصْحَابِهٖ অর্থাৎ فِىْ جُمْلَتِهِمْ আবার কেউ কেউ فِىْ কে مَعَ অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ مَعَ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ আবার অন্যান্যরা এটাকে উহ্য মুবতাদার খবর বলেছেন। অর্থাৎ- هُمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ وَعْدَ الصِّدْقِ : وَعْدًا টা উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ- وَعَدَهُمُ اللّٰهُ وَعْدَ الصِّدْقِ

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِفْرَادِ : অর্থাৎ হিশামের কেরাতে لِوَالِدَيْهِ -এর পরিবর্তে لِوَالِدِهٖ রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো جِنْس وَالِدْ যা বহুবচনের অর্থে।

قَوْلُهُ اُفٍّ : اُفٍّ শব্দটি যেরযুক্ত তানভীনসহ ও তানভীনবিহীন এবং তানভীনবিহীন যবর দ্বারা। আর اَفَّ. يَؤُفُّ. اَفًّا হতে মাসদার অর্থ- قُبْحًا এবং نَتْنًا ; ইমাম কারখী (র.) বলেন, এটা يَؤُفُّ . اَفَّ -এর মাসদার যা قُبْحًا ও تَبًّا অর্থে। اُفٍّ -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. মাসদার ২. اِسْم صَوْت ৩. اِسْم فِعْل এই তিনটির মধ্য হতে মুফাসসির (র.) দুটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। بِمَعْنٰى مَصْدَرْ দ্বারা প্রথমটির দিকে এবং اَتَضَجَّرُ দ্বারা দ্বিতীয়টির দিকে। মনে হয় যেন মুফাসসির (র.) এটা বলতেছেন যে, উভয় তাফসীরই বৈধ। যাবতীয় ময়লা আবর্জনাকে اُفٍّ বলে। যেমন কর্তিত নখ ইত্যাদি। আর এ হিসেবেই কোনো জিনিসের প্রতি ঘৃণা বুঝাতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ফতহুল কাদীরে কাজী শাওকানী (র.) সূরা ইসরার ব্যাখ্যায় আসমায়ী-এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, اُفٌّ হলো কানের ময়লা, আর تَفٌّ হলো নখের ময়লা। কোনো জিনিসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য اُفٍّ বলা হয়। সুতরাং এ অর্থেই এর অধিক ব্যবহার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুতেই আরবগণ এটাকে ব্যবহার করতে লাগল।

ছালাব থেকে ইবনে আরাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, اُفٍّ যা اُفُفٌ -এর মূল এর অর্থ অন্তর ছোট হওয়া, সঙ্কীর্ণ হওয়া। আল্লামা যুজাজ (র.)-এর অর্থ দুর্গন্ধ বলেছেন। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ هَلَاكُكَ : এখানে وَيْلَكَ -এর তাফসীর هَلَاكُكَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَيْلَكَ তার সমজাতীয় উহ্য ফে'ল হতে مَنْصُوْب হয়েছে, আর তা হলো هَلَكَ কেননা وَيْلٌ -এর ফে'ল ব্যবহার হয় না। আর অর্থের ক্ষেত্রে ধ্বংসের অর্থ দেয়। যা আপাতদৃষ্টে বদদোয়া। কিন্তু এটা দ্বারা বদদোয়া উদ্দেশ্য হয় না; বরং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ও ঈমানের দিকে লালায়িত করা উদ্দেশ্য হয়। প্রকৃত ধ্বংস উদ্দেশ্য নয়। যেমন- মা স্বীয় সন্তানকে বলে যে, তুই মর, এমন করিস না। وَيْلَكَ -এর ফার্সী অর্থ হলো وے برتر অর্থাৎ তোমার উপর আফসোস!

قَوْلُهُ دَرَجَاتٌ : বাক্যের মধ্যে تَغْلِيْب হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামের دَرَكَاتٌ -কে বলা হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُعْرَضُ : এখানে يَوْمَ টা উহ্য ফে'ল يُقَالُ لَهُمْ থেকে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اَذْهَبْتُمْ : অধিকাংশের নিকট এটা একটি হামযার সাথে পঠিত। অর্থাৎ هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ ব্যতীত। এবং উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং এক হামযা এবং মদের সাথে। আর এটা হিশামের অভিমত এবং দুই হামযার সাথে হবে তবে দ্বিতীয় হামযায় মদবিহীন تَسْهِيْل হবে। এটা ইবনে কাছীরের অভিমত।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ : এটা تَسْتَكْبِرُوْنَ -এর সিফতে কাশেফাহ। কেননা, অহঙ্কার তো অন্যায়ই হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর খুঁজে না পেয়ে কাফের মুশরিকরা বলল, পবিত্র কুরআন বা দীন ইসলাম যদি উত্তম কিছু হতো, তবে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা কি পেছনে পড়ে থাকতো আর দারিদ্র্যপীড়িত, বিপদগ্রস্ত লোকেরাই এ ধর্ম গ্রহণে অগ্রবর্তী হতো? এমন তো হতে পারে না।

শানে নুযূল : ইবনে জারীর (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন মুশরিক বলেছিল, আমরা সমাজে সম্মানের অধিকারী, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের চেয়ে আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি, যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হতো, তবে আমরাই তাদের পূর্বে তা গ্রহণ করতাম, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনুল মুনজির আওন ইবনে আবি শাদ্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর রানীন নাম্নী একটি বাঁদি ছিল, সে তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে ঈমান এনেছিল। হযরত ওমর (রা.) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতেন। তখন কাফেররা বলতো, যদি ইসলাম কোনো উত্তম বস্তু হতো, তবে রানীন নাম্নী বাঁদি আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতো না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে সা'দ (র.) যাহ্হাক এবং হাসান বসরী (র.) সূত্রে এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا إِفْكٌ قَدِيْمٌ : কাফেরদের এ উক্তির মূল কারণ হলো, তারা হেদায়েতের সৌভাগ্য লাভ করেনি, এটি তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা হেদায়েত থেকে মাহরুম হয়েছে। আর এজন্যেই তারা কুরআনে কারীমকে পুরাতন মিথ্যা বলেছে, অর্থাৎ পূর্বকালে যেভাবে মিথ্যা দাবি করা হতো, এটিও তেমনি মিথ্যা দাবি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে আরবের কাফের এবং ইহুদিরা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলো, যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হতো, তবে সকলের আগে আমরাই তা গ্রহণ করতাম। আর যেহেতু আমরা এ ধর্ম গ্রহণ করিনি, এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এতে কোনো কল্যাণ নেই। [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক]

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ إِلَيْهِ : অহংকার ও গর্ব ও মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালোমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হতো, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হতো। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য!

قَوْلُهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوْسٰى إِمَامًا وَّرَحْمَةً : এ আয়াত থেকে প্রথমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোনো অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে; বরং এর আগে হযরত মূসা (আ.) রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাওরাত নাজিল হয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়ত এতে شَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও তাওরাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াত অর্থাৎ- إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللّٰهُ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং إِسْتِقَامَةٌ শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। إِسْتِقَامَةٌ-এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোনো দুঃখ-কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কুরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবাযত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা মানুষ তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হলো পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ বাক্যে إِنْسَانٌ-এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.)। বলাবাহুল্য কুরআনের কোনো আয়াত অবতরণর কারণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবূ বকর (রা.) হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলি তাঁরই গুণাবলি হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা

দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলি হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন–

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا : وَصِيَّةٌ শব্দের অর্থ তাকিদপূর্ণ নির্দেশ এবং إِحْسَانٌ -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবাযত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا : كُرْهٌ শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোনো কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং كَرْهٌ -এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই إِكْرَاهٌ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকিদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতার অপেক্ষা বেশি : আয়াতের শুরুতে পিতামাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরি। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন– صِلْ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ অর্থাৎ মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا : এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা.) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা সাধারণ নিয়ম ছিল নয়; বরং সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। –[কুরতুবী]

এ কারণেই সমস্ত আলেম একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে কুরআন এ সম্পর্কে কোনো ফায়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোনো কোনো নারীর দুধই হয় না এবং কারো কারো দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা উক্ত মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। –[মাযহারী]

স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً : اَشُدَّ-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। সূরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে, بَلَغَ اَشُدَّهٗ ও بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী হলো এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তাওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে লাগল–

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দীয় সৎকর্ম করি, আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। এ কারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলিল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ اَشُدَّهٗ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গল, তখন তিনি উল্লিখিত দোয়া করলেন। আয়াতে بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ দোয়াও কবুল করেন এবং নয়জন মুসলমান ও কাফেরের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ কবুল হয়। বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রূহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হলো? জবাব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া।

–[রূহুল মা'আনী]

এই তাফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল-চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গুনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ তা'আলা

তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দকর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গুনাহ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে أَسِيْرُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ লিখে দেন। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আল্লাহর কয়েদী। -[ইবনে কাসীর] বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ : অর্থাৎ উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত মুমিন-মুসলমানের সৎকর্মসমূহ কবুল করে নেওয়া হয় এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন-

كَانَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ قَالَ وَاللّٰهِ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا.

অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ তা'আলা أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ الخ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম! উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا : পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আজাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষত পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, যে কোনো লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

قَوْلُهُ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا : অর্থাৎ কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদেরকে যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেগুলো মূল্যহীন। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে অল্প রিজিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান। -[মাযহারী]

অনুবাদ :

٢١. وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ط هُوَ هُوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذْ اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ خَوَّفَهُمْ بِالْاَحْقَافِ وَادٍ بِالْيَمَنِ بِهٖ مَنَازِلُهُمْ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مَضَتِ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَيْ مِنْ قَبْلِ هُوْدٍ وَمِنْ بَعْدِهٖ اِلٰى اَقْوَامِهِمْ اَنْ اَيْ بِاَنْ قَالَ لَا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ط وَجُمْلَةُ وَقَدْ خَلَتْ مُعْتَرِضَةٌ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ عَبَدْتُّمْ غَيْرَ اللّٰهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

২১. স্মরণ করুন, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা তিনি হলেন হযরত হূদ (আ.) তিনি তাঁর আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে এই বলে সতর্ক করেছিলেন اِذْ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত اَخَا عَادٍ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। আহকাফ ইয়েমেনের একটি উপত্যকা, সেখানেই তাদের ঘরবাড়ি ও বসবাস ছিল সতর্ককারীগণ এসেছিলেন রাসূলগণ তাঁর পূর্বে এবং পরেও অর্থাৎ হযরত হূদ (আ.)-এর পদার্পণের পূর্বে এবং পরেও স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে। এভাবে যে, তারা বললেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। وَقَدْ خَلَتْ বাক্যটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর। আমি তো তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٢٢. قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج لِتَصْرِفَنَا عَنْ عِبَادَتِهَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ مِنَ الْعَذَابِ عَلٰى عِبَادَتِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْۤ اَنَّهٗ يَاْتِيْنَا .

২২. তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা-অর্চনা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তাদের উপাসনা হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে তবে তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর তাদের উপাসনার ফলে যে শাস্তি আসবে তা যদি তুমি সত্যবাদী হও। তা আমাদের নিকট আনয়নে।

٢٣. قَالَ هُوْدٌ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ز هُوَ الَّذِيْ يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِيْكُمُ الْعَذَابُ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ ط اِلَيْكُمْ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ بِاسْتِعْجَالِكُمُ الْعَذَابَ .

২৩. তিনি হযরত হূদ (আ.) বললেন এর জ্ঞান তো কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তিনি জানেন শাস্তি কখন আসবে আমি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের নিকট প্রচার করি। আমি দেখছি তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। শাস্তি দ্রুত কামনা করার ক্ষেত্রে।

٢٤. فَلَمَّا رَاَوْهُ اَيْ مَا هُوَ الْعَذَابُ عَارِضًا سَحَابًا عَرَضَ فِيْ اُفُقِ السَّمَاءِ مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط اَيْ مُمْطِرٌ اِيَّانَا قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط مِنَ الْعَذَابِ رِيْحٌ بَدَلٌ مِنْ مَا فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا مُؤْلِمٌ .

২৪. অতঃপর যখন তারা দেখল শাস্তিকে মেঘ আকারে যা আকাশের দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে, তখন বলতে লাগল, তা তো মেঘ। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে অর্থাৎ আমাদের উপর বর্ষিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং এটাই তো তা যা তোমরা ত্বরান্বিত করছ. শাস্তি হতে এক ঝড় এটা مَا থেকে بَدَل হয়েছে এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٢٥. تُدَمِّرُ تُهْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ بِأَمْرِ رَبِّهَا بِإِرَادَتِهِ اَىْ كُلَّ شَيْءٍ اَرَادَ اِهْلَاكَهُ بِهَا فَاَهْلَكَتْ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَصِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ طَارَتْ بِذٰلِكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَزَّقَتْهُ وَبَقِىَ هُوْدٌ وَمَنْ اٰمَنَ مَعَهُ فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ غَيْرَهُمْ .

২৫. এটা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে যার উপর দিয়ে এটা অতিক্রম করে যাবে, তার প্রতিপালকের নির্দেশে অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুকে ধ্বংস করে দিবে যাকে ঐ শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। কাজেই এ শাস্তির ঝড় তাদের আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা ও ছোট বড় সকলকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এভাবে যে, ঐ সকল বস্তুকে আকাশ ও পাতালের মাঝামাঝি নিয়ে উড়ে গেল। আর সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এদিকে হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীজনেরা নিরাপদ থাকল। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতি ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অন্যান্যদেরকে।

٢٦. وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا فِى الَّذِىْ اِنْ نَافِيَةٌ اَوْ زَائِدَةٌ مَكَّنّٰكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ فِيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَالِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا بِمَعْنٰى اَسْمَاعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً ز قُلُوْبًا فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اَىْ شَيْئًا مِنَ الْاِغْنَاءِ وَمِنْ زَائِدَةٌ اِذْ مَعْمُوْلَةٌ لِاَغْنٰى وَاُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّعْلِيْلِ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ حُجَجِهِ الْبَيِّنَةِ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَىِ الْعَذَابَ .

২৬. আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম শক্তি ও সম্পদ থেকে তোমাদেরকে তা দেইনি হে মক্কাবাসীরা! এখানে إِنْ مَكَّنّٰكُمْ-এর إِنْ টি نَافِيَه বা অতিরিক্ত। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ سَمْعٌ শব্দটি اَسْمَاعٌ অর্থে। চক্ষু ও হৃদয় অন্তকরণ কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ কোনো কাজেই আসেনি। এখানে مِنْ টি অতিরিক্ত আর اِذْ টা হলো اَغْنٰى-এর مَعْمُوْل এবং এটা تَعْلِيْل-এর অর্থ সম্বলিত। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। সুস্পষ্ট প্রমাণাদিকে। এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হলো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَخَا عَادٍ : আদ হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। যার বংশসূত্র তিন পুরুষের মাধ্যমে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। পরবর্তীতে তার বংশসূত্রও আদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যারা হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের পর সর্বপ্রথম আরব সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দানকারী সম্প্রদায় ছিল, আদ যদি ব্যক্তি অর্থে হয় তবে مُنْصَرِفٌ হবে। আর যদি সম্প্রদায় অর্থে হয় তবে غَيْر مُنْصَرِفٌ হবে। -[লুগাতুল কুরআন]

আর এখানে اَخٌ তথা ভাই দ্বারা বংশীয় ভ্রাতৃত্ব উদ্দেশ্য, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ بِالْأَحْقَافِ : এটা حِقْفٌ -এর বহুবচন; অর্থ- বালু উঁচু ও লম্বা টিলা। أَحْقَافٌ -কে বাহ্য দৃষ্টিতে أَنْذَرَ -এর সেলাহ মনে হলেও বাস্তবে তা নয়; বরং এটা عَادٍ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُقِيْمِيْنَ بِالْأَحْقَافِ আর أَنْذَرَ আর -এর সেলাহ তো لَا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ যেমনটি সামনে আসছে। -[জুমাল]

بِأَنْ দ্বারা ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন যে, أَنْ মাসদারিয়া বা مُخَفَّفَه আর بَاء হলো تَصْوِيْرِيَّة অর্থাৎ অতিক্রমকারীর صُوْرَت অথবা كَيْفِيَّة বর্ণনা করার জন্য এসেছে অর্থাৎ সেই নবী ও রাসূলগণ এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে, তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন।

قَوْلُهُ تَافِكَنَا : বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ হতে মাসদার إِفْكٌ অর্থ- মিথ্যা বলা। তবে যখন এর সেলাহ عَنْ ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় বিদ্রোহ করা, ফিরে যাওয়া। চাই এটা বিশ্বাসগতভাবে হোক বা আমলগত হোক।

قَوْلُهُ مَا هُوَ الْعَذَابُ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- এদিকে ইঙ্গিত করা যে, رَأَوْهُ -এর যমীর ঐ مَا -এর দিকে ফিরেছে, যা مَا تَعِدُنَا -এর মধ্যে রয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, رَأَوْهُ -এর যমীর مُبْهَمْ -এর দিকে করাও জায়েজ। যার অস্পষ্টতাকে عَارِضًا থেকে দূর করা হয়েছে। চাই তা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে হোক বা حَال হওয়ার কারণেই হোক। তিনি আরো বলেছেন যে, এই إِعْرَابٌ অধিক বিশুদ্ধ। কেননা তাতে অস্পষ্টতার পরে বয়ান এসেছে।

প্রশ্ন : مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ এটা عَارِضًا -এর সিফত। অথচ مَوْصُوْف যা عَارِضًا সেটা نَكِرَه হয়েছে। আর مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ইযাফতের কারণে مَعْرِفَه হয়েছে। অনুরূপভাবে مُمْطِرُنَا ও عَارِضًا -এর সিফত হয়েছে অথচ مُمْطِرُنَا ইযাফতের কারণে مَعْرِفَه হয়েছে। আর عَارِضًا হলো نَكِرَه পক্ষান্তরে সিফত ও মওসূফের মধ্যে تَطَابُقْ শর্ত।

উত্তর : উভয় স্থানে صِفَتْ -এর মধ্যে إِضَافَت لَفْظِيَّة তথা শাব্দিক ইযাফত হয়েছে যা مَعْرِفَه -এর ফায়দা দেয় না। কাজেই সেগুলো صِفَتْ হওয়াতে কোনো দোষ নেই। ব্যাখ্যাকার (র.) مُمْطِرُ إِيَّانَا উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَاَهْلَكَتْ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فَأَصْبَحُوْا -এর আতফকে বৈধ করা।

قَوْلُهُ اَوْ زَائِدَةٌ (فِيْهِ مَا فِيْهِ) : কেননা مَا কে অতিরিক্ত মেনে নেওয়ার সুরতে অর্থ হবে- আমি তাদেরকে সেরূপ ক্ষমতা দিয়েছি, যেরূপ তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছি। এতে আদ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা مُشَبَّه এবং কুরাইশদের ক্ষমতা مُشَبَّه بِه আর مُشَبَّه بِه টা مُشَبَّه থেকে শক্তিশালী হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশদের শক্তি ও ক্ষমতা আদ সম্প্রদায়ের শক্তি ও ক্ষমতা থেকে বেশি দেওয়া হয়েছিল। এর দ্বারা কুরাইশদের বড়ত্ব বুঝা যায়। যা উদ্দেশ্যের বিপরীত। কাজেই ব্যাখ্যাকারের أَوْ زَائِدَةٌ বলাটা অতিরিক্ত মনে হয়। -[জুমাল]

قَوْلُهُ وَاُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّعْلِيْلِ : আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন- إِذْ ظَرْفِيَّه এটা تَعْلِيْل -এর স্থলাভিষিক্ত। আর أُشْرِبَتْ হলো غُلِبَتْ অর্থে। বলা হয়- أُشْرِبَ الْأَبْيَضُ حُمْرَةً، وَأُشْرِبَ فِىْ قَلْبِهِمْ اَىْ غُلِبَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক** : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু মক্কাবাসী পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার কারণে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেনি; বরং তাদের সত্যদ্রোহিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতনও বেড়ে যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ 'আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে'। এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতেও তাদের গাফলত এবং ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটেনি, তারা মনে করতো যে, তারা সমৃদ্ধশালী, তাদের ধন-সম্পদের কারণে কখনো তাদের সুখ-শান্তির অভাব হবে না।

তাই আলোচ্য আয়াতে সমৃদ্ধশালী আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। তারাও ছিল প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারী, তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত হুদ (আ.)। তিনি তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আদ জাতি হযরত হুদ (আ.)-এর উপদেশে কর্ণপাত না করার কারণে আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে, আসমানি গজব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ـ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

অর্থাৎ 'আর স্মরণ কর আদ জাতির ভাইকে, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। তিনি তাঁর আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল একথা বলে যে, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– হে রাসূল! যদি আজ আপনার জাতি আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে থাকে, তবে তা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে অন্যান্য নবী রাসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে এ মর্মে যে, আপনি আদ জাতির কথা স্মরণ করুন, আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন; তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তাওহীদে বিশ্বাস কর, শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর।

কিন্তু আদ জাতি হযরত হুদ (আ.)-এর এ সতর্কবাণীকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলল, আমরা উপলব্ধি করছি যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করাই তোমার উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

قَالُوٓا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۔ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

অর্থাৎ "তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করার জন্যেই এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে ভয়ের কথা বলছো, তা আনয়ন কর।"

এভাবে আদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)-এর হেদায়েতকে অমান্য করেছে, সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু এর পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। আদ জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ পাকের আজাব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার পাশাপাশি কাফেরদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী-রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম সর্বদা ভয়াবহ হয়েছে। আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাবলি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কখনো আল্লাহ পাক কোনো দল, গোষ্ঠী বা জাতিকে ক্ষমা দান করেন, সমৃদ্ধশালী করেন, কিন্তু যখন তাদের ঔদ্ধত্য, নাফরমানি, জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গজব নেমে আসে, পরিণামে তারা ধ্বংস হয়। পবিত্র কুরআন তাই এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করে মানবজাতিকে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে।

আহকাফের পরিচিতি : আলোচ্য আয়াতে এ সূরার নাম 'আহকাফ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, সূরার শুরুতে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'আহকাফ' নামক স্থানটি আম্মান এবং মোহরা নামক স্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তফসীরকার হযরত মোকাতেল (র.) বলেছেন, আদ জাতি ইয়েমেনের হাজরামাউত এলাকার 'মোহরা' নামক স্থানে বসবাস করতো। হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, বর্ণিত আছে– আদ জাতি ছিল ইয়েমেনের একটি গোত্র, তারা সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থানে বাস করতো। এ স্থানটিকে "ইয়াশজার" বলা হতো।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) লিখেছেন, আদ জাতি ইয়ামামা বাহরাইন প্রভৃতি এলাকার নিকটস্থ বিরাট শূন্য প্রান্তরে বসবাস করতো। এ এলাকাকেই তখন 'আহকাফ' বলা হতো। বর্তমানে এটি অনাবাদী থাকলেও তখন আদ জাতির বাসস্থান হওয়ার কারণে তা ছিল প্রাণবন্ত। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৬৫৪]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ইবনে যায়েদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যা ইকরিমার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আহকাফ পাহাড় এবং গর্তকে বলা হয়। এসব স্থানেই আদ জাতির আবাস ছিল। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাজরামাউতে একটি মরুভূমির নাম আহকাফ।" –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৩৫০]

আল্লামা আলুসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সিরিয়াতে একটি পাহাড়ের নাম আহকাফ। হযরত ইবনে ইসহাক বলেছেন, আদ জাতি আম্মান এবং হাজরামাউতের মাঝামাঝি স্থানে বাস করতো। আর ইবনে আতিয়া (র.) বলেছেন, আদ জাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো তারা ইয়েমেনে বাস করতো।

আল্লামা মাজেদী (র.) লিখেছেন, আহকাফ এর শাব্দিক অর্থ বালুর স্তূপ; আহকাফ নামক স্থানটি জর্ডানের আম্মান থেকে পূর্ব পশ্চিমে ইয়েমেন পর্যন্ত, আর উত্তর দক্ষিণে নজদ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত। সম্পূর্ণ এলাকাটি ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর পশ্চিমাংশে বালুর বর্ণ লাল, আর এ এলাকাকেই 'আহকাফ' বলা হয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত হুদ (আ.)-এর পূর্বেও এ এলাকাবাসীর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সতর্ককারী পৌঁছেছেন, তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

অর্থাৎ তাঁর পূর্বে এবং পরেও বিভিন্ন যুগে সতর্ককারী এসেছিলেন এবং তাঁরা সতর্ক করে একথা বলেছিলেন, তোমরা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

বস্তুত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ পাকের নবী রাসূলগণ এভাবেই মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, যারা ভাগ্যবান, তারা সতর্কতা অবলম্বন করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে গেছে, পক্ষান্তরে যারা হতভাগ্য, তারা নবী-রাসূলগণের হেদায়েত মানেনি, পরিণামে তাদের শাস্তি হয়েছে অবধারিত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا : বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি অনেক দিন থেকে অনাবৃষ্টির কারণে কষ্টে ছিল। হঠাৎ একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, তারা মেঘ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তারা মনে করল বৃষ্টিপাত হবে, তারা ফসল ঘরে তুলবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশে মেঘমালার আকৃতিতে যা দেখা গিয়েছিল, তা মেঘ ছিল না; বরং আল্লাহ পারেক আজাব ছিল, আর তা ঘূর্ণিঝড়ের আকৃতি ধারণ করলো এবং দুর্ধর্ষ আদ জাতির উপর আপতিত হলো। তাই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে– بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ـ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ, [তোমরা যা দেখেছ তা বৃষ্টি নয়;] বরং তা সে শাস্তিই, যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছ। এতেই রয়েছে ঝড়, যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বহনকারী।

অর্থাৎ হযরত হুদ (আ.)-এর নিকট আদ জাতি যে শাস্তির জন্যে তাড়াহুড়ো করছিল, সে শাস্তিই তাদের উপর আপতিত হলো।

قَوْلُهُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا : তার প্রতিপালক তথা আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে সে সব কিছুকে উপড়ে ফেলবে, এরপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বাড়ি-ঘড় ব্যতীত আর কিছুই রইল না, তাদের সব কিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। তাদের পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফসল এক কথায় সবকিছু আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত হুদ (আ.) এবং তাঁর অনুসারীগণ ব্যতীত কেউ রক্ষা পেল না। শুধু তাদের হারানো দিনের সাক্ষী হিসেবে বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেল। তাই ইরশাদ হয়েছে– فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ অর্থাৎ, তাদের বাড়ি-ঘর ব্যতীত আর কিছুই রইল না।

বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি তাদের আজাবের কথা তখন উপলব্ধি করল, যখন তারা দেখল, বাতাস সবকিছু উড়িয়ে নিচ্ছে, এমনকি তাদের উটগুলোকে পৃষ্ঠের বোঝাসহ আসমান-জমিনের মধ্যখানে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে তারা পালিয়ে স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশ করলো, দ্বার-রুদ্ধ করে দিল, কিন্তু প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে গেল এবং তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করলো।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তাদের লাশগুলো মরুভূমির উপর পড়েছিল, আল্লাহ পাক বালুর ঝড় প্রেরণ করলেন এবং আদ জাতির লোকদের মৃত লাশগুলো বালুর নীচে চাপা পড়ল। এ ঘূর্ণিঝড় আট দিন সাত রাত অব্যাহত ছিল, এরপর ঝড় তাদেকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

সাধারণত বাতাস একটি পরিমাণ মোতাবেক চলে, কিন্তু সেদিন আল্লাহ পাকের গজবি বাতাস কত দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। আর এভাবে দুর্ধর্ষ,আকাশ-চুম্বি ইমারত নির্মাণকারী, শক্তিধর, আদ জাতির নাম-নিশানও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেল। পরবর্তী আয়াতে তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. অর্থাৎ "এভাবেই আমি পাপিষ্ঠ জাতিগুলোকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"

এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেভাবে আদ জাতির প্রতি আজাব আপতিত হয়েছে, সে অবস্থা তোমাদেরও হতে পারে।

আল্লামা বগভী (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! লোকেরা মেঘমালা দেখে খুশি হয়, বৃষ্টিপাতের আশা করে, কিন্তু আপনি মেঘমালা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং আপনার চেহারা মোবারকে দুশ্চিন্তার আলামত লক্ষ্য করা যায়। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা! আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়তো ঐ মেঘমালায় আল্লাহ পাকের আজাব রয়েছে। [পূর্বকালে] একটি জাতির উপর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এসেছিল, কিন্তু প্রথমে মেঘমালা দেখে তারা উপলব্ধি করেছিল, এ মেঘমালা থেকে আমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে [কিন্তু ঐ মেঘমালাই তাদের জন্যে আজাব বহন করে এনেছিল।]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ যখন দেখতেন যে, তীব্র গতিতে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বাতাস থেকে এবং যা এর মধ্যে আছে তা থেকে কল্যাণ কামনা করি এবং এই বাতাস যা বহন করে এনেছে তা থেকেও কল্যাণ কামনা করি। আর আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু এই বাতাস বহন করে এনেছে তার অকল্যাণ থেকে। প্রিয়নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, সাধারণত যা দেখলে মানুষ বৃষ্টিপাতের

আশা করে; কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, মেঘমালা দেখেই তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ অবস্থায় তিনি একবার বাইরে যেতেন আবার ভেতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি শুরু হতো, তখন তাঁর চেহারা মোবারকের দুশ্চিন্তার ছাপ দূরীভূত হতো।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ অবস্থাটা উপলব্ধি করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা! সম্ভবত এ মেঘমালা সেরকমই, যেমন আদ জাতি মেঘ দেখে বলেছিল, এর দ্বারা আমরা বৃষ্টি পাব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বৃষ্টি দেখে এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তোমার রহমত কামনা করি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন, "হে আয়েশা! আমি কি করে নিশ্চিত হব! কারণ একটি জাতিকে এ বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করা হয়েছে।"

আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ যখনই আকাশে মেঘ দেখতেন, তখনই নিজের কাজ ছেড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এর অকল্যাণ থেকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ যখনই তুফান দেখতেন, তখনই দু' জানু একত্র করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! এ তুফানকে রহমতে রূপান্তরিত কর, একে আজাবে পরিণত করো না।'

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন তিনি তাঁর সব কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাজ হলেও। এরপর এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে।

পূর্ববর্তী আয়াতে শক্তিধর আদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে সাধারণত সকল যুগের কাফের মুশরিক বিশেষত মক্কার কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ

অর্থাৎ "আর আমি আদ জাতিসহ অন্যান্য জাতিকে যে ক্ষমতা দান করেছিলাম তা তোমাদেরকে দান করিনি।" তাদেরকে ধনবল, জনবল, বাহুবল তোমাদের চেয়ে শতগুণ বেশি প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান হয় এবং তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)-কে মিথ্যাজ্ঞান করে, তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর সে শাস্তির কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের শক্তি-সামর্থ্য কোনো কাজে আসেনি, তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব তোমরা তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ। কেননা পূর্বকালের অবাধ্য জাতিগুলোর ন্যায় তোমরাও আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের বিরোধিতা করছো এবং আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করছো, তোমাদের এ দৌরাত্ম্যের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা ভেবে দেখ।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً : 'আর আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছিলাম।' অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণের জন্যে তাদেরকে শ্রবণ শক্তি দান করেছিলাম, যেন তা দ্বারা তারা উপদেশ গ্রহণ করে, এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্যে তাদেরকে দান করেছিলাম নয়ন যুগল, যেন তারা সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি ঈমানে আনে, এমনিভাবে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে এবং আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল করার জন্যে তাদের দান করেছিলাম অন্তর যেন তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

কিন্তু এসব উপকরণ দ্বারা এ হতভাগ্যরা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারেনি, এসব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তারা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের নাফরমানিই করেছে, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ অর্থাৎ, কিন্তু কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোনো কাজেই আসেনি'। কেননা তারা এ সমস্ত নিয়ামতের অপব্যবহার করেছে।'

قَوْلُهُ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ : এজন্যে যে, সত্য গ্রহণের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিধানসমূহকে অমান্য করেছে, এমনকি যখন তাদেরকে আল্লাহর নবী তাদের অপকর্মের পরিণতিতে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেন, তখন তারা ঐ আজাবকে বিদ্রূপ করে। তারা বলে, যদি কোনো আজাব এসে আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে তবে তা আসুক এখনই, বিলম্ব কিসের? অবশেষে সেই আজাব তাদের উপর আপতিত হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করল। তাই পরবর্তী বাক্যাংশে ইরশাদ হয়েছে– وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ. অর্থাৎ, আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।' অর্থাৎ সে আজাবই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করল। এভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতিকে তাদের চরম অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করার অর্থ হলো তারা বলেছিল, "এখনই আসুক সে আজাব"।

অনুবাদ :

٢٧. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى اَىْ اَهْلَهَا كَثَمُوْدَ وَعَادٍ وَقَوْمِ لُوْطٍ وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ كَرَّرْنَا الْحُجَجَ الْبَيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

২৭. আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ: অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে। যেমন- সামূদ, আদ এবং লূত সম্প্রদায়কে। আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলি বিবৃত করেছিলাম অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহকে বারবার বর্ণনা করেছিলাম। যাতে তারা ফিরে আসে।

٢٨. فَلَوْلَا هَلَّا نَصَرَهُمْ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ قُرْبَانًا مُتَقَرَّبًا بِهِمْ اِلَى اللّٰهِ اٰلِهَةً ط مَعَهُ وَهُمُ الْاَصْنَامُ وَمَفْعُوْلُ اِتَّخَذُوْا الْاَوَّلُ ضَمِيْرٌ مَحْذُوْفٌ يَعُوْدُ اِلَى الْمَوْصُوْلِ اَىْ هُمْ وَقُرْبَانًا الثَّانِىْ وَاٰلِهَةً بَدَلٌ مِنْهُ بَلْ ضَلُّوْا غَابُوْا عَنْهُمْ ج عِنْدَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَ ذٰلِكَ اَىْ اِتِّخَاذُهُمُ الْاَصْنَامَ اٰلِهَةً قُرْبَانًا اِفْكُهُمْ كِذْبُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ يَكْذِبُوْنَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ اَىْ فِيْهِ .

২৮. তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? তাদের থেকে শাস্তি দূরীভূত করে। আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল, নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। আর তারা হলো প্রতিমাগুলো। اِتَّخَذُوْا -এর মাফউল হলো উহ্য যমীর যা مَوْصُوْل -এর দিকে ফিরেছে। আর তা হচ্ছে- هُمْ আর قُرْبَانًا হলো দ্বিতীয় মাফউল এবং اٰلِهَةً শব্দটি তা থেকে بَدَل হয়েছে। বস্তুত তাদের ইলাহগুলো তাদের নিকট হতে অন্তর্নিহিত হয়ে পড়লো শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় এরূপই অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য প্রতিমাগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করা। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম। এখানে مَا টা হলো মাসদারিয়া অথবা মাওসূলা এবং عَائِد উহ্য রয়েছে তথা فِيْهِ

٢٩. وَ اذْكُرْ اِذْ صَرَفْنَا اَمَلْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ جِنَّ نَصِيْبِيْنِ الْيَمَنِ اَوْ جِنَّ نِيْنَوٰى وَكَانُوْا سَبْعَةً اَوْ تِسْعَةً وَكَانَ ﷺ بِبَطْنِ نَخْلٍ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ الْفَجْرَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ج فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَنْصِتُوْا ج اَصْغُوْا لِاسْتِمَاعِهِ فَلَمَّا قُضِىَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَلَّوْا رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ مُخَوِّفِيْنَ قَوْمَهُمْ بِالْعَذَابِ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا وَكَانُوْا يَهُوْدًا .

২৯. এবং স্মরণ করুন আমি আপনার প্রতি ফিরিয়েছিলাম আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে সে জিন ছিল نَصِيْبِيْن يَمَن অথবা নীনাওয়ার অধিবাসী ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন বা নয়জন। তখন নবী করীম ﷺ বাতনে নাখলা নামক স্থানে সাহাবায়ে কেরামসহ সালাতুল ফজর আদায় করছিলেন। এ ঘটনাটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। যারা কুরআন পাঠ শুনতেছিল, যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তারা বলল অর্থাৎ তাদের কেউ কেউ বলল, তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর কান লাগিয়ে শোন। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তিনি তাঁর কেরাত পাঠ হতে অবসর হলেন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়কে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর তারা ছিল ইহুদি।

٣٠. قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا هُوَ الْقُرْاٰنُ اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَىْ تَقَدَّمَهُ كَالتَّوْرٰىةِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ الاسلام وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ اِلٰى طَرِيْقِهِ .

৩০. তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায় আমরা এমন কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি আর তা হলো কুরআন যা অবতীর্ণ হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর পরে তা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে অর্থাৎ যা তার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল যেমন– তাওরাত এবং পরিচালিত করে সত্য ইসলাম ও সরল পথের দিকে।

٣١. يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْاِيْمَانِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ اللّٰهُ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ اَىْ بَعْضَهَا لِاَنَّ مِنْهَا الْمَظَالِمَ وَلَا تُغْفَرُ اِلَّا بِرِضٰى اَرْبَابِهَا وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ .

৩১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ঈমানের দিকে যে আহ্বান করেছেন তাতে সাড়া দাও। এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন অর্থাৎ তার কতিপয় পাপ ক্ষমা করবেন। কেননা এর মধ্যে অত্যাচার-নির্যাতন তথা বান্দার হকও রয়েছে যা বান্দার সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। এবং তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

٣٢. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ اَىْ لَا يُعْجِزُ اللّٰهَ بِالْهَرَبِ مِنْهُ فَيَفُوْتُهُ وَلَيْسَ لَهٗ لِمَنْ لَا يُجِبْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَىِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءُ ط اَنْصَارٌ يَدْفَعُوْنَ عَنْهُ الْعَذَابَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُجِيْبُوْا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ .

৩২. আর কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না। অর্থাৎ পালিয়ে গিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারবে না। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের যারা তার ডাকে সাড়া না দিবে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। যে তার থেকে শাস্তি বিদূরিত করবে। তারাই যারা আহ্বানে সাড়া দেয়নি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

٣٣. اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا اَىْ مُنْكِرُو الْبَعْثِ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ بِقٰدِرٍ خَبَرُ اِنَّ وَزِيْدَتِ الْبَاءُ فِيْهِ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِىْ قُوَّةِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى هُوَ قَادِرٌ عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৩৩. তারা কি অনুধাবন করে না জানে না! পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীরা যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি তা থেকে অক্ষম হননি। তিনি সক্ষম এটা اِنَّ-এর খবর এবং এতে بَاء অতিরিক্ত আনা হয়েছে। বাক্যটি اَلَيْسَ اللّٰهُ بِقَادِرٍ-এর শক্তিতে পৌঁছার কারণে। মৃতের জীবন দান করতেও। বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣٤. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط بِاَنْ يُعَذَّبُوْا بِهَا يُقَالُ لَهُمْ اَلَيْسَ هٰذَا التَّعْذِيْبُ بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ .

৩৪. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে এভাবে যে, তাদেরকে অগ্নির শাস্তি প্রদান করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে এটা কি সত্য নয়? শাস্তি। তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, এটা সত্য! তখন তাদেরকে বলা হবে শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

٣٥. فَاصْبِرْ عَلٰى اَذٰى قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ ذَوُوالثَّبَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى الشَّدَائِدِ مِنَ الرُّسُلِ قَبْلَكَ فَتَكُوْنُ ذَا عَزْمٍ وَمِنْ لِلْبَيَانِ فَكُلُّهُمْ ذَوُوْ عَزْمٍ وَقِيْلَ لِلتَّبْعِيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ اٰدَمُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا وَلَا يُوْنُسُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ط لِقَوْمِكَ نُزُوْلَ الْعَذَابِ بِهِمْ قِيْلَ كَاَنَّهٗ ضَجِرَ مِنْهُمْ فَاَحَبَّ نُزُوْلَ الْعَذَابِ بِهِمْ فَاُمِرَ بِالصَّبْرِ وَتَرْكِ الْاِسْتِعْجَالِ لِلْعَذَابِ فَاِنَّهٗ نَازِلٌ بِهِمْ لَا مُحَالَةَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ لِطُوْلِهٖ لَمْ يَلْبَثُوْٓا فِى الدُّنْيَا فِىْ ظَنِّهِمْ اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلٰغٌ تَبْلِيْغٌ مِنَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَهَلْ اَىْ لَا يُهْلَكُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ اَىِ الْكَافِرُوْنَ .

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার সম্প্রদায়ের কষ্টের উপর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুদৃঢ় ও মসিবতে ধৈর্যধারণকারী, রাসূলগণ। আপনার পূর্বে। তবে আপনিও أُولُو الْعَزْمِ তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর مِنْ টা بَيَانِيَّه হবে। এ সুরতে প্রত্যেকেই أُولُو الْعَزْمِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। বলা হয়েছে যে, مِنْ টা تَبْعِيْضِيَّة তখন হযরত আদম (আ.) এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا -এর কারণে এবং হযরত ইউনুস (আ.) ও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ -এর কারণে। আর আপনি এদের জন্য ত্বরা করবেন না আপনার সম্প্রদায়ের জন্য। তাদের উপর শাস্তি আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে। বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি তাদের উপর শাস্তি কামনা করেছিলেন। এ কারণেই তাঁকে ধৈর্যধারণ করার ও শাস্তি কামনার ক্ষেত্রে ত্বরা না করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কেননা শাস্তিতো তাদের উপর নিশ্চিতভাবে অবতীর্ণ হবেই। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে পরকালের শাস্তির ব্যাপারে, তার সুদীর্ঘতার কারণে সেদিন তাদের মনে হবে তারা যেন পৃথিবীতে দিবসের এক দণ্ডের বেশি অবস্থান করেনি। পৃথিবীতে তাদের ধারণা মতে, এই কুরআন এক ঘোষণা তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে তাবলীগ বা প্রচার। সুতরাং শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ এটা -এর দ্বারা মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। لَامْ টা উহ্য قَسَمْ -এর জবাবের উপর এসেছে। مِنَ الْقُرٰى এটা مَا -এর بَيَانْ আর اَهْلَهَا বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উহ্য مُضَافْ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ لَوْلَا : لَوْلَا -এর তাফসীর هَلَّا দ্বারা এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, لَوْلَا টা تَحْضِيْضِيَّة বা উৎসাহব্যাঞ্জক আর এর দ্বারা تَوْبِيْخ তথা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا : اَلَّذِيْنَ হলো اِسْم مَوْصُوْل আর اِتَّخَذُوْا এটা جُمْلَه হয়ে صِلَه এখন সেলাহ ও মাওসূল মিলে نَصَرَ -এর ফায়েল। আর اِتَّخَذُوْا -এর প্রথম মাফউল هُمْ উহ্য রয়েছে আর দ্বিতীয় মাফউল হলো قُرْبَانًا। আর اٰلِهَةً টা قُرْبَانًا হতে بَدَل হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) বর্ণনা করেছেন। قُرْبَانًا বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। আর এটাও হতে পারে যে, اٰلِهَةً হলো اِتَّخَذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর قُرْبَانًا টা حَالْ অথবা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ ضَلُّوْا اَىِ الْاَصْنَام : আবার কেউ কেউ ضَلُّوْا -এর ফা'য়েল কাফেরদেরকে বলেছেন। অর্থাৎ উপাসকরা উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবে এবং তাদের থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। [প্রথমটি উত্তম] –[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُه نَفَرًا : এর অর্থ হলো– জামাত, দখল, যা তিন হতে অধিক এবং দশ থেকে কম। বহুবচনে اَنْفَارٌ -

قَوْلُهُ مِنَ الْجِنِّ : এটা نَفَرًا -এর প্রথম সিফত, আর يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ হলো দ্বিতীয় সিফত।

قَوْلُهُ حَضَرُوْهُ : যমীরের مَرْجِعْ কুরআন এবং নবী উভয়ই হতে পারে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا قُضِىَ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এটাকে مَجْهُوْل পড়েছেন। আর হাবীব ইবনে ওবাইদ এটাকে مَعْرُوْف পড়েছেন مَجْهُوْل -এর সুরতে حَضَرُوْهُ -এর যমীর কুরআনের দিকে ফিরবে, আর مَعْرُوْف -এর সুরতে মহানবী ﷺ -এর দিকে ফিরবে। –[ফাতহুল কাদীর : আল্লামা শাওকানী]

قَوْلُهُ مُنْذِرِيْنَ : এটা حَال مُقَدَّرَه হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدِّرِيْنَ الْاِنْذَارَ আর نَصِيْبِيْن হলো ইয়েমেনের একটি গ্রাম। نِيْنَوٰى -এর প্রথম نُوْن টি যেরযুক্ত এবং পরবর্তী يَاء সাকিন এবং দ্বিতীয় نُوْن -এ যবর ও পেশ উভয়ই হতে পারে। আর শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة হবে।

قَوْلُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ : মুফাসসির (র.) এই ঘটনাকে نَخْل -এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এতে تَسَامُحْ তথা বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি রয়েছে। কেননা যেখানে জিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছিল সেটা بَطْنِ نَخْلَه ছিল। এটাকে نَخْلَه -ও বলা হতো। এ জায়গাটা মক্কা হতে তায়েফের পথে একরাতের দূরত্বে অবস্থিত। যেখানে রসূল ﷺ সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন আর এ জায়গাটা মদীনা হতে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত। –[জুমাল]

قَوْلُهُ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ : এখানে জিনদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। আর اَوَلَمْ يَرَوْا থেকে আল্লাহর কালাম শুরু হয়েছে।

قَوْلُه وَزِيْدَتِ الْبَاءُ فِيْهِ لِاَنَّ الْكَلَامَ الخ : আল্লামা মহল্লী (র.) এই ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো– بَاء টা নেতিবাচক বাক্যের পরে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। আর যা তার অধীনে থাকে তা হ্যাঁ-বাচক হয়ে থাকে। কাজেই بِقَادِرٍ -এর মধ্যে بَاء আনাটা ঠিক হয়নি।

উত্তরের সারকথা হলো– نَفِىْ টা আয়াতের শুরুতে اَلَمْ يَرَوْا -এর মধ্যে হয়েছে এবং এর পরে যা কিছু তার পরে রয়েছে তাও نَفِىْ -এর অধীনে রয়েছে। মনে হয় যেন বাক্যটি اَلَيْسَ بِقَادِرٍ -এর শক্তিতে হয়েছে। কাজেই بَاء প্রবিষ্ট করা জায়েজ। এ কারণেই তার উত্তর আল্লাহর বাণী– بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর মধ্যে بَلٰى দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এটা এ কথার নিদর্শন যে, বাক্যটি শক্তিতে نَفِىْ -এর মতো হয়েছে। কেননা بَلٰى দ্বারা مَنْفِىْ বাক্যের জবাব প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) يُقَالُ لَهُمْ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَوْمَ টা উহ্য يُقَالُ ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর يَوْمَ يُعْرَضُ হতে اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ পর্যন্ত বাক্যটি يُقَالُ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَبِّنَا : এখানে وَاوْ টা قَسْمِيَّه তাকিদের জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ ذُو الثُّبَاتِ : এটা أُولُوا الْعَزْمِ -এর তাফসীর। এর অর্থ হলো উঁচু হিম্মত, সুদৃঢ় পদ। যদি مِنْ -কে بَيَانِيَّهْ ধরা হয় তবে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম أُولُوا الْعَزْمِ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। তবে কেউ কেউ مِنْ -কে تَبْعِيْضِيَّه বলেছেন। এ সুরাতে কয়েকজন আম্বিয়ায়ে কেরামকে أُولُوالْعَزْمِ থেকে مُسْتَثْنٰى করা হয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ : এটা جَوَاب شَرْط আর فاء হলো جزائية শর্ত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- إِذَا كَانَ اَمْرُ الْكُفَّارِ مَا ذُكِرَ فَاصْبِرْ عَلٰى اَذَا هُمْ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَرَوْنَ : এটা لَمْ يَلْبَثُوْا -এর ظَرْف হয়েছে। আর لِطُوْلِهِ টা لَمْ يَلْبَثُوْا -এর تَعْلِيْل যা مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلَاغٌ : এখানে هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَلَاغٌ টা উহ্য মুবতাদার খবর। আর بَلَاغٌ হলো اِسْمُ لِلتَّبْلِيْغِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এ আয়াতেও পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পাকের অবাধ্য জাতিগুলোকে ধ্বংস করার কথা ইরশাদ হয়েছে- হে মক্কাবাসী! তোমাদের আশপাশের অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের শিরক কুফর ও নাফরমানির কারণে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন مَا حَوْلَكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের আশ-পাশের" কথাটির অর্থ হলো, মক্কার অদূরেই সামুদ জাতি, আদ জাতি এবং হযরত লূত (আ.)-এর জাতি বাস করতো। আল্লাহ পাক বারে বারে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এসব জাতি সৎপথে ফিরে আসেনি; তাই তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন। আদ জাতিকে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে, সামুদ জাতিকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে এবং হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সদুমবাসীকে প্রথমে পাথর বর্ষণ করে এবং পরে জমিনকে উল্টিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার চারপার্শ্বের এসব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণই ছিল মক্কাবাসীর একান্ত কর্তব্য।

আদ জাতি ছিল আহকাফে, তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সামুদ জাতি, তোমরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে পাও। অতএব, তাদের ঘটনা থেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তোমাদের রয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً : 'তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে নিজেদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল তারা কেন [বিপদ মুহূর্তে] তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের পূজারীদের থেকে উধাও হয়ে গেল। বস্তুত এটিই ছিল তাদের নিজেদের মনগড়া মিথ্যা, আর তারা যা রচনা করতো, এটি তাই।'

অনেক কাফের তাদের হাতের বানানো প্রতিমার পূজা করে বলতো, এরা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারবো। তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মহাবিপদের সময় তোমাদের ঐসব উপাস্যরা কোথায় ছিল, তোমাদের মহাবিপদের দিনে কেন তারা সাহায্য করতে আসল না?

বস্তুত যারা একথা মনে করে যে ঠাকুর দেবতাদের পূজা অর্চনা তাদের জন্যে উপকারী হবে, তাদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিছক মনগড়া এবং ভ্রান্ত ধারণা, এ সম্পর্কে আদৌ সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ الخ : **শানে নুযূল :** ইবনে আবি শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী ﷺ 'বতনে নাখলা' নামক স্থানে কুরআনে কারীম পাঠ করছিলেন, তখন কয়েকজন জিন উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে নীচে অবতরণ করলো এবং একে অন্যকে বলল, নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। এ জিনদের সংখ্যা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল রাজবাআ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

রাসূল ﷺ -এর দরবারে জিনের উপস্থিতি : মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সে মতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হতো। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হলো এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনসুন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হিজাযেও পৌঁছাল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মতো বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হতো এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাজে কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছাল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শোন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্ত কার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। –[ইবনুল মুনযির]

আরো এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরো তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বারবার আগমন করেছে।

খাফফাযী (র.) বলেন, সবগুলো হাদীস একত্র করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয়বার সংঘটিত হয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন]

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরিউক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى : "মূসার পরে" বলার কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জিলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদি হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তাওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কুরআন তাওরাতের মতো একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরিয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কুরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

قَوْلُهُ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ : مِنْ অব্যয়টি আসলে "কোনো কোনো"-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোনো কোনো গুনাহ মাফ হবে। অর্থাৎ আল্লাহর হক মাফ হবে– বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

জিনেরা জান্নাতে যাবে না : তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, জিনেরা তাদের ঈমান ও নেক আমলের কারণে দোজখের আজাব থেকে রেহাই পাবে; কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জিন মুমিন হলেও জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা তারা ইবলিসের বংশধর। আর ইবলিসের বংশধররা জান্নাতে যেতে পারবেন না, তবে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন, জিন যদি ঈমানদার হয়, তবে তাকে ঈমানদার মানুষের ন্যায় বিবেচনা করা হবে। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দূ] পারা. ২৬, পৃ. ২৬]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءُ أُولٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُبِيْنٍ : অর্থাৎ যে আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাকে আল্লাহর আজাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সে কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

যারা আল্লাহ পাকের রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাঁর কথা মানবে না, তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে; কেননা হেদায়েত শুধু আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল ﷺ -এর অনুসরণেই রয়েছে। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। আর একথা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ প্রসঙ্গে : আলোচ্য আয়াতে কোনো কোনো রাসূলকে 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পৃথিবীতে এমন কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁর মধ্যে এ গুণটি ছিল না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ.) ব্যতীত সমস্ত নবী রাসূলগণই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করেছিলেন, তাই প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ "[হে রাসূল!] আপনি ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় হবেন না।", অর্থাৎ তাঁর ন্যায় তাড়াহুড়া করবেন না।"

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী রাসূলগণের উল্লেখ সূরা আন'আমে রয়েছে। তাঁদের সংখ্যা হলো আঠার। তাঁরা হলেন. হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকূব (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত আইয়ূব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত হারূন (আ.), হযরত জাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহইয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত আলয়াসা (আ.), হযরত লূত (আ.) ও আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ সমস্ত নবী-রাসূলগণের উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এরাই সেসব লোক যাঁদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন। অতএব, তাঁদেরই অনুসরণ কর।"

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, أُولُوا الْعَزْمِ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী-রাসূলগণ হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে জেহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মোকাতিল (র.) বলেছেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী হলেন ছয়জন। ১. হযরত নূহ (আ.), তিনি তাঁর জাতির অকথ্য নির্যাতনে সবর অবলম্বন করেছেন। ২. হযরত ইব্রাহীম (আ.), নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, তিনি তাতে সবর করেছিলেন। ৩. হযরত ইসহাক (আ.), তিনি জবেহ করার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। মোকাতিল (র.)-এর মতে, হযরত ইসহাক (আ.)-ই ছিলেন জবীহুল্লাহ, ইসমাঈল (আ.) নন [অথচ এ কথাটি অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থি, তাঁদের মতে জবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ৪. হযরত ইয়াকূব (আ.), তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে যাওয়ার এবং নিজের অন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। ৫. হযরত ইউসুফ (আ.), তিনি অরণ্যের কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এবং কারাগারে অবস্থানের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। ৬. হযরত আইয়ূব (আ.), তিনি কুষ্ঠ রোগের কারণে চরম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সবর অবলম্বন করেছেন। হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি "উলুল আজম" রাসূলের সংখ্যা হলো ৩১৩ জন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.)-এর মত হলো যাঁদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরাই হলেন 'উলুল আজম' নবী-রাসূল। –[আদ্ দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ৫০]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উলুল আজম বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী রাসূল ছিলেন পাঁচজন; যাঁদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ । আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের কথা বিশেষভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

এমনিভাবে এ পাঁচজন নবীর উল্লেখ অন্য আয়াতেও রয়েছে-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى .

যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, যেহেতু এই পাঁচজন নবীর উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে, তাই তাঁরাই হলেন أُولُوا الْعَزْمِ 'উলুল আজম' বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন ছয়জন। হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । উপরোল্লিখিত আয়াতে হযরত আদম (আ.) ব্যতীত আর পাঁচজনের উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শরিয়তের বাহক ছিলেন। তাঁদের পরে যাঁরা নবী হয়েছেন তাঁরাও এঁদেরই শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। আর হযরত আদম (আ.) সর্বাগ্রে আগমন করেছেন। তাঁকে প্রদত্ত শরিয়তের উপরই তিনি আমল করেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার মাসরূক (র.) বলেছেন, আমাকে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে দুনিয়ার প্রতি সামান্য আকর্ষণও সমীচীন নয়। হে আয়েশা! আল্লাহ পাক 'উলুল আজম' ব্যক্তিদের জন্যে দুনিয়ার কষ্টের উপর সবর করা এবং লোভনীয় মোহনীয় বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করেছেন, আমার প্রতিও সে আদেশই হয়েছে যা অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণের প্রতিও হয়েছিল, আল্লাহ পাক আমার জন্যে তাই পছন্দ করেছেন, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করছেন। فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ . "[হে রাসূল!] আপনি সবর করুন যেভাবে অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণ সবর অবলম্বন করেছেন।"

তাই আমিও তাঁদের ন্যায় সবর অবলম্বন করবো, যেমনটি তাঁরা করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, সে দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে রয়েছে যখন প্রিয়নবী ﷺ একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, যাঁকে তার সম্প্রদায় প্রহার করতে করতে রক্তাপ্লুত করে ফেলেছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে মাফ করে দাও, এরা জানে না। এ ঘটনা স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এরই যা তায়েফ নামক স্থানে ঘটেছিল; কিন্তু তিনি নিজেকে গোপন করে এভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ৪৬৫ - ৪৬৬]

জিনদের মধ্য হতে কোনো রাসূল নেই : আল্লাহ তা'আলা জিনদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছেন কিনা? এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, জিনদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল নেই। রাসূল ﷺ -কে মানব ও দানব উভয়ের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَصَدُّوْا غَيْرَهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْاِيْمَانِ اَضَلَّ اَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ كَاِطْعَامِ الطَّعَامِ وَصِلَةِ الْاَرْحَامِ فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْاٰخِرَةِ ثَوَابًا وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰى .

১. যারা যেসব মক্কাবাসী কুফরি করে ও অপরকে আল্লাহর পথ অর্থাৎ ঈমান হতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যেমন খাদ্য খাওয়ানো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা। তারা পরকালে এর কোনো ছওয়াব / প্রতিদান পাবে না। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকে পৃথিবীতেই এর প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে।

٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَيِ الْاَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَيِ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ غفر لهم سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ اَىْ حَالَهُمْ فَلَا يَعْصُوْنَهٗ .

২. যারা ঈমান আনে, অর্থাৎ আনসারগণ ও অন্যান্যরা সৎকর্ম করে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন তাতে বিশ্বাস করে। আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দকর্মগুলো বিদূরিত করবেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন ফলে তারা তাঁর নাফরমানি করবে না।

٣. ذٰلِكَ اَىْ اِضْلَالُ الْاَعْمَالِ وَتَكْفِيْرُ السَّيِّئَاتِ بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ الشَّيْطَانَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ الْقُرْاٰنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ ذٰلِكَ الْبَيَانِ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ يُبَيِّنُ اَحْوَالَهُمْ اَىْ فَالْكَافِرُ يُحْبَطُ عَمَلُهٗ وَالْمُؤْمِنُ يُغْفَرُ زَلَلُهٗ .

৩. এটা এজন্য যে, অর্থাৎ কর্মকে ব্যর্থ করে দেওয়া ও পাপ মোচন করা এ কারণে যে, যারা কুফরি করে তারা মিথ্যার শয়তানের অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের কুরআনের অনুসরণ করে, এভাবেই অর্থাৎ এই বর্ণনার মতো আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন। সুতরাং কাফেরের কর্মকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। আর মুমিনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

৪. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهٖ اَىْ فَاضْرِبُوْا رِقَابَهُمْ اَىْ اُقْتُلُوْهُمْ وَعَبَّرَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ لِاَنَّ الْغَالِبَ فِى الْقَتْلِ اَنْ يَكُوْنَ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ اَىْ اَكْثَرْتُمْ فِيْهِمُ الْقَتْلَ فَشُدُّوا اَىْ فَاَمْسِكُوْا عَنْهُمْ وَاَسِرُوْهُمْ وَشُدُّوا الْوَثَاقَ مَا يُوْثَقُ بِهِ الْاَسْرٰى فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهٖ اَىْ تَمُنُّوْنَ عَلَيْهِمْ بِاِطْلَاقِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَاِمَّا فِدَآءً اَىْ تُفَادُوْنَهُمْ بِمَالٍ اَوْ اَسْرٰى مُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَىْ اَهْلُهَا اَوْزَارَهَا تف اَثْقَالَهَا مِنَ السِّلَاحِ وَغَيْرِهٖ بِاَنْ يُسْلِمَ الْكُفَّارُ اَوْ يَدْخُلُوْا فِى الْعَهْدِ وَهٰذِهٖ غَايَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْاَسْرِ ذٰلِكَ ط خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ اَىِ الْاَمْرُ فِيْهِمْ مَا ذُكِرَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلٰكِنْ اَمَرَكُمْ بِهٖ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط مِنْهُمْ فِى الْقِتَالِ فَيَصِيْرُ مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ اِلَى النَّارِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا وَفِىْ قِرَاءَةٍ قَاتَلُوْا الْاٰيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدْ فَشَا فِى الْمُسْلِمِيْنَ الْقَتْلُ وَالْجِرَاحَاتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ يُحْبِطَ اَعْمَالَهُمْ .

৪. অতএব, যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। ضَرْبَ শব্দটি মাসদার ফে'ল শব্দ দ্বারা স্বীয় ফে'লের পরিবর্তে অর্থাৎ فَاضْرِبُوْا رِقَابَهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা কর। আর হত্যাকে গর্দানের দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো এই যে, সাধারণত গর্দানে আঘাত করার দ্বারা সহজ উপায়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তাদের অধিক হারে হত্যা করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলবে। اَلْوَثَاقَ এমন বস্তুকে বলা হয় যার দ্বারা বন্দীদেরকে বাঁধা হয়। রশি ইত্যাদি। অতঃপর হয় অনুকম্পা مَنًّا শব্দটি স্বীয় ফে'লের মাসদার স্বীয় ফে'লের পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ তোমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে তাদেরকে কোনো বিনিময় ব্যতিরেকে ছেড়ে দিয়ে। নয় মুক্তিপণ অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ধন-সম্পদ কিংবা মুসলিম বন্দির বিনিময়ে ছেড়ে দিবে। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ যুদ্ধ এদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলে যাতে করে কাফেররা মুসলমান হয়ে যায় বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আর এটা হলো হত্যা ও বন্দী করার চূড়ান্তসীমা। এটাই বিধান এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ তথা তাদের ব্যাপারে বিধান এটাই। এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন হত্যা ব্যতিরেকেই কিন্তু তোমাদের হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। সুতরাং যে তোমাদের মধ্য থেকে নিহত হবে সে জান্নাতে চলে যাবে আর যে ব্যক্তি তাদের থেকে নিহত হবে সে জাহান্নামে আশ্রয় নিবে। যারা নিহত হয়/মৃত্যুবরণ করে অপর কেরাতে রয়েছে قَاتَلُوْا এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নিহত ও আহত হওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহর পথে তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না।

٥. سَيَهْدِيْهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلٰى مَا يَنْفَعُهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ حَالَهُمْ فِيْهِمَا وَمَا فِى الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يُقْتَلْ وَاُدْرِجُوْا فِىْ قُتِلُوْا تَغْلِيْبًا .

৫. তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন পৃথিবীতে এবং পরকালে এমন জিনিসের যা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে হেদায়েত ও সংশোধন ইত্যাদি তার জন্য যে শহীদ হয়নি। আর যারা নিহত হয়নি তাদেরকে تَغْلِيْبًا নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

٦. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا لَهُمْ فَيَهْتَدُوْنَ اِلٰى مَسَاكِنِهِمْ مِنْهَا وَاَزْوَاجِهِمْ وَخَدَمِهِمْ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْلَالٍ .

৬. তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং তারা জান্নাতে স্বীয় বাসস্থানের দিকে, স্বীয় পুণ্যবতী রমণীদের দিকে এবং স্বীয় সেবকদের দিকে কোনো নির্দেশনা ব্যতিরেকেই পৌঁছে যাবে।

٧. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ اَىْ دِيْنَهُ وَرَسُوْلَهُ يَنْصُرْكُمْ عَلٰى عَدُوِّكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ يُثَبِّتْكُمْ فِى الْمُعْتَرَكِ .

৭. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও তাঁর রাসূলকে তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের সুদৃঢ় করবেন।

٨. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَعَسُوْا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَتَعْسًا لَّهُمْ اَىْ هَلَاكًا وَخَيْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ عَطْفٌ عَلٰى تَعَسُوْا .

৮. যারা কুফরি করেছে এটা مُبْتَدَأٌ তার খবর হলো تَعَسُوْا যা উহ্য রয়েছে। আর فَتَعْسًا لَّهُمْ ঐ উহ্য খবরকে বুঝাচ্ছে। তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। ধ্বংস ও আল্লাহর পক্ষ হতে হতাশা ও লাঞ্ছনা। এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। এটা تَعَسُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে।

٩. ذٰلِكَ اَىِ التَّعْسُ وَالْاِضْلَالُ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّكَالِيْفِ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

৯. এটা এই ধ্বংস ও কর্ম ব্যর্থ হওয়া এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন বিধান সম্বলিত কুরআন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

١٠. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَهْلَكَ اَنْفُسَهُمْ وَاَوْلَادَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا اَمْثَالُ عَاقِبَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ .

১০. তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে, তাদের সন্তানাদেরকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির ন্যায় শাস্তি।

١١. ذٰلِكَ اَىْ نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَهْرُ الْكَافِرِيْنَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى وَلِىُّ وَنَاصِرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ .

১১. এটা অর্থাৎ মুমিনদেরকে সাহায্য করা এবং কাফেরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া এজন্য যে, আল্লাহতো মুমিনদের অভিভাবক ওলী ও সাহায্যকারী এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবক নেই।

তাহকীক ও তারকীব

এ সূরার নাম সূরা কিতাল। পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের তারতীব অনুযায়ী এটা ৪৭নং সূরা। এই নামটি অত্র সূরার ২০ নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা ছাড়াও এ সূরার আরো দুটি নাম রয়েছে- ১. সূরা মুহাম্মদ ২. সূরা আল্লাযীনা কাফারূ।

قَوْلُهُ صَدُّوْا : এটা لَازِمْ এবং مُتَعَدِّيْ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নিজেই বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখা। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরাইশ কাফেররা।

قَوْلُهُ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ : এর অর্থ হলো- اَبْطَلَهَا وَجَعَلَهَا ضَائِعَةً তথা আমলকে বাতিল, বিনষ্ট ও ব্যর্থ করে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ : এখানে عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -এর আতফ اٰمَنُوْا -এর উপর করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَمَل صَالِح মূল ঈমানের অংশ নয়। কেননা আতফ مُغَايَرَتْ [বিপরীত বস্তুকে] চায়। কাজেই عَمَل صَالِح বা সৎ কাজ ঈমানের পূর্ণতার জন্য শর্তের পর্যায়ে যা আশায়েরাদের অভিমত।

قَوْلُهُ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَعْطُوْف -এর গুরুত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের পর তাঁর উপর ও তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর উপর ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত পূর্ণ ঈমানদার হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি তাওহীদ, তাওহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, দীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, তবে তার ঈমান আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা হলো মুবতাদা, আর كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ হলো তার খবর। আর وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ হলো উভয়ের মাঝে একটি جُمْلَه مُعْتَرِضَه

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা হলো মুবতাদা আর بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হলো মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ : এটা হলো ظَرْف অর্থাৎ اِذَا لَقِيْتُمْ -এর আমেল উহ্য রয়েছে এবং فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ وَقْتَ مُلَاقَاتِكُمُ الْعَدُوَّ -ও ঠিক সেই আমেলই। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, ضَرْبُ الرِّقَابِ

قَوْلُهُ فَضَرْبَ الرِّقَابِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ضَرْبَ মাসদারটা তার থেকে গঠিত فِعْل اَمْر তথা اِضْرِبُوْا -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কেননা মূলত ছিল فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا ফে'লকে ফেলে দিয়ে মাসদারকে مَفْعُوْل -এর দিকে ইযাফত করে ফে'লের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে সংক্ষেপ করার সাথে সাথে تَاكِيْد -ও হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ : অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে হত্যা করেছ। اَثْخَنْتُمُوْا এটা اِثْخَانٌ মাসদার হতে مَاضِيْ -এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। আর هُمْ যমীর হলো جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ অর্থাৎ اَكْثَرْتُمْ فِيْهِمُ الْقَتْلَ আর مِصْبَاحْ গ্রন্থে রয়েছে, اَثْخَنَ فِى الْاَرْضِ অর্থ হলো- سَارَ اِلَى الْعَدُوِّ

قَوْلُهُ الْوَثَاقَ : এর وَاوْ বর্ণ যের ও যবর উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ হলো- مَا يُوْثَقُ بِهٖ অর্থাৎ যা দ্বারা বাঁধা হয় যেমন রশি ইত্যাদি। এর বহুবচন হলো وُثُقٌ যেমন عِنَاقٌ -এর বহুবচন عُنُقٌ -

قَوْلُهُ وَهٰذِهٖ غَايَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْاَسْرِ : অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যখন যুদ্ধের হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করে এবং শত্রুদের শক্তি একেবারেই খর্ব হয়ে যায় তখন হত্যা ও বন্দীকরণ স্থগিত করে দাও।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا : এটা হলো মুবতাদা আর فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ হলো মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ : এটা হলো اَمْرٌ بِالْقِتَالِ -এর ইল্লত তথা জিহাদের নির্দেশদানের কারণ।

قَوْلُهُ وَمَا فِى الدُّنْيَا لِمَنْ يُّقْتَلُ وَاُدْرِجُوْا فِىْ قُتِلُوْا تَغْلِيْبًا : এটার মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো- আল্লাহর বাণী- وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ -এর তাফসীর حَالَهُمْ فِيْهَا اَىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দ্বারা করা হয়েছে। هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গ। একথা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে اِصْلَاحْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সকল বস্তু যা পৃথিবীতে কল্যাণকর হয়। যেমন- সৎ আমল, ইখলাস, হেদায়েত। কিন্তু এ জাতীয় اِصْلَاحْ -এর অবস্থাতো তাদের জন্যই হতে পারে, যারা নিহত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় اِعْتِرَاضْ টা قُتِلُوْا কেরাতে হবে। আর যদি قَاتَلُوْا হয় তবে এই প্রশ্ন উঠবে না।

জবাবের সারনির্যাস হলো– এখানে قُتِلُوْا দ্বারা সে সকল মুজাহিদগণ উদ্দেশ্য যরা নিহত হননি। তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। قَاتَلُوْا কেরাতের দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। হত্যাকারীদেরকে تَغْلِيْبًا নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন আয়াতের উদ্দেশ্য এটা হবে যে, যেই মুজাহিদগণ জীবিত রয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের অবস্থার اِصْلَاحْ করবেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছেন, তাদের অবস্থার اِصْلَاحْ বা সংশোধন জান্নাতে করবেন।

قَوْلُهُ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ : এর তাফসীর يُثَبِّتْكُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُزْء বলে كُلّ তথা ذَاتْ - উদ্দেশ্য। ذَاتْ -কে اَقْدَامْ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো– সুদৃঢ় থাকা এবং কম্পিত হওয়ার প্রভাব প্রথমে পায়ের উপরই প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ اَلْمُعْتَرِكِ : এর দ্বারা রণাঙ্গন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ হলো মুবতাদা আর بِاَنَّ اللّٰهَ হলো তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা মুহাম্মদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এই সূরা মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ, এতে ৪ রুকূ' ও ৩৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ : এই সূরাকে 'সূরা কিতাল'-ও বলা হয়। কেননা, এতে জিহাদের বিবরণ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, একটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটিই মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো– وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً ..... فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

প্রিয়নবী ﷺ হিজরতের সফরে যখন মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, তখন বারংবার মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি প্রিয় শহর, আর আমার নিকটও তুমি অত্যন্ত প্রিয় শহর, যদি মক্কাবাসী আমাকে বাধ্য না করতো তবে আমি কখনো এই শহর থেকে হিজরত করতাম না।" তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

যেহেতু আয়াতখানি হিজতের সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

যেহেতু এ আয়াতখানি হিজরতে সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়রায় পৌঁছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানি করে, যারা পাপিষ্ঠ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কথার উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কুফরি ও নাফরমানি সত্ত্বেও যারা গরিব দুঃখীকে সাহায্য করে, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যায়, তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এরই জবাবে আল্লাহ পাক সূরার প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকেও মানে না, তদুপরি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বরবাদ হয়ে যায়; কেননা, ঈমান ও ইখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো নেক আমলই কবুল হয় না।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর দুশমন, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্য-সাধনায় বাধা দেয়, তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ। এরপর জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কখন আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর মক্কার কাফেরদের ধ্বংসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মদীনা মোনাওয়ারায় মুনাফিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার পরিসমাপ্তিতে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রাহে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি পৃথিবীতে বিজয় এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরার আমল : যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে আবে জমজম দ্বারা ধৌত করে পান করে, সে মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে ঐ পানি দ্বারা গোসল করে, সে অনেক রোগ থেকে বিশেষত চর্ম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তার নিকট হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে আসবেন এবং তার হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে– فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ

অর্থাৎ পাপিষ্ঠরাই ধ্বংস হবে। এ কথার উপর এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা নিরন্নকে খাবার দেয়, যারা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, সেলায়ে রেহমী করে তাদের সকল সৎকাজই বিনষ্ট হয়ে যাবে? অথচ কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

"যে সামান্যতম সৎকাজও করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে।"

এ প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে, শুধু তাই নয়; বরং তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ পাক তাদের সকল আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা কোনো সৎকাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান। যেহেতু তারা কাফের ও বিদ্রোহী এবং জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, তাই তাদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

যে কর্মের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা না হয়, তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে দুনিয়াতে তাদের এসব কল্যাণকর কাজের জন্যে সুনাম হতে পারে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতে اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে- আল্লাহ পাক কাফেরদের গোপন চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছেন। মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার এটিই অনিবার্য শাস্তি।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর দুটি অর্থ হতে পারে। ১. তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। ২. অথবা এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।

বস্তুত অমুসলিমরা যেসব কাজকে সৎকাজ এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, কিয়ামতের দিন সে কাজগুলোর কোনোটিরই গুরুত্ব হবে না, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকাজই যে গ্রহণযোগ্য হয় না, সেদিন তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো সৎকাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তথা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার জন্য তার কুফরি ও নাফরমানিই যথেষ্ট; অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দান এর শর্ত নয়, তবে মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা শুধু কুফরি ও নাফরমানিতেই যে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষকে ঈমান আনয়নেও বাধা দিত এবং কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করতো।

তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সময় মাগরিবের নামাজে এ সূরার প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন।

قَوْلُهُ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ : যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ -এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ : بَالٌ শব্দটি কখনো অবস্থার অর্থে এবং কখনো অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভালো করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা- ১. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। ২. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কৃপাবশত তাদেরকে কোনো রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন- আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল- যদি এই আজাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার

পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হাসান, আতা (র.), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদের কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এ আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েজ নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে য, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ অর্থাৎ মুক্ত করা জায়েজ বলে তাফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন– কুদূরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র.) 'মা'আনিউল আসারে' এটাকেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনো হত্যা করা হয়েছে, কখনো গোলাম করা হয়েছে, কখনো মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনো মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া– এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোনো আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদি করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী (র.) লিখেন–

وَهٰذَا الْقَوْلُ يُرْوٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَاَبِىْ عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ الطَّحَاوِىُّ مَذْهَبًا عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالْمَشْهُوْرُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

অর্থাৎ মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র.)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিকহবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপার কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েজ। এমতাবস্থায় কুরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েজ নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর খ. ৭, পৃ. ৫০৮]

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানতে যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এ স্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এ স্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমুহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কুরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হতো। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পর কুরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তা ও লিবান তদীয় 'আরবের তমদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন-

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনোরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কিনা।"...... কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

-[ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরা মা'আরিফুল কুরআন থেকে উদ্ধৃত। খ. ৪, পৃ. ১৭৯]

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চেয়ে উত্তম কোনো পথ থাকে না। কেননা, দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থায়ই সম্ভবপর- হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, কিংবা যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোনো কোনো বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে তাকে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে- হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মতো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখাশোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রতিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরো সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন-

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مَا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

অর্থাৎ তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কারেজ ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে।
–[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সে মতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মনিবদেরকে أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমন কি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কুরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনাবলি এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই– اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। –[আবূ দাউদ]

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ফজিলত কুরআন ও হাদীসে ভুরি ভুরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্যকোনো সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোজার কাফফারা, জিহারের কাফফারা ও কসমের কাফফারার মধ্যে দাসমুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। –[মুসলিম] সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁর অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 'আন্নাজমুল ওয়াহহাজ'-এর গ্রন্থকার কোনো কোনো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন–

হযরত আয়েশা (রা.)– ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.)– ১০০, হযরত উসমান গণী (রা.)– ২০, হযরত আব্বাস (রা.)– ৭০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)– ১০০০, হযরত যুলকা'লা হিমইয়ারী (রা.)– ৮০০০ [মাত্র এক দিনে], হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ৩০,০০০।

–[ফতহুল আল্লামা, টীকা বুলুগুল মারাম : নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত খ. ২, পৃ. ২৩২]

এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরো হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোটকথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বুঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা, জিহাদকে আসমানী আজাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহদ্রোহিদার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও জমিনের আজাব দ্বরা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আজাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আজাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, ব্যাপক আজাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর ধর্মের হিফাজতকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফেরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহর নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ : সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোনো ছওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গুনাহ করলেও সেই গুনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না; বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। ১. আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন। ২. তার সমস্ত অবস্থা ভালো করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এভাবে যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আখিরাতে এভাবে যে, সে কবরের আজাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার জিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তা'আলা হকদারকে তাঁর প্রতি রাজী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। −[মাযহারী]

শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কুরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌছে একথা বলবে− اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا

قَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ : এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর এবং গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন− সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চেয়েও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। −[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য একন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

قَوْلُهُ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا : এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আজাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

قَوْلُهُ وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ : مَوْلٰى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ− অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কুরআনর অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে− رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ এতে আল্লাহ তা'আলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ তা'আলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

অনুবাদ :

١٢. إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ اَىْ لَيْسَ لَهُمْ هِمَّةٌ اِلَّا بُطُوْنُهُمْ وَفُرُوْجُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلَى الْاٰخِرَةِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ . مَنْزِلٌ وَمَقَامٌ وَمَصِيْرٌ .

১২. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে পৃথিবীতে এবং জন্তু-জানোয়ারের মতো উদর পূর্তি করে। অর্থাৎ তাদের পেট ও যৌনাঙ্গের কামনা বাসনা ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা আখিরাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। আর জাহান্নামই তাদের নিবাস। অর্থাৎ বাড়ি, অবস্থানস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٣. وَكَاَيِّنْ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ بِهَا اَهْلُهَا هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ مَكَّةَ اَىْ اَهْلِهَا الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ ج رُوْعِىَ لَفْظُ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهُمْ رُوْعِىَ مَعْنٰى قَرْيَةٍ الْاُوْلٰى فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ . مِنْ اِهْلَاكِنَا .

১৩. আরো কত শক্তিশালী জনপদ ছিল এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জনপদের অধিবাসীরা আপনার জনপদ হতে মক্কা তথা তার অধিবাসীদের থেকে। যে জনপদ হতে আপনাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা اَخْرَجَتْكَ এর মধ্যে قَرْيَة শব্দের রেয়ায়েত করা হয়েছে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি প্রথম قَرْيَة -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এবং তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। আমার ধ্বংস হতে।

١٤. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ . فِىْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ اَىْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا .

১৪. যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আর তারা হলো মুমিনগণ। সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয়। ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে আর তারা হলো মক্কার কাফেররা। এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে? মূর্তিগুলোর উপাসনা করে অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে কোনো মিল নেই।

١٥. مَثَلُ اَىْ صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ دَاخِلِيْهَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ كَضَارِبٍ وَحَذِرٍ اَىْ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ بِخِلَافِ مَاءِ الدُّنْيَا فَيَتَغَيَّرُ لِعَارِضٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج بِخِلَافِ لَبَنِ الدُّنْيَا لِخُرُوْجِهٖ مِنَ الضُّرُوْعِ .

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত যা তাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে মুশতারিক এটা মুবতাদা আর তার খবর হচ্ছে তাতে আছে নির্মল পানির নহর اٰسِنٍ শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। যেমন ضَارِبٌ এবং حَذِرٌ অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল। পৃথিবীর পানির বিপরীত কেননা তা যে কোনো কারণেই পরিবর্তন হয়ে যায়। আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় পৃথিবীর দুধের বিপরীত তা স্তন থেকে বের হওয়ার কারণে।

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لَذِيْذَةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ ج بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا فَاِنَّهَا كَرِيْهَةٌ عِنْدَ الشُّرْبِ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط بِخِلَافِ عَسَلِ الدُّنْيَا فَاِنَّهُ لِخُرُوْجِهِ مِنْ بُطُوْنِ النَّحْلِ يُخَالِطُهُ الشَّمْعُ وَغَيْرُهُ وَلَهُمْ فِيْهَا اَصْنَافٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ مَعَ اِحْسَانِهِ اِلَيْهِمْ بِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَعَ اِحْسَانِهِ اِلَيْهِمْ سَاخِطًا عَلَيْهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اَمَنْ هُوَ فِىْ هٰذَا النَّعِيْمِ وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا اَىْ شَدِيْدَ الْحَرَارَةِ فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ اَىْ مَصَارِيْنَهُمْ فَخَرَجَتْ مِنْ اَدْبَارِهِمْ وَهُوَ جَمْعُ مِعًا بِالْقَصْرِ وَاَلِفُهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءٍ لِقَوْلِهِمْ مَعْيَانِ -

আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর পৃথিবীর মদের বিপরীত। কেননা তা পানকালে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। আর আছে পরিশোধিত মধুর নহর। পৃথিবীর মধুর বিপরীত। কেননা এটা মধু মক্ষিকার পেট হতে বের হওয়ার কারণে তাতে চর্বি ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে। এবং সেখায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা তাদের প্রতি উল্লিখিত অনুগ্রহ করার পরও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। পৃথিবীর দাসদের সর্দারদের বিপরীত। কেননা পৃথিবীর মনিবরা অনুগ্রহ করার সাথে সাথে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হন। মুত্তাকীগণ কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ اَمَنْ هُوَ فِىْ هٰذَا النَّعِيْمِ -এর খবর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ নিয়ামতের মধ্যে হবে সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হবে, যে সর্বদা আগুনে থাকবে। এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। অর্থাৎ খুবই গরম যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে। অর্থাৎ নাড়িভূঁড়ি তাদের পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর اَمْعَاۤءً শব্দটি مِعًا [মদবিহীন] -এর বহুবচন ; এর আলিফটি يَاءٌ -এর পরিবর্তে এসেছে। দ্বিবচনে مَعْيَانِ যা তাদের উক্তিকে সমর্থন করে।

١٦. وَمِنْهُمْ اَىِ الْكُفَّارُ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج فِىْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ اِسْتِهْزَاۤءً وَسُخْرِيَّةً مَاذَا قَالَ اٰنِفًا نف بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اَىِ السَّاعَةَ اَىْ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بِالْكُفْرِ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَاۤءَهُمْ فِى النِّفَاقِ -

১৬. তাদের মধ্যে কতেক অর্থাৎ কাফেরদের আপনার কথা শ্রবণ করে জুমার খুতবায়, আর তারা হলো মুনাফিকরা। অতঃপর আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায়, যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম কে ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্বরে বলে তন্মধ্যে হযরত ইবনে মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত। এই মাত্র তিনি কি বললেন? اٰنِفًا শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– সময় এখনই আমরা সেদিকে মনোযোগ দেই না। এদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন কুফরের মাধ্যমে এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে। নেফাকের ক্ষেত্রে।

١٧. وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ زَادَهُمُ اللّٰهُ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ . اَلْهَمَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ بِهِ النَّارَ .

১৭. যারা সৎ পথ অবলম্বন করে তারাই হলো মুমিন সম্প্রদায়। আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তিদান করেন। অর্থাৎ এমন জিনিসের ইলহাম/শক্তিদান করেন যার মাধ্যমে সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকে।

١٨. فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ مَا يَنْتَظِرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِنَ السَّاعَةِ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَجْأَةً فَقَدْ جَاۤءَ اَشْرَاطُهَا ج عَلَامَاتُهَا مِنْهَا بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ وَالدُّخَانُ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ ذِكْرٰىهُمْ تَذَكُّرُهُمْ اَىْ لَا تَنْفَعُهُمْ .

১৮. তারা মক্কার কাফেররা কি কেবল এ জন্যই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে اَنْ تَاْتِيَهُمْ টা اَلسَّاعَةَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাস করার কোনো সুরত অবশিষ্ট থাকল না; কিন্তু এটা যে, তাদের নিকট অকস্মাৎ কিয়ামত এসে যাবে। কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ তার নিদর্শনগুলো। তন্মধ্য হতে মহানবী ﷺ -এর ধরায় প্রেরিত হওয়া, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া এবং ধোঁয়া নির্গত হওয়া। কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! অর্থাৎ উপদেশ তাদেরকে উপকৃত করবে না।

١٩. فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ دُمْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى عِلْمِكَ بِذٰلِكَ النَّافِعِ فِى الْقِيَامَةِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لِاَجْلِهِ قِيْلَ لَهٗ ذٰلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ لِتَسْتَنَّ بِهِ اُمَّتُهٗ وَقَدْ فَعَلَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط فِيْهِ اِكْرَامٌ لَهُمْ بِاَمْرِ نَبِيِّهِمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ مُنْصَرَفَكُمْ لِاَشْتِغَالِكُمْ بِالنَّهَارِ وَمَثْوٰىكُمْ مَاْوٰيكُمْ اِلٰى مَضَاجِعِكُمْ بِاللَّيْلِ اَىْ هُوَ عَالِمٌ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِكُمْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَاحْذَرُوْهُ وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَغَيْرِهِمْ .

১৯. সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি সেই জ্ঞানের উপর অবিচল থাকুন যা কিয়ামতের দিন কল্যাণকর ও উপকারী হবে। এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। রাসূল ﷺ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যাতে করে তাঁর উম্মতেরা তাঁর অনুসরণ করতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর এ নির্দেশ পালনও করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। [ইস্তিগফার পড়ি] এবং মুমিন নর নারীদের নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে উম্মতের সম্মান নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন তোমাদের গতিবিধি সম্পর্কে দিনের বেলায় তোমাদের কাজ-কর্মের জন্য। এবং তোমাদের অবস্থান সম্বন্ধে। রাতে তোমাদের শয়নস্থল সম্পর্কে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল অবস্থান সম্পর্কে অবগত। এর মধ্যে হতে কোনো জিনিসই গোপন নয়। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাকো। আর এই সম্বোধন মুমিন ও গায়রে মুমিন সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَثْوًى : এটা ظَرْف مَكَانْ অর্থ– ঠিকানা, দীর্ঘ দিন অবস্থান করার জায়গা।

قَوْلُهُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : এটা মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه مُسْتَانِفَه

قَوْلُهُ كَايِّنْ : এটা كَافٌ এবং اَيٌّ দ্বারা গঠিত/ মুরাক্কাব হয়েছে। كَمْ خَبْرِيَّة এর অর্থে হয়েছে। মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ هِيَ اَشَدُّ الخ : প্রথম قَرْيَة প্রতি লক্ষ্য করে اَخْرَجَتْكَ-এর যমীর مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে। আর اَهْلَكْنَا هُمْ-এর যমীরের মধ্যে দ্বিতীয় قَرْيَة-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ قَرْيَة দ্বারা اَهْل قَرْيَة উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণে যমীরকে مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَخْرَجَتْكَ : প্রথম قَرْيَة প্রতি লক্ষ্য করে اَخْرَجَتْكَ-এর যমীর مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে। اَهْلَكْنَاهُمْ-এর যমীরের মধ্যে দ্বিতীয় قَرْيَة-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ قَرْيَة দ্বারা اَهْل قَرْيَة উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণে যমীরকে مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُشْتَرِكَةُ : অর্থাৎ খোদাভীরুদের সাথে যে জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাতে সকল মুমিনগণের অংশীদারিত্ব রয়েছে। কেননা প্রত্যেক মুমিনই শিরক থেকে বেঁচে থাকে। তবে পরিপূর্ণ মুত্তাকীর জন্য জান্নাতের উচ্চস্তর রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْجَنَّةِ الَّتِيْ : এটা হলো মুবতাদা, আর فِيْهَا اَنْهَارٌ হলো তার খবর।

প্রশ্ন : এখানে خَبَرٌ টা হলো জুমলা। আর যখন জুমলা খবর হয় তখন তাতে একটি عَائِدٌ আবশ্যক হয়। আর এখানে কোনো عَائِدٌ নেই।

উত্তর : যখন خَبَر عَيْن মুবতাদা হয় তখন عَائِدٌ আবশ্যক হয় না। আর এখানে এরূপই হয়েছে।

قَوْلُهُ اُسِنٍ : এটা বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ হতে মাসদার اُسِنًا অর্থ– পানি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়া।

قَوْلُهُ لَذِيْذَةٍ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাসদার اِسْم فَاعِلْ অর্থে হয়েছে। আর اِسْنَاد مَجَازِيْ হয়েছে যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ -এর মধ্যে, অর্থাৎ জান্নাতের শরাব এতই সুস্বাদু যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্বাদুতে পরিপূর্ণ। এটাকে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে এটাও বলা যেতে পারে যে, مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ-এর মধ্যে মাসদারের حَمْل সত্তা বা ذَاتٌ-এর উপর হয়েছে যা বৈধ নয়, এর উত্তর হলো এই যে, এই حَمْل টা زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মতো মুবালাগার ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ فِيْهَا : لَهُمْ এটা كَائِنٌ বা مَوْجُوْدٌ-এর সাথে خَبَر مُقَدَّمْ مُتَعَلِّقْ হয়েছে হয়েছে। আর উহ্যের সাথে فِيْهَا مُتَعَلِّقْ হয়েছে। এবং مُبْتَدَا مَحْذُوْف যেমন মুফাসসির (র.) اَصْنَافٌ উহ্য মেনে উহ্য মুবতাদার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ : এই বাক্যটি বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা–

প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী– وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ দ্বারা জানা যায় যে, যেমনিভাবে জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতীগণ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল প্রাপ্ত হবেন অনুরূপভাবে ক্ষমাও জান্নাতে প্রাপ্ত হবেন, অথচ ক্ষমা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হওয়া উচিত।

উত্তর : ক্ষমা দ্বারা এখানে সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য, যা জান্নাতে অর্জিত হবে।

قَوْلُهُ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর, মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তি– اَمَّنْ هُوَ فِيْ هٰذَا النَّعِيْمِ দ্বারা উহ্য মুবতাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَمْعَا : এর অর্থ হলো নাড়িভুঁড়ি এটা مِعًا-এর বহুবচন, এর শেষের اَلِفْ টি يَا، হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কেননা তার একবচন হলো مِعًى এবং দ্বিবচন হলো مَعْيَانِ যা একথার প্রতি প্রমাণ বহন করেছে। مِعًا-এর اَلِفْ টি يَا، হতে পবির্তিত।

قَوْلُهُ مَصَارِيْنَ : এটা مَصِيْرٌ-এর جَمْعُ الْجَمْعِ বা বহুবচনের বহুবচন, অর্থাৎ مَصِيْرٌ-এর বহুবচন হলো مُصْرَانٌ আর مُصْرَان-এর বহুবচন হলো مَصَارِيْنُ-এর অর্থ হলো নাড়িভুড়ি, অন্ত্রসমূহ। ফারসিতে এটাকে روده বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ : অর্থাৎ এর দিকে মনোনিবেশ করা হয় না, তা ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নয়। বিশুদ্ধ নুসখায় نَرْجِعُ তথা جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগার সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমরা তার কথার প্রতি মনোনিবেশ করি না, তোমরা বল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এখন কি বলেছেন? –[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শাওকানী]

قَوْلُهُ فَاَنّٰى لَهُمْ : এটা হলো خَبَرمُقَدَّمْ আর ذِكْرَاهُمْ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ হলো جُمْلَه مُعْتَرِضَه আর اِذَا -এর জবাবটা উহ্য রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইবারত হলো– اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ فَكَيْفَ يَتَذَكَّرُوْنَ

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ : এটা হলো মুবতাদা, আর اَلَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا : এটা হলো মুবতাদা زَادَهُمْ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ اَشْرَاطُهَا : এটা شَرْطٌ -এর বহুবচন [.رَا বর্ণে যবর] অর্থ– আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ : অর্থাৎ যখন মুমিনগণের সৌভাগ্য ও কাফেরদের হতভাগ্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তবে আপনি আগামীতেও স্বীয় عِلْمٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ -এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন।

قَوْلُهُ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ : অর্থাৎ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اَنْ يَقَعَ مِنْكَ الذَّنْبُ অথবা اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِيَعْصِمَكَ আর কেউ কেউ বলেন, সম্বোধন তার জন্য; কিন্তু উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মতগণ। এই শেষ ব্যাখ্যাটা আগত অংশ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ অস্বীকার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের দুনিয়ার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে উভয়ের আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ.

অর্থাৎ যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করে এবং ঈমান মোতাবেক সৎ কাজ করে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন বেহেশতে বাস করার তাওফীক দান করবেন, যাতে রয়েছে মনোরম উদ্যান, যার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত রয়েছে এবং যাতে রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত, যা কেউ পৃথিবীতে দেখেনি, যার কথাও শ্রবণ করেনি এবং পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করেনি।

পক্ষান্তরে যারা কাফের, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত, যারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তাদের লোভ সীমাহীন, যিনি রিজিক দাতা, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর ব্যাপারে তাদের গাফলত অপরিসীম, কখনো তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আর এ সত্যও উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত তারা অহরহ ভোগ করছে এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও তারা চিন্তিত হয় না।

قَوْلُهُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : এদেরই আবাস্থল হলো দোজখ। কেননা তারা সারা জীবন কখনো চিরস্থায়ী জীবনের তথা আখিরাতের কথা চিন্তাও করেনি; জন্তুর ন্যায় পানাহারই ছিল তাদের কাম্য, দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধিই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এমনি অবস্থায় তাদের পরিণতি কত শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর সে পরিণতিই হলো দোজখের কঠোর কঠিন শাস্তি। এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً.........فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ : এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রাসূল! মক্কাবাসী আপনার প্রতি এবং আপনার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণেই আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করতে হয়েছে; কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অনেক জনপদের অধিবাসীকে আমি তাদের নাফরমানির কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী ছিল না। অতএব মক্কার কাফেরদের ভয় করা উচিত, যে কোনো সময় তাদের ভরাডুবি ঘটতে পারে।

قَوْلُهُ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ......... وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ : **মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য :** আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। মুমিন আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত দলিল-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে. প্রিয়নবী ﷺ -এর হেদায়েতের আলোকে জীবন যাপন করে; মুমিনের অভিভাবক সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, তিনিই তার সাহায্যকারী এবং মুমিন মাত্রই আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখে। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়। কখনো এ বিষয়ে সচেতন হয় না যে, কে তাঁকে দান করেছেন এ জীবন এবং জীবনের যথাসর্বস্ব।

বস্তুত কাফেররা দাতাকে বিস্মৃত হয়, অথচ তাঁর দান নিয়ে ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে, তদুপরি সর্বদা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় তথা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, ঐ পাপাচার তাদের নিকট বড়ই মধুর, মনোমুগ্ধকর এবং শোভনীয় মনে হয় , অথচ তার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

কাফেরদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, তারা তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক জীবন যাপন করে, ভাল-মন্দের পার্থক্য করে না, মন যা চায় তাই করে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি লালন-পালন করেছেন, যাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ আমরা ভোগ করে থাকি। কাফেররা তার কোনো ইচ্ছা ও মর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

আধুনিককালে মানুষের জীবনধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনা বাস্তব রূপে লক্ষ্য করা যায়। মরমী কবি তাই বলেছেন– کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے * مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں اس میں آفاق

"কাফেরের পরিচয় হলো এই যে, সে পৃথিবীতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আর মুমিনের পরিচয় হলো এই যে, পৃথিবী তারই মাঝে হারিয়ে যায়"।

قَوْلُهُ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنَ الخ : দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোনো কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে তাকে। তবে কোনো কোনো উপকারের কারণে পান করা হয়। যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত– একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধু মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নজির পৃথিবীতে নেই।

জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া করা চাই : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট আরজি পেশ কর, তখন অবশ্যই জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে আরজি পেশ করবে, কেননা এটি সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চে তার স্থান। আর জান্নাতুল ফেরদাউস থেকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আর তার উপরই আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে। তাবারানীতে রয়েছে, হযরত লাকীত ইবনে আমের যখন একটি প্রতিনিধি দলে এসেছিলেন, তখন প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তিনি জানতে চাইলেন, জান্নাতে কি কি রয়েছে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, পরিচ্ছন্ন মধুর নহর, পবিত্র সুরার নহর, এমন সুরা, যাতে নেশা নেই। দুধের নহর, যে দুধের স্বাদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে এবং স্বচ্ছ পানির নহর, যার পানি কখনো বিকৃত হয় না। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু), পারা. ২৬, পৃ. ৩৫]

قَوْلُهُ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দুনিয়াতে এমন কোনো ফল নেই, যা জান্নাতে নেই মিষ্ট হোক বা টক। –[ইবনে আবি হাতেম, ইবনুল মুনযির]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, জান্নাতে যে ফল রয়েছে, দুনিয়াতে শুধু তার নামই আছে [জান্নাতী ফলের স্বাদ এবং এর বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফলে নেই। –[ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম]

হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি যখনই বৃক্ষ থেকে ফল ছিড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে আরেকটি ফল গাছে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ : এই সমস্ত নিয়ামতের উপর বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদেরকে মাফ করে দেবেন। জান্নাতবাসীগণ তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবেন। এরপর কখনো আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। দুনিয়ার মুনিবরা কখনো কর্মচারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো থাকে অসন্তুষ্ট; কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

قَوْلُهُ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ : জান্নাতবাসীগণের জন্যে সংরক্ষিত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর আলোচ্য আয়াতাংশে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই ভাগ্যবান লোকেরা কি সে ভাগ্যাহত লোকদের ন্যায় হবে? যারা চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে; যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়িকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। জান্নাতীগণ কখনো দোজখীদের ন্যায় হবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ "দোজখীরা এবং জান্নাতবাসীগণ কখনো এক সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীগণই হবে সফলকাম, কিন্তু দোজখীরা হবে ব্যর্থ এবং বিপদগ্রস্ত"।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ .... عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমত মুমিনদের জন্যে জান্নাতে সংরক্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

শানে নযূল : ইবনুল মুনজির ইবনে জোরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট মুমিন এবং মুনাফিক সকলেই একত্র হতো, তিনি যা ইরশাদ করতেন, মুমিনগণ মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতেন এবং স্মরণ রাখতেন। পক্ষান্তরে, মুনাফিকরা শ্রবণ করতো ঠিকই, কিন্তু স্মরণ রাখতো না। যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবার থেকে তারা বের হয়ে আসত, তখন তারা মুমিনগণকে জিজ্ঞাসা করতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এখন কী বলছিলেন? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইরশাদ হয়েছে- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا

অর্থাৎ এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হয়, প্রকাশ্যে মনে হয় যে তারা তাঁর কথা মনযোগ সহকারেই শ্রবণ করে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আদৌ তাঁর কথায় মন দেয় না, মজলিস থেকে বের হওয়ার পরই তারা সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞসা করে, এই মাত্র তিনি কী বলেছিলেন? এর দ্বারা তারা হয়তো বোঝাতে চায়, আমরা তাঁর মজলিসে হাজির হলেও তাঁর কথা মনেযোগ সহকারে শ্রবণ করি না, অর্থাৎ তাঁর কথায় আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না। মুনাফিকদের এ ধৃষ্টতার কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.

"এরাই সে সব লোক, আল্লাহ পাক যাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। এরাই তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলছে। এ আয়াতে মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যের বিবরণ রয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হওয়া সত্ত্বেও তারা মনযোগ সহকারে তাঁর কথা শ্রবণ করতো না এবং তাঁর হেদায়েত মেনে নিত না। কেননা তারা ছিল নির্বোধ এবং হতভাগা।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰيهُمْ : অর্থাৎ আর যারা সঠিক পথে রয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের সুবুদ্ধি ও হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাওফীক দান করেন।" তারা হেদায়েতের উপর অটল অবিচল থাকে, তাই তাদের সততা, সত্যবাদিতাসহ যাবতীয় গুণাবলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা তাদের সম্মুখে হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে। মুমিনদের প্রতি এটি হয় আল্লাহ পাকের মহান দান যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক আমল করার তাওফীক লাভ করে। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তাদেরকে দোজখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ বলেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর ছওয়াব দান করবেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا الخ : أَشْرَاطٌ শব্দের অর্থ- আলামত, লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন ﷺ-এর আবির্ভাবই কিয়ামতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা খতমে-নবুয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজেযাকে কুরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কুরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত- জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে

যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমন কি পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। -[বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে [অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে] জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, [অর্থাৎ তা আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে] ইলমে-দীন পার্থিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে। বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্য পান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো: একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলোর একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الخ : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : "আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।" বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানও একথা জানে, পয়গাম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, তুমি কি কুরআনের এই বাণী শ্রবণ করিনি- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ; এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র রয়েছে- اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আরো বলা হয়েছে- وَاعْلَمُوْٓا أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- سَابِقُوْٓا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوْهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গাম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গাম্বরগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থান বিশেষ ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরিয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গুনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গাম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে ذَنْبٌ তথা গুনাহ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়। যেমন সূরা আবাসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গুনাহ ছিল না: বরং এরও এক ছওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিত সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলে-চ্য আয়াতে এমনি ধরনের গুনাহ বোঝানো যেতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বেশি পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবলীস বলে, আমি মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে [যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই]। এতে করে তাদের তওবা করারও তাওফীক হয় না।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ : مُتَقَلَّبَ -এর শাব্দিক অর্থ হলো- ওলটপালট হওয়া এবং مَثْوٰى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তাফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। ১. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং ২. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোনো কোনো গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোনো কোনো গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ী আবাসকে مُتَقَلَّبَ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসকে مَثْوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

অনুবাদ :

٢٠. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا طَلَبًا لِلْجِهَادِ لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فِيْهَا ذِكْرُ الْجِهَادِ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَىْ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهَا شَىْءٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ اَىْ طَلَبُهُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَىْ شَكٌّ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط خَوْفًا مِنْهُ وَكَرَاهِيَةً لَهُ اَىْ فَهُمْ يَخَافُوْنَ مِنَ الْقِتَالِ وَيَكْرَهُوْنَهُ فَاَوْلٰى لَهُمْ ج مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ـ

২০ মুমিনগণ বলে, জিহাদ কামনা করে একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? যাতে জিহাদ অনুমোদনের উল্লেখ থাকবে। অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় যার থেকে কোনো কিছু রহিত হয়নি। এবং তাতে যুদ্ধের কোনো নির্দেশ থাকে। অর্থাৎ জিহাদের কামনা উল্লেখ থাকে আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ সন্দেহ রয়েছে, আর তারা হলো মুনাফিকরা। তারা মৃত্যু ভয়ে বিহবল মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে। মৃত্যু থেকে ভীত হয়ে এবং এটাকে অপছন্দ করে। অর্থাৎ তারা জিহাদকে ভয় করে এবং সেটাকে অপছন্দ করে। শোচনীয় পরিণাম তাদের জন্য। এটা হলো মুবতাদা। তার খবর হলো [পরবর্তী বাক্যের] طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

٢١. طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف اَىْ حَسَنٌ لَكَ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ قف اَىْ فُرِضَ الْقِتَالُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ فِى الْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَجُمْلَةُ لَوْ جَوَابُ اِذَا ـ

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য তাদের জন্য উত্তম ছিল। অর্থাৎ তাদের জন্য আপনার আনুগত্য স্বীকার করা ও আপনার সাথে ভালো কথা বলা উত্তম ছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে অর্থাৎ জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত। ঈমান এবং আনুগত্যের ব্যাপারে। তবে তাদের জন্য এটা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো। لَوْ صَدَقُوْا বাক্যটি اِذَا -এর جَوَابٌ হয়েছে।

٢٢. فَهَلْ عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخِطَابِ اَىْ لَعَلَّكُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ اَىْ تَعُوْدُوْا اِلٰى اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْبَغْىِ وَالْقَتْلِ ـ

২২. তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা عَسَيْتُمْ -এর سِيْن বর্ণটি যবর ও যের উভয়ভাবেই পঠিত। এতে غَائِبْ হতে حَاضِرْ -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ করা হয়েছে। আর عَسَيْتُمْ অর্থ হলো لَعَلَّكُمْ অর্থাৎ ঈমান থেকে ফিরে যেতে। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ তোমরা জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ড তথা হত্যা ও লুণ্ঠনে ফিরে যেতে।

٢٣. اُولٰۤئِكَ اَىِ الْمُفْسِدُوْنَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ عَنْ اِسْتِمَاعِ الْحَقِّ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ ـ

২৩. এদেরকেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকেই আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন, আর করেন বধির সত্য শ্রবণ করা থেকে। ও দৃষ্টিশক্তিহীন হেদায়েতের পথ থেকে।

٢٤. اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَيَعْرِفُوْنَ الْحَقَّ اَمْ بَلْ عَلٰى قُلُوْبٍ لَهُمْ اَقْفَالُهَا فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ .

২৪. তবে কি এরা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? ফলে তারা হককে জানত। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ফলে তারা তা অনুধাবন করতে পারে না।

٢٥. اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا بِالنِّفَاقِ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لا الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ زَيَّنَ لَهُمْ ط وَاُمْلِيْ لَهُمْ . بِضَمِّ اَوَّلِهِ وَبِفَتْحِهِ وَاللَّامِ وَالْمُمْلِي الشَّيْطَانَ بِاِرَادَتِهِ تَعَالٰى فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمْ .

২৫. যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে নিফাকের দ্বারা শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করে দেখায় এবং এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। اُمْلِيْ বর্ণের হামযাটি পেশ ও যবরের সাথে পঠিত রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা সাপেক্ষে মিথ্যা আশাদানকারী হচ্ছে শয়তান, আর সে তো মানুষকে পথভ্রষ্টকারী।

٢٦. ذٰلِكَ اَيْ اِضْلَالُهُمْ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ اَيْ لِلْمُشْرِكِيْنَ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ج اَمْرِ الْمُعَاوَنَةِ عَلٰى عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَثْبِيْطِ النَّاسِ عَنِ الْجِهَادِ مَعَهُ قَالُوْا ذٰلِكَ سِرًّا فَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ سِرٍّ وَبِكَسْرِهَا مَصْدَرٌ .

২৬. এটা অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে। অর্থাৎ মুশরিকদেরকে আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। অর্থাৎ নবীর বিরোধিতায় তোমাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে এবং মানুষকে মহানবী ﷺ -এর সাথে জিহাদে গমন করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে। এ কথা মুনাফিকরা গোপনভাবে বলেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিলেন আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। اَسْرَارٌ শব্দটির হামযাটি যবরযুক্ত হলে এটা سِرٌّ -এর বহুবচন হবে। আর যদি হামযাটি যেরযুক্ত হয় তবে তা মাসদার হবে।

٢٧. فَكَيْفَ حَالُهُمْ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ حَالٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ظُهُوْرَهُمْ بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ .

২৭. তখন কেমন হবে তাদের অবস্থা/ দশা। যখন ফেরেশতাগণ আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবেন এটা (يَضْرِبُوْنَ) اَلْمَلٰئِكَةُ হতে حَالٌ হবে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে তাদের পিঠে লোহাড় হাতুড়ি দিয়ে।

٢٨. ذٰلِكَ اَيِ التَّوَفِّيْ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ اَيِ الْعَمَلَ بِمَا يَرْضِيْهِ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

২৮. এটা অর্থাৎ উল্লিখিত সুরতে প্রাণ সংহার করা এই জন্য যে, তারা অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে অর্থাৎ ঐ আমল দ্বারা যা তাকে সন্তুষ্টকারী। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاَوْلٰى لَهُمْ : لَامْ টা بَا-এর অর্থে অর্থাৎ- اَنْ كَانَ الْاَوْلٰى بِهِمْ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও মুনাফিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে আনুগত্য করাই শ্রেয় ছিল। এটা হযরত আতা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ কেউ اَوْلٰى-কে وَيْلٌ থেকে مُشْتَقٌّ মেনেছেন, এর অর্থ হলো ধ্বংস ও বিনাশ সাধন, তখন এ বাক্যটি দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া ও ধমকি স্বরূপ হবে এবং اَوْلٰى لَهُمْ-এর উপর ওয়াকফ হবে। এরপর নতুন বাক্য আরম্ভ হবে। (طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوْفٌ خَيْرٌ لَكُمْ) অর্থাৎ তাদের জন্য আনুগত্য ও উত্তম কথা বলাই ভালো। মুফাসসির (র.) প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَاَوْلٰى لَهُمْ : এর মধ্যে তিনটি তারকীব হতে পারে। যথা–

১. اَوْلٰى হলো মুবতাদা لَهُمْ তার مُتَعَلِّقٌ আর لَامْ টা بَا অর্থে طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوْفٌ হলো তার খবর। মুফাসসির (র.) এ তারকীবই পছন্দ করেছেন।

২. اَوْلٰى لَهُمْ হলো উহ্য মুবতাদার খবর, উহ্য ইবারত এরূপ হবে এরূপ– اَلْهَلَاكُ اَوْلٰى لَهُمْ اَىْ اَقْرَبُ لَهُمْ وَاَحَقُّ لَهُمْ

৩. اَوْلٰى হলো মুবতাদা, আর لَهُمْ তার খবর, উহ্য ইবারত হলো فَالْهَلَاكُ لَهُمْ ; এটাকে আবুল বাকা (র.) পছন্দ করেছেন। –[ই'রাবুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ : অর্থাৎ যখন اَمْر তথা জিহাদের পাক্কা ইরাদা করে ফেলল। এখানে اِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা عَزَمَ হলো صَاحِب عَزْمٍ-এর কর্ম ; اَمْر-এর কর্ম নয়।

قَوْلُهُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ : কতিপয় আলেমের অভিমত হলো لَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ তার জবাবসহ اِذَا-এর জওয়াব হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, اِذَا-এর জবাব হলো كَرِهُوْا যা উহ্য রয়েছে। আর فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ-কে শর্ত এবং لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ কে তার جَزَاء বলেছেন।

قَوْلُهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ : عَسَيْتُمْ হলো اَفْعَال رَجَاء বা اَفْعَال مُقَارِبَة-এর অন্তর্গত ফে'লে মাযী। অর্থাৎ তোমাদের থেকে দূরে নয় যে, তোমরা এতে অধিক ধমক দেওয়ার জন্য غَائِبْ থেকে حَاضِر-এর দিকে اِلْتِفَاتْ করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) تَوَلَّيْتُمْ-এর অর্থ اِعْتِرَاضٌ عَنِ الطَّاعَةِ তথা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া করেছেন। মুফাসসির (র.)-ও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আর হযরত কালবী (র.) تَوَلَّيْتُمْ-এর অর্থ করেছেন اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَمْرَ الْاُمَّةِ অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে উম্মতের কর্মের জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়া হয় তবে তোমরা রাজ্যে অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলবে।

قَوْلُهُ اَقْفَالُهَا : اَقْفَالٌ শব্দটি قُفْلٌ-এর বহুবচন। اَقْفَالٌ-কে قُلُوْب-এর দিকে সম্বন্ধ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে قُفْلٌ দ্বারা প্রচলিত তালা উদ্দেশ্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের অদৃশ্য তালা উদ্দেশ্য যা قُلُوْب-এর জন্য সমীচীন হবে। যেমন তাওফীক বা সামর্থ্য দূরীভূত হয়ে যাওয়া, চিন্তা-ভাবনার যোগ্যত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। মুফাসসির (র.) فَلَا يَفْهَمُوْنَهٗ দ্বারা এই অদৃশ্য তালা অর্থাৎ বুঝার যোগ্যতা হরণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اُمْلِىْ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. হামযাতে পেশ এবং لَامْ-এ যের يَا তে যবর অর্থাৎ اُمْلِىَ মাযী মাজহুল অর্থাৎ তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয়েছে।

২. অপর কেরাতে يَا সাকিনের সাথে مُضَارِعْ مَعْرُوْف তথা اُمْلِىْ অর্থাৎ তাদেরকে আমি অবকাশ দিব।

اُمْلِىْ لَهُمْ অর্থ– তাদেরকে আমি দীর্ঘাশা দিব। সে সময় এর فَاعِلْ হবে শয়তান। আর তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি এবং ঢিল দিয়েছি– এই সুরতে فَاعِلْ হবেন আল্লাহ।

قَوْلُهُ الْمُمْلِى الشَّيْطَانُ بِإِرَادَتِهِ تَعَالٰى : এ ইবারতের দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. অবকাশ দেওয়া আল্লাহর কাজ, কাজেই শয়তানের দিকে এর নিসবত করা তো ঠিক নয়।

উত্তর. ঢিল -এর অবকাশ দেওয়া তো বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর কাজ। কিন্তু إِسْنَادٌ مَجَازِىٌّ হিসেবে শয়তানের দিকে এর নিসবত করে দেওয়া হয়েছে। কেননা তার ওয়াসওয়াসার মাধ্যমেই এটা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর بِأَنَّهُمْ قَالُوْا হলো তার খবর। আর بَاءْ টা হলো سَبَبِيَّةْ

قَوْلُهُ قَالُوْا : قَالُوْا -এর فَاعِلْ হলো মুনাফিকরা আর كَرِهُوْا -এর فَاعِلْ হলো ইহুদি। মনে হয় যেন এই কথাবার্তা বলা ও শ্রবণ করা মুনাফিক ও ইহুদিদের মাঝে হয়েছে; মুশরিক ও মুনাফিকের মাঝে হয়নি। যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) পছন্দ করেছেন। এটা سَبْقَتْ قَلَمْ বা লিখনীর পদস্খলন করা হবে। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ الخ : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানগণ যখন অতিষ্ঠ এবং তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তখন তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, যদি পবিত্র কুরআনের এমন কোনো সূরা নাজিল হতো, যাতে জিহাদের আদেশ থাকত, তাহলে কাফেরদের মোকাবেলা করার একটা ব্যবস্থা হতো, কিন্তু যখন এমন সূরা নাজিল হলো, যাতে জিহাদের আদেশ রয়েছে, তখন মুনাফিকরা মহাবিপদে পড়ল। মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে যে অবস্থা হয় ঠিক সে অবস্থা দেখা দিল। তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শঙ্কিত চিত্তে তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দিকে তাকাতে লাগল, জিহাদের কথা শ্রবণ করে তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেল এবং চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের বিপদ আসন্ন, তাদের পক্ষে যা উচিত ছিল, তা হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং কার্যক্ষেত্রে সে আনুগত্যের প্রমাণ উপস্থাপন করা। যদি তাদের কথায় তারা সত্যবাদী হতো তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো, অর্থাৎ যদি তারা জিহাদে অংশ নিত, তবে তা তাদের জন্যে ভালো হতো।

অথবা এর অর্থ হলো, যদি তারা তাদের ঈমানের ব্যাপারে আন্তরিক হতো এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসরণেও তারা আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসত, তবে তা তাদের জন্যে অতি উত্তম হতো। কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণেই মুসলিম জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। –[তাফসীরে কবীর খ. ২৮, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ سُوْرَةٌ مُحْكَمَةٌ : مُحْكَمَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কুরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় مُحْكَمٌ শব্দটি مَنْسُوْخٌ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মুহকামাহ' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদা (র.) বলেন, যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলি বিধৃত হয়েছে। সেগুলো সব 'মুহকামাহ' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মুহকামাহ শব্দ যুক্ত করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ أَوْلٰى لَهُمْ : আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ : আভিধানিক দিক দিয়ে تولى শব্দের দুটি অর্থ সম্ভবপর। যথা– ১. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও ২. কোনো দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবূ হাইয়ান (র.) তাফসীরে বাহরে মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরিয়তের বিধানাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও [জিহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত] তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হতো। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা দূর করার জন্যে জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং

আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী ও কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلّٰى শব্দের অর্থ 'রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ তোমরা দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাগিদ : اَرْحَامٌ শব্দটি رِحْمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধিতিতে رِحْمٌ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, اَرْحَامٌ ও ذَوِى الْاَرْحَامِ শব্দ কোন কোন আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাগিদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরিউক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গুনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোনো গুনাহ নেই। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আয়ু বৃদ্ধি ও রুজি-রোজগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ বুখারীতে আছে-

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا .

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : "যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।" অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.) এই আয়াতদৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাঁদির গর্ভ থেকে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে , যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদি বিক্রয় করা হারাম। -[হাকেম]

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা : হযরত ইমাম আহমদ (র.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন?
তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন, এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর কে হবে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি? কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ সহ অভিসম্পাত করা জায়েজ; যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, দুষ্কৃতিকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ইত্যাদি।
-[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ৭২]

قَوْلُهٗ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا : অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে طَبْعٌ ও خَتْمٌ অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোরও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গুনাহে লিপ্ত থাকে। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

قَوْلُهٗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ : এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। যথা-

১. تَسْوِيْلٌ ; এর অর্থ সুশোভিত করা অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দকর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া।
২. اِمْلَاءٌ ; এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

অনুবাদ :

٢٩. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ـ يُظْهِرُ اَحْقَادَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনো তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেন না। নবী করীম ﷺ ও মুমিনদের ব্যাপারে তাদের শত্রুতাকে প্রকাশ করে দিবেন না।

٣٠. وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ عَرَّفْنَاكَهُمْ وَكُرِّرَتِ اللَّامُ فِيْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط عَلَامَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ الْوَاوُ لِقَسَمٍ مَحْذُوْفٍ وَمَا بَعْدَهَا جَوَابُهُ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ اَيْ مَعْنَاهُ اِذَا تَكَلَّمُوْا عِنْدَكَ بِاَنْ يُّعَرِّضُوْا بِمَا فِيْهِ تَهْجِيْنُ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ـ

৩০. আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম। তাদের সকলের ব্যাপারে আপনাকে জানিয়ে দিতাম। আর فَلَعَرَفْتَهُمْ -এর মধ্যে لَامْ -কে تَكْرَارْ আনা হয়েছে। ফলে আপনি তাদেরকে লক্ষণ দেখে তাদরেকে চিনে ফেলতে পারতেন। আপনি অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন وَاوْ টা ঊহ্য কসমের জন্য। তার পরবর্তী অংশ হলো جَوَابْ قَسْم কথার ভঙ্গিতে অর্থাৎ যখন তারা আপনার সাথে কথা বলে তখন এমনভাবে কটাক্ষ পাত করে যাতে মুসলমানদের ব্যাপারে ঘৃণা হয়। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

٣١. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَخْتَبِرَنَّكُمْ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ حَتّٰى نَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَنَبْلُوْ نُظْهِرَ اَخْبَارَكُمْ ـ مِنْ طَاعَتِكُمْ وَعِصْيَانِكُمْ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ ـ

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যাচাই বাছাই করব জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে। যতক্ষণ না আমি জেনে নেই অর্থাৎ প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল কে? জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কে আনুগত্যশীল আর কে নাফরমান। উপরিউক্ত তিনটি ফে'লই يَاءْ এবং نُوْن দ্বারা উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٢. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ خَالَفُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى هُوَ مَعْنٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ـ يُبْطِلُهَا مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْاٰخِرَةِ ثَوَابًا نَزَلَتْ فِي الْمُطْعِمِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَوْ فِيْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ ـ

৩২. যারা কুফরি করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে সত্য পথ থেকে এবং রাসুলের বিরোধিতা করে নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর سَبِيْلُ اللّٰهِ -এর অর্থ এটাই। তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তাদের দান সদকা ইত্যাদিকে নিষ্ফল করে দিবেন। ফলে তারা পরকালে এর কোনো প্রতিদান প্রাপ্ত হবে না। আলোচ্য আয়াতটি আসহাবে বদর অথবা বনূ কুরায়যা এবং বনূ নযীরকে অন্ন দানকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩৩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ . بِالْمَعَاصِيْ مَثَلًا .

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না। অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে। যেমন–

৩৪. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِهِ وَهُوَ الْهُدٰى ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ . نَزَلَتْ فِيْ اَصْحَابِ الْقَلِيْبِ .

৩৪. যারা কুফরি করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে আর তা হলো হেদায়েতের পথ। অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। এ আয়াত কূপবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩৫. فَلَا تَهِنُوْا تَضْعُفُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ق بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا اَيْ الصُّلْحِ مَعَ الْكُفَّارِ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق حُذِفَ مِنْهُ وَاوُ لَامِ الْفِعْلِ الْاَغْلَبُوْنَ الْقَاهِرُوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ يَنْقُصَكُمْ اَعْمَالَكُمْ . اَيْ ثَوَابَهَا .

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। اَلسَّلْم শব্দটি سِيْن বর্ণে যের ও যবর উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ যখন তোমরা কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তখন সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল اَعْلَوْنَ -এর لَامْ কালিমার وَاوْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরাই বিজয়ী ও প্রভাবশালী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছে অর্থাৎ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা। তিনি কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না কমিয়ে দিবেন না তোমাদের কর্মফল প্রতিদান/ ছওয়াব।

৩৬. اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اَيْ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوا اللّٰهَ وَذٰلِكَ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ جَمِيْعَهَا بَلِ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ فِيْهَا .

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল অর্থাৎ এতে ব্যাপৃত থাকা ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহকে ভয় কর। এটাই হলো পরকালের কাজ। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না তবে তন্মধ্য হতে জাকাতের ফরজ পরিমাণ চান।

৩৭. اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ يُبَالِغْ فِيْ طَلَبِهَا تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ الْبُخْلُ اَضْغَانَكُمْ لِدِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৩৭. তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে অর্থাৎ তার চাওয়ার মধ্যে মুবালগা করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন এবং কার্পণ্য দীন ইসলামের জন্য তোমাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দিবে।

৩৮. هَاَنْتُمْ يَا هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط يُقَالُ بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ عَنْ نَفَقَتِكُمْ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج اِلَيْهِ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَتِهٖ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اَىْ يَجْعَلُهُمْ بَدَلَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْآ اَمْثَالَكُمْ . فِى التَّوَلِّىْ عَنْ طَاعَتِهٖ بَلْ مُطِيْعِيْنَ لَهٗ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৮. দেখ, তোমরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে যা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে, যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য নিজেদেরই প্রতি। বলা হয় بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ আল্লাহ অভাবমুক্ত তোমাদের ব্যয় করা থেকে এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত তাঁর প্রতি। যদি তোমরা বিমুখ হও তাঁর আনুগত্য করা হতে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে করবেন তোমাদের পরিবর্তে তারা তোমাদের মতো হবে না আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া থেকে, বরং তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ الخ : এখানে اَمْ টি হলো مُنْقَطِعَةٌ অর্থাৎ بَلْ اَحَسِبَ الْمُنَافِقُوْنَ আর اَلَّذِيْنَ এটা স্বীয় সেলাহ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَوْجُوْدٌ এর সাথে মিলে حَسِبَ এর فَاعِلْ আর اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ টা حَسِبَ -এর দুই মফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর اَنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ যমীরে শান হলো তার উহ্য اِسْمٌ অর্থাৎ اِنَّهٗ ; এর পরবর্তী অংশ জুমলা হয়ে اَنْ-এর خَبَرٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَضْغَانَهُمْ : এটা ضِغْنٌ -এর বহুবচন; অর্থ– ঈর্ষা, ঘৃণা, গোপন শত্রুতা।

قَوْلُهٗ لَاَرَيْنَاكَهُمْ : এখানে رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَتٌ بَصَرِىْ উদ্দেশ্য। এ কারণেই مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْلٌ হয়েছে। আর যদি رُؤْيَتٌ قَلْبِىْ উদ্দেশ্য হতো তবে তিন মাফউলের দ্বারা مُتَعَدِّىْ হতো كَهُمْ হলো اَرَيْنَا -এর দুই মাফউল। -[ই'রাবুল কুরআন] আবার কেউ কেউ رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَةٌ عِلْمِيَّةٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মুফাসসির (র.) اَرَيْنَا -এর তাফসীর عَرَفْنَا দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর مَعْرِفَتٌ দ্বারা এমন مَعْرِفَتٌ উদ্দেশ্য যা চাক্ষুষ দেখার মতো হয়।

قَوْلُهٗ لَاَرَيْنَاكَهُمْ : এটা হলো لَوْ -এর জবাব। আর فَلَعَرَفْتَهُمْ -এর জওয়াব لَوْ -এর উপর আতফ হয়েছে। لام টা তাকিদের জন্য তাকরার/ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। আর فاء হলো عَاطِفَةٌ

قَوْلُهٗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ : উহ্য لَامِ قَسَمْ -এর জবাবের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَحْنِ الْقَوْلِ : উল্লিখিত لَحْنٌ -এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

১. خَطَأٌ فِى الْاِعْرَابِ তথা ই'রাবের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া।

২. خَطَأٌ فِى الْكَلَامِ তথা বাক্যের মধ্যে ভুল হওয়া। لَحْنٌ فِى الْكَلَامِ -এর মানে হলো বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ সম্মান বুঝায় এবং অপ্রকাশ্য অর্থ নীচুতা ও হীনতা বুঝায়, আর বক্তা অপ্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকে। অথবা বাক্যকে এমনভাবে উচ্চারণ/উদ্দেশ্য করা যে, তাতে তার অর্থে পরিবর্তন এসে যায় এবং সম্মানের স্থলে দুর্নাম হয়ে যায়। যেমন– মুনাফিকরা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করতে গিয়ে رَاعِنَا -এর স্থলে رَاعِيْنَا বলত। رَاعِنَا -এর অর্থ হলো আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! আর رَاعِيْنَا -এর অর্থ হলো– আমাদের রাখাল। অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর স্থলে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত, অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক, ধ্বংস হোক!

قَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثِ : এই فِعْل তিনটি হলো ১. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ২. نَعْلَمُ ৩. نَبْلُوَ এই فِعْل -ত্রয়ের মধ্যে وَاحِدْ جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ ও مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ রূপ উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়।

قَوْلُهُ شَاقُّوْا : এটা مَاضِىْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থাৎ তারা বিরোধিতা করেছে। এটা مُشَاقَّةْ এবং شِقَاقٌ থেকে مُشْتَقّ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ : حَبْطُ عَمَلْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরকালে তাদের আমলকে নিঃশেষ করে দেওয়া। আর আমল দ্বারা সেই আমল উদ্দেশ্য যাকে পরিভাষায় আমল মনে করা হয়। যেমন– আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন, গরিব, মিসকিন ও মুসাফিরকে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ أُنْزِلَتْ فِي الْمُطْعِمِيْنَ : এখানে مُطْعِمِيْنَ দ্বারা সে সকল মুশরিকরা উদ্দেশ্য, যারা বদর যুদ্ধের সময় কাফের সৈন্যদের খানাপিনা তথা ব্যয়ভার নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করেছিল।

قَوْلُهُ أَصْحَابُ الْقَلِيْبِ : বদর প্রান্তরের একটি কূপের নাম হলো قَلِيْبٌ ; যেখানে রাসূল ﷺ নিহত মুশরিকদের লাশ ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ فَلَا تَهِنُوْا : অর্থাৎ তোমরা হিম্মতহারা হয়ো না, দুর্বল হয়ো না। فَا টা جَوَابُ شَرْطٌ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। শর্তটা উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে إِذَا تَبَيَّنَ لَكُمْ بِالدَّلَالَةِ الْقَطْعِيَّةِ عِزَّ الْإِسْلَامِ وَذَلَّ الْكُفْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَا تَهِنُوْا

قَوْلُهُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ : এখানে وَاوْ হলো حَالِيَهْ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হয়েছে। অর্থাৎ وَأَنْتُمْ غَالِبُوْنَ بِالسَّيْفِ وَالْحُجَّةِ اٰخِرَ الْأَمْرِ ; أَعْلَوْنَ মূলত أَعْلَوُوْنَ ছিল। প্রথম وَاوْ টি لَامْ كَلِمَةْ হলো আর দ্বিতীয়টি হলো বহুবচনের وَاوْ প্রথম وَاوْ টি مُتَحَرِّكْ এবং তার পূর্বের বর্ণে যবর হওয়ার কারণে -وَاوْ-কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে اَلِفْ পড়ে গেছে। ফলে أَعْلَوْنَ হয়েছে। অর্থ হলো أَغْلَبُوْنَ الْقَاهِرُوْنَ ; অন্য নোসখায় قَاهِرُوْنَ -এর স্থলে الظَّاهِرُوْنَ উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ : এটা جُمْلَهْ حَالِيَهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَتِرَ : এটা বাবে ضَرَبَ থেকে مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো–হ্রাস করা, কম করা।

قَوْلُهُ فَيُحْفِكُمْ : এটা إِحْفَاءٌ থেকে অর্থ হলো কোনো ব্যাপারে মুবালাগা করা, মূলসহ উপড়ে ফেলা। এটা থেকেই إِحْفَاءُ الشَّارِبِ তথা গোঁফকে ভালোভাবে পরিষ্কার করা। এখানে প্রার্থনার ক্ষেত্রে মুবালাগা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هَا أَنْتُمْ : এখানে هَا হলো حَرْفُ تَنْبِيْهٍ আর أَنْتُمْ হলো মুবতাদা। আর هٰؤُلَاءِ হলো মুনাদা। হরফে নেদা উহ্য। যাকে মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। تَدْعَوْنَ হলো خَبَرْ ; جُمْلَةْ نِدَائِيَّةْ মুবতাদা এবং খবরের মাঝে جُمْلَةْ مُعْتَرِضَةْ

قَوْلُهُ يُقَالُ بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ : এ ইবারতের মাধ্যমে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, بَخِلَ যদি شُحٌّ তথা লোভ-লালসার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে তা عَلٰى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর যখন أَمْسَكَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন এটা عَنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ : أَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং বাহ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত; কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন না? ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ : অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যা দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لَوْ অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম;

কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোনো বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভালো হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোনো কোনো হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক খুতবায় ছত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ : আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদি বনী কোরায়যা ও বনী নাজীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ-কাফরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কুরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

قَوْلُهُ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ : এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না: বরং ব্যর্থ করে দেবেন। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন- সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে; গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ : কুরআন পাক এ স্থলে حَبْط -এর পরিবর্তে اِبْطَالٌ উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حَبْط দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোনো আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোনো কোনো সৎকর্মের জন্য অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না! কুরআন পাকে বলা হয়েছে- وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ; অন্যত্র বলা হয়েছে- اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ; অতএব যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খায়রাত সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে- لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরিবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরিবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গুনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেন- بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ মুকাতিল (র.) প্রমুখ বলেন- بِالْمَنِّ কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে কুফর ও শিরক ছাড়া কোনো কবীরা গুনাহও এমন নেই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাজি ও রোজাদার; এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামাজ রোজা বাতিল হয়ে গেছে, এগুলোর কাজা কর। অতএব, সেসব গুনাহ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত। যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করাটা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গুনাহের ক্ষেত্রেই শর্ত হবে যার আমলে গুনাহের প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎকর্মেও আজাব থেকে রক্ষা করার মতো বরকত থাকবে না: বরং সে নিয়মানুযায়ী গুনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোনো সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামাজ অথবা রোজা শুরু করে বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন, যে সৎকর্ম প্রথমে ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরজ হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গুনাহগার হবে এবং তা কাজা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গুনাহগারও হবে না এবং তা কাজাও করতে হবে না। কারণ প্রথমে যখন এই আমল ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও তা ফরজ ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ : এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর ছওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

قَوْلُهُ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ : এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহবান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েজ, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوْا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোনো বিরোধ নেই। কারণ وَإِنْ جَنَحُوْا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়; বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

قَوْلُهُ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : সংসার-আসক্তিই মানুষের জন্য জিহাদে বাধা দানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিয়ো না।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ : আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কুরআনেই জাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাগিদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন لَا يَسْئَلْكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোনো উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা ছওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত- مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, لَا يَسْئَلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি। -[কুরতুবী]

পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে– إِنْ يَّسْئَلْكُمْ فَيُحْفِكُمْ ; يُحْفِ শব্দটি إِحْفَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– বাড়াবাড়ি করা এবং কোনো কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হতো। এমন কি, তা আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে لَا يَسْئَلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরজ কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এসব ফরজ কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরজ করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। জাকাত হলো মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ অথবা ২০ ভাগের একভাগ এবং ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাননি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ يُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ : اَضْغَانَ শব্দটি ضِغْنٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করছো। শেষ আয়াতে এ কথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে– تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ এতে করে সে পরকালের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরজ তরক করা শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলি পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকি রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হেফাজত এবং বিধানাবলি পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলির প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তাঁরা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মতো শরিয়তের বিধানাবলির প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন, সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত। [যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না] তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত। –[তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী]

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য-সন্তান। কোনো দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। –[তাফসীরে মাযহারীর প্রান্ত-টীকা]

سُوْرَةُ الْفَتْحِ : সূরা ফাত্‌হ

সূরার নামকরণের কারণ : কুরআন মাজিদের ৪৮ নং সূরার নাম হলো সূরা ফাত্‌হ। فَتْحٌ [ফাত্‌হ] শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত করা ও বিজয়। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত "اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি] এর মধ্যস্থ "فَتْحًا" [ফাতহান] অর্থ– বিজয়। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে এ বিজয় দান করেছেন। উক্ত সূরায় বিরাট অংশ জুড়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর আলোকপাত করেছেন। যেহেতু এ আলোচনার মধ্যে اَلْفَتْحُ [বিজয়] শব্দটি রয়েছে সেহেতু সূরাটির নামকরণ اَلْفَتْحُ দ্বারা করা হয়েছে। যদিও সূরাটির অংশ বিশেষ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে, তথাপি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির জন্য এটা যথার্থ শিরোনাম হওয়ার দাবিদার।

সূরাটির ফজিলত ও আমল : আলোচ্য সূরাটির বহু ফজিলত রয়েছে, তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. হুদায়বিয়া নামক স্থানে মহানবী ﷺ মক্কার কুরাইশ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলে হযরত সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যস্থতায় সন্ধি করত মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে আলোচ্য সূরা ফাত্‌হ অবতীর্ণ হয়। সূরাটি রজনীতে নাজিল হয়। প্রভাতে মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন–
   অদ্যকার রজনীতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে– اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا [যা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকলবস্তু হতে উত্তম ও পছন্দনীয়।] আর তা হলো– "اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।]
২. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় এ সূরাটি লিখে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখলে নিরাপদে থাকা যায় এবং বিজয় সহজসাধ্য হয়।
৩. নৌকায় আরোহণ করার সময় এ সূরা তেলাওয়াতে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়ে থাকে।
৪. রমজান শরীফের চাঁদ দেখার সময় তিনবার এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে গোটা বছর যাবত রুজি-রোজগার সুপ্রশস্ত ও সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাতহ পাঠ করতে দেখে, আল্লাহ পাক তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করবেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর নবী করীম ﷺ হযরত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথিমধ্যে রজনীকালে সূরাটি নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হিজরি ষষ্ঠ সনের যুলকাদ মাসে রাসূল ﷺ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, তিনি ওমরা পালন করছেন। স্বপ্নের বিষয়টি শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনার্থে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীদের সঙ্গে করে ওমরা ব্রত পালনার্থে নবী করীম ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহানবী ﷺ অবগত হলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধা দান করবে, কাজেই নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে করে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। মক্কার মুশরিকদেরকে ব্যাপারটি বুঝানো পূর্বক তাদের সাথে সমঝোতা করার জন্য নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে একাধিক দূত এসেও ব্যাপারটির সূরাহা করতে পারেনি। সমস্যা জিইয়ে থাকল। পরিশেষে সুহাইল ইবনে আমরের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্ধির অধিকাংশ শর্তাবলিই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীতে ছিল। বাহ্যত মনে হচ্ছিল নবী করীম ﷺ অনেকটা নতি স্বীকার করেই মুশরিকদের সাথে এক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম– যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুলহুলাইফার বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষোভে অভিমানে জ্বলছিলেন। এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করা অপেক্ষা যুলহুলাইফার ময়দানে জীবন বিসর্জন দেওয়া যেন তাদের নিকট শ্রেয় মনে হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.-এর ন্যায় দু একজন তেজস্বী ও প্রতিভাবান সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে যে, কি হিকমত লুক্কায়িত ছিল, বাহ্যিক পরাজয়ের অভ্যন্তরে যে এক মহাবিজয় নিহিত ছিল, তা আল্লাহ ও তদীয়

রাসূল ﷺ -এরই ভালো জানা ছিল। কাজেই সাহাবীগণের সকল মান-অভিমানকে উপেক্ষা করে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুরূপ শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন।

সে বছর আর ওমরা পালন করা সম্ভব হলো না। সন্ধির শর্তানুযায়ী নবী করীম ﷺ যুলহুলাইফাতেই সাহাবীগণসহ ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। হাদীর পশুগুলোকে সেখানেই জবাই করেন। ক্ষোভে-অভিমানে হতাশ মর্মাহত সাহাবীদেরকে নিয়ে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক এলাকার আসফান নামক স্থানে রজনীকালে আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ নাজিল হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন- "অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা আমার উপর নাজিল হয়েছে যেটা সূর্য যাতে উদিত হয়েছে, তা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। অতঃপর তিনি সূরাটি তেলাওয়াত করে সাহাবীগণকে শুনালেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "আমার উপর অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু হতে প্রিয়।" এরপর তিনি সূরা ফাত্হ -এর শুরু হতে পড়া আরম্ভ করলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি : আলোচ্য সূরাটি যে মহান ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। হিজরি ষষ্ঠ সনে মক্কার অদূরে নবী করীম ﷺ ও কাফেরদের মধ্যে এ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মহান ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তাবলি যদিও অসম ছিল এবং আপাতঃদৃষ্টিতে কুরাইশদেরই পক্ষে তথাপি মূলত এর দ্বারাই মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

মহানবী ﷺ ও মুহাজির সাহাবীগণ (রা.) মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আসার পর দেখতে না দেখতে প্রায় ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁরা এমনকি আনসারী সাহাবীগণও মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারতে গমন করতে পারেননি। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে মহানবী ﷺ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়ে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করেছেন। নবীর স্বপ্ন ওহী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও নিছক কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এটা ছিল ওহীর নামান্তর। মূলত আল্লাহ তা'আলারই ইঙ্গিত।

প্রিয়নবী ﷺ -এর পক্ষে এ ইঙ্গিত বাস্তবায়িত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। কুরাইশ মুশরিকরা দীর্ঘ ছয়টি বৎসর যাবৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তারা মুসলমানদেরকে হজ বা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যেতে দেয়নি। এখানে তারা স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ -কে সাহাবীদের দলবলসহ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে, তা কি করে আশা করা যেতে পারে? ওমরার নিয়ত করে এবং ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ারই নামান্তর ছিল। আর নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া তো নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের প্রাণের জন্য কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোনো পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার এ ইঙ্গিত কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু পয়গাম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁকে যে নির্দেশই দেবেন, কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথার্থরূপে পালন করাই তাঁর একান্ত কর্তব্য। এ কারণে নবী করীম ﷺ নিঃসঙ্কোচে অকপটে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন এবং সফরে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিলেন- "ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি যারাই আমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়।" এতে যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিল যে, এ লোকগুলো তো অযথাই মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রাসূলে করীম ﷺ -এর সঙ্গী হতে প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের ﷺ প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ডানা পেতে ছিল তারা এ যাত্রার পরিণতি কি হবে? তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হলো না। এটা আল্লাহর সংকেত এবং তাঁরই রাসূল ﷺ এ সংকেত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গী হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কিছু ছিল না।

চৌদ্দশত সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ -এর নেতৃত্বে এ কঠিন শঙ্কাময় বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছে সকলেই ওমরার ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানি করার উদ্দেশ্যে সত্তরটি উট সঙ্গে নিলেন। উটগুলোর গলায় شِعَارُ قُرْبَانِيْ তথা "কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তু" হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেওয়া হলো। জিনিসপত্রের মধ্যে এক একখানি তরবারিও সঙ্গে নেওয়া হলো। এটা কোনো বেআইনী কাজ ছিল না; বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে বায়তুল্লাহ জিয়ারতকারীদের জন্য এটার পুরোপুরি অনুমতি ছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো সমরাস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হয়নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা শুরু করল।

এ সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রতিটি লোকই জানত। বিগত বৎসরই পঞ্চম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে– আরবের সমগ্র গোত্র-সম্প্রদায়গুলো সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে 'আহজাব' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ যখন জনতার এতবড় একটি কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্ত-পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে আরবের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অবশ্য লোকেরা এটাও লক্ষ্য করল যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়; বরং হারাম মাসে ইহরাম বেঁধে কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ -এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জুলকাদ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের একটি। যুগ যুগ ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ ও জিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত মাস মনে করে আসছে। এ মাসসমূহে যে কোনো কাফেলাই ইহরাম বেঁধে হজ বা ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, এর প্রতিরোধ করার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোনো গোত্রের সাথে কোনো কাফেলার লোকদের প্রাণের দুশমনী থাকলেও আরবের সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষ দুর্ভাবনার শিকার হলো। তারা মনে করল, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরব জুড়ে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ কাজটি অন্যায় ও নিগৃহীত বলে আখ্যায়িত করবে। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ মনে করতে শুরু করবে– আমরা বুঝি আল্লাহর ঘরের একচ্ছত্র মালিক হতে চাচ্ছি। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে– ভবিষ্যতে কোনো গোত্রকে হজ ও ওমরা পালন করতে দেওয়া না দেওয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার উপর বিরাগভাজন হবো, তাকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে তেমনি বাধা প্রদান করব, যেমন– আজ এ জিয়ারত ইচ্ছুক লোকদেরকে বাধা দিচ্ছি। এটা তো একটি বড় ভ্রান্ত পদক্ষেপ হবে। সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এতবড় একটা কাফেলা সমভিব্যাহারে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দেই তা হলে সারা দেশে আমাদের আর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। মূলত এটা ছিল কুরাইশদের জন্য মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়াতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, কোনোক্রমেই এ কাফেলাকে তারা তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেবে না।

নবী করীম ﷺ বনূ কা'আবের এক ব্যক্তিকে পূর্বেই সংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রাসূলে কারীম ﷺ -কে আগাম অবহিত করানোই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নবী করীম ﷺ যখন উসফান, [মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, মদীনা হতে উটের গাড়িতে দু' দিনের পথ] পৌঁছলেন, তখন সেই লোকটি এসে সংবাদ দিল যে, কুরাইশদের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে [মক্কার বাইরে উসফানের পথে] 'যী তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। আর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সৈন্যে সুসজ্জিত দুই শত উটের গাড়িসহ [উসফান হতে মক্কার দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত] 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাফেলার সাথে গায়ে পড়ে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর যুদ্ধ সংঘটিত হলে যেন সারা দেশে রটিয়ে দেওয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলেই লড়াই করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। যদিও ওমরা করার বাহানা করেছিল। ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত তারা ইহরাম বেঁধে রেখেছিল।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে নবী করীম ﷺ সফরের পথ পরিবর্তন করে দিলেন। সাহাবীগণসহ তিনি অত্যন্ত বন্ধুর দূরতিক্রম্য পথ পাড়ি দিয়ে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটি হারামের বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।

এ স্থানে বনূ খুজাআ গোত্রের সরদার বুদায়েল ইবনে ওরকাহ তাঁর গোত্রের কয়েকজন সঙ্গীসহ নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। তারা এ কথাগুলো কুরাইশ সর্দারদের নিকট পৌঁছে দিল এবং হারাম শরীফের জিয়ারত করতে ইচ্ছুক এ কাফেলাকে বাধা না দেওয়ার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সর্দাররা তাদের একগুঁয়েমী জিদ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হলো না। তারা কুরাইশদের মিত্র গোত্র সমষ্টি আহবীশ সর্দার হুলাইছ ইবনে আলকামাহকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট

পাঠাল; যাতে সে নবী করীম ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সর্দারদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ তার কথা না মানলে সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং অতঃপর আহবীশের সমস্ত শক্তি আমাদের পথে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু হুলাইস যখন এসে প্রত্যক্ষ করল যে, সমস্ত কাফেলা ও কাফেলার সব লোকই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কুরবানির জন্তুগুলোর গলায় চিহ্ন ব্যবহৃত রয়েছে এবং সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার জন্যই এসেছে, তখন সে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কোনো প্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতীতই মক্কায় ফিরে গেল। কুরাইশ সর্দারদের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল- এই লোকেরা বায়তুল্লাহর মাহাত্ম্য মেনেই তার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে। তোমরা যদি তাদেরকে বাধা দাও তাহলে আহবীশ এ কার্যে তোমাদের কোনোই সহযোগিতা করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সেই কাজে আমরা তোমাদের সাহায্য করব- এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের মিত্র হইনি।

তারপর কুরাইশদের পক্ষ হতে দূত হিসেবে ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকাফী আসল। সে নিজস্বভাবে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে নবী করীম ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকার জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে একটি দ্বীনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বললেন, আমি কায়সার, কেসরা ও নাজাসীর দরবারেও গিয়েছি। কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদের ﷺ সাথী-সঙ্গীদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গকৃত দেখতে পেয়েছি, এমন দৃশ্য কোনো বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকগুলোর অবস্থা এমন যে, মুহাম্মদ ﷺ অজু করেন, আর তার অনুসারীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তাঁরা সবই নিজেদের দেহে ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

দূতদের পরস্পর আসা-যাওয়া এবং মতবিনিময়ের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। এ সময়ে কুরাইশরা চুপে চুপে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলত। কোনো না কোনোভাবে এমন কোনো কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে, যাতে লড়াই বাধানোর পরিস্থিতি ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বহাল রাখে; কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীগণের ধৈর্য এবং নবী করীম ﷺ -এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল তাদের সমস্ত কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলায় এসে মুসলমানদের তাবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করল। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অন্য এক সময় 'তানয়ীম' [মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থান] দিক হতে আশি জন লোক এসে ঠিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। তারাও সাহাবীগণের হাতে বন্দী হলো। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। কুরাইশদের সব কয়টি ষড়যন্ত্রই এভাবে ভেস্তে গেল।

অবশেষে নবী করীম ﷺ স্বয়ং হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলে দিলেন যে, আমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। জিয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানি সম্পাদন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। উপরন্তু তারা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন না করায় মুসলমানরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। বস্তুত এটা ছিল একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার এবং চুপচাপ বসে থাকার সময় ছিল না। [মক্কায় প্রবেশ করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর]। এর জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু বিষয়টি যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এ জন্য নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত সাহাবীদের একত্র করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, "অতঃপর আমরা এ স্থান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপদ হবো না। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এটা কোনো নগণ্য ধরনের বায়'আত ছিল না। মুসলমান ছিল মাত্র চৌদ্দশত জন, সঙ্গে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তারা নিজেদের আবাসস্থল হতে আড়াইশত মাইল দূরে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিকে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত কাফেলা-ই নবী করীম ﷺ -এর হাতে মরতে প্রস্তুত থাকার জন্য বায়'আত গ্রহণ করতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হলো না। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং আল্লাহর পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এটা

অপেক্ষা আর কি হতে পারে? বস্তুত এ বায়'আত 'বাইয়াতে রেদওয়ান' তথা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অঙ্গীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তা চিরদিনই ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তীতে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। তিনি নিজেই স্ব-শরীরে ফিরে আসলেন। এদিকে কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেওয়া হবে না- এরূপ জিদ ও একগুঁয়েমী মনোভাব তারা পরিত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য তারা বারংবার শুধু বলতে লাগল, আপনি এ বৎসর ফিরে যান। আগামী বৎসর আসতে পারেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হলো-

১. দশ বৎসর যাবৎ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে না।
২. এ সময়ের মধ্যে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট পালিয়ে চলে গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৩. আরবের গোত্রসমূহ উপরিউক্ত পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একটির সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।
৪. মুহাম্মদ ﷺ এ বৎসর ফিরে যাবেন এবং আগামী বৎসর ওমরা পালন করার উদ্দেশ্যে আগমন করে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। তবে অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে আসতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জাম সঙ্গে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্য মক্কাবাসীরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে। যেন কোনোরূপ সংঘাত হওয়ার আশংকা না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোনো এক ব্যক্তিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্তসমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। যে সব কল্যাণকর দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম ﷺ এ শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, অন্য কারো দৃষ্টি সেই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিল না। ফলে এই সন্ধির পরিণতিতে যে মহান কল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা কেউই অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল- আমরা দুর্বল দেখে এই অপমানকর শর্তসমূহ মেনে নেব কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ন্যায় একজন সুক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জননেতার অবস্থাও সীমাহীন উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনো কোনো রূপ সংশয় মাথাচাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, নবী করীম ﷺ কি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়? তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অপমান ও লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেব কেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে ওমর! তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো তাঁকে বিপথগামী করবেন না। এটা শুনে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঠিক এ প্রশ্নগুলো করলেন। তিনিও তাঁকে ঠিক সেই জবাবই দিলেন- যা দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

আলোচ্য সন্ধি চুক্তির দুটি বিষয় লোকদের মনে সর্বাধিক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছিল। এর একটি হলো দুই নম্বর শর্ত। লোকদের মতে এটা সুস্পষ্টরূপে সমতা ভঙ্গকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? নবী করীম ﷺ এ বিষয়ে বললেন, আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা কি আমাদের কোন কাজে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের হতে দূরে রাখুন, এতেই তো মঙ্গল। আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির বিকল্প কোনো পথ সৃষ্টি করে দেবেন।

তা ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা মনে করতেছিলেন যে, এই শর্তটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আমরা সমস্ত আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এতদ্ব্যতীত আরো একটি প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি। অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করে ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে বুঝালেন, এ বৎসরই তওয়াফ করা হবে। স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বৎসর না হলেও আগামী বৎসর তো ইনশাআল্লাহ তওয়াফ করা হবেই।

এ সময় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি বলা যেতে পারে আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করছে। সন্ধির চুক্তি পত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জন্দল যিনি ইতোপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিল– কোনো না কোনোক্রমে পালিয়ে এসে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে শামিল হয়ে গেছেন। তাঁর পায়ে বেড়ী লাগানো ছিল, তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন অংকিত ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, "আমাকে এ অন্যায়-অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দান করুন!" এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেওয়া উপস্থিত জনতার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর বলল, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও এর শর্তাবলি আমাদের পরস্পরে মাঝে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম ﷺ তার যুক্তি মেনে নিলেন। আবু জান্দালকে এ জালিমদের নিকটই সোপর্দ করা হলো।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখনই কুরবানি করে মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং ইহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজনও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম ﷺ পরপর তিনবার এ নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ সময় যে দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও স্বীয় স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভবপর হলো না। অথচ নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে কোনো কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, এমনটি রাসূলে করীম ﷺ -এর সমগ্র রিসালতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনার আর কখনো উদ্রেক হয়নি। এতদ দর্শনে নবী করীম ﷺ খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর ক্যাম্পে পৌছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট তাঁর এ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিবেদন করলেন, আপনি নিজে গিয়ে চুপ চাপ আপনার উটটি জবাই করে ফেলুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে আপনার মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। এর পর সাহাবীগণ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁরা বুঝে নেবে যে, যা কিছু ফয়সালা হয়ে গেছে তা আর পবিরর্তিত হওয়ার মতো নয়। কার্যত হলোও তা-ই। রাসূলে কারীম ﷺ -এর আমল দেখে লোকেরা কুরবানি করল এবং মাথা মুণ্ডন করল, চুল কর্তন করাল এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখ-ক্ষোভে তাদের কলিজাটা যেন ফেটে গিয়েছিল।

অতঃপর এ কাফেলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল তখন মক্কা হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে [মতান্তরে কুরাউল গাইম নামক স্থানে] এ সূরাটি নাজিল হলো। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ সন্ধিকে নিজের পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহাবিজয়। এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্র করেন এবং বললেন, আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সবকিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান। এরপর তিনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে তা শুনালেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার এ মহাবাণী শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু করল তখন এ সন্ধি যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহা বিজয় ছিল তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। এ সন্ধির কতিপয় কল্যাণকর বিষয়গুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

১. এ সন্ধির ফলে আরবদেশে সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মর্যাদা এরূপ ছিল যে, আরবদের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত মনে করত। অথচ সেই কুরাইশরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর এর স্বাধীন সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব মেনে নিল। আরবদের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোনো একটির সাথে ইচ্ছা, মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর জিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা আপনি এটাও স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত কোনো ব্যবস্থার নাম নয়। তখনও পর্যন্ত যদিও তারা এটাই মনে করে আসছিল; বরং তা আরবে অবস্থিত ও প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে একটি এবং অন্যান্য ধর্মপরায়ণদের ন্যায় হজ ও ওমরা অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার মুসলমানদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবতকালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল এ সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হলো।

৩. কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম ﷺ ইসলাম অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামি আইন-বিধান চালু করে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে মুসলমান সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নীত করার অবাধ সুযোগ লাভ করেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নিয়ামত। সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করে নিলাম।

৪. সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বাধিক ও সর্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করত অবাধে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ পেলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে উনিশ বৎসরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এর পর মাত্র দু বৎসরে তার অনেক বেশি সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন মুসলমান। আর এর মাত্র দুই বৎসর পরই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী করীম ﷺ যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর অনুগত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল।

৫. কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক [মক্কা] হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করল। এতে বড় একটি ফায়দা সাধিত হলো যে, মুসলিমগণ উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে সক্ষম হলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটি মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এর মধ্যেই ইহুদিদের শক্তিকেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতঃপর ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদি জনবসতিসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে এসে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল তারাও একে একে মুসলমানদের অধীনতা পাশে বন্দী হয়ে গেল। এভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধি মাত্র দুটি বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আরবের শক্তির ভারসাম্য এমনভাবে বদলিয়ে দিল যে, কুরাইশ ও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে পড়ল।

মূলত মুসলমানরা যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং অপমানজনক মনে করত এবং কুরাইশরা নিজেদের চরম সাফল্য ও সম্মান মনে করত তার বিপুল কল্যাণময় অবদানসমূহ উল্লিখিতভাবে ছিল। উক্ত সন্ধিতে যে বিষয়টি সর্বাধিক দুঃসহ ও বেদনাদায়ক ছিল এবং যেটাকে কুরাইশরা স্বীয় মর্যাদা ও বিজয়ের হেতু বলে ধারণা পোষণ করত তাহলো মক্কা হতে প্রাণে বেঁচে মদীনায় পলায়নকারী লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়ে না দেওয়ার শর্ত।

কিন্তু মূলত বিষয়টি ছিল– মানুষ ভাবে একটা, আর হয় তার বিপরীতটার মতো অর্থাৎ স্বল্পকালের মধ্যেই এ অসম শর্তটি কুরাইশদের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত হলো। সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মক্কা হতে আবূ বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের বন্দীশালা হতে মুক্ত হয়ে পালিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। নবী করীম ﷺ সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবূ বসীর (রা.)-কে মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যেসব লোক এসেছিল মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি তাদের একজনকে হত্যাপূর্বক পালিয়ে লোহিত সাগরের মরু অঞ্চলে গিয়ে গোপন আস্তানা গাড়লেন। তাঁর অবস্থানস্থলের পাশ দিয়ে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করত। পরবর্তীতে যে কোনো মুসলামনই কুরাইশদের ছোবল হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো সে-ই হযরত আবূ বাসীরের আস্তানায় গিয়ে ভিড়ত। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা সত্তরে গিয়ে পৌঁছল। তাঁরা সুযোগমতো কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করতে শুরু করেন। তাঁরা যেহেতু মদীনার ইসলামি সরকার হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন সেহেতু নবী করীম ﷺ -এর উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তালো না। এ বিপদের মোকাবিলা করতে না পেরে পরিশেষে কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ শর্তটি বাতিলের অনুরোধ জানাল। অবশেষে হযরত আবূ বাসীর (রা.) এবং তাঁর সহযোগীরা দস্যুবৃত্তি পরিহার করে মদীনায় চলে আসলেন। এরূপেই এ অসম চুক্তির চির অবসান হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ قَضَيْنَا بِفَتْحِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا الْمُسْتَقْبَلَ عَنْوَةً بِجِهَادِكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا ظَاهِرًا .

অনুবাদ :

১. নিশ্চয় আমি [হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে] আপনাকে বিজয় দান করেছি। আমি আপনার জন্যে মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য বিজয়ের সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যা আপনি ভবিষ্যতে আপনার জিহাদের সাধনা ও ক্লেশের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন। সুস্পষ্ট বিজয় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য [বিজয়]।

২. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ بِجِهَادِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ مِنْهُ لِتَرْغَبَ اُمَّتُكَ فِي الْجِهَادِ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ لِعِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ الْقَاطِعِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ فَمَدْخُوْلُهَا مُسَبَّبٌ لَا سَبَبٌ وَيُتِمَّ بِالْفَتْحِ الْمَذْكُوْرِ نِعْمَتَهٗ اِنْعَامَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ بِهٖ صِرَاطًا طَرِيْقًا مُّسْتَقِيْمًا يُثَبِّتُكَ عَلَيْهِ وَهُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ .

২. [হে রাসূল!] আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন আপনার জিহাদের মাধ্যমে আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন যাতে করে আপনি আপনার উম্মতকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া অকাট্য আকলী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সেহেতু অত্র আয়াতের তাবীল [সমাধানমূলক ব্যাখ্যা] করা হবে। ل বর্ণটি এখানে [আয়াতে] হুকুমের উদ্দেশ্যে তার কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা مُسَبَّبٌ -এর উপর দাখিল হয়েছে ; سَبَبٌ -এর উপর নয়। এবং তিনি পূর্ণ করে দেন। উল্লিখিত বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামত– তাঁর নিয়ামত প্রদান– আপনার প্রতি এবং আপনাকে দেখাতে পারেন তা দ্বারা এমন পথ– রাস্তা, যেটা সহজ-সরল অর্থাৎ তার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আর তা হলো দীন ইসলাম।

৩. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ بِهٖ نَصْرًا عَزِيْزًا . نَصْرًا ذَا عِزٍّ لَا ذُلَّ مَعَهٗ .

৩. আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করতে চান তা দ্বারা– পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য– সম্মানসমৃদ্ধ সাহায্য যাতে সামান্যতম অপমান নেই [লাঞ্ছনা নেই]।

৪. هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ الطُّمَانِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط بِشَرَائِعِ الدِّيْنِ كُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا اٰمَنُوْا بِهَا وَمِنْهَا الْجِهَادُ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط فَلَوْ اَرَادَ نَصْرَ دِيْنِهٖ بِغَيْرِكُمْ لَفَعَلَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِيْ صُنْعِهٖ اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

৪. তিনিই সাকীনা দান করেছেন– প্রশান্তি মুমিনদের অন্তরে যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়, দীনের বিধানাবলি সম্পর্কে। তা এভাবে যে, যখনই কোনো বিধান নাজিল হয়েছে তখনই তাঁরা তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর ঐসব বিধান সমষ্টির অন্যতম হলো জিহাদ। ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ তা'আলার জন্যই সুতরাং তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা তাঁর দীনকে সাহায্য করার ইচ্ছা করলে তা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী– তাঁর সৃষ্টিকলায় প্রজ্ঞাময়– তাঁর শিল্পকার্যে, অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এসব গুণে গুণান্বিত থাকেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا : এর মধ্যে فَتَحْنَا -এর তাফসীর قَضَيْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের অপনোদন করা।

সংশয় : فَتْح বা বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা বিজয় আর মক্কা বিজয় সর্বসম্মতিক্রমে ৮ম হিজরিতে হয়েছে। আর এই সূরা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ضَجْنَانْ যা মক্কা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে অথবা কারো মতে كُرَاعُ الْغَمِيْمِ নামক স্থানে ৬ষ্ঠ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে, এখন সংশয় হলো যে, ৮ম হিজরিতে সংঘটিতব্য ঘটনাকে ৬ষ্ঠ হিজরিতে اِنَّا فَتَحْنَا তথা মাযীর সীগাহ দ্বারা কেন ব্যক্ত করা হলো?

নিরসন : মুফাসসিরগণ এই সংশয়ের তিনটি জবাব দিয়েছেন। যথা–

১. প্রথম জবাব তো সেটাই যার দিকে আল্লামা মহল্লী (র.) فَتَحْنَا -এর তাফসীর قَضَيْنَا দ্বারা করে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই জবাবের সার হলো فَتْح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَضَا فِى الْاَزَلِ তথা আলমে আযলের ফয়সালা অর্থাৎ حَكَمْنَا আর قَضَا فِى الْاَزَلِ নিঃসন্দেহে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বেই হয়েছে। অর্থাৎ ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের ফয়সালা আলমে আযলে হয়েছিল, এই সুরতে অতীতকালীন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হাকীকী হবে।

২. দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে মক্কা বিজয় হওয়াটা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা যা ঘটা সুনিশ্চিত হয় তাকে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এই সুরতে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করাটা মাযাযী হবে এবং এটা وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ -এর অনুরূপ হলো।

৩. তৃতীয় জবাব হলো মূলত হুদায়বিয়ার সন্ধিই হলো বিজয়। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধিই মক্কা বিজয় ও অন্যান্য বিজয়ের কারণ হয়েছিল। মহানবী ﷺ -ও হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই فَتْحٌ مُبِيْنٌ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলেছেন।

كُرَاعُ الْغَمِيْمِ নামক স্থানে যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তেলাওয়াত করে শুনালেন, সে সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এটাও কি فَتْحٌ مُبِيْنٌ ? নবী করীম ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, এটাই فَتْحٌ مُبِيْنٌ ; এ সূরতেও মাযীর শব্দ দ্বারা এটা ব্যক্ত করা হাকীকী হবে।

قَوْلُهُ عَنْوَةً : এর অর্থ হলো জোর জবরদস্তি করে নিয়ে নেওয়া, তরবারির মাধ্যমে অর্জন করা। এভাবে মক্কা বিজয় হয়েছে বলে ইমাম আযম (র.) ও ইমাম মালেক (র.) অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, সন্ধির মাধ্যমে মক্কা বিজয় হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيِّنًا : مُبِيْنًا -এর তাফসীর بَيِّنًا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُبِيْن এটা اَبَانَ থেকে لَازِمْ অর্থে হয়েছে مُتَعَدِّىْ অর্থে নয়।

قَوْلُهُ فِى الْمُسْتَقْبِلِ : এটা বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কোনো কোনো নুসখায় فِىْ ব্যতীত রয়েছে; তখন اَلْمُسْتَقْبِلْ টা بِفَتْحٍ -এর সিফত হবে।

قَوْلُهُ بِجِهَادِكَ : এর সম্পর্ক فَتْحُ مَكَّةَ -এর সাথে। এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : فَتْحُ مَكَّةَ আল্লাহ তা'আলার কর্ম, কেননা اِنَّا فَتَحْنَا -এর মধ্যে فَتْح -এর সম্পর্ক বা নিসবত আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে করেছেন, আর مَغْفِرَتْ -এর সম্পর্ক রাসূল ﷺ -এর পবিত্র সত্তার সাথে করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মক্কা বিজয় যা আল্লাহ তা'আলার কর্ম এটা রাসূল ﷺ -এর مَغْفِرَتْ -এর ইল্লত, আর এটা ঠিক নয়। কেননা একজনের কর্ম অন্যের জন্য ইল্লত হতে পারে না। কাজেই মক্কা বিজয়ের উপর রাসূল ﷺ -এর مَغْفِرَتْ হওয়াটা সঠিক নয়। এ প্রশ্নের সমাধানকল্পেই মুফাসসির (র.) بِجِهَادِكَ বৃদ্ধি করেছেন।

উত্তর : উত্তরের সার হলো بِجِهَادِكَ -এর সম্পর্ক মক্কা বিজয়ের সাথে। অর্থ হলো– মক্কা বিজয় তো আল্লাহ দিয়েছেন; কিন্তু এর প্রকাশ্য কারণ ও মাধ্যম হলো আপনার জিহাদ করা। এ পদ্ধতিতে স্বয়ং তার ফে'ল তার মাগফেরাতের ইল্লত হলো, আল্লাহ তা'আলার নয়। আর এটা বৈধ। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ هُوَ مُؤَوَّلٌ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান। প্রশ্ন হলো নবীগণ মাসুম তথা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন, এরপর রাসূল ﷺ -এর মাগফেরাত তথা গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কি অর্থ হতে পারে?

উত্তর : উত্তর হলো এতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে–

১. প্রথমত এই সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুহাম্মাদী। যাতে করে তারা জিহাদে আগ্রহী হয়।

২. দ্বিতীয় ذُنُوبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ নীতির ভিত্তিতে خِلَافُ اَوْلٰى অতি উত্তমের বিপরীত। আর خِلَافُ اَوْلٰى বিষয়াবলি নবীর থেকে প্রকাশ পেতে পারে, আর এটা عِصْمَتُ اَنْبِيَاءٍ -এর বিপরীত নয়।

৩. তৃতীয়ত অথবা مَغْفِرَتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পর্দা। অর্থ হলো আপনার এবং আপনার থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার মাঝে পর্দা দ্বারা আবরণ দিয়ে দিব যাতে করে আপনার থেকে গুনাহ প্রকাশ না পেতে পারে।

قَوْلُهُ لِتَرْغَبَ اُمَّتُكَ : এটা জিহাদের উপর মাগফেরাত مُرَتَّبٌ হওয়ার ইল্লত। অর্থাৎ জিহাদের উপর মাগফেরাত مرتب হওয়ার কারণে আপনার উম্মত জিহাদের উপর আগ্রাহান্বিত হবে।

قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ : لِيَغْفِرَ -এর لَامٌ টি عِلَّتْ غَائِيَةٌ ইল্লতে بَاعِثَةٌ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজই مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ হতে পারে না, অর্থাৎ কোনো কিছু তাকে কোনো কাজে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে পারে না। অবশ্য উল্লিখিত لَامٌ টা عِلَّتْ غَائِيَّةٌ -এর জন্য হতে পারে। অর্থাৎ কাজের ফলাফলের জন্য। যখন বলে اِشْتَرَيْتُ الْقَلَمَ لِاَكْتُبَ [আমি লেখার জন্য কলম ক্রয় করেছি] লেখাটা ক্রয়ের غَايَتْ বা শেষ সীমা। কাজেই لَامٌ -এর مَدْخُوْلٌ অর্থাৎ মাগফেরাতটা مُسَبَّبٌ ; সবব নয়। سَبَبٌ হলো বিজয়, আর مُسَبَّبٌ হলো মাগফেরাত। مَغْفِرَتٌ সবব নয়, আর মক্কা বিজয় হলো مُسَبَّبٌ অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে মক্কা বিজয় ক্ষমা পাওয়ার কারণ; মাগফেরাত মক্কা বিজয়ের سَبَبٌ নয়।

قَوْلُهُ وَيُتِمَّ : এর আতফ হলো يَغْفِرُ -এর উপর এবং لَامٌ -এর অধীনে।

قَوْلُهُ يُثَبِّتَكَ : এটার বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো তিনি তো সূচনালগ্ন থেকেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন। এরপরও তাঁর সম্পর্কে وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا বলার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : জবাবের মূলকথা হলো হেদায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের উপর স্থায়িত্ব লাভ করা।

قَوْلُهُ ذَاعِزٍّ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন হলো عَزِيْزٌ এটা مَنْصُوْرٌ -এর সিফত ; نَصَرَ -এর নয়। এ আর এখানে نَصَرَ -এর সিফত হয়েছে।

উত্তর : উত্তরের সারহলো عَزِيْزٌ এটা فَعِيْلٌ -এর ওজনে । আর فَعِيْلٌ -এর ওযনটা নিসবত বর্ণনা করার জন্যও আসে। যেমন فَسَّقْتُهُ [আমি তাকে ফিসকের দিকে নিসবত করেছি বা আমি তাকে ফাসেক বলেছি।] এমনিভাবে এখানেও عَزِيْزٌ অর্থ হলে ذُوْعِزٍّ আর ذُوْعِزٍّ এটা مَنْصُوْرٌ -ই হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল, জিহাদের প্রেক্ষিতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ করা হয়েছে, অবশেষে তাদের ব্যর্থতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। প্রকৃত মুমিনদের গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে মুমিনদের ইখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগাত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি মহব্বত, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলির কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যে সুস্পষ্ট এবং মহান বিজয় দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন এ সূরা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ জানান। আর প্রিয়নবী ﷺ -এরপর উপস্থিত মুসলমানগণকে বিজয়ের সুসংবাদের জন্যে মোবারকবাদ দান করেন।

যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে মক্কার অদূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়, আল্লাহ তা'আলা এ শান্তি চুক্তিকেই 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সূরায় সে ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে. তাই এর নামকরণ করা হয়েছে– 'সূরাতুল ফাত্হ'। 'ফাত্হ' শব্দের অর্থই হলো বিজয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যদিও মক্কা বিজয় হয় এ ঘটনার দু'বছর পর, কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি হয়েছিল, তা-ই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছে। আর এজন্যেই আলোচ্য সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি যে মহব্বত এবং আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে প্রাণপণ জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছেন, তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথাও ঘোষণা করেছেন এ সূরায়।

উপরোল্লিখিত ৪টি আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সমাপন করার পর মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন "اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا" হতে "فَوْزًا عَظِيْمًا" পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাহাবীগণ যথেষ্ট মান-অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ হুদায়বিয়াতেই ইহরাম ভেঙ্গেছিলেন এবং কুরবানি করেছিলেন। তথাপি তাদের অন্তর্জ্বালা এতটুকু প্রশমিত হয়নি। সুতরাং আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে একত্র করে শুনিয়ে দিলেন– যাতে তারা মানসিক শান্তি লাভ করল– তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ মুছে গেল।

হযরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর বাণী– "وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ" নাজিল হলো তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। তারা কটুক্তি করে বলতে শুরু করল, যে লোক তার নিজের এবং তার সাহাবীদের ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে, তার কোনো হদীস দিতে পারে না, আমরা কিভাবে তার অনুসরণ করতে পারি? এ সময় নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়– اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا الخ

–[ফাতহুল কাদীর, কুরতবী]

হযরত আতা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন আয়াতে কারীমা– "وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ" [হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন! আমি জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচরণ করা হবে।] নাজিল হওয়ার পর ইহুদিরা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, যে নিজের সম্পর্কে পর্যন্ত কিছু জানে না, আমরা কিভাবে তার আনুগত্য করতে পারি? এতে নবী করীম ﷺ যারপর নাই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন– اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা হুদায়বিয়ার কাহিনী : আলোচ্য আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা হলো– 'সোলহে হুদায়বিয়াহ' বা হুদায়বিয়ার সন্ধি। সূরার আলোচনার প্রারম্ভে উক্ত ঘটনার মোটামুটি আলোচনা করেছি। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মর্মার্থ অনুধানার্থে পুনরায় বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা হলো।

নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের পর দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর মক্কার মুশরিকদের বিরোধিতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সাহাবীরা মক্কায় সফর করতে পারেননি। ফলে বায়তুল্লাহর জিয়ারতে তাঁরা ধন্য হতে পারেননি প্রায় অর্ধ যুগ পর্যন্ত। মনে বড় ব্যাকুলতা, মুসলমান হয়েও আল্লাহর গৃহের জিয়ারত নসিব হচ্ছে না।

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রিয়নবী ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে "সাঈ" করছেন, অর্থাৎ তিনি ওমরাহ পালন করছেন। অবশ্য স্বপ্নে দিন তারিখের কোনো উল্লেখ ছিল না। এর কিছুদিন পরই তিনি চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। মক্কাবাসী এ সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। যদিও পৃথিবীর কোনো মানুষকে তারা হজ ও ওমরাহ পালনে বাধা দিত না এবং এটাও তারা স্বীকার করত যে, হজ ও ওমরার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের যে বিদ্বেষ ছিল, তার কারণেই তারা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির রজব মাস মোতাবেক মার্চ, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে এ সফর করেন। তখন মুশরিকদের হাতেই ছিল মক্কা শরীফের নিয়ন্ত্রণ।

ইমাম আহমদ বুখারী, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবূ দাউদ এবং নাসায়ী (র.) প্রমুখ ইমাম জুহরী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হুদায়বিয়া রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল সম্পন্ন করেছেন এবং চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করেছেন, এরপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়েছেন, উম্মে মানীয় আসমা বিনতে আমর, উম্মে আম্মারা আশহালীয়া প্রমুখও সঙ্গে ছিলেন। মুহাজির ও আনসারগণ এবং অন্যান্য আরব গোত্রেরও কিছু লোক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি ওমরা করছেন, সেজন্যে মুসলমানদের বিজয় সম্পর্কে কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিল না, তবে সাহাবায়ে কেরামের নিকট তরবারি ব্যতীত অন্যকোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না আর তা-ও খাপে ভরা ছিল। হুজুর ﷺ কুরবানির জন্যে কিছু পশু পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরিতে সোমবার দিন তিনি মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, দ্বি-প্রহরে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে পৌছে জোহরের নামাজ আদায় করেন। কুরবানির জন্যে সত্তরটি উট নির্দিষ্ট ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে দু'টি অশ্বও ছিল। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হযরত বশির ইবনে সুফিয়ান (রা.) নামক সাহাবীকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশরকে বিশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়ে অগ্রবর্তী দল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এ দলের অধিনায়ক ছিলেন সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালী (রা.)। হুজুর ﷺ এরপর দু' রাকাআত নামাজ আদায় করেন এবং 'যুলহোলায়ফার' মসজিদের সম্মুখ থেকে তিনি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেন, তখন তিনি ওমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যেন কারো মনে এ আশঙ্কা না থাকে যে, তিনি যুদ্ধের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করছেন; বরং সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, কাবা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি এ সফর করছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পাঠ করেন, তাঁর ইহরাম দেখে হযরত উম্মে সালামা (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও ইহরাম বাঁধেন। অবশ্য কিছু সংখ্য সাহাবায়ে কেরাম 'জুহফা' নামক স্থানে ইহরাম বেঁধেছেন। হুজুর ﷺ 'বয়দা' নামক স্থান দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে বনূ বকর, মোজায়না এবং জুহায়না নামক গোত্রের আবাসস্থল ছিল। তিনি তাদেরকেও ওমরার সফরে রওয়ানা হওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু তারা নিজেদের আর্থিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল এবং একে অন্যকে তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে বলছিলেন, যারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহনের দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ তাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ আর কখনো ফিরে আসবেন না, এরা বড় অসহায়, তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও নেই।

রাসূলে কারীম ﷺ যখন 'জুহফা' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করার আদেশ প্রদান করেন, এরপর তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হতে চাই, আর তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিস রেখে যাব– ১. আল্লাহর কিতা। ২. আল্লাহর নবীর আদর্শ, যদি তোমরা এ দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাক, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

এদিকে মক্কার কাফেররা যখন এ সংবাদ পেল যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ রওয়ানা হয়েছেন, তখন তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করল এবং বলল, "মুহাম্মদ ﷺ ওমরার জন্যে সৈন্যবাহিনীসহ আমাদের নিকট আসতে চান, আরবের লোকেরা শুনবে, মুহাম্মদ ﷺ এক প্রকার জবরদস্তি আমাদের এখানে এসে গেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধাবস্থা রয়েছে, এতে সকলেই আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে, আমরা তা হতে দেব না।" এরপর দু'শ অশ্বারোহীকে তারা হুজুর ﷺ -এর মোকাবিলার জন্যে "কোরাউল গমীম" নামক স্থানে প্রেরণ করল, এদের অধিনায়ক ছিল খালেদ ইবনে ওয়ালিদ [তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি], খালেদ আরবের আরো কয়েকটি গোত্রের লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয় এবং বনূ সাকীফ গোত্রের লোকেরাও তার সঙ্গে যোগ দেয়। এভাবে সকলে 'বালদাহ' নামক স্থানে পৌছে অবস্থান নেয়, তারা একত্রিত হয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করে, আর এ-ও স্থির করে যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে তারা দশ ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর মোতায়েন করে, তাদের একজন আরেকজনকে উচ্চৈঃস্বরে বলতো, "মুহাম্মদ ﷺ এখন অমুক কাজ করছেন", আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা বলতো, এভাবে কুরাইশরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশর ইবনে সুফিয়ানকে গোয়েন্দা কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেন, "আপনার রওয়ানা হওয়ার কথা কুরাইশরা জেনে ফেলেছে, তারা এখন 'জীতুওয়া' নামক স্থানে অবস্থান করছে, আর সকলে শপথ করে এ সংকল্প করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না, আর এ উদ্দেশ্যেই খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে পূর্বেই 'কোরাউল গামীমে' প্রেরণ করেছে। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ "অত্যন্ত আক্ষেপ হয় কুরাইশের অবস্থা দেখে, যুদ্ধ যেন তাদেরকে পেয়ে বসেছে, আমাকে যদি আরবদের ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার বাধা না দিত, তবে তাদের কী ক্ষতি হতো! যদি আরবরা আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতো, তবে তাদের উদ্দেশ্যই সফল হতো, আর যদি

আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করেন, তবে তারা আমাদের দলে প্রবেশ করতো এবং আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতো। যদি তারা এমন না-ও করতো, অর্থাৎ মুসলমানদের দলে প্রবেশ না করতো, তবে শক্তি থাকলে তারা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, কুরাইশদের ধারণা কি? আল্লাহর শপথ! আমি দীন ইসলামের জন্যে তাদের সাথে সর্বদা জিহাদ করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।" এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন এবং ইরশাদ করলেনঃ হে মুসলমানগণ! আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের কী অভিমত? আমি কি এদের সন্তান-সন্ততির দিকে দৃষ্টিপাত করবো এবং তাদেরকে ধরে ফেলবো? অথবা নীরব হয়ে বসে থাকবো, যদি তারা আমাদের মোকাবিলায় আসে, তবে কিছু লোকের জীবনাবসান ঘটবে, অর্থাৎ তাদের একদল নিহত হবে, অথবা তোমাদের যদি এ মত হয় যে, আমরা কাবা শরীফের জিয়ারতের জন্যেই এসেছি, যদি কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সঙ্গে লড়াই করবো। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কাবা শরীফের উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়েছেন, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার অভিপ্রেত ছিল না, অতএব আমরা কাবা শরীফের দিকে যেতে থাকি, যদি পথিমধ্যে কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এ মত সমর্থন করলেন।

নবী করীম ﷺ প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীসহ ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, মক্কার লোকেরা তাঁদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করবে। কাজেই তিনি সাধারণ পরিচিত পথ পরিহার করত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে মক্কার অদূরে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। তথায় তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়ল। তিনি সেখানেই সাহাবায়ে কেরামসহ অবস্থান নিলেন।

কুরাইশদের পক্ষ হতে বিভিন্ন গোত্রের কতিপয় নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট কথাবার্তা বলার জন্য আসল। তাদের মধ্যে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকাহ খোজায়ী, হুলাইস ইবনে আলকামাহ ও ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী অন্যতম। মুহাম্মদ ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করানোই ছিল তাদেরকে পাঠানোর লক্ষ্য। নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলে দিলেন যে, আমরা যুদ্ধবিগ্রহ করার জন্য আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দূতগণ কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সদুদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের দাবিতে অটল রইল– তারা কিছুতেই মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে দেবে না, মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

এবার নবী করীম ﷺ তাঁর পক্ষ হতে হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কার নেতাদের নিকট পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ যে শুধু বায়তুল্লাহর জিয়ারত তথা ওমরা পালন করার জন্যই এসেছেন তা মক্কার মুশরিক নেতাদেরকে জানিয়ে দেওয়া।

এ দিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মক্কার মুশরিকরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে। এটা শুনে মুসলমানগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। নবী করীম ﷺ সমস্ত সাহাবীগণকে একত্র করে বিষয়টি জানালেন এবং তাদের নিকট হতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে সাহাবীগণ ওয়াদা করলেন, জীবনের বিনিময়ে হলেও তাঁরা ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। একেই বলা হয় 'বাইয়াতে রিদওয়ান'।

এ দিকে মুশরিকরা দু' দু' বার মুসলমানদের উপর গোপনে অতর্কিত হামলা করে। একবার চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের এক দল মুশরিক রাত্রিবেলায় মুসলমানদের তাঁবুর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দেন। পুনরায় আশিজন মুশরিক একদিন ভোরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়; কিন্তু তারাও মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তীতে সংবাদ আসল যে, হযরত ওসমান (রা.) জীবিত আছেন এবং মুশরিকরা তাঁকে ছেড়ে দিল।

পরিশেষে কুরাইশরা সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির ইচ্ছায় নবী করীম ﷺ -এর নিকট পাঠাল। সুহাইল ইবনে আমর নবী করীম ﷺ -এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) সন্ধির চুক্তিপত্র লেখা আরম্ভ করলেন। প্রথমেই লেখা হলো– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কিন্তু সুহাইল এতে আপত্তি জানাল। তার কথানুযায়ী লেখা হলো– بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ তারপর হযরত আলী (রা.) লিখলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর এতেও প্রতিবাদ জানাল। সে বলল, আমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহর রাসূলই মানব তা হলে তার সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব কিসের? বরং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র' পরিবর্তে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখতে হবে। নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ -এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হযরত উসাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.) ও সাদ

ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর ন্যায় রাসূল প্রেমিক সাহাবীগণও এতে প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এটা যেমন সত্য আমি যে আব্দুল্লাহর পুত্র তাও তেমন সত্য। অতঃপর তিনি নিজেই মুহাম্মাদু রাসূলুল্লাহ মুছে তদস্থলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া এবং লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন–

هٰذَا مَا قَضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَهْلَهَا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشَرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ -

অর্থাৎ, এ চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সুহাইল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করেছেন। এ সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ :

১. দশ বছর যাবৎ এ চুক্তি বলবৎ থাকবে। এর মধ্যে কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে না, একের জীবন ও সম্পদ অপরের নিকট নিরাপত্তা লাভ করবে।
২. মক্কা হতে কেউ পালিয়ে মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে।
৩. মদীনা হতে পালিয়ে কেউ মক্কা গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৪. মুসলমানগণ এবারের মতো ওমরা পালন না করে ফিরে যাবে। আগামী বছর তারা ওমরা পালনে আসবে। আর তখন শুধু তিন দিনের জন্য তারা মক্কায় অবস্থান করবে। এ সময় মক্কার লোকজন বাইরে অবস্থান করবে।
৫. আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহ মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্য হতে যে-কোনো দলের সাথে জোটবদ্ধ হতে পারবে।

শান্তির প্রত্যাশায় এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ চাপিয়ে দেওয়া উক্ত শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন। কিন্তু সাহাবীগণ এতে অতিশয় মর্মাহত হলেন। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম ﷺ যখন সাহাবীদেরকে 'যুলহুলাইফা'তেই ইহরাম ভেঙ্গে ফেলার এবং হাদীর জন্তুর কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন তখন মনের ক্ষোভে সাহাবীগণ হুজুরের ﷺ কথায় সাড়া দিলেন না। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শে নবী করীম ﷺ নিজের ইহরাম ভেঙ্গে ফেললেন। তা দেখে সাহাবীগণও নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণ করলেন।

অতঃপর সাহাবীগণসহ মহানবী ﷺ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাত্হ নাজিল করত বিস্বাদ বেদনায় মর্মাহত মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং এ সন্ধির গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

قَوْلُهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ...... وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ بِهِ نَصْرًا عَزِيْزًا : আয়াতের বিশদ তাফসীর : হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর মন্তব্য পেশ করত আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন– হে নবী! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এক সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। মক্কা বিজয় ও অপরাপর জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার বিজয়ের ফয়সালা করে রেখেছি। যাতে এ জিহাদের অসিলায় আমি আপনার পূর্বাপর ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিতে পারি। আপনাকে বিজয়ের নিয়ামতে ধন্য করতে পারি এবং সহজ-সঠিক পথ তথা দীন ইসলামের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি।

হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরাজয় ও লাঞ্ছনাকর সন্ধি বলে প্রতীয়মান হয়। সন্ধির শর্তাবলির দিকে দৃষ্টি দিলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় এর সবটাই কাফের-মুশরিকদের পক্ষে গিয়েছে। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) ও অপরাপর বহু সাহাবী সন্ধির শর্তাবলির বাহ্যিক দিক দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছেন। তাদের যুক্তি হলো এতটা আত্মসমর্পিত হয়ে সন্ধি করার কি প্রয়োজন ছিল? তরবারীর মাধ্যমে ফয়সালা করা হয়নি কেন? কিন্তু নবী করীম ﷺ পয়গাম্বরী দূরদৃষ্টি সন্ধির সেই শুভ ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যা অন্যদের চোখে ধরা পড়েনি। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর অন্তরকে বিপদাপদ সহ্য করার উপযোগী ও সকল প্রকার বিরূপ প্রতিকূল পরিবেশকে মেনে নেওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার উপর অসম্ভব রকম তাওয়াক্কুলপূর্ণ অবস্থা এবং দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা নেহায়েত অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকেও স্বাগতম জানানোর দুর্লভ মন-মানসিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন।

এজন্যই তো সেদিন তিনি বলেছিলেন, কুরাইশরা আজ শান্তির বিনিময়ে আমার নিকট যা চাইবে আমি তা তাদেরকে দেব। সুতরাং শান্তির বিনিময়ে সেদিন মুশরিকরা যত অবাঞ্ছিত শর্তই জুড়ে দিয়েছে নবী করীম ﷺ পূর্ণ ধৈর্যের সাথে তা বরণ করে নিয়েছেন এবং সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটাকে "فَتْحٌ مُّبِيْنٌ" তথা **'সুস্পষ্ট বিজয়'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি **বিজয়? হুজুর** ﷺ জবাব দিলেন. অবশ্যই এটা আমাদের জন্য এক [অবশ্যম্ভাবী] মহাবিজয়।

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" আয়াতে فَتْحٌ مُّبِيْنٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : উক্ত আয়াতে فَتْحٌ مُّبِيْنٌ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যথা–

১. উক্ত বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।
২. হুদায়বিয়ার সন্ধি।
৩. অন্যান্য মতবাদের উপর ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বিজয়।
৪. এটা দ্বারা অন্যান্য জাতির উপর মুসলমানদের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।
৫. হুদায়বিয়ার পরবর্তী সকল বিজয়।
৬. এটা দ্বারা রোম বিজয় উদ্দেশ্য।
৭. এটা দ্বারা খায়বর বিজয় উদ্দেশ্য।

ইমাম রাযী (র.)-সহ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা সর্বসম্মতভাবে অত্র আয়াতখানা হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে হুদায়বিয়ার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আর বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় বলা যদিও একটু বেমানান মনে হয় তথাপি গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটাকে বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

হযরত মাজমা ইবনে হারেসিয়া আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হুদায়বিয়া থেকে 'কোরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে দেখি, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। অনেক লোক তাঁর চার পার্শ্বে সমবেত, তিনি তখন এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন। একজন সাহাবী আরজ করলেন, এটিই কি বিজয়? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ তা'আলার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটিই হলো সুস্পষ্ট বিজয়।

হযরত আবূ বকর (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলামে হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয় হয়নি। আল্লামা বগভী (র.) হযরত বারা (রা.)-এর সূত্রেও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি কিরূপে সুস্পষ্ট বিজয় হতে পারে? : অত্র সূরার 'ঐতিহাসিক পটভূমি' এর আলোচনায় এ ব্যাপারে আমরা বিশদ আলোকপাত করেছি। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হলো–

হুদায়বিয়ায় "জিহাদের বায়'আত" গ্রহণ এবং মুশরিকদের সাথে যতসামান্য বুঝা-পড়া ও সাহাবীগণের ঐক্য রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের আনুগত্য ও সাহসী ভূমিকা প্রদর্শনে মুশরিক কুরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির জন্য ঝুঁকে পড়েছিল। নবী করীম ﷺ -এর নিশ্চিন্ত ও অবিচল মনোভাব, দশ বৎসরের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি নির্বিঘ্নে মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়– যা মহাবিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল। এ সন্ধির মাধ্যমেই দুশমনদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নবী করীম ﷺ -এর মহত্ত্বের প্রভাব তাদের অন্তরে দাগ কেটেছিল– যার ফলশ্রুতিতে দুই বৎসরের মধ্যে মক্কা মোয়াজ্জমা বিজয় হয়েছিল।

সুতরাং মুসলমান ও অমুসলমানদের পারস্পরিক মেলামেশা ও অকপট সংমিশ্রণের ফলে আপনা আপনি ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সময় এতবেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে যা পূর্বে দেখা যায়নি। এটা ছিল অন্তরের বিজয়– আর প্রকৃত বিজয় তো এটাই।

মক্কা মোয়াজ্জমা সদা-সর্বদার জন্য দারুল ইসলাম হয়ে গেছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীগণের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় হাজার অথচ কেবল দুই বছরের মাথায় মক্কা বিজয়ের সময় তাঁদের সংখ্যা দশ হাজারে দাঁড়াল। অপরদিকে খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র মদীনা আরো সুদৃঢ় হয়।

মোটকথা, উক্ত সন্ধি এভাবে সমস্ত বিজয়ের বুনিয়াদ ও সোনালী অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। আর এ ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জগতের বরকতময় বিজয়ের যেই দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে– এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" আয়াতের তাফসীরে উক্ত বিজয়কে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায়, 'ফাত্হ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো বন্ধ জিনিসকে উন্মুক্ত করা বা কোনো বাধাকে অপসারিত করা, কাফেরদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌছানোর পথে যে বাধা ছিল, তা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অপসারিত হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'ফাত্হ' -এর অর্থ হলো, চূড়ান্ত ফয়সালা করা। এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছি যে, [হে রাসূল!] আপনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন।

হযরত জাবের (রা.) বলেছেন– আমরা হুদায়বিয়ার বিজয় ব্যতীত মক্কা বিজয়ের কল্পনাই করতাম না।

হযরত ফাররা (রা.) বলেছেন- তোমরা মক্কা বিজয়কেই চূড়ান্ত বিজয় ধরে নিয়েছ। বাস্তবিকই মক্কা বিজয় একটি বিজয়ই ছিল, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রেদওয়ানকে বিজয় মনে করি।

ইমাম শা'বী (র.) লিখেছেন, এটি হুদায়বিয়ার সন্ধিই ছিল, যা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পূর্বাপর সকল ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়েছে। এমনিভাবে এ হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণেই খায়বর বিজয় সম্ভব হয়েছে, এরপর মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম জুহরী (র.) বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয় হয়নি। কেননা এ সন্ধির কারণেই মুশরিকরা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে। মুসলমানদের সাথে কথা বলার এবং ইসলামি আচরণ লক্ষ্য করার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে তিন বছরের মধ্যে বহু মুশরিক মুসলমান হয়েছে।

তাফসীরকার যাহ্হাক (র.) বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি যুদ্ধ ব্যতীতই সুস্পষ্ট বিজয়ে পরিণত হয়েছে। মূলত এ সন্ধিই বিজয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সপ্তম হিজরিতে মুসলমানগণকে আল্লাহ তা'আলা খায়বরের বিজয় দান করেন, আর হুদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক সপ্তম হিজরিতে জিলক্বদ মাসে হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওমরা করেন এবং নিরাপদে, নির্বিঘ্নে মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে, তাই অষ্টম হিজরির রমজান মাসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দশ হাজার স.হাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাভিমুখে অভিযান করেন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে এ অভিযানে বিজয় লাভের সৌভাগ্য প্রদান করেন।

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে চারটি মহা নিয়ামত দানের উল্লেখ করেছেন-

১. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, তাই তাঁর এ উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সারা জীবনে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে হয় তবে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণ নিষ্পাপ, নিষ্কলংক, কিন্তু মানুষ হিসেবে যদি কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও থাকে, তার জন্যে আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই ক্ষমা ঘোষণা করলেন যে, আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হলো, দুনিয়া বা আখিরাতে কখনো এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

হাদীস শরীফে রয়েছে, কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহ অবস্থায় যখন মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর নিকট সুপারিশের জন্যে হাজির হবে, তখন তিনি তাঁর দ্বারা যে ভুল হয়েছিল, তা স্মরণ করত আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করতে অপারগতা পেশ করবেন। তিনি বলবেন- لَسْتُ لَهَا অর্থাৎ "আজকের এ কঠিন দিনে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য আমি নই"। এমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসূলগণের নিকটও মানুষ যাবে, তাঁরাও একই জবাব দেবেন। অবশেষে মানুষ এ আবেদন নিয়ে হাজির হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট, তিনি প্রথমত সুপারিশ করার ব্যাপারে নিজের অপারগতা পেশ করবেন, এরপর পরামর্শ দেবেন যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট হাজির হও, তিনি এমন মহান ব্যক্তি, যাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে। এর বিবরণ বুখারী শরীফে এভাবে রয়েছে-

"وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ" -

"অর্থাৎ বরং তোমরা সকলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর তা'আলার এমন বান্দা, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।" -[বুখারী শরীফ, পৃ. ১১০৮]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ পরামর্শের তাৎপর্য হলো, কিয়ামতের এ কঠিন দিনে শাফাআত করার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কেননা তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁর আগের এবং পরের সমস্ত ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিষয়ে তাঁর জবাবদিহী করার কিছুই নেই। তাই তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমগ্র মানবজাতির জন্যে আজ সুপারিশ করতে পারবেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَ اَوَّلُ مُشَفَّعٍ

"[কিয়ামতের দিন] আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করবো এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে।]"

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন প্রিয়নবী ﷺ -ই হবেন সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়েরই সুসংবাদ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে "সীরাতুল মুস্তাকীম" বা সরল-সঠিক পথ দান করবেন। এতে কোনো

অস্পষ্টতা নেই, ভুল-ভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। যে পথে চললে মানুষ জীবনকে সার্থক সুন্দর এবং সফলকাম করতে পারে, সে জীবন বিধানই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করবেন।

'আর [হে রাসূল!] আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পূর্ণ শক্তিকে সাহায্য করতে চান'। ফলে আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত হবে এবং দলে দলে লোক আপনার প্রতি ঈমান আনবে, আর এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

অর্থাৎ "যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয় আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, এখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী।"

বস্তুত পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল, প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগে অর্থাৎ বিদায় হজের মুহূর্তে তিনি এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেছিলেন, অথচ যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেন, তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। এর মাত্র আট বছর পর দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তিনি মক্কা বিজয় করেছিলেন, আর মাত্র দু'বছর পর ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন। অতএব দশ বছরের ব্যবধানে অতি অল্প সংখ্যক থেকে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছিলেন, যা সম্ভব হয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের বরকতে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই খায়বর এবং মক্কা বিজয় হলো, এরপর হুনাইন এবং তায়েফও মুসলমানদের করতলগত হয়। পরবর্তীতে হেজাজ, নাজদ, ইয়েমেন এক কথায় সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এর পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তদানীন্তন পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পারস্য রাজ, রোমক সম্রাট এবং মিশরের রাজা মোকাওকাসসহ অনেকের কাছে প্রিয়নবী ﷺ -এর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রিয়নবী ﷺ -এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, মিশরসহ অন্যান্য বহু দেশ মুসলমানদের আয়ত্তাধীন হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের এক বিরাট অংশে ইসলামি হুকুমত কায়েম করার তাওফীক দান করেন। এটিও ছিল আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পরিপূর্ণ করার, তাঁর সাহায্য করার এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

বিজয় কিভাবে মাগফিরাতের সবব হতে পারে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لِيَغْفِرَ اللّٰهُ الخ অর্থাৎ বিজয় এ জন্য দান করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন। এখানে বিজয়কে মাগফিরাতের সবব বা কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিজয় কিভাবে মাগরিফাতের সবব হতে পারে। এর জবাবে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটিই সহজ ও সঠিক।

কোনো কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেছেন এর সহজ ব্যাখ্যা হলো, বিজয় হলো মানুষের ইসলাম গ্রহণের সবব। আর এটা ছওয়াবের আধিক্য এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ [সবব]। এদিকে এটা হলো মাগফিরাতের কারণ। আর কারণের কারণও কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে বিজয় মাগফিরাতের সবব বা কারণ হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

১. এর মাধ্যমে লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, নবী করীম ﷺ -এর কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়া হলো– তিনি সম্পূর্ণ মাসুম-নিষ্পাপ।

২. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর হজ করা সম্ভব হয়েছে। আর হজ হলো মাগফিরাতের সবব। হজ করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ হজকে তুমি কবুল করে নাও, এ প্রচেষ্টাকে তুমি গ্রহণ করে নাও এবং এর দ্বারা গুনাহ মাফ করে দাও।

৩. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহকে মূর্তিপূজার অপবিত্রতা হতে হেফাজত করা হয়েছে আর তা মানুষের গুনাহ হতে পবিত্র হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তো কোনো গুনাহ নেই, সুতরাং তাঁর গুনাহ মাফের কি অর্থ হতে পারে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, নবী করীম ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর কোনো গুনাহ ছিল না। সুতরাং তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে?

মুফাসসিরগণ এর একাধিক জবাব দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. এ স্থলে কোনো ব্যাপারে উত্তম পন্থা পরিহার করাকে গুনাহ বলা হয়েছে।

২. এখানে গুনাহ দ্বারা মুমিনদের গুনাহ উদ্দেশ্য।

৩. গুনাহের দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা ক্ষেত্রবিশেষে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) হতে সগীরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। "حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ" অর্থাৎ সাধারণ সৎলোকদের পুণ্য আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পাপ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন– পূর্বের গুনাহ দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বিচ্যুতি এবং পরবর্তী গুনাহ দ্বারা উম্মতের গুনাহ উদ্দেশ্য।

৫. অথবা এখানে মাগফিরাতের অর্থ হলো নবী করীম ﷺ -এর নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া।

৬. এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, مَغْفِرَتْ -এর অর্থ হলো পর্দা [অন্তরায়] অর্থাৎ গুনাহ ও বান্দার মাঝখানে অন্তরায় [বাধা] সৃষ্টি করে দেওয়া। অথবা, গুনাহ ও শাস্তির মধ্যে পর্দা [অন্তরায়] সৃষ্টি করে দেওয়া। প্রথমোক্ত অর্থটি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) -এর জন্য প্রযোজ্য এবং শেষোক্ত অর্থটি ঈমানদারগণ ও অলিগণের জন্য প্রযোজ্য। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

উল্লিখিত আয়াত নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নাজিল হয়েছে। আর মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ম হিজরিতে সুতরাং মাজীর সীগাহ্ ব্যবহার করত কিভাবে এ বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হতে পারে? :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" "[হে নবী!] আমি নিশ্চয় আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

কেউ কেউ বলেছেন– এখানে "فَتْحٌ مُّبِيْنٌ" -এর দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ আয়াতখানা নাজিল হয়েছে নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপনান্তে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের পথে ষষ্ঠ হিজরির জিলকাদ মাসে। আর মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজরির রমজান মাসে। সুতরাং যদি আয়াতে উল্লিখিত বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হয় তা হলে "فَتَحْنَا" মাজীর সীগাহ ব্যবহার করা হলো কিভাবে?

মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন–

১. এ স্থলে مَاضِىْ -এর সীগাহ مُضَارِعْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এখানে فَتَحْنَا [আমি বিজয় দান করেছি] এর অর্থ হলো, আমি আদিকালে আপনার জন্য মক্কা বিজয়ের ফয়সালা করে রেখেছি। (قَضَيْنَا لَكَ بِفَتْحِ مَكَّةَ يَوْمَ الْاَزَلِ)

৩. অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য ভবিষ্যতের বিষয়াবলিকে অতীতকালজ্ঞাপক সীগাহর মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। এ বিষয়টিও তন্মধ্যে একটি। অর্থাৎ আপনি যে মক্কা বিজয় লাভ করবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেন তা আপনার জন্য বিজয় হয়ে গিয়েছে।

মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে নাকি সন্ধির মাধ্যমে? : পবিত্র মক্কা নগরী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে না সন্ধির মাধ্যমে এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষী ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিচারে–

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও একদল মনীষীর মতে মক্কা মোয়াজ্জমাহ যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজিত হয়েছে। তাদের দলিল–

১. আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন– "اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি]। আর فَتْحٌ বা বিজয় শব্দের ব্যবহার তখনই প্রযোজ্য হয় যখন যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় লাভ হয়ে থাকে।

২. নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যারাই বাধা দিতে আসবে তাদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং মক্কার নিম্ন এলাকায় প্রবেশকালে বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি বহু মুশরিককে হত্যা করেছেন।

৩. ইতিহাস হতে জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের সময় ইকরিমা ইবনে আবী জাহলের নেতৃত্বে কয়েকজন মুশরিক যুবক মুসলমানদেরকে বাধা দান করেছে এবং অসতর্কভাবে ঘোরাফেরাকারী দুজন মুসলমানকে তারা হত্যাও করেছিল।

৪. ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের সাথে নবী করীম ﷺ -এর কোনো প্রকার সন্ধি ও সমঝোতা হয়েছিল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও একদল মনীষীর মতে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় হয়নি; বরং সন্ধি ও সমঝোতার মাধ্যমে তা মুসলমানদের দখলে এসেছে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ الخ আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মুশরিকদের হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে আক্রমণ করতে পারনি।

২. মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের বন্দী করা হয়নি।

৩. মক্কার মুশরিকদের সম্পদ গনিমত হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

উপরোল্লিখিত মতদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় : উপরিউক্ত পরস্পর বিরোধী মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, মক্কার আংশিক যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় হয়েছে এবং অপরাংশ সন্ধির মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে। সুতরাং 'বুআইতীত' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত খালেদ (রা.) মক্কার নিম্নভাগ যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক দখল করেছেন। অপরদিকে মক্কার উপরিভাগ সন্ধির মাধ্যমে জয় করে নিয়েছেন। আর এ সময় নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে উপরিউক্ত বক্তব্যকেই অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হয়।

قَوْلُهُ وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ; এর দুটি অর্থ হতে পারে–

১. আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য দান করেন।

২. অর্থের দৃষ্টিতে বাক্যটির তাৎপর্য হলো, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে এমন সাহায্য করলেন, যার দরুন তাঁর দুশমনরা অক্ষম ও দুর্বল হয়ে যাবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দৃষ্টান্তহীন সাহায্য দান করেন। এ অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হলো, যে জিনিস বাহ্যত একটি সন্ধিচুক্তি মাত্র– আর তাও যথেষ্ট নতি স্বীকার করে গ্রহণ করা একটি সন্ধিপত্র, তাই এক সময় এটি চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হবে। কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা দানের জন্য এমন আশ্চর্যজনক পন্থা খুব কম লোকই গ্রহণ করেছে।

একটি দ্বন্দ্বের নিরসন : এখানে একটি প্রশ্ন হলো, عَزِيْز শব্দটি مَنْصُوْر -এর সিফাত হয়ে থাকে, এটা نَصْر -এর وَصْف হয় না। কিন্তু এখানে কিভাবে نَصْرًا عَزِيزًا বলা হলো?

এর জবাবে এই যে, فَعِيْل -এর وَزْن নিসবত [সম্পর্ক] বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং نَصْرًا عَزِيزًا -এর অর্থ হলো, এমন সাহায্য যা عِزَّتْ -এর দিকে সম্পর্কিত হবে ذِلَّتْ -এর দিকে সম্পর্কিত হবে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ .... اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ : ইরশাদ হচ্ছে– সেই আল্লাহ ঈমানদারগণের অন্তরসমূহে প্রশান্তি নাজিল করেছেন। যাতে তাদের পূর্বেকার ঈমানের সাথে আরো ঈমান সংযুক্ত হয়। তাদের ঈমানী শক্তি বেড়ে যায়।

سَكِيْنَةٌ -এর অর্থ এবং হুদায়বিয়ায় ঈমানদারগণের উপর এর প্রভাব : আলোচ্য আয়াতে سَكِيْنَةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটি প্রভাব রয়েছে–

১. জেহাদের বায়'আত গ্রহণ করার সময় জিহাদের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। পরবর্তী আয়াত– "فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ" -এর মধ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কাফেরদের অনর্থক জিদ সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ অসম চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার পরও সাহাবীগণের শান্ত থাকা। পরবর্তী আয়াত– "فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ" -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যেহেতু প্রথমত জিহাদের জন্য অগ্রসর হওয়া এবং পরে জিহাদ হতে বিরত থাকা নবী করীম ﷺ -এর সন্তুষ্টিতেই হয়েছে– সেহেতু এতে নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। আর তাঁর প্রতিটি আনুগত্যেই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, কাজেই এতেও সাহাবীগণের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের এমন কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তিনি মুসলমানদের অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি নাজিল করেন, ফলে প্রিয়নবী ﷺ -এর নির্দেশ পালনে তাঁরা সম্পূর্ণ অবিচল থাকেন এবং এভাবে আল্লাহর রাহে জান-মালের কুরবানি পেশ করার সুযোগ লাভ করেন।

যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো কাফেরদের অনুকূলে মনে হচ্ছিল, মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল যে, এটি দুর্বলের সন্ধি, কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ -এর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল এসবের পরিণামের প্রতি, তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সবর অবলম্বনের এবং সংযত থাকার উপদেশ দিলেন। তখন মুসলমানদের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনার ভাব সৃষ্টি হলো। প্রিয়নবী ﷺ -এর কথায় হযরত ওমর (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের উত্তেজনা প্রশমিত হলো, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি তাদের এ নজিরবিহীন আনুগত্য তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হলো। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুকরণের বরকতে মুমিনের কলবে নূর সৃষ্টি হয়, তার কলব নূরানী হয়, ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবায়ে কেরামের মন আহত ছিল,

তখন এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হলো, আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করলেন. আর হুজুর ﷺ তখন বললেন, এ পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমার নিকট এ আয়াতসমূহ অধিক প্রিয়।

প্রিয়নবী ﷺ এ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এটিই কি বিজয়? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় إِنَّا فَتَحْنَا থেকে فَوْزًا عَظِيْمًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে سَكِيْنَةٌ শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের কারণে মানব মনে এক প্রকার শান্তি এবং সান্ত্বনা আসে, সে সান্ত্বনাকেই এ আয়াতে سَكِيْنَةٌ বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা এবং একীন পূর্বেই ছিল, এ ঘটনার কারণে তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। আর এ ঘটনায় এমন নতুন কিছু বিষয় যোগ হয়েছে, যা ঈমান ও একীনের মাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকারক যাহ্হাক (র.)।

ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ অর্থাৎ যেন তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান যুক্ত হয়, বৃদ্ধি পায়। মুফাস্সিরগণ এর তাফসীর করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا "بِشَرَائِعِ الدِّيْنِ مَعَ إِيْمَانِهِمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ" অর্থাৎ যাতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর যে ঈমান রয়েছে তার সাথে দীনের বিধি-বিধানের ঈমান যুক্ত হয়ে যায়। ইসলামি বিধানাবলি যেহেতু পর্যায়ক্রমে ক্রমশ নাজিল হয়েছে, সেহেতু নতুন আহকামের প্রতি ঈমান আনয়নের দ্বারা ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে। সুতরাং مُؤْمَنٌ بِهٖ তথা যার উপরে ঈমান গ্রহণ করা হয় তার হিসেবে ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে আশায়েরাও স্বীকার করে। মূল ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয় না। যেমন- মাতুরীদীয়াগণ বলেন- اَلْإِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ অর্থাৎ মূল ঈমানে ক্রম-বৃদ্ধি সাধিত হয় না।

আর কালবী (র.) বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধির একটি ঘটনা হুদায়বিয়াতে ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন তাওহীদের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে এবং মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, যখন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তথা ঈমান এনেছে, তখন নামাজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে জাকাত, রোজা, হজ এবং এরপর জিহাদ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে দীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। প্রতিদিন ওহীর মাধ্যমে নতুন নতুন বিধান আসত, লোকেরা তা মেনে নিত, এভাবে তাদের ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতো।

এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- "لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ" -এর মর্মার্থ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে তারা দীনের বিধানাবলির প্রতিও ঈমান এনেছেন। যখনই কোনো বিধান নাজিল হয়েছে তখনই তার উপর ঈমান এনেছেন। এভাবেই তাঁদের ঈমান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের ঈমান বৃদ্ধিকরণের অর্থ হলো আল্লাহ-ভীতির সাথে আরো আল্লাহভীতি যুক্ত করা।

কেউ কেউ বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের নূর বা আলো বৃদ্ধি পাওয়া। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى أَعْلَمُ

قَوْلُهٗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ ...... عَلِيْمًا حَكِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আর আসমান জমিনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ তা'আলারই, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

এ কথার তাৎপর্য হলো, কেউ যেন একথা মনে না করে যে, মুসলমানগণের দুর্বলতার কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আসমান জমিনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকেরই, তাই কোনো প্রকার দুর্বলতার কারণে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; বরং হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, বিশেষ হিকমতের কারণেই আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর কোনো ফেরেশতাকে প্রেরণ করে নিজেই মক্কাবাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমতের কারণে মুমিনদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন, যেন মুমিনগণ জিহাদের ছওয়াব লাভ করতে পারেন এবং কাফেরদেরকেও হঠাৎ ধ্বংস না করে ঈমান আনয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٥. لِيُدْخِلَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ اَىْ اَمَرَ بِالْجِهَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا .

৫. যাতে তিনি প্রবেশ করাতে পারেন – [لِيَدْخُلَ শব্দটি] উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। [অর্থাৎ اَمَرَ بِالْجِهَادِ لِيَدْخُلَ الخ আল্লাহ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে প্রবেশ করাতে পারেন] ঈমানদার নর-নারীদেরকে এমন জান্নাতে যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আর যেন তাদের পাপরাশি মোচন করে দিতে পারেন। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে মহা সাফল্য।

٦. وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۤنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ ظَنُّوْا اَنَّهُ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِمْ دَاۤئِرَةُ السَّوْءِ ج بِالذُّلِّ وَالْعَذَابِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا مَرْجِعًا .

৬. আর যেন শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষদেরকে, যারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে। اَلسَّوْءُ শব্দটির সীন অক্ষরটি তিন স্থানেই যবর এবং পেশ উভয়ভাবে পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ তারা ধারণা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে এবং ঈমানদারগণকে সাহায্য করবেন না। বস্তুত তাদের উপরই অমঙ্গল চক্র [নিপতিত হবে] লাঞ্ছনা এবং শাস্তির। আর আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর এবং আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল– প্রত্যাবর্তনস্থল।

٧. وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِىْ مُلْكِهِ حَكِيْمًا . فِىْ صُنْعِهِ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

৭. আকাশমণ্ডল ও জমিনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর [করায়ত্তে]। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে মহাকৌশলী তাঁর কার্যে সর্বদাই তিনি এ সকল গুণ ধারণ করে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ" "যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নর-নারীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন।"

অত্র আয়াতে "لِيَدْخُلَ" এর لَامْ -এর مُتَعَلِّقٌ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে কতিপয় মতামত উল্লেখ করা হলো–

১. জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, لِيُدْخِلَ -এর লামটি একটি উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ আর মূল ইবারত হলো- "اَمَرَ بِالْجِهَادِ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ" আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত দ্বারা জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাতে করে তিনি এর [মহান আমলের] বিনিময়ে ঈমানদার নারী-পুরুষদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। তিনি এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَغْفِرَ اللّٰهُ الخ -এর ন্যায় এটাও বিজয়ের কারণ; কিন্তু যেহেতু দু'টি حَرْفُ جَارْ একটি عَامِلْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হওয়া আপত্তিজনক, সেহেতু তিনি উহ্য فِعْل -এর সাথে এটাকে مُتَعَلِّقْ মেনেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন- اِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে لِيَزْدَادُوْا টা مُتَعَلِّقْ হওয়ার পর لِيُدْخِلَ ও- اِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন- لِيُدْخِلَ -এর لَامْ -এর বর্ণটি উহ্য فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। মূলত ইবারতটি এমন হবে- "يَبْتَلِىْ بِتِلْكَ الْجُنُوْدِ مَنْ يَّشَاءُ لِيُدْخِلَ الخ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে বাহিনী দ্বারা যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা করেন। যাতে করে ঈমানদার নর-নারীগণকে জান্নাতে পাঠাতে পারেন।

৪. কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মতে, اِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে لِيَزْدَادُوْا টা مُتَعَلِّقْ হওয়ার পর তার সাথে لِيُدْخِلَ ও مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

৫. কারো কারো মতে, لِيُدْخِلَ শব্দটি يَنْصُرَكَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

উল্লেখ্য- উক্ত صُوْرَتْ -সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত সূরতই উত্তম যেটা জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ মুনাফিক ও মুশরিকদের উপরই অকল্যাণ হয়।

دَائِرَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো- এমন রেখা যা একটি কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে থাকে [বৃত্ত]। অতঃপর এমন বিপদ ও মসিবতের অর্থে তা ব্যবহার হতে লাগল যা বিপদগ্রস্তকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে। অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিক মুসলমানদের উপর যে বিপদ আপতিত হওয়ার আশা করেছিল তা শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এসে পড়ল। -[কামালাইন]

আয়াতে سَوْءٌ -এর বিভিন্ন কেরাত এবং তদনুযায়ী তার অর্থগত পার্থক্য : আল্লাহ তা'আলার বাণী - "عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ" -এর মধ্যস্থিত سَوْءٌ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. سَوْءٌ -এর সীন অক্ষরটি পেশ বিশিষ্ট হবে। এটা আবূ আমর এবং ইবনে কাছীরের ক্বেরাত। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে আজাব, পরাজয় এবং মন্দ।

২. سَوْءٌ -এর সীন অক্ষরটি যবরযোগে হবে। এটা অধিকাংশ ক্বারীগণের কেরাত।

এ অবস্থায় এর অর্থ হবে- নিন্দা ও তিরস্কার। আল্লামা জামাখশরী (র.) বলেছেন যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় এর অর্থ হবে ধ্বংস। আর শেষোক্ত অবস্থায় এর অর্থ হবে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কথাবার্তা।

এর কেরাত উল্লেখ করতে গিয়ে জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, "بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ" অর্থাৎ তিন স্থানেই সীন অক্ষরটি যবর এবং পেশ উভয়যোগে পড়া জায়েজ হবে। এখানে 'তিন স্থান' এর দ্বারা তিনি বস্তুত নিম্নোক্ত তিনটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ১. ظَنَّ السَّوْءِ ২. دَائِرَةُ السَّوْءِ ৩. ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ -

মুহাক্কিকগণ (র.) বলেছেন, এদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় সাতজন ক্বারী সর্বসম্মতভাবে سَوْءٌ শব্দটির সীন অক্ষরটিকে যবরযোগে পড়েছেন। কাজেই উক্ত দুই অবস্থায় আর পেশের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্যে যে কিছুটা শিথিলতা হয়ে গেছে তা স্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : শানে নুযূল : একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" পড়ে শুনালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ﷺ -কে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পুরস্কার তো আপনার জন্য অমাদের জন্য কি? তখন নাজিল হলো- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ -

এখানে ঈমানের প্রবৃদ্ধির ফলাফলকে ভিন্ন ভঙ্গিমায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে ঈমানদারগণকে সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং মন্দ ও দুর্বলতা হতে তাদেরকে পুতঃপবিত্রকরণ উদ্দেশ্য। হাদীস শরীফে এসেছে হুদায়বিয়ায় জিহাদের বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই জাহান্নামী হবে না।

قَوْلُهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ : আল্লাহ তা'আলা এজন্য জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এর বদৌলতে মুসলিম নর-নারীগণকে জান্নাতের স্থায়ী শান্তি ও সুখ দান করতে পারেন, তাদের সমস্ত পাপ ও দুঃখ মোচন করে দিতে পারেন। আর আল্লাহর নিকট ঈমানদারগণের এ প্রাপ্তি মহা সফলতা হিসেবে চিহ্নিত ও বিবেচিত।

আয়াতে ঈমানদার মহিলাগণের উল্লেখের কারণ : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জন্য শুভ প্রতিফলের কথা সাধারণত [নারী ও পুরুষের জন্য] সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করে থাকেন। পুরুষ ও মহিলাদের প্রাপ্য শুভফলের কথা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু গুটিকতেক স্থানে বিশেষ কারণে মুসলিম নর-নারীর শুভ ফলের উল্লেখ পৃথক পৃথকভাবে করা হয়েছে। এ স্থানটি সেগুলোর মধ্যে একটি। অথচ যেই হুদায়বিয়াকে কেন্দ্র করে এ শুভসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে সে হুদায়বিয়ার ঘটনায় মুসলিম রমণীগণ উপস্থিত ছিলেন না। এর বিশেষত্ব ও কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেছেন-

প্রথমত মর্যাদা ও শুভফল প্রাপ্তি নির্ভর করে আনুগত্যের উপর। চাই তা হুদায়বিয়ার ব্যাপারে হোক কিংবা অন্য কোনো ব্যাপারে হোক- আর এর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত উক্ত ব্যাপকতার মধ্যে মহিলাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে। তারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ফজিলতের কথা শ্রবণ করত মনঃক্ষুণ্ন হবে না।

যা হোক ফজিলত যখন আনুগত্যের কারণে শিরধার্য হয়ে থাকে তখন নারীরা তাদের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালন করত শুভ সংবাদ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে। কেননা নারী পুরুষ কারো পরিশ্রমই বৃথা যায় না।

তাছাড়া হাদীস শরীফে রয়েছে, উক্ত হুদায়বিয়ার সফরে হযরত উম্মে সালামা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সফর-সঙ্গিনী ছিলেন। আর অন্তরের দিক দিয়ে তো সকল মুসলিম মহিলাই মুসলামনদের সাথে ছিল।

এতদ্ব্যতীত মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে এ বিপদসংকুল যাত্রা হতে বিরত রাখা এবং কান্নাকাটি ও বিলাপ করে তাদের সাহস-হিম্মতকে ভেঙ্গে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সাহস বৃদ্ধি করেছিলেন। তারা সেই লোকদের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান ইত্যাদি সংরক্ষণ করে তাদেরকে নিশ্চিত করে রেখেছিলেন। তাঁরা কাফের ও মুনাফিকদের আক্রমণের আশঙ্কা অনুধাবন করেও মদীনার ঘর-বাড়িতে বসে রয়েছিলেন। সুতরাং এ জন্যই ঘরে বসে থেকেও তাঁরা জিহাদের শুভফল লাভে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে শরিক হয়েছেন।

সুতরাং এ সন্দেহ নিরসন হয়ে গেল যে, ঈমানদার রমণীগণ ঘরে বসে থেকেও জিহাদের মর্যাদা লাভ করবেন কিনা?

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঈমানদারদের পাপ মোচন হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে পরে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নর-নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন- যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবহমান, তথায় তারা চিরকাল থাকবেন। আর যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি মোচন [মার্জনা] করে দিতে পারেন।

এ আয়াত হতে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর তাদের দোষ-ত্রুটি, পাপরাশি বিমোচন করে দিবেন। অথচ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বেই তাদের পাপের পঙ্কিলতা হতে পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। অন্যান্য স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ বৈপরীত্ব কিভাবে নিরসন করা যেতে পারে?

এর জবাবে মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. আলোচ্য আয়াতে وَاوْ সাধারণ একত্রিকরণের অর্থে হয়েছে তারতীব তথা ক্রমধারার জন্য হয়নি। সুতরাং এর অর্থও হবে প্রথমত তাদের পাপ মোচন করে দেওয়া হবে এবং পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

২. এখানে ঈমানদারগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো মুখ্য বিষয়। আর তাদের পাপ মোচন করে দেওয়া হলো গৌণ ও পরোক্ষ বিষয়। এ জন্যই জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পাপ মোচনের বিষয়কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। তারতীবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৩. এখানে "تَكْفِيْرُ سَيِّئَاتْ" -এর অর্থ হলো জান্নাতীগণকে সম্মান ও ইজ্জতের পোশাক পরানো। আর তা জান্নাতের প্রবেশের পরই হবে।

৪. এর অর্থ হলো জান্নাতীগণ হতে মানবীয় দোষ-ক্রটি দূর করে তাদেরকে ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত করা। আর তা জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরই করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَانَ ذَالِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণের জান্নাতে প্রবেশ এবং তাদের গুনাহ মাফের উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা বিরাট সাফল্যও চূড়ান্ত বিজয়।

জান্নাতে প্রবেশকে "فَوْزًا عَظِيْمًا" তথা মহাবিজয় আখ্যায়িত করায় সেই আনাড়ী, সুফী ও মাস্তান দরবেশদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে যারা জান্নাত তলবকারীদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে থাকে। কেননা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটা মহাসাফল্য সেহেতু বাস্তবিক পক্ষেই এটা মহা সফলতা। যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সফলতা অর্জনকারী তারাই সত্যিকারভাবে সফলকাম। আর হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ঈমানদারগণ যা লাভ করেছিলেন তা দর্শনে সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ -কে দেওয়া নিয়ামতরাজির কথা শুনে ঈমানদারগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন এটা তো আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, আমাদের জন্য কি রয়েছে? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মু'মিনগণের জান্নাতবাসী হওয়া এবং তাদের গুনাহের পঙ্কিলতা বিমোচন হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে– আর বলা হয়েছে, এটা সাধারণ কোনো জিনিস নয়– এটা হলো এক বিরাট পাওনা ও মহাসফলতা।

قَوْلُهُ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ .... مَصِيْرًا : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতির বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

আর আল্লাহ তা'আলা [এজন্য জিহাদের হুকুম নাজিল করেছেন] যাতে তিনি মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। এ মুনাফিক ও মুশরিকরা আল্লাহর ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে। এ কু-ধারণার কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে। আজাব ভোগ করতে হবে। তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছেন, কতইনা নিকৃষ্ট স্থান এ জাহান্নাম– যেথায় তারা চিরকাল থাকবে।

ইতঃপূর্বে ঈমানদারদের নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে মুনাফিক ও মুশরিকদের শাস্তি ও দুর্গতির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশংসাস্থলে হওয়ার কারণে ঈমানদারদের উপর ইতঃপূর্বে সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাজিল হওয়ার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তা তাদের জন্যই নির্ধারিত হবে। কাজেই মুনাফিক ও মুশরিকরা যে এটা হতে বঞ্চিত হতো, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

সুতরাং উক্ত হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন– ইসলামের শিকড় মজবুত হয়েছে এবং ইসলামি বিজয়সমূহের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এর দরুন কাফের ও মুনাফিকদের উপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের শাস্তি অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত আছে যে, মুমিনগণ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং আল্লাহ তা'আলার শানে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করল, যেমন তারা বলতে শুরু করল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন না। কোনো কোনো মুনাফিক বলল, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না। অথবা মন্দ ধারণার অর্থ হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য অনেক কিছুকে শরিক মনে করতো।

সুতরাং মদীনা হতে যাত্রা করার সময় নবী ﷺ -এর সাথে একমাত্র জাদ্দ ইবনে কায়েস ব্যতীত অন্য কোনো মুনাফিক ছিল না। অন্যরা সকলেই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়েছিল। তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ তো অবশ্যই হবে এবং মুসলিমরা কোনোমতেই জীবিত সহীহ সালামতে ফিরে আসতে পারবে না। আর বাহ্যিকভাবে দেখতে গেলে অবস্থা অনেকটা এরূপই

ছিল। কেননা মুসলমানরা স্বীয় দেশ মদীনা হতে দূরে ছিল। যুদ্ধাস্ত্র ছিল তাদের হাতে অতি নগণ্য। অপরদিকে মুশরিকরা ছিল তাদের নিজেদের দেশে। তাছাড়া শুধু যে কুরাইশরা তাদের বিরুদ্ধে ছিল তা নয়; বরং গোটা মক্কাই ছিল তাদের প্রতিপক্ষ দুশমন। এমতাবস্থায় মুনাফিকরা ভাবল যে, কেন নিজেদেরকে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যাবে?

অপরদিকে কাফেররা ভাবল যদিও বাহ্যত মুসলমানরা ওমরা পালন করতে আসছে; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো ওমরার ছলনায় মক্কা দখল করে নেওয়া। মুনাফিক ও মুশরিকদের এ ছিল কুধারণা। আয়াতে কারীমায় ظَنَّ السَّوْءِ -এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুনাফিক ও কাফেররা ধারণা করেছিল যে, মুসলমানদের উপর বিপদ আসন্ন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিপদ মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং মুনাফিক ও কাফিরদের উপরই বিপদ ও ধ্বংসের ঘূর্ণি-চক্র আপতিত হবে, আর তা তাদের মুনাফেকী এবং নাফরমানিরই শাস্তি, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার গজবও তাদের উপর পড়বে এবং আল্লাহ পাকের লা'নতও রয়েছে তাদের প্রতি। আর আখিরাতে হবে তাদের প্রতি কঠিন ও কঠোর শাস্তি, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে দোজখ তৈরি করে রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।

আর যেহেতু কুফরির কারণেই তাদেরকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সেহেতু মহিলাদেরকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাফের ও মুনাফিক মহিলারাও যেহেতু তাদের পুরুষদের সহযোগী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল সেহেতু তাদেরকেও আজাবের উপযোগী সাব্যস্ত করা যথার্থ হয়েছে।

যা হোক কাফের ও মুনাফিকরা কোনো মতেই তাদের প্রাপ্য শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিতে চাইলে কে আছে যে, তা হতে রক্ষা করতে পারে?

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক ও কাফেরদের জন্যে চারটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যথা–

১. তাদের উপর বিপদাপদের ঘূর্ণিচক্র আপতিত হবে, কখনো এর থেকে তারা রেহাই পাবে না।
২. তাদের প্রতি আল্লাহর তা'আলার গজব অবধারিত।
৩. তারা হবে অভিশপ্ত, রহমত থেকে বঞ্চিত, কোপগ্রস্ত। এ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এরপর আখেরাতের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
৪. আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে দোজখ তৈরি করে রেখেছেন; আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।

অবশ্য তিনি প্রাজ্ঞ ও কৌশলীও বটে। সুতরাং এটা তাঁর কৌশলের পরিপন্থি যে, মুহূর্তেই সকল কাফেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তবে কিছুদিন পর কাফেররা নিহত ও বন্দী হয়েছে। আর মুনাফিকরা জীবনভর আফসোস ও হতাশায় ভুগেছিল। কেননা ইসলাম ও মুসলমানগণ দিন দিন শক্তিশালী হয়েছিল। পক্ষান্তরে কাফেররা হয়েছিল হীন-দীন। এটা ছিল ইহকালীন শাস্তি। আর পরকালের যন্ত্রণাদায়ক আজাবের কথা তো আলাদা।

মুনাফিকদেরকে মুশরিকদের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– "وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ الخ" অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা সেসব মুনাফিক নর-নারী এবং মুশরিক নর-নারীকে শাস্তি প্রদান করতে চান, যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে।"

আলোচ্যাংশের ন্যায় কুরআনে মাজীদের বহু স্থানে মুশরিকদের পূর্বে মুনাফিকদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম উল্লেখ করেন যে, আজাবের ঘোষণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের পূর্বে মুনাফিকদের উল্লেখ রয়েছে। কেননা মুশরিকদেরকে সকলেই ইসলামের দুশমন জানে, ইসলামের প্রতি তাদের দুশমনী প্রকাশ্য; কিন্তু মুনাফিকদের কুফরি ও নাফরমানি তারা কখনো প্রকাশ করে না, সর্বদা তারা নিজেদের অবস্থা গোপন রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত মুনাফিক হলো ইবলিস শয়তানের ন্যায়, ইবলিস যখন মানুষকে প্রতারণা দেওয়ার জন্যে আসে, তখন সে আদৌ একথা প্রকাশ করে না যে, আমি তোমার শত্রু; বরং সে বন্ধু বেশেই আসে, এমনিভাবে মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করতো, প্রকাশ্যে তাদেরকে ইসলামের শত্রু মনে করাও কঠিন ছিল, তারা ঈমানদার না হয়েও ঈমানের দাবিদার ছিল। সুতরাং তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা তো দূরের কথা; বরং তাদেরকে পরম বন্ধু ভেবে মুসলমানরা যে তাদের নিকট সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। এ জন্যেই তারা মুসলমানদের অধিক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। অতএব, তাদের আজাবও হবে কাফের মুশরিকদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ "নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।"

মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার কিরূপ ধারণা করত? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "اَلظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ" অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপ কু-ধারণা পোষণ করে? এর জবাবে মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ-

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন- "ظَنُّوْا اَنَّهٗ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ" অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকরা ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও ঈমানদারগণের সাহায্য করবেন না।

২. ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন- মুনাফিক ও মুশরিকরা ধারণা করেছিল যে, নবী করীম ﷺ এবং মুমিনগণ পরাজিত হবেন। ইসলামি আদর্শের উপর কুফর বিজয়ী হবে।

৩. ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন, মুনাফিক ও মুশরিকদের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখতে পান না এবং তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত নন। ইরশাদ হচ্ছে- "وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ" "বরং তোমরা ধারণা করে বসে আছো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধিকাংশ কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত নন।"

৪. কারো কারো মতে মুশরিকরা ধারণা করত যে, প্রতিমা ও দেব-দেবীদের সাথে আল্লাহ তা'আলার যোগসাজশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ" অর্থাৎ তোমরা যা ধারণা করেছ তা মোটেই ঠিক নয়; বরং তোমাদের এ প্রতিমাগুলো হলো কিছু নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারণ করেছ।

৫. কেউ কেউ বলেছেন- কাফেরদের কু-ধারণা ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং মুমিনগণ ওমরা পালনের অজুহাতে মক্কা দখলের ষড়যন্ত্র করছে। আর মুনাফিকদের ধারণা ছিল, মুসলমানগণ হুদায়বিয়া হতে নিরাপদে জীবিত ফিরে আসবে না। আল্লাহ পাক মুনাফিকদের এ অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ করেন- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا "বরং তোমরা [মুনাফিকরা] ধারণা করে বসে আছ যে, রাসূল ﷺ ও ঈমানদারগণ কখনো তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসবে না।"

৬. মুনাফিক ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, নবী করীম ﷺ ও মুমিনদেরকে মক্কায় ওমরা পালন করার জন্য প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা অপমানিত হয়েছে এবং চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

মোটকথা, মুশরিক ও মুনাফিকরা বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনা ও ধারণার বশবর্তী ছিল। আর তাদের উক্ত ধারণা সর্বমূলেই যে খারাপ ও বিশ্রী তা বলাই বাহুল্য। ইরশাদ হচ্ছে- اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ অর্থাৎ তারা শুধু ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে [বাস্তবের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।]

"وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ الخ" **আয়াতটি পুনরুল্লেখের কারণ :** এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا অর্থাৎ "আসমান-জমিনের সকল বাহিনী আল্লাহ তা'আলার করায়ত্বে। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহাকৌশলী।

উক্ত সূরার প্রারম্ভে ইতঃপূর্বেও প্রায় হু-বহু এরূপ একটি আয়াত রয়েছে। আয়াতদ্বয় শাব্দিকভাবে প্রায় এক ও অভিন্ন হলেও এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে সু-সংবাদ দেওয়া। অপরদিকে শেষোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কাফিরদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দুঃসংবাদ প্রদান করা। এজন্যই শেষোক্ত আয়াতে حَكِيْمًا -এর সাথে عَزِيْزًا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ **আয়াতে** جُنُوْدُ **-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল বাহিনী আল্লাহর অধীনে।

এখানে جُنُوْدُ বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্য নিম্নরূপ-

১. এটা দ্বারা আল্লাহ পাকের অসীম শক্তিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. এখানে جُنُوْدُ তথা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনী দ্বারা এতদুভয়ের মধ্যকার ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে।

৩. আকাশের ফেরেশতাগণ এবং জমিনের জীব-জন্তু ও জিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

অনুবাদ :

٨. اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى اُمَّتِكَ فِى الْقِيٰمَةِ وَمُبَشِّرًا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا ـ مُنْذِرًا مُخَوِّفًا فِيْهَا مِنْ عَمَلِ سُوْءٍ بِالنَّارِ ـ

৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে আপনার উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিন এবং তাদের জন্য সুসংবাদদাতা হিসেবে দুনিয়াতে তাদের জন্য জান্নাতের এবং ভীতি প্রদর্শনকারী দুনিয়ায় অপকর্মকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী।

٩. لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهِ وَفِى الثَّلٰثَةِ بَعْدَهٗ وَتُعَزِّرُوْهُ يَنْصُرُوْهُ وَقُرِئَ بِزَايَيْنِ مَعَ الْفَوْقَانِيَّةِ وَتُوَقِّرُوْهُ ط تُعَظِّمُوْهُ وَضَمِيْرُهُمَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُسَبِّحُوْهُ اَىِ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ـ

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার। لِتُؤْمِنُوْا শব্দটি এখানে এবং এরপর তিনটি স্থানে تَا ও ى উভয়ের সাথে পড়া যায় এবং তাঁকে সহযোগিতা করতে পার। তারা তাকে সাহায্য করতে পারে। আর وَتُعَزِّرُوْهُ শব্দটির ز অক্ষরটি تَا সহ দুটি ز -এর সাথে (تُعَزِّزُوْهُ) -ও পঠিত হয়েছে। আর যাতে তোমরা তাকে সম্মান করতে পার ইজ্জত করতে পার। هُمَا যমীরটি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর যেন তাঁর তাসবীহ [পবিত্রতা] পাঠ করতে পার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ সকাল এবং বিকাল সকাল-সন্ধ্যা।

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ بِالْحُدَيْبِيَةِ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط هُوَ نَحْوُ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج الَّتِىْ بَايَعُوْا بِهَا النَّبِىَّ ﷺ اَىْ هُوَ تَعَالٰى مُطَّلِعٌ عَلٰى مُبَايَعَتِهِمْ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا فَمَنْ نَّكَثَ نَقَضَ الْبَيْعَةَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ يَرْجِعُ وَبَالُ نَقْضِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

১০. [হে হাবীব!] নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় বায়'আতে রিদওয়ান [মূলত] তারা [যেন] আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে। [ঐ আয়াতের ন্যায়] যেমন [আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন] যে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে সে [পরিণামে] আল্লাহরই আনুগত্য করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর যেই হাত দ্বারা তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের বায়'আত সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন– পুরস্কৃত করবেন। অতঃপর যে ভঙ্গ করবে অর্থাৎ বায়'আত ভঙ্গ করবে– সুতরাং সে অবশ্যই ভঙ্গ করবে অর্থাৎ তার বায়'আত ভঙ্গের অশুভ ফল প্রত্যাবর্তন করবে। তার নিজের প্রতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি যে পূরণ করবে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন ى এবং ن -এর সাথে– মহাবিনিময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتُؤْمِنُوا وَتُعَزِّرُوْهُ الخ : উল্লিখিত আয়াতে لِتُؤْمِنُوْ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহূর ক্বারীগণ لِتُؤْمِنُوْا কে تا -এর সাথে جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرٌ -এর সীগাহ হিসেবে পড়েছেন। অর্থাৎ যাতে তোমরা ঈমান আন।

২. ইবনে কাসীর (র.), আবূ আমর ও ইবনে মুহাইমিন (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন– لِيُؤْمِنُوْا . ى সহ جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ হিসেবে। অর্থাৎ যাতে তারা ঈমান আনে।

এতদ পরবর্তী তিনটি শব্দ যথাক্রমে وَيُعَزِّرُوْهُ - وَيُوَقِّرُوْهُ ও وَيُسَبِّحُوْهُ -এর মধ্যেও অনুরূপ দুটি কেরাত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَتُعَزِّرُوْهُ : تُعَزِّرُوْهُ শব্দটির শেষে ضَمِيْر টি হলো ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل আর تُعَزِّرُوْا শব্দটি تَعْزِيْر হতে নির্গত। নেহায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, تَعْزِر -এর মূল অর্থ হলো বিরত রাখা, প্রতিহত করা। এটা সাহায্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা কেউ যদি কারো সাহায্য করে সে যেন তার দুশমনদেরকে প্রতিহত করে। সুতরাং تَعْزِيْر শব্দটি تَادِيْب তথা আদব শিক্ষাদান এর অর্থেও হয়ে থাকে।

শরিয়তের পরিভাষায় تَعْزِيْر এমন শাস্তিকে বলে যেটা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তবে কোনো কেরাতে تُعَزِّرُوْهُ -এর স্থানে تُعَزِّزُوْهُ (تَعْزِيْز) হতে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا অর্থাৎ আর যেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।

بُكْرَةً -এর অর্থ হলো সকাল এবং اَصِيْل -এর অর্থ সন্ধ্যা। তবে এখানে মুফাস্‌সিরগণ "সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করা" -এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যথা–

১. কেউ কেউ বলেছেন– بُكْرَةً -এর দ্বারা সকালের নামাজ [ফজর] এবং اَصِيْل -এর দ্বারা অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামাজ যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

২. অথবা, এর অর্থ হলো সকাল-সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর তাসবীহ পাঠ কর।

قَوْلُهُ فَسَنُؤْتِيْهِ : আল্লাহর বাণী– "فَسَنُؤْتِيْهِ" -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জমহূর ক্বারীগণের মতে, فَسَنُؤْتِيْهِ - ن -এর সাথে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ হবে। অর্থাৎ– আমি তাকে শীঘ্রই দান করব।

২. কুফার ক্বারীগণ এবং আবূ আমর (রা.)-এর মতে– فَسَيُؤْتِيْهِ . ى -এর সাথে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থাৎ আল্লাহ শীঘ্রই তাকে দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ ..... وَاَصِيْلًا : পূর্ববর্তী আয়াতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করার পর চারটি এমন নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আর এ আয়াতে এমন নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে দান করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির কাছে সাক্ষী রূপে এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদদাতা হিসেবে, আর কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হিসেবে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে তোমরা সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর, তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা উপলব্ধি কর। আর এ সত্যও উপলব্ধি কর যে, তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দান করা এবং যারা ঈমান আনে না, নেক আমল করে না, তাদেরকে সতর্ক করা। আর তোমরা যেন সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের মহিমা বর্ণনা কর তথা তসবীহ পাঠ কর।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ দুনিয়াতেই ঈমান ও নেক আমলের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন, আর কাফেরদেরকে দুনিয়াতেই তিনি ভীতি প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু সাক্ষ্য প্রদানের যে দায়িত্ব তাঁর প্রতি রয়েছে তা তিনি পালন করবেন কিয়ামতের কঠিন দিনে, সেদিন উম্মতের আমল সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর প্রিয়নবী ﷺ -কে সাহায্য করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের সাহায্য করা, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং তা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর উম্মতেরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে, তাদের নিকট কোনো নবী রাসূল আসেননি– কেউই তো আমাদের নিকট আপনার বার্তা পৌঁছে দেয়নি। কেউই আমাদেরকে সতর্ক করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তাঁরা আল্লাহর পয়গাম কেন লোকদেরকে পৌঁছান নি। নবীগণ (আ.) বলবেন, আমরা আপনার পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছি এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু তারা তো আমাদের কথা শোনেনি– আমাদের আনুগত্য করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীগণের নিকট জানতে চাইবেন যে, তাঁদের দাবির পক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কিনা? তখন তাঁরা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতগণকে সাক্ষী মানবেন। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ সাক্ষ্য দেবেন যে, নবীগণ তাদের কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন; কিন্তু কওমের লোকেরাই তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অন্যান্য নবীগণের কওমের লোকেরা এর প্রতিবাদ করে বলবে, উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ তো আমাদের বহু পরে দুনিয়ায় আগমন করেছে, তারা এটা কি করে জানল? উত্তরে উম্মতে মুহাম্মদী বলবেন যে, আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ -এর মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতের বক্তব্যকে সত্যায়িত করবেন এবং তাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

আলোচ্য আয়াতের تُعَزِّرُوْهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং আরো কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, এ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা সাহায্য করা বা তা'যীম করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যাপারেই হতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ সর্বনামগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারেন। যদি আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে সম্মান করা এবং সাহায্য করার তাৎপর্য হবে দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। আর যদি প্রিয়নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এর অর্থ হবে, তাঁর মহান আদর্শের বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। আর আল্লামা জমখশরী (র.) লিখেছেন, সকল সর্বনাম দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তাফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করার তাৎপর্য হলো, সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার জিকিরে তন্ময় থাকা। কোনো কোনো তাফসীরকার এ কথাও বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ পাঠ করার তাৎপর্য হলো, নামাজ আদায় করা।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ : বাইয়াতের তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে যে বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো বিশেষ অঙ্গীকার। ইসলাম বা জিহাদ সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কোনো কোনো সময় সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইয়াত গ্রহণ করতেন এ মর্মে যে, আমরা প্রাণপণ জিহাদ করবো, কখনো কোনো অবস্থাতেই দুশমনের মোকাবিলা তথা রণাঙ্গন থেকে পিছপা হবো না।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর দস্তে মোবারকের উপর হাত রেখে তাঁরা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁরা আমরণ জিহাদ করবেন। সাহাবায়ে কেরামের এ বাইয়াত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, [হে রাসূল!] মুমিনগণ আপনার হাতে হাত রেখে যে অঙ্গীকার করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সে অঙ্গীকার তারা আমার সঙ্গেই করেছে। কেননা সে অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশের লক্ষ্যেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

[যে রাসূলের অনুগত হয়, সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।]

এর দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর উচ্চতম মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর কথা মেনে চলে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কথা মানে, এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে।

দ্বিতীয়ত বায়'আতের এ প্রথা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণেই আজ অব্যাহত রয়েছে। বুজুর্গানে দীনের নিকট যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মসংশোধনের জন্যে হাজির হয়, তাঁরা তাদেরকে এ মর্মে বাইয়াত করেন যে, তারা কখনো আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করবে না, শরিয়ত বিরোধী কাজে অংশ নেবে না।

হুদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ -এর দস্তে মোবারকে হাত রেখে যে বাইয়াত করেছিলেন, তা ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলে অভিহিত। এ বাইয়াতকে শুধু যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সাথে বাইয়াত বলে আখ্যা দিয়েছেন তাই নয়; বরং পরবর্তী আয়াতাংশে একথাও বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সেদিন জিহাদের বাইয়াত করেছিলেন, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারের যে ওয়াদা করেছেন, তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

يَدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর হাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : আল্লাহ তা'আলার 'হাত' বলে তাঁর এমনি একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে يَدُ اللّٰهِ [আল্লাহ তা'আলার হাত] দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতের নিয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী ﷺ -এর হাতে হাত রেখে জিহাদের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েতের নিয়ামত দান করেছেন।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ১. يَدُ اللّٰهِ কথাটির অর্থ হলো نِعْمَتُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তাদের প্রতি রয়েছে। ২. نُصْرَتْ অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের জন্যে রয়েছে। ৩. এর অর্থ হলো, غَلَبَتْ অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী ﷺ -এর হাতে বাইয়াত করেছেন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, দীন ইসলামকে বিজয়ী করতে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৮, পৃ. ৮৭]

ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করেছে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট বাইয়াত করেছে, তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট জিহাদের অঙ্গীকার করেছে। হাদীস শরীফে রয়েছে, হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এ পাথরটিকে দাঁড় করাবেন, তার দু'টি চক্ষু থাকবে, যা দ্বারা সে দেখবে, আর তার রসনা থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে, হজরে আসওয়াদকে যে চুম্বন করেছে, তার পক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে। আর ঐ চুম্বনকারী মূলত আল্লাহ তা'আলার নিকট অঙ্গীকারকারী বিবেচিত হবে। এরপর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াতখানা তেলাওয়াত করেন।

اَلْبَيْعَةُ-এর অর্থ : بَيْعَتْ -এর আভিধানিক অর্থ হলো বিক্রয় করা। আর পরিভাষায় এমন চুক্তিকে বাইয়াত বলে যা মানুষ নিজের উপর ঈমানের আনুগত্য করার জন্য করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিহাদের বাইয়াত করেছিলেন।

اَلْبَيْعَةُ-এর প্রকারভেদ : বাইয়াত দুই প্রকার। যথা-

১. بَيْعَتْ جِهَادْ **[বাইয়াতে জিহাদ] :** বিশেষ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রয়োজনে আমীর বা ইমাম জিহাদের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

২. কোনো ভাল কাজের উপর বাইয়াত (بَيْعَتْ سُلُوْكْ) সহীহ মুসলিমে এতদসংক্রান্ত বর্ণনায় "وَعَلَى الْخَيْرِ" শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। মাশায়েখে তরীকত এর بَيْعَتْ اِحْسَانْ -ও এর অন্তর্গত। সূরায়ে মুমতাহানার দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহের মধ্যেও এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার বায়'আতকে বায়'আতে রিদওয়ান বলার কারণ : হুদায়বিয়ায় সংঘটিত বায়'আতকে বায়'আতে রিদওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانْ) বলার দুটি কারণ মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. এতদ্সংক্রান্ত আল্লাহর বাণী- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ الخ আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তোষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে বাইয়াতে রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির বাইয়াত।

২. উক্ত বাইয়াত যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এর নাম হয়েছে- بَيْعَةُ الرِّضْوَانْ -

বাইয়াতের সময় ইমামের হাতের উপর হাত রাখা জরুরি কিনা? : আল্লাহর বাণী- يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -এর দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, বাইয়াতের সময় ইমামের হাতের উপর হাত রাখা আবশ্যক। কিন্তু আসলে তা নয়; বরং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং কারো মাধ্যমেও বাইয়াত গ্রহণ করা যেতে পারে; বরং শায়েখের [ইমামের] নির্দেশনা অনুযায়ী চলাই হলো প্রকৃত বাইয়াত। আনুষ্ঠানিক বাইয়াত জরুরি নয়। অবশ্য বাইয়াতের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও কিছুটা ফায়েদা রয়েছে- এতে বাইয়াত গ্রহণকারীর উপর ইমামের একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে প্রচলিত বাইয়াতের স্থান : বর্তমানে আমাদের দেশে পীর-মাশায়েখ যে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন ক্ষেত্র বিশেষে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এর জন্য খাঁটি তথা শরিয়তের অনুসারী পীর দেখে নিতে হবে। এক শ্রেণির শরিয়ত বিরোধী ভণ্ডপীর বাইয়াতের নামে লোকদেরকে নিজের স্বার্থের অসিলা বানিয়ে নেওয়ার এবং মানুষের দীন-ধর্মকে বরবাদ করার যে ফন্দি তৈরি করে রেখেছে সে ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন থাকা দরকার।

বাইয়াতে রেদওয়ান কিসের উপর নেওয়া হয়েছিল? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ الخ "অর্থাৎ [হে হাবীব!] যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন........।"

অত্র আয়াত দ্বারা সে বাইয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহাদের উপর সাহাবীগণ (রা.) হতে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ায় সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট بَيْعَتْ عَلَى الْمَوْتِ তথা মৃত্যু কবুল করার উপর বাইয়াত করেছিলেন।

ইবনে ওমর, মা'কাল ইবনে ইয়াসের ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ কথার উপর বাইয়াত হয়েছেন যে, তাঁরা যুদ্ধের ময়দান হতে পশ্চাদপসারণ করবেন না, পালিয়ে যাবেন না।

মোদ্দাকথা, নবী করীম ﷺ-এর হাতে হাত রেখে সেই দিন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করেছেন– অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন যে, মুশরিকদের হতে হযরত ওসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবেন না। প্রয়োজনে জীবন দেবেন তবুও পিছ পা হবেন না।

বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনা : হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে নবী করীম ﷺ তাঁর বিশ্বস্ত একজন সাহাবীকে কুরাইশদের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন– যাতে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরাসরি তাদেরকে জানানো যায় এবং তাদের মতামতও জানা যায়।

সুতরাং এ জন্য প্রথমত তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা আমার জীবন নাশ করার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কেননা আমি তাদের কেমন দুশমন তা তারা ভালো করেই অবহিত রয়েছে। তাছাড়া আমার সম্প্রদায় বনূ আদী ইবনে কা'আবের কেউই বর্তমানে মক্কায় নেই। কাজেই তারা যদি আক্রমণ করেই বসে তা হলে কেউ আমার পক্ষে কথা বলার মতো থাকবে না; বরং আমি আপনাকে এমন একজনের কথা বলব যে, কুরাইশদের নিকট আমার অপেক্ষা অধিক সম্মানী ও প্রিয়। তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা.)। নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাগণের নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসেছেন– এতদভিন্ন তাদের অন্য কোনো ইচ্ছা নেই।

হযরত ওসমান (রা.) মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথে আহ্বান ইবনে সাঈদ ইবনে আস তাঁর সঙ্গী হলেন। হযরত ওসমান (রা.) কুরাইশদেরকে নবী করীম ﷺ -এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতারা হযরত ওসমান (রা.)-কে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে পার। তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম ﷺ তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তওয়াফ করতে পারি না। অতঃপর সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে।

নবী করীম ﷺ যখন সংবাদ পেলেন যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে, তখন তিনি ইরশাদ করলেন– যে, হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না। এরপর তিনি সাহাবীগণকে ডেকে একটি বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। একেই বাইয়াতে রিদওয়ান বলে। জাবদ ইবনে কায়েস মুনাফিক ব্যতীত উপস্থিত সকলেই নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়েছেন। নবী করীম ﷺ তাঁর একটি হাত অপর হাতের উপর রেখে বললেন, তা ওসমানের বাইয়াত। এটা হতে হযরত ওসমান (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়। নবী করীম ﷺ তাঁকে কত বেশি স্নেহ করতেন, এ ঘটনা হতে তার কিছুটা অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ সেদিন মৃত্যুর উপর বাইয়াত করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা মরতে প্রস্তুত। মোটকথা, তাঁরা হযরত ওসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। জীবনের রক্তবিন্দু দিয়ে তারা লড়ে যাবেন। অবশ্য পরে সংবাদ আসল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে বলে যে খবর ইতোপূর্বে পাওয়া গেছে তা মোটেই সঠিক নয়। হযরত ওসমান (রা.) জীবিত আছেন। অতঃপর কুরাইশরা তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি হুদায়বিয়ায় এসে নবী করীম ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন।

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণের উক্ত বায়'আতে তাঁদের দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন "অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" অথচ আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র : এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো হাত নেই। তিনি তো হাত পা ইত্যাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর? মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন–

১. গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর"-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের বায়'আত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন এবং তাদেরকে এর পূর্ণ বিনিময় ছওয়াব দান করবেন।

২. আল্লামা জমখশরী (র.) বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ -এর দ্বারা تَخْيِيْل -এর ভিত্তিতে يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ -এর তাকিদ নেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের (রা.)-এর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়ার শামিল।

৩. ইমাম ছাক্বাফী (র.) বলেছেন, এখানে اَللّٰهُ শব্দটিকে "اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ" হিসেবে বিক্রয়কারীর সাথে তাশবীহ [উপমা] দেওয়া হয়েছে। আর يَدٌ শব্দটি اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উক্ত বাক্যটি রূপকভাবে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাকের হাত রয়েছে, তবে এটা সৃষ্টির হাতের মতো নয়; বরং যেরূপ হাত হওয়া আল্লাহর জন্য শোভনীয় সেরূপ হাতই তাঁর রয়েছে। এর প্রকৃত রূপ আমাদের জানা নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

৬. "وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ" একক সত্তার প্রবক্তা একদল [বাতিলপন্থি] সুফী এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন : এই পুরস্কারের অঙ্গীকার বায়'আতে রিদওয়ানের সাহাবীদের জন্য নির্দিষ্ট নাকি ব্যাপক?

উত্তর : যাদের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তারা তো প্রথম ও بِالذَّاتِ মিসদাক। অন্যান্যরা যারা তাকে গ্রহণ করেছেন তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে بِالتَّبْعِ মিসদাক। আর বায়'আতে রিদওয়ানের সাহাবীরা নিশ্চিতভাবে ঐ দৌলত পেয়ে গেছেন। তবে অন্যান্যদের ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেননা ধর্তব্য তো হয় عُمُوْمُ سَبَبْ -এর; خُصُوْص مَوْرِدْ -এর নয়।

সংশয় : সামনের আয়াতে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর মধ্যে تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর কয়েদ রয়েছে। কাজেই عُمُوْم তো বাকি থাকবে না।

উত্তর : تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর কয়েদ -এর رِضَا এবং قَبُوْل -এর মধ্যে সাধারণভাবে দখল নেই, শুধুমাত্র একটি ঘটনার বর্ণনা। যদি ঐ গাছের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে সকল বায়'আত সেই গাছের নিচেই অনুষ্ঠিত হতো এবং হযরত ওমর (রা.)-ও সেটা কর্তন করতেন না।

ফায়েদা : খলিফাগণ ও আউলিয়ায়ে কেরামের বাইয়াত এটার উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, তবে খেলাফতের বাইয়াত মাসনূন ও مُتَوَارِثْ আর সূফীগণের বয়াত مُتَضَمِّنْ বিস্তারিত জানার জন্য خُلَاصَةُ التَّفَاسِيْر দেখুন।

মাসআলা : বাইয়াত সুন্নত। ওয়াজিবও নয়, আবার বিদআতও নয়। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) قَوْلُ الْجَمِيْلِ -এর মধ্যে এরূপই বলেছেন।

মাসআলা : বায়'আত একটি অঙ্গীকার যা মুখে স্বীকার করা ও লিখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মোসাফাহা করা সুন্নত।

মাসআলা : মহিলাদেরকে মুসাফাহা করার মাধ্যমে বাইয়াত করা জায়েজ নয়, বুখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে মৌখিক বাইয়াত করতেন, বায়'আতের উদ্দেশ্যে কখনো তিনি নারীদের হাত স্পর্শ করেননি।

মাসআলা : বায়'আতকৃতা নারী যদি ছোট ও মাহরামও হয় তবুও তার সাথে মুসাফাহা পরিত্যাগ করাই উত্তম।

অনুবাদ :

١١. سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ اَىِ الَّذِيْنَ خَلَّفَهُمُ اللّٰهُ عَنْ صُحْبَتِكَ لَمَّا طَلَبْتَهُمْ لِيَخْرُجُوْا مَعَكَ اِلٰى مَكَّةَ خَوْفًا مِنْ تَعَرُّضِ قُرَيْشٍ لَكَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا عَنِ الْخُرُوْجِ مَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج اللّٰهَ مِنْ تَرْكِ الْخُرُوْجِ مَعَكَ قَالَ تَعَالٰى مُكَذِّبًا لَهُمْ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ اَىْ مِنْ طَلَبِ الْاِسْتِغْفَارِ وَمَا قَبْلَهٗ مَا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط فَهُمْ كَاذِبُوْنَ فِىْ اِعْتِذَارِهِمْ قُلْ فَمَنْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ اَىْ لَا اَحَدَ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّهَا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

১১. অচিরেই আপনাকে বলবে যারা পিছনে রয়ে গেছে তারা বেদুইনদের মধ্য হতে [অর্থাৎ যারা] মদীনার আশে-পাশে রয়েছে, অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গলাভ হতে পিছনে রেখেছেন, হুদায়বিয়ার বৎসর আপনি যখন তাদেরকে আপনার সাথে মক্কার দিকে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এ আশঙ্কায় যে, কুরাইশরা আপনার পথ অবরোধ করতে পারে। আপনি যখন তাদের নিকট ফিরে যাবেন মক্কা হতে- আমাদেরকে বিরত রেখেছে আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ আপনার সাথে বের হওয়া থেকে সুতরাং আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহর নিকট আমরা আপনার সাথে বের হতে না পারার দরুন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ইরশাদ করছেন, তারা তাদের মুখে [এমন কথা] বলে- ক্ষমা প্রার্থনা ও পূর্ববর্তী বক্তব্য- যা তাদের অন্তরে নেই। -সুতরাং তাদের এ ওজর [অপারগতা] পেশ করার ব্যাপারে তারা অভ্যাসগতই মিথ্যাবাদী। হে নবী! আপনি বলুন, তাহলে কে আছে এখানে اِسْتِفْهَام [প্রশ্নবোধক] نَفِىْ [নেতিবাচক] অর্থে হয়েছে অর্থাৎ কেউই নেই যে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষতি করতে চান। এখানে ضَرٌّ শব্দটি ض অক্ষরে যবরও হতে পারে এবং পেশও হতে পারে অথবা তিনি তোমাদের মঙ্গল করতে চান; বরং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই এ গুণে গুণান্বিত।

١٢. بَلْ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضٍ اِلٰى اٰخَرَ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ اَىْ اَنَّهُمْ يَسْتَاصِلُوْنَ بِالْقَتْلِ فَلَا يَرْجِعُوْنَ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ز هٰذَا وَغَيْرِهٖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ـ جَمْعُ بَائِرٍ اَىْ هَالِكِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ بِهٰذَا الظَّنِّ ـ

১২. বস্তুত بَلْ শব্দটি উভয় স্থানে এক উদ্দেশ্য হতে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা তো ধারণা করে বসেছিলে যে, রাসূল ﷺ ও ঈমানদারগণ কখনো তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসবে না। আর তোমাদের অন্তরে তাকে আকর্ষণীয় চমৎকার করে দেখানো হয়েছে- অর্থাৎ তারা নিহত হয়ে নির্মূল হয়ে যাবে। কাজেই তারা ফিরে আসবে না। আর তোমরা মন্দ-ধারণা পোষণ করেছিলে- এটাও অন্যান্য ধারণা- তোমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। بُوْرٌ শব্দটি بَائِرٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ এ কু-ধারণার কারণে তোমরা আল্লাহর নিকট ধ্বংসশীল।

١٣. وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ـ نَارًا شَدِيْدَةً ـ

১৩. আর যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনবে না, আমি সেই কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি- জ্বলন্ত আগুন। প্রচণ্ড অগ্নি।

١٤. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِمَا ذُكِرَ ـ

১৪. ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা আজাব দেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো অতি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এসব গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ ; এর তাফসীরে মুফাসসির (র.) বলেছেন- حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ মদীনার আশে-পাশে বসবাসকারী বেদুইনরা।

মুফাসসিরগণ এর মহল্লে ই'রাব সম্পর্কে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন-

১. এটা পূর্ববর্তী اَلْاَعْرَابُ হতে صِفَتْ হওয়ার কারণে মহল্লান مَجْرُوْر হবে। অর্থাৎ مِنَ الْاَعْرَابِ الْمُقِيْمِيْنَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ [মদীনার আশে-পাশে বসবাসকারী] বেদুইনরা।

২. حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী اَلْاَعْرَابُ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূব (مَنْصُوْب) হবে।

قَوْلُهٗ اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا : বিজ্ঞ মুফাসসিরের বক্তব্য "اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا" তারকীবের দৃষ্টিকোণ হতে شَرْطٌ مُؤَخَّرٌ [পরে উল্লিখিত শর্ত] হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ তার جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ [পূর্বে উল্লিখিত জাযা হয়েছে।] অথবা, এটা বাক্য হয়ে سَيَقُوْلُ لَكَ الخ -এর ظَرْفٌ তথা مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ ضَرٌّ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ضَرٌّ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত বিদ্যমান -

১. ضَرٌّ শব্দটির ض অক্ষরটি যবরযোগে। এমতাবস্থায় এটা মাসদার হবে। অর্থ হবে- অনিষ্ট সাধন করা। এটা জমহুরের কেরাত।

২. ضُرٌّ শব্দটির ض অক্ষরটি পেশযোগে পঠিত হবে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে- اَمْرًا يَضُرُّكُمْ এমন বিষয় যা তোমাদের ক্ষতিসাধন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- পরাজয়। এটা হামযাহ ও কেসায়ী প্রমুখ ক্বারীগণের কেরাত। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় অবস্থায় একই অর্থ হবে। যেমন- اَلضَّرُّ এ অর্থে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ : **শানেনুযূল** : বর্ণিত আছে যে, মদীনার আশে-পাশে গিফার, মুজুনীয়াহ, জুহাইনাহ, আসলাম, আশজা ও ওয়ায়েল ইত্যাদি বেদুইন গোত্রসমূহ বসবাস করত। নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে যখন মক্কায় ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকেও যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এ ভয়ে নবী করীম ﷺ-এর সাথে ওমরা পালনের জন্য বের হলো না যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পথ অবরোধ করে বসবে এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেবে।

পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ সাহাবীগণসহ সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে আসলে তারা বহু ওজর-আপত্তি করতে শুরু করল। তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেগফার করার জন্যে নবী করীম ﷺ -কে অনুরোধ জানাল।

সুতরাং তারা যে এগুলো বলবে, তা তারা মদীনা ফিরে যাওয়ার পূর্বেই হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা নাজিল করে নবী করীম ﷺ -কে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। আর এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের এসব ওজর-আপত্তি অনর্থক ও বেমানান। মূলত কুরাইশদের ভয়েই তারা ওমরাহ পালন করতে যায়নি এবং নবী করীম ﷺ -এর সাথে শরিকও হয়নি।

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ .... خَيْرًا : অর্থাৎ [হে রাসূল!] যেসব আরব গ্রামবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব, অমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তারা মুখে যা বলে তাদের অন্তরে তা নেই।

আরবের যেসব গোত্র রাসূল ﷺ -এর আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে হুদায়বিয়ার সফরে যায়নি, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা এখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট নিজেদের অপারগতা পেশ করবে যে, আর্থিক কাজে ব্যস্ততা এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকার কারণেই আমরা ওমরার এ সফরে শরিক হতে পারিনি।

মূলত যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ -এর সফর-সঙ্গী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে দুর্বলচিত্ত বেদুইন ব্যক্তিরা ভয়ে এ সফর থেকে বিরতও থাকে। তাদের ধারণা ছিল, এ সফরে যুদ্ধ হবে, আর এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য, তাদের এমন ধারণার কারণেই তারা এ সফরে অংশ নেয়নি, এখন যখন প্রিয়নবী ﷺ নিরাপদে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তারা কি কি ওজর-আপত্তি তুলে ধরবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে পূর্বেই এ আয়াতের মাধ্যমে অবহিত করেছেন।

মুখাল্লাফুন [পশ্চাদপদ অবলম্বনকারী] কারা? তারা কি ওজর পেশ করেছিল? : ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারাহ হতে যাত্রা করার সময় নবী করীম ﷺ অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রস্তুতির সাথে সাহাবীগণ (রা.)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। কেননা, তখনই তিনি সংঘর্ষ বাধার আশংকাবোধ করেছিলেন। এটা দেখে কতিপয় সরলপ্রাণ বেদুইন যাদের অন্তরে তখনো ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেনি। তারা পরস্পরে বলতে লাগল যে, দেখ এ যাত্রাকারী মুসলমানগণ কোনো মতেই জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের গোপন তথ্য উন্মোচন করে নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন যে, তারা হুদায়বিয়ায় তাদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে অহেতুক মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করবে। তারা বলবে, হুজুর, ঘর-বাড়ি ও পরিবার পরিজনদের ধান্ধায় আমরা সময় করে উঠতে পারিনি : আমাদের ঘর-সংসার দেখা-শুনা করার মতো কেউ ছিল না। এ জন্য আমরা ওমরা পালনে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। য হোক, এতে আমাদের গোস্তাখী হয়ে গিয়েছে। আমরা তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অথচ বলার সময় তারা নিজেরা জানত যে, তারা যা বলছে তা সর্বাংশে মিথ্যা। আর ইস্তেগফারের দরখাস্তও ছিল নিছক অভিনয় মাত্র– সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে ছিল না। কেননা, তারা মূলত এটাকে গুনাহই মনে করে না, কাজেই অন্তরের সাথে লজ্জিত হবে কিভাবে? আর এমতাবস্থায় তওবা কবুল হওয়ার বিষয় তো নিতান্ত হাস্যকর।

মুখাল্লাফুনের ওজর পেশের মোকাবিলায় নবী করীম ﷺ -এর জবাব : ইরশাদ হচ্ছে– হে হাবীব! আপনি মুনাফিকদের ওজর পেশের জবাবে বলুন যে, মঙ্গল-অমঙ্গল সবই আল্লাহ তা'আলার হাতে– তার সামনে কারো কোনো ক্ষমতা চলে না। সুতরাং তোমাদের মতো বাজে-নীচু লোক রাসূলের সাথী হওয়া তিনি পছন্দ করেননি। আর এখন আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও তাঁর পছন্দনীয় নয়। কেননা তোমাদের মিথ্যার পর্দা ফাঁস হয়ে পড়েছে। তোমরা নিজেদের দোষেই হুদায়বিয়ার বরকতও মর্যাদা হতে বঞ্চিত রইলে।

মুখাল্লাফুনের ওজর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ : মুখাল্লাফুন তথা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ হতে বিমুখতা প্রদর্শনকারীরা তাদের ধন-সম্পদ ও সংসারের ঝামেলায় যে ওজর পেশ করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঘর-সংসার ও মালামালের মঙ্গলামঙ্গল তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তেই রয়েছে। তিনি চাইলে ঘরের মধ্যে অমঙ্গল হতে পারে, আর তিনি ইচ্ছা করলে ঘরের বাইরেও ক্ষতিমুক্ত রাখতে পারে। তাছাড়া আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তোষ এর মোকাবিলায় ঐসব বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা করা কিভাবে ঈমানদারের আলামত হতে পারে। তারা প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহকে ভুলিয়ে ফেলতে চেয়েছে। যেন তারা চেয়েছে যে, দুনিয়াও হাতে থাকুক এবং আল্লাহও সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সবকিছুর খবর রাখেন। ওমরায় শরিক না হওয়ার যে কারণ তোমরা বর্ণনা করেছ তা যে, মূলত কোনো ব্যাপারই ছিল না; বরং এর কারণ যে অন্যত্র নিহিত রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবগত আছেন। তোমরা তো ধারণা করে বসেছিলে যে, নবী করীম ﷺ

এবং মুসলিমগণ সহীহ সালামতে ফিরে আসবেন না। আর তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল এটাই। উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা ভেবেছিলে যে, আল্লাহর রাসূলের সাথে না যাওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অথচ এটা তোমাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক।

মুনাফিকদের উপরিউক্ত ওজর গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর কয়েকটি দিক রয়েছে। যথা–

১. তারা বলেছে আমাদের হাতে সময় ছিল না।

২. আমরা সফরে অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম।

৩. আমাদের ধারণা ছিল যে, আপনি আমাদের জন্য ইস্তেগফার করলে এ গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।

অথচ বাস্তবিক অবস্থা তা ছিল না। প্রথমোক্ত দুটি ওজর তো সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। আর তৃতীয় ধারণাটি এ জন্য বাতিল হবে যে, তারা নবুয়তের উপর আস্থাশীল ছিল না। উপরন্তু ইস্তেগফারের আবেদনেও তারা একনিষ্ঠ ছিল না।

যাহোক, তাদের ওজরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রথমত যদি তাদের ওজর সত্যও হতো তা হলে অকাট্য নির্দেশের মোকাবিলায় তা ছিল অনর্থক। কেননা উক্ত ওজর বাস্তবিক পক্ষে তাদের ভাগ্যকে খণ্ডন করতে পারত না। তথা শরিয়ত যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করেছে বাস্তব ওজরকে রুখসতের যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শরিয়ত ওজরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অকাট্যভাবে নির্দেশ দিয়েছে– যেমন এ ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে প্রকৃত ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত তাদের উক্ত ওজর সত্য ও বাস্তব ছিল না; বরং নিছক কাল্পনিক ও মনগড়া ছিল এবং এক ধরনের প্রতারণা ছিল, সুতরাং তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

কোনো কোনো তাফসীর হতে জানা যায় যে, উক্ত মুনাফিকদের মধ্য হতে এক দল তওবা করত প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করেনি, এখানে তাদের উল্লেখের কারণ : কুরআনে মাজীদের ভাষা ও বর্ণনা গভীর মনোনিবেশের সাথে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের পাশাপাশি কাফেরদের, মুখলিসদের [নিষ্ঠাবান] পাশাপাশি মুনাফিকদের এবং জান্নাতীদের পাশাপাশি জাহান্নামীদের উল্লেখ করেছেন। কেননা, "تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا" অর্থাৎ বিপরীত বস্তুর উল্লেখের মাধ্যমে যে কোনো বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

সুতরাং ইতোপূর্বে যেসব মুখলিস ঈমানদারগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমের আকর্ষণে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন, জীবনের মায়া তুচ্ছ করে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হয়েছেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তোষ অর্জনের জন্য নিজের প্রাণকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি– তাদের আলোচনা করা হয়েছে, প্রশংসা করা হয়েছে, তারা যে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল ও মর্যাদার পাত্র হয়েছেন তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এরপর এখানে যারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেননি– কোনোরূপ যুক্তিযুক্ত ওজন না থাকা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম ﷺ -এর ডাকে সাড়া দেয়নি তাদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ লোকগুলো হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ না করে, শুধু যে হুদায়বিয়ার বরকত-রহমত ও মর্যাদাপ্রাপ্তি হতেই বঞ্চিত হয়েছে তা নয়; বরং তা হতে বিরত থেকে তারা মুসলমান ও নবী করীম ﷺ -এর সম্পর্কে কুধারণা, বদ আকীদা পোষণ করেছে, তাঁদের ধ্বংস ও নিপাত কামনা করেছে এবং নবী করীম ﷺ মদীনায় ফেরার পর তাঁর নিকট মিথ্যা ও বানোয়াট ওজর-আপত্তি পেশ করেছে– সে কারণে তারা মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই অন্যান্য মুনাফিকদের ন্যায় তাদেরও স্থায়ী নিবাস হবে জাহান্নামের গভীরতম স্থানে।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ ...... رَحِيْمًا : ইরশাদ হচ্ছে, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব ও সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যাকে চান শাস্তি দান করেন। আল্লাহ পাক অতিশয় ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, যারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়নি এবং নবী করীম ﷺ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর নিকট অনর্থক ওজর-আপত্তি পেশ করেছে, তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার– ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিল। এর জবাবে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আসমান-জমিনের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কব্জায় রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা আজাব দিতে পারেন। আমি তাঁর মতের বিরুদ্ধে কি করতে পারি? হ্যাঁ! তিনি দয়া করলে তোমাদের ক্ষমা করেও দিতে পারেন। কেননা তাঁর ক্রোধের উপর সর্বদাই দয়া ও রহমত বিজয়ী রয়েছে।

অনুবাদ :

١٥. سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ الْمَذْكُوْرُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ هِىَ مَغَانِمُ خَيْبَرَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا اُتْرُكُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ج لِنَاْخُذَ مِنْهَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ كَلِمَ بِكَسْرِ اللَّامِ اَىْ مَوَاعِيْدَهُ بِغَنَائِمِ خَيْبَرَ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ج اَىْ قَبْلَ عَوْدِنَا فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط اَنْ نُصِيْبَ مَعَكُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ فَقُلْتُمْ ذٰلِكَ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ اِلَّا قَلِيْلًا ـ مِنْهُمْ ـ

১৫. যারা [হুদায়বিয়া হতে] পেছনে রয়ে গেছে তারা শীঘ্রই বলবে অর্থাৎ উল্লিখিত মুনাফিকরা যখন তোমরা গনিমতের দিকে যাবে– তাহলো খায়বরের গনিমত– তা নেওয়ার জন্য আমাদের কে অবকাশ দাও সুযোগ করে দাও যাতে আমরা তোমাদের অনুগামী হতে পারি যাতে গনিমতের মালের অংশ গ্রহণ করতে পারি। তারা চায় তা দ্বারা আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করে দিতে এক কেরাতে [كَلٰمَ -এর স্থলে] كَلِمَ লাম অক্ষরটির যেরযোগে এসেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে খায়বরের গনিমত-এর ওয়াদা নির্ধারিত হওয়া। হে হাবীব! আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের অনুগামী হতে পারবে না। এরূপ আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বে বলেছেন অর্থাৎ [হুদায়বিয়া হতে] আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই। সুতরাং শীঘ্রই তারা বলবে; বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করছ। এ কারণে যে, আমরা তোমাদের সাথে গনিমতের মালে শরিক হয়ে যাব। এজন্যই তোমরা এরূপ বলেছ। বস্তুত তারা বুঝে না দীন তবে গুটি কতেক– তাদের মধ্য হতে [দীনি স্মরণ রাখে]।

١٦. قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ الْمَذْكُوْرِيْنَ اِخْتِبَارًا سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ اَصْحَابِ بَاْسٍ شَدِيْدٍ قِيْلَ هُمْ بَنُوْ حَنِيْفَةَ اَصْحَابُ الْيَمَامَةِ وَقِيْلَ فَارِسُ وَالرُّوْمُ تُقَاتِلُوْنَهُمْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ هِىَ الْمَدْعُوُّ اِلَيْهَا فِى الْمَعْنٰى اَوْ هُمْ يُسْلِمُوْنَ ج فَلَا تُقَاتِلُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا اِلٰى قِتَالِهِمْ يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا ـ

১৬. [হে হাবীব!] আপনি বলুন, যেই সকল বেদুইন [হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ হতে] পশ্চাতে রয়েছে উল্লিখিত [মুনাফিক]-দেরকে পরীক্ষার নিমিত্তে শীঘ্রই তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে এমন এক জাতির দিকে যারা প্রবল শক্তিধর– কেউ কেউ বলেছেন, তারা হলো ইয়ামামার অধিবাসী বনূ হানীফা। আর কারো কারো মতে তারা হলো পারস্য ও রোমবাসীগণ। তাদের সাথে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করবে এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ প্রকৃত পক্ষে এ [লড়াইয়ের] দিকেই তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে– যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তখন তোমরা আর তাদের সঙ্গে লড়াই করবে না। সুতরাং যদি তোমরা এটা মেনে নাও তাদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও যেমনটি নিয়েছিলে ইতোপূর্বে তাহলে তোমাদেরকে দেওয়া হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব ব্যথাদায়ক।

١٧ ১৭. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط فِي تَرْكِ الْجِهَادِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ج وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ عَذَابًا أَلِيْمًا .

অন্ধ, পঙ্গু এবং রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য কোনো অপরাধ নেই জিহাদ পরিহার করার ব্যাপারে। আর যে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রবেশ করাবেন يُدْخِلْهُ শব্দটি ي ও ن উভয়ের সাথে পড়া জায়েজ হবে। এমন জান্নাতে যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান। অপরদিকে যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তাকে [আজাব] দেবেন এখানে يُعَذِّبْهُ শব্দটি ي ও ن উভয়ের সাথে হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ এখানে كَلٰمَ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ ل -এর উপর যবর দিয়ে এর পরে একটি আলিফ বাড়িয়ে كَلَامْ পড়েছেন।

২. হামযাহ ও কেসায়ী (র.) প্রমুখ কারীগণ ل -এর নিচে যেরযোগে كَلِمْ পড়েছেন।

প্রথমোক্ত কেরাতে শব্দটি একবচন এবং শেষোক্ত কেরাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا الخ : অত্র আয়াতের প্রথমোক্ত بَلْ তথা بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا -এর দ্বারা হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণকারী গোত্রসমূহের মুসলমানদের বক্তব্য- لَنْ تَتَّبِعُوْنَا [তোমরা কখনো আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না]-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আর শেষোক্ত بَلْ তথা بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا দ্বারা মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর যে অপবাদ দিয়েছে- তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُعَذِّبْهُ وَيُدْخِلْهُ : يُدْخِلْهُ ও يُعَذِّبْهُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ ي যোগে يُعَذِّبْهُ ও يُدْخِلْهُ পড়েছেন। অর্থাৎ- صِيْغَةُ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ

২. হযরত নাফে' ও ইবনে ওমর (রা.) এ শব্দদ্বয়ে ي -এর পরিবর্তে ن যোগে نُعَذِّبْهُ ও نُدْخِلْهُ তথা جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর صِيْغَةْ দ্বারা পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا : لَنْ -এর দ্বারা যদিও সাধারণত ভবিষ্যতের সদা-সর্বদার জন্য নফী বুঝিয়ে থাকে তথাপি এখানে সর্বদার জন্য নফী উদ্দেশ্য নয়; বরং এই لَنْ সাময়িক নফী বুঝানোর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ তা শুধু খায়বরের যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লামা আলুসী (র.) بَحْرْ নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে মুজনিয়াহ ও জুহাইনাহ গোত্রদ্বয় খায়বরের পর কতিপয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে- সেই যুদ্ধসমূহে খোদ নবী করীম ﷺ -ও উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাঁর খেলাফতের যুগে ঐ বেদুইন গোত্রগুলোকে বিভিন্ন জিহাদে শরিক করেছিলেন। সুতরাং এসব ঘটনাপ্রবাহ হতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে لَنْ -এর مُطْلَقْ تَابِيْد [সর্বদা] -কে বুঝানো হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ : শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে ওমরা পালনের সফরে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর সাথে শরিক হওয়ার জন্য। কিন্তু মদীনার আশপাশের কতিপয় বেদুইন গোত্র যারা নতুন মুসলমান হয়েছিল এবং যাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল ছিল তারা ধারণা করল যে, কুরাইশরা অবশ্যই মুসলমানদের গতিরোধ করে বসবে এবং এমন সংঘর্ষ বাধবে যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাবে– তারা আর কখনো মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না। এ ধারণার বশীভূত হয়ে তারা নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারগণের সাথে ওমরায় অংশগ্রহণ করল না।

হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করত জানিয়ে দিলেন যে, হে হাবীব! আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন তখন সেই মুনাফিক বেদুইন গোত্রগুলো আপনার নিকট এসে অনর্থক ওজর-আপত্তি পেশ করবে এবং আপনাকে তাদের পক্ষ হতে ইস্তেগফার করার জন্য অনুরোধ করবে। আপনি তাদের কথা আদৌ বিশ্বাস করবেন না এবং তাদের ওজর কবুল করবেন না।

আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতি শীঘ্রই একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে সেই যুদ্ধে শুধু তারাই অংশগ্রহণ করবে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। আর কেবল তারাই সেই যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালিক হবে।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আরো জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যখন হুদায়বিয়ার সঙ্গীদেরকে নিয়ে খায়বরের যুদ্ধে রওয়ানা করবেন তখন সেই বেদুইন মুনাফিক গোত্রসমূহ তারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়নি, তারা আপনার সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করবে। আপনি কিন্তু তাদের সেই অনুরোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে বলে দেবেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ প্রেরণ করেছেন এটা রদবদল করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ ..... إِلَّا قَلِيْلًا : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার বৎসর ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাত্রার সময় মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে ওমরায় শরিক হতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মদীনার আশে-পাশে অবস্থিত কয়েকটি বেদুইন গোত্র, যেমন– গেফার, জুহাইনাহ, আসলাম প্রভৃতি ওমরায় অংশ গ্রহণ করেনি। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করতে গেলে কুরাইশদের সাথে তাদের বিপুল সংঘাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ অনেকটা হতাশ চিত্তে ব্যথিত মনে অথচ নিরাপদে হুদায়বিয়া হতে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তাদেরকে আশার বাণী শুনানো হয়। মদীনায় ফিরে গেলে উপরিউক্ত মুনাফিকরা কি কি বলবে, তাও নবী করীম ﷺ -কে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ সূরায় হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণকে যেসব সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে একটি ছিল– হুদায়বিয়াহ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর প্রথম যে যুদ্ধটি হবে তাতে শুধু হুদায়বিয়ায় বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণই অংশগ্রহণ করবেন এবং এটা হতে পাওয়া গনিমতের মাল শুধু তারাই ভোগ করবেন। অন্য কেউ না উক্ত যুদ্ধে শরিক হতে পারবে আর না তার গনিমতের অংশ পাবে। কিন্তু মুনাফিকরা যদিও মৃত্যুর আশঙ্কায় হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। তথাপি গনিমতের মালের লোভে তারা আসন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আরজু করবে। আপনি কিন্তু তাদের সেই আবেদন-নিবেদনে এতটুকুও কর্ণপাত করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে–

হে হাবীব! আপনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর যখন খায়বরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, যুদ্ধে যাত্রা করবেন, তখন হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণকারী সেই মুনাফিকরা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দাও। আর এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর দেওয়া ঘোষণাকে পাল্টিয়ে দিতে চায়।

হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা কোনোক্রমেই আমাদের সাথে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের প্রভু পূর্বেই তা বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা বলবে, তোমরা হিংসার বংশবর্তী হয়েই আমাদেরকে গনিমত হতে বঞ্চিত করার জন্যই এরূপ বলছ। মূলত তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকেরই দীনি জ্ঞান রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে كَلَامَ اللّٰهِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর তা'আলার ঘোষণাকে পাল্টিয়ে দিতে চায়। এখানে كَلَامَ اللّٰهِ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং-

১. জমহুর মুফাসসিরগণের মতে- كَلَامَ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাণী দ্বারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো, খায়বরের যুদ্ধ ও তার গনিমতের অংশীদার একমাত্র হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারীগণই হবে।

২. অথবা, এর দ্বারা খায়বরের যুদ্ধ হতে মুনাফিকদের বিরত রাখা সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে- "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা এখানে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ না করে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের প্রাপ্য হয়েছে। কিন্তু খায়বরে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সাথে শামিল হয়ে তারা আল্লাহর গজবকে পাল্টিয়ে রহমতের অধিকারী হতে চাইছে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, অত্র আয়াতে "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আগাম বক্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, খায়বরের যুদ্ধে যাত্রাকালে মুনাফিকরা এরূপ বলবে।

৫. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন যে, অত্র আয়াতে- "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীকে বুঝানো হয়েছে- فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا

অর্থাৎ হে হাবীব! তারা আপনার সাথে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা কখনো আমার সাথে যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না এবং আমার সাথে কখনো শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু শেষোক্ত মতটি মুহাক্কীকগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এ আয়াতখানি তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতখানা এর তিন বৎসর পূর্বে নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে এরূপই বলেছেন। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. আমরা মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা এরূপ বলবে- খায়বরে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন-নিবেদন করবে। আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে।

২. আমরা মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, খায়বরের যুদ্ধে তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে পারবে না।

৩. ইতোপূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা খায়বরে যাওয়ার আবেদন করলে আমরা যেন "لَنْ تَتَّبِعُوْنَا" [কখনো তোমরা আমাদের সাথী হতে পারবে না] বলে দেই।

৪. মুফতী শফী (র.) বলেছেন যে, كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ -এর দ্বারা وَحْىٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ তথা হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا : ইরশাদ হচ্ছে হে হাবীব! মুনাফিকরা যখন খায়বরে যাওয়ার জন্য আবদার করবে তখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে পারবে না, তখন তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা তো নিষেধ করেনি; বরং তোমরা চাচ্ছ যে, গনিমতের মাল সম্পূর্ণটার মালিক যেন তোমরা হতে পার। অন্য কেউ যেন এতে অংশীদার না হয়। মূলত তারা ছিল একেবারেই নিরেট বোকা ও অন্ধ! মুসলমানগণ কিরূপ দুনিয়াত্যাগী ও লালসাহীন, তারা যদি একবার চোখ খুলে তা দেখার চেষ্টা করত তা হলে কখনো এরূপ অযাচিত ও জঘন্য মন্তব্য করতে পারত না। ত্যাগ-তিতিক্ষাই যাদের জীবনের একমাত্র ব্রত তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ স্থান পাবে কি করে? আর নবী করীম ﷺ -এর ব্যাপারেও বা কি করে এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, তিনি হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে,

লোভ-লালসার শিকার হয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে বসেছেন? [নাউযুবিল্লাহ] একমাত্র মুনাফিকরাই যে পারে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ ও প্রিয় সাহাবীগণ (রা.)-এর ব্যাপারে এরূপ জঘন্য ও ঘৃণ্য মন্তব্য করত, তা বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ ..... عَذَابًا اَلِيْمًا : ইরশাদ হচ্ছে- হে হাবীব! যেই বেদুইন মুনাফিক গোত্রসমূহ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেনি, তারা যখন খায়বরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাবে তখন তা প্রত্যাখ্যান করত আপনি এর বিকল্প প্রস্তাব পেশ করবেন এবং বলবেন, শীঘ্রই এক পরাক্রমশালী জাতির সাথে লড়াই করার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়। যদি তোমরা এ ব্যাপারে আনুগত্য কর এবং লড়াই কর, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন- আর যদি পূর্বের ন্যায় পশ্চাদপসরণ কর তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন।

قَوْلُهُ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ : আলোচ্য আয়াতে قَوْم দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম যাহ্হাক (র.) ও এক দলের মতে। এখানে قَوْم দ্বারা বনূ সাকীফকে বুঝানো হয়েছে।
২. ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর মতে এখানে قَوْم -এর দ্বারা পারস্যবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
৩. কা'বে আহবার (র.)-এর মতে قَوْم -এর দ্বারা অত্র আয়াতে রোমবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে।
৪. আতা ও হাসান (র.) প্রমুখগণের মতে এখানে قَوْم -এর দ্বারা পারস্য ও রোমবাসী উভয়দেরকে বুঝানো হয়েছে।
৫. মুজাহিদ (র.) ও একদল মনীষীর মতে তারা হলো মূর্তি ও প্রতিমাপূজারী তথা পৌত্তলিক।
৬. কারো কারো মতে এর দ্বারা খায়বরের পরবর্তী যুদ্ধসমূহ উদ্দেশ্য।
৭. কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে قَوْم -এর দ্বারা মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কওম বনূ হানীফাকে বুঝানো হয়েছে- যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা.) সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। যার পরিণতিতে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসায়লামা নিহত হয় এবং বনু হানীফার লোকেরা পরাজিত হয়। হযরত জুবায়ের (রা.) এ মত পোষণ করেন।
৮. কেউ কেউ বলেছেন- এখানে قَوْم -এর দ্বারা ঐসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে তওবা করতে বাধ্য করেছিলেন।
৯. কারো কারো মতে এখানে قَوْم -এর দ্বারা হাওয়াজিন গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইকরিমা (রা.) এ মত পোষণ করেন।

মূলতঃ অত্র আয়াতে قَوْم -এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে- তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এটা দ্বারা মুনাফিকদেরকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। যদি তাদের মধ্যে ঈমানী নূর থাকে তা হলে যুদ্ধের পরিণতির কথা না ভেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিরোধীরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াতখানা নাজিল হলো- وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আর যদি তোমরা ইতোপূর্বে যেমনিভাবে হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণ করেছ তেমনি এ যুদ্ধ হতেও পশ্চাদপসরণ কর তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবে নিক্ষেপ করবেন"- তখন অন্ধ, পঙ্গু ও রুগ্ণ লোকজন যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ। তখন উপরিউক্ত আয়াতখানা নাজিল করত তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের হুকুম হতে তাদেরকে বহির্ভূত রাখা হয়।

২. ইতোপূর্বে যারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেনি, আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন; তাদের উপর আজাব ও গজবের কথা ঘোষণা করেছেন। এতে অন্ধ, পঙ্গু ও অক্ষম লোকজন– যারা ওমরায় ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল তারা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল করত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দান করেন।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : প্রতিবন্ধীদের উপর জিহাদ ফরজ নয় : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় এবং তাতে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়, তখন অন্ধ, খোঁড়া লোকেরা আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের সম্পর্কে কি আদেশ? তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ .....

অর্থাৎ যারা অন্ধত্বের কারণে বা পঙ্গু হওয়ার দরুণ জিহাদে যেতে অক্ষম হয়, এ ব্যাপারে তাদের কোনো গুনাহ নেই। তাদের জন্যে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে।

এর পাশাপাশি যারা সাময়িকভাবে রুগ্ণ হয়, তাদের রোগের কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হলেও তাদেরও গুনাহ হয় না, অবশ্য রোগ যেমন সাময়িক, এর অনুমতিও সাময়িক, অর্থাৎ যখন তারা আরোগ্য লাভ করবে, তখন পুনরায় তাদের প্রতি জিহাদের দায়িত্ব বর্তাবে।

তাবারানী (র.) হযরত জায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আদেশক্রমে [পবিত্র কুরআনের আয়াত] লিখছিলাম, কলম আমার কানের মধ্যে রাখা ছিল, যখন জিহাদের আদেশ হলো, ঠিক তখন একজন অন্ধ ব্যক্তি হাজির হলো এবং আরজ করলো, আমি তো অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ? ঐ মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত "لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ" নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যারা জিহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষম হয়, তাদের প্রতি এ দায়িত্ব নেই। –[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ৮০-৮১]

আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদিও প্রতিবন্ধীদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু যদি তারা কোনোভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কাদেসিয়ার জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। তিনি এ জিহাদে ইসলামের পতাকাবাহী ছিলেন। –[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ১০৫]

অনুবাদ :

١٨. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ هِيَ سَمُرَةٌ وَهُمْ اَلْفٌ وَّثَلْثُمِائَةٍ اَوْ اَكْثَرَ ثُمَّ بَايَعَهُمْ عَلٰى اَنْ يُنَاجِزُوْا قُرَيْشًا وَاَنْ لَّا يَفِرُّوْا عَلَى الْمَوْتِ فَعَلِمَ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا . هُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ بَعْدَ اِنْصِرَافِهٖ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ .

১৮. আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারগণের উপর যখন তারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন– হুদায়বিয়ায় বৃক্ষের নিচে এটা হলো বাবলা গাছ। আর তাদের সংখ্যা হলো এক হাজার তিন শত কিংবা ততোধিক। তথায় নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে এ কথার উপর বায়'আত করিয়েছেন যে, তারা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করবেন এবং মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যাবেন না। সুতরাং তাঁদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা জেনে নিলেন অর্থাৎ ওয়াদা পূর্ণ করা এবং সত্যবাদিতা। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর সাকীনা [প্রশান্তি] নাজিল করলেন এবং অচিরেই তাদেরকে একটি বিজয় দান করলেন। আর তা হলো হুদায়বিয়া হতে নবী করীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের পর খায়বরের বিজয়।

١٩. وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

১৯. আর বিরাট অংকের গনিমতের মাল তারা আহরণ করবে খায়বর হতে। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী মহাকৌশলী। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি উক্ত গুণে গুণান্বিত।

٢٠. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا مِنَ الْفُتُوْحَاتِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ غَنِيْمَةَ خَيْبَرَ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج فِيْ عَيَالِكُمْ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَهَمَّتْ بِهِمُ الْيَهُوْدُ فَقَذَفَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلِتَكُوْنَ اَيِ الْمُعَجَّلَةَ عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ اَيْ لِتَشْكُرُوْهُ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ نَصْرِهِمْ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا . اَيْ طَرِيْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَفْوِيْضِ الْاَمْرِ اِلَيْهِ تَعَالٰى .

২০. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেটা তোমরা আহরণ করবে– বিজয়সমূহ হতে অনন্তর অনতিবিলম্বেই তোমাদেরকে দান করেছেন এটা খায়বরের গনিমত। আর লোকদের [আক্রমণের] হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন অর্থাৎ তোমাদের পরিবার পরিজনকে [হেফজাত করেছেন] যখন তোমরা যুদ্ধে বের হয়েছিলে এবং ইহুদিরা তোমাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণের সংকল্প করেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আর যাতে হয় তা– অর্থাৎ অবিলম্বে প্রাপ্ত গনিমত এটা উহ্য বাক্যের উপর আত্ফ হয়েছে– আর তা হলো لِتَشْكُرُوْهُ [যাতে তোমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার।] ঈমানদারগণের জন্য নিদর্শন তাদের সাহায্যের ব্যাপারে আর যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখাতে পারেন সরল-সঠিক পথ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার এবং সকল বিষয় তাঁর উপর সোপর্দ করার পদ্ধতি।

٢١. وَأُخْرٰى صِفَةُ مَغَانِمَ مُقَدَّرٍ مُبْتَدَأٌ لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا هِيَ مِنْ فَارِسَ وَالرُّوْمِ قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ط عَلِمَ اَنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ـ اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

২১. আর অন্য এটা উহ্য مَغَانِمُ শব্দের সিফাত (صِفَتْ) হয়েছে আর তা হলো مُبْتَدَأ যা এখনো তোমাদের হাতে আসেনি তা হলো রোম ও পারস্য হতে প্রাপ্য গনিমত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, শীঘ্রই এটা তোমাদের হস্তগত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদা উক্ত গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ : এখানে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ টা رَضِيَ ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা اِذْ টা অতীতকালের জন্য ظَرْف-এর পর সর্বদাই جُمْلَة হয়ে থাকে। অতীকালের অবস্থার বর্ণনার ভিত্তিতে বাইয়াতের সুরতকে উপস্থিত করার জন্য مُضَارِعْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর تَحْتَ টা يُبَايِعُوْنَكَ -এর ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ سَمُرَ : এটা رَجُلَ-এর ওযনে বাবলা গাছ/ বাবুল বৃক্ষ। কেউ কেউ বলেন, ঝাউ গাছকে سُمُرَ বলা হয়।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يَفِرُّوْا عَلَى الْمَوْتِ : কোনো নুসখায় রয়েছে مِنَ الْمَوْتِ উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, মৃত্যু থেকে পলায়নের রাস্তা গ্রহণ করবে না। মুফাসসির (র.) مِنْ-এর পরিবর্তে عَلٰى এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক রেওয়ায়েতে এটাও রয়েছে যে, বায়'আত মৃত্যুর উপর হয়েছিল। আর অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, বায়'আত সুদৃঢ় থাকা ও পলায়ন না করার উপর হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَعَلِمَ : এখানে عَلِمَ-এর আতফ হয়েছে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ-এর উপর। এখন এ প্রশ্ন রয়ে গেল যে, মাতূফ হলো مُضَارِعْ আর مَعْطُوْف عَلَيْه হলো مَاضِيْ

এর জবাব হলো اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ টা مَاضِيْ-এর অর্থে। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَنْزَلَ : এর আতফ رَضِيَ-এর উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً : এর আতফ হয়েছে فَتْحًا قَرِيْبًا-এর উপর।

قَوْلُهُ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ : যেহেতু এটা অনুদান ও অনুগ্রহের স্থান, তাই উত্তম রূপে সম্বোধনের জন্য গায়েব থেকে খেতাবের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা আহলে হুদায়বিয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْفُتُوْحَاتِ : মুফাসসির (র) مِنَ الْفُتُوْحَاتِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই আতফ مُغَايَرَتْ-এর জন্য। অর্থ হলো প্রথম مَعْطُوْف عَلَيْه যা مَغَانِمَ كَثِيْرَةً-এর দ্বারা খায়বরের গনিমত উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় গনিমত যা مَعْطُوْف-এর দ্বারা খায়বর ব্যতীত অন্যান্য গণিমত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ غَنِيْمَةَ خَيْبَرَ : যদি এ আয়াত খায়বর বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়; যেমনটি সুস্পষ্ট, তবে পূর্ণ সূরাটা হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে অবতীর্ণ হয়নি। আর যদি এটি খায়বর বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয় তবে এটা অদৃশ্য সংবাদের অন্তর্গত হবে। আর ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্তকরণ বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে হবে। এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, পূর্ণ সূরা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'আসফানে'র নিকটবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ فِيْ عِيَالِكُمْ اَيْ عَنْ عِيَالِكُمْ : এটা عَنْ عِيَالِكُمْ হতে পরিবর্তিত। এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اُخْرٰى : আয়াত- "وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا" -এর মধ্যস্থিত اُخْرٰى -এর মহল্লে ই'রাব -এর ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা-

১. এটা (أُخْرٰى) রফার মহল্লে হবে। এমতাবস্থায় এর দুটি অবস্থা হবে। যথা–

ক. এটা (أُخْرٰى) মুবতাদা এবং "لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا" তার صِفَتٌ আর "قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا" তার خَبَرٌ -

খ. অথবা এটা উহ্য মুবতাদার خَبَرٌ

২. এটা مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হবে। মূল ইবারত হবে– وَ وَعَدَكُمْ اُخْرٰى অথবা فِعْلٌ مُضْمَرٌ عَلٰى شَرْطِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মানসূব হবে। ইবারত হবে– وَقَضَى اللّٰهُ اُخْرٰى الخ

৩. اُخْرٰى মাজরুর হবে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে رُبَّ মাহযূফ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : শানে নুযূল : হুদায়বিয়ায় মুসলমানগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট মৃত্যুর উপর যে বায়'আত করেছিলেন এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অত্র বাইয়াতের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ–

নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জুলকাআদ মাসে প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীগণসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে বাধা প্রদান করবে– মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাই সাধারণ পথ ত্যাগ করত পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে সাহাবীগণসহ তিনি হুদায়বিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং তথায় অবস্থান করলেন। কুরাইশদের পক্ষ হতে বুদায়েল বিন ওয়ারাকা, ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ এবং আরো কয়েকজন দূত পর পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। নবী করীম ﷺ তাদের মারফত কুরাইশদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমরা শুধু ওমরা পালনের উদ্দেশ্যেই এসেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মক্কা দখলের কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। কিন্তু কুরাইশরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল– তাদের একই কথা আমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না।

রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন মক্কায় প্রেরণের জন্য। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং হযরত ওসমান (রা.)-কে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। হযরত ওসমান (রা.) কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট নবী করীম ﷺ -এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সাথে হাদীর পশুও রয়েছে– সেগুলোকে ওমরা পরবর্তী কুরবানির উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়ে এসেছেন। কুরাইশরা তা মানতে রাজি হলো না। তারা বলল, ইচ্ছা হয় তুমি নিজেই বায়তুল্লার তওয়াফ করে যেতে পার। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ব্যতীত আমি ওমরা পালন করতে পারি না– বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারি না। কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ দিকে মুসলমানদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে। এতদশ্রবণে নবী করীম ﷺ -ও মর্মাহত হলেন। তিনি সাহাবীগণকে ডাকলেন। সমবেত সাহাবীগণ একটি বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, আমরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করব– হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব এবং মৃত্যুর ভয়ে ময়দান ত্যাগ করব না। এটাই ইতিহাসে "بَيْعَتِ رِضْوَانْ" হিসেবে খ্যাত।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াত কয়টি নাজিল হয়েছে। এতে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় আমরা কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ হতে এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, اَلْبَيْعَةَ - اَلْبَيْعَةَ অর্থাৎ বায়'আত গ্রহণ করুন– বায়'আত। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট দৌড়ে গেলাম। দেখলাম যে, তিনি একটি বৃক্ষের নিচে রয়েছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। এটাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন– لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে, যারা হুদায়বিয়ার অভিযানে শরিক হয়নি এবং এজন্যে ভিত্তিহীন ওজর-আপত্তি পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে খাঁটি মুমিনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা হুদায়বিয়ায় একটি বৃক্ষতলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হস্ত মোবারকে এ মর্মে বায়'আত করেছিলেন যে, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও রাসূলে কারীম ﷺ -কে সাহায্য করতে থাকবেন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন। আলোচ্য আয়াতে এমন ত্যাগী, নিবেদিত প্রাণ মুমিনগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

যে বৃক্ষের নিচে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল : হুদায়বিয়ায় যে গাছের নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান হয়েছে, আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তার নাম উল্লেখ করেছেন সামুরাহ বা বাবলা গাছ। বিভিন্ন বর্ণনা হতে উক্ত বৃক্ষটির নাম বাবলাই পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের দ্বিমত পরিলক্ষিত হয় না।

তবে যেই গাছটির নিচে বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল পরবর্তীতে তার কি পরিণতি হয়েছে– এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরীনে ইজামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তা নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর পক্ষ হতে পরবর্তী সময়ে উক্ত গাছটি মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং 'তাবাকাতে ইবনে সা'আদে' হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বাই'আতে রেদওয়ানের পর কয়েক বৎসর ধরে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত গাছটির খোঁজ করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাকে খুঁজে বের করতে পারেননি। কাজেই গাছটি যে ঠিক কোনটি ছিল এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

   তাবাকাত ইবনে সা'আদ এবং বুখারী-মুসলিমে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে– তিনি বলেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত মুসাইয়্যাব (রা.) বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি আমাকে বলেছেন বাইয়াতের পরের বৎসর যখন আমরা ওমরাতুল ক্বাজা পালনের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করলাম তখন তা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু অন্বেষণ করেও আমরা তার সন্ধান পাইনি।

   হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) হতে এও বর্ণিত আছে যে, একবার হজের যাত্রাপথে তিনি কতিপয় লোককে হুদায়বিয়ায় একটি গাছের নিচে নামাজ পড়তে দেখলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা এখানে নামাজ পড়ছ কেন? তারা বলল, এটা সেই গাছ যার নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণ যারা উক্ত বাইয়াতে শরিক ছিলেন তাঁরা বলেছেন, পরবর্তী বৎসর তাঁরা বহু খুঁজেও সে গাছটি শনাক্ত করতে পারেননি। অথচ তোমরা তাকে শনাক্ত করতে পেরেছ। সুতরাং বুঝা যায় যে, তোমরা সাহাবীগণ (রা.) হতেও এতদসম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ।

২. উক্ত বৃক্ষটি যার নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছে– তা পরবর্তীতেও পরিচিত ছিল। লোকজন এটাকে চিনত এবং বরকতের উদ্দেশ্যে তার নিচে নামাজ পড়ত।

৩. একদল আলেমের মতে উক্ত বৃক্ষটিকে কেটে ফেলা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা পরবর্তীতে উক্ত বৃক্ষের নিচে নামাজ পড়া শুরু করেছিল। বিষয়টি হযরত ওমর (রা.)-এর নজরে পড়লে তিনি লোকদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং বৃক্ষটি কেটে ফেললেন।

তাফসীরে ইবনে জারীরে উল্লেখ আছে যে, হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতের আমলে হুদায়বিয়ার নিকট দিয়ে একবার অতিক্রম করেছিলেন। তখন তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যে গাছটির নিচে বাইআত সংঘটিত হয়েছিল তা কোথায়? এতে একেকজন একেকটি দেখিয়েছিল। তখন তিনি তাদেরকে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করলেন।

উক্ত বৃক্ষটি কেন কাটা হয়েছিল? অথবা কেন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল? : নবী করীম ﷺ যে গাছটির নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা কেটে দেওয়া হয়েছে অথবা মানুষের অন্তর হতে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) সেটাকে কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তিনি দেখেন, লোকেরা তার নিচে ভীড় জমাচ্ছে– নামাজ পড়ছে এবং তাকে অসিলাহ বানিয়ে মঙ্গল কামনা করছে– তখন তিনি তা কাটার জন্য নির্দেশ দিলেন। কেননা কোনো বৃক্ষ মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ এর কারণ হতে পারে না। আর এর দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে শিরকের দিকে ধাবিত হতে পারে। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু উক্ত গাছটির নিচে একটি উত্তম কার্য সম্পাদিত হয়েছে এবং লোকেরা তাকে কল্যাণদাতা মনে করে অন্ধ আনুগত্যে মেতে উঠতে পারে এবং বাড়াবাড়ি করে ফেতনার সৃষ্টি করতে পারে সেহেতু মানুষের মন হতে এটাকে বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে বা গোপন করে ফেলা হয়েছে।

রাফেজী ও তাদের অনুসারীদের আকীদা খণ্ডন : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সকল সাহাবী এমন কি অপরাপর

সাহাবীগণকেও দোষারোপ করা, তাঁদের সমালোচনা করা, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। যেমনটি রাফেজী সম্প্রদায় করে থাকে। রাফেজীরা হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণের উপর কুফর ও নিফাকের অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। [নাউজুবিল্লাহ]

অথচ হুদায়বিয়ার এ ভয়াবহ মুহূর্তে আল্লাহর দীনের জন্য মৃত্যুবরণ ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানে একনিষ্ঠ-আন্তরিক এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে আত্মদানের ভাবধারায় পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চতর মানে উন্নীত ছিল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অনুরূপ সনদ প্রাপ্তির পর কেউ যদি তাঁদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে অথবা তাঁদের প্রতি রূঢ় ও খারাপ ভাষা ব্যবহার করে কিংবা বিষোদগার সৃষ্টির অপপ্রয়াস করে তখন তা খোদ আল্লাহ তা'আলার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর হবে।

অবশ্য কেউ ধারণা পোষণ করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁদের সন্তুষ্টির সনদ করেছিলেন তখন তাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু পরে আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। আর এরূপ ধারণা হবে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এক কঠিন ভ্রমে নিমজ্জিত হওয়া। কেননা এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে যে, তাদের ধারণা হলো যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে অত্র আয়াত নাজিল করেছিলেন তখন তিনি তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মূলত লোকেরা সাহাবীগণের ব্যাপারে অপবাদে জড়িয়ে পড়বে অমূলক ও ভিত্তিহীন ধারণায় লিপ্ত হবে বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে অকাট্যভাবে সাহাবীগণের সততা, সাধুতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন, তাঁদের চরিত্রকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সত্যায়িত করেছেন।

হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যাপারে মতবিরোধ : নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় কতজন সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কতজন বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হয়েছেন? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. সাহাবী হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে তাঁদের সংখ্যা [১৩০০] এক হাজার তিনশত জন বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র.) তাঁর সনদে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন–

عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (ضـ) قَالَ اِنَّهٗ ﷺ بَعَثَ عُثْمَانَ اِلٰى قُرَيْشٍ لِلصُّلْحِ فَاحْتَبَسَهٗ قُرَيْشٌ فَبَلَغَ النَّبِىَّ اَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا نَبْرَحُ حَتّٰى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ وَدَعَاهُمْ اِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعُوْا وَهُمْ اَلْفٌ وَّثَلٰثُ مِاَئةٍ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে বন্দী করে রাখল। নবী করীম ﷺ -এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা ফিরে যাবো না। অতঃপর নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। সেই সময় সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত জন।

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত অথবা ততোধিক।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশত।

৫. বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে কেউ কেউ বলেছেন যে, মদীনা হতে বের হওয়ার সময় তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত। পথে লোকসংখ্যা বেড়ে ক্রমান্বয়ে চৌদ্দশত ও পনেরশতে পৌঁছেছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক আজাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত জন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গোলামের সংখ্যা ছিল এক শত, তাছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা ছিল একশত। মোট সংখ্যা এক হাজার পাঁচ শত জন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– **فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا** অর্থাৎ সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে এক নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে 'নিকটবর্তী বিজয়' দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর দ্বারা খায়বরের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। খায়বরের যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল লাভ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, উক্ত গনিমতের মাল শুধুমাত্র যারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়েছে তারাই লাভ করবে এবং তারাই শুধু খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে হুদায়বিয়ায় গমন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখন হুদায়বিয়া হতে ফিরে এসেছেন এবং কতদিন মদীনায় অবস্থানের পর খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেছেন? এ ব্যাপারে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী তিনি জিলহজ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন এবং সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খায়বর গমন করেন, আর সফর মাসে তা বিজয় হয়। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কারো কারো মতে, হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম ﷺ বিশ দিন মদীনায় অবস্থান করত খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন মদীনায় অবস্থান করত নবী করীম ﷺ খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রতিশ্রুত সেই বিজয়ের কথা অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. উক্ত বিজয় যে অবশ্যই ঘটবে এবং এর সংগঠনের ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই তা বুঝাবার জন্যই অতীতকাল-জ্ঞাপক সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. সূরা فَتْحٌ -এর সম্পূর্ণ অংশ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়নি; বরং তার কিছু অংশ খায়বরের বিজয়ের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং খায়বরের বিজয় সংক্রান্ত এই আয়াতগুলো শেষোক্ত অংশভুক্ত।

খায়বর কখন বিজিত হয় : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন মতান্তরে বিশ দিন মদীনায় অবস্থান করত সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খায়বর আক্রমণ করলেন। আল্লাহ তা'আলার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নবী করীম ﷺ -এর সাথে উক্ত যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁরাই অংশগ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁর সাথে হুদায়বিয়ায় শরিক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ রাত্রি বেলায় খায়বরে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর দিনের বেলায় তাদের উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। খায়বর ছিল প্রভাবশালী ইহুদিদের বসতি। তাদের ছিল বহু দুর্ভেদ্য সুরক্ষিত দুর্গ। প্রথমত নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু তারা পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজিত হয়।

নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করতে পেরে অন্যান্য দুর্গের অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়, নবী করীম ﷺ তা গ্রহণ করেন। তাদের থেকে নগদ যে সম্পদ লাভ হয় তা মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাদের ভূমি এ শর্তে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যে, এর অর্ধেক ফসল তারা মুসলমানদেরকে দেবে। এই যুদ্ধে ১৫ জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন এবং ৯৩ জন ইহুদি নিহত হয়েছে।

বাইআতে রিদওয়ানে কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এতদসংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা যায়? : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ায় সাহাবীগণ হতে কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন? এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– بَايَعْنَا عَلٰى اَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ। অর্থাৎ সেদিন আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বাইআত গ্রহণ করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের ময়দান হতে পশ্চাদপসরণ করব না। আমরা মৃত্যুর উপর বায়'আত গ্রহণ করিনি।

২. অথচ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রা.) হতে এর বিপরীত নিম্নোক্ত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে–

"عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ"

অর্থাৎ হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি সালমাহ ইবনে আকওয়া' (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনারা হুদায়বিয়ার দিন নবী করীম ﷺ -এর হাতে কিসের উপর বায়'আত করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মৃত্যুর উপর।

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস দু'খানা হতে পরস্পর বিরোধী দুটি বক্তব্য সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস হতে সাব্যস্ত হয়, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন না করার উপর তাঁরা বায়'আত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা.)-এর হাদীস হতে প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর উপর বায়'আত হয়েছিল।

বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় : উপরিউক্ত পরস্পর বিরোধী হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে অত্র হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধিতা বা বৈপরীত্ব নেই। কেননা বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি যুদ্ধ হতে পশ্চাদপসরণ করব না। আর কেউ কেউ এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা মৃত্যুকে বাজি রেখে যুদ্ধ করব– অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করলেও আমরা যুদ্ধে পিছ পা হবো না।

আসলে হুদায়বিয়ায় তো সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করলেও হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণ করবেন না। সম্পূর্ণ বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে যারা অংশ বিশেষ শুনেছেন তারা তাই বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে যারা পুরোপুরি বক্তব্য শুনেছেন তাঁরা তদনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ .... مُسْتَقِيْمًا : হুদায়বিয়ার সন্ধির ধারাবাহিকতায় নাজিলকৃত অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বিজয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূলত অত্র আয়াতখানা এ কথারই ইঙ্গিতবহ যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য পরাজয়ের গ্লানি তো নয়ই; বরং তা ভবিষ্যতের হাজারো বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গনিমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যা তোমরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিজয় হতে অর্জন করবে। আর এখন নগদ তোমাদেরকে খায়বরের বিজয় দান করা হলো। আর লোকদের আক্রমণ হতে তোমাদেরকে হেফাজত করা হয়েছে। তোমরা বের হয়ে যাওয়ার পর যখন ইহুদিরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছেন।

আর এ নগদ পাওনার উপর যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর এবং আল্লাহ যে ঈমানদারদেরকে সাহায্য করে থাকেন তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে যায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা যাতে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাতে পারেন। আল্লাহর উপর যেন তোমরা তাওয়াক্কুল ও ভরসা করতে শিখ এবং নিজের সব বিষয় আল্লাহর উপর সমর্পণ করতে অভ্যস্ত হও।

আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী– "وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ" [আর লোকদের হাত তথা হামলা হতে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করেছেন] -এর মধ্যে اَلنَّاسُ দ্বারা মদীনার ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। মুসলমানগণ হুদায়বিয়ার দিকে বের হয়ে যাওয়ার পর ইহুদিরা এ মনস্থ করেছিল যে, তারা মুসলমানদের পরিবার-পরিজনের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন, ফলে তারা আর আক্রমণ করার সাহস পেল না।

কারো কারো মতে মুশরিকদের একটি গুপ্ত ঘাতকদল এ জন্য হুদায়বিয়ায় এসে পৌঁছল যে, সুযোগ বুঝে তারা নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করে দেবে। তারা কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল। এমনকি একজন মুসলমানকে শহীদও করে ফেলেছিল। সাহাবীগণ তাদেরকে বন্দী বানিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করলেন; কিন্তু দয়ার সাগর মহানবী ﷺ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

আরেক দল মুশরিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসল। কিন্তু মুসলমানগণ তাদেরকে বন্দী করে নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অপরদিকে এটাও আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত যে, উক্ত সময় কোনো শত্রুশক্তিও মদীনার উপর আক্রমণ করার সাহস পায়নি। অথচ চৌদ্দশত যোদ্ধা বাইরে চলে যাওয়ার পর মদীনা প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ইহুদি, মুনাফিক ও মুশরিকরা এ মুহূর্তে সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। সহজেই তারা অরক্ষিত মদীনা দখল করে নিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দিয়েছেন- সে কারণে তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

قَوْلُهُ وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا ..... شَىْءٍ قَدِيْرًا : খায়বরের পরও আরো বহু বিজয় ও গনিমত যে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করছে- এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

তোমাদের জন্য আরো বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল রয়েছে- যা এখনো তোমাদের হস্তগত হয়নি। রোম, পারস্য ও অন্যান্য রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে তোমরা তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলার নিশ্চিত জানা রয়েছে যে, তা তোমরা লাভ করবেই। আর আল্লাহ পাক তো সর্বশক্তিমান- তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। জয়-পরাজয়ের মালিক তিনি। যাকে ইচ্ছা জয়ের মাল্যে ভূষিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত করেন।

"আর এটা ভিন্ন অন্যান্য গনিমত যা তোমাদের হস্তগত হয়নি"-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا" আর এটা ছাড়া আরো বহু গনিমত রয়েছে যা এখনো তোমাদের হস্তগত হয়নি- অচিরেই তোমরা তার মালিক হবে।" এটার দ্বারা কোন গনিমত উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে নিম্নোক্ত মতপার্থক্য রয়েছে-

১. জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতে উক্ত গনিমতের মাল দ্বারা রোম ও পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিতব্য গনিমতের মালকে বুঝানো হয়েছে।

২. ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান, মুকাতিল, ইবনে আবী লাইলা (র.) প্রমুখ মনীষীগণের মতে এর দ্বারা মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়সমূহকে বুঝানো হয়েছে।

৬. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিজয়সমূহকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা হুনায়েনের বিজয় উদ্দেশ্য।

৪. হযরত কাতাদা ও হাসান (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. ইবনে জায়েদ ইবনে ইসহাক, যাহহাক (র.) প্রমুখ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী এর দ্বারা খায়বরের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা, বাইয়াতে রিদওয়ানের নগদ প্রতিদান খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে পাওয়া গেল। আর মক্কা বিজয় যদিও তাৎক্ষণিকভাবে হয়নি, তথাপি তা বাইয়াতে রিদওয়ানের বরকতেই পরবর্তীতে অর্জিত হয়েছে। বলা যায় মুসলমানদের পরবর্তী পর্যায়ের হাজারো বিজয়ের সোনালী সূচনা রচিত হয়েছিল এ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমেই।

অনুবাদ :

٢٢. وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْحُدَيْبِيَةِ لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا يَحْرُسُهُمْ وَّلَا نَصِيْرًا .

২২. আর যদি কাফেররা লড়াই করে তোমাদের সাথে হুদায়বিয়ায়- তাহলে অবশ্যই তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তারা কোনো মুরব্বি [বন্ধু] - ও পাবে না- যে তাদেরকে রক্ষা করবে আর না কোনো সাহায্যকারী পাবে।

٢٣. سُنَّةَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ مِنْ هَزِيْمَةِ الْكَافِرِيْنَ وَنَصْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ سَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ سُنَّةَ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا مِنْهُ .

২৩. আল্লাহর [চিরন্তন] নীতি হলো- এখানে سُنَّةَ শব্দটি مَصْدَرْ এটা তার পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবার্থ তথা কাফেরদের পরাজয় ও ঈমানদারদের সাহায্য করার জন্যে তাকিদ প্রদানকারী হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে নীতি হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন- যে, তিনি কাফেরদেরকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করবেন এবং ঈমানদারকে বিজয় দান করবেন। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তুমি আল্লাহ তা'আলার এ নীতিতে কোনোরূপ রদবদল ও পরিবর্তন দেখবে না। তা হতে।

٢٤. وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط فَاِنَّ ثَمَانِيْنَ مِنْهُمْ طَافُوْا بِعَسْكَرِكُمْ لِيُصِيْبُوْا مِنْكُمْ فَاُخِذُوْا وَاُتِىَ بِهِمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَفَا عَنْهُمْ وَخَلّٰى سَبِيْلَهُمْ فَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبُ الصُّلْحِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا . بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

২৪. তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাদের হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে বিরত রেখেছেন মক্কার উপত্যকায়- হুদায়বিয়ায় তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর- সুতরাং তাদের আশিজন তোমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য সুযোগ খুঁজে ফিরছিল। তখন তাদেরকে বন্দী করা হলো এবং রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। আর এটাই সন্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ তা'আলা দেখেন। এখানে تَعْمَلُوْنَ শব্দটি تَا ও ى উভয়ের সাথে পড়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই উক্ত গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰهِ : سُنَّةَ اللّٰهِ নসবের মহল্লে হয়েছে। এর পূর্বে একটি فِعْل উহ্য থেকে এটাকে নসব প্রদান করেছে। মূল ইবারত হবে- سُنَّةَ اللّٰهِ ذٰلِكَ سُنَّةَ

قَوْلُهُ تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ; অত্র আয়াতে يَعْمَلُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ تَعْمَلُوْنَ - ت যোগে جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ দ্বারা পড়েছেন।

২. আবূ আমর (র.) يَعْمَلُوْنَ - ى যোগে جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ হিসেবে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ ..... عَلَيْهِمْ : **শানে নুযূল :** অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা হতে কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুজানী (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমরা যখন হুদায়বিয়ায় ঐ বৃক্ষের নিচে অবস্থান করলাম যার উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে– এমতাবস্থায় আশিজন মুশরিক যুবক আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল– তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে অভিশাপ দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কারো সাথে চুক্তি করে এসেছ? নাকি কেউ তোমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ দান করেছে? তারা তা অস্বীকার করল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্তি দিয়ে দিলেন।

২. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ মুশরিকদের আশি জনের একটি দল মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র–শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তানঈম পাহাড়ের উপর দিয়ে এসেছিল। সাহাবীগণ তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসল এবং নবী করীম ﷺ তাদেরকে জীবন্ত ছেড়ে দিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াতটি নাাজিল হয়েছিল।

৩. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সত্তর অথবা আশিজন কুরাইশ কাফের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য তানঈম পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে এসেছিল। সাহাবীগণ (রা.) তাদের সকলকে বন্দী করে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাজির করলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি দিলেন না; বরং তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

৪. কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, একবার কতিপয় মুশরিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসল। সাহাবীগণ পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির করলেন। কিন্তু দয়াল নবী ﷺ তাদেরকে শাস্তি দিলেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্তি দিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ ..... وَلَا نَصِيْرًا : হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ বাহ্যত কিছুটা নতজানু হয়ে মক্কার কুরাইশ কাফেরদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। এতে সাহাবীগণ যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু এ সন্ধির মধ্যে মুসলমানদের জন্য এক সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত ছিল তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি। সুতরাং হুদায়বিয়াহ হতে বেদনাবিধুর ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরার পথে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতখানা নাজিল করে উক্ত সন্ধির নেপথ্য রহস্য সাহাবীগণকে বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁদের হতাশ অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

আল্লাহ তা'আলা এ জন্য হুদায়বিয়ায় তাঁর নবীকে সংঘর্ষের অনুমতি দেননি যে, যুদ্ধ বাধলে মুসলমানরা পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হতো; বরং এর পেছনে ভিন্ন রহস্য নিহিত ছিল। আর তা হলো, আপাতত রক্তক্ষয় ও সংঘর্ষ এড়িয়ে কুরাইশদেরকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিক হতে পরাস্ত করা। মুশরিকদের উপর মুসলমানদের নৈতিক ও আদর্শিক বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সামরিক দিক দিয়ে তারা আপনা আপনিই দুর্বল হয়ে পড়ে। আর বস্তুত হয়েছিলও তাই।

বস্তুত হুদায়বিয়ায় যদি মুশরিকরা তোমাদের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত এবং তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ বেধেই যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে মুশরিকরা পরাজিত হতো। কেউ অভিভাবক হয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতো না।

মূলত কাফেরদেরকে পরাজিত করা এবং ঈমানদারগণকে বিজয় দান করাই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি। কখনো তাঁর এ নীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে হকেরেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আর বাতিলকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নিতে হয় চিরবিদায়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ ..... بَصِيْرًا : আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি হুদায়বিয়ায় মুশরিকদেরকে তোমাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত রেখেছেন। অথচ তোমরা তো তাদেরকে বশ করেই বসেছিলে। আর আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদের সকল কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করেই থাকেন। সুতরাং তিনি তোমাদের হুদায়বিয়ায় কৃত কার্যকলাপও ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

নবী করীম ﷺ প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারত তথা ওমরা পালন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কুরাইশরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে সম্মত হলো না। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, কোনোক্রমেই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

বাহ্যত মুসলমানগণ খারাপ পরিস্থিতিতে ছিলেন। কেননা তারা তো ওমরার ইহরাম বেঁধে প্রায় নিরস্ত্রভাবে তথায় গিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য মাত্র একখানা তরবারি ছাড়া তাদের নিকট অস্ত্র বলতে আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া তাঁরা কেন্দ্র তথা মদীনা হতে বহু দূরে ছিলেন। অথচ মক্কা ছিল অতি নিকটে। কুরাইশরা ছিল অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের সমর্থনও তাদের পক্ষে ছিল। কাজেই যেকোনোভাবে তারা যুদ্ধ বেঁধে দিতে চেয়েছিল। মুসলমানদেরকে সংঘর্ষে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে সাহাবীগণ চরম ধৈর্য প্রদর্শনপূর্বক সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং একবার কতিপয় মুশরিক মুসলমানদের ভেতরে ঢুকে পড়ে গোলযোগের চেষ্টা করল। মুসলমানগণ সুকৌশলে তাদেরকে বন্দী করে ফেললেন। আবার একদা ফজরের সময় একদল মুশরিক অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসল। সাহাবীগণ তাদেরকেও কয়েদ করতে সক্ষম হলেন। নবী করীম ﷺ উদারতা প্রদর্শন করত সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই হুদায়বিয়ায় মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সামগ্রিক কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবে যুদ্ধ হলে মুসলমানরাই বিজয়ী হতেন। তথাপি পূর্বাপর ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সেদিন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মুসলমানগণ যা লাভ করতে পারত সন্ধির মাধ্যমে তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ كَفَّ ..... بِبَطْنِ مَكَّ : আল্লাহর বাণী- "هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ .... بِبَطْنِ مَكَّةَ" -এর মধ্যে بَطْنِ مَكَّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, بَطْن -এর দ্বারা হুদায়বিয়াকে এবং مَكَّةَ -এর দ্বারা হরেম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। بَطْن অর্থ পেট, অন্তর্নিহিত যেহেতু হুদায়বিয়া হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত সে কারণে তাকে بَطْنِ مَكَّةَ বলা যথার্থ হয়েছে। অথবা হুদায়বিয়াকে এ জন্য بَطْنِ مَكَّةَ বলা হয়েছে যে, এটা হেরেম শরীফের সংলগ্ন এলাকা।

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰ : আল্লাহ তা'আলা বাণী- "سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ" -এর মধ্যকার سُنَّةَ اللّٰهِ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা নবী-রাসূলগণের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন- অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ "আমিও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো।"

২. سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে পরিণামে হকপন্থিদেরই বিজয় অবধারিত। এ শর্তে যে, হক পন্থিগণ সামগ্রিকভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. অথবা سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অভ্যাসকে বুঝানো হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٥. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ عَنِ الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ وَالْهَدْىَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى كُمْ مَعْكُوْفًا مَحْبُوْسًا حَالٌ اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط اَىْ مَكَانَهُ الَّذِىْ يُنْحَرُ فِيْهِ عَادَةً وَهُوَ الْحَرَمُ بَدْلُ اِشْتِمَالٍ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۤءٌ مُّؤْمِنٰتٌ مَوْجُوْدُوْنَ بِمَكَّةَ مَعَ الْكُفَّارِ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ بِصِفَةِ الْاِيْمَانِ اَنْ تَطَئُوْهُمْ اَىْ تَقْتُلُوْهُمْ مَعَ الْكُفَّارِ لَوْ اُذِنَ لَكُمْ فِى الْفَتْحِ بَدْلُ اِشْتِمَالٍ مِنْ هُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ اَىْ اِثْمٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج مِنْكُمْ بِهٖ وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ لِلصِّنْفَيْنِ بِتَغْلِيْبِ الذُّكُوْرِ وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوْفٌ اَىْ لَاُذِنَ لَكُمْ فِى الْفَتْحِ لٰكِنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيْهِ حِيْنَئِذٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ج كَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ لَوْ تَزَيَّلُوْا تَمَيَّزُوْا عَنِ الْكُفَّارِ لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ حِيْنَئِذٍ بِاَنْ نَاْذَنَ لَكُمْ فِىْ فَتْحِهَا عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا .

২৫. তারা তো সেই লোক যারা কুফরি করেছে এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে বিরত রেখেছে অর্থাৎ সেথায় পৌঁছা হতে এবং হাদী [কুরবানির জন্তু] এটা كُمْ জমীরের উপর আত্ফ হয়েছে। যাকে বারণ করা হয়েছে। বাধা প্রদান করা হয়েছে। এটা حَالٌ (مَعْكُوْفًا) হয়েছে। তার যথাস্থানে পৌঁছা হতে অর্থাৎ ঐ স্থানে পৌঁছা হতে যেথায় সাধারণত তাকে জবাই করা হয়। আর তা হলো হেরেম শরীফ। এটা بَدْلُ اِشْتِمَالٌ হয়েছে। আর যদি কিছু ঈমানদার নর-নারী না হতো, মক্কায় কাফেরদের সাথে অবস্থিত যাদের সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই ঈমানদার হিসেবে যে তোমরা তাদেরকে পদদলিত করবে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে- যদি তোমাদেরকে বিজয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। এটা هُمْ হতে بَدْلُ اِشْتِمَالٌ হয়েছে। ফলে তাদের কারণে তোমাদের উপর গুনাহ আরোপিত হতো। مَعَرَّةٌ অর্থ পাপ। অজানাবশত তোমাদের সম্পর্কে তা [না জানা থাকার কারণে] আর নামবাচক (هُمْ) সর্বনাম নর ও নারী উভয়ের জন্য হয়েছে- নরকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তা হলে অবশ্যই তোমাদেরকে বিজয়ের অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু এমতাবস্থায় এ জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি যে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে প্রবেশ করাতে পারেন যেমন উল্লিখিত ঈমানদারগণকে [প্রবেশ করিয়েছেন।] যদি তারা দূরে সরে যেত কাফেরদের দল হতে পৃথক হয়ে যেত তাহলে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য হতে যারা কাফের। তখন আমি তোমাদেরকে মক্কা বিজয়ের অনুমতি দিতাম। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পীড়াদায়ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ...... وَالْهَدْيَ : আল্লাহর বাণী– "هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ" -এর মধ্যস্থিত اَلْهَدْيَ শব্দটির মধ্যে একাধিক কেরাত বিদ্যমান। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে ه -এর উপর জবর এবং د জযম ও ى -এর মধ্যে জবর হবে। অর্থাৎ– اَلْهَدْيَ -

২. আবূ আসেম ও ওমর (র.) প্রমুখগণের মতে د যেরযোগে এবং ى তাশদীদযোগে اَلْهَدِيَّ হবে।

৩. اِبْنِ خَالِدِيَه -এর তিনটি لُغَتْ বর্ণনা করেছেন– ক. اَلْهَدْىُ খ. اَلْهَدِيُّ ও গ. اَلْهُدْىُ –[কামালাইন]

اَلْهَدْيَ শব্দটির কেরাতের ন্যায় মহল্লে ইরাবের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন–

১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মতে اَلْهَدْيَ শব্দটি মানসূব হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা– ক. পূর্ববর্তী صَدُّوْكُمْ -এর كُمْ যমীরের উপর আতফ হবে। খ. অথবা, مَفْعُوْل مَعَهٗ হবে।

২. কেউ কেউ এটাকে مَرْفُوْع পড়েছেন। এ হিসেবে যে, এটা فِعْل مُقَدَّر مَجْهُوْل -এর نَائِب فَاعِلْ হয়েছে। ইবারত হবে এরূপ– وَصُدَّ الْهَدْيُ

৩. এক বর্ণনায় আবূ আমর এটাকে مَجْرُوْر পড়েছেন। এমতাবস্থায় তা اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর উপর আতফ হবে।

قَوْلُهُ مَحِلَّهٗ : مَحِلَّهٗ -এর মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে দুটি اِحْتِمَالْ রয়েছে।

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা اَلْهَدْيَ হতে بَدْل اِشْتِمَالْ হবে।

২. অথবা এর হরফে জার হজফ বা উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। মূলত ইবারত হবে– عَنْ اَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ আর جَارّ ও مَجْرُوْر মিলিত হয়ে صَدُّوْا অথবা مَعْكُوْفًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ الخ : শানে নুযূল : হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় মক্কায় এমন কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন সঙ্গত কারণে হিজরত করে মদীনায় আসতে পারেননি। তাছাড়া এমন বহু লোকও ছিল যারা পরবর্তীতে ঈমান আনবে বলে আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। আর তখন যুদ্ধ বেঁধে গেলে তাদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাঁদের শানে উক্ত আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

হযরত আবূ জুমআ জুনযুব ইবনে সাবআহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন– আমি দিনের প্রথমাংশে কাফের অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। অথচ দিনের শেষাংশে মুসলমান অবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমরা তিনজন পুরুষ ও সাতজন মহিলা এই দলভুক্ত ছিলাম। আমাদের শানেই আয়াতে কারীমা– وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ الخ নাজিল হয়েছে। –[তাবারানী, লুবাব]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ .... بِغَيْرِ عِلْمٍ : হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তোমাদেরকে হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ করা এবং মক্কা বিজয় করার অনুমতি না দেওয়ার কারণ হলো তখন মক্কায় কাফেরদের সাথে এমন বহু ঈমানদার নর-নারী রয়ে গেছে যাদের ঈমানদার হওয়া তোমাদের জ্ঞাত ছিল না। আর সে অজ্ঞতার কারণে কাফেরদের সাথে তোমরা তাদেরকেও হত্যা করতে এবং পাপী সাব্যস্ত হতে।

মুসলমানগণ যে, আন্তরিকতার সাথে দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্যে অটল ছিলেন তা আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। আর কাফেরদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। এ অবস্থায় করণীয় ছিল মুসলমানদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে শায়েস্তা করা; কিন্তু এক সুদূরপ্রসারী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে তা বাস্তবায়িত করা হয়নি। উক্ত কল্যাণের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। যথা–

যখন হুদায়বিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মক্কায় এমন কিছু ঈমানদার নর-নারী ছিলেন যারা নিজেদের ঈমান লুকিয়ে রেখেছিলেন অথবা নিজেদের অসহায়ত্বের দরুন হিজরত করে মদীনায় যেতে অপারগ ছিলেন বিধায় মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছিলেন। কাজেই এমতাবস্থায় যুদ্ধ বাঁধলে কাফের মুশরিকদের সাথে উক্ত ঈমানদারগণও নিহত হতেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে অনুশোচনা ও পরিতাপের সৃষ্টি হতো এবং কাফেররা অপবাদ দেওয়ার সুযোগ পেত যে, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের দীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ উক্ত ঈমানদারগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। অপরদিকে মুসলমানদেরকেও কলঙ্ক, দুর্নাম এবং অনুশোচনার হাত হতে হেফাজত করেছেন। আর এ কারণেই যুদ্ধ অনুমোদন করেননি।

২. আল্লাহ তা'আলা বিপুল রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে মক্কা বিজয় কামনা করেননি; বরং সামরিক দিকের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিক দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। সুতরাং হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলামের আদর্শবাদ যখন জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তখন মূর্তিপূজার নিগূঢ় বন্ধন ছিন্ন করে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। যদ্দরুন মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে প্রায় বিনা রক্তপাতে মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করে নিলেন।

قَوْلُهُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الخ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যদি মক্কায় অবস্থিত মুসলমানগণ কাফেরদের হতে পৃথক হয়ে যেতো, যদি তাদেরকে কাফেরদের হতে পৃথক করা সম্ভব হতো এবং কাফেরদেরকে আক্রমণ করলে তাদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করতাম এবং তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু যেহেতু তখন যুদ্ধ সংঘটিত হলে কাফেরদের সাথে মক্কায় অবস্থিত ঈমানদারগণকে অজ্ঞাতসারে নিহত হতে হবে এজন্যই আমি যুদ্ধের অনুমতি দান করিনি।

কাফেরদের সাথে যদি ঈমানদারগণ মিশে থাকে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ হবে কিনা? : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সাথে যদি মুসলিমগণ মিশ্রিত থাকে অমুসলিমদের উপর হামলা করলে মুসলিমগণও হামলার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে এহেন পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের উপর হামলা করা জায়েজ নেই।

সুতরাং আবূ যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে কাসেম (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি মুশরিকদের কোনো ক্যাম্পে তাদের কর্তৃক অধিকৃত কিছু মুসলমানও তাদের সাথে থাকে তাহলে কি ঐ ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে? ইবনে কাসেম (র.) বললেন, ইমাম মালেক (র.)-কেও ঠিক এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল- 'আমরা কি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব" এমতাবস্থায় যে, তাদের ক্যাম্পে মুসলমান বন্দীও রয়েছে? ইমাম মালেক (র.) উত্তরে বলেছেন, এটা করা জায়েজ হবে না। কেননা মক্কাবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ যদি ঈমানদারগণ কাফেরদের হতে পৃথক হয়ে যেত তাহলে আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রদান করতাম।

সুতরাং উপরিউক্ত অবস্থায় যদি কেউ ঐ ক্যাম্পে আক্রমণ করে এবং কোনো মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে তাকে দিয়ত ও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অবশ্য আক্রমণকারীর যদি পূর্ব হতে জানা থাকে যে, উক্ত ক্যাম্পে মুসলমান রয়েছে তা হলেই কেবল উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি উক্ত ক্যাম্পে মুসলমান আছে কিনা- তা জানা না থাকে এবং এমতাবস্থায় আক্রমণ করে তাহলে দিয়ত ও কাফ্ফারা কিছুই আদায় করতে হবে না। তাছাড়া মুসলিমগণ তো তখনই কাফেরদের ক্যাম্পে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে যখন নিশ্চিত হয় যে, তথায় কোনো মুসলমান নেই।

٢٦. اِذْ جَعَلَ مُتَعَلِّقٌ بِعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاعِلٌ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْاَنَفَةَ مِنَ الشَّىْءِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ بَدَلٌ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَهِىَ صَدُّهُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى اَنْ يَعُوْدُوْا مِنْ قَابِلٍ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُفَّارَ حَتّٰى يُقَاتِلُوْهُمْ وَاَلْزَمَهُمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَلِمَةَ التَّقْوٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاُضِيْفَتْ اِلَى التَّقْوٰى لِاَنَّهَا سَبَبُهَا وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْكُفَّارِ وَاَهْلَهَا ط عَطْفُ تَفْسِيْرِىٍّ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا . اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ وَمِنْ مَعْلُوْمِهِ تَعَالٰى اَنَّهُمْ اَهْلُهَا .

অনুবাদ :

২৬. যখন ভরে নিয়েছিল– এটা عَذَّبْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ কাফেররা– এটা فَاعِلٌ তাদের অন্তরে অহমিকা অহঙ্কার জাহিলিয়াতের অহমিকা এটা পূর্ববর্তী اَلْحَمِيَّةَ হতে بَدَل (حَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ) হয়েছে। আর তা হলো তাদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন। সুতরাং তাঁরা এ মর্মে মুশরিকদের সাথে সন্ধিতে সম্মত হলেন যে, পরবর্তী বৎসর তাঁরা [ওমরা করার জন্য] পুনরায় আসবেন। আর কাফেরদের ন্যায় তাঁরা অহমিকায় লিপ্ত হননি। নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন। আর তাদের উপর অপরিহার্য [অত্যাবশ্যক] করে দিলেন– অর্থাৎ ঈমানদারদের তাকওয়ার কালিমা তথা "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" ; এখানে كَلِمَةَ -কে এ জন্য তাকওয়ার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা তাকওয়ার কারণেই মানুষ তা পাঠ করে থাকে। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিক হকদার– উক্ত কালিমার, কাফেরদের তুলনায়। আর [তারাই ছিল] এর যোগ্য পাত্র– এটা আত্ফে তাফসীর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি সর্বদাই উক্ত গুণে গুণান্বিত। আর আল্লাহ তা'আলার এটাও জানা রয়েছে যে, তারাই এ কালিমার উপযুক্ত পাত্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ এখানে اِذْ শব্দটি ظَرْف বা مَفْعُوْل فِيْه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে।

এখানে اِذْ -এর মধ্যে যে فِعْل টি আমল করেছে তাকে উহ্য ধরা হবে অথবা তা উল্লেখ রয়েছে বলে গণ্য হবে।

সুতরাং যদি এর মধ্যে আমলকারী فِعْل উল্লেখ আছে বলে ধরা হয়, তাহলে তার দুটি অবস্থা হবে। যথা–

১. এর মধ্যে আমলকারী فِعْل হলো صَدُّوْا ; মূলত বাক্যটি এরূপ হবে– وَصَدُّوْكُمْ حِيْنَ جَعَلُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الخ অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে তখন বারণ করেছে যখন তাদের অন্তরে অন্ধ অহমিকা স্থান করে নিয়েছিল।

২. অথবা إِذْ-এর উপর আমলকারী فِعْل হলো- لَعَذَّبْنَا ; মূল ইবারত হবে- لَعَذَّبْنَاهُمْ حِيْنَ جَعَلُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الخ অর্থাৎ যখন তারা তাদের অন্তরে অন্ধ অহমিকা ও মিথ্যা আভিজাত্যকে স্থান দিয়েছিল তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

অপর দিকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, إِذْ-এর মধ্যে আমলকারী فِعْل উহ্য রয়েছে তাহলেও এর দুটি অবস্থা হবে। যথা-

১. একটি হলো, إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ অর্থাৎ যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অন্ধ আভিজাত্যবোধ ও ঘৃণ্য অহমিকাকে স্থান দিয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে হেফাজত করেছেন।

২. দ্বিতীয়টি হলো- أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ অর্থাৎ কাফেররা যখন মিথ্যা অহংকার ও দাম্ভিকতায় মেতে উঠেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর ইহসান করেছেন এবং তোমাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ : এর আতফ উহ্যের উপর হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ- فَضَاقَتْ صُدُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। كَلِمَةُ التَّقْوٰى অর্থাৎ سَبَبُ التَّقْوٰى-এর ইযাফত أَدْنٰى مُنَاسَبَتْ-এর কারণে হয়েছে। আবার কেউ কেউ تَقْوٰى-এর পূর্বে أَهْلَ উহ্য মেনেছেন অর্থাৎ كَلِمَةُ أَهْلِ التَّقْوٰى তথা আল্লাহ তা'আলা বদরবাসীদের জন্য খোদাভীরু লোকদের কথা পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهُ أَهْلَهَا : এটা أَحَقَّ بِهَا এর- عَطْف تَفْسِيْرِىْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الْجَاهِلِيَّةِ : আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, হুদায়বিয়ার দিন কাফের কুরাইশরা জাহিলিয়াতের অন্ধ অহমিকায় মেতে উঠেছিল। অত্র আয়াতে মুসলিমগণ এ বৎসর ওমরা পালন করতে পারবে না; বরং আগামী বৎসর এসে বিশেষ ব্যবস্থায় ওমরা পালন করতে হবে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর পরিবর্তে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর পরিবর্তে مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ লিখতে হবে, কোনো মুশরিক মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; কিন্তু কোনো মুসলমান দীন ত্যাগ করে মক্কায় আসলে তাকে মদীনায় ফেরত দেওয়া হবে না- ইত্যাকার শর্তারোপ জাহিলিয়াতের ঘৃণ্য অহমিকা ও মিথ্যা দম্ভ ছাড়া আর কি? হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেররা যে ঔদ্ধত্য ও অহমিকা দেখিয়েছিল তা কোনো আদর্শের জন্য ছিল না; বরং তা ছিল হিংসা-বিদ্বেষ ও বর্বরতামূলক। এটা কোনো ন্যায়নীতির জন্য ছিল না; বরং তা ছিল তাদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের অমূলক আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। এ বিদ্বেষের কারণেই তারা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণের (রা.) বিরোধিতায় গর্জে উঠে। এ জন্যই তারা নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের জন্য মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। কুরবানির পশুগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে জবাই করতে দেয়নি।

মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে এ ভাবনাই তাদের জন্য বড় বাধ সাজিয়েছিল যে, লোকেরা বলবে কুরাইশরা মুসলমানদের ভয়ে তাদের নিকট নত হয়ে তাদেরকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। তারা ভেবেছে যে, এমনটি করতে দিলে আরবের অন্যান্য গোত্রেরসমূহের নিকট তারা মুখ দেখাতে পারবে না। তাদের ইজ্জত রক্ষা হবে না। কিন্তু কাউকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে দিলে কুরাইশ মুশরিকদের আভিজাত্যে আঁচড় লাগবে, তাদের সম্ভ্রমে আঘাত লাগবে- এটা জাহিলিয়াতের জিদ ও দাম্ভিকতা বৈ আর কি হতে পারে?

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা দাম্ভিকতার কথা তুলে ধরেছেন এবং এর নিন্দা করেছেন। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণকে বর্বরতামূলক জিদ হতে রেহাই দিয়েছেন। তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেছেন, তাদের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। সন্ধির শর্তাবলি মুসলমানদের ইচ্ছার সম্পূর্ণরূপে পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى الخ : অত্র আয়াতে "كَلِمَةَ التَّقْوٰى" -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– তাকওয়ার কালেমা হলো– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানা এর প্রমাণ–

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابِهٖ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১. ইবনে জারীর (র.)-ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে উল্লেখ করেছেন যে, كَلِمَةُ التَّقْوٰى -এর দ্বারা- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -কে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তাকওয়ার কালেমা হলো ইখলাস।

৪. হযরত আতা (র.)-এর মতে তাকওয়ার কালেমা হলো–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৫. হযরত আলী (রা.) বলেছেন– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তাকওয়ার কালেমা হলো– شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৭. কারো কারো মতে এখানে– كَلِمَةُ التَّقْوٰى বলতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -কে বুঝানো হয়েছে।

৮. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেছেন– তাকওয়ার কালেমা দ্বারা– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৯. হযরত ওবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণিত আছে– তাকওয়ার কালেমা দ্বারা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

প্রকাশ থাকে যে, كَلِمَةُ التَّقْوٰى -এর মধ্যে اَدْنٰى تَلَبُّسْ তথা সামান্যতম সম্পর্কের দরুন ইজাফত হয়েছে। অবশ্য تَقْوٰى -এর দ্বারা যদি اَهْلِ تَقْوٰى উদ্দেশ্য হয় তা হলে اِضَافَت حَقِيْقِيَّة হবে।

অনুবাদ :

২৭. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ج رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ اَنَّهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ اٰمِنِيْنَ وَيُحَلِّقُوْنَ وَيُقَصِّرُوْنَ فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ اَصْحَابَهُ فَفَرِحُوْا فَلَمَّا خَرَجُوْا مَعَهُ وَصَدَّهُمُ الْكُفَّارُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَجَعُوْا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ وَرَابَ بَعْضُ الْمُنَافِقِيْنَ نَزَلَتْ وَقَوْلُهُ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِصَدَقَ اَوْ حَالٌ مِنَ الرُّؤْيَا وَمَا بَعْدَهَا تَفْسِيْرٌ لَهَا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ لِلتَّبَرُّكِ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ اَىْ جَمِيْعَ شُعُوْرِهَا وَمُقَصِّرِيْنَ اَىْ بَعْضَ شُعُوْرِهَا وَهُمَا حَالَانِ مُقَدَّرَتَانِ لَا تَخَافُوْنَ ط اَبَدًا فَعَلِمَ فِى الصُّلْحِ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا مِنَ الصَّلَاحِ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ اَىِ الدُّخُوْلِ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ هُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ وَتَحَقَّقَتِ الرُّؤْيَا فِى الْعَامِ الْقَابِلِ ـ

২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্নকে যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। হুদায়বিয়ার বৎসর [মদীনা হতে] বের হওয়ার পূর্বে নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর সাথীগণ– নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করেছেন– এবং তাঁরা মাথার চুল মুণ্ডাচ্ছেন এবং চুল ছোট করছেন। সুতরাং তিনি তাঁর সাহাবীগণকে তা অবগত করালেন। সাহাবী এতদ্শ্রবণে অত্যন্ত খুশি হলেন। অতঃপর যখন তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে বের হলেন এবং হুদায়বিয়ায় কাফেররা তাঁদেরকে বাধা প্রদান করল, তখন তাঁরা ফিরে আসলেন। এতে তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। আর কিছু মুনাফিক [নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্নের ব্যাপারে] সংশয় পোষণ করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়। আর আল্লাহর বাণী– بِالْحَقِّ [শব্দটি] صَدَقَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অথবা, এটা رُؤْيَا হতে حَالٌ হয়েছে। এর পরবর্তী বাক্য এর জন্য তাফসীর [ব্যাখ্যা] হয়েছে। যদি আল্লাহ তা'আলা চান তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। এখানে اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ টি বরকতের জন্য হয়েছে। নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডানো অবস্থায় অর্থাৎ মাথার সমস্ত চুল এবং চুল কর্তন করা অবস্থায় অর্থাৎ মাথার আংশিক চুল। আর এ শব্দদ্বয় حَالٌ مُقَدَّرٌ হয়েছে। তোমরা ভীত হবে না। কখনো সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অবগত হয়েছেন সন্ধির ব্যাপারে যেটা তোমরা জানতে না তার সুফল ও কল্যাণ কাজেই তিনি দান করেছেন তোমাদেরকে তা ব্যতীত– অর্থাৎ প্রবেশ ব্যতীত নিকটবর্তী বিজয়- তা হলো খায়বরের বিজয়। আর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্ন পরবর্তী বৎসর বাস্তবায়িত হয়েছে।

২৮. هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ اَىْ دِيْنَ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ط عَلٰى جَمِيْعِ بَاقِى الْاَدْيَانِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ اَنَّكَ مُرْسَلٌ بِمَا ذُكِرَ ـ

২৮. আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর রাসূল ﷺ -কে হেদায়েত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। বিজয়ী করার জন্য তাকে– অর্থাৎ অকাট্য সত্য দ্বীনকে সমস্ত দীনের উপর অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত দীনের উপর। আর সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এ ব্যাপারে যে, নিঃসন্দেহে আপনি উল্লিখিত বিষয়াদিসহ প্রেরিত হয়েছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলার বাণী– "فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا" -এর মধ্যে فَتْح قَرِيْب বা নিকটবর্তী বিজয় দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে আলেমগণ হতে বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. এটার দ্বারা খায়বর বিজয় উদ্দেশ্য। এটাই প্রসিদ্ধ মত।

২. এটার দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে।

৩. এটার দ্বারা হুদায়বিয়া পরবর্তী সকল বিজয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : আল্লাহর বাণী– لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ -এর মধ্যে بِالْحَقِّ -এর মুতা'আল্লাক -এর ব্যাপারে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান। যথা–

ক. بِالْحَقِّ পূর্ববর্তী صَدَقَ ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

খ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য شِبْه فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অর্থাৎ– صَدَقَ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

গ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য شِبْه فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে যা اَلرُّؤْيَا হতে حَالْ হয়েছে। اَلرُّؤْيَا مُتَلَبِّسَةً بِالْحَقِّ অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা এমতাবস্থায় উক্ত স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা যথাযথ ছিল।

ঘ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য فِعْل অর্থাৎ اُقْسِمُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে। এমতাবস্থায় এটা কসম হবে। আর لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ হবে তার জবাব। এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه তথা স্বতন্ত্র বাক্য হবে এবং اَلرُّؤْيَا -এর মধ্যে وَقْف করতে হবে।

قَوْلُهُ اٰمِنِيْنَ : اٰمِنِيْنَ শব্দটি পূর্ববর্তী لَتَدْخُلُنَّ ফে'লের যমীর اَنْتُمْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। اٰمِنِيْنَ فِىْ حَالِ الدُّخُوْلِ لَا تَخَافُوْنَ عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা মাসজিদুল হারামে সম্পূর্ণ নিরাপদে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের শত্রুকে এতটুকুও ভয় করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ .... بِالْحَقِّ : বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ায় গমনের পূর্বে নবী করীম ﷺ স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং তথায় সাহাবীগণসহ হলক ও কসর করেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেরদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন এবং সে বৎসরের জন্য মক্কায় প্রবেশ স্থগিত রেখে হুদায়বিয়ায় ইহরাম ভেঙ্গে ফেললেন ও কুরবানির পশুগুলো তথায় জবাই করে ফেললেন, তখন সাহাবীগণ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্বপ্নের সত্যতা কোথায়? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতখানা নাজিল করেন। –[লুবাব]

ইবনে কাছীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবীগণ (রা.)-সহ মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন। মদীনা হতে রওয়ানার পূর্বে তিনি সাহাবীগণকে তা অবগতও করেছিলেন। সাহাবীগণের ধারণা ছিল নবী করীম ﷺ এ বৎসর অবশ্যই ওমরা পালন করবেন। কিন্তু যখন হুদায়বিয়ায় এ মর্মে সন্ধি স্থাপিত হলো যে, মুসলমানগণ এ বৎসর ওমরা পালন করতে পারবে না; বরং আগামী বৎসর বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তারা কাজা ওমরা পালন করবে। তখন বহু সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। এমন কি হযরত ওমর (রা.) অকপটে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহে যাবো এবং এর তওয়াফ করব? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছি যে, তুমি এ বৎসরই যাবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না। নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, তুমি অবশ্যই বায়তুল্লাহে যাবে এবং এর তওয়াফ করবে। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তদ্রূপ উত্তর দিয়েছেন, যেমনটি দিয়েছিলেন নবী করীম ﷺ। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উক্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কেন ইনশাআল্লাহ বলেছেন– অথচ তিনি নিজেই তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ চান অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আলোচ্যাংশে তো আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঈমানদারগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেবেন। সুতরাং এতে আবার ইনশাআল্লাহ বলার কি আছে? এটাকে তাঁর ইচ্ছার সাথে শর্তারোপিত করার কি অর্থ হতে পারে?

মুফাসসিরীনে কেরাম এটার তাৎপর্য উল্লেখ করতে যেয়ে লিখেছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এটার দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো– মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার দিন নিজেদের পেশি শক্তি প্রদর্শন করেছিল। গায়ের জোরে তারা মুসলমানদের উপর এক অসম চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে, তারা যা চাইবে তাই হবে। আসলে ব্যাপার তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যা চাইবেন তাই হবে। আর তিনি যা চাইবেন না তা কস্মিনকালেও হবে না, হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করবেন কেউই তা রুখতে পারবে না। মূলত হুদায়বিয়ার বৎসর মুসলমানগণের মক্কা বিজয়ের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেননি, বিধায় তা হয়নি। যদি ইচ্ছা করতেন তা হলে মুসলমানগণ অবশ্যই মক্কা বিজয় করতে পারত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাফেরদের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করাতে পারতেন।

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সবকিছুই তাঁর মহান সত্তার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

ওমরাতুল কাজার ঘটনা অথবা لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ আয়াতের বাস্তবরূপ : হুদায়বিয়ার সন্ধির মর্মানুযায়ী নবী করীম ﷺ পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ সপ্তম হিজরিতে ওমরা পালন করার জন্য সাহাবীগণ (রা.) সহ মক্কায় গেলেন। একেই ওমরাতুল কাজা বলে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী এ ওমরায় ঐসব সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সাথে ছিলেন যাদেরকে হুদায়বিয়ায় বাধা দেওয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা নবী করীম ﷺ -এর আগমনের সংবাদ শুনে মাসজিদুল হারাম হতে বের হয়ে দারুন-নদওয়ায় এসে একত্র হলো– নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ (রা.)-কে দেখার জন্য। তারা পরপর বলাবলি করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথীগণ খুবই জীর্ণ-শীর্ণও ভুখা-নাংগা অবস্থায় আছে। নবী করীম ﷺ এটা শুনলেন। মাসজিদুল হারামে প্রবেশের পর চাদরের ভেতর হতে ডান কাঁধ বের করলেন, যেটা তওয়াফের নির্ধারিত নিয়ম। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আজ যারা এ মুশরিকদেরকে তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবে তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এর পর সাহাবীগণ (রা.) সম্মিলিতভাবে দৌড়িয়ে তিন বার তওয়াফ করলেন। রুকনে ইয়ামানী এবং হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন।

ওমরাতুল কাজায় নবী করীম ﷺ যুলহুলায়ফায় এসে ইহরাম বেঁধেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুরবানির পশুও ছিল। মুসলমানগণ তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের সাথে মক্কায় প্রবেশের সময় শুধুমাত্র খাপে ঢাকা একটি তরবারি ছিল। সতর্কতার খাতিরে মদীনা হতে রওয়ানার সময় কিছু তীর-বল্লমও সাথে ছিল; কিন্তু সেগুলো আজুজ নামক স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এ ওমরাতুল কাজার সময় নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। হযরত মায়মূনা (রা.) তাঁর বোন উম্মে ফজল (রা.)-কে তাঁর বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করেছিলেন। উম্মে ফজল (রা.) ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী। তিনি হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ প্রদানের উক্ত অধিকার হযরত আব্বাস (রা.)-কে দিয়েছিলেন। আর হযরত আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাথে তাঁকে বিবাহ দিয়েছিলেন।

কাফেরদের নেতারা এ সময় মক্কা হতে বের হয়ে পড়ল। কেননা এ দৃশ্য তাদের জন্য অসহনীয় ছিল। অন্যান্য মক্কাবাসীরা মক্কায় অবস্থান করত নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ (রা.)-এর ওমরা পালনের দৃশ্য অবলোকন করল। নবী করীম ﷺ কুরবানির পশুগুলোকে 'জী-তুয়া' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর উটে আরোহণ করলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) উটের লাগাম ধরে তাকে চালাচ্ছিলেন। আর এভাবে নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য হলো, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাপূর্ণ হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। তৃতীয় দিন কুরাইশরা হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উজ্জাহর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলকে নবী করীম ﷺ -এ নিকট পাঠালেন। তারা কুরাইশদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন যে, এখন আপনার মুদ্দত তথা সন্ধিস্থিত নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আপনি চলে যান। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। আমরা এখানে বিবাহ করে ভোজের আয়োজন করব। তোমাদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হবে। কুরাইশরা বলল, তোমাদের দাওয়াতের প্রয়োজন নেই আমাদের। এর পর সাহাবীগণসহ নবী করীম ﷺ মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হযরত মায়মুনা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানের ভার আবূ রাফে' (রা.)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি হযরত মায়মুনা (রা.) -সহ সারেফ (سَرِفْ) নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তথায় তাঁর সাথে নবী করীম ﷺ বাসর উদ্‌যাপন করলেন। জিলহাজ মাসে মদীনায় এসে পৌছলেন। –[সীরাতে ইবনে হিশাম]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ الخ এ صَدَقَ -এর অর্থ কি? ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীতকাল জ্ঞাপক সীগাহ দ্বারাই প্রকাশের হেতু কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন।"

صَدَقَ-এর অর্থ : صَدَقَ শব্দটি كَذَبَ -এর বিপরীত। এমন সংবাদ ও ভাষণ যার সাথে বাস্তবতার মিল রয়েছে তাকে صَدَقَ বা সত্য বলা হয়। পক্ষান্তরে যে সংবাদ ও ভাষণের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নাই তাকে বলে كَذَبَ বা মিথ্যা।

নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন। বস্তুত নবীগণের স্বপ্ন হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও ওহী ছিল। নবী করীম ﷺ -কে স্বপ্নে প্রতারণা করার ক্ষমতা শয়তানকে দেওয়া হয়নি। অবশ্য যে বৎসর তিনি তা স্বপ্নে দেখেছিলেন সে বৎসর তা বাস্তবায়িত হয়নি; বরং তা বাস্তব রূপ লাভ করতে আরো একটি বৎসর লেগে গিয়েছিল। সুতরাং সপ্তম হিজরির জুলকা'দাহ মাসে ওমরাতুল কাজায় তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

হজ ও ওমরায় হলক এবং কসরের হুকুম কি? এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? : حَلْق [হলক] -এর অর্থ হলো মাথা মুণ্ডানো এবং قَصْر [কসর] -এর অর্থ হলো মাথার চুল কর্তন করা। হজ ও ওমরার মধ্যে মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল কর্তন করা ওয়াজিব।

ওমরা ও হজের সমাপ্তি পর্যায়ে হলক বা কসর করা হয়ে থাকে। হলক বা কসর না করা পর্যন্ত হজ ও ওমরার কাজের নিয়ত হতে মুক্ত হওয়া যায় না। হজ বা ওমরা পালনকারীকে যাবতীয় কার্যাদি শেষ করত হলক বা কসর করে ইহরামের কাপড় খুলতে হয়।

হজ ও ওমরা পালনকারীর জন্য হলক বা কসর যেকোনো একটি করলেই চলবে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে হলকই হলো উত্তম, কেননা হাদীস শরীফে এসেছে নবী করীম ﷺ হলককারীর জন্য তিন বার দোয়া করেছেন এবং কসরকারীর জন্য দোয়া করেছেন মাত্র একবার।

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন– হুদায়বিয়ার দিন কেউ কেউ হলক করল, আবার কেউ কেউ কসর করল। নবী করীম ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা হলককারীদের উপর রহম করুন! সাহাবীগণ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কসরকারীগণ! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা হলক ও কসরকারী উভয়ের উপর অনুগ্রহ করুন!

কাজেই উপরিউক্ত হাদীস হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, হলক করা কসর অপেক্ষা উত্তম।

অনুবাদ :

٢٩. كَمَا قَالَ تَعَالَى مُحَمَّدٌ مُبْتَدَأٌ رَسُولُ اللّٰهِ خَبَرُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَيْ أَصْحَابُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَشِدَّاءُ غِلَاظٌ عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَرْحَمُوْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ خَبَرٌ ثَانٍ أَيْ مُتَعَاطِفُوْنَ مُتَوَادُّوْنَ كَالْوَالِدِ مَعَ الْوَلَدِ تَرٰىهُمْ تُبْصِرُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا حَالَانِ يَبْتَغُوْنَ مُسْتَانِفٌ يَطْلُبُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ عَلَامَتُهُمْ مُبْتَدَأٌ فِيْ وُجُوْهِهِمْ خَبَرُهُ وَهِيَ نُوْرٌ وَبَيَاضٌ يُعْرَفُوْنَ بِهِ فِي الْاٰخِرَةِ أَنَّهُمْ سَجَدُوْا فِي الدُّنْيَا مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ط مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الْخَبَرُ أَيْ كَائِنَةً وَأُعْرِبَ حَالًا مِنْ ضَمِيْرِهِ الْمُنْتَقِلِ إِلَى الْخَبَرِ ذٰلِكَ أَيِ الْوَصْفُ الْمَذْكُوْرُ مَثَلُهُمْ صِفَتُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ج مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ بِسُكُوْنِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا فَرَاخَهُ فَاٰزَرَهُ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ قَوَّاهُ وَأَعَانَهُ فَاسْتَغْلَظَ غَلُظَ فَاسْتَوٰى قَوِيَ وَاسْتَقَامَ عَلٰى سُوْقِهِ أُصُوْلِهِ جَمْعُ سَاقٍ -

২৯. যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– মুহাম্মদ এটা মুবতাদা আল্লাহর রাসূল এটা তার খবর এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ এটাও মুবতাদা। এর খবর হলো– অতি কঠোর পাষাণ হৃদয়ের কাফেরদের প্রতি তারা কাফেরদের উপর দয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীল দয়ালু এটা দ্বিতীয় খবর। পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতাপূর্ণ বন্ধু ভাবাপন্ন। যেমন পিতা সন্তানের প্রতি হয়ে থাকেন। তুমি তাদেরকে দেখবে– অবলোকন করবে তাদেরকে রুকু ও সিজদারত– এতদুভয় حَالْ হয়েছে। তারা কামনা করে এটা স্বতন্ত্র বাক্য, তালাশ করে আল্লাহর করুণা এবং সন্তোষ, তাদের চিহ্ন তাদের আলামত– এটা মুবতাদা। তাদের চেহারায় বিদ্যমান, এটা তার খবর। আর তা হলো আলো ও শুভ্রতা যা দ্বারা আখিরাতে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে যে, তারা পৃথিবীতে [থাকাকালে] সিজদা করেছে। সিজদার চিহ্ন– খবর [অর্থাৎ فِيْ وُجُوْهِهِمْ] যার সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে এটাও ঠিক তার সাথেই مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আর তা হলো كَائِنَةً এর মধ্যে حَالْ -এর ই'রাব দেওয়া হয়েছে; সেই যমীরের দরুন, যা খবরের দিকে রুজু করেছে। তা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলি [তাদের এমন] গুণাবলি সিফাত যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাতে – এটা মুবতাদা ও খবর এবং তাদের এমন গুণাবলি যার উল্লেখ রয়েছে ইঞ্জীলে এটাও মুবতাদা এবং খবর। এমন একটি কৃষি ক্ষেতের ন্যায় যে তার অঙ্কুর বের করে। شَطْأَ শব্দটির ط অক্ষরটি জযম ও যবরযোগে উভয়ভাবে পড়া যায়। অর্থাৎ তার অঙ্কুর। অতঃপর এটাকে দৃঢ় করছে। أَزَرَ শব্দটি মদসহ ও মদ ছাড়া দুভাবেই পড়া যায়। এটাকে সুদৃঢ় করেছে। ফলে এটা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে। মোটা ও তরতাজা হয়েছে। অতঃপর তা সোজা হয়েছে– শক্তিশালী হয়েছে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের কাণ্ডের উপর তার মূলের উপর– سُوْقٌ শব্দটি سَاقٌ -এর বহুবচন।

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ اَىْ زِرَاعَهُ لِحُسْنِهِ مِثْلُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ بَدَؤُوْا فِىْ قِلَّةٍ وَضُعْفٍ فَكَثُرُوْا وَقَوُوْا عَلٰى اَحْسَنِ الْوُجُوْهِ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ط مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ اَىْ شَبِهُوْا بِذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ اَىِ الصَّحَابَةِ لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيْضِ لِاَنَّ كُلَّهُمْ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا . اَلْجَنَّةَ وَهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ اَيْضًا فِىْ اٰيَاتٍ .

অনুবাদ : কৃষকদেরকে তা মুগ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তার সৌন্দর্য দর্শনে কৃষক অভিভূত ও খুশি হয়ে পড়ে। এর দ্বারা সাহাবীগণের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেননা তাঁদের যাত্রা শুরু হয় সংখ্যার স্বল্পতা ও দুর্বলতা নিয়ে। অতঃপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাঁরা অত্যন্ত চমৎকার শক্তিমত্তার অধিকারী হলেন। যাতে তাঁদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন এটা একটি উহ্য فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে, পূর্ববর্তী বাক্যের দ্বারা তা বোধগম্য হয় অর্থাৎ তাদেরকে সেটার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে তাদের মধ্য হতে অর্থাৎ সাহাবীগণ (রা.), এখানে مِنْ জাতীয়তা বর্ণনার জন্য হয়েছে– অংশবিশেষ বুঝানোর জন্য হয়নি। কেননা তাদের সকলের মধ্যেই উক্ত গুণ বিদ্যমান। মাগফিরাত ও মহা বিনিময়ের অর্থাৎ জান্নাত। সাহাবীগণের পরবর্তী লোকদের জন্যও মাগফিরাত ও জান্নাত রয়েছে– যা অন্যান্য আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ : আল্লাহর বাণী– "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ الخ" -এর মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর তা নিম্নোক্ত তিনটি দিকের বিবেচনায় مَرْفُوْع হতে পারে–

১. مُحَمَّدٌ মুবতাদা এবং رَسُوْلُ اللّٰهِ তার خَبَرٌ এমতাবস্থায় এটা هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ -এর তাকিদ হবে।

২. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এটা একটি مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর خَبَرٌ এর ; মূল বাক্যটি হবে– هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ سَبَقَ ذِكْرُهٗ الخ অর্থাৎ তিনিই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ যার আলোচনা ইতোপূর্বে "اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ" -এর মধ্যে করা হয়েছে।

৩. مُحَمَّدٌ মুবতাদা আর رَسُوْلُ اللّٰهِ হবে عَطْف بَيَانٌ এখানে رَسُوْلُ اللّٰهِ টা مَدْح -এর জন্য হবে, تَمْيِيْز -এর জন্য হবে না।

قَوْلُهُ سِيْمَاهُمْ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সিজদার কারণে তাদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান।

এখানে سيماهم -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন–

১. এর দ্বারা সেই আলো উদ্দেশ্য যা দ্বারা কিয়ামতের দিন ঈমানদার ও নামাজি হিসেবে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইমাম তাবারানী (র.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণনা করেছেন যে, سِيْمَاهُمُ النُّوْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তাদের মুখায়বের নিদর্শন বলতে কিয়ামত দিবসের আলোকে বুঝানো হয়েছে।

২. এর দ্বারা সিজদার দীর্ঘতার কারণে নামাজির শরীরে সিজদার স্থানসমূহে যেই চিহ্ন পড়ে থাকে তাকে বুঝানো হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা অধিকহারে নামাজ পড়ে দিনের বেলায় তার চেহারা উদ্ভাসিত দেখা যায়।

৩. শহর ইবনে হাওশাব (র.) বলেছেন, [পরকালে] সিজদার চিহ্নসমূহ পূর্ণিমার রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

৪. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর দ্বারা خُشُوْع এবং خُضُوْع উদ্দেশ্য।

৫. সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর মতে এর দ্বারা সিজদার মাটি যা কপালে লেগে থাকে, তাকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ : এখানে مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ-এর مِنْ এর একটি উহ্য شِبْه فِعْل তথা كَائِنَةً-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ الخ : আল্লাহর বাণী- ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ-এর মধ্যে ذَالِكَ টা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা মুবতাদা এবং পরবর্তী বাক্য এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَشِدَّاءُ : আল্লাহর বাণী- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الخ-এর মধ্যস্থ اشداء-এর মধ্যে একাধিক কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে اَشِدَّاءُ-এর হামযাহ অক্ষরটি مَرْفُوْع হবে।

২. হযরত হাসান (রা.)-এর মতে اَشِدَّاءَ-এর হামযা অক্ষরটির উপর نَصْب হবে।

قَوْلُهُ شَطْاَهُ : আল্লাহর বাণী- كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ-এর মধ্যস্থিত شَطْاَهٗ-এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেরাতসমূহ বিদ্যমান-

১. জমহুর ক্বারীগণ "ط" অক্ষরটির উপর সাকিন দিয়ে شَطْاَهٗ পড়েছেন।

২. জুহরী ও ইবনে আবু ইসহাক হামযা বাদ দিয়ে شَطَهٗ পড়েছেন।

৩. ইবনে কাসীর (র.) ও জাকওয়ান (র.)-এর উপর জবর দিয়ে شَطَاَهٗ পড়েছেন।

৪. আনাস, নসর ইবনে আসেম ও ইয়াহইয়া ইবনে আদাব (র.) এটাকে عَصَاهٗ-এর অনুরূপ شَطَاهٗ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কার মুশরিকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও ওমরা পালনের জন্য এসেছে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ আসল, কুরাইশ মুশরিকরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এতে নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ খুবই মর্মাহত হলেন। রাসূলে করীম ﷺ একটি বাবলা গাছের তলদেশে সাহাবীগণ (রা.) হতে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন এবং কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ হতে পশ্চাদপসরণ করবেন না। মোটকথা, তারা হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যার সংবাদ সত্য ছিল না। মুশরিকরা তাঁকে বন্দী করেছিল মাত্র। অতঃপর তিনি সশরীরে ফিরে আসলেন।

এ দিকে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমর নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসল। সে অনেকগুলো অসম শর্ত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল। নবী করীম ﷺ শান্তির খাতিরে সবকিছু অকপটে মেনে নিলেন। সন্ধি চুক্তি লিখার সময় হযরত আলী (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখলে তাদের পক্ষ হতে ঘোর আপত্তি উঠল। তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখতে বাধ্য করল। এমন কি চুক্তিপত্রে বিসমিল্লাহ লিখাও তারা বরদাশত করল না। সন্ধির সমুদয় শর্তাবলি এমন ছিল যে, তা মুসলমানগণের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল অত্যন্ত অকার্যকর। যাদের সাথে যুদ্ধ করে জীবন দিতে সাহাবীগণ একটু পূর্বে নবী করীম ﷺ-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে সাহাবীগণের (রা.)-এর অন্তর মোটেই সায় দিচ্ছিল না। হযরত ওমর (রা.)ও ক্ষোভে দুঃখে নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করেই বসলেন যে, আপনি যে আল্লাহর রাসূল এটা কি সত্য নয়? আমরা যে হকের উপর রয়েছি তা কি ঠিক নয়? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, সবই সত্য। হযরত ওমর (রা.) পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন, তা হলে নতজানু হয়ে সন্ধি করার কি হেতু থাকতে পারে? কিন্তু এত কিছুর পরও সন্ধির অন্তর্নিহিত কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে শান্তি ও সমঝোতার খাতিরে নবী করীম ﷺ তা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র আয়াতটি নাজিল করে দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যথা-

১. অত্র আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সান্ত্বনা দান করত তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান করা হয়েছে। মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে একটি অপমানজনক সন্ধি যে তাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং উক্ত সন্ধির মধ্যে বিশেষ হিকমত নিহিত রয়েছে– তা জানিয়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

২. মুশরিকরা যে, নবী করীম ﷺ -কে রাসূল বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে অত্র আয়াতে তা খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে রাসূল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করেছেন তখন মুশরিকরা কি বলল না বলল, কুরাইশরা তাকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করল কি করল না তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বে তিনি রাসূল হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। এমন কি পরকালেও তাকে রাসূল হিসেবেই সম্বোধন করা হবে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা একদিকে মুশরিকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ : সমগ্র কুরআনে শেষ নবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলি ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ আহবানের স্থলে يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গাম্বরকে নাম সহকারে আহবান করা হয়েছে : যেমন – يَا عِيْسٰى - يَا مُوْسٰى - يَا إِبْرَاهِيْمُ সমগ্র কুরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর নাম 'মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফেররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ কুরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ : এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি : এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি; বরং তারা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্য কুরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কুরআনও তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফেরদের মোকাবিলায় বজ্র-কঠোর সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহবান জানায়। কুরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালোবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোনো কিছুই নিজের জন্য নয়, বরং সব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে– مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, "সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর ছিলেন এ কথার অর্থ এই যে. এ স্থলে আত্মীয়তা. বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না. পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কুরআনের ফয়সালা এই যে– لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ ...... أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ

অর্থাৎ যেসব কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন না। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমন কি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকু-সিজদা ও নামাজে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামাজ سِيْمَا هُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামাজ তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাজ ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সিজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাজের ফলে উপরিউক্ত চিহ্ন খুব বেশি ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাতে বেশি নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ নামাজিদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ : উপরে সাহাবায়ে কেরামের সিজদা ও নামাজের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তাওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলে তাঁদের আরো একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোনো কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সুচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরো মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন। আর তাঁরা হলেন- পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.), নারীদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ -এ পাঠবিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর فِى الْاِنْجِيْلِ -এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়।

২. فِى التَّوْرٰىةِ -এ পাঠবিরতি না করা, বরং فِى الْاِنْجِيْلِ -এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে মুখমণ্ডলের নূরের সাব্যস্ত করা।

৩. فِى التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِى الْاِنْجِيْلِ -এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ -কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। বর্তমান যুগে তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কুরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোনো নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তাওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীল আছে। ঈমাম বগভী (র.) বলেন, ইঞ্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। -[মাযহারী]

বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে–
খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালোবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। –[তাওরাত : বাবে ইস্তেরা]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী (র.) খ্রিস্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য ফিন্ডার নামক পাদ্রীর জবাবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বললে, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মতো, যাকে কেউ ক্ষেত বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। –[ইঞ্জীল: মাত্তা]

ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কুরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে, সে বলল, আল্লাহর রাজত্ব এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অঙ্কুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরি দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা কাটায় সময় এসে গেছে। –[ইযহারুল হক খ. ৩, ৩১০ পৃ.]
আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে। তা তাওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

قَوْلُهُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিকতা দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র.) বলেন, একবার আমরা ইমাম মালেক (র.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করে যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন, যার অন্তরে কোনো একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। –[কুরতুবী]

ইমাম মালেক (র.) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সেও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا : مِنْهُمْ-এর مِنْ অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক مِنْ -এর ব্যবহার কুরআনে প্রচুর যেমন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ; এখানে مِنَ الْأَوْثَانِ বলে رِجْس-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে مِنْهُمْ বলে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে مِنْ-কে 'কত' এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থি। কেননা যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিদওয়ানে শরিক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার প্রতি পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন–
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ আল্লাহ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারো সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোনো-না-কোনো সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আব্দুল বার (র.) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত

উদ্ধৃত করে লিখেন- وَمَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا অর্থাৎ আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনো অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারো কারো বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদিল ও সিকাহ।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গুনাহ : কুরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে আরো অনেক আয়াতে এই উল্লিখিত হয়েছে- لَقَدْ رَضِيَ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا

এ ছাড়া আরো অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে। যেমন-

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ.

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ 'হুসনা' তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় 'হুসনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সমময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরো এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,] তাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমন কি অর্ধ মুদেরও না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি। -[বুখারী]

হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্যে থেকে নিম্নোক্ত চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)। -[বাযযার]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ.

অর্থাৎ আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাঁদের ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আজাবে আক্রান্ত করবেন। -[তিরমিযী]

এ সম্পর্কে আয়াত ও হাদীস অনেক। আর সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত।

সূরা হুজুরাত

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম হলো– হুজুরাত। হুজুরাত শব্দের অর্থ– ঘরের চার দেয়াল। এ সূরার চতুর্থ নম্বর আয়াতটি হতে সূরার নামটি চয়ন করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে– إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঘরের চার দেয়ালের পিছন হতে ডাকাডাকি করে। আয়াতে উল্লিখিত حُجُرَاتٌ [হুজুরাত] শব্দটিকে পূর্ণ সূরার নাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এ সূরাতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ [অর্থাৎ অংশ বিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নামকরণ করা] -এর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। ইবনে মরদিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা হুজুরাত মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়। ইবনে মরদিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

এ সূরায় ১৮ টি আয়াত ৩৪৩ টি বাক্য এবং ১৪৭৬ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার ফজিলত ও আমল : যদি কেউ সূরা হুজুরাত লিপিবদ্ধ করে গৃহের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে তবে সে গৃহে জিন-ভূত আসবে না।

যদি এ সূরা লিখে তা ধৌত করে কোনো দুগ্ধবতী মাকে পান করানো হয়, তবে তার দুধ বৃদ্ধি পায়। আর যদি সে অন্তঃসত্ত্বা হয় তবে তার গর্ভস্থ সন্তান নিরাপদ থাকে। এ সূরাটি কেউ স্বপ্নযোগে তেলাওয়াত করতে দেখলে সে মানুষের প্রিয় পাত্র হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : পূর্ববর্তী সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, খায়বরের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জিহাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিজয় বহন করে এনেছে। এরপর সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুমিনগণকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর উচ্চতম শান এবং মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম রাসূল ﷺ -এর দরবারে কথাবার্তা বলার নিয়ম-নীতির শিক্ষা এতে রয়েছে। এরপর এ সূরায় মুসলমানদের পরস্পরের প্রীতি বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথ ও পন্থা শেখানো হয়েছে। পরস্পরের মধুর সম্পর্ক রক্ষা করার সঠিক ও বাস্তব পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের এবং মানবতার মান উন্নয়নের নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মনকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভের কারণে তাঁরা আত্মসংশোধনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটি বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় নাজিলকৃত আইন-বিধান ও খোদায়ী হেদায়েতের সমন্বয় ও সমষ্টি। মূল বিষয়বস্তুর আলোকে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ জন্যই সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন-বিধান ও হেদায়েতকে একটি সূরায় একত্র করে দেওয়া হয়েছে। সূরার আলোচিত বিষয়াদি দেখলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতেও তা জানা যায়।

হাদীসের বর্ণনা হতে একথাও জানা যায় যে, উক্ত আইন বিধানের অধিকাংশই মদীনা শরীফে নবী করীম ﷺ -এর জীবনের শেষের দিকে নাজিল হয়েছে। উদাহরণত চতুর্থ আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটা বনূ তামীম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। উক্ত গোত্রের প্রতিনিধিগণ মদীনায় এসে নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের হুজরা শরীফের পিছন হতে নবী করীম ﷺ -এর নাম ধরে ডাকাডাকি করেছিল। সমস্ত সীরাতগ্রন্থেও প্রতিনিধি আগমনের সময় নবম হিজরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ একাধিক হাদীস হতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ আয়াতটি অলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ তাঁকে বনূ মুস্তালিক হতে জাকাত আদায়ের জন্য পাঠালে উক্ত ঘটনাটি ঘটে। অথচ অলীদ ইবনে উকবা সর্বসম্মতভাবে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছেন। কাজেই সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় যে মহানবী ﷺ -এর জীবনের শেষ দিক তা স্পষ্টভাবেই বলা যায়।

সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : উক্ত সূরা হুজুরাতের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মুসলমানদেরকে ঈমানদার উপযোগী আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া। প্রথমোক্ত পাঁচটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো শুনা খবর বিশ্বাস করে নেওয়া এবং এর উপর নির্ভর ও ভিত্তি করে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি, দল অথবা জাতির বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ পাওয়া গেলে, প্রথমত ভেবে দেখতে হবে যে, সংবাদটির সূত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কিনা? বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে না হলে সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও তদন্ত চালিয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে যে, মূল সংবাদটি সত্য কিনা? এরপর মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোনো সময় ঘটনাক্রমে পরস্পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তখন মুসলমান জনগণের পক্ষে কিরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর মুসলিম জনগণকে সেসব অন্যায় ও অনুচিত কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টি করে, যার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষেই পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, গালাগালি করা, একে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, অন্যের ব্যাপারে অন্তরে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি তন্ন তন্ন করে জানার চেষ্টা করা, অপরের গিবত করা– এগুলো মন্দ কাজ। এগুলোর দ্বারা সমাজে অশান্তির বীজ বপন করে থাকে। এগুলোই স্বভাবতই খারাপ ও পাপ কাজ। আল্লাহ তা'আলা পৃথক পৃথকভাবে নাম ধরে এদেরকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

বংশীয় ও গোত্রীয় যেসব বৈষম্য ও পার্থক্য মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের সৃষ্টি করে, মানুষে মানুষে হানাহানি ও মারা-মারির সূত্রপাত করে, তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশ পরিবারের নিজেদের মর্যাদা ও অভিজাত্য নিয়ে গৌরব অহংকার করা এবং অন্যদেরকে নিজেদের অপেক্ষা নীচ জ্ঞান করা, আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা- এগুলোই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে দুনিয়া ও মানব সমাজের জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মূল উৎপাটন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত, একই বংশ হতে উদ্ভূত। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণিতে তাদের বিভক্ত হয়ে পড়া কেবল পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। এগুলো অহঙ্কার ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উপকরণ নয়। হ্যাঁ, একজন মানুষের উপর অপর একজন মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র নৈতিক মর্যাদার কারণেই স্বীকৃত হতে পারে। নৈতিক মান ব্যতীত মর্যাদা ও প্রাধান্যের অন্য কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। এটাই ভালো-মন্দ এবং উত্তম-অধমের একমাত্র মাপকাঠি।

পরিশেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে মেনে নেওয়া, কার্যত অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা এবং খালেসভাবে আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল অকাতরে সঁপে দেওয়াই হলো প্রকৃত ঈমান। যে লোক উপরিউক্ত রীতি ও আচরণ অবলম্বন করবে সে-ই হবে প্রকৃত ঈমানদার। কিন্তু যারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং দিল দিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, উপরন্তু হাব-ভাবে এমনটি বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম কবুল করে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছে। দুনিয়ার সামাজিকতার মাপকাঠিতে এ লোকেরা মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে। সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মতো আচরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা মুমিনরূপে গণ হতে পারে না– প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

পূর্বোক্ত সূরার সাথে আলোচ্য সূরার সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে সংশোধন ও সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর অত্র সূরা হুজুরাতে সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণের (রা.) ফজিলত ও মর্যাদার উল্লেখ করেছেন। আর এ সূরাতে নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারগণের পারস্পরিক অধিকার এবং আচরণের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের পরস্পরের আচার-আচরণের গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে। কাজেই পূর্বোক্ত সূরার সাথে অত্র সূরাটির যোগসূত্র ও সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা হুজুরাত, মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانِىْ عَشَرَةَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা : ১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ اَىْ لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ الْمُبَلِّغِ عَنْهُ اَىْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِكُمْ عَلِيْمٌ - بِفِعْلِكُمْ نَزَلَتْ فِىْ مُجَادَلَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ تَامِيْرِ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ اَوِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ مَعْبَدٍ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অগ্রগামী হয়ো না– এখানে لَا تُقَدِّمُوْا সীগাহটি قَدَّمَ (بَاب تَفْعِيْل) হতে গৃহীত। এটা تَقَدَّمَ (তথা تَفَعُّل)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ -কোনো কথা বা কাজে অগ্রণী হয়ো না– আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অগ্রে–যিনি আল্লাহর পয়গাম প্রচারক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ -এর অনুমতি ব্যতীত। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী তোমাদের বক্তব্য এবং জানেন তোমাদের কাজকর্ম। এ আয়াতখানা হযরত ওমর (রা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়, যখন তাঁরা খোদ নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে আকরা ইবনে হাবিছ এবং কা'কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর নিয়োগের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন [অর্থাৎ উক্ত দু'জনের মধ্য হতে কে আমীর হবে– এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ও কথা কাটাকাটি হয়েছিল।]

٢. وَنَزَلَ فِيْمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ اِذَا نَطَقْتُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ اِذَا نَطَقَ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ اِذَا نَاجَيْتُمُوْهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بَلْ دُوْنَ ذٰلِكَ اِجْلَالًا لَهُ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ اَىْ خَشْيَةَ ذٰلِكَ بِالرَّفْعِ وَالْجَهْرِ الْمَذْكُوْرَيْنِ -

২. আর যারা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেছে তাদের শানে নাজিল হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বর বুলন্দ করো না যখন তোমরা কথা বল নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজের উপর– যখন তিনি কথা বলেন। আর তোমরা তাঁর সাথে তদ্রূপ বড় গলায় কথা বলো না যখন তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা কর যদ্রূপ তোমরা পরস্পরে কথা বলার সময় করে থাক, বরং তার সম্মানার্থে তদপেক্ষা নিচু গলায় বলবে। কেননা [অন্যথা] তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের আমলসমূহ [সৎকর্মসমূহ] বরবাদ–নিষ্ফল হয়ে যাবে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে ও উঁচু গলায় কথা বললে– যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে– এ আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমাদের আমলসমূহ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

٣. وَنَزَلَ فِيْمَنْ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَاَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ اِخْتَبَرَ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط اَيْ لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ اَلْجَنَّةُ.

৩. হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) এবং তদ্রূপ অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) যারা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে নিচু স্বরে কথা বলতেন তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে নিচু স্বরে কথা বলে তারা এমন লোক, পরীক্ষা করেছেন আল্লাহ তা'আলা– যাচাই করেছেন তাদের অন্তরকে তাক্ওয়ার জন্য– অর্থাৎ যেন তাদের হতে তাক্ওয়া প্রকাশিত হয়। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা বিনিময় [অর্থাৎ] জান্নাত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تُقَدِّمُوْا : আল্লাহর বাণী– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ الخ -এর মধ্যস্থিত لَا تُقَدِّمُوْا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ تَقْدِيْمٌ (بَاب تَفْعِيْل) হতে "لَا تُقَدِّمُوْا" -এর মীম-এর উপর পেশ ও د -এর মধ্যে যেরযোগে পড়েছেন।

২. যাহ্হাক ও ইয়াকূব হাযরামী (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ تَقَدَّمَ (بَاب تَفَعُّلْ) হতে "لَا تَقَدَّمُوْا" পড়েছেন।

قَوْلُهُ (رحـ) مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ : জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) لَا تُقَدِّمُوْا -এর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন–

مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ ; এর ভাবার্থ এই যে, لَا تُقَدِّمُوْا এটা بَاب تَفْعِيْل থেকে صِيْغَه جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ তথা تَقْدِيْم মাসদার হতে নির্গত হয়েছে [যা হতে مَاضِيْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ হলো قَدَّمَ] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, بَاب تَفْعِيْل সাধারণত مُتَعَدِّيْ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে بَاب تَفْعِيْل টি بَاب تَفَعُّلْ -এর অর্থে [قَدَّمَ টি تَقَدَّمَ -এর অর্থে এবং তদনুযায়ী] لَا تُقَدِّمُوْا শব্দটি لَا تَتَقَدَّمُوْا -এর অর্থে হয়েছে। আর তা مُتَعَدِّيْ না হয়ে لَازِمْ হয়েছে। সোজা কথা হলো, এখানে لَا تُقَدِّمُوْا বাবে তাফয়ীল হতে হওয়া সত্ত্বেও لَازِمْ হয়েছে। কেননা مُتَعَدِّيْ হলে এর অর্থ হতো– " তোমরা অগ্রগামী করো না" যা এ ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। আর لَازِمْ হওয়ার কারণে এর অর্থ হয়েছে– " তোমরা অগ্রগামী হয়ো না" এখানে এটাই প্রযোজ্য।

সুতরাং মুফাস্সির (র.)-এর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন– "لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ" অর্থাৎ কোনো কথা বা কাজে তোমরা নবী করীম ﷺ হতে অগ্রগামী হয়ে যেয়ো না।

قَوْلُهُ اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى : অত্র আয়াতাংশে اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى -এর মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটির অর্থের ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

১. لِلتَّقْوٰى -এর لَامْ অক্ষরটি كَائِنَة -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে قُلُوْب -এর صِفَتْ হয়েছে।

২. অথবা, لِلتَّقْوٰى -এর لَامْ অক্ষরটি عِلَّةْ বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ খোদাভীতির কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ : اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ বাক্যটি لَا تَرْفَعُوْا অথবা لَا تَجْهَرُوْا হতে مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ -এর মধ্যে আমল করার ব্যাপারে لَا تَرْفَعُوْا এবং لَا تَجْهَرُوْا -এর মধ্যে تَنَازُعْ রয়েছে। সুতরাং বসরীগণের মতে দ্বিতীয় فِعْل -এর مَفْعُوْل لَهٗ হবে। পক্ষান্তরে কূফীগণের মতে প্রথমোক্ত فِعْل -এর مَفْعُوْل لَهٗ হবে। তবে প্রথমোক্ত মাযহাব অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ : আল্লাহর বাণী- وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ পূর্ববর্তী বাক্য اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ হতে حَالْ হওয়ার দরুন مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ : শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا الخ -এর শানে নুযূল-এর ব্যাপারে একাধিক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা অত্র আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন এবং জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন- তা এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ তামীম এবং কতিপয় লোক একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্য হতে কাকে আমীর নিয়োগ করা হবে এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। হযরত আবূ বকর (রা.) কা'কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর নিয়োগের প্রস্তাব করলেন। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রা.) আকরা ইবনে হাবিসকে আমীর নিয়োগের জন্য পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। এতে তাদের মধ্যে কিছুটা তর্ক-বচসা হলো, যাতে উভয়ের স্বর উচ্চ হয়ে পড়ল। একে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. হযরত শা'বী (র.) জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে কুরবানি করার ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর নামাজ হতে অবসর হওয়ার পূর্বেই কুরবানি করে ফেলেছিল। এখানে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে যে, তোমরা নবী করীম ﷺ কুরবানি করার পূর্বে কুরবানি করো না। এমন কি যারা নবী করীম ﷺ -এর কুরবানির পূর্বে কুরবানি করেছিল তাঁদের কুরবানি পুনরায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. হযরত মাসরূক (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, অত্র আয়াতখানা يَوْمُ الشَّكِّ [সন্দেহের দিবস]-এর রোজার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। উক্ত দিন রোজা রাখা হতে সাহাবীগণকে বারণ করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে রোজা না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ খায়বর গমন করার সময় মদীনা শরীফে একজন লোককে খলীফা নিয়োগ করে যেতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অন্য এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৫. হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, কিছু লোক বলাবলি করেছিল যে, নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে যদি আমাদের রোজা রাখার হুকুম সম্বলিত কোনো আয়াত নাজিল হতো! তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ চল্লিশজন সাহাবীকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বনী আমিরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনজন সাহাবী পিছনে পড়ে যায়। বনূ আমির ঐ তিনজন ব্যতীত বাকি সকলকে শহীদ করে ফেলে। উক্ত তিনজন সাহাবী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তাঁদের সাথে বনূ সুলাইমের দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বনু সুলাইম অপেক্ষা বনূ আমির সম্মানী ও অভিজাত হওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে বনূ আমিরের লোক হিসেবে পরিচয় দিল। সাহাবীত্রয় তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেললেন।

   বনূ সুলাইমের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট তাদের লোককে হত্যা করার বিচার দাবি করল। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে দিয়াত আদায় করে দিলেন। উক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

৭. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, অত্র আয়াতখানা মূলত ব্যাপক যেকোনো কথা বা কাজে নবী করীম ﷺ -এর উপর অগ্রণী না হওয়ার ব্যাপারে এটি নাজিল হয়েছে।

৮: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ যদিও সহীহ তথাপি অত্র আয়াতের প্রকৃত শানে নুযূল আল্লাহ পাকেরই ভালো জানা রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, কোনো বিশেষ কারণ ব্যতীতই অত্র আয়াত নাজিল হয়েছে।

মোটকথা, আয়াতখানার শানে নুযূল যাই হোক না কেন, এর হুকুম ব্যাপক। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর হতে কথা ও কাজে যে কেউ অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা করবে তার জন্যই এর হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا الخ : **শানে নুযূল** : রাসূল ﷺ -এর সাথে কথা বলার সময় কতিপয় লোক নিজেদের পরস্পরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত, আর তাদের ব্যাপারে এ আয়াত খানা অবতীর্ণ হয়; কারো কারো মতে এ আয়াত হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যকার বিতর্কের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেটা পূর্ববর্তী আয়াতের শানে নুযূলে আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الخ : **শানে নুযূল** : অত্র আয়াত- إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ -এর শানে নুযূল-এর ব্যাপারেও একাধিক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) জন্মগতভাবে উচ্চৈঃস্বরের অধিকারী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, আয়াত- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الخ নাজিল হওয়ার পর তিনি রাস্তায় বসে কাঁদতে শুরু করলেন। আসিম ইবনে আদী ইবনে আজালান (রা.) পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় সাবিত (রা.)-কে ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমার আওয়াজ জন্মগতভাবে উঁচু। কাজেই আমার মনে হয় আয়াত- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الخ আমার ব্যাপারেই নাজিল হয়েছে। আসিম (রা.) এ ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -কে জানালেন। নবী করীম ﷺ সাবিত (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি কি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করতে চাও না, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা কি তোমার কাম্য নয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে কি তুমি রাজি নও? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাজি, আর কখনো নবী করীম ﷺ -এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলব না। তখন তাঁর শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াত لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা.) কসম করে আরজ করলেন যে, তিনি কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেছেন- আয়াত لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) এত নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন যে, পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়।

মোটকথা, এর উদ্দেশ্য এই যে, কথাবার্তায় নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদব রক্ষা করে চল। আওয়াজ একেবারে উঁচু করো না, যা বেয়াদবীর পর্যায়ে পড়ে। আবার এত নিচুও করো না, যাতে কথা বুঝতে কষ্ট হয়; বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।

قَوْلُهُ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ الخ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদব ও আচার-আচরণের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কথাবার্তা ও চাল-চলনে কিভাবে আদব রক্ষা করতে হবে, তার সাথে আদব বজায় রাখলে কি লাভ হবে এবং না রাখলে কি ক্ষতি হবে- এতদ্ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, যে বিষয়ে আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ -এর হতে হুকুম পাওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে, এর ফয়সালা নবী করীম ﷺ -এর উপর অগ্রণী হয়ে নিজের পক্ষ হতে করে নিয়ো না; বরং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। সুতরাং নবী করীম ﷺ যখন কিছু ইরশাদ করেন তা কান দিয়ে নীরবে শ্রবণ কর। তাঁর ইরশাদের পূর্বেই নিজের পক্ষ হতে কিছু বলে ফেলার দুঃসাহস করো না। তাঁর তরফ হতে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নির্দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে তা গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী আমল কর। স্বীয় ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে তার ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর প্রাধান্য দিয়ো না; বরং স্বীয় চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনাকে শরিয়তের অনুগত করে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ করীনা [লক্ষণ] অথবা স্পষ্টভাবে কথা বলার অনুমতি পাওয়া যায় কথা বলবে না, বরং অপেক্ষা করতে থাকবে। অনুমতি ও অপেক্ষা ছাড়া কথা বলতে গেলে রাসূলের ﷺ ইচ্ছার বিরোধী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মোটকথা, কোনো কিছুর বৈধতা শরিয়তের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। চাই তা কাতয়ী قَطْعِىْ হোক অথবা যান্নী ظَنِّىْ হোক। আর যেমনিভাবে পয়গাম্বরের অনুপস্থিতিতে প্রথমত نَصّ -কে অনুসরণ করতে হয় এবং نَصّ -এর মধ্যে গবেষণা করতে হয় তেমনটি নবী করীম ﷺ -এর উপস্থিতিতে প্রথমত نَصّ -এর অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর করীনার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাপারে এ একই হুকুম প্রযোজ্য।

কাজেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চল। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ -এর সত্যিকার আনুগত্য ও তা'জীম কেবল তখনই সম্ভবপর হতে পারে যখন অন্তরে খোদাভীতি থাকবে। অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকে, তাহলে বাহ্যত ইসলামের দাবিদার হওয়ার জন্য বারংবার মুখে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নাম নিবে এবং বাহ্যিকভাবে তাঁদের আহকামকেও সামনে রাখবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ ও স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করবে। সুতরাং জেনে রাখা উচিত যে, যা মুখে রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই শুনেন এবং যা অন্তরে রয়েছে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। কাজেই তাঁকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। অতএব তাঁকে ভয় করা উচিত।

আয়াতের উদ্দেশ্য : আরবের কতিপয় গোত্রের লোকদের নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কতিপয় অসৌজন্য ও অভদ্রোচিত আচরণ ছিল। তা ছাড়া তারা লোকদেরকে মন্দ উপাধি দানেও ছিল পটু। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তথা গোটা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -কে উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতামূলক আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্র আয়াত নাজিল করেছেন। যাতে তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে ভদ্রতামূলক আচরণ করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর সাথে সবচেয়ে উত্তম আচরণ হলো নিজের মতামতের উপর তাঁর মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। নবী করীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ অনুযায়ী। নবী করীম ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো হুকুম তুমি খুঁজে না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী হুকুম দিব। নবী করীম ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর মধ্যেও কোনো হুকুম খুঁজে না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, এমতাবস্থায় আমি ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করব।

মোটকথা, অত্র আয়াত নাজিল করত আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর মতামতকে নিজের মতামতের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। নবী করীম ﷺ -এর মতামত ও কথাবার্তার ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি করা যাবে না। তাঁর কথা ও কাজকে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে মাথা পেতে নিতে হবে। রাসূলের কারীম ﷺ -এর নিঃশর্ত আনুগত্যই কেবল ইহ্-পরকালের সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

দীনি নেতা তথা আলেমগণের সাথেও উক্ত আদব জরুরি : কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) বলেছেন, দ্বীনি ইমাম ও আলেমগণের ব্যাপারে আয়াতে উল্লিখিত আদব বজায় রাখা জরুরি। কেননা দীনি নেতৃবৃন্দ হলেন নবী করীম ﷺ -এর প্রতিনিধিগণ। আর আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরসূরি। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

একদিন নবী করীম ﷺ হযরত আবুদ্ দারদা (রা.)-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অগ্রে চলতে দেখে তাঁকে সাবধান করে বললেন, তুমি কি এমন এক ব্যক্তির অগ্রে চলতে চাও যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নবী করীম ﷺ আরও ইরশাদ করলেন, দুনিয়ায় এমন কোনো ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি, যে নবী-রাসূলগণের পর হযরত আবূ বকর (রা.) হতে শ্রেষ্ঠ। মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর পর সকল মানুষ হতে উত্তম।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ .... لَا تَشْعُرُوْنَ : অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তার আদব-কায়দার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। আর নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলার সময় পরস্পরের ন্যায় বলো না। কেননা এরূপ করলে তোমাদের নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলার অর্থ হচ্ছে– নবী করীম ﷺ -এর দরবারে পরস্পরে কথা বলার সময় যেন নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা তোমাদের আওয়াজ উচ্চ না হয়। আর খোদ নবী করীম ﷺ -এর সাথেও যদি কথা বল তাহলে তাঁর অপেক্ষা নিচু স্বরে বলবে।

মোটকথা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে শোরগোল করো না। আর নিজেরা পরস্পরে যে পদ্ধতিতে বেপরোয়াভাবে হাসি-তামাশার সাথে কথা বল, নবী করীম ﷺ -এর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা আদবের খেলাফ ও গোস্তাখী হিসেবে গণ্য হবে। নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করার সময় অত্যন্ত নম্রভাবে তা'জীমের সাথে আদব-কায়দা ও ভদ্রতার সাথে করবে।

এ আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি যদিও নবী করীম ﷺ -এর মজলিসের জন্য বলা হয়েছে; কিন্তু এটা কেবল সে যুগের লোকদের জন্য সীমিত নয়; বরং সর্বকালের লোকদের জন্যই তা প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম ﷺ -এর রওজা শরীফের সামনে উচ্চৈঃস্বরে সালাম-কালাম করা হারাম। কেননা জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভদ্রোচিত আচরণ করা যদ্রূপ ফরজ তদ্রূপ তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ফরজ।

নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আদবের অবস্থা : লক্ষণীয় যে, একজন ভদ্র ছেলে তার পিতার সাথে, একজন যোগ্য ছাত্র তার উস্তাদের সাথে, একজন মুখলিস মুরীদ তার মুর্শিদের সাথে এবং একজন সিপাহী তার কমাণ্ডারের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলে। অথচ পয়গাম্বর (আ.)-এর মর্তবা তো এদের অপেক্ষা কত বেশি। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি; যাতে কোনোরূপ বেয়াদবি না হয় এবং তিনি ব্যথা না পান। নবী করীম ﷺ নাখোশ হয়ে গেলে ঈমান আর থাকে কোথায়! এতে সমস্ত আমল বরবাদ হওয়ার এবং সকল মেহনত ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

নাফরমানি [গুনাহ]-এর দরুন নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা? : কুফর এবং শিরক এর কারণে তো সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়- এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু গুনাহ ও অপরাধের কারণে নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায় কিনা? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

খাওয়ারিজ এবং মু'তাযিলীগণ তাঁদের মূলনীতি অনুযায়ী বলে থাকেন যে, ফিস্‌ক ও গুনাহের দ্বারাও যেহেতু ঈমান হতে খারিজ [বাহির] হয়ে যায় সেহেতু গুনাহের কারণে নেক আমলও বরবাদ হয়ে যাবে।

আয়াত أَنْ تَحْبَطَ الخ বাহ্যত খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলীগণের পক্ষে যায়। আর এটা তাঁদের দলিল। কিন্তু জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত শুধু গুনাহকে আমল বরবাদকারী হিসেবে গণ্য করেন না।

আহলুস্-সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার খণ্ডন : অত্র আয়াত أَنْ تَحْبَطَ الخ -এর দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তারা তো গুনাহকে আমল বরবাদকারী হিসেবে গণ্য করেন না। অথচ অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উঁচু আওয়াজে কথা বলাকে আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা তো গুনাহ।

আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যথা-

* উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নবী করীম ﷺ -এর কষ্ট পাওয়ার কারণ। আর নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া হলো কুফর। কাজেই [কুফর হওয়ার কারণে]-এর দ্বারাও আমল বরবাদ হয়ে যাবে।
* কখনো কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলায় বেয়াদবি হয়ে যায়। আর কেউ কারো অনুগত হলে তার সাথে আদব রক্ষা করা জরুরি হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম করলে নেতা অন্তরে ব্যথাবোধ করে। আর সাধারণ গুনাহ যদিও আমল বরবাদকারী হয় না, তথাপি নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া খাসভাবে এমন কঠিন পাপ যার কারণে আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা عَامّ -এর একটি খাস একক। এর হুকুমও খাস।

হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকে তখন আর তা [উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা] অপছন্দনীয় হয় না এবং তখন তা কষ্টের কারণও হয় না। কাজেই এমতাবস্থায় এর কারণে আমল বরবাদ হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু যে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলবে তাঁর পক্ষে তো জানা সম্ভব নয় যে, নবী করীম ﷺ কোন অবস্থায় রয়েছেন- প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ -এর মানসিক অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে রয়েছে। কাজেই অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ জালালী মেজাজে থাকার কারণে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথনের দরুন কথকের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। অথচ তার কোনো খবরই থাকবে না। হয়তো সে এ মনে করে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে থাকবে যে, নবী করীম ﷺ -এর কষ্ট হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে হুযূর ﷺ -এর কষ্ট হচ্ছে এবং তার আমলও বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে টেরও পাচ্ছে না। আল্লাহর বাণী- لَا تَشْعُرُوْنَ -এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ সকল দিকের বিবেচনা করত সাধারণভাবে সকল প্রকার উচ্চৈঃস্বর হতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা যদিও কোনো কোনো প্রকারের উচ্চৈঃস্বরের কারণে নেক আমল বিনষ্ট হয় তথাপি এটা নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। কাজেই সব সময় সর্বপ্রকার উচ্চ আওয়াজ হতে নিষেধ করেছে। সুতরাং যে কোনো সময় নবী করীম ﷺ -এর সাথে বড় গলায় কথা বলা হতে বিরত থাকা উচিত।

মোদ্দাকথা- তোমরা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা এতে নবী করীম ﷺ -এর মনে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর তা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে যে, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে। কারণ বেয়াদবি এবং গোস্তাখীর দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া যদিও নিছক গুনাহই বটে, কিন্তু যেহেতু এটা নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আর নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ তা'আলার একেবারেই অপছন্দনীয় যা কোনো কোনো সময় ইচ্ছাকৃত কুফরির নিকটবর্তী নিয়ে যায়। আর কুফর তো সর্বসম্মতভাবে আমলকে বরবাদ করে ফেলে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে কোনো গুনাহ সরাসরি আমল বরবাদকারীও সাব্যস্ত হয় না। অথচ আহলে-সুন্নত গুনাহ সরাসরি আমল বরবাদকারী হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া উক্ত গুনাহটি অন্যান্য গুনাহ অপেক্ষা জঘন্য হওয়াও সাব্যস্ত হয়েছে। যাহোক, আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, তোমরা হুযূর ﷺ -এর সম্মুখে অথবা খোদ হুযূর ﷺ-এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে এবং বেপরোয়াভাবে কথাবার্তা বলো না। কেননা এতে তোমাদের আমল বরবাদ ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এভাবে যে, এর দরুন নবী করীম ﷺ অন্তরে ব্যথা পাবেন। আর তা তোমাদের লাঞ্ছনার কারণ হবে– যা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছানোর দরুন আমলকে বরবাদ করে দিবে। তোমাদের এ কথোপকথন পদ্ধতিই যে, তোমাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েছে তা তোমরা টেরও পাবে না। আর তোমাদের বেপরোয়া মনোভাবই হবে তোমাদের চরম দুর্দশা ও দুর্ভোগের জন্য একান্তভাবে দায়ী।

এখানে نِدَاء -কে পুনঃ উল্লেখের ফায়দা কি? : আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন– يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا الخ দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় ইরশাদ করেছেন– يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا অর্থাৎ উভয় আয়াতে ঈমানদারদেরকে আহ্বান করত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। মুফাস্‌সিরগণ এর কয়েকটি ফায়দা-এর উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো–

১. ঈমানদারগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অত্যধিক মমত্ববোধ ও কল্যাণকামিতার কারণে বারবার ঈমানদারগণকে খেতাব করেছেন। সাধারণত দেখা যায় যে, কেউ কাউকে অধিক মায়া-মহব্বত করলে তাকে বারংবার সম্বোধন করে। যেমন হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে বারবার يَا بُنَيَّ বলে খেতাব করেছেন।
২. نداء -কে পুনরায় উল্লেখের এক ফায়দা এও হতে পারে যে, পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, দ্বিতীয়বারে তাদেরকে লক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে প্রথমবারে যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল। যাতে এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ না পায় যে, প্রথমে যাদের আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আলোচনা করা হয়নি; বরং অন্যদের কথা বলা হয়েছে।
৩. এর আরো একটি ফায়দা এই যে, উক্ত আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন নয়; বরং এতদুভয়ের পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং এদের দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাকিদ নয়; বরং প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত।
৪. বারংবার ঈমানদারগণের সিফাত দ্বারা আহ্বান করত বস্তুত তাদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈমানের গুণে গুণান্বিত হওয়া যে, একটি সুমহান ব্যাপার তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। বাস্তাবিকই সত্যিকার ঈমানের অধিকারী হওয়া হতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কি হতে পারে?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপর অত্র আয়াতের প্রভাব : যখনই কোনো আয়াত নাজিল হতো সাথে সাথে সাহাবীগণ (রা.) তার উপর আমল করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে যেতেন। তদনুযায়ী স্বীয় চরিত্রকে শোধরিয়ে নেওয়ার জন্য সাহাবীগণ (রা.)-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অনুরূপ এক পরিবর্তন। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো–

১. উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন যে, অদ্য হতে আমি আপনার সাথে চুপি চুপি কথা বলব।
২. অত্র আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো।
৩. মুহাম্মদ ইবনে সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াত– يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) রাস্তায় বসে কাঁদতে ছিলেন। এ সময় আসিম ইবনে আদী ইবনে আজালান তাঁর পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ আয়াতখানা আমার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কেননা জন্মগতভাবেই আমার আওয়াজ বিকট। আসিম (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উত্থাপন করলেন। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি রাজি নও যে, তুমি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করবে, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? উত্তরে সাবিত (রা.) আরজ করলেন, আমি রাজি আছি। কখনও আমি আমার আওয়াজকে নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজের উপর উচ্চ করব না।

অত্র আয়াতে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه বাহ্যত এক ও অভিন্ন হওয়ার পরও عَطْف -এর দ্বারা কিভাবে পার্থক্য সূচিত হলো? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ الخ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্বরকে নবী করীম ﷺ -এর স্বরের অপেক্ষা উচ্চ করো না, আর তাদের সাথে এমন প্রকাশ্য আওয়াজে কথা বলো না, যদ্রূপ তোমাদের পরস্পরে বলে থাক।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এখানে مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف এক ও অভিন্ন। কেননা উভয় স্থলেই নবী করীম ﷺ -এর স্বরের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা প্রথমোক্ত অংশের তথা- "لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"-এর অর্থ হলো নবী করীম ﷺ যখন কথা বলতে থাকবেন আর তখন তোমরাও কারো সাথে [তাঁর সম্মুখে] কথাবার্তায় লিপ্ত হও সেই সময় তোমাদের কথাবার্তার আওয়াজ যেন নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ না হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয়াংশ তথা "وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ" -এর অর্থ হলো- 'যখন তোমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা-বার্তা বলবে তখন তদ্রূপ উচ্চ আওয়াজে বলবে না, যদ্রূপ তোমরা পরস্পরে বলে থাক; বরং তদপেক্ষা নিচু আওয়াজে বলবে'। সুতরাং উভয় বাক্যের অর্থগত পার্থক্য সাব্যস্ত হলো। আর عَطْف -এর জন্য এতটুকু পার্থক্যই যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ .... وَاَجْرٌ عَظِيْمٌ الْجَنَّةُ : পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সামনে অথবা তার সাথে কথা বলার সময় উচ্চ আওয়াজে কথা বলার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর অত্র আয়াতে যারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে নিচু গলায় আদবের সাথে কথা বলে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। এর প্রতি ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- "যারা নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে নিচু আওয়াজে আদব, তা'জীম ও নত-নম্রভাবে কথাবার্তা বলে তারা এমন লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন, তাদেরকে খালেস ও পূতঃপবিত্র করে নিয়েছেন।

বস্তুত ইসলামের মহা নিদর্শনাবলি চারটি। যথা- ১. কুরআনে কারীম ২. নবী করীম ﷺ ৩. বায়তুল্লাহ ও ৪. নামাজ। এগুলোর প্রতি তারাই সম্মান প্রদর্শন করবে, যাদের অন্তরে খোদাভীতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো অন্তরে আল্লাহ ভীতির বহিঃপ্রকাশ। এতে বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ -এর আওয়াজ হতে আওয়াজ উচ্চ হওয়া যখন বেয়াদবি তখন তাঁর আহকাম ও ফরমানাদি শ্রবণ করার পর এর বিরুদ্ধে কথা বলা কিরূপ জঘন্য অপরাধ হবে তা অনুমেয়। মোটকথা, পূর্ণমাত্রায় তাক্ওয়ার দাবি হলো মুসলমানকে অনুত্তম কথাবার্তা হতে বিরত থাকতে হবে।

তিরমিযী শরীফের একটি মারফূ' হাদীস নিম্নরূপ-

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ .

অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী খোদাভীরু হতে পারবে না, যতক্ষণ না দূষণীয় বিষয়াদি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য [কিছু কিছু] নির্দোষ বিষয়কে পরিহার করে চলবে।

সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে এবং বেপরোয়াভাবে কথা বলা কখনো অপরাধজনক হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো হয় না। এক্ষণে যদি সব ধরনের উচ্চ আওয়াজই পরিহার করে বলে, তাহলে অপরাধের পর্যায়ে পড়ার কোনোরূপ শঙ্কাই থাকে না। কাজেই পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া অর্জিত হবে।

পরিশেষে উক্ত আমলের পারলৌকিক লাভ ও পুরস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা এই যে, উপরিউক্ত ইখলাস ও সত্য উপলব্ধির কারণে আখিরাতে তাঁর জীবনে [পূর্বেকৃত] পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যাবে এবং মহা প্রতিদান লাভ করবে।

অত্র আয়াতে "اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى" বাক্যের তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) বলেন,

* তাকওয়ার গুণটি জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে যাচাই করে নিয়েছেন।

* তাদের অন্তরসমূহ যে তাকওয়ার জন্য মনোনীত, তা আল্লাহ তা'আলা জেনে নিয়েছেন।

* তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ তা'আলা নিখুঁতভাবে তাক্ওয়ার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন।

মোটকথা, রাসূল ﷺ -এর প্রতি আদব প্রদর্শন ও তাক্ওয়া [খোদাভীতি] পরস্পরে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যাদের অন্তরে যত বেশি খোদাভীতি রয়েছে তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ততবেশি আদব প্রদর্শন করবে, তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁর অনুগত থাকবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে খোদাভীতির বালাই নেই তারা যে, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি শুধু অশ্রদ্ধাই পোষণ করবে তাই নয়, বরং তাকে অপমানিত করতেও কুণ্ঠিত হবে না। নবী করীম ﷺ -এর সাথে বেয়াদবি করা অন্তরে খোদাভীতির অনুপস্থিতিকেই প্রমাণিত করে, যা মূলত অন্তর্নিহিত কুফরিরই লক্ষণ।

٤. وَنَزَلَ فِيْ قَوْمٍ جَاؤُوْا وَقْتَ الظَّهِيْرَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَنْزِلِهٖ فَنَادَوْهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ حُجُرَاتِ نِسَائِهٖ ﷺ جَمْعُ حُجْرَةٍ وَهِيَ مَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ بِحَائِطٍ وَنَحْوِهٖ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَادٰى خَلْفَ حُجْرَةٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوْهُ فِيْ أَيِّهَا مُنَادَاةَ الْأَعْرَابِ بِغِلْظَةٍ وَجَفَاءٍ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ . فِيْمَا فَعَلُوْهُ مَحَلَّكَ الرَّفِيْعَ وَمَا يُنَاسِبُهُ مِنَ التَّعْظِيْمِ .

٥. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا أَنَّهُمْ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ بِالْاِبْتِدَاءِ وَقِيْلَ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ ثَبَتَ . حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . لِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ وَنَزَلَ فِي الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ مُصَدِّقًا فَخَافَهُمْ لِتِرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَجَعَ وَقَالَ إِنَّهُمْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ وَهَمُّوْا بِقَتْلِهٖ فَهَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِغَزْوِهِمْ فَجَاءُوْا مُنْكِرِيْنَ مَا قَالَهُ عَنْهُمْ .

অনুবাদ :

৪. একবার একদল লোক জোহরের সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করেছিল, তখন তিনি তাঁর হুজরা শরীফে ছিলেন। তারা নবী করীম ﷺ -কে ডাকাডাকি আরম্ভ করল। তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে। নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন হতে আপনাকে ডাকাডাকি করে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের হুজরার পিছন হতে; حُجُرَاتٌ শব্দটি حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। حُجْرَةٌ 'হুজরা' বলে জমিনের সেই অংশকে বুঝায়, যা দেয়াল ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষিত [পরিবেষ্টিত] করা হয়। তাদের প্রত্যেকে একেকটি হুজরার পিছন হতে ডাকছিল। গ্রাম্য আরবদের ন্যায় কর্কশ ও কঠোর আওয়াজে ডাকাডাকি করছিল। কেননা তাদের জানা ছিল না যে, নবী করীম ﷺ কোনটিতে রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ-অবুঝ তারা আপনার শানে যা করেছে সে ব্যাপারে এবং আপনার উচ্চ মর্যাদা ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে।

৫. যদি তারা সবর করত এখানে أَنَّهُمْ রফার মহল্লে হয়েছে, শুরুতে হওয়ার দরুন। কারো কারো মতে এটি একটি উহ্য فِعْل -এর فَاعِل হয়েছে। অর্থাৎ ثَبَتَ أَنَّهُمْ الخ আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম তথা কল্যাণকর হতো, আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করে তাদের জন্য। ওলীদ ইব্‌নে উকবা-এর ব্যাপারে এ আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। [ঘটনা হচ্ছে] নবী করীম ﷺ তাঁকে সদকা উসূলের জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে বনূ মুস্তালিকের সাথে তাঁর শত্রুতা থাকার কারণে তিনি তাদেরকে ভয় পেলেন। ফিরে এসে নবী করীম ﷺ -কে জানালেন যে, তারা সদকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করেছে। তদুপরি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে। নবী করীম ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বনূ মুস্তালিকের লোকেরা এসে তাদের ব্যাপারে ওলীদ ইবনে উকবা (রা.) যা বলেছেন, তা অস্বীকার করল।

٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ خَبَرٍ فَتَبَيَّنُوْٓا صِدْقَهٗ مِنْ كِذْبِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَتَثَبَّتُوْا مِنَ الثَّبَاتِ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مَفْعُوْلٌ لَهٗ اَىْ خَشْيَةَ ذٰلِكَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ جَاهِلِيْنَ فَتُصْبِحُوْا فَتَصِيْرُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ مِنَ الْخَطَأِ بِالْقَوْمِ نٰدِمِيْنَ . وَ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ ﷺ بَعْدَ عَوْدِهِمْ اِلٰى بِلَادِهِمْ خَالِدًا فَلَمْ يَرَ فِيْهِمْ اِلَّا الطَّاعَةَ وَالْخَيْرَ فَاَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬. হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের নিকট আগমন করে কোনো ফাসিক কোনো খবরসহ সংবাদ নিয়ে তাহলে তোমরা তাকে যাচাই করে দেখবে অর্থাৎ এর সত্যকে মিথ্যা হতে প্রভেদ করে দেখবে। অন্য এক কেরাতে فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থানে فَتَثَبَّتُوْا রয়েছে যা ثُبَاتٌ হতে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা একে সপ্রমাণিত করবে। যেন এমন না হয় যে, তোমরা কোনো কওমের ক্ষতি সাধন করে বসবে (اَنْ تُصِيْبُوْا) এটা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কায়। অজ্ঞাতসারে এটা فَاعِلٌ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ جَهَالَةٍ শব্দটি جَاهِلِيْنَ [এর অর্থে হয়েছে।] অতঃপর তোমরা হবে হয়ে পড়বে তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে উক্ত কওমের সাথে তোমরা যে ভুল করেছ [সে ব্যাপারে] লজ্জিত। অতঃপর তারা তাদের এলাকায় ফিরে যাওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাদের নিকট হযরত খালিদ (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে আনুগত্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। সুতরাং তিনি নবী করীম ﷺ-কে তা জানালেন।

٧. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط فَلَا تَقُوْلُوا الْبَاطِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ يُخْبِرُهٗ بِالْحَالِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ الَّذِىْ تُخْبِرُوْنَ بِهٖ عَلٰى خِلَافِ الْوَاقِعِ فَيُرَتِّبُ عَلٰى ذٰلِكَ مُقْتَضَاهُ لَعَنِتُّمْ لَاَثِمْتُمْ دُوْنَهٗ اِثْمَ التَّسَبُّبِ اِلَى الْمُرَتَّبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ حَسَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ لِاَنَّ مَنْ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ الخ غَايَرَتْ صِفَتُهٗ صِفَةَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهٗ اُولٰٓئِكَ هُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ الرّٰشِدُوْنَ لا الثَّابِتُوْنَ عَلٰى دِيْنِهِمْ .

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ রয়েছেন কাজেই তোমরা অনর্থক কথাবার্তা বলো না। এরূপ করলে আল্লাহ পাক তৎক্ষণাৎ নবী করীম ﷺ -কে তা অবহিত করে দিবেন। বহুবিদ বিষয়ে যদি নবী করীম ﷺ তোমাদের অনুসরণ করতেন [তোমাদের কথা ধরতেন] যেসব অবাস্তব সংবাদ তোমরা তাঁকে পৌঁছাও যদি তদনুযায়ী তিনি আমল করে বসেন তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরা গুনাহগার হবে। হুযূর ﷺ কিন্তু নির্দোষ থাকবেন। কেননা উক্ত কর্মের কারণ তোমরাই [কাজেই দায়ীও হবে তোমরা]। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং একে পরিশোভিত করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এটাকে তোমাদের অন্তরে। আর অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন তোমাদের কাছে কুফর, ফিসক ও নাফরমানিকে – এটা [পূর্ববর্তী বাক্য হতে] অর্থের দিক বিবেচনায় اِسْتِدْرَاكٌ হয়েছে ; শব্দের দিক দিয়ে নয়। কেননা, যার নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ..... তার অবস্থা পূর্বোল্লিখিতদের অবস্থা হতে ভিন্নতর হবে। এরাই হলো এখানে خِطَابٌ হতে (غَائِبٌ) -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ করা হয়েছে। সঠিক পথপ্রাপ্ত তাদের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٨. فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَىْ اَفْضَلَ وَنِعْمَةً ط مِنْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ حَكِيْمٌ ـ فِىْ اِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ ـ

৮. আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ فَضْلًا এটা মাসদার। একটি উহ্য فِعْل তথা اَفْضَلَ -এর [مَفْعُوْل হওয়ার] কারণে مَنْصُوْب হয়েছে এবং অনুদান তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন তাদেরকে এবং তিনি মহাপ্রকৌশলী তাদেরকে অনুদান প্রদানের ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْحُجُرَاتِ : প্রকাশ থাকে যে, اَلْحُجُرَاتُ শব্দটি حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন– اَلظُّلُمَاتُ ও اَلْغُرُفَاتُ শব্দদ্বয় যথাক্রমে ظُلْمَةٌ ও غُرْفَةٌ -এর বহুবচন।

কেউ কেউ বলেছেন– حُجُرَاتٌ হলো حُجَرٌ -এর বহুবচন। আর حُجَرٌ হলো حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। এমতাবস্থায় এটা বহুবচনের বহুবচন (جَمْعُ الْجَمْعِ) হবে।

اَلْحُجْرَةُ -এর অর্থ হলো– اَلْحُجْرَةُ هِىَ مَا يُحْجَرُ مِنَ الْاَرْضِ بِحَائِطٍ اَوْ نَحْوِهِ অর্থাৎ জমিনের নির্দিষ্ট অংশ যার চতুর্দিকে দেয়াল ইত্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়ে থাকে।

اَلْحُجُرَاتُ শব্দের মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : اَلْحُجُرَاتُ শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. জমহুর ক্বারীগণ اَلْحُجُرَاتُ -এর ج অক্ষরকে পেশ যোগে পড়েছেন।
২. ইবনে আবী উবলা (র.) ج অক্ষরকে সাকিন যোগে اَلْحُجْرَاتُ পড়েছেন।
৩. আবূ জা'ফর কা'কা' ও শায়বা প্রমুখ ج অক্ষরকে যবর যোগে اَلْحُجَرَاتُ পড়েছেন।

قَوْلُهُ فَتَبَيَّنُوْا : فَتَبَيَّنُوْا -এর মধ্যে দু'টি ক্বেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে فَتَبَيَّنُوْا যা মূল কুরআনে রয়েছে।
২. হামযাহ ও কিসায়ী (র.) পড়েছেন– فَتَثَبَّتُوْا [ثُبَاتٌ হতে]।

قَوْلُهُ اَنْ تُصِيْبُوْا : اَنْ تُصِيْبُوْا এর মধ্যে দু' প্রকারের ইরাব হতে পারে। যথা–

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা اَنْ تَبَيَّنُوْا -এর مَفْعُوْل لَهُ হবে।
২. অথবা, এটা একটি উহ্য مُضَافٌ -এর مُضَافٌ اِلَيْهِ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ : আল্লাহর বাণী– لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ -এর মধ্যে দু' ধরনের ই'রাবের সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা পূর্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত فِيْكُمْ -এর যমীর হতে حَالٌ হবে।
২. অথবা, এটা مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। তখন এটা একটি প্রশ্নের জবাব হবে এবং স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রশ্নটি হলো– لَوْ اَطَاعَكُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا يَحْدُثُ؟ [নবী করীম ﷺ যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করতেন তাহলে কি হতো?]

قَوْلُهُ نِعْمَةً وَّ فَضْلًا : আল্লাহর বাণী– "فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً" -এর মধ্যস্থিত فَضْلًا ও نِعْمَةً মহল্লান مَنْصُوْب হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. এগুলো একটি উহ্য فِعْل -এর مَصْدَرٌ (তথা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ) হবে। অর্থাৎ– اَفْضَلَ اللّٰهُ فَضْلًا وَاَنْعَمَ نِعْمَةً
২. অথবা, حَبَّبَ ফে'লের مَفْعُوْل لَهُ হবে।
৩. কিংবা مَفْعُوْل بِهِ হবে।

فَضْل ও نِعْمَةٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : فَضْل -এর অর্থ হলো ঐ মঙ্গল, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে; কিন্তু তিনি এর মুখাপেক্ষী নন।

পক্ষান্তরে نِعْمَةٌ -এর অর্থ হলো যা আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার নিকট পৌছে এবং বান্দা এর মুখাপেক্ষী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতদ্বয় বনূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের শানে নাজিল হয়েছিল। তারা দুপুরে মদীনায় এসেছিল। তাদের মধ্যে আকরা ইবনে হাবিস ও উয়াইনা ইবনে হিসনও ছিলেন। নবী করীম ﷺ তখন দুপুরের কায়লুলাহ [খাওয়ার পর বিশ্রাম] করছিলেন। তারা নবী করীম ﷺ -এর বের হওয়ার অপেক্ষা করল না; বরং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের হুজরা শরীফসমূহের পিছন দিক হতে নবী করীম ﷺ-এর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল। তাদের ভাষা ছিল মাধুর্যহীন, আচরণ ছিল অসৌজন্যমূলক। নবী করীম ﷺ জাগ্রত হয়ে বাহিরে তাশ্রীফ আনয়ন করলেন। যেহেতু তারা অসময়ে তড়িঘড়ি করে ডাকাডাকি করছিল এবং নবী করীম ﷺ -কে বিরক্ত করেছিল সেহেতু অত্র আয়াতদ্বয় নাজিল করত তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে সকলকেই অবহিত করা হয়েছে যে, এরূপ আচরণ নবী করীম ﷺ -এর মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকে এবং পরিণামে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিকে অপরিহার্য করে। –[জালালাইন, লুবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ الخ : শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত উম্মে সালামা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হতে এবং তাবারানী ও আহমদ (র.) হারিছ ইবনে আবিল হারিছ খুযায়ী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াতখানা ওলীদ ইবনে উকবা (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে।

নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবা (রা.)-কে বনূ মুস্তালিকের নিকট জাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে ওলীদের সাথে বনূ মুস্তালিকের শত্রুতা ছিল। ওলীদকে দেখে তারা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসল। কিন্তু ওলীদ মনে করলেন যে, পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসলেন। নবী করীম ﷺ -কে জানালেন যে, বনূ মুস্তালিকের লোকেরা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে; বরং তারা আমাকে হত্যা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে। নবী করীম ﷺ এটা শুনে তাদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করলেন।

অতঃপর বনূ মুস্তালিকের একটি দল নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করল। তারা আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাকাত প্রদানে প্রস্তুত ছিলাম এবং আপনার পক্ষ হতে এক ব্যক্তির আগমনে আমরা খুশিও হয়েছিলাম। তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা দিতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি রাস্তা হতে ফিরে চলে এসেছেন। আমরা তো এতে শঙ্কাবোধ করলাম যে, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ আমাদের উপর নারাজ হয়ে পড়লেন নাকি?

তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পর কোনো সংবাদ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতঃপর নবী করীম ﷺ হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে বনূ মুস্তালিকের নিকট পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে কোনোরূপ বিদ্রোহী মনোভাব পেলেন না; বরং তাদেরকে সম্পূর্ণ অনুগত পেলেন এবং নবী করীম ﷺ -কে তা অবহিত করালেন।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : নবী করীম ﷺ -এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণকারীদেরকে অজ্ঞ আখ্যায়িত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

হে হাবীব! যারা আপনাকে হুজরাসমূহের পিছন দিক হতে ডাকাডাকি করে তাঁদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অবুঝ। এরূপ তাড়াহুড়া না করে তারা যদি আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করত, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তারা তাদের কৃতকর্ম হতে তওবা করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

মুসলিমদের উন্নতি নবী করীম ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল : আলোচ্য আয়াত ও এর প্রেক্ষাপট হতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর মুসলিম জাতির তারাক্কী ও উন্নতি নির্ভরশীল।

বনূ তামীমের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। নবী করীম ﷺ হুজরা শরীফে অবস্থান করছিলেন। তারা হুজরার বাইরে দাঁড়িয়ে নবী করীম ﷺ -কে ডাকাডাকি করতে লাগল। এটা ছিল এক ধরনের বেয়াদবি, অজ্ঞতা ও অসৌজন্যতা। নিজেদের সরলতা ও কারণে তারা মহানবী ﷺ -এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা কি জানত যে, তখন তাঁদের উপর হয়তো ওহী নাজিল হচ্ছিল, অথবা তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল ছিলেন। সময়সূচি ও সময়ানুবর্তিতা না থাকলে তো কোনো সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষেও দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ নবী করীম ﷺ তো মুসলমানদের যাবতীয় পার্থিব ও দীনি দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

তা ছাড়া নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদবের বিষয়টিও ছিল লক্ষণীয়। তাদের উচিত ছিল কারো মাধ্যমে নবী করীম ﷺ -কে সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া এবং নবী করীম ﷺ বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তিনি বের হয়ে আসার পর তাঁর সাথে আলোচনায় বসা উচিত ছিল। এই ছিল উত্তম ও সৌজন্যমূলক পন্থা। এতদ্‌সত্ত্বেও অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ঘটনাক্রমে যা ঘটে গেছে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবানিতে তা ক্ষমা করে দিবেন।

যাতে স্বীয় ভুলের উপর অনুতপ্তবোধ করত ভবিষ্যতে যেন এরূপ পন্থা অবলম্বন না করে। নবী করীম ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এর উপরই মুসলিম জাতির উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আর এটাই এমন ঈমানী সম্পর্ক, যার উপর ইসলামি ভ্রাতৃত্বের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ আদবের চাহিদা : এখানে إِلَيْهِمْ -এর মধ্যে এ রহস্য নিহিত রয়েছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না নবী করীম ﷺ তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে না আসেন। কিন্তু যদি তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন অথবা বের হয়ে আসার পর অন্য কোনো কার্যে মশগুল হয়ে যান তাহলেও অপেক্ষা করতে হবে। কেননা এটা তো خُرُوْجُ إِلَيْهِمْ [তাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া] নয়। এটা হলো ধৈর্যের চরম অবস্থা। মোটকথা, নবী করীম ﷺ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আদবের সাথে অপেক্ষা করতে থাক। আর তোমরা যদি বুঝতে পার যে, নবী করীম ﷺ তোমাদের কথা শ্রবণ করার জন্য বের হয়ে এসেছেন তাহলে তোমরা কথা বলতে পার।

নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও নবী করীম ﷺ -এর হাদীস পড়া এবং শুনার সময় এবং তাঁর রওজা শরীফে হাজির হওয়ার সময় তাঁর আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কি খুলাফা, ওলামা ও দীনি নেতৃবৃন্দের সাথেও পর্যায়ক্রমে আদব রক্ষা করে চলতে হবে। অবশ্য নবী করীম ﷺ ও পরবর্তীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ .... نٰدِمِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে যে কোনো সংবাদ যাচাই-বাচাই করে গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথা কি অশুভ পরিণাম হতে পারে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে দেখবে যে, তা সত্য কি মিথ্যা। কেননা এমনও আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমের উপর আক্রমণ করে বসবে এবং পরিণামে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতখানা ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ব্যাপারে ঘটনা হলো, বনূ মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা যখন মুসলমান হলো, তখন নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবাকে তাদের নিকট হতে জাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের এলাকায় গিয়ে কোনো কারণে ভয় পেলেন, অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শয়তান তাকে প্ররোচিত করল। তাই তিনি গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই মদীনা ফিরে গেলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, লোকেরা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। অপর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, আর তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। নবী করীম ﷺ এ সংবাদ শুনতে পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাদের মস্তক চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একটি সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবার সংকল্প করলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে তিনি ঐ বাহিনী পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এ সময় বনূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে যিরার নিজেই একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন যে, আল্লাহর নামের শপথ, আমরা ওলীদকে দেখিওনি, জাকাত দিতে অস্বীকার করা তো দূরের কথা। আর তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমরা যে ঈমান এনেছি তার উপরই অবিচল রয়েছি। জাকাত দিতে আমরা আদৌ অস্বীকার করিনি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও"। –[ইবনে কাছীর]

ভিত্তিহীন সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা অনেক অকল্যাণের কারণ : নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবাকে বনূ মুস্তালিক গোত্রের নিকট হতে জাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। জাহিলি যুগ হতে ওলীদ এবং বনূ মুস্তালিক গোত্রের মধ্যে কিছুটা তিক্ততা ছিল। ওলীদের আগমনের কথা শুনে তারা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসল, কিন্তু ওলীদ এটা দেখে বুঝে নিল যে, তারা তাকে হত্যা করতে আসছে। এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ওলীদ ফিরে আসল এবং নিজের ধারণা মোতাবেক নবী করীম ﷺ -কে রিপোর্ট করল যে, বনূ মুস্তালিক মুরতাদ হয়ে গেছে এবং আমাকে হত্যা করতে সংকল্প করেছে। অতঃপর নবী করীম ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠালেন এবং বললেন যে, ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখবে মূল ব্যাপারটি কি? অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে সঠিক খবর জানাল যে, বনূ মুস্তালিক মুসলমান অবস্থায় আছে, তারা জাকাত দিতে প্রস্তুত। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে তারা নিজেরাই এসে নবীকে ঘটনাটি জানিয়ে দিয়েছিল।

মোটকথা ঘটনাটি ছিল এমন যে, একটি ভিত্তিহীন সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করে নেওয়ার দরুন একটি বিরাট ভুল সংঘটিত হতে যাচ্ছিল। একটি ভুল সংবাদের দরুন দু'টি বন্ধু দলের মাঝে চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছিল। সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ সবাইকে তা হতে রক্ষা করলেন। এ কারণেই ভিত্তিহীন সংবাদের উপর নির্ভর করা সকল ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ। -[কামালাইন, ফতূহাতে ইলাহিয়া, কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

খবরের সত্যতা যাচাই কখন জরুরি : এটা একটি স্বতন্ত্র আলোচনা যে, সংবাদের সত্যতা যাচাই করা কখন ওয়াজিব, কখন জায়েজ এবং কখন নিষিদ্ধ? এ ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে-

১. যে ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করলে কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব। যেমন বাদশাহ [খলিফা] যদি কারো মুরতাদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করেন, তাহলে তার জন্য উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করা ওয়াজিব। যদি সংবাদ সত্য হয়, তাহলে মুরতাদকে তওবা করার জন্য বলবে। আর তওবা করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করবার নির্দেশ দান করবে।

   অথবা, বাদশাহ যদি জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি অমুককে হত্যা করতে চায়, তাহলে যেহেতু প্রজাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধান করা ওয়াজিব সেহেতু তার সত্যতা যাচাই করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ওয়াজিব।

২ যে ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করলে কোনো ওয়াজিবে ব্যাঘাত হয় না এবং যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার কোনো ক্ষতিও হবে না, তাহলে সংবাদের সত্যতা যাচাই করা জায়েজ; ওয়াজিব নয়। যেমন- কেউ শুনল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে প্রহার করবে।

৩. আর যদি অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, যাচাই করলে নিজের ক্ষতি তো প্রতিহত করা যাবে না, কিন্তু অন্যের তা অপছন্দনীয় হবে তাহলে সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হারাম হবে। যেমন- কেউ শ্রবণ করল যে, অমুক ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহলে এর যাচাই করলে নিজের কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু যাচাই করতে গেলে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হবে, কাজেই এমতাবস্থায় সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হারাম হবে।

অত্র আয়াত হতে উদ্ভাবিত দু'টি মাসআলা : আলোচ্য আয়াতের আলোকে দু'টি শরয়ী মাসআলা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. অত্র আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ফাসিক পাপাচারীর সংবাদ গ্রহণ করা এবং এর উপর ভিত্তি করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া জায়েজ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সত্যতা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

   তা ছাড়া সংবাদ পাওয়া মাত্র তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তও নেওয়া উচিত হবে না। فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا কেরাতটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ সংবাদ পাওয়ার পর যাচাই-বাছাই করে দৃঢ় ও ধীরচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

   উল্লেখ্য যে, ফাসিকের সংবাদ যদ্রূপ গ্রহণযোগ্য নয় তদ্রূপ তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাক্ষ্য এমন একটি সংবাদ যাকে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়। কাজেই ফাসিকের সংবাদ ও সাক্ষ্য কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাসিকের সংবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে ফাসিকের সংবাদ বা সাক্ষাৎ গ্রহণ করলে কারো ক্ষতির কোনোরূপ আশঙ্কা থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে তার সংবাদ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা আয়াতে কারীমায় ফাসিকের সংবাদ গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ অর্থাৎ তাদের সংবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতীত গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদের অজ্ঞাতে কোনো কওমের ক্ষতি সাধন করে বসার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং কোনো ফাসিক এসে যদি বলে যে, 'অমুক ব্যক্তি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ এ বস্তুটি দান করেছেন'। তাহলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা উক্ত সংবাদ গ্রহণ করলে এবং হাদিয়া কবুল করলে তাতে কারো কোনোরূপ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

২. আলোচ্য আয়াত হতে গৃহীত [উদ্ভাবিত] দ্বিতীয় শরয়ী মাসআলাটি হলো خَبَرِ وَاحِدٌ একজনের সংবাদ [শর্তসাপেক্ষে] গ্রহণযোগ্য এবং শরিয়তের দলিল হওয়ার উপযোগী।

কেননা ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবা (রা.) কর্তৃক প্রদত্ত বনূ মুস্তালিক সম্পর্কিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই করে দেখার জন্য এবং তাঁর নিকট রিপোর্ট পেশ করার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) তদন্ত করার পর যেই রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন, নবী করীম ﷺ উক্ত সংবাদ গ্রহণও করেছিলেন।

সুতরাং তা হতে خَبَرِ وَاحِدٌ দলিল [ও তা গ্রহণযোগ্য] হওয়া প্রমাণিত হলো। -[তাফসীরে কবীর]

قَوْلُهُ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا : এ অংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. কূফাবাসীদের নিকট এর অর্থ হবে- لِئَلَّا تُصِيْبُوْا قَوْمًا

২. আর বসরাবাসীদের মতে এর অর্থ হবে- خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبُوْا -[তাফসীরে কাবীর]

কুফর, ফিসক এবং ইসয়ানের মধ্যকার পার্থক্য : উল্লেখ্য যে, কুফর, ফিসক এবং ইসয়ান– এ তিনটি শব্দই اِيْمَانٌ كَامِلٌ তথা পূর্ণ ঈমানের বিপরীত। কারণ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। যার কোনো একটির অনুপস্থিতিতে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কুফর, ফিসক এবং ইসয়ান এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ঈমানী গুণের বিপরীত। কারণ পূর্ণ মুমিন হতে হলে প্রথমত تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ তথা অন্তরের বিশ্বাস-এর প্রয়োজন। আর এটা কুফর এবং تَكْذِيْبٌ -এর বিপরীত। দ্বিতীয়ত اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ -এর প্রয়োজন। আর এটা এটা ফিসক এবং كِذْبٌ -এর বিপরীত। তৃতীয়ত عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ -এর প্রয়োজন। আর এটা عِصْيَانٌ বা مَعْصِيَةٌ -এর বিপরীত।

অথবা কুফরের অর্থ হচ্ছে শিরক। আর اَلْفُسُوْقُ -এর অর্থ হচ্ছে خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ বা আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। অথবা কুফরের সম্পর্ক হবে কালামের সাথে আর مَعْصِيَةٌ অর্থ হলো– আমল পরিত্যাগ করা। অথবা কুফ্রের অর্থ হচ্ছে– প্রকাশ্য পাপ, আর فُسُوْق -এর অর্থ হলো– কবীরা গুনাহ, আর مَعْصِيَةٌ -এর অর্থ হলো– সগীরা গুনাহ।

সারকথা হলো, পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে হলে ব্যক্তির বিশ্বাস, আমল ও কথায় ছোট বা বড় কোনো গুনাহই থাকতে পারবে না। সকল গুনাহই তার নিকট অপছন্দনীয় হবে।

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ الخ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ-এর বর্তমানে তোমরা যদি লাগামহীন কথাবার্তা বল, তাহলে রাসূলে কারীম ﷺ -কে তা অবহিত করে দেওয়া হবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ বর্তমান রয়েছেন। তোমরা যদি অবাস্তব কোনো সংবাদ তাঁকে প্রদান কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা ফাঁস করে দিবেন এবং তাঁকে বাস্তব ঘটনা অবহিত করিয়ে দিবেন। তোমরা তাঁকে যেসব অবাস্তব সংবাদ প্রদান কর, এর অধিকাংশ অনুযায়ী যদি তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে পরিণামে তোমরা কষ্ট পেতে। এর জন্য তিনি দায়ী হতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদেরকে প্রিয় বান্দা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করে দিয়েছেন; পক্ষান্তরে কুফর, ফিস্ক ও নাফরমানিকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করে দিয়েছেন; সেহেতু তোমাদেরকে মিথ্যা সংবাদের ভয়াবহ পরিণতি হতে মেহেরবানি করে হেফাজত করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য : নবী করীম ﷺ মুসলমানদের মাঝে থাকা বস্তুত একটি বিরাট নিয়ামত। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ الخ সুতরাং তোমরা এর মর্যাদা প্রদান কর। ইহ্-পারলৌকিক কোনো বিষয়ে তোমরা তাঁর বিরোধিতা করো না। এরূপ ধারণা করে বস না যে, পার্থিব বিষয়াদিতে নবী করীম ﷺ আমাদের অনুসরণ করবেন। তাছাড়া তিনি তোমাদের কোনো সংবাদ বা মতামত অনুযায়ী যদি আমল না করেন, তাহলে এতে বিরক্ত হয়ো না। কেননা হক বা সত্য কারো ইচ্ছা বা মতামতের অনুসারী নয়। এরূপ হলে তো আসমান-জমিনের এ কারখানা কবেই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত।

যাহোক, নবী করীম ﷺ যদি লোকজনের কথা মেনে নিতে থাকতেন, তাহলে তোমরা বিপদে পড়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি অনুগ্রহ করে ঈমানদারগণের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, ফিসক ও গুনাহ্কে অপ্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। যদ্দরুন তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ কাম্য রয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেজামন্দি হাসিলের জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। যথায় নবী করীম ﷺ উপস্থিত রয়েছেন তথায় অন্য কারো ইচ্ছা ও মতামতের কিভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে?

এমন কি পার্থিব বিষয়াদিতেও নবী করী ﷺ -এর আনুগত্য জরুরি। তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যতীত ঈমান কামিল হতে পারে না। সুতরাং ঈমানদারগণ সাথে সাথেই নবী করীম ﷺ -এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়েছেন। আজ যদিও নবী করীম ﷺ আমাদের মাঝে নেই তথাপি তাঁর শিক্ষা, ওয়ারিশ ও প্রতিনিধি আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কার কি যোগ্যতা রয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই অবগত আছেন। তিনি স্বীয় হিকমতের আলোকে যে যা পেতে পারে তাকে তা দান করে থাকেন। তার প্রতিটি বিধানেই হিকমত রয়েছে– মুসলিম মনীষীগণ ও অল্পবিস্তর তা অবগত রয়েছেন।

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى : গ্রন্থকার (র.) স্বীয় বক্তব্য– اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি এই যে, لٰكِنَّ -এর পূর্বাপরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এর সম্পর্ক হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্বের বাক্য ও পরের বাক্য পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। অথচ এখানে তা দেখা যায় না, এর কারণ কি?

জবাবের সারকথা এই যে, যদিও শাব্দিকভাবে এখানে বৈপরীত্ব ও বিরোধ দেখা যায় না, কিন্তু অর্থগতভাবে বৈপরীত্ব বিদ্যমান। কেননা উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারীগণ পূর্বোল্লিখিতদের হতে ভিন্ন ধরনের। পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যারা তাদের অবস্থা পূর্বে উল্লিখিতদের হতে আলাদা। তারা সব কথায় কান দেয় না। সুতরাং পূর্বাপরের মধ্যে বৈপরীত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেল।

٩. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةٍ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا وَمَرَّ عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ فَبَالَ الْحِمَارُ فَسَدَّ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ وَاللّٰهِ لَبَوْلُ حِمَارِهِ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْ مِسْكِكَ فَكَانَ بَيْنَ قَوْمَيْهِمَا ضَرْبٌ بِالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ وَالسُّعَفِ اقْتَتَلُوْا جُمِعَ نَظْرًا إِلَى الْمَعْنٰى لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ جَمَاعَةٌ وَقُرِئَ اقْتَتَلَتَا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج ثُنِّيَ نَظْرًا إِلَى اللَّفْظِ فَإِنْ بَغَتْ تَعَدَّتْ إِحْدٰيهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ تَرْجِعَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ج اَلْحَقِّ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ بِالْإِنْصَافِ وَأَقْسِطُوْا ط اِعْدِلُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অনুবাদ :

৯. আর ঈমানদারদের মধ্যে যদি দু'টি দল- অত্র আয়াতখানা একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। তা এই যে, নবী করীম ﷺ একবার গাধায় সওয়ার হলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট দিয়ে যেতে লাগলেন। এমতাবস্থায় গাধাটি প্রস্রাব করল। এতদ দর্শনে ইবনে উবাই নাক বন্ধ করে ফেলল। তখন হযরত ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, [হে ইবনে উবাই!] তোমার মেশক হতে তাঁর গাধার প্রস্রাব অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এতে উভয় গোত্র হাত, জুতা ও গাছের ডালের দ্বারা মারামারি শুরু করে দেয়। [طَائِفَةٌ -এর] অর্থের দিক বিবেচনায় [اِقْتَتَلُوْا ক্রিয়াকে] বহুবচন নেওয়া হয়েছে। কেননা প্রতিটি طَائِفَةٌ -ই একেকটি দল। অন্য এক কেরাতে اِقْتَتَلَتَا রয়েছে, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দাও। শব্দের দিক বিচারে দ্বিবচন নেওয়া হয়েছে। সুতরাং [এরপরও] যদি বাড়াবাড়ি করে সীমালঙ্ঘন করে তাদের মধ্য হতে একটি দল অন্য দলের উপর, তাহলে বাড়াবাড়িকারী দলের সাথে লড়াই কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ফিরে আসে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর নির্দেশ [তথা বিধান]-এর দিকে [অর্থাৎ] সত্যের দিকে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তাহলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ইনসাফের সাথে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে ইনসাফ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীগণকে ভালোবাসেন।

١٠. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فِي الدِّيْنِ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ج إِذَا تَنَازَعَا وَقُرِئَ إِخْوَتِكُمْ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي الْإِصْلَاحِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

১০. নিশ্চয় ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই দীনি ভাই। কাজেই তোমাদের ভাইগণের মধ্যে সমঝোতা করে দাও যখন তারা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। أَخَوَيْكُمْ -এর স্থলে এক কেরাতে إِخْوَتِكُمْ [تَا] -এর সাথে রয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর। সমঝোতা স্থাপনের ব্যাপারে। যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِقْتَتَلُوْا : اِقْتَتَلُوْا শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ বহুবচনের সীগাহ দ্বারা اِقْتَتَلُوْا পড়েছেন। কেননা طَائِفَتَانِ শব্দগতভাবে বহুবচন।

২. ক্বারী ইবনে আবী উবলা (র.) পড়েছেন– اِقْتَتَلَتَا কেননা طَائِفَتَانِ তাছনিয়া মুয়ান্নাছ।

৩. যায়েদ ইবনে আলী ও উবাইদ ইবনে উমায়ের প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন– اِقْتَتَلَا ; তারা طَائِفَتَانِ -কে فَرِيْقَانِ হিসেবে গণ্য করেছেন।

قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا : আল্লাহর বাণী– فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো طَائِفَتَانِ - [طَائِفَتَانِ -এর] শব্দের দিক বিবেচনায় একে দ্বিবচনের নেওয়া হয়েছে [যদিও পূর্বে اِقْتَتَلُوْا -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর নেওয়া হয়েছিল অর্থের দিকে লক্ষ্য করে।]

قَوْلُهُ اَخَوَيْكُمْ : আল্লাহর বাণী– "فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ" -এর মধ্যস্থিত اَخَوَيْكُمْ -এর মধ্যে তিন প্রকারের কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ اَخَوَيْكُمْ [দ্বিবচনের সীগাহ] পড়েছেন।

২. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হাসান (রা.), হাম্মাদ ইবনে সালিমা (র.) ও ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ اِخْوَانِكُمْ পড়েছেন।

৩. আবূ আমর (র.) নসর ইবনে আসিম (র.), আবু আলিয়া (র.) ও ইয়াকূব (র.) প্রমুখ اِخْوَتِكُمْ পড়েছেন।

بَيْنَهُمَا -এর যমীর কিভাবে তাছনিয়া বা দ্বিবচন নেওয়া হলো, অথচ নিকটবর্তী مَرْجِعْ বহুবচন হয়েছে : আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -তে বর্ণিত بَيْنَهُمَا -এর যমীর কিভাবে تَثْنِيَة নেওয়া ঠিক হয়েছে, অথচ তার নিকটবর্তী مَرْجِعْ - اِقْتَتَلُوْا শব্দটি جَمْع -এর শব্দ?

মূল কথা হলো, بَيْنَهُمَا -এর যমীরটির مَرْجِعْ হলো طَائِفَتَانِ ; সুতরাং طَائِفَتَانِ শব্দের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে بَيْنَهُمَا -এর যমীরটি تَثْنِيَة নেওয়া হয়েছে। –[জালালাইন]

কিভাবে اِقْتَتَلُوْا -এর যমীরটি جَمْع নেওয়া হয়েছে অথচ তার مَرْجِعْ দ্বিবচন : اِقْتَتَلُوْا শব্দটি অর্থের দৃষ্টিতে জমা নেওয়া হয়েছে, যদিও সঙ্গতভাবে তা تَثْنِيَة হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা প্রতিটি طَائِفَةٌ হলো একটি দল যাতে অনেক লোক আছে। সুতরাং অর্থের দৃষ্টিতে جَمْع নেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পরস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে নুযূল : এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরিক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোনো ইমাম, আমির সরদার অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারো বিরোধিতা এবং কারো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

মাসায়েল : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। হয়তো বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। এটা ওয়াজিব। যদি ইসলামি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদি করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যার্পণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে- فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোনো পক্ষের মনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কুরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকিদ করেছে। -[বয়ানুল কুরআন]

মাস'আলা : যদি মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরিয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যাদ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত। -[মাযহারী]

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েজ হবে না। -[মাযহারী]

এই বিধান তখন, যখন এক দলের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোনো প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষে থাকবে। যেমন জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা.) বলেন, এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছ। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জামাল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে-

কোনো সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েজ নয়। কারণ তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন- إِنَّ طَلْحَةَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা.)-এর জন্য বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদাতের মর্তবা অর্জিত হতো না। কারণ শাহাদাত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরি।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়া তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়র (রা.) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গুনাহগার ছিলেন না। এরূপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্বসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফজিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জবাবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন– تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জবাবে অন্য একজন বুজুর্গ বলেন এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোনো এক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন, আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার বাদানুবাদ হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলির ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র.) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নীরব থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন, আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নীরব থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোনো পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

অনুবাদ :

১১. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ الْاٰيَةُ نَزَلَتْ فِيْ وَفْدِ تَمِيْمٍ حِيْنَ سَخِرُوْا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ وَالسُّخْرِيَةُ الْاِزْدِرَاءُ وَالْاِحْتِقَارُ قَوْمٌ اَيْ رِجَالٌ مِنْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا نِسَاۤءٌ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْآ اَنْفُسَكُمْ لَا تَعِيْبُوْا فَتُعَابُوْا اَيْ لَا يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ لَا يَدْعُوْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَقَبٍ يَكْرَهُهُ وَمِنْهُ يَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ بِئْسَ الْاِسْمُ اَيِ الْمَذْكُوْرُ مِنَ السُّخْرِيَةِ وَاللَّمْزِ وَالتَّنَابُزِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج بَدَلٌ مِنَ الْاِسْمِ لِاِفَادَةِ اَنَّهُ فِسْقٌ لِتَكَرُّرِهِ عَادَةً وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ مِنْ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

১১. হে মুমিনগণ! কেউ যেন উপহাস না করে– তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল হযরত আম্মার (রা.) ও সুহায়েব (রা.) ইত্যাকার দরিদ্র মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। আর سُخْرِيَةٌ এমন হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুককে বলে যা দ্বারা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং কষ্ট দেওয়া হয়। কোনো কওম তোমাদের মধ্য হতে এক দল অন্য কওম [দল]-এর সাথে [কেননা] হয়তো উপহাসকৃতরা উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে– আল্লাহর নিকট আর যেন উপহাস না করে নারীগণ তোমাদের মধ্য হতে অপর নারীগণের সাথে [কেননা] হয়তো উপহাসকৃতা নারীগণ উপহাস-কারিণীগণের অপেক্ষা উত্তম হবে। আর তোমাদের নিজেদের [ভাইয়ের] প্রতি দোষারোপ করো না অর্থাৎ তুমি তোমার অন্য ভাইয়ের প্রতি দোষারোপ করো না, তাহলে তোমার প্রতিও দোষারোপ করা হবে। অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না। আর পরস্পরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না– একে অপরকে এমন উপাধিতে ডেকো না যা সেই [আহুত ব্যক্তি] অপছন্দ করে। যেমন হে ফাসিক! হে কাফের ইত্যাদি। কতইনা মন্দ নাম! বিদ্রূপ, দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিসকের নামকরণ ঈমান গ্রহণের পর اَلْفُسُوْقُ শব্দটি اَلْاِسْمُ হতে بَدَلٌ হয়েছে। এটা বুঝানোর জন্য যে, তা ফিস্‌ক। কেননা بَدَلٌ সাধারণত বারংবার হয়। আর যে তওবা করবে না তা হতে– তারাই জালিম।

১২. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ اَيْ مُؤْثِمٌ وَهُوَ كَثِيْرٌ كَظَنِّ السُّوْءِ بِاَهْلِ الْخَيْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُمْ كَثِيْرٌ بِخِلَافِهِ بِالْفُسَّاقِ مِنْهُمْ فَلَا اِثْمَ فِيْهِ فِيْ نَحْوِ مَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ وَلَا تَجَسَّسُوْا حُذِفَ مِنْهُ اِحْدَى التَّائَيْنِ لَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَعَائِبَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهَا .

১২. হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। নিঃসন্দেহে কতিপয় ধারণা গুনাহ অর্থাৎ গুনাহের দিকে ধাবিতকারী। আর এর সংখ্যা অনেক। যেমন ভালো-সৎ ঈমানদারগণের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা– যারা সংখ্যায় অনেক। ফাসিক মুসলমানদের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা– এটার বিপরীত। কেননা এটা যদি তাদের বাহ্যিক অবস্থা মাফিক হয় তাহলে তাতে গুনাহ হবে না। আর কারো ছিদ্রান্বেষণ করো না। এর দু'টি تَ -এর একটিকে হযফ করা হয়েছে। [অর্থাৎ] মুসলমানদের গোপন বিষয়াদি ও দোষ-ত্রুটি উদঘাটনের পিছনে লেগে যেয়ো না।

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط لَا يَذْكُرُهُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ لَا يَحِسُّ بِهِ لَا فَكَرِهْتُمُوهُ ط أَيْ فَاغْتِيَابُهُ فِي حَيَاتِهِ كَأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْكُمُ الثَّانِي فَكَرِهْتُمُوهُ فَاكْرَهُوا الْأَوَّلَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط أَيْ عِقَابَهُ فِي الْاِغْتِيَابِ بِأَنْ تَتُوبُوا مِنْهُ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ قَابِلٌ تَوْبَةَ التَّائِبِينَ رَحِيمٌ بِهِمْ.

একে অপরের গিবত করো না– অন্যের এমন কিছু উল্লেখ কর না যা সে অপছন্দ করে– যদিও এটা তার মধ্যে বিদ্যমান। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? مَيْتًا শব্দটির ى অক্ষরটি তাশ্‌দীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয়ভাবে পড়া যায়। [অর্থাৎ] যার মধ্যে অনুভূতি নেই। [জবাব হবে] না। সুতরাং তোমরা একে অপছন্দ কর। অর্থাৎ জীবদ্দশায় তার গিবত করা মৃতাবস্থায় তার গোশত খাওয়ার সমতুল্য। আর তোমাদের নিকট দ্বিতীয়টি পেশ করার পর তোমরা একে ঘৃণা করেছ। সুতরাং প্রথমোক্তটিকেও ঘৃণা কর [এবং পরিহার কর]। আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ গিবত করার ব্যাপারে তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। এভাবে যে, গিবত হতে তোমরা তওবা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী। তওবাকারীদের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু তওবাকারীদের প্রতি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْفُسُوْقُ : আল্লাহর বাণী– بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ -এর মধ্যস্থিত اَلْفُسُوْقُ শব্দটি اَلْاِسْمُ হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। কেননা, اَلْاِسْمُ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ আর بَدَلٌ ও مُبْدَلٌ -এর ই'রাব এক হয়ে থাকে।

قوله وَلَا تَجَسَّسُوْا : আল্লাহর বাণী– وَلَا تَجَسَّسُوْا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ ج -এর সাথে وَلَا تَجَسَّسُوْا পড়েছেন।

২. হাসান, আবূ রেজা ও ইবনে সীরীন প্রমুখ ক্বারীগণ ج -এর পরিবর্তে ح দ্বারা وَلَا تَحَسَّسُوْا পড়েছেন।

قَوْلُهُ مَيْتًا : আল্লাহর বাণী– "اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا" -এর মধ্যস্থিত مَيْتًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা, এটা لَحْمٌ অথবা اَخِيْهِ হতে حَالٌ হয়েছে।

مَيْتًا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ ى -এর উপর সাকিনযোগে مَيْتًا পড়েছেন।

২. হযরত নাফে (র.) ى -এর উপর তাশ্‌দীদযোগে مَيِّتًا পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ الخ : **শানে নুযূল** : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। যথা–

১. হযরত যাহ্‌হাক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে কতিপয়ের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মধ্যে হযরত আম্মার (রা.), সোহাইব (রা.), খাব্বাব (রা.), ফোহায়রা (রা.), বেলাল (রা.), সালমান (রা.) ও সালিম (রা.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বনূ তামীমের লোকেরা তাদেরকে উপহাস করল। তাদের ব্যাপারে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

২. তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতখানা হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইব্‌নে শামআস (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হযরত সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) কানে কম শুনতেন। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সাধারণত নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে তাঁকে সামনের কাতারে বসার জন্য সুযোগ করে দিতেন।

একদিন হযরত সাবিত (রা.) নামাজের পর নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে হাজির হয়ে দেখতে পান যে, আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সাহাবীগণ (রা.) সারিবদ্ধ হয়ে আলোচনা শুনছিলেন। হযরত সাবিত (রা.) সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন– تَفَسَّحُوْا تَفَسَّحُوْا সকলেই তাঁকে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রায় সম্মুখে পৌঁছলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে আর সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হলো না। হযরত সাবিত (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে? উপস্থিত লোকজন তার নাম প্রকাশ করে দিল। হযরত সাবিত (রা.) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বললেন, অমুক মহিলার পুত্র নাকি? জাহেলিয়াতের যুগে তাকে উক্ত নামে ডাকা হতো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। হযরত সাবিত (রা.)-এর কথায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং এ ধরনের আচরণ হতে বিরত থাকার জন্য সাহাবীগণ (রা.)-কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৩. অপর এক বর্ণনা এসেছে যে, ইকরিমা ইবনে আবী জাহল (রা.) মুসলমান হওয়ার পর মদীনায় আগমন করলেন। লোকজন তাকে বিদ্রূপ করল এবং বলল যে, اِبْنُ فِرْعَوْنَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ -এ উম্মতের ফিরাউনের ছেলে'। হযরত ইকরিমা (রা.) নবী করীম ﷺ -কে তা অবগত করালেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। অনুরূপ আচরণ পরিহার করার জন্য সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, অত্র আয়াতখানা হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে। তিনি ছিলেন ইহুদি রমণী। খায়বরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে মুসলিমদের হাতে আসার পর নবী করীম ﷺ তাকে আজাদ করেন এবং বিবাহ করেন। মদীনার অন্যান্য মহিলারা তাঁকে يَهُوْدِيَّةٌ بِنْتُ يَهُوْدِيَّيْنِ (ইহুদির কন্যা ইহুদি) বলে তিরস্কার করত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি বলনি যে, আমার পিতা হলেন হারূন (আ.), আমার চাচা হলেন মূসা (আ.) এবং আমার স্বামী হলেন মুহাম্মদ ﷺ? তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিনীগণ (রা.) হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে বেঁটে ও খাটো বলে তিরস্কার করত। তাঁদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৩. হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বলেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে সালামা (রা.) তো বেঁটে ও খাটো। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ : শানে নুযূল : وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আয়াতাংশের শানে নুযূলের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো এক বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রাগন্বিত হয়ে তাকে বললেন, হে ইহুদির বাচ্চা! তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ যর (রা.)-কে বললেন, হে আবূ যর! তুমি কি ঐ স্থানে লাল কালো দেখতে পাও না? তাক্‌ওয়ার দৃষ্টিতে তুমি তার অপেক্ষা উত্তম নও।

২. হাসান ও মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পরও কোনো কোনো ব্যক্তিকে কুফরির দিকে নিসবত করা হতো। যেমন– বলা হতো, হে ইহুদি! হে খ্রিস্টান! ইত্যাদি। তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : শানে নুযূল : আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -এর শানে নুযূল হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে।

দু জন সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট তরকারির জন্য পাঠালেন। হযরত উসামা (রা.) খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তরকারি প্রদানে অস্বীকার করলেন। হযরত সালমান (রা.) প্রেরণকারী সাহাবীদ্বয়কে বিষয়টি অবহিত করালেন। তারা শুনে তিরস্কার করে বলল, হযরত সালমান (রা.)-কে যদি পানি ভর্তি কূপেও পাঠানো হয় তাহলে তার পানি শুষ্ক হয়ে যাবে।

উক্ত সাহাবীদ্বয় নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলেন। তাদের দেখে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, বাহ্ তোমাদের মুখে গোশ্‌তের লালিমা কিভাবে চমকাচ্ছে। তারা বললেন, আমরা তো গোশ্‌ত খাইনি। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা গিবত করেছ। তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতোপূর্বে মুসলমানদের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিবাদ প্রতিরোধ করার কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ঘটনাক্রমে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়ে গেলে তা কিভাবে নিরসন করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারস্পরিক বিরোধ সম্পূর্ণ মেটানোও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত তা যেন ব্যাপক আকার ধারণ না করে তার চেষ্টা করতে হবে। কেননা দু' ব্যক্তি বা দু' দলের মধ্যে যদি ঘটনাক্রমে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন পরস্পরে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-কৌতুক করে থাকে, যা মতবিরোধের আগুনে ইন্ধন যোগিয়ে থাকে। অথচ যাকে সে উপহাস করছে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা যে, উপহাসকারীর অপেক্ষা বহু গুণে বেশি তা তার জানাও নেই। আর এভাবে মতবিরোধ ও তিক্ততা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, তা সংশোধনের আর কোনো পথই খোলা থাকে না।

قَوْلُهُ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ ...... خَيْرًا مِّنْهُنَّ : এখানে আল্লাহ তা'আলা একজন ঈমানদারকে অন্য ঈমানদারের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে পুরুষগণ যেন অপর পুরুষদের এবং নারীগণ যেন অপর নারীদের বিদ্রূপ না করে। কেননা হয়তো আল্লাহর নিকট বিদ্রূপকারীদের অপেক্ষা বিদ্রূপকৃতগণ অধিকতর সম্মানী ও উত্তম হতে পারে, যা তাদের জানা নেই।

কোনো দল যেন অন্য দলের সাথে কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের সাথে উপহাস না করে। سُخْرِيَّة এমন হাসি ও বিদ্রূপকে বলে যা দ্বারা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং তার অন্তরে ব্যথা দান করা হয়। কিন্তু কারো অন্তরকে খুশি করার জন্য যে হাসি-তামাশা করা হয় তাকে কৌতুক বলে। এটা জায়েজ বরং নবী করীম ﷺ হতে সাব্যস্ত রয়েছে।

قَوْم এবং نِسَاء -এর শব্দের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু সমষ্টিগতভাবে বিদ্রূপ করা নাজায়েজ; বরং পুরুষ ও নারীদের জাতি বুঝানোই এটার উদ্দেশ্য, চাই তাদের সংখ্যা এক হোক অথবা একাধিক হোক। যদ্রূপ নারীদের সাথে নারীদের এবং পুরুষদের সাথে পুরুষদের বিদ্রূপ করা হারাম তদ্রূপ নারীদের সাথে পুরুষদের এবং পুরুষদের সাথে নারীদের বিদ্রূপ করাও হারাম। অধিকতর উপহাস সমজাতীয়ের সাথে হওয়ার কারণেই সম্ভবত কুরআন মাজীদে তাখসীস করা হয়েছে। অথবা, এর উদ্দেশ্য এই যে, সমজাতীয়ের সাথে যখন উপহাস করা জায়েজ নেই তখন অসমজাতীয়ের সাথে কোনোক্রমেই জায়েজ হবে না। কেননা এতে উপহাস ছাড়াও এক ধরনের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা নিহিত রয়েছে- যা ততোধিক নিন্দনীয়। আর যে কোনো লোক যতই হীন হোক তার শেষ পরিণতি যদি ঈমানের সাথে হয় অর্থাৎ ঈমানের সাথে যদি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাহলে আল্লাহর নিকট অবশ্যই সে মর্যাদাবান হবে। অপরদিকে বাহ্যিক সম্মানী ব্যক্তির মৃত্যু যদি ঈমানের সাথে না হয় তাহলে তার মতো দীনহীন আর কে হতে পারে? কাজেই বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সাবধান থাকা উচিত। عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا -এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ যে মুখের কথার দ্বারাই হয়ে থাকে এমন নয়। কারো নকল বেশ ধারণ বা প্রতিকৃতি কিংবা পুত্তলিকা বানানো, কারো প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক ইঙ্গিত করা, কারো কথা, কাজ বা আকার-আকৃতি কিংবা পোশাকের উপর হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করা অথবা তার কোনো দোষ-ত্রুটির দিকে লোকদের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট করা- যেন তারা তজ্জন্য বিদ্রূপের হাসি হাসে, এসব কিছুই অপমানকর ঠাট্টা-বিদ্রূপের পর্যায়ে পড়ে। মোটকথা, এমন যে কোনো ধরনের বিদ্রূপ হতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

সহীহ হাদীসে আছে, অহঙ্কার ও উপহাস সত্যের পরিপন্থি। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। কেননা এমনও হতে পারে যে, উপহাসকারী অপেক্ষা উপহাসকৃত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট মান ও মর্যাদায় অনেক বড় ও অধিক প্রিয়।

মহিলারা قَوْم -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কথা পুনরায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ কোনো দল যেন অন্য দলের সাথে বিদ্রূপ না করে। এখানে قَوْم -এর মধ্যে মহিলারাও শামিল রয়েছে। তথাপি পুনরায় وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ বলে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

মুফাস্‌সিরগণ এর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও সাধারণত قَوْم বলতে আমরা পুরুষ ও নারী উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকি, তথাপি মূলত قَوْم বিশেষত পুরুষদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা তারাই মহিলাদের জন্য قَوَّامٌ [শৃঙ্খলা বিধানকারী] হয়ে থাকে।

قَوْم শব্দটি প্রকৃতপক্ষে قَائِمٌ -এর বহুবচন। যেমন- زَائِرٌ ও صَائِمٌ -এর বহুবচন زَوْرٌ ও صَوْمٌ হয়ে থাকে। সুতরাং মহিলারা যদি قَوْم -এর মধ্যে শামিল হতো, তাহলে وَلَا نِسَاءٌ الخ বলার প্রয়োজন হতো না। এ ব্যাপারে কবি যুহাইরের নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- وَمَا اَدْرِىْ وَلَسْتُ اَخَالُ اَدْرِىْ ٭ قَوْمٌ اٰلُ حِصْنٍ اَمْ نِسَاءٍ

অত্র শ্লোকে قَوْم -এর বিপরীতে نِسَاء -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

অবশ্য قَوْم عَاد এবং قَوْم ثَمُوْد ইত্যাদিতে পুরুষদের অধীনে (تَبْعًا) নারীদেরকে শামিল করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ -এর তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন- لَا تَعِيْبُوْا فَتُعَابُوْا اَىْ لَا يَعِيْبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ তোমরা অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, তাহলে তোমাদের প্রতিও দোষারোপ করা হবে। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা হতে বিরত থাকো।

কামালাইনের গ্রন্থকার (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা অপরের প্রতি দোষারোপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর اَنْفُسَكُمْ এ জন্য বলা হয়েছে যে, অন্যের দোষচর্চা করা পরিণামে নিজের দোষচর্চা করারই শামিল। কেননা সমস্ত মুসলমান একটি আত্মার ন্যায়। অথবা, এ জন্য যে, যে অন্যের দোষ বর্ণনা করবে তার দোষও বর্ণনা করা হবে। কাজেই অন্যের দোষ বর্ণনা করার পরিণামে নিজের প্রতিই দোষারোপ করা হয়।

তাফসীরে কবীর প্রণেতা [ইমাম রাযী (র.)] এটার তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. কোনো মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে গালমন্দ বা তিরস্কার করা, তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো ও তার প্রচার প্রসার করার অর্থ হলো নিজেকে তিরস্কার ও গালমন্দ করা। কেননা দু'জনই একটি দেহের মতো।
২. একজন যদি অপরজনকে গালমন্দ করে, তাহলে অপরজন প্রতিশোধ হিসেবে তাকে গালমন্দ করবে। কাজেই কাউকে গালা-গালি করার অর্থ হলো নিজেকে গালাগালি করা।
৩. অপরকে গালমন্দ করলে [সে যদি এর যোগ্য না হয়, তাহলে] উক্ত গালমন্দের অশুভ পরিণাম গালমন্দকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং এটা যেন নিজেকেই গালমন্দ করা হলো।

قَوْلُهُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ : ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ তোমরা নিন্দনীয় [মন্দ] উপাধিতে কাউকে ডেকো না, কাউকে মন্দ উপনাম [খেতাব বা উপাধি] প্রদান করো না।

জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন- لَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَقَبٍ يَكْرَهُهُ وَمِنْهُ يَا فَاسِقُ الخ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এমন উপাধিতে ডেকো না, যা সে অপছন্দ করে। যেমন- কাউকে হে ফাসিক! অথবা, হে কাফির! বলে সম্বোধন করা।

কামালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, نَبْزٌ -এর অর্থ হলো, যে কোনো ধরনের উপাধি। কিন্তু পরিভাষায় মন্দ উপাধিকে نَبْز বলে। কামূস অভিধান গ্রন্থে আছে- تَنَابُزٌ -এর অর্থ হলো, কাউকে তার উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- اَلتَّنَابُزُ بِالْاَلْقَابِ -এর অর্থ হলো, কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে তওবা করার পরও তাকে সেদিকে নিসবত [সম্পর্কিত] করে ডাকা। যেমন- কেউ মদ পান করা হতে তওবা করার পরেও তাকে মদ্যপায়ী বলা। যে কোনো অপরাধ হতে তওবা করার পর তওবাকারীকে পূর্বে কৃত অপরাধের জন্য লজ্জা দেওয়া জায়েজ নেই।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যদি কেউ কাউকে এমন গুনাহের কারণে লজ্জা দেয় যা হতে সে তওবা করেছে, তাহলে লজ্জাদাতাকে উক্ত গুনাহে লিপ্ত করে ইহ-পরকালে অপমানিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, যে সকল উপনাম বা উপাধি বাহ্যত মন্দ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিন্দনীয় নয়, তা উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এগুলো তাদের পরিচিতির মাধ্যম। এদের মাধ্যমে সহজেই তাদের পরিচয় লাভ করা যায়।

এ জন্যই মুহাদ্দিসগণ اَسْمَاءُ الرِّجَالِ -এর মধ্যে سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ [নির্বোধ সুলায়মান] ইত্যাকার পরিচিতিমূলক শব্দাবলিকে জায়েজ রেখেছেন। যেমন- আবূ হুরায়রাহ (রা.)-কে উক্ত [বিড়ালের পিতা বা বিড়ালওয়ালা] নামে ডাকা হয়েছে। হাদীসে এ নামেই তিনি পরিচিত।

ভালো উপাধিতে সম্বোধন করা সুন্নত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ঈমানদারের উপর অপর ঈমানদারের যেসব অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- সে তার ঈমানদার ভাইকে অধিক পছন্দনীয় ও সুন্দর নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। আরবে এরূপ নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবী করীম ﷺ নিজেও তা পছন্দ করতেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে বিশেষ বিশেষ পদবীতে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সিদ্দীক ও আতীক, ওমর (রা.)-কে ফারূক, হামযা (রা.)-কে আসাদুল্লাহ ও খালিদ (রা.) -কে সাইফুল্লাহ উপাধি দান করেছিলেন। সাহাবীগণের পরবর্তী যুগেও এর রেওয়াজ চলে এসেছে। বর্তমানেও তা জায়েজ; বরং সুন্নত।

قَوْلُهُ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী নাম খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট।

কাউকে মন্দ নামে ডাকলে নিজেই গুনাহগার হতে হয়। যাকে মন্দ নামে ডাকল সে মন্দ হোক বা না হোক, তার ক্ষতি হোক বা না হোক. কিন্তু যে উক্ত উপাধি [বা নাম] প্রদান করল সে সমাজে অসভ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। ভেবে দেখ যে, মুমিন-এর উত্তম উপাধি পাওয়ার পর এরূপ নাম কিরূপ অশোভনীয় হবে।

অথবা, এর মর্মার্থ এ যে, যখন একজন লোক ঈমান গ্রহণ করেছে, মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তাকে মুসলমান হওয়ার পূর্বেকার বিষয়াদির দ্বারা তিরস্কার করা অথবা তখনকার নিকৃষ্ট উপাধিতে আখ্যায়িত করা অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাকার নামে আখ্যায়িত করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

অথবা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যদি কোনো গুনাহ হতে তওবা করে থাকে তাহলে তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এর পুনরুল্লেখ করা অনুচিত হবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এর মর্মার্থ এই যে, ঈমান গ্রহণের পর তোমরা পূর্ববর্তী এ সকল অপকর্মের কারণে তাদেরকে ফাসিক- ফাজির বলে ডেকো না। এরূপ করা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম কাজ।

'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে সাইয়েদ কুতুব (র.) বলেছেন যে, ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকে বিদ্রূপ করা এবং গালাগালি করা, মন্দ উপাধিতে সম্বোধন করা নিঃসন্দেহে ফাসিকী কাজ। এটা এমন একটি অপকর্ম যা ঈমান হতে দূরে সরিয়ে দেয়। বারংবার এরূপ আচরণ করা জুলুম। আর জুলুম শিরকের নামান্তর। সুতরাং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-, যারা উক্ত আচরণ হতে তওবা করবে না তারা জালিম।

قَوْلُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا ...... اِثْمٌ : ইরশাদ হচ্ছে- হে ঈমানদারগণ! অধিক অধিক ধারণা করা হতে বিরত থাক। নিঃসন্দেহে কতিপয় ধারণা গুনাহের দিকে ধাবিত করে।

পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টিতে কু-ধারণার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা একদল অন্য দলের [এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির] ব্যাপারে এমন ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত হয় যে,] ভালো ধারণার কোনো রাস্তাই আর খোলা থাকে না। বিরোধীদের যে কোনো কথাকেই বিপরীত অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরোধীদের কথা ভালো ব্যাখ্যার যদি হাজারো অবকাশ থাকে- অপরদিকে মন্দ ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে একটি, তাহলেও মন্দ দিকটাই তার নজরে বিরাট হয়ে দেখা দিবে। আর এ মন্দ দিকটাকেই সে সন্দেহাতীত ও নিশ্চিত বলে ধরে নিবে। এর অজুহাতেই তার উপর দোষারোপ করত তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করবে।

ধারণার শ্রেণিবিভাগ এবং সেগুলোর হুকুম : ধারণার বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং সেগুলোর হুকুমও বিভিন্ন। নিম্নে তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো-

১. **ওয়াজিব** : এ প্রকারের ظَنّ বা ধারণা ওয়াজিব। যেমন ফিকহী ধারণা। যেসব বিষয়াদিতে কোনো نَصّ নেই, সেগুলোর ধারণা [তথা ইজতিহাদ-গবেষণা] করা। অথবা, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

২. **জায়েজ** : এরূপ ধারণা পোষণ করা জায়েজ। যেমন- জীবনাচরণের ব্যাপারে ধারণা করা। উদাহরণত কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে ফিসক তথা অপকর্ম করে, যেমন- মদ পান করে বা বেশ্যালয়ে গমন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা জায়েজ। কিন্তু কোনো প্রমাণ ব্যতীত নিশ্চিত হওয়া ঠিক হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃত কু-ধারণা করাও গুনাহ নয়- যতক্ষণ পর্যন্ত না তদনুযায়ী আমল করবে। অবশ্যই যথাসম্ভব একে প্রতিহত করতে হবে।

৩. **হারাম** : যেমন- খোদায়ী এবং নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহাতীত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধারণা করে বসা অথবা আকায়েদ ও ফিকহী মাসআলায় কিতয়ী [অকাট্য] বিষয়ের বিপরীত মত পোষণ করা। অথবা, কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ফিসকের আলমত বর্তমান না থাকে; বরং নেককার [সৎ] হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায় তথাপি তার ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম।

উপরিউক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে যেহেতু সবগুলো হারাম নয়, বরং শুধু তৃতীয়টি হারাম সেহেতু كُلًّا না বলে كَثِيْرًا বলা হয়েছে আর উক্ত كَثِيْر [আধিক্য] -এর দ্বারা মূল আধিক্যকে বুঝানো হয়েছে। আপেক্ষিক আধিক্য উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এর একক অন্যান্যের তুলনায় অধিক হওয়া জরুরি নয়। অবশ্য সর্বসাধারণ এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থার দিকে যদি তাকানো হয়, তাহলে প্রথমোক্ত দু' প্রকারের তুলনায় এর আধিক্য প্রমাণিত হবে। কেননা অধিকাংশ লোক এ হারাম ধারণায়ই লিপ্ত রয়েছে। بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ -এর মর্মার্থ এটিই।

অবশ্য কু-ধারণার ব্যাপারে যে একটি প্রবাদ রয়েছে- "اَلْحَزْمُ سُوْءُ الظَّنِّ" -এর মর্মার্থ হচ্ছে- সন্দিগ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে নিজে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ যার ব্যাপারে কু-ধারণা [সন্দেহ] রয়েছে তার সাথে তদনুযায়ী আমল না করা। অর্থাৎ তাকে হেয় প্রতিপন্ন বা লাঞ্ছিত করবে না অথবা তার কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করবে না। অবশ্য খোদ ধারণাকারী নিজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তার আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَجَسَّسُوْا : ইরশাদ হচ্ছে– " তোমরা অন্যদের ছিদ্রান্বেষণ করো না।"

جَسّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো "جَسٌّ بِالْيَدِ" অর্থাৎ হাত দ্বারা স্পর্শ করত কোনো বস্তুকে উপলব্ধি করা। পরিভাষায় গোপনে ছদ্মবেশে কারো কথাবার্তা শ্রবণ করাকে تَجَسُّسْ বলে। এটা হারাম। তবে কারো দ্বারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা নিজের কিংবা কোনো মুসলমানের হেফাজতের জন্য تَجَسُّسْ হারাম নয়।

আয়াতের মর্মার্থ হলো, লোকদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য খুঁজে বেড়িয়ো না। একজন অপরজনের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়িয়ো না। অন্যদের অবস্থাবলি ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে দোষ ধরার লক্ষ্যে ওঁৎ পেতে থেকো না। এরূপ কাজ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক, বা কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে করা হোক, অথবা নিছক নিজের কৌতুকপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে করা হোক– সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অন্যদের অস্পষ্ট ও গোপন কাজ-কর্ম খুঁজে খুঁজে বেড়ানো এবং আবরণের ঐ ধারে কি আছে তা দেখার জন্য চেষ্টা করা, কারো দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা কতটুকু রয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য চেষ্টা করা একজন ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। অন্যের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা কান দিয়ে শুনা, প্রতিবেশির ঘরে কান পাতা ও চোখ পাতা, কারো দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারাদি আড়ি পেতে শোনা ও জানার চেষ্টা করা আদপেই চরিত্রহীনতার কাজ। এগুলোর কারণে সমাজে সমূহ বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, অশান্তি নেমে আসে।

ছিদ্রান্বেষণ হতে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ : আল্লাহর বাণী– وَلَا تَجَسَّسُوْا [তোমরা একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না] -এর মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে উক্ত আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। নিম্নে কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করা হলো–

١. عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ اِنْ كِدْتَ اَنْ تُفْسِدَهُمْ" فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ (رضـ) : كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - (اَبُوْ دَاوُدَ)

٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْاَمِيْرَ اِذَا ابْتَغٰى الرِّيْبَةَ فِى النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ - (اَبُوْ دَاوُدَ)

٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : اُتِىَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فَقِيْلَ هٰذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ لٰكِنْ اِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهٖ.

٤. وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِهٖ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِىْ بَيْتِهٖ (اَبُوْ دَاوُدَ)

قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .... فَكَرِهْتُمُوْهُ : ইরশাদ হচ্ছে– [হে ঈমানদারগণ!] তোমরা একে অপরের গিবত [পরনিন্দা] করো না। তোমরা দীনি ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন কিছু উল্লেখ কর না যা সে অপছন্দ করে। যদিও এটা তার মধ্যে থাকুক না কেন। আপন মুসলমান ভাইয়ের গিবত করা এমন খারাপ কাজ– যেন কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ঠোকরিয়ে ভক্ষণ করল। কোনো মানুষ কি এটা পছন্দ করবে? সুতরাং বুঝে নাও যে, গিবত এটা হতেও নিন্দনীয় ও খারাপ কাজ। কারো গোশ্ত ঠোকরিয়ে ভক্ষণ করলে হয়তো সে শারীরিক কষ্ট অনুভব করবে। কিন্তু কারো ইজ্জত, আব্রু হানি করলে সে সীমাহীন মনোযাতনা ভোগ করবে।

মূলত একটি উপমার মাধ্যমে এখানে গিবতের কদর্যতা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে পর পর কয়েকটি মুবালাগাহ (مُبَالَغَه) রয়েছে। প্রথমত اِسْتِفْهَامْ [প্রশ্নবোধক] -কে ইতিবাচক অর্থে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়কে প্রিয় রূপে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত اَحَدُكُمْ -এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যরা এটা পছন্দ করে না। চতুর্থত সাধারণ মানুষের পরিবর্তে ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চমত ভাইয়ের গোশ্তও মৃত অবস্থায় ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) এর তাফসীরে বলেছেন– تَكْرَهُ اِنْ وَجَدْتَ جِيْفَةً اَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا كَذَالِكَ فَاكْرَهْ لَحْمَ اَخِيْكَ وَهُوَ حَيٌّ অর্থাৎ তোমার ভাইকে মৃত অবস্থায় পেলে তার গোশ্ত ভক্ষণ করতে তুমি তো অপছন্দ কর; সুতরাং জীবদ্দশায়ও তার গোশ্ত খেতে [তথা গিবত করতে] অপছন্দ কর।

মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যখন বলা হলো– اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا؟ [তোমাদের কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করতে কি পছন্দ করবে?] তখন যেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পক্ষ হতে জবাব দেওয়া হলো– لَا [না]; অতঃপর বলে দেওয়া হলো, তোমরা তাকে যদ্রূপ অপছন্দ কর তদ্রূপ তার মন্দ কার্যের আলোচনা হতে বিরত থাক।

কাজী বায়যাভী (র.) বলেছেন– إِنْ صَحَّ ذَالِكَ وَعُرِضَ هٰذَا عَلَيْكُمْ فَقَدْ كَرِهْتُمُوْهُ তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া অছন্দনীয় হওয়া যদি সহীহ হয়, তাহলে তোমাদের নিকট গিবত পেশ করা হলে তোমরা একে অবশ্যই অপছন্দ করবে এবং পরিহার করবে। উক্ত فَا -কে فَصِيْحَه বলে, এটা উহ্য শর্তের জবাবের মধ্যে হয়ে থাকে। উক্ত উপমায় ইজ্জত-আব্রুকে গোশতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একে اِسْتِعَارَه تَمْثِيْلِيَّه বলে।

জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তবে তা কি গিবত হবে? হুযূর ﷺ ইরশাদ করলেন– إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

অর্থাৎ "তুমি যা বলবে তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে এটা গিবত হবে। আর যদি তোমার কথিত বিষয়টি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে"। [অর্থাৎ এটা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।]

মোটকথা, কারো দোষ– যা তার মধ্যে রয়েছে তা [পিছনে তার অবর্তমানে] বর্ণনা করাকে গিবত বলে। পক্ষান্তরে যেই দোষ তার মধ্যে নেই তা রটানোকে বলে بُهْتَانٌ বা মিথ্যা অপবাদ।

গিবত সম্পর্কীয় বিবিধ মাসআলা :

১. যে গিবতের কারণে অধিক কষ্ট হয় তা কবীরা গুনাহ।
২. যে গিবতের দরুন কষ্ট কম হয়, যেমন– জায়গা বা সওয়ারির গিবত বর্ণনা করা– এটা সগীরা গুনাহ।
৩. গিবত প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গিবত শ্রবণ করা গিবত করার শামিল।
৪. গিবতের কারণে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক বিনষ্ট হয় বিধায় তওবা করতে হবে এবং যার হক নষ্ট করেছে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।
৫. শিশু, পাগল ও জিম্মির গিবত করাও নিষেধ এবং হারাম।
৬. কাফের হারবীর গিবত করা মাকরূহ।
৭. মুখের দ্বারা যদ্রূপ গিবত হয়ে থাকে তদ্রূপ কাজের দ্বারাও গিবত হতে পারে। যেমন– কোনো খঞ্জের ন্যায় চলে তাকে উত্যক্ত করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা।
৮. গিবতকারী যদি ক্ষমা চায় তাহলে যার গিবত করেছে তার জন্য মোস্তাহাব হলো ক্ষমা করে দেওয়া।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গিবত জায়েজ :

১. জালিমের বিরুদ্ধে এমন কারো নিকট অভিযোগ করা, যে তার জুলুমকে রুখতে সক্ষম।
২. বিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট রোগীর অবস্থা বর্ণনা করা।
৩. ফতোয়ার প্রয়োজনে মুফতির নিকট প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেওয়া।
৪. মুহাদ্দিসগণ হাদীসের হেফাজতের জন্য বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা।
৫. মুসলমানকে পার্থিব বা দীনি কোনো ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য কারো অবস্থা তার নিকট উল্লেখ করা।
৬. পরামর্শ গ্রহণের জন্য কারো অবস্থা প্রকাশ করা।
৭. যে নিজের দোষ নিজেই বলে বেড়ায় তার গিবত করা।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, গিবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতখানা "عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ" -এর অন্তর্ভুক্ত।

গিবত সম্পর্কে চারটি হাদীস :

١. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ هِيَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ . قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ . وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

٢. عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ (رضـ) يَعْنِي ابْنَ قُرَّةَ لَوْ مَرَّ بِكَ رَجُلٌ اَقْطَعُ فَقُلْتَ هٰذَا اَقْطَعُ كَانَ غِيْبَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ فَقَالَ . صَدَقَ .

٣. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ .

٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَاَوْا فِيْ قِيَامِهِ عَجْزًا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا اَعْجَزَ فُلَانًا ؟ فَقَالَ اَكَلْتُمْ لَحْمَ اَخِيْكُمْ وَاغْتَبْتُمُوْهُ .

অনুবাদ :

١٣. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا جَمْعُ شَعْبٍ بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَهُوَ اَعْلٰى طَبَقَاتِ النَّسَبِ وَّقَبَاۤئِلَ هِيَ دُوْنَ الشُّعُوْبِ وَبَعْدَهَا الْعَمَائِرُ ثُمَّ الْبُطُوْنُ ثُمَّ الْاَفْخَاذُ ثُمَّ الْفَصَائِلُ اٰخِرُهَا مِثَالُهُ خُزَيْمَةُ شَعْبٌ كِنَانَةُ قَبِيْلَةٌ قُرَيْشٌ عِمَارَةٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ قُصَيٌّ بَطْنٌ هَاشِمٌ فَخْذٌ الْعَبَّاسُ فَصِيْلَةٌ لِتَعَارَفُوْا ط حُذِفَ مِنْهُ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَيْ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لَا لِتَفَاخَرُوْا بِعُلُوِّ النَّسَبِ وَاِنَّمَا الْفَخْرُ بِالتَّقْوٰى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِكُمْ خَبِيْرٌ ـ بِبَوَاطِنِكُمْ ـ

১৩. হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে [অর্থাৎ] আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে। অতঃপর তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন জাতিতে [শাখায়] شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ -এর বহুবচন। شَعْبٌ -এর শীন অক্ষরটি যবরযোগে হবে। আর شَعْبٌ বলা হয় বংশের সর্বোচ্চ তাবকাহ [স্তর বা সিঁড়ি]-কে এবং বিভিন্ন গোত্রকে কাবীলা বলা হয় شَعْبٌ -এর নীচের স্তরকে। এর পরবর্তী স্তর হলো اَلْعَمَائِرُ তারপর بَطْنٌ ; এরপর فَخْذٌ অতঃপর সর্বশেষ স্তর হলো اَلْفَصَائِلُ যেমন- خُزَيْمَةُ হলো شَعْبٌ আর كِنَانَةُ হলো قَبِيْلَةٌ কুরাইশ হলো عِمَارَةٌ [এটার ع অক্ষরটি যের বিশিষ্ট।] কুসাই হলো بَطْنٌ হাশিম হলো فَخْذٌ এবং আব্বাস فَصِيْلَه যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। تَعَارَفُوْا হতে একটি تَا -কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার [একদল অপর দলের পরিচয় লাভ করতে পার]। উচ্চ বংশের দ্বারা অহঙ্কার করার জন্য এরূপ করা হয়নি। আর গৌরব একমাত্র তাকওয়ার দ্বারাই করা যেতে পারে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন তোমাদের গোপন তথ্য সম্পর্কে।

١٤. قَالَتِ الْاَعْرَابُ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ اٰمَنَّا ط صَدَّقْنَا بِقُلُوْبِنَا قُلْ لَهُمْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا اَيْ اِنْقَدْنَا ظَاهِرًا وَلَمَّا اَيْ لَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط اِلَى الْاٰنِ لٰكِنَّهُ يُتَوَقَّعُ مِنْكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ بِالْاِيْمَانِ وَغَيْرِهِ لَا يَالِتْكُمْ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ وَبِاِبْدَالِهِ اَلِفًا لَا يَنْقُصْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ اَنْ مِنْ ثَوَابِهَا شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيْمٌ بِهِمْ ـ

১৪. বেদুইনরা বলে- বনূ আসাদের কতিপয় লোক- আমরা ঈমান এনেছি আমরা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি [অন্তরের সাথে সত্যায়িত করেছি] আপনি বলুন তাদেরকে তোমরা ঈমান গ্রহণ করনি; বরং তোমরা বল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছি। অথচ প্রবেশ করেনি ঈমান তাদের অন্তরে [এখানে لَمَّا শব্দটি لَمْ -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।] তখন পর্যন্ত। কিন্তু তোমাদের পক্ষ হতে এর আশা করা যায়। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য কর- ঈমান ও অন্যান্য ব্যাপারে- তাহলে হ্রাস করা হবে না [لَا يَلِتْكُمْ শব্দটি] হামযাসহ, হামযা ব্যতীত বা হামযাকে আলীফের দ্বারা পরিবর্তন করত [বিভিন্নভাবে] পড়া যায়। অর্থাৎ লাঘব করা হবে না। তোমাদের আমলসমূহ অর্থাৎ তার ছওয়াব কিছুমাত্র। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ঈমানদারগণের জন্য, অতিশয় দয়ালু তাদের প্রতি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتَعَارَفُوْا : আল্লাহর বাণী- لِتَعَارَفُوْا -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ একটি ت হযফ করে لِتَعَارَفُوْا পড়েছেন।

২. কুজ্জিজ (র.) একটি ت কে অপরটির মধ্যে ইদগাম করে لِتَّعَارَفُوْا পড়েছেন।

৩. আ'মাশ (র.) দু'টি ت -কে বলবৎ রেখে لِتَتَعَارَفُوْا পড়েছেন।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পড়েছেন- لِتَعْرِفُوْا ।

قَوْلُهُ إِنَّ اَكْرَمَكُمْ : আল্লাহর বাণী- إِنَّ اَكْرَمَكُمْ -এর মধ্যস্থিত إِنَّ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ হামযার নিচে যেরযোগে إِنَّ পড়েছেন।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) হামযার উপর যবরযোগে أَنَّ পড়েছেন।

قَوْلُهُ يَلِتْكُمْ : আল্লাহর বাণী- يَلِتْكُمْ -এর মধ্যে দু' প্রকারের কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ হামযাহ ব্যতীত يَلِتْكُمْ পড়েছেন।

২. আবূ আমর ও আবূ হাতিম প্রমুখ ক্বারীগণ হামযা সহ يَأْلِتْكُمْ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ .... مِّنْ ذَكَرٍ الخ : **শানে নুযূল** : আল্লাহর বাণী- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ الخ -এর শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১. আবূ দাউদ (র.) ইমাম যুহরী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াতখানা আবুল হিন্দ-এর শানে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ বনূ বায়াজাহকে বলেছেন যে, তোমরা আবুল হিন্দের সাথে তোমাদের একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়ে দাও। তারা বলল, আমরা আমাদের কন্যাকে কিভাবে একজন দাসের সাথে বিবাহ দিতে পারি? তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে বায়তুল্লাহর ছাদে উঠে আজান দিতে বললেন। ইত্তাব ইব্‌নে আসীদ বলল, আল্লাহর শুকরিয়া যে, আজকের এ দৃশ্য দেখার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ মৃত্যুদান করেছেন। হারিছ ইবনে হিশাম মন্তব্য করল যে, মুহাম্মদ ﷺ বুঝি আজান দেওয়ার জন্য এ কালো কাকটি ব্যতীত অন্য কাউকে পেলেন না। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا الخ : **শানে নুযূল** : ইব্‌নে জারীর (র.) মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বনূ আসাদের কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর নিকট সদ্‌কার মাল প্রার্থনা করল এবং তারা বুঝাতে চাইল যে, তারা ঈমান এনে রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইহ্‌সান করেছে। তখন তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ .... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ : ইরশাদ হচ্ছে- হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন নর তথা আদম (আ.) ও একজন নারী তথা হাওয়া (আ.) হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার্থে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক খোদাভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান। তোমাদের ভিতর বাহির সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ভালভাবে জানা আছে।

অহঙ্কারের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গিবত পরস্পর দোষারোপ ও তিরস্কারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর দরুনই মানুষ নিজেকে সম্মানী এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বড়-ছোট, মর্যাদাবান ও হীন হওয়া বংশলতা ও অভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে ব্যক্তি যত বেশি ভদ্র ও খোদাভীরু হবে সে আল্লাহ পাকের নিকট তত বেশি সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

বংশের হাকীকত এই যে, সমস্ত মানুষ একজন নর ও একজন নারী তথা আদম ও হাওয়া (আ.) হতে সৃষ্টি হয়েছে। শেখ, সাইয়েদ, মোগল, পাঠান, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আনসারী ইত্যাদি সকলের বংশধারাই এক মাতা-পিতা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এ সকল বংশলতা ও ভ্রাতৃত্ব আল্লাহ তা'আলা শুধু পরিচিতির জন্য নির্ধারণ করেছেন।

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কাউকে যদি কোনো উচ্চ বংশে পয়দা করে থাকেন, তাহলে এটা তার জন্য একটি খোদাপ্রদত্ত সৌভাগ্য ও নিয়ামত। যেমন জন্মগতভাবে কারো আওয়াজ শ্রুতিমধুর এবং চেহারা সুদর্শন হয়ে থাকে, যা অবশ্যই তার একটি ভালো দিক। কিন্তু এটা তার জন্য অহঙ্কারের বিষয় হতে পারে না। একে মর্যাদা ও গৌরবের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এর কারণে অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। হ্যাঁ, এটার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনা চেষ্টা ও পরিশ্রমে বংশীয় মর্যাদা দান করেছেন। আর অহঙ্কার পরিহার করাও শুকরিয়ারই দাবি। আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতকে বদ অভ্যাস ও দুষ্কর্মের দ্বারা কলুষিত করা যাবে না।

মোটকথা, মর্যাদা, সম্মান ও ফজিলতের প্রকৃত মানদণ্ড বংশ নয়, এর মাপকাঠি হলো তাক্ওয়া [খোদাভীতি] ও সৎকর্ম। প্রথমটি বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত খোদাপ্রদত্ত এবং শেষোক্তটি পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনযোগ্য।

আর তাকওয়ার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। আল্লাহই ভালো জানেন যে, যে ব্যক্তি বাহ্যত মুত্তাকী বলে মনে হয় বাস্তবিক পক্ষে সে কেমন? আর ভবিষ্যতেই বা তার কি পরিণতি হবে?

বংশগত পার্থক্য পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য হয়ে থাকে। আর উক্ত পরিচয়ের পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। যেমন–

* একই নামের দু' ব্যক্তি হলে বংশের মাধ্যমে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।
* দূরবর্তী ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত আত্মীয়তার নিরিখে তাদের শরয়ী অধিকার দেওয়া যায়।
* এর দ্বারা আসাবাদের নিকট হওয়া حَاجِبْ ও مَحْجُوْب দূর হওয়া অবগত হয়েও নির্ধারণ করা যায়।
* স্বীয় বংশের পরিচয় পাওয়ার পর অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করবে না।

মোটকথা, ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা, স্বভাব ও চরিত্রের ব্যবধান, শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞানের পার্থক্য পরস্পর সংঘর্ষ ও সংঘাতের জন্য নয়; বরং এটা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা ও উন্নতির সোপানে পৌঁছার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট রং, জাতীয়তা, ভাষা, মাতৃভূমি এবং এ জাতীয় সকল ঐতিহ্যের কোনো মূল্য নেই। সেখানে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মূল্য রয়েছে– মাত্র একটি কারণেই তাকে সম্মান দেওয়া হবে। তা হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। যে যত বেশি খোদাভীরু হবে, আল্লাহর দরবারে সে তত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

অত্র আয়াত হতে তিনটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয় : আলোচ্য আয়াত– يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ الخ হতে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. সকল মানুষের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন নারী তথা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যত মানুষ রয়েছে তাদের আদি পিতা ও আদি মাতা এক। মূলত মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ। কাজেই আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানই সকলকে অনুসরণ করা উচিত।

২. মূল উৎসের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনের তাগিদেই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। ভাষা, বর্ণ ও আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে এ জন্য পার্থক্য করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পরস্পরে পরিচিত হতে পারে। এ জন্য তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি যে, এটাকে কেন্দ্র করে তারা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং রক্তপাত করবে– শ্রেণি সংগ্রামে মেতে উঠবে। পারস্পরিক পার্থক্য তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাধা হওয়ার জন্য তা করা হয়নি; বরং উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক হিসেবেই তা করা হয়েছে।

৩. তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্রই হবে উত্তম ও অধমের মাপকাঠি ও মানদণ্ড। ভাষা, বর্ণ, বংশগত কৌলিন্য, দেশ, আকৃতি ইত্যাদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারে না। কেবল বিশেষ কোনো বংশের, বর্ণের ও দেশের বলেই কেউই বিশেষ মর্যাদার দাবি করতে পারে না। এগুলো নিছক খোদাপ্রদত্ত; এতে মানুষের কোনো দখল বা কৃতিত্ব নেই। একমাত্র তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা যেতে পারে। যে যত বেশি খোদাভীরু হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা তত বেশি হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এটাই।

অত্র আয়াতদ্বয়ে বাহ্যত বৈপরীত্ব মনে হয়- কিভাবে এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে? : প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন- [হে ঈমানদারগণ!] যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট ইসলামকে প্রকাশ করে তাকে বল না যে, তুমি ঈমানদার নও।

এর কারণ হচ্ছে- ঈমান হলো অন্তরের ব্যাপার। কারো অন্তরের কথা মানুষের জানা থাকার কথা নয়। সুতরাং বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করার পর তাকে ঈমানদারই ধরে নিতে হবে-মুনাফিক বলা যাবে না। বাকি তার অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। সে অনুযায়ী ফয়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মানুষের নেই। এ জন্যই বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা তোমাদের নিকট ইসলাম প্রকাশ করে- বাহ্যিক আনুগত্য জাহির করে, তাদের ঈমানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করো না।

আর অত্র আয়াতে বলা হয়েছে- [হে হাবীব!] কতিপয় বেদুঈন লোক দাবি করে থাকে যে, তারা ঈমান এনেছে। আপনি তাদেরকে বলুন যে, তোমরা তো ঈমান গ্রহণ করনি; বরং তোমরা এতটুকু দাবি করতে পার যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ অর্থাৎ বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছ।

এর কারণ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের খবর জানেন। সুতরাং তাদের অন্তরে যে, ঈমান নেই, তারা যে শুধু বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছে- আল্লাহ তা'আলার তা জানা থাকার কারণে তিনি নবী করীম ﷺ -কে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ জন্যই নবী করীম ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে অনুরূপ মন্তব্য করা জায়েজ হয়েছে।

মোটকথা, প্রথমোক্ত আয়াতে যেহেতু মানুষের তা জানা নেই সেহেতু তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জানা রয়েছে সেহেতু তিনি নবী করীম ﷺ -কে তা জানিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধিতা নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন। কিন্তু অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এদু'টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এর সমাধান কি? : إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ -এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। আমরা এর বিশদ আলোচনায় না গিয়ে সারকথা পেশ করবার চেষ্টা করব।

إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ -এর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে মূলনীতি হলো "إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا" অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে যখন উভয় শব্দ একত্র হবে তখন এরা পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হবে। এমতাবস্থায় إِيْمَانٌ আভ্যন্তরীণ আনুগত্য এবং إِسْلَامٌ বাহ্যিক আনুগত্যের অর্থে হবে। অপরদিকে যদি কোনো ক্ষেত্রে শুধু ঈমান বা শুধু ইসলাম শব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহলে উভয়টি একই অর্থে হবে। এমতাবস্থায় যে কোনো একটি দ্বারাই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারের আনুগত্যের সমষ্টিকে বুঝাবে।

অত্র আয়াতে যেহেতু إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু এরা পৃথক পৃথক অর্থে হয়েছে। সুতরাং إِيْمَانٌ দ্বারা আভ্যন্তরীণ আনুগত্য ও إِسْلَامٌ দ্বারা বাহ্যিক আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ : شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شَعْبٌ এবং ক্ষুদ্রতম অংশ عَشِيْرَةٌ বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন, অনারত জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شَعْبٌ বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে তাদেরকে قَبَائِلَ বলা হয়। أَسْبَاطٌ শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য হচ্ছে পারস্পরিক পরিচয় : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও শনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণত এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার কর; গর্বের জন্য নয়।

١٥. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَىِ الصَّادِقُوْنَ فِىْ اِيْمَانِهِمْ كَمَا صُرِّحَ بِهٖ بَعْدُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا لَمْ يَشُكُّوْا فِى الْاِيْمَانِ وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِجِهَادِهِمْ يَظْهَرُ صِدْقُ اِيْمَانِهِمْ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ . فِىْ اِيْمَانِهِمْ لَا مَنْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَلَمْ يُوْجَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ الْاِسْلَامِ .

١٦. قُلْ لَهُمْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ط مُضَعَّفُ عَلِمَ بِمَعْنٰى شَعَرَ اَىْ اَتُشْعِرُوْنَهٗ بِمَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ فِىْ قَوْلِكُمْ اٰمَنَّا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

١٧. يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ط مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَسْلَمَ بَعْدَ قِتَالٍ مِنْهُمْ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ج مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْبَاءِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَ اَنْ فِى الْمَوْضِعَيْنِ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فِىْ قَوْلِكُمْ اٰمَنَّا .

١٨. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ .

অনুবাদ :

১৫. তারাই শুধু ঈমানদার– স্বীয় ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী। যেমন– পরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর সংশয় পোষণ করেনি ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েনি এবং আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে জিহাদের মাধ্যমেই তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ পায়। তারাই হলো সত্যবাদী তাদের ঈমানের ব্যাপারে। তারা নয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের হতে ইসলাম তথা বাহ্যিক আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

১৬. আপনি বলুন, তাদেরকে তোমরা কি তোমাদের দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে অবগত করাচ্ছ? تُعَلِّمُوْنَ শব্দটি عَلِمَ -এর مُضَعَّفْ অর্থাৎ شَعَر অর্থাৎ তোমরা اٰمَنَّا [আমরা ঈমান এনেছি] বলে তোমাদের [বর্তমান] অবস্থা সম্পর্কে কি আল্লাহ তা'আলাকে অবহিত করাতে চাচ্ছ? অথচ আকাশমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু সবই আল্লাহ তা'আলা অবগত রয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারেই সম্পূর্ণ জ্ঞাত রয়েছেন।

১৭. এই লোকেরা আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। যুদ্ধ ব্যতীত পক্ষান্তরে তাদের মধ্য হতে অন্যান্যরা যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ আমার উপর রেখ না। اِسْلَامَكُمْ শব্দটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ যেরদাতা আমিল بَا -কে হযফ করত তদস্থলে যবর দেওয়া হয়েছে। উভয় স্থলে اَنْ -এর পূর্বে بَا -কে উহ্য গণ্য করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তোমাদের বক্তব্য اٰمَنَّا [আমরা ঈমান এনেছি] -এর ব্যাপারে।

১৮. আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়াদি জানেন অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে যা অদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেন। يَعْمَلُوْنَ শব্দটি تَا ও يَا উভয়ের সাথে হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন নয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا : ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا আয়াতাংশে ثُمَّ শব্দের উল্লেখ হওয়ার তাৎপর্য হলো, ঈমানদার লোকেরা যখন ঈমান এনেছে তখন তো তাদের অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিলই না, ভবিষ্যতেও তাদের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তাদের ঈমান গ্রহণের সময় এবং ভবিষ্যতেও কোনোরূপ সন্দেহ না থাকার প্রতি ثُمَّ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াতাংশে ثُمَّ -এর দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী- "ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا" -এর মধ্যস্থিত ثُمَّ -এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা ঈমান গ্রহণের সময় তাদের মধ্যে তো কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় থাকেইনি এমন কি পরেও কোনোরূপ সন্দেহ দেখা দেয় না। তাদের ঈমান সর্বদাই সংশয় ও সন্দেহমুক্ত থাকে।

قَوْلُهُ اَتُعَلِّمُوْنَ : আল্লাহর বাণী- اَتُعَلِّمُوْنَ -এর মধ্যে تَعْلِيْمٌ [শব্দটি] اِعْلَامٌ -এর অর্থে হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং অবহিত করা। এ জন্য بَا -এর সাহায্যে مَفْعُوْل ثَانِىْ -এর দিকে مُتَعَدِّىْ করা হয়েছে। একে যদি شَعُرَ -এর অর্থে ধরা হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْل হবে। আর যদি اَشْعَرَ -এর অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِيك مَفْعُوْل হবে।

تُعَلِّمُوْنَ -এর বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- تُعَلِّمُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর কারীগণ (র.) تا -এর সাথে تُعَلِّمُوْنَ পড়েছেন।

২. ইবনে কাছীর (র.) ى -এর সাথে يُعَلِّمُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ اِسْلَامَكُمْ : আল্লাহর বাণী- "لَا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ" -এর মধ্যস্থিত اِسْلَامَكُمْ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। অর্থাৎ মূলে ছিল بِاِسْلَامِكُمْ - بَاء হরফে জারকে হযফ করত যেরের স্থলে যবর দেওয়া হয়েছে। একে নাহুবিদগণের পরিভাষায় "مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ" বলে।

قَوْلُهُ اَنْ هَدَاكُمْ : আল্লাহর বাণী- اَنْ هَدَاكُمْ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ اَنْ هَدَاكُمْ -এর হামযার উপর যবরযোগে পড়েছেন।

২. ক্বারী আসিম (র.) (اَنْ -এর) হামযার নিচে যেরযোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا الخ : **শানে নুযূল :** يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا الخ -এর শানে নুযূলের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, বনূ আসাদের কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোনো রূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম কবুল করেছি। আমরা আপনার পক্ষ হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আপনার বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র হাতে তুলে নেইনি।
   নবী করীম ﷺ মন্তব্য করলেন, তাদের বোধশক্তি কম। শয়তান তাদের মুখ দিয়ে কথা বলছে। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। -[ইব্‌নে কাছীর]

২. মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল-কুরাজী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- নবম হিজরিতে বনূ আসাদের দশ জন লোক নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তখন সাহাবীগণসহ মসজিদে নববীতে ছিলেন। তারা আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট সদিচ্ছায় এসেছি। আমাদের নিকট কোনো দাওয়াতী দল পাঠানো হয়নি। তাছাড়া আমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতেও আমরা নিরাপদ। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতখানা নাজিল করেন।

قَوْلُهُ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ... ... اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : কারো ইসলাম গ্রহণ যে নবী করীম ﷺ -এর উপর তাঁর অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার উপর আল্লাহ তা'আলারই একটি বিরাট অনুগ্রহ, তার আলোচনা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- হে হাবীব! তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চাচ্ছে। কেননা, অন্যান্যদের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ইসলাম কবুল করেনি। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিও না- এ জন্য যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ, বরং তোমরা যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে বুঝতে হবে যে, ঈমানের প্রতি হিদায়েত দান করত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

ইসলাম কবুল করা ইসলামের প্রতি অনুগ্রহ নয় : কতেক বেদুঈন ও গ্রাম্যলোক এসে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল, দেখুন, আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেছি। এর জবাব পরে দেওয়া হয়েছে। এতে এ সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তারা তো اٰمَنَّا বলেছে; اَسْلَمْنَا বলেনি।

এর উত্তর এই যে, তারা যদি اَسْلَمْنَا বলত, তাহলে সন্দেহের অবকাশ ছিল। যাহোক, তাদের ঈমানকে ইসলাম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তারা ছিল এর দাবিদার। এ জন্য اَسْلَمُوْا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তারা স্বীয় বাহ্যিক আনুগত্যকে যাকে বস্তুত ইসলাম বলাই সমুচিত ছিল– ঈমান বলেছে এবং আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে। هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ -এর দ্বারা এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, তাদের ঈমানকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এখানে একে ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেন তাদের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -এর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমাদের ঈমানের দাবিকে মেনেও নিয়ে হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ মাত্র। –[বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারের সারকথা : সূরার সূচনা হয়েছিল নবী করীম ﷺ -এর আদবের আলোচনা প্রসঙ্গে। আর সম্পূর্ণ সূরাটিই যেন সেই আদবের তাফসীল বা ব্যাখ্যা। পৃথক পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ছয়টি আদব নবী করীম ﷺ -এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে–

১. لَا تُقَدِّمُوْا ২. لَا تَرْفَعُوْا ৩. لَا تَجْهَرُوْا ৪. لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا ৫. اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ الخ ও ৬. وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ الخ

অন্যদিকে আটটি হুকুম [আদব] মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। আর একটি আদব এমন রয়েছে যা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সূরায় মোট পনেরটি আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা ঈমান ও একীন যখন অন্তরে দৃঢ়তা ও মজবুতী লাভ করে এবং শিকল গেঁড়ে বসে, তখন গিবত, অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি আপনি আপনিই দূরীভূত হয়ে যায়। কোনো লোক যদি এসব অপরাধ ও নিকৃষ্ট কাজে জড়িত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনো তার ঈমান দৃঢ়তা ও পূর্ণাঙ্গ লাভ করেনি।

হাদীস শরীফে এসেছে– يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ – "হে ঐসব লোক, যারা মুখে ঈমান এনেছে; কিন্তু অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌছেনি। তোমরা মুসলমানদের গিবত করো না এবং তাদের গোপন তথ্যাদি খুঁজে বেড়াইও না।"

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْاۤ اَسْلَمْنَا অর্থাৎ "তাদেরকে বলে দাও, তোমরা ঈমান আননি; বরং বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি"।

এ আয়াত থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য আছে। কিন্তু এ আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে– পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এ কারণে আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা!

শরিয়তের পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরিয়তে অন্তরের বিশ্বাসের ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গুরুত্ব হয় না, যতক্ষণ এর প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ-কর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালেমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরিয়তে এর গুরুত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হবে। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে এটা নিফাক হবে। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজ-কর্ম পর্যন্ত পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ছাড়া ইসলাম এবং ইসলাম ছাড়া ঈমান হতে পারে না। যেমন আগুন ও ধুয়া। একটি অপরটির জন্য জরুরি। ইসলামি বিধানে এটা অসম্ভব যে, একজন মুমিন হবে; কিন্তু মুসলমান হবে না, আর মুসলমান হবে মুমিন হবে না।

মোটকথা, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য আছে। শরিয়তের বিধানে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই; বরং একটি অপরটির জন্য জরুরি ও সম্পূরক। –[মা'আরিফুল কুরআন]

সূরা ক্বাফ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির প্রথম অক্ষর হলো- ق আর এর দ্বারাই এ সূরার নাম সূরা ক্বাফ রাখা হয়েছে। এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় করা হয়েছে। আর ق টি حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এ সূরাটি পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে তিনটি রুকূ', ৪৫টি আয়াত, ৩৯৫ টি বাক্য এবং ১৪৯০ টি অক্ষর রয়েছে। -[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা ক্বাফ মক্কা মুয়ায্যমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার ফজিলত : হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূল ﷺ -এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন, তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। -[মুসলিম, কুরতুবী]

হযরত ওমর ইবনে খাত্তার (রা.) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল ﷺ উভয় ঈদের নামাজে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন- قٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। সূরাটি বেশ বড়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাজ হালকা করতেন। -[কুরতুবী]

মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ সূরাটি ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে তেলাওয়াত করতেন।

ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সূরাটি ঈদের নামাজেও তেলাওয়াত করতেন।

আবুল আ'লা থেকে বর্ণিত ইবনে মরদবিয়া সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সূরা ক্বাফ শিক্ষা কর।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরার গুরুত্ব এবং বরকত অনেক বেশি।
-[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ১৭০]

এ সূরার আমল : বর্ণিত আছে যে গৃহে সূরা ক্বাফ পাঠ করা হয়, সে গৃহে সর্বদা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে।

এ সূরার শুরু থেকে كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে পান করলে দাঁতের এবং পেটের ব্যথা দূর হয়। আর যে শিশুর দাঁত উঠে না তাকে ঐ পানি পান করানো হলে সহজে দাঁত উঠে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করছে, সে এমন ইলম অর্জন করবে যা মানুষের জন্য উপকারী হবে এবং সে কল্যাণকর কাজে শরিক হওয়ার তাওফীক পাবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : এ সূরাটি ঠিক কখন নাজিল হয়েছিল তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায়নি। তবে সূরাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, এর নাজিল হওয়ার সময় নবুয়তের তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু করে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। এটা মাক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। সূরাটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এটা নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে নাজিল হয়েছে। তখন কাফেরদের বিরোধিতা ও শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য প্রকাশ্য নির্যাতন তখনো শুরু হয়নি।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়, হিসাব-নিকাশের কথা, জান্নাতের ছওয়াব এবং দোজখের আজাব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে এবং পরিশেষে জান্নাতের জন্য অনুপ্রাণিত করে দোজখের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনের যে সূরাসমূহকে 'মুফাসসাল' বলা হয়, তন্মধ্যে এটি সর্বপ্রথম সূরা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট শুনে শুনেই এ সূরা কণ্ঠস্থ করেছি। কেননা তিনি প্রত্যেক জুমার খুতবার সময় এ সূরাটি পাঠ করতেন। সকল বড় বড় মজলিসে তিনি এ সূরা পাঠ করতেন। যেমন ঈদের দিনেও তিনি এ সূরা পাঠ করতেন, কেননা এ সূরায় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও দোজখের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর প্রতিবেশীনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুমার খুতবাসমূহে আমি নবী করীম ﷺ -এর মুখে এ সূরাটি প্রায় শুনতে পেতাম। এভাবে শুনতে শুনতেই এটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ নামাজেও এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। এটা হতে সাব্যস্ত হয় যে, সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে জন্য তিনি বেশি বেশি পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকদের নিকট পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এই গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফে যখন তাঁর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা বেশি স্তম্ভিত হয়েছিল তা হলো মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থিত হওয়া এবং যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দেওয়া। লোকেরা বলত, এটা সম্পূর্ণ নতুন কথা। এটাকে কোনো বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেহাংশ হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় একত্র হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ভাষণটি নাজিল হয়েছে। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং এটা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপরদিকে লোকদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, স্তম্ভিত হও বা এটাকে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে কর অথবা এটাকে মিথ্যা মনে করে উড়িয়ে দাও, তাতে প্রকৃত সত্য কখনো পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হলো- তোমাদের দেহের একেকটি অণু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে যাওয়া অণু পুনরায় একত্র করে তোমাদের দেহাবয়বকে আবার দাঁড় করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাকে এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে এবং কারো নিকট তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এটা নিছক ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। শুধু তাই নয়; তোমাদের মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করছেন। যখন সময় হবে তখন একটি ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সকলে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক বিদীর্ণ করে উদ্ভিদের অংকুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যেই মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না বলে অস্বীকার করছ, তখন তোমরা নিজেদের চোখেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা তাও জানতে পারবে যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল কুকুরের ন্যায় বাধামুক্ত ছিলে না। বাস্তবিকই তোমরা দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভালো বা মন্দ, পুরস্কার-শাস্তি, আজাব ও ছওয়াব, জান্নাত ও দোজখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প কাহিনী বলে মনে করছ; কিন্তু সেদিন এসব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়ে মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে যাকে তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য বলে মনে করছ। অপরদিকে মহান আল্লাহকে ভয় করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ।

মাক্কী সূরাসমূহে সাধারণত তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সূরায় আখিরাত সম্পর্কেই সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির যোগসূত্র : পূর্বোক্ত সূরা হুজুরাতের শেষ আয়াত হলো- وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন] এর দ্বারা আমলের জাযা বা প্রতিদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আর এ সূরা ক্বাফ-এর সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রয়েছে কিয়ামত ও আমলের প্রতিদানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা।

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ : সূরা ক্বাফ, মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ (الْاٰيَةُ) فَمَدَنِيَّةٌ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ الخ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত : ৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. قٓ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ج الْكَرِيْمِ مَا اٰمَنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ

১. ق ক্বাফ এর দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। সম্মানিত কুরআন মর্যাদাপূর্ণ [কুরআন] -এর শপথ। মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনেনি।

٢. بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْذِرُهُمْ يُخَوِّفُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْبَعْثِ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا الْاِنْذَارُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ ج

২. বরং তারা বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের মধ্য হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছেন। তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন রাসূল হয়ে আগমন করেছেন যিনি তাদেরকে পুনরুত্থানের পর জাহান্নামে [যাওয়া]-এর ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং কাফেররা বলল, তা [ভয় প্রদর্শন] আশ্চর্য বিষয়।

٣. اَئِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ج نَرْجِعُ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ - فِيْ غَايَةِ الْبُعْدِ -

৩. তবে কি اَئِذَا -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে, এতদুভয় অবস্থায় উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া যায়। আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব এবং মাটিতে পরিণত হব তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? ঐ প্রত্যাবর্তন [পুনরুত্থান] সুদূর পরাহত। একেবারেই দূরবর্তী [অসম্ভব]।

٤. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ تَأْكُلُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ فِيْهِ جَمِيْعُ الْاَشْيَاءِ الْمُقَدَّرَةِ -

৪. আমি ভালোভাবেই অবগত আছি যা জমিন হ্রাস করে তাদের হতে যা গ্রাস করে- আর আমার নিকট রয়েছে একটি সংরক্ষিত কিতাব এটা হলো লাওহে মাহফূয; সংঘটিতব্য সবকিছু এতে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।

٥. بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ بِالْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْ شَاْنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ - مُضْطَرِبٍ قَالُوْا مَرَّةً سَاحِرٌ وَسِحْرٌ وَمَرَّةً شَاعِرٌ وَشِعْرٌ وَمَرَّةً كَاهِنٌ وَكَهَانَةٌ -

৫. বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সত্যকে কুরআনকে। যখন এটা তাদের কাছে আসল তখন তারা নবী করীম ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ল অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল। সুতরাং কখনো বলল, জাদুকর ও জাদু। আবার কখনো বলল, কবি ও কাব্য। আর কখনো বলল, জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ্যা।

٦. اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا بِعُيُوْنِهِمْ مُعْتَبِرِيْنَ بِعُقُوْلِهِمْ حِيْنَ اَنْكَرُوا الْبَعْثَ اِلَى السَّمَآءِ كَائِنَةً فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا بِلَا عَمَدٍ وَ زَيَّنّٰهَا بِالْكَوَاكِبِ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ شُقُوْقٍ تُعِيْبُهَا .

৬. তারা কি দেখেনি তাদের চক্ষু দিয়ে বা বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করে– যখন তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে আকাশের দিকে যা রয়েছে তাদের উর্ধ্বে। কিভাবে আমি এটাকে সৃষ্টি করেছি ছাদবিহীনভাবে এবং আমি একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি তারকারাজির দ্বারা। আর এটার মধ্যে কোনোরূপ ছিদ্র [খুঁত] নেই এমন কোনো ফাটল নেই, যা এটাকে দোষযুক্ত করতে পারে।

٧. وَالْاَرْضَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَوْضِعِ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ مَدَدْنٰهَا دَحَوْنَاهَا عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ جِبَالًا تُثَبِّتُهَا وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ . يَبْهَجُ بِهٖ لِحُسْنِهٖ .

৭. আর জমিনের দিকে এটা اِلَى السَّمَآءِ -এর মহল্লের উপর আতফ হয়েছে। কিভাবে আমি একে বিস্তৃত করেছি পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছি আর স্থাপন করেছি এটার মধ্যে পর্বতরাজি– পাহাড়সমূহ যা তাকে স্থিতিশীল রেখেছে। আর আমি গজিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের শ্রেণির সতেজ উদ্ভিদ সুন্দর ও সতেজ হওয়ার কারণে যা দেখলে মন খুশি হয়ে যায়।

٨. تَبْصِرَةً مَفْعُوْلٌ لَهٗ اَىْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ تَبْصِيْرًا مِنَّا وَّ ذِكْرٰى تَذْكِيْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ . رَجَّاعٍ عَلٰى طَاعَتِنَا .

৮. জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচনকারী এটা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ আমি তা এ জন্য করেছি যে, তা আমার পক্ষ হতে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিবে এবং শিক্ষাপ্রদ নসিহত স্বরূপ। প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য যে প্রত্যাবর্তনকারী আমার আনুগত্যের প্রতি রুজুকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قٓ : সূরার প্রথমে উল্লিখিত قٓ -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ ف -এর উপর সাকিনসহ قَافْ পড়েছেন।

২. হাসান ইবনে আবী ইসহাক ও নসর ইবনে আসিম প্রমুখ ক্বারীগণ ف -এর যেরযোগে قَافِ পড়েছেন।

৩. হারূন ও মুহাম্মদ ইবনে সুমাইকাহ প্রমুখ ক্বারীগণ ف -এর উপর পেশযোগে قَافُ পড়েছেন। কেননা তা মাবনীর হরকত।

৪. ঈসা সাকাফী (র.) ف -এর উপর যবর দিয়ে قَافَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ وَالْقُرْاٰنِ : আল্লাহর বাণী– وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ -এর মধ্যস্থিত وَاوْ টি কসম বা শপথের জন্য হয়েছে। اَلْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ হলো তার مُقْسَمٌ بِهٖ হয়েছে। কিন্তু এখানে جَوَاب قَسَم কি? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন ইবারতের উল্লেখ করেছেন। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

* مَا اٰمَنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি।

* اِنَّ الرَّجْعَ لَكَائِنٌ অর্থাৎ পুনরুত্থান অবশ্যই হবে।

* اِنَّكَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি ভয় প্রদর্শনকারী।

* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الخ অর্থাৎ যে কোনো শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন, তার জন্য আমার নিকট চির উপস্থিত একজন সংরক্ষক মওজুদ রয়েছে।

* قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের দেহের যে অংশ জমিন গ্রাস করবে, তা আমার জানা রয়েছে।
* لَتُبْعَثُنَّ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।
* بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ অর্থাৎ বরং তারা তো এ জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, তাদের নিকট একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছে।
* اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُنْذِرَ بِهِ النَّاسَ অর্থাৎ আমি আপনার উপর এ জন্য কুরআন নাজিল করেছি যে, তা দ্বারা আপনি লোকদেরকে ভয় দেখাবেন।
* بَلْ عَجِبُوْا অর্থাৎ বরং তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَئِذَا مِتْنَا : مِتْنَا -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা-

১. أَئِذَا -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে।

২. أَئِذَا -এর দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে।

৩. উভয় হামযাকে বহাল রেখে মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে।

৪. দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে।

৫. একটি হামযাকে বিলোপ করে।

اَئِذَا الخ -এর অর্থ : আল্লাহর বাণী- اَئِذَا مِتْنَا الخ মূলত মুশরিকদের উক্তি, যা তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন মাত্র। এখানে প্রশ্নটি তারা অস্বীকৃতির জন্য করেছে। এর অর্থ হলো- لَا نَرْجِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ كَوْنِنَا تُرَابًا وَبَعْدَ اَكْلِنَا الْاَرْضُ অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পর, আমি মাটিতে মিশে যাওয়ার পর এবং জমিন আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলার পর আমরা পুনরায় উত্থিত হব না।

আলোচ্য আয়াতাংশে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? : আল্লাহর বাণী- ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ -এর মধ্যে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হলো- نَرْجِعُ اِلَى اللّٰهِ بِالْبَعْثِ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ অর্থাৎ আমরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ফিরে যাব। তাতো সুদূর পরাহত মনে হয়।

قَوْلُهُ لَمَّا جَاءَهُمْ : আল্লাহ তা'আলার বাণী- بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ -এর মধ্যস্থিত لَمَّا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ ل -এর উপর যবর ও م -এর উপর তাশদীদসহ যবর দিয়ে لَمَّا পড়েছেন।

২. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) ل -এর নিচে যেরযোগে এবং م -কে তাখফীফ করে لِمَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضَ : আল্লাহর বাণী- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا -এর মধ্যস্থিত اَلْاَرْضَ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এর দু'টি কারণ হতে পারে। যথা-

১. وَالْاَرْضَ শব্দটি عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ মানসূব হয়েছে। মূলত ছিল وَمَدَدْنَا الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا الخ

২. অথবা, তা اِلَى السَّمَاءِ -এর মহল্লের উপর আত্ফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা اَفَلَمْ মূলত اِلَى السَّمَاءِ يَنْظُرُوْا -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ ذِكْرٰى وَ تَبْصِرَةً : আল্লাহর বাণী- تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى শব্দদ্বয় مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- فَعَلْنَا ذٰلِكَ تَبْصِيْرًا مِنَّا وَ ذِكْرٰى অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে চক্ষু উন্মোচনকারী ও উপদেশ হওয়ার জন্য আমি আকাশ ও জমিনকে কৌশলপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছি।

অথবা, একটি উহ্য مَصْدَر -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। যার মূলে ছিল- بَصَّرْنَا هُمْ تَبْصِرَةً وَ ذَكَّرْنَا هُمْ ذِكْرٰى

২. تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى একটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। মূল ইবারত হবে- هِيَ تَبْصِرَةٌ وَ ذِكْرٰى

قَوْلُهُ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا : আল্লাহর বাণী- كَيْفَ بَنَيْنٰهَا মাফউল তথা اَلسَّمَاءِ হতে حَال হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। مخاطب -কে স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ الخ : **শানে নুযূল** : নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদের নিকট যেসব বিষয়াদি পেশ করেছেন তন্মধ্যে তাওহীদের ন্যায় পুনরুত্থানের বিষয়টিও তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তাওহীদের কথা শুনে যেমন তারা বলত যে, হাজার হাজার খোদা যখন দুনিয়াটাকে সামাল দিতে পারছে না, তখন এক খোদা কি করে তা পারবে? (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) তেমনটি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তারা বলত যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে যখন মাটির সাথে মিশে যাব, তখন আমাদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন।

قَوْلُهُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ : ق এটা আরবি বর্ণমালার একটি। কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. مُحْكَمٌ ২. مُتَشَابِهٌ -আবার مُتَشَابِهٌ -কেও ভাগ করা হয়েছে দু'ভাগে। এক. যার অভিধানিক অর্থ জানা আছে কিন্তু পারিভাষিক অর্থ অজ্ঞাত। **দুই.** যার আভিধানিক ও পারিভাষিক কোনো অর্থই জানা নেই। قٓ বর্ণটি শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত। সূরার প্রথমে ব্যবহৃত এ অজ্ঞাত অর্থবোধক বর্ণগুলোকে حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ -ও বলা হয়।

এ জন্যই জালালাইনের গ্রন্থকার আ'ল্লামা মহল্লী (র.) এর তাফসীরে লিখেছেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ ق (ইত্যাদি)-এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন।

অবশ্যই মুহাক্কিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এটার অর্থ জানতেন। অন্যথায় সম্বোধন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে সাধারণ ঈমানদারগণের এটার অর্থ জানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

তবে কতিপয় মুফাস্সিরে কেরাম (র.) ধারণার উপর ভিত্তি করে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

"ق" -এর ব্যাখ্যায় আলেমগণের বিভিন্ন মতামত : "ق" -এর তাফসীরে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো-

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ق আল্লাহর নামসমূহের একটি।
* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় যাহ্হাক ও ইকরিমা (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ক্বাফ ভূপৃষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত এক বিশাল সবুজ পাহাড়ের নাম।
* শা'বী (র.) বলেছেন, ق হলো সূরার ভূমিকা।
* ইনতাকী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা مُقَرَّبُوْنَ [আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভকারী বান্দাগণকে] বুঝানো হয়েছে।
* আবূ বকর আররাফ (র.) বলেছেন, এটার অর্থ হলো- قِفْ عِنْدَ اَمْرِنَا وَنَهْيِنَا وَلَا تَعِدَّ هُمَا অর্থাৎ আমার আদেশ ও নিষেধের কাছে থেমে যাও- এদের সীমা ডিঙিয়ে যেয়ো না।
* ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, ق হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত চারটি নামের প্রথমাংশ- قَادِرٌ . قَرِيْبٌ . قَاضٍ ও قَابِضٌ
* যুজাজ (র.) বলেছেন- ق এর অর্থ হলো- قَاضِيُ الْاَمْرِ অর্থাৎ [যে কোনো] বিষয়ের ফয়সালাকারী।
* হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এটা কুরআন মাজীদের একটি নাম।
* হযরত ওহ্হাব (র.) বর্ণনা করেছেন, একবার যুলকারনাইন (আ.) ভ্রমণে বের হয়ে একটি বিশাল পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। ঐ পাহাড়ের নিচে বহু ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন পাহাড়! জবাব আসল, আমি কোহে ক্বাফ তথা ক্বাফ পাহাড়। তোমার আশে-পাশে এরা কি? জবাব আসল, এই ক্ষুদ্র পাহাড়সমূহ আমার শাখা-প্রশাখা। এমন কোনো দেশ নেই যেখানে আমার শাখা নেই। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো শহরে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন আমাকে নির্দেশ দেন, আমি আমার ঐ শাখা নাড়া-চাড়া করলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। হযরত যুলকারনাইন (আ.) উক্ত পাহাড়কে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বলে দাও! জবাব আসল, "আমাদের রব অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ; তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

قَوْلُهُ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ : 'আর শপথ কুরআনে মাজীদের'। কুরআনের মর্যাদা তো বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। এটা আগমন করেই পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবসমূহকে মানসূখ [রহিত] করে দিয়েছে। এটা তার ই'জাযী শক্তি ও অসীম রহস্যের দ্বারা সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। কুরআনে কারীম স্বয়ং এর সাক্ষী যে, এতে কেউই হাত দেওয়ার সুযোগ পায়নি– কোনোরূপ খুঁত বের করতে পারেনি। কিন্তু তথাপিও মুশ্‌রিকরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এর কারণ এই ছিল না যে, তাদের নিকট এর বিরুদ্ধে কোনো দলিল প্রমাণ মওজুদ ছিল; বরং শুধু তাদের নিজেদের অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও অহমিকার কারণেই তারা কুরআনে কারীম ও নবী করীম ﷺ -কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি।

'আল-মাজীদ' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. উচ্চ মর্যাদাবান মহামহিমান্বিত, শ্রদ্ধেয়, মহামান্য, ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী।

২ দানশীল, অনুগ্রহকারী, বিপুল দাতা, অশেষ কল্যাণ বিধানকারী। এটা আল-কুরআনের সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর উপরিউক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য।

কুরআন এই দিকের বিবেচনায় মহান যে, দুনিয়ার কোনো গ্রন্থ তার মোকাবেলায় পেশ করা যেতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যিক মানের দিক দিয়েও তার অলৌকিকত্ব আশ্চর্যজনক ও নজীরবিহীন, শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তার মুজেযা অতুলনীয়। তা যখন নাজিল হয়েছিল তখনও মানুষ এর মতো বাণী রচনা করে পেশ করতে পারেনি এবং এর পরবর্তী সময় তথা আজ পর্যন্তও কেউ এর সমতুল্য বাণী রচনায় সক্ষম হয়নি, আর কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। তার কোনো একটি বাণী কালের কোনো পর্যায়েই বিন্দুমাত্রও ভুল প্রমাণিত হয়নি, আর না কোনো দিন হবে। বাতিল না সম্মুখ দিক হতে তাকে মোকাবিলা করতে পারে, না পিছন দিক হতে আক্রমণ করে তাকে পরাস্ত করতে পারে। মানুষ এর নিকট যতবেশি হেদায়েত লাভ করতে চেষ্টা করবে এটা তাদেরকে ততবেশি হিদায়েত দান করবে। মানুষ তার যতবেশি অনুসরণ করবে এটা হতে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ততবেশি লাভ হবে। তার কল্যাণ ও মঙ্গলের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কোনো একটি পর্যায়েও মানুষ তার প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও তার উপর নির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হতে পারে না। এর মঙ্গল ও কল্যাণ কোথায়ও এবং কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না এবং যেতেও পারে না।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-ও প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন– اَلْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ-এর অর্থ হলো অশেষ কল্যাণ বিধায়ক ও মহামহিমান্বিত কুরআন। যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ অর্থাৎ বাতিল না এর সম্মুখে দিক হতে আসতে পারে, আর না পিছনের দিক হতে। মহাপ্রকৌশলী ও বহুল প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে এটা নাজিল হয়েছে। মোটকথা আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হওয়ার কারণেই এটা সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়ার দাবিদার হতে পেরেছে।

قَوْلُهُ فِيْٓ اَمْرٍ مَرِيْجٍ : مَرِيْجٍ শব্দ مَرْجٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ– স্থিরতা। اَمْر শব্দের সাথে مَرْجٌ -এর সম্পর্ক রূপকভাবে হয়েছে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তিকে مَرِيْجٌ বলা হয়ে থাকে, সমস্যাকে নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতে, مَرِيْجٌ শব্দের অর্থ– বিশৃঙ্খলাকারী ও দুষ্ট। হযরত কাতাদা ও যাহহাক (র.) প্রমুখ বলেছেন এর অর্থ মিশ্র ও জটিল। অর্থাৎ কাফিররা এক নীতির উপর স্থির থাকে না। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে ফ্যাসাদ ও জটিলতা সৃষ্টি করে।

قَوْلُهُ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ .... شَيْءٌ عَجِيْبٌ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান না আনয়নের কারণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

মক্কার মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -এর উপর যেসব কারণে ঈমান আনয়ন করেনি। যে বিষয়সমূহকে তারা ঈমান গ্রহণ না করার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো পুনরুত্থানের বিষয়টি। সুতরাং একে তারা আশ্চর্যজনক মনে করেছে যে, তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন ব্যক্তি ভয়-প্রদর্শনকরী হিসাবে তাদের নিকট আগমন করেছেন। যিনি তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তদানুযায়ী আমল না করলে মৃত্যুর পর তাদেরকে পরকালে পুনঃ জীবিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কাজেই কাফেররা বলেই ফেলল যে, এরূপ ভীতি প্রদর্শন তো অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার।

"بَلْ عَجِبُوْا الخ" আয়াতে تَعَجُّبْ এবং مُتَعَجَّبْ مِنْه -এর কারণ : بَلْ عَجِبُوْا -এর مُتَعَجَّبْ مِنْه হলো "أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ"; কাফেরদের ধারণা ছিল তাদেরকে সাবধানকারী তাদের মধ্য হতে একজন হতে পারে না। তাদেরই এক ব্যক্তি তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তা তাদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আর যদি তাদের মধ্য হতেই হবে, তাহলেও সে ব্যক্তি তো মুহাম্মদ ﷺ হতে পারেন না। তাদের মধ্য হতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কোনো একজনের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হলে তাও একটা কথা ছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে, এ মহান দায়িত্বের জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে নির্বাচন করা হলো কেন? সুতরাং তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছিল- لَوْلَا أُنْزِلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এ দু'টি জনপদ [মক্কা ও তায়েফের]-এর মধ্য হতে একজন মহান ব্যক্তির উপর [আবূ জাহল অথবা ওয়ারাকা ইবনে মাসউদ সাকাফীর উপর] এ কুরআন নাজিল হলো না কেন?

তাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার আরো কারণ ছিল পরকাল বিষয়ক নবী করীম ﷺ -এর বক্তব্য। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, হাশর-নশর হওয়া, জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো তাদেরকে বিস্মিত করত এবং তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হতো।

بَلْ عَجِبُوْا -এর মধ্যে بَلْ কোন অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী- بَلْ عَجِبُوْا -এর মধ্যে بَلْ শব্দটি উহ্য جَوَاب قَسَم হতে إِضْرَاب হয়েছে। আর তাদের বিস্ময় প্রকাশ তাদের নির্বুদ্ধিতার দরুন করা হয়েছে। অন্যথা মূলত এবং নিখুঁত বিবেকের দৃষ্টিতে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আগমন মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়; বরং তাদের আগমন না করাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

আর উক্ত বাক্য- بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ الخ -এর মধ্যে مَضْرُوْب عَنْه উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি হলো- لَمْ يَقْتَنِعُوْا بِالشَّكِّ فِى الرِّسَالَةِ وَالْحَشْرِ بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ অর্থাৎ তারা শুধু রিসালত ও হাশরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এজন্যও তারা আশ্চর্যবোধ করেছে যে, তাদের নিকট তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজনকে ভয় প্রদর্শনকারী [রাসূল] হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

قَوْلُهُ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ .... وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ : কাফেররা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করত। তারা বলত যে, আমরা মত্যুবরণ করত মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় কি আমাদেরকে জীবিত করা হবে? এটাতো আমাদের নিকট সুদূর পরাহত ও অসম্ভব বলেই মনে হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করত পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- জমিন তাদের দেহাংশের কি পরিমাণ গ্রাস করে তা আমার ভালো করেই জানা রয়েছে। আর আমার নিকট একটি সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে। তারা যে, পুনরুত্থানকে সুদূর পরাহত মনে করছে তা ঠিক নয়। কেননা সুদূর পরাহত হওয়া হয়তো যাকে পুনরুত্থিত করা হবে, তার হিসাবে হবে অথবা পুনরুত্থানকারীর দিক বিবেচনায় হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় এ জন্য অসম্ভব হবে না যে, তার মধ্যে তো জীবন ধারণের যোগ্যতা বিদ্যমান- যা বাস্তবে রয়েছে। আর শেষোক্ত দিকের বিচারেও তা অসম্ভব হতে পারে না। কেননা দেহের সমস্ত অংশের মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার জানা-শুনা রয়েছে। তাদেরকে পুনরায় একত্র করত জীবনদানের ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে।

মোটকথা, মানুষ সর্বাংশে মাটিতে মিশে যায় না; বরং তার জীবন তো সহীহ-সালামত থেকেই যায়। মাটিতে যদি মিশে তা শুধু দেহই তো মিশে থাকে। এর অংশসমূহ পরিবর্তিত হয়ে যে আকার ধারণ করে তা আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন। আর তা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীনই থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা একে একত্র করে জীবন্ত করে দিবেন। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ইলমও হলো قَدِيْم [অনাদি] পূর্ব হতেই সবকিছু তিনি লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিভাবে মানুষের পুনরুত্থান হবে তাও তথায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখনো তাঁর নিকট অত্র কিতাব সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ইলমে কাদীম না বুঝলে এটুকু বুঝে নাও যে, উক্ত দপ্তরে সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে।

كِتَاب حَفِيْظ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলার বাণী- كِتَابٌ حَفِيْظٌ -এর দ্বারা লাওহে মাহফূজ (اللَّوْح مَحْفُوْظ) -কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর মধ্যে সংঘটিত ও সংঘটিতব্য সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে। মূলত এটা একটি উপমা। অর্থাৎ যেমন কারো কাছে এমন একটি কিতাব থাকে যার মধ্যে সবকিছু লিপিবদ্ধ থাকে তেমনটি আল্লাহ তা'আলার ইলমেও সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে। লাওহে মাহফূযকে মানুষের দেমাগ [মগজ]-এর সাথে তুলনা করা যায়। ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এতে জ্ঞানের কত ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। আর লাওহে মাহফূয হলো সাদা মুক্তার ন্যায়, যা সপ্তম আকাশে হাওয়ার সাথে ঝুলে রয়েছে। এর ব্যাসার্ধ আসমান-জমিনের সমতুল্য। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ .... فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মক্কার কাফেরদের কুরআন ও নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করার মূল কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- বস্তুত কাফেররা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যখন তা আমাদের নিকট আগমন করেছে। সুতরাং তারা দোদুল্যমানতা ও সংশয়ে ভুগছে। কুরআন ও নবী করীম ﷺ -এর সত্যতার ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কখনো তারা বলছে যে, কুরআন জাদু এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ জাদুকর! কখনো বলছে, কুরআন কাব্য এবং মুহাম্মদ ﷺ কবি। আবার কখনো বা বলছে কুরআন জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মুহাম্মদ ﷺ জ্যোতিষী।

কাফেররা শুধু আশ্চর্যবোধের বহিঃপ্রকাশই করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা পরিষ্কার ভাষায় কুরআন মাজীদ ও নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এমনকি পরকাল-পুনরুত্থান সকল সত্যকেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য জিদ ধরে বসে তাদের সামনে শত যুক্তি পেশ করলেও তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেই।

বস্তুত উপরে কুরআন মাজীদের শপথ করা হয়েছে এ কথাটি বলার জন্য যে, মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত মেনে নিতে কোনো যুক্তিসঙ্গত ও বিবেক-বুদ্ধিসম্মত কারণে অস্বীকৃতি জানায়নি; বরং এর ভিত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বিবেক বিরোধী। কেননা, তারা এ বলে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল যে, তাদের জাতির মধ্য হতে তাদের নিজেদের মতোই একজন লোককে আল্লাহ তা'আলা সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। এতেই তারা বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার ব্যবস্থা না করতেন অথবা, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য কোনো অতি মানবকে পাঠাতেন, তাহলে তা-ই তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হতো। কাজেই নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করার জন্য একে অজুহাত হিসেবে পেশ করা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুস্থ বিবেকের দাবি হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে সাবধানকারীর আগমন হওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আর উক্ত সতর্ককারী যে তাদের স্বজাতীয়, তাদের নিজেদের মতোই একজন এটাও তাদের নিকট কম আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সুস্থ বিবেকের দাবি হলো, উক্ত ব্যক্তি তাদেরই একজন হওয়া।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, যাকে এ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন, সে মুহাম্মদ ﷺ -ই কিনা? আর এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের তো প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন মাজীদে তিনি যা উপস্থাপন করেছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য এটাই সর্বদিক দিয়ে যথেষ্ট।

কাজেই প্রমাণিত হলো যে, পূর্বোক্ত আয়াতে এ কথাটি বলার জন্যই কুরআনের শপথ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্যই আল্লাহর রাসূল। কাফেররা অকারণেই কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাঁর রিসালতের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করছে। কুরআনের সিফাত 'মাজীদ' দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ .... زَوْجٍ بَهِيْجٍ : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যে, পুনরুত্থানে সক্ষম তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টির প্রতি তাকানোর জন্য এবং এগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

এ লোকেরা যখন পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তখন তারা কি একবারও তাকায়নি- একবারও আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখেনি, কিভাবে আমি তাদের উর্ধ্বে তাকে ছাদবিহীনভাবে বানিয়েছি। তারকারাজির দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। আর তাতে দূষণীয় কোনো ফাটলও নেই। এত বিশাল আকাশকে ছাদ ব্যতীত কিভাবে আমি মজবুতভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। হাজারো লাখো তারকার আগমনে ঝিকিমিকিতে কি এক অপূর্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা হয় তথায় রাত্রি বেলায়। হাজারো-লাখো বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও না এতে ফাটল ধরেছে, না কোনো দিক ভেঙ্গে পড়েছে আর না তা বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। তারা কি চিন্তা করে দেখেছে, তা কোন কারিগরের কাজ, কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম?

আর কি তারা জমিনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি? এ বিশাল ভূখণ্ডকে কিভাবে আমি পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছি। এর উপর পর্বতরাজিকে স্থাপন করে সুদৃঢ় করে দিয়েছি। সুদৃশ্যময় রকমারি উদ্ভিদ দ্বারা এর উপরিভাগকে করে দিয়েছি সুশোভিত। রিজিকের ভাণ্ডারসমূহ আর অগণিত সম্পদরাজি তা হতে উদগীরণ করা হচ্ছে- যা কোনো দিন নিঃশেষ হবে না।

نَظَر -এর অর্থ : এখানে نَظَر -এর অর্থ হলো অন্তরের দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করা। অর্থাৎ অন্তঃচক্ষু দ্বারা তা দেখা যে, যে মহান আল্লাহ আকাশের ন্যায় বিশাল বস্তুকে এবং জমিনের ন্যায় বিস্তৃর্ণ জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই পুনরুত্থানে সক্ষম।

অনুবাদ :

٩. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكًا كَثِيْرَ الْبَرَكَةِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ بَسَاتِيْنَ وَحَبَّ الزَّرْعِ الْحَصِيْدِ . الْمَحْصُوْدِ .

৯. আর আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি বরকতপূর্ণ পানি অতি বরকতময়। অতঃপর উৎপন্ন করি তার দ্বারা বাগিচাসমূহ বাগানসমূহ এবং শস্য ফসল পরিপক্ক কর্তনযোগ্য।

١٠. وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ طِوَالًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ مُتَرَاكِبٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .

১০. এবং উন্নত উচ্চ খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি সুদীর্ঘ। তা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। যার ছড়াগুলো স্তরে স্তরে সজ্জিত একটির উপর একটি [স্তরে স্তরে] ধরে থাকে।

١١. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ مَفْعُوْلٌ لَهُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ط يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلُ هٰذَا الْإِحْيَاءِ الْخُرُوْجُ مِنَ الْقُبُوْرِ فَكَيْفَ تُنْكِرُوْنَهُ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ نَظَرُوْا وَعَلِمُوْا مَا ذُكِرَ .

১১. বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ (رِزْقًا) তা مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে। আর আমি জীবিত করেছি তার দ্বারা একটি মৃত শহরকে (مَيْتًا) -এর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ সমান [অর্থাৎ তা এতদুভয়ের জন্য সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে]। তেমনিভাবে অর্থাৎ এ জীবিতকরণের ন্যায় হবে বহির্গমন কবরসমূহ হতে। সুতরাং তোমরা কিভাবে তাকে অস্বীকার করতে পার? এখানে প্রশ্নবোধক [বাক্য] تَقْرِيْرٌ [ইতিবাচক] -এর জন্য হয়েছে। এর অর্থ হবে- তারা অবশ্যই দেখেছে এবং জেনেছে যা উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنٰى قَوْمٍ وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ هِىَ بِئْرٌ كَانُوْا مُقِيْمِيْنَ عَلَيْهَا بِمَوَاشِيْهِمْ يَعْبُدُوْنَ الْاَصْنَامَ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ حَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ وَقِيْلَ غَيْرُهُ وَثَمُوْدُ قَوْمُ صَالِحٍ .

১২. তাদের পূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে নূহ (আ.)-এর কওম - قَوْم -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে فِعْل -কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। এবং 'রাস'-এর অধিবাসীরা 'রাস' একটি কূপের নাম। তারা তাদের চতুষ্পদ জন্তুসহ তথায় বসবাস করত। তারা মূর্তিপূজারী ছিল। কারো কারো মতে, তাদের নবী ছিলেন হানযালা ইবনে সাফওয়ান। কেউ কেউ অন্যজনের নামোল্লেখ করেছেন। আর ছামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর কওম।

١٣. وَعَادٌ قَوْمُ هُوْدٍ وَفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ .

১৩. আর আদ হযরত হুদ (আ.)-এর কওম এবং ফিরআউন ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়।

١٤. وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ اَىِ الْغَيْضَةِ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ط هُوَ مَلِكٌ كَانَ بِالْيَمَنِ اَسْلَمَ وَدَعَا قَوْمَهُ اِلَى الْاِسْلَامِ فَكَذَّبُوْهُ كُلٌّ مِنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ كَذَّبَ الرُّسُلَ كَقُرَيْشٍ فَحَقَّ وَعِيْدِ وَجَبَ نُزُوْلُ الْعَذَابِ عَلَى الْجَمِيْعِ فَلَا يَضِيْقُ صَدْرُكَ مِنْ كُفْرِ قُرَيْشٍ بِكَ .

১৪. আর আইকা ওয়ালারা (اَيْكَة) -এর অর্থ হলো ক্রোধ। তারা হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম। আর 'তুব্বা' এর কওম তুব্বা ইয়েমেনের একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কওমকে ইসলাম কবুল করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু কওমের লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে] উল্লিখিত সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কুরাইশদের ন্যায়। সুতরাং আমাদের ভয় সত্যে পরিণত হলো। পূর্বোক্ত সকলের উপরই আজাব নাজিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে; কাজেই কুরাইশদের কুফরির কারণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না- সংকীর্ণ হৃদয় হয়ে পড়বেন না।

١٥. اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط اَىْ لَمْ نَعْىَ بِهِ فَلَا نَعْيٰى بِالْاِعَادَةِ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ شَكٍّ مِنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ . وَهُوَ الْبَعْثُ .

১৫. প্রথমবারের সৃষ্টিকার্যে আমি কি অক্ষম ছিলাম? অর্থাৎ এতে আমি অপরাগ হইনি। সুতরাং পুনরায় সৃষ্টি করতেও আমি অক্ষম হব না; বরং তারা পড়ে রয়েছে সন্দেহের মধ্যে সংশয়ের মধ্যে একটি নবতর সৃষ্টির ব্যাপারে আর তা হলো পুনরুত্থান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَاسِقَاتٍ : আল্লাহর বাণী وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ -এর মধ্যে بٰسِقٰتٍ শব্দটি اَلنَّخْلَ হতে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ -এর মহল্লে ই'রাব হয়েছে। আর حَالٌ مُقَدَّرَةٌ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা জন্মের সময় লম্বা হয়ে জন্মায় না, বরং ক্রমান্বয়ে লম্বা হয়ে থাকে। আর اَلنَّخْل -কে এ জন্য একবচন নেওয়া হয়েছে যে, তা অত্যন্ত লম্বা এবং উপকারী। সুতরাং হাদীস শরীফে اَلنَّخْل -কে মুসলমানগণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رِزْقًا : আল্লাহর বাণী- رِزْقًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। مَنْصُوْبٌ হওয়ার কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা-
* এটা حَالٌ হওয়ার দরুন مَنْصُوْبٌ হয়েছে অর্থাৎ- مَرْزُوْقًا لِلْعِبَادِ
* اِنْبَاتٌ -এর অর্থ হয়ে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে অর্থাৎ- اَنْبَتْنَا اِنْبَاتًا
* এটা مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে। অর্থাৎ- اَنْبَتْنَا .... لِرِزْقِ الْعِبَادِ

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ : এ আয়াতটির কোনো মহল্লে ই'রাব নেই। এটা جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ যা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এসেছে। অথবা এ কথা বর্ণনা করার জন্য এসছে যে, পুনরুত্থানের সময় তাদের কবর হতে বের হওয়ার ব্যাপারটি মৃত মাটি হতে জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করার মতোই। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ نَزَّلْنَا : আল্লাহর বাণী- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ -এর نَزَّلْنَا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে-
১. জমহুর ক্বারীগণ بَابُ تَفْعِيْلٍ তথা تَنْزِيْلٌ হতে نَزَّلْنَا পড়েছেন।
২. কেউ কেউ اِنْزَالٌ হতে اَنْزَلْنَا পড়েছেন।

قَوْلُهُ مَيْتًا : আল্লাহর বাণী· بَلْدَةً مَّيْتًا শব্দটির মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-
১. জমহুর ক্বারগণ ى -এর মধ্যে সাকিন দিয়ে مَيْتًا পড়েছেন।
২. ক্বারী জাফর ও খালেক (র.) প্রমুখ ى -এর উপর তাশদীদযোগে مَيِّتًا পড়েছেন।

قَوْلُهُ اَفَعَيِيْنَا : اَفَعَيِيْنَا শব্দের দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-
১. জমহুর ক্বারীগণ اَفَعَيِيْنَا -এর প্রথম ى -এর নিচে যের ও দ্বিতীয় ى -এর উপর সাকিনযোগে পড়েছেন।
২. ইবনে আবী ইবলা প্রথম ى -এর উপর তাশদীদযোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ...... كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ : আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন এখানে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে যে, আমি [আল্লাহই] তো আকাশ হতে বরকতপূর্ণ পানি নাজিল করে থাকি, আর এর দ্বারা জমিনে বাগ-বাগিচা ও ফসলের সমাহার সৃষ্টি করি। আর সৃষ্টি করি সুউচ্চ ও উন্নত খেজুর বৃক্ষরাজি যার মধ্যে থোঁকায় থোঁকায় ছড়ার গুচ্ছ স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে থাকে। আমার বান্দাদের রিজিকের ব্যবস্থা করার জন্যই তো আমি এরূপ করি।

আমি আর এ পানি দ্বারা সঞ্জীবিত করি মৃত প্রায় শুষ্কভূমিকে। আমি মৃত্যুর পর লোকদেরকে এভাবে পুনর্জীবিত করব।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের পরিচয় দিয়েছেন, পুনরুত্থানের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। দলিল পেশ করেছেন এভাবে যে, যেই আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী গোলকটিকে জীবন্ত সৃষ্টিকুলের অবস্থান ও বসবাস গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন- যিনি পৃথিবীর নিষ্প্রাণ মাটিকে উর্ধ্বলোকের প্রাণহীন পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ মানের ক্রমবর্ধমান জীবন সৃষ্টি করেছেন। যাকে তোমরা তোমাদের ক্ষেতখামার ও বাগ-বাগিচায় শ্যামল শোভামণ্ডিত ও চাকচিক্যময় হয়ে ভেসে উঠতে দেখতে পাও; যিনি এ উদ্ভিদকে মানুষ ও জীব-জন্তুর তথা সকল প্রাণীর জন্য খাদ্যের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন: সে পবিত্র সত্তা সম্বন্ধে যদি ধারণা করা হয় যে, মৃত্যুর পর তিনি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না, তাহলে তা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

তোমরা তো নিজেরাই দেখতে পাও যে, একটি বিশাল অঞ্চল সম্পূর্ণ নির্জীব ও শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে। বৃষ্টির একটি ফোঁটা নিপতিত হওয়া মাত্রই তার অভ্যন্তর হতে সহসা জীবনের ফল্গুধারা ফুটে উঠে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মৃতবৎ পড়ে থাকা শিকড়গুলো তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত হয়ে উঠে এবং নানা ধরনের ভূগর্ভস্থ পোকা-মাকড় মাটির তলদেশ হতে বের হয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয়। তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। আর তা তো তোমরা তোমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। এর সত্যতাকে তোমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পার না। কাজেই পুনরুত্থানকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার?

নূহ (আ.), ছামূদ ও অপরাপর জাতিসমূহের কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত নূহ (আ.), ছামূদ ও অপরাপর কয়েকটি জাতির ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো? মুফাস্‌সিরগণ (র.) তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. এ সকল জাতির লোকেরাও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল– যদ্রূপ মক্কার কাফের মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, পুনরুত্থানকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং দেখা গেল রাসূল (আ.)-এর সাথে আচরণে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং এখানে মক্কার কাফেরদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতের ঐ সকল জাতিসমূহ রাসূলগণকে অস্বীকার করা ও পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন– দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও শাস্তি তো তারা ভোগ করেছেই আখেরাতেও তাদের জন্য কঠিন ও চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। কাজেই মক্কার কাফেররাও যদি নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হতে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকেও উক্ত অতীত জাতিসমূহের ভাগ্য বরণ করতে হবে। তাদের জন্য আল্লাহর আজাব অবধারিত ও অনিবার্য হয়ে পড়বে। দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই যে, একে রুখতে পারে– এর গতিরোধ করতে পারে।

২. অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলির উল্লেখ করার দ্বিতীয় কারণ হলো– নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া। বাস্তবিক পক্ষেই মক্কার কাফের মুশরিকদের সীমাহীন নির্যাতন, সমালোচনা, কটূক্তি, তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও দাওয়াতের গতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে পড়া নবী করীম ﷺ -কে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি স্বভাবতই মনভাঙ্গা ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবছেন যে, না জানি তাঁর দাওয়াতে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে– হয়তো যেভাবে দাওয়াত দেওয়ার দরকার ছিল, আমি সেভাবে দাওয়াত পৌঁছাতে পারছি না। সুতরাং অতীত জাতিসমূহের ঘটনার উল্লেখ করত নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আপনার বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করায় আপনার হতাশ মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি হকের উপর সঠিক পথ ও পদ্ধতির উপরই রয়েছেন। তা কেনো নতুন বিষয় নয়। চিরদিন এ রূপই হয়ে এসেছে। আপনার পূর্বেও আমি যাদেরকে রাসূল করে বিভিন্ন জাতির নিকট পাঠিয়েছি, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুতরাং আপনাকেও যে আপনার জাতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং আপনার দাওয়াতী কাজে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলবে, তা স্বাভাবিক। তাতে না বিস্ময়ের কিছু আছে আর না হতাশ ও মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ আছে।

'আসহাবুর রাস' কারা? : পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এবং তাদের আল্লাহদ্রোহিতার উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের কয়েকটি স্থানে أَصْحَابُ الرَّسِّ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো স্থানেই তাদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়নি। তাই তাদের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ–

* জালালাইন প্রণেতা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, 'রাস' ছিল একটি কূপের নাম। তারা উক্ত কূপের আশে-পাশে বসবাস করত। তারা ছিল প্রতিমাপূজারী। কথিত আছে যে, তাদের নবী ছিলেন হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আ.)।
* কারো কারো মতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের লোক ছিল।
* কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা ছিল হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি।
* কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিল উখদূদের অধিবাসী।
* কারো কারো মতে, তারা হলো হযরত সালেহ (আ.)-এর ঐ চার সহস্র অনুসারী যারা আজাব হতে নাজাত পেয়েছিল।

যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্যে থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। আজাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরামাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ (আ.)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ (আ.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حَضَرَمَوْتُ [হাযারা-মাউত অর্থাৎ মৃত্যু হাজির হলো] হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্য মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করেন। তারা

তাকে হত্যা করে। ফলে আজাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই উল্লিখিত হয়েছে- وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهُ ثَمُوْدُ : হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কুরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَادٌ : বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানি করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝনঝার আজাবে সব ফানা হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِخْوَانُ لُوْط : হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ : ঘন জঙ্গল ও বনকে اَيْكَةٌ বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শুয়াইব (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আজাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

قوله قوم تبع : ইয়েমেনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুব্বা। সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে কওমে ফিরআউন না বলে ফিরআউন বললেন কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ অর্থাৎ ইতঃপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [নবীগণকে] হযরত নূহ (আ.)-এর কওম, আসহাবে রাস, ছামূদ, আদ, ফিরআউন ও লূত (আ.)-এর জাতি।

লক্ষণীয় যে, এখানে অন্যান্যদের ব্যাপারে জাতির নাম নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ফিরআউনের শুধু নাম নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ قَوْمُ فِرْعَوْنَ না বলে শুধু فِرْعَوْنَ বলা হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা-

১. অন্যান্য যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা নিজেরা দোষী ছিলেন না। যেমন হযরত নূহ (আ.), হযরত লূত (আ.), হযরত তুব্বা (আ.) ; বরং অপরাধী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ছিল তাদের জাতি। অথচ ফিরআউন নিজেই ছিল অপরাধী। এ জন্যই قَوْمُ نُوْحٍ বলা হয়েছে; কিন্তু قَوْمُ فِرْعَوْنَ বলা হয়নি।

২. যদিও হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউন ও তার জাতি তথা কিবতীরা উভয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তথাপি এ ব্যাপারে ফিরআউনের ভূমিকাই ছিল মুখ্য এবং তাদের উপর ফিরআউনের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ, এ জন্যই শুধু فِرْعَوْنَ বলা হয়েছে ; قَوْمُ فِرْعَوْنَ বলা হয়নি।

৩. মিশরে বনূ ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে যে কিবতীরা ফিরআউনকে সহযোগিতা করেছিল ফিরআউন মূলত সে কিবতীদের বংশীয় লোক ছিল না।

قَوْلُهُ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ .... مِنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ : আল্লাহ তা'আলা এখানে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার দলিল পেশ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- 'আমি কি প্রথমবার এদেরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়েছিলাম? অর্থাৎ না, আমি তো প্রথমবার তাদেরকে সৃষ্টি করতে অপারগ হইনি। সুতরাং এটাই তো প্রমাণ করে যে, পুনরায় আমি তাদেরকে জীবিত করতে অসমর্থ হব না। কেননা যে কোনো বস্তুকে প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হতে কঠিন। সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টিকারী তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন।

বস্তুত পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীরা অনর্থকই সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। নতুন করে সৃষ্টি তথা পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের ঘোর কাটছে না। আর এ সংশয়ই তাদেরকে কুফরির দিকে তাড়িত করছে।

"وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ" ও "وَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ الخ" **আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য** : প্রথমোক্ত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ আর আমি জমিনে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্যময় উদ্ভিদ গজিয়েছি।

শেষোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ অর্থাৎ আর পানি দ্বারা আমি জমিনের কর্তনযোগ্য [পরিপক্ক] শস্যদানা গজিয়েছি।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়কে বাহ্যত এক ও অভিন্ন মনে হয়। দ্বিতীয়টিকে যেন প্রথমটির পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হয়। তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে- প্রথম আয়াতটিতে উদ্ভিদকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে উদ্ভিদকে রিজিকের পরিবেশক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী- حَبَّ الْحَصِيْدِ -এর মধ্যে তো اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ আবশ্যক হয়ে পড়ে, এর সমাধান কি? : আল্লাহর বাণী- "حَبَّ الْحَصِيْدِ" -এর মধ্যে اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ ওয়াজিব হয়ে পড়ে; এ জন্য-

* اَلْحَصِيْدُ -এর পূর্বে اَلزَّرْعُ শব্দকে উহ্য ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ اَلْحَصِيْدُ উহ্য اَلزَّرْعُ -এর সিফাত হয়েছে। مَوْصُوْفٌ -কে বিলোপ করে সিফাতকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

* অথবা, اَلْحَصِيْدُ অর্থাৎ কর্তনযোগ্য ফসল। এমতাবস্থায় উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। সুতরাং اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ সাব্যস্ত হবে না। যেমন- حَقُّ الْيَقِيْنِ ـ حَبْلُ الْوَرِيْدِ ও دَارُ الْاٰخِرَةِ ইত্যাদি।

অনুবাদ :

١٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ حَالٌ بِتَقْدِيرِ نَحْنُ مَا مَصْدَرِيَّةٌ تُوَسْوِسُ تُحَدِّثُ بِهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَالضَّمِيْرُ لِلْإِنْسَانِ نَفْسُهُ ج وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ . الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْوَرِيْدَانِ عِرْقَانِ لِصَحْفَتَي الْعُنُقِ . .

১৬. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং আমি জানি একটি উহ্য نَحْنُ সহ এটা (نَعْلَمُ) حَالٌ হয়েছে। যা কিছু مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ কুমন্ত্রণা দেয় যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে بِهِ -এর بَاء অতিরিক্ত অথবা তা (কে) -فِعْل مُتَعَدِّيْ করার জন্য হয়েছে। আর যমীরটি اَلْإِنْسَانُ -এর দিকে ফিরেছে। তার নাফস প্রবৃত্তি এবং আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী জানার দিক দিয়ে ঘাড়ের রগ হতে (حَبْلُ الْوَرِيْدِ) -এর মধ্যে ইযাফত بَيَانٌ -এর জন্য হয়েছে। গ্রীবাস্থিত দু'টি প্রধান রগকে وَرِيْدَانِ বলে।

١٧. إِذْ نَاصِبَهُ أُذْكُرْ مُقَدَّرًا يَتَلَقَّى يَأْخُذُ وَيُثْبِتُ الْمُتَلَقِّيَانِ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِالْإِنْسَانِ مَا يَعْمَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنْهُ قَعِيْدٌ . أَيْ قَاعِدَانِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا قَبْلَهُ .

১৭. যখন একটি উহ্য أُذْكُرْ ক্রিয়া এটাকে নসব দানকারী লিপিবদ্ধ করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে দু'জন সংগ্রহকারী–লিপিবদ্ধকারী মানুষের জন্য নিযুক্ত দুজন ফেরেশতা সে যা করে তার ডানে ও বামে উপবিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ, قَاعِدَانِ] قَعِيْدٌ একবচন, তবে দ্বিবচনের অর্থে হয়েছে। আর] قَعِيْدٌ শব্দটি مُبْتَدَأٌ এটার খবর তার পূর্বে রয়েছে।

١٨. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ حَافِظٌ عَتِيْدٌ . حَاضِرٌ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بِمَعْنَى الْمُثَنّٰى .

১৮. সে যে কোনো কথাই বলে তার নিকটে রয়েছে প্রহরী হেফাজতকারী উপস্থিত হাজির قَعِيْدٌ ও عَتِيْدٌ উভয় শব্দ দ্বিবচনের অর্থে হয়েছে।

١٩. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ غَمْرَتُهُ وَشِدَّتُهُ بِالْحَقِّ ط مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ حَتّٰى يَرَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا عِيَانًا وَهُوَ نَفْسُ الشِّدَّةِ ذٰلِكَ أَيِ الْمَوْتُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ . تَهْرُبُ وَتَفْزَعُ .

১৯. আর আসবে মৃত্যুযন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কষ্ট সত্য নিয়ে আখিরাতের বিষয়াদি এমনকি এটাকে অস্বীকারকারী স্বচক্ষে তা দেখে নিবে। আর তা হলো স্বয়ং কঠোরতা তা অর্থাৎ মৃত্যু যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে তুমি পলায়ন করতে ও ভয় করতে।

٢٠. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ط لِلْبَعْثِ ذٰلِكَ أَيْ يَوْمُ النَّفْخِ يَوْمُ الْوَعِيْدِ . لِلْكُفَّارِ بِالْعَذَابِ .

২০. আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য তা অর্থাৎ শিঙ্গার ফুৎকারের দিন প্রতিশ্রুতির দিবস কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এ দিনে।

٢١. وَجَاءَتْ فِيْهِ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى الْمَحْشَرِ مَعَهَا سَائِقٌ مَلَكٌ يَسُوقُهَا إِلَيْهِ وَشَهِيْدٌ ـ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَ الْاَيْدِيْ وَالْاَرْجُلُ وَغَيْرُهَا وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ ـ

২১. আর উপস্থিত হবে এ দিনে প্রত্যেক ব্যক্তি হাশরের ময়দানের দিকে তার সাথে থাকবে একজন পরিচালক একজন ফেরেশতা, যে তাকে তাড়িয়ে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে এবং একজন স্বাক্ষী–যে তার কার্যাবলি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তা হলো তার হাত, পা ইত্যাদি।

٢٢. لَقَدْ كُنْتَ فِي الدُّنْيَا فِيْ غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا النَّازِلُ بِكَ الْيَوْمَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ اَزَلْنَا غَفْلَتَكَ بِمَا تُشَاهِدُهُ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ حَادٌّ تُدْرِكُ بِهِ مَا اَنْكَرْتَهُ فِي الدُّنْيَا ـ

২২. আর কাফেরদেরকে বলা হবে অবশ্যই ছিলে তুমি পৃথিবীতে উদাসীনতায় লিপ্ত তা হতে [যে অবস্থা] যা তোমার উপর আজ আপতিত হয়েছে। সুতরাং আমি তোমার হতে তোমার পর্দাকে উন্মোচন করে দিলাম। আমি তোমার উদাসীনতাকে দূর করে দিয়েছি যা তুমি আজ চাক্ষুষ দেখলে তার মাধ্যমে। সুতরাং তোমার দৃষ্টি আজ খুবই তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তার দ্বারা তুমি উপলব্ধি করছ, যা তুমি দুনিয়ায় অস্বীকার করেছিলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَعْلَمُ : আল্লাহর বাণী– وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ -এর মধ্যে نَعْلَمُ - حَالٌ হয়েছে। কাজেই তা مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। যদি حَالٌ مُضَارِعْ مُثْبَتْ হয়, তা হতে ضَمِيْرٌ-ই যথেষ্ট হয়ে থাকে وَاوْ-এর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যদি وَاوْ-এর সাথে হয়, তাহলে তাকে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ বানাতে হয়। আর এ জন্যই মুফাসসির [জালালাইন গ্রন্থকার (র.)] এখানে نَعْلَمُ -এর পূর্বে نَحْنُ উহ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। –[কামালাইন]

قَوْلُهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ : আল্লাহর বাণী– مَا تُوَسْوِسُ -এর মধ্যে مَا -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. উক্ত مَا . مَصْدَرْ -এর অর্থে হবে।

২. উক্ত مَا টি مَوْصُوْلْ -এর অর্থে হবে।

আল্লাহর বাণী– مَا تُوَسْوِسُ بِهِ -এর মধ্যে "ب" কয়েকটি অর্থে হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যথা–

১. উক্ত "ب" অতিরিক্ত হবে। অর্থাৎ এখানে এর বিশেষ কোনো অর্থ নেই। শুধু বাক্যের শোভাবর্ধনের জন্য নেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, تَعْدِيَه -এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ فِعْلٌ -কে مُتَعَدِّيْ করার জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ قَعِيْدٌ : মূলত ছিল– "عَنِ الْيَمِيْنِ قَعِيْدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ" প্রথম قَعِيْد -কে বিলোপ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় قَعِيْدٌ শব্দটি قَاعِدٌ -এর অর্থে হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে قَعِيْدٌ শব্দটি مُقَاعِد -এর অর্থে হয়েছে। যেমন, جَلِيْسٌ শব্দটি مُجَالِسٌ -এর অর্থে হয়ে থাকে।

জাওহারী, আখফাশ ও ফাররা (র.) প্রমুখ নাহুবিদগণ বলেছেন– فَعِيْلٌ ও فَعُوْلٌ -এর ওজনে قَعُوْدٌ ও قَعِيْدٌ [এবং অন্যান্য শব্দাবলি] সমভাবে এক-দ্বি ও বহুবচনের জন্য হয়ে থাকে।

জালালাইনের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এখানে قَعِيْدٌ শব্দটি قَاعِدَانِ -এর অর্থে হয়েছে।

আর قَعِيْد এমন উপবেশনকারী [সঙ্গী]-কে বলে যে সর্বদা সঙ্গে থাকে- কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং কিরামুন-কাতিবুন ফেরেশতাগণও সর্বদা মানুষের সাথে থাকে। তবে স্ত্রীসহবাস [যৌন মিলন], প্রস্রাব-পায়খানার ও জানাবতের অবস্থায় যদিও দূরে সরে যায় তথাপি আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে, মানুষ কি করছে।

قَعِيْد-এর মহল্লে ই'রাব : অত্র আয়াতে قَعِيْد শব্দটি مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ হওয়ার কারণ مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ এটার খবরে মুকাদ্দাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ .... حَبْلِ الْوَرِيْدِ : ইতঃপূর্বে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন হতে পুনরুত্থান কিভাবে সংঘটিত হবে তার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদানকারীর ইলম ও কুদরতের উপর নির্ভরশীল সেহেতু প্রথম হতে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

মানুষকে আমি আল্লাহই সৃষ্টি করেছি। আর তার অন্তরে কি প্ররোচনার সৃষ্টি হয়, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে কি সব জল্পনা-কল্পনা চলে তা আমি ভালভাবেই অবগত রয়েছি। আমি তার গ্রীবার শাহরগ হতেও অধিকতর নিকটে অবস্থান করি। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতিটি কাজ ও কথা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এমনকি তার অন্তরের গভীরে যেই কুমন্ত্রণা ও কল্পনার বুদবুদ ভেসে উঠে তাও তাঁর গোচরীভূত রয়েছে। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যা জানে তারও অধিক জানা রয়েছে আল্লাহ তা'আলার।

وَرِيْد-এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ" আর আমি তার শাহরগ গ্রীবার শিরা হতেও অধিকতর নিকটবর্তী।

وَرِيْد অর্থ- প্রত্যেক প্রাণীর এমন শিরা যার মাধ্যমে গোটা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। তা কেটে দিলে প্রাণী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। একে দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

১. তা কলিজা হতে উদ্ভূত হয়ে সারা শরীরে খাঁটি রক্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তাকেই মূলত وَرِيْد বলে।
২. তা হৃদপিণ্ড হতে উদগত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম কণা সারা দেহে বিস্তৃত করে দেয়। এ প্রকার সূক্ষ্ম কণাকে রূহ বলে। প্রথম প্রকারের শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিরা সরু হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত وَرِيْد-এর দ্বারা উভয় প্রকারের শিরাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা উভয় প্রকারের শিরা দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত দু'টি অর্থের যে কোনো একটিই গ্রহণ করা হোক না কেন সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন তার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

قَوْلُهُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ : আল্লাহর বাণী وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ-এর মধ্যে قَرَابَتْ-এর দ্বারা কোন ধরনের قَرَابَتْ [সংলগ্নতা]-কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, এর দ্বারা قَرَابَةٌ بِالْعِلْمِ অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্যকে বুঝানো হয়েছে; স্থানগত নৈকট্যকে বুঝানো হয়নি।

* সুফিয়ায়ে কেরাম (র.)-এর মতে, এখানে জ্ঞানগত নৈকট্যের সাথে স্থানগত এক বিশেষ নৈকট্যকেও বুঝানো হয়েছে; যার অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও সঠিক অবস্থা আমাদের জানা নেই। যেমন কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

১. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সিজদা কর এবং আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও।
২. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

সহীহ হাদীসে আছে-

১. মানুষ সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়।
২. হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য [সান্নিধ্য] লাভ করে।

* উপরিউক্ত দুই মতের মাঝামাঝি অবস্থান করে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তৃতীয় একটি অভিমত পেশ করেছেন; তাঁর মতে আয়াতে বর্ণিত نَحْنُ-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়নি; বরং ফেরেশতাকুলকে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাগণ সর্বদা মানুষের সাথে থাকেন এবং তারা মানুষের নিজের অপেক্ষাও তাদেরকে ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত রয়েছেন।

উপরিউক্ত তিনটি অভিমতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটিই সমধিক গ্রহণযোগ্য। এর দ্বারা আল্লাহ যে, মানুষের ব্যাপারে মানুষের চাইতেও অধিক জ্ঞাত রয়েছেন, তাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানের দিক বিচারে মানুষের রূহ ও নফস হতেও তাদের অধিক নিকটবর্তী। মানুষ নিজের সম্পর্কে ততটুকু জানে না, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে জানেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো حُضُوْرِىْ পক্ষান্তরে মানুষের ইলেম হলো حُصُوْلِىْ

قَوْلُهُ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ .... رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ : ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। মানুষের সকল কাজকর্ম যদিও আল্লাহ তা'আলার ইলমে সংরক্ষিত রয়েছে তথাপি একটি দপ্তরে আমলের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– 'স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মানুষের ডানে ও বামে উপবিষ্ট দু'জন সংরক্ষণকারী ফেরেশতা যাদেরকে মানুষের কার্যাবলি সংরক্ষণ করার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তারা মানুষের কাজ-কর্ম সংগ্রহ করে এবং সংরক্ষণ করে। মানুষ যে কেনো কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য একজন সংরক্ষণকারী-সমুপস্থিত থাকে।'

এক বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণকে قَعِيْدٌ বা উপবিষ্ট বলা তাদের কোনো কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে সহীহ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যখন বসে তখন তারাও বসে। মানুষ চলতে থাকলে একজন ফেরেশতা সম্মুখে এবং অন্যজন পিছনে চলতে থাকে। মানুষ শয়ন করলে একজন মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে থাকে। অবশ্য পায়খানা-প্রস্রাব এবং স্ত্রী সহবাসের সময় তারা পৃথক হয়ে দূরে অবস্থান করে। তবে দূরে থেকেও আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ জ্ঞানের দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, 'মানুষ' কি কি করেছে। মানুষ কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করলে তাও তারা লিপিবদ্ধ করে।

ফেরেশতা কি সবকিছু লিখে, নাকি শুধু যাতে ছওয়াব ও শাস্তি রয়েছে তাই লিখে ? : আল্লাহ তা'আলা কতিপয় ফেরেশতাকে মানুষের কাজ-কর্ম রেকর্ড করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা কি মানুষের সব কাজ-কর্মই সংরক্ষণ করে, নাকি শুধু যে সকল কাজে ছওয়াব বা আজাব রয়েছে শুধু সেগুলো সংরক্ষণ করে? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরাগণ (র.) হতে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. হযরত হাসান (র.), কাতাদা (র.) ও একদল মুফাসসিরে কেরামের মতে ফেরেশতারা মানুষের প্রত্যেকটি কাজ-কর্মই সংরক্ষণ করে থাকে চাই এর সাথে ছওয়াব বা আজাব জড়িত থাকুক বা না থাকুক। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন– তারা শুধু সে সকল কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা লিপিবদ্ধ করে যার সাথে ছওয়াব অথবা আজাব জড়িত রয়েছে।

উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একটি হাদীসের উল্লেখ করত উপরিউক্ত মাযহাবদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। হাদীসখানা হলো, হযরত আলী ইবনে আবী তালহা (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রথমত প্রতিটি কথাই রেকর্ড করা হয়ে থাকে– তাতে কোনো পাপ বা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক; কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রেকর্ডকৃত বিষয়গুলো পুনঃবিবেচনা করা হয়। সুতরাং যা ছওয়াব অথবা আজাবের সাথে জড়িত তা রেকর্ড করত অবশিষ্টগুলো মুছে দেওয়া হয়। কুরআন মাজীদের অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান মুছে দেন এবং যা চান বলবৎ রাখেন। আর তাঁর নিকটই রয়েছে মূল কিতাব লিপি।

কথাবার্তায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি : ইমাম আহমদ (র.) হযরত বেলাল ইবনে হারিস মুযানী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ মাঝে মাঝে কোনো ভালো কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান। অথচ সে সাধারণ মনে করে কথাটি বলে এবং ধারণাও করতে পারে না যে, এর ছওয়াব এত প্রচুর ও ব্যাপক যে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। অপর পক্ষে মানুষ সাধারণ মনে করে কোনো মন্দ কথা বলে ফেলে। সে অনুমানও করতে পারে না যে, এর শাস্তি কত মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী, যার দরুন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

হযরত আলকামা (রা.) এ হাদীসখানা উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, এ হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা হতে বিরত রেখেছে। –[ইবনে কাসীর]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নসিহত : হযরত হাসান বসরী (র.) আল্লাহর বাণী- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ -এর আলোকে নসিহত করে বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার জন্য আমলনামা স্থাপন করা হয়েছে এবং দু জন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে। একজন রয়েছে তোমার ডান দিকে এবং অপরজন রয়েছে বাম দিকে। ডান দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা তোমার ভালো কাজ লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা মন্দ কাজ রেকর্ড করে। সুতরাং এ সত্যকে সামনে রেখে তোমার মনে যা চায় তাই কর; ভালো-মন্দ কম বেশি, যা তোমার ইচ্ছা করে। তোমার মৃত্যুর পর এ আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। কবরে এটা তোমার সাথেই থাকবে। পুনরুত্থানের দিন যখন তুমি কবর হতে বের হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে, তখন তোমার আমলনামা অনুযায়ীই তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا . اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا .

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার গ্রীবার সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিবস সে একটি আমলনামা তার সামনে খোলা অবস্থায় পাবে। [তাকে বলা হবে-] তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

হাসান বসরী (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন যিনি তোমাকেই তোমার কাজ-কর্মের হিসাবকারী নির্ধারণ করেছেন।

ফেরেশতারা কিভাবে মানুষের কাজ-কর্ম রেকর্ড করেন? : অত্র আয়াত এবং অনুরূপ অপরাপর আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণ কর্তৃক মানুষের ভালো-মন্দ সকল কাজ-কর্ম রেকর্ড করে থাকেন। বহু হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে এ রেকর্ড করা হয় তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা তা বুঝে আসে না। সুতরাং এর ব্যাপারে আল্লাহর সেই বক্তব্য যথাযথভাবে বিশ্বাস করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর অবস্থা নিয়ে ঘাটাঘাটি করা এবং এর খুঁটি-নাটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য বর্তমান যুগে সচিত্র ঘটনা বা অনুষ্ঠান রেকর্ড ধারণকারী ও চিত্রহীন বক্তব্য রেকর্ড ধারণকারী এমন কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা কল্পনাও করতে পারেননি। শরিয়তের উক্ত বিষয়াবলি বুঝতে এ সকল আধুনিক আবিষ্কার আমাদেরকে যথেষ্ট রূপে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেছে।

মোটকথা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যতটুকু জানিয়ে দিয়েছেন ততটুকু বিশ্বাস করতে হবে। এর অবস্থা ও ধরন জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তা শুধু আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিতে হবে।

قَوْلُهٗ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ...... مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ : ইতঃপূর্বে মানুষের আমল রেকর্ড করার কথা বলা হয়েছে। এরপর মূল উদ্দেশ্য কিয়ামতের আলোচনা শুরু হয়েছে। সুতরাং সর্বপ্রথম কিয়ামতের ভূমিকা তথা মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মানুষ মৃত্যুকে ভুলে বসে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়ামতকে অস্বীকার করে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- আর মৃত্যুযাতনা সত্যসহ আসবে। তখন আখিরাতের বহু বিষয় যা তোমরা অস্বীকার করতে তা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়বে। আর তা হবে সে মৃত্যু যা হতে তোমরা পলায়ন করতে, যাকে তোমরা ভয় করতে।

মৃত্যু যন্ত্রণা এসে পৌঁছলে সমস্ত সত্য মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে চাক্ষুষ ধরা দিবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ যেসব সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন, তার সত্যতা সে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। ফাসিকরা তো দুনিয়ার মহব্বতের দরুন মৃত্যুকে ভয় করে থাকে। আর মুত্তাকীগণ স্বভাবগত কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য কখনো যদি এ স্বভাবজাত ভয়ের উপর শওক ও জযবাহ প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে ভিন্ন কথা।

মোটকথা, মানুষ মৃত্যুকে পরিহার করে চলার শত চেষ্টা করেছে, তা হতে পলায়নের জন্য প্রচেষ্টার ক্রটি করেনি; কিন্তু তথাপি বিধাতার অমোঘ বিধান অনুযায়ী তা এসেই পড়েছে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ আয়াতাংশে بِالْحَقِّ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ অর্থাৎ আর মৃত্যু যাতনা সত্যসহ উপস্থিতি হবে। উক্ত আয়াতে اَلْحَقُّ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ (র.) হতে একাধিক قَوْل [অভিমত] পাওয়া যায়। যথা-

১. কেউ কেউ বলেছেন- اَلْحَقُّ -এর দ্বারা اَمْرُ الْاٰخِرَةِ তথা আখিরাতের বিষয়, যা দুনিয়ায় থাকাকালীন নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে বলেছেন। সে সময় মানুষ চাক্ষুষ তা দেখতে পাবে।

২. اَلْحَقُّ -এর দ্বারা কারো কারো মতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুযাতনা পরিশেষে মৃত্যুকে নিয়ে উপস্থিত হবে এমতাবস্থায় ب- تَعْدِيَة এর জন্য হবে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحَقِّ -এর দ্বারা দীনে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, 'সাকরাতুল মাওত' তথা মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর মানুষ দীনে ইসলামকে কবুল করবে। কিন্তু তখন তা কোনো কাজে আসবে না।

৪. কেউ কেউ বলেছেন– এখানে اَلْحَقِّ -এর দ্বারা আমলের প্রতিদানকে বুঝানো হয়েছে।

৫. কারো কারো মতে, اَلْحَقِّ -এর দ্বারা حَقِيْقَةُ الْاَمْرِ তথা প্রকৃত অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ .... سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ : ইতঃপূর্বে মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– আর পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। সেদিন কাফেরদেরকে দেওয়া আজাবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে আর সাথে একজন পরিচালক থাকবে যে তাকে পরিচালনা করে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে। আর একজন সাক্ষী থাকবে, যে তার আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় سَائِقٌ [পরিচালক] ও شَهِيْدٌ [সাক্ষী]-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, سَائِقٌ -এর দ্বারা ঐ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যে মানুষকে পরিচালিত করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাবে। আর شَهِيْدٌ -এর দ্বারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝানো হয়েছে, সেগুলো হাশরের ময়দানে মানুষের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লামা ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও যাহহাক (র.) হতে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন– سَائِقٌ ও شَهِيْدٌ -এর দ্বারা আমলের লেখক ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু شَهِيْدٌ ও سَائِقٌ দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে বুঝানো হয়নি; বরং যার পুণ্য বেশি তার সাক্ষী হবে পুণ্যের লেখক এবং পরিচালক হবে পাপের লেখক। পক্ষান্তরে যার পাপ বেশি হবে তার সাক্ষী হবে পাপের লেখক এবং তার পরিচালক হবে পুণ্যের লেখক।

قَوْلُهُ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا .... حَدِيْدٌ : কিয়ামতের দিবসে মানুষকে লক্ষ্য করে যা বলা হবে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– আজ তুমি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ দুনিয়ায় তো তুমি এ ব্যাপারে উদাসীন ও অসতর্ক ছিলে। তুমি অদ্য স্বচক্ষে যা দেখলে এ অবস্থা অবলোকন করলে তা দ্বারা আমি তোমার উদাসীনতার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ায় তুমি অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে যা উড়িয়ে দিয়েছিলে বা অস্বীকার করেছিলে তা আজ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ এবং হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছ।

দুনিয়ার আনন্দে পড়ে তো আজকের দিনকে ভুলে বসেছিলে। তোমার চোখের সামনে ছিল কু-প্রবৃত্তির চাকচিক্যের হাতছানি। পয়গাম্বর (আ.) যা বুঝাচ্ছেন তা বুঝতে না বুঝার চেষ্টাও করতে না। তোমার চোখের সামনে অন্ধকারের যে কালো ছায়া-পর্দা পড়েছিল তা সরে গিয়ে তোমার দৃষ্টিকে অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ও প্রখর করে দেওয়া হয়েছে। আজ দেখে নাও যে, নবী-রাসূলগণ (আ.) যা বলতেন– বুঝাতেন, তা সত্য ছিল কিনা?

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ الخ আয়াতে مُخَاطَبٌ কে? : অত্র আয়াত لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ -এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে– এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– অত্র আয়াতে কাফেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা কাফের দুনিয়াতে আখিরাতকে অস্বীকার করত। এটাই জমহুর মুফস্‌সিরগণের অভিমত।

২. যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন যে, এখানে لَقَدْ كُنْتَ الخ -এর দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ প্রথমে কুরআনে কারীম হতে উদাসীন বে-খবর ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা তাঁকে অবহিত করেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশভঙ্গি (سِيَاقٌ) এ মতের পরিপন্থি।

৩. আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন– অত্র আয়াতে ঈমানদার-কাফের, ফাসিক-মুত্তাকী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে– দুনিয়ায় সকল মানুষের অবস্থা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখার মতো। আর আখেরাতে জেগে থাকার মতো। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষু বন্ধ হয়ে থাকে এবং কিছুই দেখতে পায় না, তদ্রূপ আখিরাতের বিষয়াবলিও দুনিয়ায় থেকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দুনিয়ার জাগতিক চক্ষু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই প্রকৃত জাগরণ শুরু হয়ে যায়। তখন আখিরাতের সমস্ত বিষয় সামনে এসে পড়ে। এ জন্যই কেউ কউ মন্তব্য করেছেন– اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا অর্থাৎ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, মৃত্যুর পরই মূলত সে জেগে উঠবে।

অনুবাদ :

٢٣. وَقَالَ قَرِيْنُهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ هٰذَا مَا اَىِ الَّذِىْ لَدَىَّ عَتِيْدٌ حَاضِرٌ .

২৩. আর তার সাক্ষী বলবে তার সাথে নিযুক্ত ফেরেশতা এটা যা অর্থাৎ যা [এখানে مَا শব্দটি اَلَّذِىْ -এর অর্থে হয়েছে।] আমার নিকট উপস্থিত হাজির।

٢٤. فَيُقَالُ لِمَالِكٍ اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ اَىْ اَلْقِ اَلْقِ اَوْ اَلْقِيَنْ وَبِهِ قَرَأَ الْحَسَنُ فَاُبْدِلَتِ النُّوْنُ اَلِفًا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ . مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ .

২৪. অতঃপর মালিক [দোজখের দারোগা]-কে বলা হবে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর اَلْقِيَا শব্দটি اَلْقِ - اَلْقِ -এর অর্থে হয়েছে। অথবা, তা اَلْقِيَنْ -এর অর্থে হয়েছে। হযরত হাসান (র.) اَلْقِيَا -এর পরিবর্তে اَلْقِيَنْ পড়েছেন। অতঃপর ن -কে اَلِفٌ -এর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রত্যেক ঔদ্ধত কাফেরকে সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী।

٢٥. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ كَالزَّكٰوةِ مُعْتَدٍ ظَالِمٍ مُّرِيْبٍ . شَاكٍّ فِىْ دِيْنِهِ .

২৫. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ভালোকার্যে যেমন জাকাত সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারী সন্দেহকারী স্বীয় দীনের ব্যাপারে সন্দিহান।

٢٦. نِالَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ مُبْتَدَأٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ خَبَرُهُ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ . تَفْسِيْرُهُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ .

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করেছিল। এটা মুবতাদা। এটার মধ্যে শর্তের অর্থ নিহিত রয়েছে। এর খবর হলো– সুতরাং তাকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ কর– এটার ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার মতো।

٢٧. قَالَ قَرِيْنُهُ الشَّيْطَانُ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهُ اَضْلَلْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ ۢ بَعِيْدٍ . فَدَعَوْتُهُ فَاسْتَجَابَ لِىْ وَقَالَ هُوَ اَطْغَانِىْ بِدُعَائِهِ لِىْ .

২৭. তার সাথী বলবে [অর্থাৎ] শয়তান বলবে– হে আমার প্রভু! আমি তো তাকে গোমরাহ করিনি বিপথগামী করিনি তাকে বরং নিজেই সে সুদূর গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল ফলে আমি তো শুধু তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আর সে আমার ডাকে সাড়া প্রদান করেছে। আর কাফের বলবে শয়তান তার আহ্বানের মাধ্যমে আমাকে বিপথগামী করেছে।

٢٨. قَالَ تَعَالٰى لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ اَىْ مَا يَنْفَعُ الْخِصَامُ هُنَا وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ فِى الدُّنْيَا بِالْوَعِيْدِ . بِالْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ لَوْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَابُدَّ مِنْهُ .

২৮. আল্লাহ তা'আলা বলবেন আমার সম্মুখে তোমরা ঝগড়া করো না অর্থাৎ এখানে ঝগড়া-বিবাদ করলে কোনো ফায়দা হবে না। আমি তো পূর্বেই পেশ করেছিলাম তোমাদের নিকট পৃথিবীতে সতর্কবাণী আখিরাতের আজাব সম্পর্কে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ না কর তাহলে তা তোমাদের জন্য অনিবার্য হবে।

٢٩. مَا يُبَدَّلُ يُغَيَّرُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فِىْ ذٰلِكَ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ فَاُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَظَلَّامٌ بِمَعْنٰى ذِىْ ظُلْمٍ لِقَوْلِهِ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ وَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ .

২৯. কোনোরূপ রদ-বদল করা হয় না পরিবর্তন করা হয় না কথা আমার নিকট উক্ত ব্যাপারে আর আমি বান্দাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচারকারী নই যে, বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। ظَلَّامٌ শব্দটি এখানে ذِىْ ظُلْمٍ [অবিচারকারী] -এর অর্থে হয়েছে। কেননা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে। "لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ" [আজ কোনোরূপ অবিচার হবে না] এখানে মোবালাগা (مُبَالَغَةٌ) -এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ : আল্লাহর বাণী– هٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيْدٌ -এর কয়েক প্রকারের তারকীব হতে পারে। যথা–

১. هٰذَا মুবতাদা مَا নাকেরায়ে মাওসূফাহ عَتِيْدٌ হলো এর সিফাত। لَدَىَّ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে عَتِيْدٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। عَتِيْدٌ তার مُتَعَلِّقٌ ও মওসূফের সাথে মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

২. مَا নাকেরায়ে মাওসূফাহ, لَدَىَّ হলো এর প্রথম সিফাত এবং عَتِيْدٌ হলো এর দ্বিতীয় সিফাত। আর مَا -এর সিফাতদ্বয়ের সাথে যুক্ত হয়ে খবর হলো هٰذَا মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিল جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

৩. هٰذَا মুবতাদা, مَا ইসমে মওসূল, لَدَىَّ সেলাহ, مَوْصُوْلٌ ও صِلَةْ মিলে মুবতাদা, عَتِيْدٌ হলো এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়ে পুনরায় هٰذَا -এর খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

৪. هٰذَا হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ আর مَا হলো بَدْلٌ ; بَدْلٌ ও مُبْدَلٌ مِنْهُ মিলে মুবতাদা عَتِيْدٌ শব্দটি لَدَىَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

৫. هٰذَا মুবতাদা, مَا لَدَىَّ -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে। عَتِيْدٌ উহ্য মুবতাদা هُوَ -এর খবর হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ মুবতাদা ও عَتِيْدٌ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

৬. هٰذَا মুবতাদা مَا لَدَىَّ প্রথম খবর এবং عَتِيْدٌ দ্বিতীয় খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

৭. هٰذَا মুবতাদা, مَا لَدَىَّ হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ এবং عَتِيْدٌ বদল। بَدْلٌ ও مُبْدَلٌ مِنْهُ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْقِيَا : আল্লাহর বাণী– اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ -এর মধ্যস্থিত اَلْقِيَا শব্দটিকে মুফাস্‌সিরগণ (র.) বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ [তাহকীক] করেছেন।

১. اَلْقِيَا শব্দটি মূলত ছিল اَلْقِ. اَلْقِ দ্বিতীয় فِعْلٌ -কে বিলোপ করত। এর فَاعِلٌ তথা ضَمِيْر -কে فِعْلٌ -এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম فِعْلٌ -কে দ্বিবচন আনা হয়েছে। ফলে اَلْقِيَا হয়ে গেছে। এতে اَلْقِيَا ফে'লটির ضَمِيْر তথা فَاعِلٌ টি দ্বিবচন হয়েছে।

২. অথবা, তা মূলে اَلْقِيَنْ ছিল। নূন অক্ষরকে اَلِفْ -এর দ্বারা পরিবর্তন করায় اَلْقِيَا হয়ে গিয়েছে। –[জালালাইন]

৩. অথবা, মূলতই তা দ্বিবচনের সীগাহ। এখানে প্রকৃতপক্ষে شَهِيْدٌ ও سَائِقٌ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ : আল্লাহর বাণী– الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ (র.)-এর বিভিন্ন قَوْلٌ রয়েছে। যথা–

১. উক্ত আয়াতাংশটুকু মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে, আর فَاَلْقِيَاهُ الخ এর খবর হয়েছে।

২. অথবা, তা كُلٌّ হতে بَدْلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

৩. অথবা, كَفَّارٍ হতে بَدْلٌ হওয়ার দরুন مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ : আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ -এর মধ্যে ظَلَّامٌ শব্দটি মূলত مُبَالَغَةْ -এর সীগাহ। এর মূল অর্থ হলো অত্যধিক জুলুমকারী, অত্যধিক জালিম। কিন্তু এখানে مُبَالَغَةْ -এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা এখানে ذِىْ ظُلْمٍ [জুলুমওয়ালা, জালিম]-এর অর্থে হয়েছে। যেমন– لَبَّانٌ শব্দটি ذُوْ لَبَنٍ -এর অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতখানার অর্থ হবে আমি বান্দাদের উপর [মোটেই] জুলুমকারী নই।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে مُبَالَغَةْ فِى النَّفْىِ জুলুম না করার ব্যাপারে আতিশয্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিন্দুমাত্রও অবিচারী নন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– মানুষের সঙ্গী কিয়ামতের দিন বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়ায় যার সঙ্গী হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল এই সে ব্যক্তি, অদ্য আপনার দরবারে উপস্থিত, আপনি তার ফয়সালা করুন!

এখানে সঙ্গী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? : আলোচ্য আয়াত وَقَالَ قَرِيْنُهُ الخ -এর মধ্যে قَرِيْن তথা সঙ্গী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে– ঐ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম বগভী (র.) ও কতিপয় মুফাস্‌সিরে কেরামের (র.) মতে এখানে قَرِيْن দ্বারা এ সঙ্গী ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যে পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ধ্বনি হওয়ার পর মানুষকে তাড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাবে এবং আমলনামার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা মহল্লী (র.)-ও এ মতকে সমর্থন করেছেন।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কতিপয় মুফাস্‌সিরের মতে অত্র আয়াতে قَرِيْن দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াত قَالَ قَرِيْنُهُ مَا اَطْغَيْتُهُ -এর দ্বারাও এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং সে বলবে, অপরাধী উপস্থিত হয়েছে– যাকে আমি বিভ্রান্ত করে দোজখের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসছি। আমি তো তাকে শুধুমাত্র আহ্বান জানিয়েছিলাম; কিন্তু গোমরাহ তো সে নিজেই হয়েছে। স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সে বিপথগামী হয়েছে এবং কুফরিকে গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামী কাফেরদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– এ জাহান্নামী কাফেররা দুনিয়ায় সৎকার্যে বাধা দান করত, সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করত এবং দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত।

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ অর্থ– خَيْر -এর পথে বাধাদানকারী। এখানে মুফাসসিরগণ (র.) خَيْر -এর দু'টি তাফসীর উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. خَيْر -এর অর্থ– ধন-সম্পদ। এ অর্থের বিবেচনায় আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে– সে না নিজে ধান-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করত, না অন্যদেরকে দান করতে দিত। সে নিজেও জাকাত প্রদান করত না এবং অন্যদেরকেও জাকাত আদায়ে বাধা দান করত।

২. خَيْر -এর অপর অর্থ হলো 'কল্যাণ'– যাতে ঈমানও শামিল রয়েছে। এর আলোকে আয়াতখানার তাৎপর্য হচ্ছে– সে নিজেও ঈমান আনয়ন করেনি, অপরাপর কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে ও কল্যাণকর কার্যাদি পালনে বাধা প্রদান করেছে। সে ভালো কাজের কোনো উদ্যোগকেই সহ্য করত না।

কেউ কেউ বলেছেন– مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ কথাটি অলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেনি; উপরন্তু তার গোত্রের লোকদেরকেও ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করেছে।

مُعْتَدٍ অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী। مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ -এর উপরিউক্ত অর্থদ্বয়ের আলোকে مُعْتَدٍ শব্দটিরও দ্বিবিধ অর্থ হবে–

১. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ -এর অর্থ যদি জাকাত ও ধন-সম্পদ প্রদানে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে مُعْتَدٍ -এর অর্থ হবে– ওয়াজিব কাজ বর্জনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ তার ধন-সম্পদের লোভ এতটুকু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, সে সুদ গ্রহণ ও চুরি করার মাধ্যমে হারাম বস্তু গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২. আর مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ অর্থ যদি ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, তাহলে مُعْتَدٍ -এর অর্থ হবে– সে যে শুধু ঈমান গ্রহণে অস্বীকার করেছে তাই নয়; বরং তার ঔদ্ধত্য এতটুকু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের উপর নির্যাতনের স্টীম-রোলার চালিয়েছে– ঈমানদারগণকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে– মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উঠে পড়ে লেগেছে।

مُرِيْبٍ অর্থ– সংশয়কারী। এখানে এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা– ১. সংশয়কারী এবং ২. অন্যের অন্তরে সংশয় সৃষ্টিকারী। দীনের ব্যাপারে একদিকে তারা নিজেরা ছিল সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত, অপরদিকে তারা অন্যদের অন্তরেও সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস পেত। তাদের নিকট আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, রিসালত, ওহী তথা দীনের সব বিষয়াদিই ছিল সংশয়পূর্ণ। নবী-রাসূলগণ যা বলতেন কিছুই তাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো না। তাদের আশ-পাশে পরিচিতজন যারা ছিল তাদের সকলের মধ্যেই এসব ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির জন্য তারা চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করত না। সর্বদা তাদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপনের চেষ্টা চালিয়ে যেত।

তদুপরি পূর্বোক্ত আয়াতে كَفَّارٍ عَنِيْدٍ বলে বিশেষত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তার ধারণার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর এখানে নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণের উপর তারা নির্যাতন করেছে, তাঁদেরকে দীন হতে ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। পরকাল, কিয়ামত ও হাশর-নশরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে।

যেসব অপরাধ মানুষকে জাহান্নামী করে : কুরআন মাজীদে যে অপরাধসমূহকে জাহান্নামী হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে– তন্মধ্যে নিম্নোক্ত অপরাধগুলো উল্লেখযোগ্য–

১. اَلْكُفْرُ بِالْحَقِّ তথা সত্যকে অস্বীকার করা। সত্যকে গ্রহণ না করা।

২. كُفْرَانُ النِّعْمَةِ وَعَدَمِ الشُّكْرِ بِهَا তথা নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করা, শুকরিয়া আদায় না করা।

৩. وَالْحِقْدُ وَالْعَدُوُّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ তথা ঈমানদারগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ।
৪. مَنَّاعٍ لِطَرِيْقِ الْخَيْرِ وَالْفَلَاحِ তথা ভালো ও কল্যাণের পথে বাধা দেওয়া।
৫. اَلتَّعَدِّىْ فِى الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ তথা কথা ও কাজে সীমালঙ্ঘন করা।
৬. اَلظُّلْمُ عَلَى النَّاسِ তথা মানুষের উপর জুলুম করা।
৭. اَلشَّكُّ فِى اُصُوْلِ الدِّيْنِ তথা দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।
৮. اِيْقَاعُ الشُّبْهَةِ فِىْ قُلُوْبِ النَّاسِ তথা লোকদের অন্তরে [দীনের ব্যাপারে] সংশয় সৃষ্টি করে দেওয়া।
৯. اَلشِّرْكُ فِى الْعِبَادَةِ তথা ইবাদতে শিরক করা।
১০. عَدَمُ تَأْدِيَةِ حُقُوْقِ اللّٰهِ وَحُقُوْقِ الْعِبَادِ তথা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার অধিকার আদায় না করা।

قَوْلُهُ قَالَ قَرِيْنُهُ مَا اَطْغَيْتُهُ ...... ضَلَالٍ بَعِيْدٍ : কিয়ামতের দীন যখন জাহান্নামীকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে তখন তার সঙ্গী শয়তান আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করবে– হে আমার রব! আসলে আমি তো তাকে বিপথগামী করিনি; বরং সুদূর গোমরাহীতে সে নিজেই নিমজ্জিত ছিল।

এ বলে শয়তান তার অপরাধকে হালকা করতে চাবে যে, আমি তো তার উপর কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করিনি। আমি শুধুমাত্র তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। এ হতভাগা নিজেই গোমরাহ হয়ে নাজাত ও কামিয়াবীর পথ হতে দূরে সরে গিয়েছে। অপরদিকে কাফের লোকটি আরজ করবে যে, হে আল্লাহ! শয়তান আমাকে তার আহ্বানের মাধ্যমে বিপথগামী ও গোমরাহ করেছে।

কারো কারো মতে; এখানে ভাষণের প্রেক্ষিত ও বাচনভঙ্গীই বলে দেয় যে, এখানে قَرِيْن দ্বারা সে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে উক্ত ব্যক্তির সাথে নিয়েজিত থাকত। আল্লাহর আদালতে উক্ত ব্যক্তি যে, শয়তানের সাথে তর্ক-বচসায় লিপ্ত হয়েছে তাও স্পষ্ট। লোকটির আরজি হলো, এ শয়তান আমার পিছনে লেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে আমাকে পথহারা করেই ছেড়েছে। কাজেই সে-ই শাস্তিরযোগ্য। অপরদিকে শয়তানের আরজি হলো, হে রব! তার উপর তো মূলত আমার কোনোরূপ কর্তৃত্ব ছিল না, আমি মাত্র তাকে ডেকেছিলাম। যদি সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীতে লিপ্ত না হতো তাহলে তো আমার কিছুই করার ছিল না। সে তো ইচ্ছাকৃতভাবেই গোমরাহী ও আল্লাহদ্রোহিতার পথে এসেছে। সে নবী-রাসূলগণের কোনো কথাতেই কর্ণপাত করেনি। আর আমি গোমরাহীর প্রতি তার মধ্যে যে-ই মোহর সঞ্চার করে দিয়েছিলাম, তারই পিচ্ছিল পথ ধরে সে বিপথগামী হয়ে পড়েছিল। সে সরল সঠিক পথ হতে দূরে বহু দূরে সরে গিয়েছিল।

قَوْلُهُ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ .... اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ : কাফের ও তার সঙ্গী শয়তান হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে যখন পরস্পরকে দোষারোপ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন– আমার সম্মুখে তোমরা এখানে অনর্থক তর্ক-বচসা করো না। বাক-বিতণ্ডা করলে এখানে কোনোরূপ ফায়েদা হবে না। পূর্ব হতেই দুনিয়ায় তোমাদেরকে ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি কুফরি করবে-চাই কারোও কু-প্ররোচনায় পড়ে হোক অথবা আপনা-আপনি হোক তাকে জাহান্নামী হতে হবে। জাহান্নামের আজাব হতে নিস্তার লাভের কোনো পথই তার জন্য খোলা থাকবে না। কাফেরদেরকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করা হবে না। আর শয়তানকে তো ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠে না। আমার এখানে কোনোরূপ জুলুম ও অবিচার হবে না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ইনসাফ ও হিকমতের আলোকেই নেওয়া হবে। আমার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব হবে, কারো অনুরোধে তার একবিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন হবে না।

ظَلَّامٌ শব্দের অর্থ ও তার তাৎপর্য : ظَلَّامٌ শব্দের মূল অর্থ হলো অনেক বড় জালিম। এর তাৎপর্য এ নয় যে, আমি আমার বান্দাদের জন্য জালিম তো বটেই, তবে বহু বড় জালিম নই; বরং এ কথার তাৎপর্য হলো, আমি যদি সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী হয়ে নিজেরই লালিত-পালিত সৃষ্টির উপর জুলুম করি, তাহলে আমি কার্যত বহু বড় জালিম হয়ে যাব। এ কারণে আমি আমার বান্দাদের উপর আদৌ কোনো জুলুম করি না। তবে আমি তোমাদেরকে যে শাস্তি দিচ্ছি এটা ঠিক সেই শাস্তি যার জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যতটা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তার এক রত্তি পরিমাণ বেশি শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। আমার বিচারালয় নিরপেক্ষ আদালত। যে লোক প্রকৃতই শাস্তি পাবার যোগ্য নয়; তাকে সে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না এবং কেউ তা পেতেও পারে না। যার এ শাস্তি পাওয়ার উপযোগিতা অকাট্য ও সংশয়-সন্দেহ বিমুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়নি, সে শাস্তি তাকে কক্ষনো দেওয়া হবে না।

অনুবাদ :

٣٠. يَوْمَ نَاصِبُهُ ظَلَّامٍ نَقُوْلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ اِسْتِفْهَامُ تَحْقِيْقٍ لِوَعْدِهِ بِمَلْئِهَا وَتَقُوْلُ بِصُوْرَةِ الْاِسْتِفْهَامِ كَالسُّؤَالِ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ . اَىْ فِىْ لَا اَسَعُ غَيْرَ مَا امْتَلَأْتُ بِهِ اَىْ قَدِ امْتَلَأْتُ .

৩০. সেদিন তার নসবদাতা হলো ظَلَّامٍ আমি বলব نَقُوْلُ শব্দটি ى ও ن উভয়ের সাথে হতে পারে। [অর্থাৎ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ ও وَاحِدْ مُذَكَّرْ দু'ভাবেই পড়া যায়] জাহান্নামকে, তুমি কি পুরামাত্রায় ভর্তি হয়ে গেছ? জাহান্নামকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ প্রশ্ন করা হবে। আর জাহান্নাম বলবে প্রশ্নাকারে জানতে চাইবে আরো কিছু বাকি আছে নাকি? অর্থাৎ যা কিছু ভর্তি করা হয়েছে তদপেক্ষা অধিক ধারণের ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছি।

٣١. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ مَكَانًا غَيْرَ بَعِيْدٍ مِنْهُمْ فَيَرَوْنَهَا .

৩১. আর জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে নিকটবর্তী করা হবে মুত্তাকীগণের স্থানের দিক দিয়ে অদূরে তাঁদের হতে। সুতরাং তারা তা দেখতে পাবে।

٣٢. وَيُقَالُ لَهُمْ هٰذَا الْمَرْئِىُّ مَا يُوْعَدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الدُّنْيَا وَيُبْدَلُ مِنْ لِلْمُتَّقِيْنَ قَوْلُهُ لِكُلِّ اَوَّابٍ رَجَّاعٍ اِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ حَفِيْظٍ . حَافِظٍ لِحُدُوْدِهِ .

৩২. আর তাদেরকে বলা হবে এটা যা দৃশ্যমান যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল – يُوْعَدُوْنَ শব্দটি ى ও تَ উভয়যোগে পড়া যায়। [অর্থাৎ তা جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -ও হতে পারে এবং جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -ও হতে পারে। এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল] দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে রুজুকারীর জন্য। আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ হেফাজতকারী সংরক্ষণকারী -এর জন্য।

٣٣. مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ خَافَهُ وَلَمْ يَرَهُ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ مُقْبِلٍ عَلٰى طَاعَتِهِ .

৩৩. যে দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করত তাকে ভয় করেছে অথচ তাকে দেখেনি এবং আসক্ত অন্তরসহ উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য অভিমুখী অন্তরসহ।

٣٤. وَيُقَالُ لِلْمُتَّقِيْنَ اَيْضًا ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ط اَىْ سَالِمِيْنَ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ اَوْ مَعَ سَلَامٍ اَوْ سَلِّمُوْا وَادْخُلُوْا ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ حَصَلَ فِيْهِ الدُّخُوْلُ يَوْمُ الْخُلُوْدِ الدَّوَامِ فِى الْجَنَّةِ .

৩৪. মুত্তাকীগণকে আরো বলা হবে– জান্নাতে প্রবেশ কর সালাম সহকারে সকল ভয়-ভীতি হতে নিরাপদে অর্থাৎ প্রশান্তি সহকারে অথবা সালাম দাও এবং প্রবেশ কর এটা [অর্থাৎ] যে দিন জান্নাতে প্রবেশ করার ভাগ্য অর্জিত হলো অনন্তকালের দিন [অর্থাৎ] জান্নাতে তোমরা চিরদিন থাকবে।

٣٥. لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا دَائِمًا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ زِيَادَةٌ عَلٰى مَا عَمِلُوْا وَطَلَبُوْا .

৩৫. তথায় তারা যা চাইবে, তাই পাবে চিরকাল আর আমার নিকট অতিরিক্ত রয়েছে তারা যা আমল করেছে বা কামনা করেছে।

٣٦. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ اَىْ اَهْلَكْنَا قَبْلَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قُرُوْنًا اُمَمًا كَثِيْرَةً مِنَ الْكُفَّارِ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا قُوَّةً فَنَقَّبُوْا فَتَّشُوْا فِى الْبِلَادِ ط هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ . لَهُمْ اَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَجِدُوْا .

৩৬. তাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি অর্থাৎ কুরাইশ কাফেরদের পূর্বে [যুগে যুগে] বহু কাফের জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। শক্তির অধিকারী ছিল। তারা ভ্রমণ করে ফিরত অনুসন্ধান করে ফিরত শহরে শহরে কোনো আশ্রয়স্থল পাওয়া গিয়েছিল কি? তাদের জন্য অথবা অন্যদের জন্য মৃত্যু হতে আত্মরক্ষার। না, তারা পায়নি।

٣٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَذِكْرٰى لَعِظَةً لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ عَقْلٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ اِسْتَمَعَ الْوَعْظَ وَهُوَ شَهِيْدٌ . حَاضِرٌ بِالْقَلْبِ .

৩৭. আর নিশ্চয় তাতে উল্লিখিত বিষয়ে অবশ্যই নসিহত রয়েছে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অন্তর রয়েছে আকল রয়েছে। অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত রেখেছে মনোযোগের সাথে উপদেশ শ্রবণ করেছে এমতাবস্থায় যে, সে উপস্থিত নিবিষ্ট চিত্তে উপস্থিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَقُوْلُ : আল্লাহর বাণী نَقُوْلُ-এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর কারীগণ جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ-এর সীগাহ হিসেবে نَقُوْلُ পড়েছেন।

২. নাফে' ও আবূ বকর প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন يَقُوْلُ অর্থাৎ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ দ্বারা।

৩. হযরত হাসান (র.) পড়েছেন– اَقُوْلُ ، (وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ)

৪. ক্বারী আ'মাশ (র.) পড়েছেন– يُقَالُ (وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ مَجْهُوْل)

قَوْلُهُ يُوْعَدُوْنَ : আল্লাহর বাণী– يُوْعَدُوْنَ-এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ تُوْعَدُوْنَ (ت-এর সাথে) جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ হিসেবে পড়েছেন।

২. হযরত ইবনে কাছীর (র.) পড়েছেন–يُوْعَدُوْنَ (جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ)

قَوْلُهُ غَيْرَ بَعِيْدٍ : আল্লাহর বাণী –غَيْرَ بَعِيْد-এর মধ্যস্থিত غَيْر শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে। এর مَنْصُوْب হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা–

* এখানে غَيْر শব্দটি ظَرْف হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

* অথবা, حَالٌ হওয়ার কারণে তা مَنْصُوْب হয়েছে।

* অথবা, مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ-এর সিফত হওয়ার দরুন مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : আল্লাহর বাণী– لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٌ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এর- هٰذَا পূর্ববর্তী لِكُلِّ اَوَّابٍ الخ অথবা। হয়েছে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হওয়ার কারণে بَدَل হতে لِلْمُتَّقِيْنَ পূর্ববর্তী لِكُلِّ اَوَّابٍ الخ খবর হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ : আল্লাহর বাণী –وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ-এর মধ্যে بِالْغَيْبِ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা–

* হয়তো তা مَفْعُوْلٌ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ– خَافَ الرَّحْمٰنَ حَالَ كَوْنِهٖ غَائِبًا অর্থাৎ আল্লাহকে না দেখে ভয় করেছে।

* অথবা, فَاعِلٌ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ– خَافَ اللّٰهَ تَعَالٰى حَالَ كَوْنِهٖ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে সে আল্লাহকে ভয় করেছে।

قَوْلُهُ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ : আল্লাহর বাণী- اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ-এর মধ্যস্থিত بِسَلَامٍ শব্দটির মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. بِسَلَامٍ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা مَفْعُوْلٌ হতে হাল হবে। অথবা, اُدْخُلُوْا-এর যমীর হতে হাল হবে।

২. এটা مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হবে। এমতাবস্থায় بَا শব্দটি مَعَ-এর অর্থে হবে।

قَوْلُهُ مَحِيْصٍ : আল্লাহর বাণী- وَهُوَ شَهِيْدٌ-এর মধ্যে مَحِيْصٍ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। কেননা তা খবর হয়েছে। আর "مِنْ" অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। هَلْ নাবোধক প্রশ্নের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ شَهِيْدٌ : আল্লাহর বাণী- وَهُوَ شَهِيْدٌ বাক্যটি جُمْلَهْ حَالِيَهْ [অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য] হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ ...... مِنْ مَزِيْدٍ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দোজখের কি অবস্থা হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন- আমি কিয়ামতের দিন দোজখকে লক্ষ্য করে বলব- তুমি কি পূর্ণমাত্রায় ভর্তি হয়ে গেছ? তখন জাহান্নাম জবাবে বলবে- هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟ অর্থাৎ আরো অতিরিক্ত [বাকি] আছে নাকি? দোজখের এ জবাবের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. হে রব! আর কোনো দোজখী আছে নাকি, থাকলে দাও। আমার উদর ভর্তি হয়নি। বর্ণিত আছে যে, দোজখ এত বিশাল হবে যে, দোজখীদের দ্বারা এর উদর পূর্ণ হবে না। সে রাগে-ক্ষোভে ফোঁস ফোঁস করতে থাকবে এবং আরো দোজখী চাইবে। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলে তা হালকা করতে চাবেন। তার জবাব পাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কদম দোজখের উপর রাখবেন তখন দোজখ দেবে যাবে, সংকীর্ণ হয়ে পড়বে এবং ব্যস! ব্যস!! [যথেষ্ট হয়েছে] বলতে থাকবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

২. هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟-এর অন্য অর্থ হচ্ছে- জাহান্নাম বলবে যে, আরো অধিক আছে নাকি? অর্থাৎ আমার মধ্যে তো আর অধিক ধারণ ক্ষমতা নেই। আমার সম্পূর্ণ উদর কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) এ মতই সমর্থন করেছেন। সুতরাং অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ "অবশ্যই আমি জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব।" সুতরাং আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে কিনা? তা জাহান্নাম হতে জানার জন্য এবং তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এরূপ জিজ্ঞাসা করবেন।

قَوْلُهُ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : ইতঃপূর্বে জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে- এখানে জান্নাত ও জান্নাতীগণের অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকট নিয়ে আসা হবে। আর দৃশ্যমান সে জান্নাতকে লক্ষ্য করে মুত্তাকীদেরকে সম্বোধন করত বলা হবে যে, এটা সেই জান্নাত দুনিয়ায় থাকাকালীন এমন সব লোকের জন্য যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি বেশি বেশি রুজুকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষাকারী তথা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাবলি পালনকারী ছিল। কাজেই আজ তারাই এর হকদার হবে, তারা এতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। চিরদিন তারা এ জান্নাতের সুখ-সম্ভোগে মত্ত থাকবে, কখনো তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না।

এখানে اَوَّابٌ-এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের মতামত : আলোচ্য اَوَّابٌ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যথা-

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আতা (র.) প্রমুখ বলেছেন, এখানে اَوَّابٌ-এর দ্বারা তাসবীহ পাঠকারীকে বুঝানো হয়েছে।
* হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) শা'বী (র.) ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে اَوَّابٌ এমন লোককে বলে, যে নির্জনে নিজের গুনাহ খাতা স্মরণ করে এবং তা হতে তওবা করে ও আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।
* হযরত কাসেম (র.) বলেছেন- اَوَّابٌ হলেন এমন ব্যক্তি যে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকেন।
* হযরত আবূ বকর আবরাক (র.) বলেছেন- যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে তাকে اَوَّابٌ বলে।
* হযরত হাকাম ইবনে কুতাইবা (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে আল্লাহ তা'আলার জিকির করে, তাকে اَوَّابٌ বলে।

* হযরত যাহহাক (র.) ও একদল আলেমের মতে যে ব্যক্তি গুনাহ্ করা মাত্রই আল্লাহর দিকে রুজু করে- কখনো কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করতে মোটেই বিলম্ব করে না, তাকে أَوَّابٌ বলে।
* হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসার পূর্বে এবং মজলিস হতে উঠার পর ইস্তেগফার করে, তাকে أَوَّابٌ বলে।

হাদীস শরীফে আছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মজলিস হতে উঠার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা ঐ মজলিসে কৃত তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি পূত-পবিত্র, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি। তোমার দিকে রুজু করছি।"

অত্র আয়াতে حَفِيظٌ -এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের অভিমত : আলোচ্য আয়াতে حَفِيظٌ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে-
* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন- আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের হেফাজতকারীকে حَفِيظٌ বলে।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি এটাকে [আল্লাহর বিধি-নিষেধকে] হেফজ [স্মরণ] করে রাখে তাকে حَفِيظٌ বলে।
* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লাহ তা'আলার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, তাকে বলে حَفِيظٌ বলে।
* হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপদেশকে কবুল করে এবং তার সংরক্ষণ করে তাকে حَفِيظٌ বলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে চার রাকাত ইশরাকের নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে সে-ই হলো أَوَّابٌ ও حَفِيظٌ -

قَوْلُهُ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ .... مُنِيبٍ : এখানে জান্নাতীগণের কতিপয় গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে- তারাই জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করবে, যারা দয়াময় আল্লাহকে ভয় করেছে- অথচ কখনো তাকে দেখেনি। আর তারা আল্লাহর প্রতি আসক্ত- আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী অন্তঃকরণসহ তার দরবারে হাজির হয়েছে। আজকের দিনের সকল কল্যাণ ও সাফল্য একমাত্র তাদের জন্যই রয়েছে।

জালালাইন গ্রন্থকার (র.) خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ -এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন- خَافَهُ وَلَمْ يَرَاهُ অর্থাৎ সে আল্লাহকে দেখেনি। তথাপি তাকে ভয় করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে না সে দেখেছে আর না ইন্দ্রিয় দ্বারা তাকে উপলব্ধি করেছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে ভয় করেছে- তার নাফরমানি করেনি। যদিও আল্লাহ তা'আলাকে দেখেনি। তথাপি আল্লাহর ভয়ে সদা সে তার নাফরমানি হতে বিরত থাকত। অবশ্যই আল্লাহকে রহমান দয়াময় হিসেবে জানত বলে তাঁর রহমত ও মাগফেরাতের আশাও করত। এ জন্যই হাদীসে আছে- اَلْإِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ অর্থাৎ আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি হলো ঈমান।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর তাফসীরে লিখেছেন যে, خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ -এর অর্থ হলো, নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। এমন স্থানে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ তাকে দেখতে পায় না, সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে গুনাহের কার্য হতে বিরত থাকেন। হাদীস শরীফে আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো- رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে। আর তখন [আল্লাহর ভয়ে] তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু পড়তে থাকে। আয়াতের অপরাংশ হলো وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ অর্থাৎ আর সে আল্লাহর প্রতি আসক্ত অন্তর সহকারে উপস্থিত হয়েছে। مُنِيبٌ শব্দটি إِنَابَةٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ হলো- রুজু করা, প্রত্যাবর্তন করা। জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন- رَجَّاعٌ إِلَى طَاعَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী, যে সমস্ত আনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে কবুল করেছে।

কারো করো মতে, قَلْبٌ مُنِيبٌ বলতে এমন একটি অন্তরকে বুঝানো হয়েছে যা সর্বদিক হতে ফিরে এক আল্লাহর দিকেই ঘুরে যায়। জীবনভর যত প্রতিকূল অবস্থার সাথে তাকে সংগ্রাম করতে হোক না কেন, সে অন্তর সর্বাবস্থায়ই সেদিকে ঘুরে যায় এবং বারবার তাই করে। এরূপ অন্তরকেই 'আল্লাহ-আসক্ত অন্তর' বলা যায়।

আবূ বকর আররাক (র.) বলেছেন, قَلْبٌ مُنِيبٌ -এর নিদর্শন হলো; আল্লাহ তা'আলার উপলব্ধিকে সদা-সর্বদা চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত রাখে। সকল প্রকার কু-প্রবৃত্তিকে পরিহার করত আল্লাহ তা'আলার সামনে অবনত মস্তকে হাজির থাকে। আর এরূপ কাল্‌বের অধিকারীর জন্যই রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা।

কাফের ও ঈমানদার একই স্থানে হওয়া সত্ত্বেও মুত্তাকীনকে খাস করার অর্থ : স্থান হিসেবে ঈমানদার এবং কাফের উভয়ই

সমান। সে হিসেবে জান্নাত কাফেরদেরও নিকটে হতে পারে। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাত মুত্তাকীন লোকদের নিকটবর্তী হবে। এ বিশিষ্টতার ফায়দা বা তাৎপর্য কি?

আল্লাহর বাণী- أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ-এর অর্থ হলো- জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। আয়াতে বর্ণিত নৈকট্যের অর্থ যদি স্থানগত নৈকট্য হতো, তাহলে উপরিউক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত হতো। কিন্তু এটা শুধুমাত্র ঈমানদার লোকদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মূলত জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের দূরত্ব দূর করে দেওয়া হবে। এ কথাটি বুঝার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, দু'জন লোক যদি একটি ঘরে থাকে, যার নিকটে আরো একটি ঘর রয়েছে যা ঐ দু'জনের একজনের জন্য অতি নিকটে, আর অপরজনের জন্য তুলনামূলকভাবে কিছুটা দূরে। ধরুন যে দু'জনের মধ্যে একজনের উভয় পা কাটা অন্যজনের উভয় পা ভালো সে দৌড়াতেও সক্ষম। তারা উভয়ে যদি ঐ ঘরটির দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু নিতে চায় তাহলে যার পা নেই তার জন্য ঐ ঘর নিকটে হয়েও অতিদূরে। অনুরূপ জান্নাত জাহান্নামীদের অতি নিকটে হয়েও দূরে। কেননা তাদের সৎকর্ম ও নেক আমল না থাকার কারণে তারা পঙ্গু। উপরন্তু ঈমানদার লোকেরা নেক আমলের মাধ্যমে তার নিকট পৌঁছতে পারবে তা তাদের নিকটেই মনে হবে। কেননা নেক আমলের কারণে তারা পঙ্গু নয়। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[তাফসীরে কাবীর]

জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করার অর্থ কি? : আল্লাহর বাণী وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الخ-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকটবর্তী করা হবে। মুফাস্সিরগণ (র.) এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

* জান্নাতকে তার মূল স্থান হতে স্থানান্তর করত কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো সর্বশক্তিমান- তাঁর জন্য এটা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। এমতাবস্থায় اُدْخُلُوْهَا الخ-এর অর্থ এই নয় যে, এখনই চলে যাও; বরং এর দ্বারা ওয়াদা ও সুসংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য।
* হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীদেরকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ الخ অর্থাৎ এ সেই জান্নাত, দুনিয়ায় তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
* কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে জান্নাতকে নিকটবর্তী করা মূলত উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জান্নাতীগণের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে দিবেন। জান্নাতবাসীরা জান্নাতকে অতি নিকটে দেখতে পাবে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের উচ্চ মর্যদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, উপরে জান্নাত-জাহান্নাম এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের যে অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ঐ লোকের জন্য নসিহত ও উপদেশ রয়েছে যে মনোযেগের সাথে তা শ্রবণ করে এবং নিবিষ্ট চিত্তে তা উপলব্ধি করে।

জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) شَهِيْدٌ-এর তাফসীরে বলেছেন- حَاضِرٌ بِالْقَلْبِ অর্থাৎ অন্তরকে হাজির করে শ্রবণ করে।

কামালাইন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, حُضُوْرِ قَلْبِ-এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা-

* সাধারণ স্তর হলো, পাঠ করার সময় আদেশাবলি ও নিষেধাবলির ধ্যান করবে।
* এর বিশেষ স্তর হলো, মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির রয়েছি। তিনিই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এখানে জান্নাতীগণের যেসব গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে : আলোচ্য আয়াত কয়টিতে জান্নাতীগণের নিম্নোক্ত গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে-

* اَلتَّقْوٰى لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা আল্লাহর ভয় থাকা।
* اَلرُّجُوْعُ وَالتَّوْبَةُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى তথা আল্লাহর দিকে রুজু করা ও তওবা করা।
* حَافِظٌ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী তথা আল্লাহর আদেশাবলি ও নিষেধাবলি মান্যকারী হওয়া।
* صَاحِبُ الْقَلْبِ الْمُنِيْبِ তথা আল্লাহর প্রতি আসক্ত অন্তঃকরণের অধিকারী হওয়া।
* اَلْاِعْتِقَادُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّهٗ رَحْمٰنٌ তথা আল্লাহ তা'আলা যে দয়াময়- এ আকিদা পোষণকারীহওয়া।

অনুবাদ :

٣٨. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ تَعَبٍ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ فِىْ قَوْلِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ اِسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ وَانْتِفَاءُ التَّعَبِ عَنْهُ لِتَنَزُّهِهٖ تَعَالٰى عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَلِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهٖ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

৩৮. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি আকাশমণ্ডল ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুকে [মাত্র] ছয় দিনে প্রথমদিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিবস ছিল শুক্রবার। আর আমাকে স্পর্শ করেনি কোনো প্রকার ক্লান্তি অবসাদ। ইহুদিদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা শনিবারে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা হতে ক্লান্তি ও কষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টের গুণাগুণ হতে পবিত্র। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও অনান্যদের মধ্যে কোনোরূপ সাদৃশ্য নেই; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন কিছু করতে চান তখন তাকে বলেন, হয়ে যাও! আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে যায়।

٣٩. فَاصْبِرْ خِطَابٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّكْذِيْبِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ صَلِّ حَامِدًا قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَىْ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ج اَىْ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

৩৯. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এখানে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। তার উপর তারা যা বলে অর্থাৎ ইহুদি ও অন্যান্যরা। যেমন– তারা আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে। আর আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন আল্লাহর প্রশংসাসহ সালাত কায়েম করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ ফজরের সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ জোহর ও আসরের সালাত।

٤٠. وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اَىْ صَلِّ الْعِشَائَيْنِ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ دُبُرٍ وَبِكَسْرِهَا مَصْدَرُ اَدْبَرَ اَىْ صَلِّ النَّوَافِلَ الْمَسْنُوْنَةَ عَقِبَ الْفَرَائِضِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةُ التَّسْبِيْحِ فِىْ هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ مُلَابِسًا لِلْحَمْدِ.

৪০. আর রাত্রির একাংশে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার সালাত কায়েম করুন আর সিজদাসমূহ তথা সালাতসমূহের পরেও اِدْبَارٌ শব্দটির হামযাটি হয়তো যবর বিশিষ্ট হবে তখন তা دُبُرٌ -এর বহুবচন হবে। অথবা এর হামযাটি যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় তা اَدْبَرَ -এর মাসদার হবে। অর্থাৎ ফরজসমূহের পর প্রচলিত নফল নামাজসমূহ আদায় কর। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উক্ত সময়গুলোতে প্রকৃত তাসবীহ পাঠের কথা বলা হয়েছে, যা হামদের সাথে মিশ্রিত হয়।

٤١. وَاسْتَمِعْ يَا مُخَاطَبُ مَقُوْلِيْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ هُوَ اِسْرَافِيْلُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ـ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ اَقْرَبُ مَوْضِعٍ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ اَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْاَوْصَالُ الْمُتَقَطِّعَةُ وَاللُّحُوْمُ الْمُتَمَزِّقَةُ وَالشُّعُوْرُ الْمُتَفَرِّقَةُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُنَّ اَنْ تَجْتَمِعْنَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ ـ

৪১. আর মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর হে আমার বক্তব্যের শ্রোতা! যে দিবসে আহ্বানকারী আহ্বান করবে তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.) নিকটবর্তী স্থান হতে আকাশ হতে। আর তা হলো, বায়তুল মাকদিসের পাথর- যা আকাশের সর্বাধিক নিকটবর্তী ভূমি। তিনি [ইসরাফীল (আ.)] বলবেন, হে পুরাতন হাড়সমূহ! হে ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিসমূহ! হে দীর্ণ-বিদীর্ণ মাংসসমূহ, বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন ফয়সালার জন্য একত্র হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لُغُوْبٍ : وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ আয়াতে বর্ণিত لُغُوْبٌ শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ لُغُوْبٌ শব্দের ل অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে لُغُوْبٌ পড়েছেন। হযরত আলী, তালহা, ইয়াকুব (রা.) প্রমুখ لُغُوْبٌ শব্দের ل অক্ষরের উপর ফাতহা দিয়ে لُغُوْبٌ পড়েছেন। لَغْوٌ এবং لُغُوْبٌ উভয় কেরাতেই لُغُوْبٌ শব্দটি মাসদার হবে এবং এদের অর্থও একই।

قَوْلُهُ اِدْبَارْ : وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ আয়াতে বর্ণিত اِدْبَارٌ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ دُبُرٌ -এর বহুবচন হিসেবে اِدْبَارٌ শব্দের হামযার উপর ফাতহা দিয়ে اَدْبَارٌ পড়েছেন। হযরত নাফে', ইবনে কাছীর ও হামযা (রা.) প্রথম اِدْبَارٌ শব্দের হামযার নিচে কাসরা দিয়ে اِدْبَارٌ শব্দটিকে মাসদার হিসেবে اِدْبَارٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ : وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ বাক্যটি হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হবে, যার কোনো مَحَلٌ مِنَ الْاِعْرَابِ হবে না। নতুবা وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ বাক্যটি وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ কালামে বর্ণিত خَلَقْنَا -এর نَحْنُ যমীর হতে حَالٌ হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ الخ : **শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতখানা ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল।

নবী করীম ﷺ উত্তরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা রবি ও সোমবার জমিন সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গলবারে পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন। বুধবারে গাছ-পালা, পানি ও বৃক্ষ-লতা সৃষ্ট করেছেন। বৃহস্পতিবার আসমান সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবারে তরকারাজি, সূর্য-চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবারে তিনটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ঘণ্টায় আযল, দ্বিতীয় ঘণ্টায় কল্যাণকর বিষয়াদির বিপদাপদ ও তৃতীয় ঘণ্টায় আদমকে সৃষ্টি করেছেন। আদমকে জান্নাতে থাকতে দিয়েছেন এবং ইবলীসকে নির্দেশ দিয়েছেন আদমকে সিজদা করার জন্য। আর শেষ মুহূর্তে আদমকে জান্নাত হতে বের করে নিয়ে আসলেন।

ইহুদিরা জিজ্ঞাসা করল যে, তারপর কি হলো? নবীজী ﷺ বললেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা আরশে বসলেন। তারা বলল, তোমার কথা তো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। তারা বলল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়।

قَوْلُهُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ : এ আয়াত দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. ইহুদিদের ধারণা যে, "আল্লাহ আকাশ পাতাল সবকিছু সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আরশে বসে বিশ্রাম নেন।" এটাকে খণ্ডন করার জন্য যে, এ সকল বিষয় সৃষ্টি করার ফলে আল্লাহ ক্লান্ত হননি। কোনো ধরনের ক্লান্তিই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

২. মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি হতে যে আল্লাহ তা'আলা পূত-পবিত্র তার ঘোষণা দেওয়ার নিমিত্তে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও মানুষকে এক জাতীয় ধারণা না করার জন্য। মানুষ যেমন কোনো কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা মোটেও ক্লান্ত হন না, তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যখন কোনো বস্তু সৃষ্টির মনস্থ করেন তখন كُنْ বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الخ : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করত ইরশাদ করেন– "হে হাবীব! আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির একাংশেও তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন!"

জমহুর মুফাস্সিরগণ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ -এর দ্বারা ফজরের নামাজের দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং قَبْلَ الْغُرُوْبِ -এর দ্বারা জোহর ও আসরের নামাজের দিকে আর وَمِنَ اللَّيْلِ الخ -এর দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর আল্লাহর বাণী– اِدْبَارَ السُّجُوْدِ -এর দ্বারা ফরজ নামাজসমূহের পর নফল নামাজ আদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা নামাজের পরে যে তাসবীহ পাঠ করা হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ আর রাত্রিকালে আবার তাসবীহ কর, আর সিজদায় অবনত হওয়া থেকে অবসর গ্রহণের পরও।

উপরিউক্ত আয়াতের শেষার্ধে বলা হয়েছে যে, সিজদায় অবনত হওয়া থেকে অবসর গ্রহণের পরও আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ কর। সিজদায় অবনত হওয়া দ্বারা ফরজ নামাজের কথা বুঝানো হয়েছে; কিন্তু এটা হতে অবসর গ্রহণের পরে আবার কি ধরনের তাসবীহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাফসীরকার ও মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন ধরনের মতামত বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সিজদা (سُجُوْد) দ্বারা এখানে ফরজ নামাজ বুঝানো হয়েছে এবং اِدْبَار বলে সে নফল তাসবীহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে। কেউ কউ বলেছেন, উক্ত আয়াতে যেভাবে اِدْبَارَ السُّجُوْدِ। -এর উল্লেখ করা হয়েছে এটা হতে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা ফরজ নামাজের পর নফল নামাজসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নবী করীম ﷺ এটা আদায় করে থাকতেন। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (রা.) এবং মুজাহিদ, আওযায়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, اِدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা মাগরিবের পরে দু' রাকাত সুন্নত নামাজকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম মাযহারী (র.)-এর মতে, ফরজ নামাজের পর যেসব সুন্নত নামাজ পড়ার কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, اِدْبَارَ السُّجُوْدِ। দ্বারা সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

নামাজের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে : ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের এ দীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে

না। কিন্তু প্রশ্ন হলো– তাহলে নবীর মৃত্যুর পর যে সব মানুষ দুনিয়াতে আসবেন তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত।' আমরা এর জবাবে বলব, এ দায়িত্ব সাধারণভাবে সব ঈমানদার লোক এবং বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের উপরই অর্পিত হয়েছে। দাওয়াতের এ মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করা সহজ কথা নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ; কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ কুরবানি ও আত্মোৎসর্গের পথ। যাঁরাই এ দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাঁরা অত্যন্ত বিপদ সংকুল ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাই এ পথে চলার জন্য প্রয়োজন ঈমানী ও আত্মিক শক্তি, যে শক্তি ছাড়া এ পথে চলা মোটেও সম্ভব নয়। এ শক্তি ও সামর্থ্য কিভাবে কোন পদ্ধিতিতে এবং কিসের ভিত্তিতে অর্জন করা সম্ভব হবে? তা আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন।

সত্য দীনের দাওয়াত দেওয়ার পথে যতই মর্মবিদারী ও প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দিক, চেষ্টা-প্রচেষ্টার যে ফলই লাভ হতে দেখা যাক, তা সত্ত্বেও পূর্ণ ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে সারাটি জীবন ধরে পরম সত্যের বাণী প্রচার ও বিশ্বকে পরম কল্যাণের দিকে ডাকার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা এ উপায়েই অর্জিত হতে পারে, যার কথা এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহর হামদ ও তাঁর তাসবীহ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে নামাজ। এ ছাড়া কুরআনে যেখানেই হামদ ও তাসবীহকে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তার অর্থ হচ্ছে– নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং নফল নামাজ ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর দীনের পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য এর মাধ্যমে অর্জিত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ "আর শোন, যেদিন ঘোষণাদানকারী [প্রত্যেক ব্যক্তির] নিকটস্থ স্থান হতেই ডাক দেবে।"

অর্থাৎ তোমার নিকট কিয়ামতের অবস্থাবলি হতে যা অবতীর্ণ হচ্ছে তুমি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। যেদিন আহবানকারী হযরত ইসরাফীল (আ.) অথবা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আহবান যেদিন শুনতে পাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ আহবান হলো সাধারণ আহবান, অথবা শব্দ অথবা বিকট আওয়াজ যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আওয়াজ হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইসরাফীল (আ.) ফুঁ দেবেন, আর জিবরাঈল হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকদেরকে আহবান করবেন এবং বলবেন, আল্লাহর দরবারে হিসাব দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি এসো! এ কথার ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, আহ্বানের কাজটি হাশরের ময়দানে সংঘটিত হবে।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, ইসরাফীলই হাশরের ময়দানে আহ্বান করবেন এবং তাদের অতি নিকটবর্তী স্থান হতে বলবেন, যাতে তাদের প্রত্যেকের নিকট তাঁর আহবান পৌছে। বলবেন, "হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসেব দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো!" হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে আহবান করবেন। হযরত কালবী (র.) বলেছেন, কেননা তা জমিন হতে আসমানের নিকটবর্তী স্থান অর্থাৎ বার মাইলের দূরত্ব। কা'ব বলেছেন, তা জমিন হতে মাত্র ১৮ মাইল দূরে। –[ফাতহুল কাদীর]

হযরত জাবির (রা.)-ও বলেছেন, এ আহবানকারী ফেরেশতা স্বয়ং হযরত ইসরাফীল ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নয়। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের মৃতদেরকে এ বলে সম্বোধন করবেন, "হে পঁচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসেবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।"
–[মাযহারী]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, আয়াতে দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা নিম্ন জগতকে পুনর্জীবিত করা হবে। এর নিকটবর্তী স্থানের অর্থ হচ্ছে– তখন এ আওয়াজটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে যেন মনে হবে কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, আওয়াজটি এমনভাবে শোনা যাবে যেন কেউ আমাদের কাছেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরা, এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক হতে এর দূরত্ব সমান। –[কুরতুবী]

মোটকথা, যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর এ আওয়াজ শুনতে পাবে।

٤٢. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ قَبْلَهُ يَسْمَعُونَ أَيِ الْخَلْقُ كُلُّهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ط بِالْبَعْثِ وَهِيَ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ إِسْرَافِيْلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ قَبْلَ نِدَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ ذٰلِكَ أَيْ يَوْمَ النِّدَاءِ وَالسَّمَاعِ يَوْمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْقُبُوْرِ نَاصِبُ يَوْمَ يُنَادِيْ مُقَدَّرٌ أَيْ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ .

٤٣. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيْ وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ .

٤٤. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ قَبْلَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ تَشَقَّقُ بِتَخْفِيْفِ الشِّيْنِ وَتَشْدِيْدِهَا بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِيْهَا الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ط جَمْعُ سَرِيْعٍ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ أَيْ فَيَخْرُجُوْنَ مُسْرِعِيْنَ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ فِيْهِ فَصْلٌ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ بِمُتَعَلِّقِهَا لِلْاِخْتِصَاصِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَ ذٰلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى الْحَشْرِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ الْإِحْيَاءُ بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالْجَمْعُ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ .

٤٥. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ أَيْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ تف تُجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ .

অনুবাদ :

৪২. যে দিবস এটা পূর্বোক্ত يَوْمَ হতে بَدَل হয়েছে। তারা শ্রবণ করবে অর্থাৎ সমস্ত মাখলুক সত্যের বিকট ধ্বনি পুনরুত্থানের [বিকট ধ্বনি] তা হবে ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। এ ফুৎকার তার ঘোষণা [যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] -এর পূর্বেও হতে পারে এবং পরেও হতে পারে। তা –অর্থাৎ ঘোষণা দেওয়া ও আওয়াজ শ্রবণ করার দিবস বাহির হওয়ার দিবস কবরসমূহ হতে يَوْمَ يُنَادِيْ -এর নসবদাতা [আমিল] উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম [প্রতিফল] জানতে পারবে। [যে দিন]।

৪৩. নিশ্চয় আমি জীবন দানকারী এবং মৃত্যুদানকারী আর আমারই দিকে সকলকে ফিরে আসতে হবে।

৪৪. যে দিন এটা পূর্ববর্তী يَوْمَ হতে بَدَل হয়েছে। উভয়ের মধ্যবর্তী বাক্য জুমলায়ে মু'তারিযা হয়েছে বিদীর্ণ হবে تَشَقَّقُ -এর শীন অক্ষরটি তাশদীদবিহীন এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবে পড়া যাবে। তাশদীদসহ হলে মূলত এতে দ্বিতীয় تَ -কে শীনের মধ্যে ইদগাম করা হবে। জমিন, তা হতে দ্রুত বের হয়ে আসবে তারা سِرَاعًا শব্দটি سَرِيْعٌ -এর বহুবচন। এটা উহ্য فِعْل -এর যমীর হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তখন তারা দৌড়ে দ্রুতবেগে বের হতে থাকবে। তাই হবে হাশর, যা আমার জন্য অতি সহজ হবে। এখানে সিফাতের مُتَعَلِّقْ -এর দ্বারা মাওসূফ সিফাতের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছে اِخْتِصَاصْ -এর উদ্দেশ্যে। আর এরূপ ব্যবধান ক্ষতিকর নয়। ذٰلِكَ -এর দ্বারা হাশরের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার সংবাদ অবহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশ ও আল্লাহর সমীপে পেশ করার জন্য একত্র করা।

৪৫. আমি জানি তারা যা বলে–অর্থাৎ কুরাইশ কাফেররা। আর আপনি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নন যে, তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন। এটা জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার কথা। সুতরাং আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাকে উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে। আর তারা হলেন মুমিনগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ الخ : আল্লাহর বাণী- يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ الخ -এর মধ্যে يَوْمَ শব্দটি পূর্ববর্তী يَوْمَ يُنَادِيْ হতে بَدَل হয়েছে। আর যেহেতু يَوْمَ يُنَادِيْ একটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, সেহেতু উক্ত يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ ও- مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। মূলত ছিল- يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ .... يَوْمَ يُنَادِيْ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ : আয়াতাংশে اَلْحَقِّ শব্দটি কোন অর্থ হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দটি يَقِيْن [নিশ্চয়তা] -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন তারা যখন হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার ফুৎকার সন্দেহাতীতভাবে শ্রবণ করবে।

قَوْلُهُ سِرَاعًا : আল্লাহর বাণী- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا আয়াতে سِرَاعًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা, তা একটি উহ্য فِعْل হতে حَالْ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- فَيَخْرُجُوْنَ مُسْرِعِيْنَ অর্থাৎ ফলে তারা দৌড়ে বের হয়ে আসবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ حَشْرٌ الخ : আল্লাহর বাণী- "ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ" -এর দ্বারা حَشْرٌ -এর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- اَلْاِحْيَاءُ بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالْجَمْعُ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশ ও আল্লাহর সম্মুখে পেশ করার জন্য তাদেরকে একত্র করা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ : **শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইহুদিদের একটি দল নবী কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন- হে রাসূল! আমাদেরকে যদি আখিরাত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতেন তাহলে ভালো হতো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও, যারা আমাদের সতর্কতাকে ভয় করে। -[লুবাব]

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ অর্থাৎ "যেদিন সমস্ত মানুষ হাশরের দিনের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে; তা ভূগর্ভ হতে মৃতদের আত্মপ্রকাশ লাভের দিন হবে।"

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে- সব মানুষই মহাসত্যের ব্যাপার সংক্রান্ত ডাক শুনতে পাবে। দ্বিতীয় হলো, হাশরের ধ্বনি সবাই ঠিক ঠিক ভাবেই শুনতে পাবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তাৎপর্য এ হবে যে, লোকেরা সে মহাসত্য সংক্রান্ত আহ্বানকে নিজেদের কানে শুনতে পাবে, তারা যা দুনিয়ায় মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, যা অমান্য ও অস্বীকার করার জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, আর যে বিপর্যয়ের আগাম সংবাদদাতা নবী-রাসূলগণকে তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে তাৎপর্য এই হবে যে, তারা সন্দেহাতীতভাবে ও বস্তুতই হাশরের এ ধ্বনি শুনতে পারবে; তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, এটা কিছুমাত্র বিভ্রান্তি বা ভুল বুঝার ব্যাপার নয়, এটা বাস্তবিকই হাশরেরই ধ্বনি। তাদেরকে যে হাশরের কথা বলা হয়েছিল তাই উপস্থিত হয়েছে এবং তারই ধ্বনি এখন উত্থিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহই থাকবে না।

قَوْلُهُ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- [হে নবী!] যেসব কথাবার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সেগুলোকে আমরা ভালো করেই জানি।'

রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য এ বাক্যটিতে সান্ত্বনাও রয়েছে, আর রয়েছে ধমক ও হুমকি কাফেরদের জন্য। নবী কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার সম্পর্কে এরা যেসব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে, আপনি তার কিছুমাত্র পরোয়া করবেন না। আমি সবকিছুই শুনছি, তাদের সাথে বুঝাপড়া করা আমার কাজ। কাফেরদেরকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে, আমার নবীর বিষয়ে তোমরা যেসব উক্তি করছ তার জন্য তোমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হবে। প্রত্যেকটি কথা আমি নিজেই শুনছি, তোমাদেরকেই তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আমার জ্ঞান আপনার ব্যাপারে মুশরিকদের কথা পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এটা যেন আপনাকে অস্থির করে না তোলে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا যখন পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে; আর লোকেরা তার ভেতর হতে বের হয়ে দ্রুততার সাথে চলে যেতে থাকবে।

হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় হযরত ইসরাফীল (আ.) সবাইকে আহবান করবেন।

মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেছেন– مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَتُجْرَوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে, কেউ সওয়ার হয়ে, আবার কেউ পায়ে হেঁটে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে ঐসব লোকদেরকে নসিহত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের ধমকি-হুমকিকে ভয় করে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– হে হাবীব! আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে নসিহত করুন– উপদেশ দান করুন, যারা আল্লাহর আজাবের হুমকিকে ভয় করে। অর্থাৎ আপনি ঈমানদারগণকে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করুন।

কুরআনের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ দু'ভাবে উপদেশ দান করেছেন। যথা–

১. কুরআনের বাণী শুনিয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

২. কুরআন অনুযায়ী নিজে আমল করত লোকদেরকে দেখিয়েছেন।

যদিও কুরআনের উপদেশ ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্যই তথাপি যেহেতু তা হতে ঈমানদারগণই উপকৃত হয়ে থাকে, সেহেতু তাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) অত্র আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِمَنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! যারা তোমার ধমকিকে ভয় করে এবং তোমার প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশা করে তুমি আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। হে অনুগ্রহকারী! হে দয়াময়!

سُوْرَةُ وَالذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা যারিয়াত, মক্কায় অবতীর্ণ

سِتُّوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالذّٰرِيٰتِ الرِّيَاحِ تَذْرُوا التُّرَابَ وَغَيْرَهُ ذَرْوًا مَصْدَرٌ وَيُقَالُ تَذْرِيْهِ ذَرْيًا تَهُبُّ بِهٖ .

১. শপথ ধূলি ঝাঞ্ঝার, যে বাতাস ধূলাবালি ইত্যাদিকে এলোমেলাা করে দেয়। ذَرْوًا শব্দটি মাসদার। বলা হয়– تَذْرِيْهِ ذَرْيًا অর্থাৎ বাতাস ধূলা উড়ায়।

٢. فَالْحٰمِلٰتِ السُّحُبِ تَحْمِلُ الْمَاءَ وِقْرًا ثِقْلًا مَفْعُوْلُ الْحَامِلَاتِ .

২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের। যে মেঘ পানি বহন করে। وِقْرًا শব্দটি اَلْحَامِلَاتِ -এর মাফউল।

٣. فَالْجٰرِيٰتِ السُّفُنِ تَجْرِيْ عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ يُسْرًا لا بِسُهُوْلَةٍ مَصْدَرٌ فِيْ مَوْضِعِ الْحَالِ اَيْ مَيْسَرَةً .

৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের, যে নৌকা পানি বুক চিড়ে চলাচল করে, সহজতার সাথে। يُسْرًا শব্দটি মাসদার حَالٌ -এর স্থান অর্থাৎ এমতবস্থায় যে, তা ধেয়ে চলে/ দ্রুত চলে।

٤. فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا الْمَلَائِكَةِ تُقَسِّمُ الْاَرْزَاقَ وَالْاَمْطَارَ وَغَيْرَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ .

৪. শপথ বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ বান্দাদের রিজিক ও শহরে বৃষ্টি বণ্টন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত।

٥. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ اَيْ اِنَّ وَعْدَهُمْ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ لَصَادِقٌ . لَوَعْدٌ صَادِقٌ .

৫. তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এখানে مَا টা مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ পুনরুত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য সত্য অঙ্গীকার।

٦. وَاِنَّ الدِّيْنَ الْجَزَاءَ بَعْدَ الْحِسَابِ لَوَاقِعٌ ط لَا مُحَالَةَ .

৬. আর কর্মফল দিবস হিসাব নিকাশের পর আমলের প্রতিদান দেওয়া অবশ্যম্ভাবী।

٧. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ جَمْعُ حَبِيْكَةٍ كَطَرِيْقَةٍ وَطُرُقٍ اَيْ صَاحِبَةِ الطُّرُقِ فِي الْخِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِي الرَّمْلِ .

৭. শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন طُرُقٌ শব্দটি طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেই আকাশ সৃষ্টিগতভাবেই রাস্তা বিশিষ্ট। যেমন বালুর মধ্যে রাস্তা হয়ে থাকে।

٨. اِنَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ فِيْ شَاْنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ لا قِيْلَ شَاعِرٌ سَاحِرٌ كَاهِنٌ شِعْرٌ سِحْرٌ كَهَانَةٌ .

৮. তোমরা তো হে মক্কাবাসী! হুজুর ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কবি, জাদুকর ও জ্যোতিষী আর কুরআন সম্পর্কে বলা হয় এটা কবিতা, জাদু ও জ্যোতির্বিদ্যা।

٩. يُؤْفَكُ يُصْرَفُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ اَىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ مَنْ اُفِكَ ط صُرِفَ عَنِ الْهِدَايَةِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৯. সে ব্যক্তিই তা পরিত্যাগ করে নবী করীম ﷺ ও কুরআনকে অর্থাৎ এ বিষয়ে ঈমান আনয়ন করতে যে সত্যভ্রষ্ট যাকে আল্লাহর ইলমে হেদায়েত হতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

١٠. قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ لُعِنَ الْكَذّٰبُوْنَ اَصْحَابُ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ .

১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা বিভিন্ন উক্তিকারী মিথ্যাবাদীরা অভিশপ্ত ও লানতপ্রাপ্ত হোক।

١١. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ جَهْلٍ يَغْمُرُهُمْ سَاهُوْنَ لا غَافِلُوْنَ عَنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ .

১১. যারা অজ্ঞ যাদেরকে অজ্ঞতা ডুবিয়ে রেখেছেন ও উদাসীন অর্থাৎ আখিরাতের কর্মের ব্যাপারে গাফিল।

١٢. يَسْـَٔلُوْنَ النَّبِيَّ اِسْتِهْزَاءً اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ اَىْ مَتٰى مَجِيْئُهٗ .

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে নবী কারীম ﷺ -কে বিদ্রূপের স্বরে কর্মফল দিবস কবে হবে? অর্থাৎ সেটা কখন আসবে?

١٣. وَجَوَابُهُمْ يَجِيْئُ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ اَىْ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهَا .

১৩. তাদের জবাব হলো– কর্মফল দিবস সেদিন আসবে, যেদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে। অর্থাৎ তাতে শাস্তি প্রদান করা হবে।

١٤. وَيُقَالُ لَهُمْ حِيْنَ التَّعْذِيْبِ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط تَعْذِيْبَكُمْ هٰذَا الْعَذَابُ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ فِى الدُّنْيَا اِسْتِهْزَاءً .

১৪. তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় বলা হবে– তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। পৃথিবীতে উপহাসছলে বিদ্রূপ করে।

١٥. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ لا تَجْرِىْ فِيْهَا .

১৫. সেদিন নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকবেন প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। যে প্রসবণ তাতে প্রবাহিত হবে।

١٦. اٰخِذِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِىْ خَبَرِ اِنَّ . مَاۤ اٰتٰىهُمْ اَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ ط مِنَ الثَّوَابِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ اَىْ دُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ مُحْسِنِيْنَ . فِى الدُّنْيَا .

১৬. উপভোগ করবে তা এটা خَبَرُ اِنَّ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন পুণ্য হতে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে পৃথিবীতে

١٧. كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ . يَنَامُوْنَ وَمَا زَائِدَةٌ وَيَهْجَعُوْنَ خَبَرُ كَانَ وَقَلِيْلًا ظَرْفٌ اَىْ يَنَامُوْنَ فِىْ زَمَنٍ يَسِيْرٍ مِنَ الَّيْلِ وَيُصَلُّوْنَ اَكْثَرَهٗ .

১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতেন নিদ্রায়। এখানে يَهْجَعُوْنَ টা يَنَامُوْنَ অর্থে, আর مَا হলো অতিরিক্ত। আর يَهْجَعُوْنَ হলো كَانَ -এর খবর আর قَلِيْلًا হলো ظَرْفٌ অর্থাৎ রাতের স্বল্প অংশই শয়ন করতেন এবং অধিকাংশ অংশে নামাজ পড়তেন।

١٨. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ـ

১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তারা বলতেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا [হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন!]

١٩. وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ الَّذِيْ لَا يَسْاَلُ لِتَعَفُّفِهِ ـ

১৯. তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক। مَحْرُوْمٌ হলো সে ব্যক্তি যে প্রার্থনা থেকে পবিত্র থাকার লক্ষ্য প্রার্থনা করে না। [যার ফলে সে বঞ্চিত থেকে যেত।]

٢٠. وَفِي الْاَرْضِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْاَشْجَارِ وَالثِّمَارِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا ـ اٰيٰتٌ دَلَالَاتٌ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَوَحْدَانِيَّتِهِ لِلْمُوْقِنِيْنَ لا

২০. ধরিত্রীতে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, ফল-ফলাদি তরুলতা ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতায় দিক নির্দেশনা। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।

٢١. وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ط اٰيَاتٌ اَيْضًا مِنْ مَبْدَاِ خَلْقِكُمْ اِلٰى مُنْتَهَاهُ وَمَا فِيْ تَرْكِيْبِ خَلْقِكُمْ مِنَ الْعَجَائِبِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ذٰلِكَ فَتَسْتَدِلُّوْنَ بِهٖ عَلٰى صَانِعِهٖ وَقُدْرَتِهٖ ـ

২১. এবং তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, তোমাদের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্যজনক বস্তু রয়েছে। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? ফলে তোমরা তা দ্বারা তার সৃষ্টি ও ক্ষমতার উপর প্রমাণ পেশ করে থাকো।

٢٢. وَفِي السَّمَاۤءِ رِزْقُكُمْ اَيِ الْمَطَرُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ النَّبَاتُ الَّذِيْ هُوَ رِزْقٌ وَمَا تُوْعَدُوْنَ مِنَ الْمَاٰبِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ اَيْ مَكْتُوْبٌ ذٰلِكَ فِي السَّمَاۤءِ ـ

২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক অর্থাৎ বৃষ্টি যা উদ্ভিদ গজানোর কারণ যাতে রয়েছে তোমাদের জীবিকা। ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু প্রত্যাবর্তন, পুণ্য ও শাস্তি হতে অর্থাৎ এগুলো আকাশে লিখিত রয়েছে।

٢٣. فَوَرَبِّ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ اَيْ مَا تُوْعَدُوْنَ لَحَقٌّ مِثْلَ مَاۤ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ـ بِرَفْعِ مِثْلُ صِفَةٌ وَمَا مَزِيْدَةٌ وَبِفَتْحِ اللَّامِ مُرَكَّبَةٌ مَعَ مَا الْمَعْنٰى مِثْلَ نُطْقِكُمْ فِيْ حَقِيْقَتِهٖ اَيْ وَمَعْلُوْمِيَّتِهٖ عِنْدَكُمْ ضَرُوْرَةَ صُدُوْرِهٖ عَنْكُمْ ـ

২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! এই সকল অর্থাৎ যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে অবশ্যই তোমাদের বাক স্ফূর্তির মতোই সত্য। مِثْل শব্দটি رَفْع-এর সাথে (حَقٌّ)-এর সিফত এবং مَا টা হলো অতিরিক্ত এবং (مِثْل)-এর لَامْ যবরের সাথে مَا-এর সাথে مُرَكَّبْ আর অর্থ এই- তোমাদের সাথে যার অঙ্গীকার করা হয় তা বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে এরূপই যেমন তোমাদের কথাবার্তা বলা সত্য। অর্থাৎ যেভাবে তোমাদের নিকট তোমাদের কথাবার্তা জ্ঞাত হওয়াটা সুনিশ্চিত ও ইয়াকীনী, এই কথাবার্তা তোমাদের থেকে চাক্ষুষ প্রকাশ হওয়ার কারণে। [এভাবে তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারও সত্য।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالذَّارِيَاتِ : এখানে وَاوْ টি হলো قَسَمِيَّةٌ আর ذَارِيَاتٌ এটা ذَرِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– যা উড়িয়ে দেয়, এলোমেলো করে দেয়। এর মওসূফ اَلرِّيَاحُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَلرِّيَاحُ الذَّارِيَاتُ [এলোমেলোকারী বায়ু] এটা ذَرَى يَذْرُوْ ذَرْوًا অথবা ذَرَى يَذْرِىْ ذَرْيًا হতে নির্গত যা مُعْتَلْ لَامْ وَاوِىْ বা يَائِىْ আর اَلذَّرِيَاتُ হলো مُقْسَمٌ بِهٖ

قَوْلُهُ ذَرَى يَذْرِىْ ذَرْيًا : এর দ্বারা এটা مُعْتَلْ لَامْ يَائِىْ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَهُبُّ بِهٖ : এটা অর্থ বর্ণনা করার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বায়ু এটাকে উড়িয়ে দেয়। এলোমেলো করে দেয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ : আল্লামা মহল্লী (র.) مَا -কে- مَصْدَرِيَّةٌ বলেছেন, অর্থাৎ وَعْدٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- اِنَّ وَعْدَكُمْ لَوَعْدٌ صَادِقٌ

قَوْلُهُ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ : হলো مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ আর اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ হলো مَعْطُوْفٌ এখন মা'তূফ আলাইহি এবং মা'তূফ মিলে جُمْلَةٌ হয়ে جَوَابُ قَسَمٍ হয়েছে। আবার এখানে اِنَّمَا -এর- مَا -কে- مَوْصُوْلَةٌ -ও বলা যেতে পারে। আর تُوْعَدُوْنَ এটা বাক্য হয়ে সেলাহ আর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ بِهٖ আর সব মিলে جُمْلَةٌ হয়ে ان -এর- اِسْمٌ আর لَصَادِقٌ হলো اِنَّ -এর খবর। আর اِنَّ হলো হরফে মুশাবাহ বিল ফে'ল।

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ : এখানে وَاوْ টা قَسَمِيَّةٌ جَارَّةٌ অর্থ اُقْسِمُ আর اَلسَّمَاءُ হলো মওসূফ اَلْحُبُكُ হলো সিফত। সিফত ও মওসূফ মিলে جُمْلَةٌ হয়ে جَوَابُ قَسَمٍ

قَوْلُهُ حُبُكٌ : এটা حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন طَرِيْقَةٌ টা طُرُقٌ -এর বহুবচরন। অর্থ রাস্তা, পানির তরঙ্গ, বাতাসের কারণে বালুতে পতিত চিহ্ন। আবার কেউ কেউ حُبُكٌ -কে- حِبَاكٌ -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন مُثُلٌ এটা مِثَالٌ -এর বহুবচন, حَبِيْكَةٌ এবং حِبَاكٌ তারকারাজির পথ অতিক্রম করাকেও বলা হয়। –[ই'রাবুল কুরআন, লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ فِى الْخِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِى الرَّمْلِ : এই ইবারত বৃদ্ধির উপকারিতা হলো এই যে, আকাশের পথ গুলো خِيَالِىْ এবং مَعْنَوِىْ নয়; বরং তা مَحْسُوْسِىْ এবং مَوْجُوْدٌ فِى الْخَارِجِ হয়ে থাকে। যদিও বহু দূরে অবস্থানের কারণে চোখে দেখা যায় না।

قَوْلُهُ يُوْفَكُ عَنْهُ : এটা اُفُكٌ মাসদার হতে মুযারে মাজহূলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ– ফিরানো হয়, বিপথগামী করা হয়, প্ররোচিত করা হয়।

قَوْلُهُ صُرِفَ عَنِ الْهِدَايَةِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى : এই ইবারত বৃদ্ধি করণ দ্বারা উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের সমাধান করা–

প্রশ্ন : يُوْفَكُ مَنْ اُفِكَ দ্বারা বুঝা যায় যে, যে পথভ্রষ্ট তাকে পথভ্রষ্ট করা হবে। আর এটা تَحْصِيْلِ حَاصِلْ কে আবশ্যক করে, কেননা যে বিপথগামী তাকে বিপথগামী করার কোনো অর্থ হয় না।

উত্তর : যে আল্লাহর عِلْمِ اَزَلِىْ -তে বিপথগামী, তাকে বাস্তবে ও প্রকাশ্যে বিপথগামী করা হবে।

বালাগাত : قَوْلُهُ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ : قُتِلَ -এর হাকীকী অর্থ হলো হত্যা করা; কিন্তু এখানে اِسْتِعَارَهْ -এর ভিত্তিতে অভিসম্পাত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এভাবে যে, مَفْقُوْدُ الْحَيَاتِ -কে- مَفْقُوْدُ السَّعَادَةِ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এটা اِسْتِعَارَهْ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে।

مَفْقُوْدُ السَّعَادَةِ হলো مُشَبَّهٌ আর مَفْقُوْدُ الْحَيَاةِ হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ ; মুশাব্বাহ বিহী যদিও উহ্য কিন্তু مُشَبَّهٌ بِهٖ -এর- لَوَازِمْ -এর মধ্য থেকে হত্যাকে مُشَبَّهٌ -এর জন্য প্রমাণিত করে দিয়েছে। এটা اِسْتِعَارَهْ تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ এটা قُتِلَ الْكَذَّابُوْنَ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ বদ দোয়ার অর্থে। خَرّٰصُوْنَ অর্থ– অনুমান কারী, মিথ্যা বক'ওয়াজ কারী। এটা خَرَّاصٌ -এর বহুবচন, خَرْصٌ হতে মুবালাগার সীগাহ।

قَوْلُهُ غَمْرَةٌ : غَمْرَةٌ অর্থ– গভীর পানি যার তলদেশ দেখা যায় না। এখানে জ্ঞান বেষ্টনকারী অজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ : এখানে اَيَّانَ হলো খবরে মুকাদ্দাম আর يَوْمُ الدِّيْنِ হলো মুবতাদা মুয়াখখার।

قَوْلُهُ مَتٰى مَجِيْئُهُ : এটা أَيَّانَ -এর তাফসীর مَجِيْئُهُ উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আর উহ্য মুযাফ নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে।

প্রশ্ন : أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ এটা মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন। আর يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ হলো প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টিই زَمَانٌ আর زَمَانٌ -এর উত্তর زَمَانٌ দ্বারা দেওয়া যায় না। زَمَانٌ -এর উত্তর حَدَثٌ দ্বারা হয়। মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই مَجِيْئُهُ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে زَمَانٌ -এর জবাব اَخْبَارٌ بِالزَّمَانِ দ্বারা হয়ে যায়।

প্রশ্ন : أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ -এর মধ্যে সময়ের নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, আর উত্তর হলো يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ যা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, যা ঠিক হয়নি।

উত্তর : মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন যেহেতু জানা ও বুঝার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল উপহাসছলে ও বিদ্রূপাত্মক। এ কারণেই প্রকৃত জবাবের পরিবর্তে صُوْرَةً জবাব দিয়েছেন, যাতে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সমতার সৃষ্টির হয়। يَوْمَ শব্দটি يَجِيْئُ উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। هُمْ হলো মুবতাদা আর يُفْتَنُوْنَ হলো খবর, আর عَلٰى টা فِىْ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : يُفْتَنُوْنَ -এর সেলাহ্ عَلٰى কেন আনা হলো?

উত্তর : يُفْتَنُوْنَ যেহেতু يُعْرَضُوْنَ -এর অর্থের অধীন তাই يُفْتَنُوْنَ -এর সেলাহ عَلٰى আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَجْرِىْ فِيْهَا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নে উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর বাণী- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ দ্বারা জানা যায় যে, মুত্তাকীগণ ঝরনায় থাকবেন। অথচ ঝরনায় হওয়ার বা থাকার কোনোই অর্থ হয় না। মুফাসসির (র.) تَجْرِىْ فِيْهِ বলে এরই উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের সার হলো মুত্তাকীগণ এমন বাগানে অবস্থা করবেন যাতে প্রবহমান ঝরনা থাকবে।

قَوْلُهُ اٰخِذِيْنَ : এটা اِنَّ -এর উহ্য খবরের যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- كَائِنُوْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ حَالَ كَوْنِهِمْ اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ

قَوْلُهُ مِنَ الثَّوَابِ : এটা مَا -এর বয়ান يَهْجَعُوْنَ এটা هُجُوْعٌ হতে রাতের নিদ্রা যাওয়াকে বলা হয়।

قَوْلُهُ وَبِالْاَسْحَارِ : এটা يَسْتَغْفِرُوْنَ -এর مُتَعَلِّقٌ এবং بَاءٌ টা فِىْ অর্থে اَلْاَسْحَارِ এটা سَحَرٌ -এর বহুবচন। রাতের শেষ ষষ্ঠাংশকে বলা হয়। আর يَسْتَغْفِرُوْنَ -এর يَهْجَعُوْنَ হয়েছে عَطْفٌ -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যারিয়াত প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় তিনটি রুকু, ষাট আয়াত, ৩৬০টি বাক্য ১২৮৭ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার সকল বন্ধু তার অনুগত থাকবে এবং তার রিজিক বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা ক্বাফে হাশরের কথা বলা হয়েছে এবং দলিল দ্বারা হাশরের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও হাশর, তাওহীদ এবং নবুয়তের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা ক্বাফের পরিসমাপ্তিতে হাশরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেই শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে হাশরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গী : সূরা ক্বাফে হাশরের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলিল প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তা করে না। তাদেরকে যে পন্থায় বোঝানো হলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেই পন্থাই আলোচ্য সূরার অবলম্বন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব জাতির মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একটি বিরাট গুণ ছিল, তার মিথ্যাবাদিতাকে অপছন্দ করতো, বিশেষত শপথ করে মিথ্যা বলাকে তারা ভীষণ অন্যায় মনে করতো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে শপথ করে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্যে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে কোনো কথা বলতো, তবে তার সত্যতায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

মূলত এ কারণেই আলোচ্য সূরার শুরুতে কয়েকটি জিনিসের শপথ করে কিয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এমন বস্তুসমূহের শপথ করা হয়েছে, যা কিয়ামতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। যথা– ১. اَلذَّارِيَاتُ ذَرْوًا ২. اَلْحَامِلَاتُ وِقْرًا ৩. اَلْجَارِيَاتُ يُسْرًا এবং ৪. اَلْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا

আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আলী মোর্তাযা (রা.)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

ذَارِيَاتْ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حَامِلَات وِقْرًا -এর শাব্দিক অর্থ– বোঝাবাহী। অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جَارِيَاتُ يُسْرًا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مُقَسِّمَات اَمْرًا -এর অর্থ– সেই সব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিজিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বণ্টন করে। –[ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে মনসুর]

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ : حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُكٌ বলা হয়। অনেক তাফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে حُبُكٌ -এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই– اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ; বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত এবং কখনো উম্মাদ, কখনো জাদুকর, কখনো কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে। তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তির' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারণ করে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ : اُفُكٌ -এর শাব্দিক অর্থ– মুখ ফেরানো। عَنْهُ-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। যথা–

১. এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।
২. এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٌ مُّخْتَلِفٌ [বিভিন্ন উক্তি] বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পারস্পরিক বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কুরআন ও রাসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قَوْلُهُ قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ : خَرَّاصٌ -এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক উক্তিকারী। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে। –[মাযহারী]

কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেজগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ : ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ : يَهْجَعُوْنَ শব্দটি هُجُوْعٌ থেকে উদ্ভূত এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জারীর এই তাফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেজগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে مَا শব্দটি 'না'-বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোনো অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা.)-এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।

-[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর বর্ণনামতে আহনাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই যে- আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছে না। কারণ তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশি করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। আল্লাহর রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্তও পৌছে না এবং আল্লাহর রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথেও খাপ খায় না। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কুরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে-

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا অর্থাৎ যারা ভালোমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আব্দুর রহামান ইবনে যায়েদ (রা.) বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল, হে আবূ উসামা, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন [অর্থাৎ كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ], আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জবাবে বললেন-

طُوْبٰى لِمَنْ رَقَدَ اِذَا نَعَسَ وَاتَّقَى اللّٰهَ اِذَا اسْتَيْقَظَ অর্থাৎ তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করে না। -[ইবনে কাসীর]

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না: বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সেও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

অর্থাৎ লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামাজ পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ : রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফজীলত : অর্থাৎ মুমিন পরহেজগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। اَسْحَارٌ শব্দটি سَحْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফজিলত অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ; সহীহ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন [কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না]। তিনি ঘোষণা করেন, কোনো তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করবে? কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? -[ইবনে কাসীর]

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহেজগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে?

জবাব এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার আধ্যাত্ম্য জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সত্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহর মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ : سَائِلٌ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজখবর নেয়।

বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামাজ ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হন না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেন। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানান না। কিন্তু কুরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকির ও মিসকিনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকিরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে [পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে]। অতঃপর মুমিন পরহেজগারদের অবস্থা, গুণাবলি ও উচু মর্তবা বর্ণনা করা। এখন আবার কাফের ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়া নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লিখিত اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কুরআন ও রাসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوْقِنِيْنَ-এর অর্থ আগের مُتَّقِيْنَ -ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহর নিদর্শনাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। যেমন–

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র রয়েছে। এমনিভাবে ভূ-পৃষ্ঠের নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

قَوْلُهُ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ : এ স্থলে নিদর্শনাবলির বর্ণনায় আকাশ ও শূন্যজগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তি সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহর কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে

কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা মানবীয় বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সুক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য একটি জমাট রক্ত তৈরি হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরি করা হয়। এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়াার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুখী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেযাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়, স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশি জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَفِى السَّمَاۤءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ : অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে মাহফূযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিজিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিজিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করার ও চেষ্টা করে তবে রিজিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিজিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে রিজিক অর্থ বৃষ্টি অর্থ হলো- বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্যজগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوْعَدُوْنَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَاۤ اَنْتُمْ تَنْطِقُوْنَ : অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবর্তা বলার মাধ্যমে কোনো সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত; এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরিউক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণ ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে; কিন্তু বাকশক্তিতে কখনো কোনো ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। -[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٢٤. هَلْ اَتٰـكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ وَهُمْ مَلٰئِكَةٌ اِثْنَا عَشَرَ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ جِبْرِيْلُ ـ

২৪. আপনার নিকট এসেছে কি? নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত তারা হলেন ১২ জন বা ১০ জন বা তিনজন ফেরেশতা, তাদের মধ্যে হযরত জিবরীল (আ.)-ও ছিলেন।

٢٥. اِذْ ظَرْفٌ لِحَدِيْثِ ضَيْفٍ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط اَىْ هٰذَا اللَّفْظَ قَالَ سَلٰمٌ ج اَىْ هٰذَا اللَّفْظَ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ لَا نَعْرِفُهُمْ قَالَ ذٰلِكَ فِىْ نَفْسِهِ وَهُمْ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مُقَدَّرٍ اَىْ هٰؤُلَاءِ ـ

২৫. যখন اِذْ টা حَدِيْثُ ضَيْفٍ -এর ظَرْف হয়েছে তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। অর্থাৎ এই 'সালাম' শব্দটি। উত্তরে তিনি বললেন, 'সালাম' অর্থাৎ এই শব্দটি। এরা তো অপরিচিত লোক। আমি তাদেরকে চিনি না। তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] এটা মনে মনে বললেন, এটা হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰؤُلَاءِ

٢٦. فَرَاغَ مَالَ اِلٰى اَهْلِهِ سِرًّا فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ وَفِىْ سُوْرَةِ هُوْدٍ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ اَىْ مَشْوِيٍّ ـ

২৬. অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) গোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা নিয়ে আসলেন। সূরা হূদে রয়েছে- بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ তথা ভূনা গো-বৎস নিয়ে এলেন।

٢٧. فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ـ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْاَكْلَ فَلَمْ يُجِيْبُوْا ـ

২৭. ও তাদের সামনে রাখলেন এবং বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? তিনি তাদের সম্মুখে খাবার উপস্থাপন করলেন; কিন্তু তারা এতে সাড়া দিল না।

٢٨. فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ فِىْ نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ذِىْ عِلْمٍ كَثِيْرٍ هُوَ اِسْحَاقُ كَمَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ هُوْدٍ ـ

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হলো অর্থাৎ স্বীয় হৃদয়ের গহীনে ভয় অনুভব করলেন। তারা বললেন, ভীত হবেন না আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। এবং তারা তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। অনেক জ্ঞানের অধিকারী পুত্রের। তিনি হলেন হযরত ইসহাক (আ.) যেমনটি সূরা হূদে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٩. فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ سَارَةُ فِىْ صَرَّةٍ صَيْحَةٍ حَالٌ اَىْ جَاءَتْ صَائِحَةً فَصَكَّتْ وَجْهَهَا لَطَمَتْهُ وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ لَمْ تَلِدْ قَطُّ وَعُمْرُهَا تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ سَنَةً وَعُمْرُ اِبْرَاهِيْمَ مِائَةُ سَنَةٍ اَوْ عُمْرُهٗ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً وَعُمْرُهَا تِسْعُوْنَ سَنَةً ـ

২৯. তখন তাঁর স্ত্রী আসল হযরত সারা (আ.) চিৎকার করতে করতে فِىْ صَرَّةٍ এটা حَال হয়েছে। অর্থাৎ চিৎকার রত অবস্থায় আসল। এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে? যে কখনো সন্তান প্রসব করেনি, আর তাঁর বয়স হয়েছে ৯৯ বছর। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স একশত বৎসর। অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ১২০ বছর আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ৯০ বছর।

٣٠. قَالُوْا كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ قَوْلِنَا فِى الْبِشَارَةِ قَالَ رَبُّكِ ط اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ الْعَلِيْمُ بِخَلْقِهٖ.	৩০. তারা বললেন, এরূপই অর্থাৎ আমাদের সুসংবাদের মতোই আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময় স্বীয় কর্মে সর্বজ্ঞ স্বীয় সৃষ্টির ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ : এখানে هَلْ টা আগ্রহ দেওয়া হৃদয়ের আকর্ষণ সৃষ্টির করা ও এই ঘটনার মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য এসেছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, এখানে هَلْ টা قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন- আল্লাহর বাণী- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ -এর মধ্যে هَلْ টা قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খেদমতে মেহমান হিসেবে আগত ফেরেশতার সংখ্যা তিনের অধিক ছিল, যা ضُيُوْف তথা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। অথচ এখানে ضَيْف তথা এক বচনের শব্দ উল্লেখ কর্‌্যার কারণ কি?

উত্তর : ضَيْف হলো মাসদার। আর মাসদার এক বচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় এবং এটা تَثْنِيَةْ ও جَمْعْ হয় না। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهٗ اِذْ دَخَلُوْا : কেউ কেউ বলেন, اِذْ دَخَلُوْا টা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف আর সেটাই তাতে নসব দিয়েছে। আবার কেউ কেউ حَدِيْث-কে عَامِلْ মেনেছেন। অর্থাৎ- هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُهُمُ الْوَاقِعُ فِيْ وَقْتِ دُخُوْلِهِمْ عَلَيْهِ

আবার কেউ কেউ اَلْمُكْرَمِيْنَ-কে نَاصِبْ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) আগত মেহমানদেরকে সম্মান করেছিলেন।

قَوْلُهٗ فَقَالُوْا سَلَامًا : এখানে سَلَامًا হলো مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ-এর নসব দানকারী ফে'ল سَلَّمْتُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ سَلَامًا অথবা سَلَّمْتُ سَلَامًا মাসদার যা ফে'লের প্রতিনিধিত্ব করছে; এজন্যই তার ফে'লকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ سَلَامٌ : হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে বললেন سَلَامٌ ; এখানে سَلَامْ টা نَكِرَهْ হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। কেননা ثُبَاتْ এবং دَوَامْ-এর উপর বুঝানোর জন্য رَفْعْ-এর দিকে পরিবর্তন করেছে। যাতে করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সালাম মেহমানদের সালাম থেকে উত্তম হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ فَاَوْجَسَ : তিনি পেলেন, অনুভব করলেন, এটা اِيْجَاسْ থেকে مَاضِىْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। اِيْجَاسْ এর অর্থ হলো অন্তরে অনুভব করা। হৃদয়ে গোপন বা অস্পষ্ট আওয়াজ আসা। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهٗ اَضْمَرَ فِىْ نَفْسِهٖ : শুধুমাত্র অর্থ বর্ণনার জন্যই এটাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ صَرَّةٌ : কঠিন চেচামেচিকে صَرَّةٌ বলা হয়। صَرِيْرُ الْبَابِ অর্থ- দরজার আওয়াজ। صَرِيْرُ الْقَلَمِ অর্থ- কলমের দ্বারা লেখার খশখশানি আওয়াজ।

اَقْبَلَتْ صَائِحَةً অর্থ হলো- جَاءَتْ صَائِحَةً অর্থাৎ চিৎকার করতে করতে আসল।

আবার কেউ কেউ اَقْبَلَتْ-এর অনুবাদ করেছেন اَخَذَتْ দ্বারা। অর্থাৎ হযরত সারা (আ.) চিৎকার করা আরম্ভ করেছিলেন। এটা اَقْبَلَتْ شَتَمَنِىْ-এর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ তুমি আমাকে গালি দেওয়া আরম্ভ করে দিলে।

قَوْلُهُ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا : হযরত সারা (আ.) এই বার্ধক্যজনিত অবস্থায় সন্তানের সুসংবাদ শুনে অতিশয় আশ্চার্যান্বিত হয়ে স্বীয় মুখ ঢেকে ফেললেন قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ অর্থ হলো- أَنَا عَجُوزٌ عَقِيْمٌ فَكَيْفَ أَلِدُ আমি তো অতিশয় বন্ধ্যা বৃদ্ধা আমি কিভাবে সন্তান জন্ম দিব?

قَوْلُهُ كَذَالِكَ : এটা উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ- قَالَ قَوْلًا مِثْلَ ذَالِكَ الَّذِىْ قُلْنَا অর্থাৎ তিনি এরূপই বলেছেন, যেরূপ আমরা বললাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ : **হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মেহমানগণের ঘটনা :** হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট মানব রূপ ধারণ করে কয়েকজন ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন এবং একটি বাছুর ভাজা করিয়ে তাদের সম্মুখে পরিবেশন করলেন। কিন্তু এত সুস্বাদু খাদ্য মেহনদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তারা নিস্ক্রীয় ছিলেন। খাবারের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন, মেহমানগণ যদিও মানব রূপ ধারণ করছেন, প্রকৃত অবস্থায় তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা।

ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান লাভ করেবেন । অদূরেই তাঁর স্ত্রীর দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি এ সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কেননা তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধা, তার জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন, এটি আমাদের কথা নয়; বরং পরাক্রমশালী, মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা। তাই এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ফেরেশতাগণ যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ.

অর্থাৎ "[হে রাসূল!] ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা আপনার নিকট পৌঁছেছে কি"?

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মেহমান তথা ফেরেশতাগণের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা.) এবং আতা (র.) বলেছেন, ফেরেশতাগণের সংখ্যা ছিল তিনজন। আর তাঁরা হরেন- হযরত জিবরাঈল.(আ.) মিকাঈল (আ.) এবং ইস্রাফীল (আ.)।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র.) বলেছেন, ফেরেশতাগণের সংখ্যা ছিল আটজন, হযরত জিবরাইল (আ.) সহ আরো সাতজন।

যাহহাক (র.) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন নয় জন, মোকাতিল (র.) বলেছেন, বার জন ফেরেশতা ছিলেন।

সুদ্দী (র.)-এর মতে, তাঁরা ছিলেন ১১ জন। তারা অল্প বয়স্ক ছেলেদের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন। তাদের চেহারা ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন। এটি নবী-রাসূলগণের তরিকা। হযরত রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার কর্তব্য হলো মেহমানের আপ্যায়ন করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর নিকট আরজ করল, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, খাবার খাওয়ানো এবং সালাম দেওয়া পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত।

আলোচ্য আয়াতে مُكْرَمِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো সম্মানিত, কেননা তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা আর ফেরেশতাগণ নিঃসন্দেহে সম্মানিত। আলোচ্য আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গাম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَالُوْا سَلَامًا ـ قَالَ سَلَامٌ : ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ; হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাবে বললেন- سَلَامٌ ; কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কুরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জবাব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও! হযরত ইবরামীম (আ.)-এর এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْلُهُ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ : مُنْكَرٌ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামের গুনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গুনাহকেও مُنْكَرٌ বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন, এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

قَوْلُهُ رَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ : رَاغَ শব্দটি رَوْغٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। **প্রথমত** এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেননি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই জবাই করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। **দ্বিতীয়ত,** আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না। বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। **তৃতীয়ত,** আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না; বরং বলেছেন- اَلَا تَأْكُلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

قَوْلُهُ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ : অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোনো মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশঙ্কা করা হতো। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়িতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশঙ্কার কারণ ছিল।

قَوْلُهُ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ : صَرَّةٌ-এর অর্থ হলো অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صَرِيْرٌ বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন- كَذٰلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজটি এমনিভাবে হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স একশ বছর ছিল। -[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٣١. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شَاْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ .

৩১. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিশেষ কাজ কি?

٣٢. قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۙ كَافِرِيْنَ اَىْ قَوْمُ لُوْطٍ .

৩২. তারা বললেন, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের প্রতি।

٣٣. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ۙ مَطْبُوْخٍ بِالنَّارِ .

৩৩. তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা, আগুনে পোড়ানো।

٣٤. مُّسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً عَلَيْهَا اِسْمُ مَنْ يَرْمِىْ بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظَرْفٌ لَهَا لِلْمُسْرِفِيْنَ بِاِتْيَانِهِمُ الذُّكُوْرَ مَعَ كُفْرِهِمْ .

৩৪. যা চিহ্নিত অর্থাৎ যে কঙ্কর দ্বারা যাকে ধ্বংস করা হবে তাতে তার তার নাম লিপিবদ্ধ করা ছিল। আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে عِنْدَ رَبِّكَ এটা مُسَوَّمَةً -এর জন্য ظَرْف হয়েছে সীমালঙ্ঘন-কারীদের জন্য তাদের কুফরির সাথে সাথে পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার কারণে।

٣٥. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا اَىْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج لِاِهْلَاكِ الْكَافِرِيْنَ .

৩৫. সেথায় অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের জনপদে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম কাফেরদেরকে বিনাশ সাধন করার জন্য।

٣٦. فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ج وَهُمْ لُوْطٌ وَابْنَتَاهُ وُصِفُوْا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ اَىْ هُمْ مُصَدِّقُوْنَ بِقُلُوْبِهِمْ عَامِلُوْنَ بِجَوَارِحِهِمِ الطَّاعَاتِ .

৩৬. আর সেথায় আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোনো আত্মসমর্পণকারী পাইনি। আর তারা হলো হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দু কন্যার সন্তানগণ। পরিবারবর্গের ঈমান এবং ইসলামের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা স্বীয় হৃদয়ের গহীন থেকে সত্যায়নকারী এবং স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আনুগত্যের উপর আমলকারী।

٣٧. وَتَرَكْنَا فِيْهَآ بَعْدَ اِهْلَاكِ الْكَافِرِيْنَ اٰيَةً عَلَامَةً عَلٰى اِهْلَاكِهِمْ لِلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ط فَلَا يَفْعَلُوْنَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ .

৩৭. আমি তাতে রেখেছি কাফেদেরকে ধ্বংস করার পর একটি নিদর্শন তাদের ধ্বংসের উপর একটি চিহ্ন যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য। যেন তারা তাদের মতো অপকর্ম না করে।

٣٨. وَفِى مُوْسَى مَعْطُوْفٌ عَلَى فِيْهَا الْمَعْنٰى وَجَعَلْنَا فِىْ قِصَّةِ مُوْسٰى اٰيَةً اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ مُتَلَبِّسًا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ -

৩৮. এবং নিদর্শন রেখেছি হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্তে এর আতফ হলো فِيْهَا -এর উপর অর্থ হলো আমি হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতেও নিদর্শন রেখেছি যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

٣٩. فَتَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِرُكْنِهٖ مَعَ جُنُوْدِهٖ لِاَنَّهُمْ لَهٗ كَالرُّكْنِ وَقَالَ لِمُوْسٰى هُوَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -

৩৯. তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল ঈমান থেকে ক্ষমতার দম্ভে তার সৈন্য সামন্তসহ কেননা তারা তার জন্য স্তম্ভের মতো ছিল। এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল যে, তিনি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।

٤٠. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ طَرَحْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ الْبَحْرِ فَغَرِقُوْا وَهُوَ اَىْ فِرْعَوْنُ مُلِيْمٌ اٰتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِنْ تَكْذِيْبِ الرُّسُلِ وَدَعْوَى الرُّبُوْبِيَّةِ -

৪০ সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম ফলে ডুবে মরল সেতো ছিল অর্থাৎ ফেরাউন তিরস্কারযোগ্য অর্থাৎ এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ছিল যার কারণে তাকে তিরস্কার করা যায়, আর তা ছিল রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও রব তথা প্রতিপালক হওয়ার দাবি করা।

٤١. وَفِىْ اِهْلَاكِ عَادٍ اٰيَةٌ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ج هِىَ الَّتِىْ لَا خَيْرَ فِيْهَا لِاَنَّهَا لَا تَحْمِلُ الْمَطَرَ وَلَا تُلْقِحُ الشَّجَرَ وَهِىَ الدَّبُوْرُ -

৪১. এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের' ধ্বংসের ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে। যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; যাতে কোনোরূপ কল্যাণ ছিল না। কেননা তা বৃষ্টিকে বহন করেনি এবং বৃক্ষে ফলও উৎপাদন করেনি আর তা ছিল পশ্চিমা বায়ু।

٤٢. مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ كَالْبَالِى الْمُتَفَتِّتِ -

৪২. এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল মানুষ অথবা সম্পদ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলাম। পঁচা, বাসি ও পুরানো হাড়ের ন্যায় টুকরো টুকরো করে দিত

٤٣. وَفِىْ اِهْلَاكِ ثَمُوْدَ اٰيَةٌ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ بَعْدَ عَقْرِ النَّاقَةِ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ اَىْ اِلٰى اِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ كَمَا فِىْ اٰيَةٍ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ -

৪৩. আরো নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে তাদের ধ্বংসের মধ্যে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল উটকে বিনাশ করার পর স্বল্পকাল ভোগ করে দাও অর্থাৎ স্বীয় জীবনের সময়/হায়াত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। যেমন এ আয়াতে এসেছে- تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাড়িঘরে তিন দিন উপভোগ করে নাও!

٤٤. فَعَتَوْا تَكَبَّرُوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ اَىْ عَنْ اِمْتِثَالِهٖ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بَعْدَ مَضِيِّ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَىِ الصَّيْحَةُ الْمُهْلِكَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اَىْ بِالنَّهَارِ .

৪৪. কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে নিতে অহঙ্কার প্রদর্শন করল ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ; অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বজ্রাঘাত। এবং তারা তা দেখাতে ছিল। অর্থাৎ দিনের বেলায়।

٤٥. فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ اَىْ مَا قَدَرُوْا عَلَى النُّهُوْضِ حِيْنَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ .

৪৫. তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণের সময় তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হয়নি। এবং তা প্রতিরোধ ও করতে পারল না। তাদের ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

٤٦. وَقَوْمَ نُوْحٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى ثَمُوْدَ اَىْ وَفِىْ اِهْلَاكِهِمْ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اٰيَةٌ وَبِالنَّصْبِ اَىْ وَاَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اَىْ قَبْلَ اِهْلَاكِ هٰؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ .

৪৬. আমি ধ্বংস করেছিলাম নূহ সম্প্রদায়কে قَوْمَ نُوْحٍ -এর مِيْم বর্ণে যের সহকারে ثَمُوْدَ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে অর্থাৎ তাদেরকে আকাশের ও পৃথিবীর পানি দ্বারা ধ্বংস করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। এবং مِيْم বর্ণে যবর সহকারে অর্থাৎ আমি নূহ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। এদের পূর্বে অর্থাৎ উল্লিখিত মিথ্যাবাদীদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে তারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ : এটা একটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه যা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তরের জন্য এসেছে। মনে হয় যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর কি বললেন? উত্তর দেওয়া হলো- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

قَوْلُهٗ خَطْبُكُمْ : خَطْبٌ অর্থ হলো শান, কাহিনী, মহান বিষয় এবং গুরুত্ব পূর্ণ কাজ।

قَوْلُهٗ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ مَطْبُوْخٍ بِالنَّارِ : حِجَارَةً এটা حَجَرٌ-এর বহুবচন।

প্রশ্ন : مِنْ طِيْنٍ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা লাভ কি হয়েছে।

উত্তর: এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِحْتِمَال مَجَازِىْ-কে প্রতিহত করা। কেননা কোনো কোনো সময় حِجَارَةٌ এবং حَجَرٌ শিলাখণ্ডকেও বলা হয়। حِجَارَة-এর মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে লূত সম্প্রদায়কে শিলা খণ্ড দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। বিষয়টি এরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ এতে يَطِيْرُ-কে বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجَازٌ-এর সম্ভাবনাকে বিদূরিত করা। কেননা কোনো কোনো সময় দ্রুত ধাবমান ব্যক্তিকেও مَجَازًا তথা অপ্রকৃতরূপে طَائِر বলে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : মুসান্নেফ (র.)-এর مَطْبُوْخٌ بِالنَّارِ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : এটা একটা সংশয়ের অপনোদন যে, حِجَارَه মাটির হয় না তথাপিও এখানে মাটির পাথর কেনা বলা হলো? এখানে حِجَارَةً مِنْ طِيْنٍ দ্বারা আগুনে পোড়ানো মাটি উদ্দেশ্য। যা শক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পাথরের মতো হয়ে থাকে। এটাকে سِجِّيْل বলা হয়। এটা মূলত سنگ گل-এর আরবিকৃত। যাকে কঙ্কর বলা হয়।

قَوْلُهُ مُسَوَّمَةً : এর অর্থ হলো مُعَلَّمَةً অর্থাৎ চিহ্নিত, مُسَوَّمَةً এটা হয়তো حِجَارَةً-এর সিফত হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে অথবা حِجَارَه থেকে حَالٌ হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ عِنْدَ رَبِّكَ : এটা مُسَوَّمَةً-এর ظَرْف হয়েছে অর্থাৎ- مُعَلَّمَةً عِنْدَهُ

قَوْلُهُ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا : এখানে থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণীর সূচনা হচ্ছে পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ফেরেশতাদের কথোপকথন ছিল।

প্রশ্ন : فِيْهَا-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো লূত সম্প্রদায়ের জনপদ অথচ পূর্বে কোথাও লূত সম্প্রদায়ের জনপদের উল্লেখ নেই। এতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর : যেহেতু লূত সম্প্রদায়ের জনপদ প্রসিদ্ধ ও مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ ছিল, তাই যমীর নেওয়া সঠিক হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ مُوْسٰى : এর আতফ হলো فِيْهَا-এর উপর এবং تَرَكْنَا-এর অধীনে। যেমনটি মুফাসসির (র.) جَعَلْنَا فِىْ قِصَّةِ مُوْسٰى اٰيَةً বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি বিচক্ষণদের জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রেখে দিয়েছি।

قَوْلُهُ مَعَ جُنُوْدِه : এটা বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِرُكْنِهٖ-এর মধ্যে بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ : اَوْ টা وَاوْ অর্থেও হতে পারে। আর এটাই বেশি ভালো মনে হয়। কেননা সে হযরত মূসা (আ.) কে এই উভয় উপাধিতেই স্মরণ করত। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে ফেরাউনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে- هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ [এতো দক্ষ জাদুকর] অন্যত্র ফেরাউনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে- اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, اَوْ টা وَاوْ অর্থে হয়েছে।

অথবা او তার নিজ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্প্রদায়কে সংশয় ও অস্পষ্টতার মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া।

قَوْلُهُ وَجُنُوْدَهُ : এটাও ঠিক আছে যে, اَخَذْنَاهُ-এর মাফউলের যমীরের উপর আতফ হয়েছে এবং এটা مَفْعُوْل مَعَهُ হয়েছে আর এটাই প্রকাশ্য।

قَوْلُهُ عَقِيْمَ : عَقِيْم বলা হয় বন্ধ্যা নারীকে اَلرِّيْحَ الْعَقِيْمَ বলা হয় অকল্যাণকর বায়ুকে যা ক্ষতিকর হয়ে থাকে, যা বৃক্ষে ফল জন্মায় না এবং বৃষ্টিও বহন করে আনে না।

অধিকাংশ মুফাসসিরের ধারণা মতে এই বায়ু ছিল পশ্চিমা বায়ু। হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন- نُصِرْتُ بِالصَّبَاءِ وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ আবার কেউ কেউ দক্ষিণা বায়ুও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تُلْقِحُ : এটা اِلْقَاحٌ থেকে নির্গত। অর্থ হলো, গর্ভবতী করা। আর বাবে سَمِعَ হতে لَقِحَ অর্থ হলো- গর্ভবতী হওয়া।

قَوْلُهُ الصَّعِقَةُ : صَاعِقَه আকাশের বিজলীকেও বলা হয় এবং চেচামেচি করে চিৎকার করাকেও বলা হয়। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য, যাতে করে তা অন্য আয়াত অর্থাৎ اِنَّ عَذَابَهُمُ الصَّيْحَةُ-এর বিপরীত না হয়।

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ : এটা وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ-এর তাফসীর। অর্থাৎ সে তার ধ্বংসকারীর উপর বিজয়ী হতে পারেনি। অথবা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেনি। তবে এই অর্থ ঠিক নয়। কেননা, কেউ আল্লাহর থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না এবং বিজয় লাভ করতেও সক্ষম নয়। আল্লামা মহল্লী (র.) যদি عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ-এর পরিবর্তে وَمَا كَانُوْا دَافِعِيْنَ عَنْ اَنْفُسِهِمُ الْعَذَابَ বলতেন, তবে উত্তম হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরত করছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। হযরত লূত (আ.) সদুম, আমুরা প্রভৃতি জনপদের জন্যে নবী মনোনীত হয়েছিলেন। এ জনপদগুলো বর্তমানে জর্দানের অন্তর্ভুক্ত। জর্দানের বিখ্যাত 'মৃত সাগরের' উপকূলেই ছিল এ জনপদগুলোর অবস্থান।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর তাঁবুর দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় কয়েকজন আগন্তুক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। মেহমানদারি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাই আগন্তুকদের পরিচয় লাভের পূর্বেই তিনি তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁরা খাদ্য গ্রহণে কোনো প্রকার আগ্রহ বোধ করলেন না, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত এবং ভীত হলেন। মানবরূপী এ আগন্তুকগণ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা, আমরা আপনাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করছি। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করছিলেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, ইরশাদ হয়েছে– قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম বলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছ?

ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্নের জবাব দিলেন এভাবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

قَالُوْٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ "তারা বলেন, আমরা এক পাপিষ্ঠ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি"।

অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর জাতির প্রতি, যারা শুধু জঘন্য নিন্দনীয় কুকর্মেই লিপ্ত হয়নি; বরং এতদ্ব্যতীত তারা ছিল ডাকাত, লুটেরা, অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত, চরম নির্লজ্জ আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত লূত (আ.)-কে প্রেরণ করছিলেন; কিন্তু তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে এবং বলেছে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আজাব নিয়ে আসুন। এমন অবস্থায় হযরত লূত (আ.) দরবারে ইলাহীতে দোয়া করলেন এভাবে, "হে আমার পরওয়ারদেরগার! আমাকে এ জালেমদের জুলুম থেকে হেফাজত কর, এ জঘন্য চরিত্রহীন লোকদের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর এবং আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কর"।

আল্লাহ পাক হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করলেন। পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করাই হলো আমাদের কাজ।

حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ হলো কংকর এবং সেই জমাট মাটি, যা পাথরে রূপান্তরিত হয়, এমন প্রস্তর বর্ষণ করে তাদের শাস্তি বিধানই হলো আমাদের কর্মসূচি।

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞসা করলেন, আপনারা কোন অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আজাব নাজিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয় মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে।

قَوْلُهُ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ : অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আজাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থি নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে লূতের পর হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আ.) সত্রের পয়গাম দেন তখন বলা হয়েছে فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পরিরষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ– শক্তি। হযরত লূত (আ.)-এর বাক্যে أَوْ اٰوِيْٓ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত : হযরত লূত (আ.)-এর জাতির এ ধ্বংসলীলা, তাদের এ শোচনীয় পরিণতি অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষাণীয় দৃষ্টান্ত। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা এ পৃথিবীতে অন্যায়, অশ্লীল অমানবিক কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি এসব ক্ষেত্রে নবীর নিকাত্মীয় হওয়াও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হয় না।

قَوْلُهُ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ : যেভাবে হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায়ও পরবর্তী কালের মানুষের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তথা বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি বিরাটকায় অজগরে পরিণত হতো, যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে স্বহস্তে স্পর্শ করতেন, তখন তা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হতো। কিন্তু এসব মুজেযা দেখেও ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো, ক্ষমতার দম্ভ তার ঈমান আনয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

قَوْلُهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে সে তাঁকে জাদুকর বলেছে, আর যেহেতু ক্ষমতার দম্ভে সে আত্মহারা হয়েছিল এবং দুনিয়ার লোভে মোহে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, তাই তাওহীদের আহবানে সাড়া দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে এবং হযরত মূসা (আ.)-কে পাগল বলেছে। অথচ ক্ষমতার দম্ভে সে নিজেই হয়ে পড়েছিল নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। কেননা তার কথাতেই রয়েছে স্ববিরোধিতা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হযরত মূসা (আ.)-কে সে পাগল এবং জাদুকর বলেছে। যদি তিনি পাগল হন তবে জাদুকর কি করে হলেন? কেননা যারা জাদুকর, তারা হয় অত্যন্ত চতুর, আর যদি তিনি পাগল হন, তবে তাঁকে জাদুকর বলা যায় না। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফেরাউনের কোনো কথাই সত্য নয়।

قَوْلُهُ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيمٌ : যেহেতু ফেরাউন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর সাড়া দেয়নি, তাওহীদে বিশ্বাস করেনি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে জাদু বলে আখ্যা দিয়েছে, তাই আল্লাহ পাক তার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তাকে তার দলবলসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করেছেন, আর হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণের বরকতে বনী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করল।

قَوْلُهُ وَهُوَ مُلِيمٌ : অর্থাৎ কুফর ও নাফরমানি, দম্ভ ও অহমিকা এবং সত্যের সঙ্গে শত্রুতা পোষণের দোষে ফেরাউন ছিল অভিযুক্ত এবং তিরস্কারের যোগ্য। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন- وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ অর্থাৎ আর হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায়ও রয়েছে উপদেশ, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করি।

ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী : প্রকাশ্য দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা হলো, ফেরাউন অত্যন্ত শক্তিধর, দাম্ভিক ও জালেম নৃপতি ছিল। পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রকাশ্যে কোনো শক্তিই ছিল না, কিন্তু তাঁর নিকট ছিল সত্য, এ সত্যের দাওয়াত নিয়েই তিনি এসেছিলেন ফেরাউনের কাছে, তিনি আল্লাহ পাকের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ছিলেন ঈমানী ও রূহানী শক্তির অধিকারী, আর ফেরাউন ছিল জাগতিক শক্তির অধিকারী। জাগতিক শক্তি কখনো রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবিলা করতে পারে না। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং লোহিত সাগরে তার সমাধি ঘটেছে।

ঠিক এমনিভাবে নমরুদ জাগতিক শক্তির অধিকারী হয়েও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রুহানী শক্তির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তদ্রূপ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সকল জাগতিক শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে বারংবার মোকাবিলা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে কা'বা শরীফের ভেতর প্রবেশ করে পাঠ করেছিলেন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানি- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"[হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেওয়ারই যোগ্য"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কওমে লূত এবং ফেরাউনের পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এ ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ পাক অবাধ্য কাফেরদের ধ্বংসকে দুনিয়ার মানুষের জন্যে নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন, যাতে করে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আর একই উদ্দেশ্যে এ আয়াত থেকে আদ, সামুদ এবং নূহ জাতির শোচনীয়

পরিণতির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অর্থাৎ 'আর আদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণশূন্য বায়ু'।

اَلرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অর্থাৎ এমন বায়ু যাতে কোনো কল্যাণ থাকে না। সাধারণত বায়ু হয় বৃষ্টির বাহন, কিন্তু আদ জাতির নিকট প্রেরিত বায়ুতে ছিল না বৃষ্টি, এতে ছিল শুধু ধ্বংস। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ .

'যে কোনো জিনিসের উপরই ঐ বায়ু প্রবাহিত হয়েছে, তাকেই সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছেড়েছে.।

আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং সত্যদ্রোহিতার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ আদ জাতির ধ্বংস নেমে আসে, ঝড় এবং ঘূর্ণিবাতে দুরাত্মা কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়, আর এ আজাব আসে তাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ। এতে রয়েছে পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ : যেভাবে কওমে লূত, কওমে ফেরাউন এবং কওমে আদ -এর ধ্বংসলীলায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ পর্যায়ে সামূদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে মানবজাতির জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ

অর্থাৎ সামূদ জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারেও আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ পাক পাহাড় থেকে তাদের জন্যে একটি উষ্ট্রী বের করে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দিয়েছিলেন. কেউ যেন উষ্ট্রীটির ক্ষতিসাধন না করে। কিন্তু দুরাত্মা কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর শত বাধা সত্ত্বেও ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে। তখন হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের গৃহে তোমরা তিনদিন যাবত আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ .

কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো। হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনলো না, তিনদিন পর্যন্ত তাদের ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হলো, এরপর আল্লাহ পাকের আজাব আপতিত হলো এবং তা স্বচক্ষে তারা দেখছিল, আর তাদের গৃহেই তাদেরকে ধ্বংস করা হলো।

قَوْلُهُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ : সামূদ জাতিকে হেদায়েত করার জন্যে আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আ.) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তাই তাদের প্রতি আজাব নাজিল হলো, আর তা এত আকস্মিকভাবে আপতিত হলো যে, আজাব নাজিল হওয়ার পর তারা পলায়নের কোনো অবকাশ পায়নি, এমনকি তারা পলায়নের জন্যে দাঁড়াতেও পারেনি। আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই তারা করতে পারেনি। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আরো কিছু দিন ভোগ করে নাও, এটি ছিল তাদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, এই ভোগের সময় ছিল মাত্র তিন দিন। এরপরই তারা কোপগ্রস্ত হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আদেশ কার্যকর হয় এবং তারা তাদের নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

-[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ১২৭]

قَوْلُهُ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : "আর ইতিপূর্বে আমি নূহের জাতিকেও ধ্বংস করেছি. নিশ্চয় তারা ছিল অবাধ্য জাতি।" অর্থাৎ কওমে লূত, ফেরাউন, আদ এবং সামূদ জাতির পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকেও তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা তারা ছিল অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

অনুবাদ :

٤٧. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ بِقُوَّةٍ وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ لَهُمْ قَادِرُوْنَ يُقَالُ اٰدَ الرَّجُلُ يَئِيْدُ قَوِىَ وَاَوْسَعَ الرَّجُلُ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَقُدْرَةٍ ـ

৪৭. আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আমি এতে সক্ষম। বলা হয়- اٰدَ الرَّجُلُ يَئِيْدُ [মানুষ শক্তিশালী হয়ে গেছে] আরো বলা হয়- اَوْسَعَ الرَّجُلُ [মানুষ সুপ্রশস্ত ও ক্ষমতাবান হয়ে গেছে।]

٤٨. وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا مَهَدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ نَحْنُ ـ

৪৮. আর ভূমি আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

٤٩. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ صِنْفَيْنِ كَالذَّكَرِ وَ الْاُنْثٰى وَالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ وَالصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَالْحُلْوِ وَالْحَامِضِ وَالنُّوْرِ وَالظُّلْمَةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ بِحَذْفِ اَحَدِ التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ خَالِقَ الْاَزْوَاجِ فَرْدٌ فَتَعْبُدُوْنَهٗ ـ

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু مِنْ كُلِّ شَيْءٍ এটা পরবর্তী خَلَقْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় দুই প্রকারে যেমন পুরুষ ও নারী, আসমান ও জমিন সূর্য ও চন্দ্র, সমতল ভূমি ও পাহাড়, গ্রীষ্ম ও শীত, মিষ্টি ও টক এবং আলো ও অন্ধকার। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি تَاء থেকে একটি تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাতে তোমরা জানতে পার যে, জোড়ার সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি বেজোড় কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

٥٠. فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ط اَىْ اِلٰى ثَوَابِهٖ مِنْ عِقَابِهٖ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَلَا تَعْصُوْهُ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ ـ

৫০. [হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন!] অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে তার ছওয়াবের দিকে এভাবে যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে নাফরমানি করবে না আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥١. وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ يُقَدَّرُ قَبْلَ فَفِرُّوْا قُلْ لَهُمْ ـ

৫১. তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহ স্থির করিও না। আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। [৫০ নং আয়াতে] فَفِرُّوْا -এর পূর্বে قُلْ لَهُمْ উহ্য মানা হবে।

٥٢. كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا هُوَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَىْ مِثْلَ تَكْذِيْبِهِمْ لَكَ بِقَوْلِهِمْ اِنَّكَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ تَكْذِيْبُ الْاُمَمِ قَبْلَهُمْ رُسُلَهُمْ بِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ ـ

৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারা তাকে বলেছে, "তুমিতো এক জাদুকর, না হয় এক উম্মাদ। অর্থাৎ যেমনি এ সকল লোকেরা তাদের উক্তি- اِنَّكَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -এর মাধ্যমে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এমনি এই উক্তির মাধ্যমেই এদের পূর্ববর্তী উম্মতেরাও স্বীয় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

٥٣. اَتَوَاصَوْا كُلُّهُمْ بِهٖ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ج جَمَعَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْقَوْلِ طُغْيَانُهُمْ ـ

৫৩. এরা কি প্রত্যেকেই একে অপরকে এ উপদেশই দিয়ে এসেছে? ইস্তেফহামটা نَفِىْ -এর অর্থে। বস্তুত তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাদের অবাধ্যতা তাদেরকে একথার উপর একত্র করে দিয়েছে।

٥٤. فَتَوَلَّ اَعْرِضْ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ لِاَنَّكَ بَلَّغْتَهُمُ الرِّسَالَةَ ـ

৫৪. অতএব, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি অভিযুক্ত হবেন না। কেননা আপনি তো তাদের নিকট রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

٥٥. وَذَكِّرْ عِظْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ عَلِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ يُؤْمِنُ ـ

৫৫. আপনি উপদেশ দিতে থাকুন কুরআনের মাধ্যমে কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে যার ব্যাপারে আল্লাহর ইলম রয়েছে যে, সে ঈমান আনয়ন করবে।

٥٦. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ وَلَا يُنَافِىْ ذٰلِكَ عَدَمَ عِبَادَةِ الْكَافِرِيْنَ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا يَلْزَمُ وُجُوْدُهَا كَمَا فِىْ قَوْلِكَ بَرَيْتُ هٰذَا الْقَلَمَ لِاَكْتُبَ بِهٖ فَاِنَّكَ قَدْ لَا تَكْتُبُ بِهٖ ـ

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আর এটা কাফেরদের ইবাদত না করার অন্তরায় নয়। কেননা غَايَتْ -এর অস্তিত্বে আসা আবশ্যক নয়। যেমন তুমি বল যে, আমি লিখার জন্য কলম বানিয়েছি, আবার কখনো এরূপও হয় যে, তুমি সেই কলম দ্বারা লিখনা।

٥٧. مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ لِىْ وَلِاَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ وَلَا اَنْفُسَهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ ـ

৫৭. আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না নিজের জন্য, না তাদের জন্য। আর না তাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য। এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। না তাদের জন্য আর না অন্যদের জন্য।

٥٨. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ الشَّدِيْدِ ـ

৫৮. আল্লাহই তো রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

٥٩. فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ذَنُوْبًا نَصِيْبًا مِنَ الْعَذَابِ مِثْلَ ذَنُوْبِ نَصِيْبِ اَصْحٰبِهِمُ الْهَالِكِيْنَ قَبْلَهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ بِالْعَذَابِ اِنْ اَخَّرْتُهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তা-ই মক্কা ও অন্যান্য এলাকার যারা কুফরির মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম করেছেন, তাদের জন্য শাস্তির অংশ সেই পরিমাণ। যা অতীতে তাদের সমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। তাদের পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্তরা। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে। যদি আমি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেই।

٦٠. فَوَيْلٌ شدة عذاب لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ فِيْ يَوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ - اَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

৬০. দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য তাদের সেই দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا : জমহুর وَالسَّمَاءَ এবং وَالْاَرْضَ -এর উপর اِشْتِغَالٌ -এর ভিত্তিতে নসব দিয়ে পড়েছেন। উহ্য ইবারত হলো– وَفَرَشْنَا الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا এবং وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا ; আবুস সাম্মাক এবং ইবনে মাকসান উভয় স্থানে মুবতাদা হওয়ার কারণে মা'রূফ পড়েছেন। এই উভয়টির পরবর্তী অংশ তার খবর। প্রথমটি তথা نَصْب দিয়ে পড়া উত্তম। جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর আতফ جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর উপর হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই বাক্যটি حَال مُؤَكَّدَه হয়েছে, কেননা শারেহ এ কথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, مُوْسِعُوْنَ -এটা قَادِرُوْنَ -এর অর্থে। কাজেই مُوْسِعُوْنَ টা اَوْسَعَ লাজেম থেকে হবে। আর এটা এরূপ যেমন বলা যায়– اَوْرَقَ الشَّجَرُ অর্থাৎ صَارَ ذَا وَرَقٍ ; যখন একথা বুঝে এসে গেল যে, لَمُوْسِعُوْنَ ব্যাখ্যাকারের ভাষ্যমতে লাজেম, তখন জালালাইনের যে সকল নোসখায় لَمُوْسِعُوْنَ এর পরে لَهَا রয়েছে– সেটা বিশুদ্ধ নয়। অবশ্য যারা لَمُوْسِعُوْنَ -কে مُتَعَدِّىْ বলেছেন তাদের নিকট لَهَا থাকাটা বিশুদ্ধ হবে। এই সুরতে لَمُوْسِعُوْنَ টা حَال مُؤَسِّسَه হবে যেটা একটি নতুন ফায়দা দিবে।

قَوْلُهُ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ : **প্রশ্ন :** زَوْجَيْنِ তথা জোড়ার সাতটি উপমা কেন দিলেন? অথচ একটি দিলেও হতো।

উত্তর : অনেক উপমা দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জোড়-বেজোড়ের যে বিষয়টি রয়েছে এটা مَحْسُوْسَاتْ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাতে করে আরশ, কুরসি, লওহে মাহফূয, কলমকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করা হয়।

قَوْلُهُ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ : উদ্দেশ্য হলো এই যে, পূর্বের এবং পরের সকল নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে একই রূপ এবং একই কথার উপরেই সকলে একত্র হয়েছে; একে অপরকে অছিয়ত বা উপদেশ করেনি। কেননা সময় ও কাল ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কাজেই পরস্পর একে অপরকে নবীগণের বিরোধিতা করার ব্যাপারে অসিয়ত করা সম্ভব নয়; বরং মূল কারণ ও ইল্লত হলো মুশতারাক। আর তা হলো অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ, বিরোধিতা, জিদ হিংসা ও আত্মম্ভরিতা, যা উভয় দলের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا يَلْزَمُ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা যে, لِيَعْبُدُوْنِ -এর মধ্যে لَامْ টি عِلَّت بَاعِثَه -এর জন্য। অর্থাৎ মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ হলো ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কর্ম مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার কোনো কর্মই مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ হয় না।

এর উত্তর দিয়েছেন যে, لِيَعْبُدُوْنِ -এর মধ্যে لَامْ টা عَاقِبَتْ এবং صَيْرُوْرَتْ এর জন্য যাকে عِلَّت غَائِبَة ও বলা হয়, عِلَّت بَاعِثَه নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِىْ ذٰلِكَ عَدَمَ عِبَادَةِ الْكَافِرِيْنَ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : জিন ও ইনসান সৃষ্টির عِلَّت غَائِيَه হচ্ছে ইবাদত। তাই প্রতিটি মানুষের ইবাদত করা উচিত। অথচ আমরা দেখেছি যে, কাফেররা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে না?

উত্তর : غَايَة -এর পতিত হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন একটি কলম বানানো হয় লেখার জন্য। কিন্তু কোনো কোনো সময় তা দ্বারা লিখা হয় না। অথচ কলম বানানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো লিখা। দ্বিতীয়ত উত্তর কেউ কেউ এটা দিয়েছেন যে, এখানে عِبَادْ দ্বারা মুমিন বান্দাগণ উদ্দেশ্য, এটা تَعْمِيْمٌ بَعْدَ التَّخْصِيْصِ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুমিনগণ ঈমান অনুপাতে ইবাদত করে থাকেন।

قَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمْ : এ বাক্য বৃদ্ধির দ্বারা একটি সংশয় নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : সাধারণত পৃথিবীর সর্দার ও দাসদের মালিকগণের এই অভ্যাস ও রীতি হয়ে থাকে যে, দাস ক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে নিজের জন্য ও দাসদের জন্য জীবিকা উপার্জন করানো। তবে আল্লাহরও কি বান্দা সৃষ্টি করা দ্বারা এই উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা?

নিরসন : সাধারণ মালিকদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার এই অভ্যাস নেই এবং এর প্রয়োজনও নেই; ররং তিনি নিজেই তো স্বীয় বান্দাদেরকে জীবিকা দান করে থাকেন।

قَوْلُهُ ذَنُوْبًا : ذَنُوْبًا শব্দের ذَال বর্ণটি যবরযুক্ত। ذَنُبٌ -এর বহুবচন। বড় বালতিকে ذَنُبٌ বলা হয়। পরিভাষা ও প্রচলিত অর্থে অংশ ও পালাকে ذَنُبٌ বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং তা অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যেসব বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এ ছাড়া আয়াতসমূহে তাওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকিদ রয়েছে।

قَوْلُهُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : اَيْد শব্দের অর্থ– শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ তাফসীরই করেছেন।

قَوْلُهُ فَفِرُّوْآ اِلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গুনাহ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গুনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে দূরে থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَفِرُّوْآ اِلَى اللّٰهِ অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের দিকেই পলায়ন কর, অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর নৈকট্য ধন্য হও, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হও, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও, এক আল্লাহ পাকের প্রতি-ই ভরসা কর, আল্লাহ পাকের রহমতের-ই আশা কর, শুধু আল্লাহ পাককেই ভয় কর। তিনি তোমার মালিক, তিনিই তোমার খালেক বা স্রষ্টা। অতএব, তুমি সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু এক আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক করতে প্রয়াসী হও।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোনো কোনো মাবুদকে স্বীকার করো না।"

অর্থাৎ যদি তুমি সবকিছু থেকে পলায়ন করে নিজেকে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির রাখতে না পার, তবে অন্তত তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করো না, অন্য কোনো কিছুকে মাবুদ বা উপাস্য বলে মনে করো না। উপাস্য একজনই, তথা একমাত্র আল্লাহ পাকই মাবুদ বা উপাস্য, ইবাদতের যোগ্য শুধু তিনিই, আর কেউ নয়। অতএব আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, প্রিয় কেউ নেই আর আল্লাহ পাক ব্যতীত মকসুদও কেউ নেই, কেননা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই মর্দে মুমিনের সকল সাধনা। অতএব এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হও।

قَوْلُهُ اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত প্রকাশ্য সতর্ককারী, অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সম্মুখে মাথা নত করো না। এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, শিরকসহ যাবতীয় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সচেষ্টা হও।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .... اَوْ مَجْنُوْنٌ : **প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা :** এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে নবী! এত সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কাফেররা ঈমান না আনে, তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্জন না করে, তবে আপনি তাতে দুঃখিত হবেন না। কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোনো জাতির নিকট কোনো নব- রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তাঁদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে জাদুকর

এবং পাগল বলা হয়েছে। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দেখলে মনে হয়, যেন পূর্বের কাফেররা এদেরকে এ অন্যায় কাজের জন্যে অসিয়ত করেছে এবং পূর্বকালের লোকেরা এ যুগের কাফেদেরকে আল্লাহ্ পাকের প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ "তবে কি তারা একে অন্যকে এই অসিয়ত করেই মরেছে? বস্তুত তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।" আলোচ্য আয়াতের শুরুতে كَذٰلِكَ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনার উম্মতের কাফেরদের যে অবস্থা রয়েছে, অনুরূপ অবস্থাই ছিল পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতদের। তারাও এমনিভাবেই নবী রাসূলগণের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে. তবে কি পূর্ববর্তী কাফেররা এ যুগের কাফেরদেরকে নবী-রাসূলগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের অসিয়ত করে গেছে? কেননা সকল যুগের কাফেরদের একই আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

যেহেতু এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক, তাই পরস্পরকে অসিয়ত করার প্রশ্নই উঠে না; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা এক সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাদের স্বভাব এবং প্রকৃতি একই, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যদ্রোহিতার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে; কিন্তু আচরণে কোনো অমিল নেই। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ-কে কাফেরদের অন্যায় আচরণে সবর অবলম্বনের তাগিদ দিয়ে ইরশাদ করেছেন- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "[হে নবী!] কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ"।

قَوْلُهُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوْمٍ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যখন এই কাফেরদেরকে বারংবার ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করেছেন, কিন্তু আপনার আহবানে তারা সাড়া দেয়নি, তাদের শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রেখেছে, তাই তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই শ্রেয়। আর এ কারণেই এ ব্যাপারে আপনার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। তাই আপনাকে কাফেরদেরর জন্য চিন্তিত হতে হবে না। আর আপনি তাদেরকে সাবধান করেননি এবং নাজাতের পথ প্রদর্শন করেননি- এ অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে কেউ আনতে পারবে না। তাই তাদের আচরণে ভ্রুক্ষেপ না করে আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

ইবনে জারীর, ইবনে হাতিম, ইবনে রাহবীয়া, ইবনে হাইসাম, ইবনে কুলাইব, মুজাহিদ (রা.)-এর সূত্রে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوْمٍ [হে রাসূল! আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, আর এতে আপনার প্রতি কোনো অভিযোগও হবে না] নাজিল হয়, তখন আমাদের প্রত্যেকের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে. আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আজাব আসবে এবং সকলকে ধ্বংস করা হবে। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -কে মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার আদেশ দিয়েছেন। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ। নাজিল হয়, তখন আমরা সকলে আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হই।

ইবনে জারীর লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, যখন فَتَوَلَّ عَنْهُمْ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয়, কেননা তাঁরা মনে করেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ হলো এবং আজাব আপতিত হওয়া অবধারিত, এরপর আল্লাহ পাক নাজিল করলেন- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ [হে রাসূল! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, নিশ্চয় আপনার উপদেশ মুমিনদের জন্যে উপকারী হবে]

অর্থাৎ যার মধ্যে ঈমান আনয়নের যোগ্যতা রয়েছে, তার জন্য আপনার উপদেশ উপকারী হবে, যদিও কাফেররা আপনার উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত না হয়।

অথবা এর অর্থ হলো; হে রাসূল! আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার উপদেশ নিঃসন্দেহে মুমিনদের জন্যে উপকারী হবে। তাদের মন এর দ্বারা আলোকিত হবে।

এ আয়াত নাজিল হবার পর মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। -[তাফসীরে তাবারী খ. ২৭, পৃ. ৭]

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ : **জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য** : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেন- অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা-

১. যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোনো কাজ করা অসম্ভব।

২. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরো অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মুমিন তারা কমবেশি ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই আয়াতের এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

এই কেরাত থেকে উপরিউক্ত তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব; বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহর আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোনো কোনো লোক আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর সরল তাফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রাখা হয়েছে। সে মতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গুনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ.

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদি অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলেমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রাখা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করাটা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ : অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোনো উপকার চাই না যে, তারা রিজিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা যত বড় লোকই হোক না কেন কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থকড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুজী-রোজগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোনো উপকার উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ ذَنُوْبًا : এই শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوْب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আজাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আজাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে, অর্থাৎ কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আজাব আসে না কেন? এর জবাব এই যে, আজাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এসে যাবে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা তূর, মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالطُّوْرِ لا اَيِ الْجَبَلِ الَّذِىْ كَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُوْسٰى ـ

১. শপথ তূর পর্বতের অর্থাৎ যেই পাহাড়ে চড়ে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করেছেন।

٢. وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ لا

২. এবং শপথ ঐ কিতাবের, যা লিখিত আছে।

٣. فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ لا اَيِ التَّوْرٰىةِ اَوِ الْقُرْاٰنِ ـ

৩. উন্মুক্ত পত্রে। অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআনে।

٤. وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ لا هُوَ فِى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ اَوِ السَّادِسَةِ اَوِ السَّابِعَةِ بِحَيَالِ الْكَعْبَةِ يَزُوْرُهٗ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ بِالطَّوَافِ وَالصَّلٰوةِ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ اَبَدًا ـ

৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের; এটা হলো তৃতীয় আকাশে অথবা ষষ্ঠ আকাশে অথবা সপ্তম আকাশে কাবা শরীফের সোজা উপরে অবস্থিত, প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে নামাজ ও তওয়াফের জন্য এর জিয়ারত করে থাকে। তারা আর কখনো তাতে ফিরে আসার সুযোগ পায় না।

٥. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ لا اَيِ السَّمَاءِ ـ

৫. শপথ সমুন্নত ছাদের অর্থাৎ আকাশের।

٦. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ لا اَيِ الْمَمْلُوْءِ ـ

৬. শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের অর্থাৎ পরিপূর্ণ/টইটুম্বুর

٧. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ لا لَنَازِلٌ بِمُسْتَحِقِّهٖ ـ

৭. আপনার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের উপর অবশ্যই অবতীর্ণ হবে।

٨. مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ لا عَنْهُ ـ

৮. এর নিবারণকারী কেউ নেই। এর থেকে।

٩. يَّوْمَ مَعْمُوْلٌ لَوَاقِعٌ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا لا تَتَحَرَّكُ وَتَدُوْرُ

৯. যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে নড়াচড়া করবে এবং চক্কর দিবে। يَوْمَ টা لَوَاقِعٌ -এর مَعْمُوْل

١٠. وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ط تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

১০. এবং পর্বত চলবে দ্রুত উড়তে উড়তে ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন।

١١. فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ لِلرُّسُلِ .

১১. দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি সেদিন অস্বীকারকারীদের রাসূলগণকে।

١٢. الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ بَاطِلٍ يَّلْعَبُوْنَ ـ اَىْ يَتَشَاغَلُوْنَ بِكُفْرِهِمْ .

১২. যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে অর্থাৎ তাদের কুফরিতে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।

١٣. يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ط يُدْفَعُوْنَ بِعُنْفٍ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ تَمُوْرُ .

১৩. সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে। কঠোরভাবে ধাক্কা দেওয়া হবে। এটা يَوْمَ تَمُوْرُ থেকে بَدَلٌ হয়েছে।

١٤. وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيْتًا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ .

১৪. এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য বলা হবে- এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

١٥. اَفَسِحْرٌ هٰذَآ الْعَذَابُ الَّذِىْ تَرَوْنَ كَمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ فِى الْوَحْىِ هٰذَا سِحْرٌ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ .

১৫. এটা কি জাদু? এটা কি জাদু যা তোমরা দেখতেছ যেমনিভাবে তোমরা ওহীর ব্যাপারে বলতে যে, এটা জাদু। নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

١٦. اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْآ عَلَيْهَا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ج صَبْرُكُمْ وَجَزْعُكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ط لِاَنَّ صَبْرَكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ .

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা তাতে ধৈর্যধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর তোমাদের ধৈর্যধারণ করা এবং না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান কেননা তোমাদের ধৈর্য তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এর পরিণাম।

١٧. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ .

১৭. মুত্তাকীরা তো থাকবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশ।

١٨. فٰكِهِيْنَ مُتَلَذِّذِيْنَ بِمَآ مَصْدَرِيَّةٌ اٰتٰىهُمْ اَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ ج وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ عَطْفٌ عَلٰى اٰتَاهُمْ اَىْ بِاِتْيَانِهِمْ وَوِقَايَتِهِمْ .

১৮. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে স্বাদ গ্রহণ করবে। এখানে بِمَا -এর مَا টি مَصْدَرِيَّةٌ এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের আজাব হতে এটা وَوَقَاهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে اٰتَاهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া থেকে এবং সংরক্ষণ করা থেকে।

١٩. وَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا حَالٌ اَىْ مُهَنَّئِيْنَ بِمَا اَلْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

১৯. এবং তাদেরকে বলা হবে- তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর هَنِيْٓـئًا শব্দটি حَالٌ হয়েছে। অর্থ হলো مُهَنَّئِيْنَ ; তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ। بِمَا-এর بَاء টি سَبَبِيَّةٌ

২০. مُتَّكِئِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَكِنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فِىْ جَنّٰتٍ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج بَعْضُهَا اِلٰى جَنْبِ بَعْضٍ وَزَوَّجْنٰهُمْ عَطْفٌ عَلٰى فِىْ جَنَّاتٍ اَىْ قَرَنَّا هُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ عِظَامِ الْاَعْيُنِ حِسَانِهَا .

২০. তারা হেলান দিয়ে বসবে مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার বাণী- فِىْ جَنّٰتٍ -এর উহ্য যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে শ্রেণিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে তার একটির পাশে আরেকটি আমি তাদের মিলন ঘটাব এটা فِىْ جَنّٰتٍ -এর উপর عَطْف হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে সংযুক্ত করব, মিলাবো। আয়াতলোচনা হূরের সাথে

২১. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُبْتَدَأٌ وَاتَّبَعَتْهُمْ مَعْطُوْفٌ عَلٰى اٰمَنُوْا ذُرِّيَّتُهُمْ اَلصِّغَارُ وَالْكِبَارُ بِاِيْمَانٍ مِنَ الْكِبَارِ وَمِنَ الْاٰبَاءِ فِى الصِّغَارِ وَالْخَبَرُ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ط اَلْمَذْكُوْرِيْنَ فِى الْجَنَّةِ فَيَكُوْنُوْنَ فِىْ دَرَجَتِهِمْ وَاِنْ لَّمْ يَعْمَلُوْا بِعَمَلِهِمْ تَكْرِمَةً لِلْاٰبَاءِ بِاجْتِمَاعِ الْاَوْلَادِ اِلَيْهِمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا نَقَصْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ ط يُزَادُ فِىْ عَمَلِ الْاَوْلَادِ كُلُّ امْرِئٍ ' بِمَا كَسَبَ عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ رَهِيْنٌ مَرْهُوْنٌ يُؤَاخَذُ بِالشَّرِّ وَيُجَازٰى بِالْخَيْرِ .

২১. এবং যারা ঈমান আনে এটা মুবতাদা আর তাদের অনুগামী হয় এটা اٰمَنُوْا -এর উপর مَعْطُوْف তাদের সন্তান-সন্ততি ছোট ও বড় [অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক] ঈমানে প্রাপ্তবয়স্কদেরকে তাদের ঈমানের কারণে আর অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে তাদের পিতা-মাতা ঈমানের কারণে। আর খবর হলো তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে উল্লিখিতদেরকে জান্নাতে। ফলে তারাও তাদের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে, যদিও তারা তাদের পিতাগণের অনুরূপ আমল করেননি। তাদের পিতাগণের সম্মানার্থে তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্র করব এবং যে পরিমাণ প্রতিদান তাদের সন্তানদের ব্যাপারে বৃদ্ধি করা হয়েছে [তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না] اَلَتْنٰهُمْ -এর لَامْ বর্ণে যবর ও যের উভয়ই পারে। অর্থ হলো হ্রাস করব না, কমাবো না। আর مِنْ شَىْءٍ -এর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর কৃতকর্মের জন্য ভালো বা মন্দ দায়ী অর্থাৎ মন্দ আমলের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে এবং ভালো আমলের কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। رَهِيْنٌ শব্দটি مَرْهُوْنٌ অর্থে হবে।

২২. وَاَمْدَدْنٰهُمْ زِدْنَاهُمْ فِىْ وَقْتٍ بَعْدَ وَقْتٍ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ وَاِنْ لَّمْ يُصَرِّحُوْا بِطَلَبِهٖ .

২২. আমি তাদেরকে দিব তাদেরকে বৃদ্ধি করে দিব প্রতি মুহূর্তে ফলমূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে যদিও তারা সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনা না করে।

২৩. يَتَنَازَعُوْنَ يَتَعَاطَوْنَ بَيْنَهُمْ فِيْهَا اَىِ الْجَنَّةِ كَاْسًا خَمْرًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا اَىْ بِسَبَبِ شُرْبِهَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَاْثِيْمٌ بِهٖ يَلْحَقُهُمْ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

২৩. তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করবে সেথায় জান্নাতে পানপাত্র শরাব যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না অর্থাৎ শরাব পান করাব কারণে না কোনো অহেতুক কথাবার্তা বলবে এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না যা শরাব পান করার কারণে ঘটে থাকে/মিলিত হয়ে থাকে পৃথিবীর শরাবের বিপরীত

٢٤. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لِلْخِدْمَةِ غِلْمَانٌ اَرِقَّاءُ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ حُسْنًا وَنَظَافَةً لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ مَصُوْنٌ فِى الصَّدَفِ لِاَنَّهُ فِيْهَا اَحْسَنُ مِنْهُ فِى غَيْرِهَا .

২৪. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোররা সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। কেননা যে মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে থাকে, তা যে মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে থাকে না সেটা অপেক্ষা বহু উত্তম।

٢٥. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ يَسْاَلُ بَعْضُهُم بَعْضًا عَمَّا كَانُوْا عَلَيْهِ وَمَا وَصَلُوْا اِلَيْهِ تَلَذُّذًا وَاعْتِرَافًا بِالنِّعْمَةِ .

২৫. তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করবে অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরের থেকে সে সকল কর্ম সম্পর্কে জেনে নিবে যা তারা পৃথিবীতে করতেন এবং সে সম্পর্কেও যা তারা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সবকিছু স্বাদ গ্রহণ ও নিয়ামত প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি স্বরূপ হবে।

٢٦. قَالُوْٓا اِيْمَاءً اِلٰى عِلَّةِ الْوُصُوْلِ . اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا فِى الدُّنْيَا مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ .

২৬. এবং তারা বলবেন প্রাপ্তির কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে পৃথিবীতে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে ভীত শঙ্কিত ছিলাম।

٢٧. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْمَغْفِرَةِ وَوَقٰينَا عَذَابَ السَّمُوْمِ اَيِ النَّارِ لِدُخُوْلِهَا فِى الْمَسَامِ .

২৭. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আগুন থেকে। জাহান্নামের আগুনকে এ কারণে سَمُوْم বলা হয় যে, সেই আগুন লোমকূপের মধ্যেও ঢুকে যায়।

٢٨. وَقَالُوْا اِيْمَاءً اَيْضًا . اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ اَىْ فِى الدُّنْيَا نَدْعُوْهُ اَىْ نَعْبُدُهُ مُوَحِّدِيْنَ اِنَّهُ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا وَاِنْ كَانَ تَعْلِيْلًا مَعْنًى وَبِالْفَتْحِ تَعْلِيْلًا لَفْظًا هُوَ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ الصَّادِقُ فِىْ وَعْدِهِ الرَّحِيْمُ الْعَظِيْمُ الرَّحْمَةِ .

২৮. এবং তারা ইঙ্গিতের ভঙ্গিতে এটাও বলবে যে, আমরা পূর্বেও পৃথিবীতে আল্লাহকে আহবান করতাম অর্থাৎ একত্ববাদের স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁর ইবাদত করতাম। তিনি তো اِنَّهُ -এর হামযা যের সহকারে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে যদিও তা تَعْلِيْل অর্থে হয়েছে। আর যবরসহ শাব্দিকভাবে تَعْلِيْل হওয়ার কারণে। কৃপাময় اَلْبَرُّ বলা হয় এমন দয়া প্রদর্শনকারী দাতাকে যিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণে সত্যবাদী। পরম দয়ালু অতিশয় অনুগ্রহকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالطُّوْرِ : আরবি ভাষায় পাহাড়কে طُوْر বলা হয়। কতিপয় আরবি ভাষাভাষী এটা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, প্রত্যেক সুজলা সুফলা পাহাড়কেই طُوْر বলা হয়। যখন তাতে اَلِفْ وَلَامْ প্রবেশ করে তখন সিনাই উপত্যকার একটি সুনির্দিষ্ট পর্বত উদ্দেশ্য হয়। আর এটা সেই পর্বত যা মিশর ও মাদায়েনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপরেই হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহর তাজাল্লী প্রদান করা হয়েছিল এবং এই পর্বত শৃঙ্গেই হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছিলেন।

قَوْلُهُ فِي رَقٍّ مَنْشُوْرٍ : رَقٍّ শব্দের অর্থ হলো কাগজ, পাতা, চামড়ার পাতলা আবরণ, বহুবচনে رُقُوْقٌ এটা رَا. বর্ণে যবরসহ অধিক ব্যবহৃত। আর رِا. বর্ণে যের দিয়ে তা খুব কমই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ الْمَسْجُوْرِ : এটা ইসমে মাফউলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ অর্থ পরিপূর্ণ, টইটম্বুর। এটা ভীষণ গরম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাবে نَصَرَ হতে سُجُوْرًا মাসদার। অর্থ– গরম করা, পরিপূর্ণ হওয়া।

قَوْلُهُ يُدَعُّوْنَ : دَعٌّ হতে মুযারে মাজহুলের جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ– তাদের ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَمُوْرُ : এটা বাবে نَصَرَ থেকে, মাসদার– مَوْرًا অর্থ– ফেটে যাওয়া, কাঁপা, ভয় করা, থরথর করা

قَوْلُهُ بِمَا : এখানে مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةٌ

প্রশ্ন : এটা مَانِے مَصْدَرِيَّه এ কথা কেন বলা হলো?

উত্তর: مَانِے مَصْدَرِيَّه বলার কারণ হলো যদি مَا-কে مَوْصُوْلَه ধরে নেওয়া হয় তবে مَعْطُوْف-এর মধ্যে অর্থাৎ وَوَقَاهُمْ-এর صِلَه থেকে খালি হওয়া অত্যাবশ্যক হয়। কেননা فِعْل তার মাফউল هُمْ-কে নিয়ে নিয়েছে। আর عَائِدْ-বিহীন صِلَه রয়ে গেল। অথচ صِلَه যখন জুমলা হয় তখন عَائِدْ থাকা জরুরি। আবার বৈধ যে, مَا টা مَوْصُوْله হবে আর وَوَقَاهُمْ এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে। তবে অর্থের হিসেবে نَدْعُوْهُ-এর عِلَّتْ হবে। অর্থ হবে– আমরা তাঁর ইবাদত এ জন্য করতাম যে, তিনি অনুগ্রহকারী দয়ালু। আর যদি اِنَّه-এর হামযাকে যবর দিয়ে পড়া হয় তবে তা نَدْعُوْهُ-এর শাব্দিক عِلَّتْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা তূর প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা তূর মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৪৮ আয়াত, ৩১২ বাক্য ও ১৫০০ টি অক্ষর রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা তূর মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

হযরত জোবায়ের ইবনে মুতম (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, তা আমি নিজেই শ্রবণ করেছি, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করেছেন।

–[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬. পৃ. ১২৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা ২৭ পৃ. ৭]

স্বপ্নের তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কিছুদিন পর ঐ সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হবে. অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি কা'বা শরীফের নিকটে বসবাস করবে।

এ সূরার আমল : যদি কোনো বন্দী ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করে, তবে অতি সত্বর রেহাই পাবে। এমনভিাবে, যদি কোনো ভ্রমণরত ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করতে থাকে, তবে সে সফরে নিরাপদ থাকবে।

নামকরণ : এ সূরার বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তূর পর্বতের শপথ দ্বারা, এজন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা তূর।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যথা– ১. পরকালীন জীবনের সত্যতা। ২. সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী। ৩. পরকালীন জীবনের সত্য-সাধকদের জন্যে পুরস্কারের শুভ সংবাদ। এর পাশাপাশি রয়েছে তাওহীদ ও রিসালতের আলোচনা এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার উল্লেখ। সূরার শুরুতেই পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে; পরকালীন জীবনে পাপিষ্ঠদের শাস্তি অনিবার্য, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এ কথার সাক্ষী যে, প্রত্যেকটি মানুষকে অবশেষে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে, মানবজাতিকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এ সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالطُّوْرِ : হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদায়েনে অবস্থিত তূরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি। –[কুরতুবী]

তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরিউক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরজ।

قَوْلُهُ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ : رَقٍّ শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে কুরআনে পাক বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ : আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মা'মূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল মা'মূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের পালা আসে। -[ইবনে কাসীর]

সপ্তম আকাশে বসাবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মা'মূর। এ কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল মা'মূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। -[ইবনে কাসীর]

বায়তুল মা'মূরের অবস্থান : বায়তুল মা'মূর অর্থ- 'আবাদ ঘর'। এর দ্বারা কা'বা শরীফ এবং কা'বা শরীফের সরাসরি উর্ধ্বেই ফেরেশতাদের ইবাদতের জন্যে বায়তুল মা'মূর রয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির, ইবনে মরদবিয়া হাকেম এবং বায়হাকী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, বাতুল মা'মূর রয়েছে সপ্তম আসমানে, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বায়তুল মা'মূরে হাজির হয়, তারা আর কোনো দিন ফিরে আসে না। অর্থাৎ প্রতিদিনই নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা সেখানে ইবাদতে মশগুল থাকে। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। -[তাফসীরে দুররুল মানসূর, খ. ৬. পৃ. ১২৯]

আল্লামা বগভী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, ফেরেশতারা বায়তুল মা'মূরের তওয়াফ করে এবং তার ভেতরে নামাজ আদায় করে, এরপর আর কখনো আসে না। সর্বক্ষণ ফেরেশতারা সেখানে ছড়িয়ে থাকে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, বায়তুল মা'মুর বলে এ স্থলে কা'বা শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা হজ, ওমরা পালনকারী, এতেকাফকারীদের দ্বারা কা'বা শরীফ সর্বক্ষণ আবাদ থাকে।

অথবা বায়তুল মা'মুর শব্দটি দ্বারা মুমিনের অন্তরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের মারেফাত এবং ইখলাস দ্বারা মুমিনের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, বায়তুল মা'মুর কি? তিনি বললেন, তা আসমানে রয়েছে কা'বা শরীফের ঠিক উপরে। যেভাবে জমিনের কা'বা সম্মানিত স্থান, ঠিক তেমনি বায়তুল মা'মূরও আসমানের সম্মানিত স্থান, প্রতিদিন তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে। যে ফেরেশতা আজ এ দায়িত্ব পালন করল, কিয়ামত পর্যন্ত সে আর কখনো এ সুযোগ পাবে না, কেননা ফেরেশতাদের সংখ্যা অত্যধিক।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জান? তারা জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলই জানেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তা হলো আসমানি কা'বা, জমিনী কা'বার ঠিক উপরেই অবস্থিত, যদি তা নীচে পড়ে, তবে কা'বা শরীফের উপরই পড়বে। তাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আসবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃ. ৯]

قَوْلُهُ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ : اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ মানে উঁচু ছাদ, এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. নীলাভ আকাশ যা পৃথিবীর উপর কোনো খুঁটি ব্যতীতই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে স্থাপিত হয়েছে।

২. বেহেশতের উপরে আরশে এলাহী স্থাপিত রয়েছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করা হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ : مَسْجُوْرٍ শব্দটি سَجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে- وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তাফসীরই হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আলী, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। -[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-কে জনৈক ইহুদি প্রশ্ন করল : জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন, সমুদ্রেই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদি এই উত্তর সমর্থন করল। -[কুরতুবী]

হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ مَسْجُوْرٍ -এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জারীর (র.) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। -[ইবনে কাসীর]

সমুদ্রগুলো দোজখে পরিণত হবে : মুহাম্মদ ইবনে কা'ব এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, পৃথিবীর সাগর মহাসাগরগুলোকে অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সাগর-মহাসাগরগুলোকে অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত করবেন, এর পরিণতিতে দোজখের অগ্নি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জিহাদ, হজ এবং ওমরা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যেন সমুদ্রের সফর না করে, কেননা সমুদ্রের নীচে অগ্নি রয়েছে, অথবা তিনি বলেছেন, অগ্নির নীচে সমুদ্র রয়েছে। হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমুদ্র হলো দোজখ।

আবুশ শেখ এবং বায়হাকী (র.) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি অমুক ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী কোনো ইহুদিকে দেখিনি, সে আমাকে বলেছিল, আল্লাহ পাকের বিরাট অগ্নিকুণ্ড হলো সমুদ্র। অর্থাৎ সমুদ্রগুলো অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হবে। যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে একত্র করবেন অর্থাৎ এগুলোকে সাগর-মহাসাগরে নিক্ষেপ করবেন। এভাবে সকল সাগর-মহাসাগর দোজখে পরিণত হবে।

কালবী (র.) বলেছেন, 'মাসজূর' অর্থ হলো পরিপূর্ণ, আর হাসান, কাতাদা এবং আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, 'মাসজূর' অর্থ হলো শুষ্ক, অর্থাৎ সমুদ্রের পানি শুষ্ক হয়ে যাবে। আর রবী ইবনে আনাস (র.) বলেছেন, তখন সমুদ্রের মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানি একাকার হয়ে যাবে, আর এ অবস্থাকেই 'মাসজূর' বলা হয়েছে। আলী ইবনে বদর বলেছেন, সাগর-মহাসাগর-গুলোকে 'বাহরে মাসজূর' এজন্যে বলা হয়েছে যে, তার পানি পান করা যায় না, আর তা দ্বারা কৃষিকাজও হয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বাহরে মাসজূর বলা হয় বাহরে মা'কুফকে, অর্থাৎ যে পানিকে স্থবির করে রাখা হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এমন কোনো রাত হয় না, যে রাতে সাগরগুলো তিনবার আল্লাহ পাকের দরবারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না। আর তা এ মর্মে যে অনুমতি হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিমজ্জিত করে দেই। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন কাজ করা থেকে সমুদ্রগুলোকে বিরত রাখেন, আর তাদের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি দেন না।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা ২৭, পৃ. ৯ মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৭, পৃ. ৩৭]

যাহহাক (র.) হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বাহরে মাসজূর হলো মহান আরশের নীচে স্থাপিত একটি সাগর, সাত আসমান সাত জমিনের মধ্যে যতখানি দূরত্ব রয়েছে, এ সমুদ্রের গভীরতা ততখানি। এ সমুদ্রকে 'বাহরে হায়াওয়ান' বলা হয়। যখন হযরত ইস্রাফীল (আ.) প্রথম শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন ৪০ দিন সকালে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ঐ সমুদ্র থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যে কারণে লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

قَوْلُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ : আপনার পালনকর্তার আজাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা.) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না। –[ইবনে কাসীর]

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রা.) বলেন, মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌছেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করেছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আজাবে আক্রান্ত হয়ে যাব। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا : অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مَوْرٌ বলা হয়, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে. কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ...... ذُرِّيَّتُهُمْ :

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব।" হযরত আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়। -[মাযহারী]

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরজ করবে, হে পরওয়ারদিগার! দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে ছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে- তাদেরকে জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক!

-[ইবনে কাসীর]

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন: এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হলো? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তরে বলা হবে- তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

قَوْلُهُ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ : اَلَتَ ও اِيْلَاتٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো হ্রাস করা। -[কুরতুবী] আয়াতের অর্থ এই সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে; বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে পিতৃপুরুষদের সমান করে দেবেন।

قَوْلُهُ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ : অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী হবে; অপরের গুনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়া কথা আছে। কিন্তু গুনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গুনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। -[ইবনে কাসীর]

মাস ব্যাপী হযরত ওমর (রা.)-এর অসুস্থতা : হাফেজ ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) এক রাতে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বের হলেন। এক ব্যক্তি তার গৃহে তাহাজ্জুদের নামাজে সূরা তূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিল, হযরত ওমর (রা.) যখন এ আয়াত اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ শ্রবণ করলেন, তখন একটি চিৎকার দিলেন এবং বললেন, শপথ! কাবা শরীফের প্রতিপালকের, মনে হয় কোমর ভেঙ্গে গেছে। এরপর তিনি ঐ গৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। অনেকক্ষণ পর যখন তিনি প্রকৃতস্থ হলেন, তখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ আয়াতের ভয়াবহতার প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তরে এত বেশি হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এভাবে সুদীর্ঘ এক মাস যাবত তিনি অসুস্থ রইলেন। অনেক লোক তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তারা জানত না তাঁর কী রোগ হয়েছে?

শপথের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে পাঁচটি বিরাট বিস্ময়কর, গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, আখিরাতে বেঈমান, নাফরমানদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। সেই পাঁচটি সৃষ্টি হচ্ছে- ১. কোহে তূর ২. কিতাবে মাসতুর ৩. বায়তুল মা'মূর, ৪. সাকফে মারফূ' ৫. বাহরে মাসজূর। এসব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার পর এ সত্যে বিশ্বাস করতে কোনো বুদ্ধিমান মানুষেরই বিলম্ব হয় না যে, যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে সমগ্র মানবজাতির পুনরুত্থান এবং কিয়ামত অনুষ্ঠান আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। আর কিয়ামত কায়েম হবে ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কার এবং বেঈমান ও নাফরমানদের শাস্তি ঘোষণার জন্যে। কিয়ামতের দিনই প্রত্যেকটি মানুষকে তার সারা জীবনের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা বা শ্বেতপত্র দেওয়া হবে। ঈমানদার ও নেককার হলে ডান হাতে এবং বেঈমান ও বদকার হলে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

অনুবাদ :

٢٩. فَذَكِّرْ دُمْ عَلٰى تَذْكِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَرْجِعْ عَنْهُ لِقَوْلِهِمْ لَكَ كَاهِنٌ مَجْنُوْنٌ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اَىْ بِاِنْعَامِهٖ عَلَيْكَ بِكَاهِنٍ خَبَرُ مَا وَّلَا مَجْنُوْنٍ ط مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ـ

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন অর্থাৎ আপনি সর্বদা মুশরিকদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন। তারা আপনাকে গণকও উম্মাদ বলার কারণে আপনি তাদেরকে বুঝানো থেকে ফিরে আসবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে অর্থাৎ আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহের কারণে গণক নন এটা مَا -এর খবর এবং উন্মাদও নন এটা হলো بِكَاهِنٍ -এর উপর মা'তূফ।

٣٠. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ هُوَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ـ حَوَادِثُ الدَّهْرِ فَيَهْلِكُ كَغَيْرِهٖ مِنَ الشُّعَرَاءِ ـ

৩০. তারা কি বলতে চায় যে, তিনি একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। যে যুগের পরিক্রমায় অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনিও ধ্বংস হয়ে যাবেন।

٣١. قُلْ تَرَبَّصُوْا هَلَاكِىْ فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ـ هَلَاكَكُمْ فَعُذِّبُوْا بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالتَّرَبُّصُ الْاِنْتِظَارُ ـ

৩১. আপনি বলুন, তোমরা প্রতীক্ষা কর আমার ধ্বংসের আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। তোমাদের বিনাশের। সুতরাং বদরের ময়দানে তাদেরকে তরবারির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর اَلتَّرَبُّصُ অর্থ হলো اَلْاِنْتِظَارُ তথা প্রতীক্ষা করা।

٣٢. اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ عُقُوْلُهُمْ بِهٰذَا اَىْ قَوْلُهُمْ لَهٗ سَاحِرٌ كَاهِنٌ شَاعِرٌ مَجْنُوْنٌ اَىْ لَا تَاْمُرُهُمْ بِذٰلِكَ اَمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ج بِعِنَادِهِمْ ـ

৩২. তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে? অর্থাৎ তাঁকে তাদের জাদুকর। গণক, কবি ও উন্মাদ বলা। অর্থাৎ তাদেরকে এরূপ শিক্ষা/নির্দেশ দেয় না। না, তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? তাদের অবাধ্যতার কারণে।

٣٣. اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ج اِخْتَلَقَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَخْتَلِقْهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ اِسْتِكْبَارًا فَاِنْ قَالُوْا اِخْتَلَقَهٗ ـ

৩৩. তারা কি বলে, এই কুরআন তাঁর নিজের রচনা? অর্থাৎ নিজে নিজেই কুরআন রচনা করে ফেলেছেন। বরং তারা অবিশ্বাসী অহঙ্কারবশত যদি তারা বলে যে, এই কুরআন তিনি নিজেই রচনা করেছেন।

٣٤. فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مُّخْتَلَقٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِهِمْ ـ

৩৪. তবে এর সদৃশ কোনো রচনা উপস্থিত করুন। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাদের কথায়।

٣٥. اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَىْ خَالِقٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ط اَنْفُسَهُمْ وَلَا يُعْقَلُ مَخْلُوْقٌ بِدُوْنِ خَالِقٍ وَلَا مَعْدُوْمٌ يَخْلُقُ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ خَالِقٍ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ فَلِمَ لَا يُوَحِّدُوْنَهٗ وَيُؤْمِنُوْنَ بِرَسُوْلِهٖ وَكِتَابِهٖ ـ

৩৫. তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে। না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নিজেদের। একথা আকলের বিপরীত যে, কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব স্রষ্টাবিহীন হবে, আর একথাও বুঝে আসে না যে, অস্তিত্বহীন, বস্তু কাউকে সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এটা প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চিতভাবে তার কোনো না কোনো স্রষ্টা রয়েছে। আর তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ তবে কেন তারা তাঁর একত্ববাদকে স্বীকার করছে না এবং তাঁর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ও তাঁর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না।

٣٦. أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى خَلْقِهِمَا إِلَّا اللّٰهُ الْخَالِقُ فَلِمَ لَا يَعْبُدُوْنَهُ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ط وَإِلَّا لَاٰمَنُوْا بِنَبِيِّهِ.

৩৬. নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ এতদুভয় সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় কাজেই তারা কেন তাঁর ইবাদত করবে না? বরং তারা তো অবিশ্বাসী অন্যথায় অবশ্যই তারা তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনত।

٣٧. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِهِمَا فَيَخُصُّوْا مَنْ شَاؤُوْا بِمَا شَاؤُوْا أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ. الْمُتَسَلِّطُوْنَ الْجَبَّارُوْنَ وَفِعْلُهُ صَيْطَرَ وَمِثْلُهُ بَيْطَرَ وَبَيْقَرَ.

৩৭. আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে? নবুয়ত, রিজিক ইত্যাদির যে, তারা যাকে চাবে এবং যা চাবে তা দিয়ে তাকে বিশোষিত করবে। না, তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? প্রাধান্য বিস্তারকারী বিচারক। এর فِعْل হলো صَيْطَر এবং এর মতো হলো بَيْطَرَ এবং بَيْقَرَ] بَيْطَرَا এটা بَيْطَارُ থেকে পশুর চিকিৎসককে বলে। আর بَيْقَرَ অর্থ হলো أَفْسَدَ، شَقَّ এবং أَهْلَكَ

٣٨. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ مَرْقٰى إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ أَيْ عَلَيْهِ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ حَتّٰى يُمْكِنُهُمْ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِزَعْمِهِمْ إِنِ ادَّعَوْا ذٰلِكَ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ أَيْ مُدَّعِي الْاِسْتِمَاعِ عَلَيْهِ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. بِحُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَاضِحَةٍ.

৩৮. নাকি তাদের নিকট সিঁড়ি আছে আকাশে আরোহণ করার যন্ত্র যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে থাকে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের কথাবার্তা, যার ফলে তাদের জন্য নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ সকল চিন্তাধারার ব্যাপারে মুনাযারা/ তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব হয়ে গেছে। যদি তারা এ দাবি করে থাকে। থাকলে তাদের সেই শ্রোতা উপস্থিত করুক অর্থাৎ শ্রবণ করার দাবিদার উপস্থিত করুক সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।

٣٩. وَلِشِبْهِ هٰذَا الزَّعْمِ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ قَالَ تَعَالٰى أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ أَيْ بِزَعْمِكُمْ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا زَعَمُوْهُ.

৩৯. আর এই ধারণা তাদের ঐ ধারণার সদৃশ হওয়ার কারণে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা আল্লাহ তা'আলা বলেন– তবে কি কন্যা সন্তানগণ তাঁর জন্য অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মতে। এবং পুত্র সন্তানগণ তোমাদের জন্য। তোমরা যে ধারণা পোষণ কর তা হতে আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে।

٤٠. أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا عَلٰى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الدِّيْنِ فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ غُرْمٍ لَكَ مُثْقَلُوْنَ ط فَلَا يُسْلِمُوْنَ.

৪০. তবে আপনি কি তাদের থেকে কোনো প্রতিদান চান আপনি যে দীন নিয়ে আগমন করেছেন এর বিনিময়ে যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে যার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে না।

٤١. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ أَيْ عِلْمُهُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ط ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْكِنُهُمْ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَعْثِ وَأَمْرِ الْاٰخِرَةِ بِزَعْمِهِمْ.

৪১. নাকি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয় কিছু লিখে? যার ফলে তাদের পক্ষে মহানবী ﷺ -এর সাথে তাদের ধারণা মতে পুনরুত্থান এবং পরকালীন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয়ে গেছে।

٤٢. أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ط بِكَ لِيُهْلِكُوْكَ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ط الْمَغْلُوْبُوْنَ الْمُهْلَكُوْنَ فَحَفِظَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ ثُمَّ اَهْلَكَهُمْ بِبَدْرٍ ـ

৪২. অথবা তারা কি কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? আপনার সাথে দারুন নদওয়াতে আপনাকে বিনাশ করার জন্য পরিণামে কাফেররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। তারাই পরাজিত। তারাই ধ্বংসশীল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে তাদের থেকে রক্ষা করেছেন। তাদেরকে বদর ময়দানে ধ্বংস করেছে।

٤٣. أَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ بِهٖ مِنَ الْاٰلِهَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِاَمْ فِيْ مَوَاضِعِهَا لِلتَّقْبِيْحِ وَالتَّوْبِيْخِ ـ

৪৩. নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্যকোনো ইলাহ আছে? তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র! সকল স্থানে أَمْ -এর সাথে اِسْتِفْهَامْ আনাটা تَقْبِيْح তথা মন্দত্ব বর্ণনা করা ও تَوْبِيْخ তথা ধমকির জন্য এসেছে।

٤٤. وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا بَعْضًا مِّنَ السَّمَاۤءِ سَاقِطًا عَلَيْهِمْ كَمَا قَالُوْا فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ اَيْ تَعْذِيْبًا لَهُمْ يَقُوْلُوْا هٰذَا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ـ مُتَرَاكِبٌ نَرْتَوِيْ بِهٖ وَلَا يُؤْمِنُوْا ـ

৪৪. তারা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের উপর ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে যেমনটি তারা বলেছিল যে, আকাশের কোনো খণ্ড আমাদের উপরে ফেলে দাও অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। তারা বলবে, এটাতো এক পুঞ্জিভূত মেঘ। অর্থাৎ জমাকৃত বৃষ্টি। যার দ্বারা আমরা পরিতৃপ্ত হবো এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

٤٥. فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ لا يَمُوْتُوْنَ ـ

৪৫. আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে। মৃত্যুবরণ করবে।

٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِيْ بَدَلٌ مِّنْ يَوْمِهِمْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ط يُمْنَعُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

৪৬. সেদিন কোনো কাজে আসবে না এটা يَوْمَهُمْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। পরকালে তাদের থেকে শাস্তি প্রতিহত করা হবে না।

٤٧. وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِكُفْرِهِمْ عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ اَيْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ فَعُذِّبُوْا بِالْجُوْعِ وَالْقَحْطِ سَبْعَ سِنِيْنَ وَبِالْقَتْلِ يَوْمَ بَدْرٍ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ اَنَّ الْعَذَابَ يَنْزِلُ بِهِمْ ـ

৪৭. এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে, জালেমদের জন্য তাদের কুফরির কারণে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের মৃত্যুর পূর্বে। সুতরাং তাদেরকে সাত বছর পর্যন্ত ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না যে, তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

٤٨. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ بِإِمْهَالِهِمْ وَلَا يَضِيْقُ صَدْرُكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِمَرْأَىٰ مِنَّا نَرَاكَ وَنَحْفَظُكَ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ اَىْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ حِيْنَ تَقُوْمُ . مِنْ مَنَامِكَ اَوْ مِنْ مَجْلِسِكَ .

৪৮. আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে এবং আপনার হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়, আপনি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছেন অর্থাৎ আপনি আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছেন, আমি আপনাকে দেখছি এবং আপনার হেফাজত ও সংরক্ষণ করছি। আপনি আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ আপনি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলুন যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করবেন।

٤٩. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ حَقِيْقَةً اَيْضًا وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ مَصْدَرٌ اَىْ عَقْبَ غُرُوْبِهَا سَبِّحْهُ اَيْضًا اَوْ صَلِّ فِى الْاَوَّلِ الْعِشَائَيْنِ وَفِى الثَّانِىْ سُنَّةُ الْفَجْرِ وَقِيْلَ الصُّبْحُ .

৪৯. এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন রাত্রিকালেও প্রকৃতভাবে ও তারকার অস্তগমনের পর। اِدْبَارَ হলো মাসদার। অর্থাৎ তারকারাজি অস্তমিত হওয়ার পর তাসবীহ পাঠ করুন। প্রথমটি দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামাজ পড়া উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা ফজরের সুন্নত উদ্দেশ্য এটাও বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টি দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ دُمْ عَلٰى تَذْكِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ : فَذَكِّرْ-এর তাফসীর دُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَثْبِتْ টা ذَكِّرْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে আপনি এখনো পর্যন্ত তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন অনুরূপভাবে আগামীতেও আপনি তাদেরকে অনরবত উপদেশ দিতে থাকুন। তাদের কথার কারণে বিফল মনোরথ হয়ে উপদেশ দান বন্ধ করে দূরে চলে যাবেন না।

قَوْلُهُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ : এর অর্থ হলো بِفَضْلِ رَبِّكَ

قَوْلُهُ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ : এখানে بَاء টা হলো قَسَم-এর জন্য نِعْمَةِ رَبِّكَ হলো مُقْسَمْ بِهٖ যা مَا-এর ইসম اَنْتَ আর খবর كَاهِن-এর মাঝে পতিত হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ গণক (كَاهِنْ) এমন ব্যক্তিকে বলে যে, দাবি করে যে, আমি প্রত্যাদেশ ব্যতীত অদৃশ্যের সংবাদ সম্বন্ধে অবগত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, بِنِعْمَةِ-এর মধ্যে بَاء-টি হলো سَبَبِيَّة এবং নেতিবাচক বাক্যের مَضْمُوْن-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থ হলো اِنْتَفٰى عَنْكَ الْكَهَانَةُ وَالْجُنُوْنُ بِسَبَبِ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহর রহমতে আপনার থেকে গণকের কর্ম ও উন্মাদনাকে রহিত করা হয়েছে। -[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

قَوْلُهُ اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ : এ আয়াতগুলোতে اَمْ টি ১৫টি জায়গায় এসেছে। প্রতিটি স্থানেই এর উহ্য রূপ بَلْ এবং হামযার সাথে রয়েছে। اِسْتِفْهَامْ-এর হামযা অস্বীকার ও ধমকের জন্য হয়েছে। কাজেই মুফাসসির (র.)-এর জন্য উচিত ছিল যে, প্রত্যেক স্থানেই بَلْ এবং হামযাকে উহ্য মানা।

قَوْلُهُ تَرَبَّصُوا : এখানে أَمْر টা تَهْدِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحْلَامُهُمْ : এটি حُلْم [حَا، বর্ণে পেশ] حِلْم [حَا، বর্ণে যের]-এর বহুবচন حُلُم [حَا، বর্ণে পেশ , এবং বহুবচন حُلُم [حَا، বর্ণে পেশ] অর্থ হলো স্বপ্ন। আর حِلْم [حَا، বর্ণে যের] অর্থ সহনশীল, ধৈর্যশীল। যেহেতু সহনশীলতা জ্ঞানের কারণে হয়ে থাকে حِلْم অর্থ জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। মনে হয় যেমন এখানে سَبَبْ مُسَبَّبْ বলে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمْ يَخْتَلِقْهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ -এর হামযাটা অস্বীকারমূলক।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالُوْا اِخْتَلَقَهُ : এটা উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ এটা উহ্য শর্তের جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِشِبْهِ هٰذَا الزَّعْمِ بِزَعْمِهِمْ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ : এই ইবারতে বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের অপনোদন করা। সংশয় হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ -এর সাথে এর পূর্বের কোনো সম্পর্ক জানা যায় না।

সন্দেহের উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হলো পূর্বের আয়াতে মুশরিকদের এ ধারণাকে বর্ণনা করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কুরআন রচনা করে মানুষের নিকট পেশ করছেন। তাদের এ ধারণা বাতিল ও অসার। দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিকদের এ বাতিল ধারণার উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। উভয় ধারণাই ফাসেদ এবং বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে মুশতারাক। আর এটাই হলো وَجْه اِشْتِرَاك উভয় আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক ও مُنَاسَبَتْ প্রমাণিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ غُرْمٌ : مَغْرَمٌ -এর তাফসীর عَزْم দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَغْرَمٌ -এর مِيْم টি مَصْدَر مِيْمِيْ

قَوْلُهُ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ : মুফাসসির (র.)-এর জন্য উচিত ছিল دَارُ النَّدْوَةِ শব্দটি উহ্য করে দেওয়া। কেননা দারুন নদওয়াতে মুশরিকরা সমবেত হয়েছিল রাসূল ﷺ -এর হিজরতকালে। যাতে রাসূল ﷺ -কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল আর এই সূরা হলো মাক্কী যা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। কাজেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে নদওয়ার সাথে আবদ্ধ করা কঠিন কাজ। এরই উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, দারুন নদওয়ার قَيْد -কে উহ্য রাখাই ভালো হতো। কেননা রাসূল ﷺ প্রেরিত হওয়ার থেকেই তো চক্রান্তের ধারা অব্যাহত ছিল।

قَوْلُهُ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا : এই আয়াত হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমনটি সূরা শু'আরাতে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর সূরা বনী ইসরাঈলে কুরাইশদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত ছিল। আর সেই আয়াতটি হলো أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

قَوْلُهُ فَذَرْهُمْ : এটা شَرْط مُقَدَّمْ -এর جَزَاء এর উহ্য শর্ত হলো এই যে– إِذَا بَلَغُوْا فِى الْعِنَادِ إِلٰى هٰذَا فَذَرْهُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُوْنٍ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দু'দল লোকের উল্লেখ রয়েছে, এক দল যারা সত্যদ্রোহী, যারা অশান্তি প্রিয়, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত তাদের সম্পর্কে সূরার প্রারম্ভে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের শাস্তি অনিবার্য, এরপর ঈমানদার ও নেককারদের শুভ পরিণতি জান্নাতের ঘোষণার পর জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতের কিছু উল্লেখ রয়েছে।

আর এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে এ মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেররা তাঁকে উন্মাদ ও গণক বলতো আর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, হে রাসূল! আল্লাহ পাকের দয়ায় আপনি কাফেরদের অপপ্রচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, আপনি নিষ্কলংক, আপনি পাগলও নন, গণকও নন। আপনার সত্যিকার পরিচয় হলো, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, আর শুধু নবীও নন, বরং সর্বশেষও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। অতএব, কাফেরদের এসব অন্যায় আপত্তিকর মন্তব্যে কিছুই যায় আসে না। নবী হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো মানুষকে উপদেশ দান করা, এ দায়িত্ব আপনি যথারীতি পালন করতে থাকুন, হতভাগা কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনি তো আমার সাহায্য লাভে ধন্য, কাফেররা যাই বলুক, তাতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই।

قَوْلُهُ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ : এ আয়াতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে' হে রাসূল! কাফেররা যে আপনার কথায় কর্ণপাত করে না, তার কারণ কি এই যে, তারা আপনাকে একজন কবি মনে করে। কালের গর্ভে অনেক কবিই হারিয়ে গেছে তাদের ধারণা হলো, আপনিও এভাবে হারিয়ে যাবেন, তারা সে দিনেরই অপেক্ষায় আছে।

قَوْلُهُ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ : [হে রাসূল!] আপনি তাদেরকে বলুন তোমরা আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছো তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি, দেখি তোমাদের কী পরিণতি হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে কি আদেশ দান করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা আমার পরিণতি দেখার অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষা করছি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর। আর তা হলো, আমার শুভ পরিণতি হলো পরম সাফল্য আর তোমাদের শোচনীয় পরিণতি হলো চরম ব্যর্থতা এবং কঠিন শাস্তি।

–[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ১০১০]

قَوْلُهُ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে কখনো গণক, কখনো পাগল বলতো, আর কখনো তাঁকে কবিও বলা হতো। আর আলোচ্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কুরাইশদেরকে মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে, কিন্তু তাদের বুদ্ধির দৌড় কি এতখানি যে, আল্লাহর প্রিয়নবী ﷺ -কে তারা গণক, পাগল বা কবি মনে করে? তাদের বিবেক বুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওহী নাজিল হয়, আর কবি যে কল্পনার জাল বিস্তার করে এবং মাতাল যে প্রলাপ বকে, এর মধ্যে তারা কি কোনো পার্থক্যই করতে পারে না? তারা কি এতই নির্বোধ, প্রকৃতপক্ষে, তারা সবই বোঝে, তবে তারা জ্ঞানপাপী তাদের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে দৌরাত্ম্য এবং সত্যদ্রোহিতা, আর সেই স্বভাবগত দৌরাত্ম্যের কারণেই তারা সত্যকে গ্রহণ করে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ 'তাদের বিচার বুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? অথবা তারা এক সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি'।

অর্থাৎ কুরাইশ সর্দারদেরকে তো বুদ্ধিমান মনে করা হয়, কিন্তু তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এ আদেশই দেয় যে, একই ব্যক্তিকে তারা একবার গণক বলে, আবার জাদুকর বলে, কখনো কবি বলে, আবার কখনো উন্মাদ বলে, অথচ যে জাদুকর সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আর যে উন্মাদ তার বুদ্ধিই নেই, তাদের এসব স্ববিরোধী কথাবার্তায় একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারাই নির্বোধ, অথবা সত্যদ্রোহিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় তারা সীমালঙ্ঘন করছে পবিত্র কুরআন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্যতার দলিল প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত এবং অনস্বীকার্য।

قَوْلُهُ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ .... اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ : অর্থাৎ এ কাফেররা কি একথা বলতে চায় যে, পবিত্র কুরআনকে হযরত রাসূলে করীম ﷺ নিজেই রচনা করে এনেছেন এবং আল্লাহ পাকের কালাম বলে প্রচার করেছেন? তারা কি এ ধারণা করে যে, পবিত্র কুরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব? যদি তাদের এ ধারণাই হয়, তবে পবিত্র কুরআনের অনুরূপ কোনো বাণী তারা রচনা করে নিয়ে আসুক। অথচ তা কখনো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মানব দানব সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও পবিত্র কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাদেরকে বারে বারে আহবান জানানো সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মূলত এ কাফেরদের মন পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না এবং এ কাফেররা জেনে শুনেই এসব কথা বলছে।

قَوْلُهُ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ :অর্থাৎ তারা যে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের বাণীকে মানে না, এর কারণ কি? তারা কি ভেবেছে যে, তাদের উপর কারো কোনো শক্তি নেই? তারা কি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছে, কে তাদের স্রষ্টা? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কি তাদেরই সৃষ্টি? অথবা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের ভাণ্ডারের আধিপত্য কি তারা লাভ করেছে? প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি রিজিকদাতা, তিনি ভাগ্য-নিয়ন্তা, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা, এসব কথা কাফেররা খুব ভালোভাবেই জানে। কিন্তু তাদের হিংসা, শত্রুতা, মানবতা বিরোধী আচরণ, এ কথার প্রমাণ যে, তাদের পাপপ্রবণ মন তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে, ফলে তারা বুঝে শুনেই সত্যদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকে।

قَوْلُهُ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ : কাফের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতেও তারা ঈমান আনে না, আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কুরআনের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই, অথচ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিন স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যের অপূর্ব জীবন্ত নিদর্শন। এসব নিদর্শন দেখেও কি তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না? নাকি তারা একথা মনে করে যে, তারা এসব সৃষ্টি করেছে? তারা যে সৃষ্টি করেনি, একথা তারা ভালোভাবেই জানে। অতএব, আল্লাহ পাকই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই হলো বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

قَوْلُهُ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ : অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সম্পদ ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব কি তাদের হাতেই রয়েছে? যে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে নবুয়ত দিয়ে দিতে পারে।

অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর কি তাদের আধিপত্য রয়েছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ইলম এবং হিকমত দান করতে পারে? এবং তারা জানতে পারে কে নবুয়তের যোগ্য আর কে ইলম এবং হিকমতের উত্তরাধিকারী হতে পারে? অথবা সবকিছুর উপর কি তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? তথা তারা আল্লাহ পাকের সম্পদের ভাণ্ডারের রক্ষী নিযুক্ত হয়েছে? এসব কিছুই নয়, অতএব তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, যদি তারা এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তবে দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকাই তাদের কাজ।

قَوْلُهُ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا : শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হেফাজতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে– وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাজত করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে– وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জারীর (র.) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তা-ই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

এরপর যদি সে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে। –[ইবনে কাসীর]

মজলিসের কাফফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন: 'যখন দণ্ডায়মান হন' -এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেন, তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তাসবীহ ও তাহমীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোনো সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো পাপকাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালোমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গুনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ –[তিরমিযী, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ الخ : অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার নামাজ এবং সাধারণ তাসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামাজ ও তখনকার তাসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

সূরা নাজম

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম শব্দটি হচ্ছে وَالنَّجْمِ এখানে "وَ" বর্ণটি কসমের জন্য, আর اَلنَّجْمُ অর্থ হলো- তারকা নক্ষত্র, যা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আর এ শব্দটির বিবেচনায়ই এ সূরাকে اَلنَّجْمُ বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ নামকরণের সাথে সূরার বিষয়বস্তুর বিন্দুমাত্র মিল নেই, শুধুমাত্র আলামত বা নিদর্শন হিসেবেই এ শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র একটি আয়াত যা হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সাবহা সম্পর্কে অবতীর্ণ তা মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের ৫৩ নং সূরা। আয়াত সংখ্যা ৬২, রুকূ' সংখ্যা ৩টি, বাক্য সংখ্যা ৩০০টি। এর অক্ষর রয়েছে ১৪০৫ টি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় তাওহীদের প্রমাণ এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে এ নশ্বর জগতের অবসান ও কিয়ামত অনুষ্ঠানের যে প্রমাণ রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ -এর প্রত্যেকটি কথা যে সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় তা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মোবারক জবান থেকে যা বের হয় তা শুধু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী। এ কথার ঘোষণাও রয়েছে এ সূরায়। -[নূরুল কুরআন খ. ২৭, পৃ. ৬৩]

সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা নাজম এমন প্রথম সূরা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ঘোষণা করেন। -[কুরতুবী]

এ সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াতের সিজদা আদায় করেন। মুসলমান এবং কাফের সবাই এ সিজদায় শরিক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সিজদায় অবনত হয় কেবল এক অহঙ্কারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল, ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। -[ইবনে কাছীর]

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে- اَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سُوْرَةُ النَّجْمِ সিজদার আয়াত রয়েছে এমন সূরার মধ্যে সূরা নাজমই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতেই এ হাদীসের যেসব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, আবূ ইসহাক ও যুহাইর ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হতে জানা যায় যে, এটা কুরআন মাজীদের এমন একটা সূরা যা নবী করীম ﷺ কুরাইশদের একটা সাধারণ সভায় [আর ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে] সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফের ও মুমিন উভয় শ্রেণির লোকই উপস্থিত ছিল। শেষের দিকে তিনি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলেন, তখন উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করল। মুশরিকদের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত যারা সকলের অপেক্ষা বেশি বিরোধী ছিল সেজদা না করে পারল না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র একজন উমাইয়া ইবনে খালফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে নিল এবং বলল, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। উত্তরকালে আমার এ চক্ষুদ্বয় এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছে যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবূ অদায়া। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের দেওয়া বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যখন সূরা নাজম পাঠপূর্বক সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় চলে গেল, তখন আমি সিজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ আমি এভাবে করি যে, এ সূরাটি পাঠকালে আমি কখনোই সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'আদ বলেছেন, ইতঃপূর্বে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেছিলেন। এ বৎসরই রমজান মাসে রাসূলে কারীম ﷺ কুরাইশদের সাধারণ সম্মেলনে সূরা নাজম তেলাওয়াত করলেন এবং মুমিন ও কাফের সকলেই তাঁর সাথে সেজদায় পড়ে গেল। আবিসিনিয়ায় হিজরত করে যাওয়া লোকদের নিকট এ খবর পৌঁছল ভিন্ন একরূপ নিয়ে। তাতে বলা হলো যে, মক্কার কাফেররা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ সংবাদ পেয়ে হিজরতকারীদের মধ্যে কিছুলোক নবুয়তের ৫ম বর্ষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে এসে দেখতে পেলেন, জুলুমের চাকা পূর্বানুরূপই সবকিছু নিষ্পিষ্ট করে চলছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। এ প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এ সূরাটি নবুয়তের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি : নাজিল হওয়ার সময়কাল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে যে অবস্থার মধ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়েছিল তা জানা যায় যে, নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ কেবলমাত্র অপ্রকাশ্য মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাতেছিলেন। এ দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে কোনো সাধারণ জনসমাবেশে কুরআন মাজীদ পড়ে শুনাবার কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি। কাফেরদের কঠিন প্রতিরোধই ছিল তাঁর পথের প্রতিবন্ধক। রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যক্তিত্বে তাঁর তাবলীগী কার্যাবলি ও তৎপরতায় কি তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক রকমের প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা সবিশেষ অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এ কালাম না শুনবার এবং অন্যরাও যাতে শুনতে না পারে সেজন্য চেষ্টা ও যত্নের কোনো ত্রুটি করত না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে নানা প্রকারে ভুল ধারণা প্রচার করে কেবলমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর এ দীনি মিশনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে এক দিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, 'মুহাম্মদ ﷺ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং এক্ষণে অন্য লোকদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে।' অপরদিকে তিনি যেখানেই কুরআন শুনানোর চেষ্টা করতেন, সেখানে হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতে না পারে, এরূপ করার মূলে তাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

এরূপ অবস্থায় একদিন রাসূলে কারীম ﷺ হেরেম শরীফের মধ্যে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে কুরাইশ বংশের লোকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুখে ভাষণটি বিঘোষিত হয়, আর তা-ই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা নাজম রূপে। এরূপ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি যখন এটা শুনাতে শুরু করলেন, তখন তাঁর বিপরীত চিৎকার ও কোলাহল করার কোনো হুঁশ-ই বিরুদ্ধবাদীদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী করীম ﷺ যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সিজদায় পড়ে গেল। এটা ছিল তাদের একটা বড় দুর্বলতা, এ দুর্বলতা যখন তারা দেখে ফেলল, তখন তারা বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়ল। সাধারণ লোকেরাও তাদের এ বলে ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্য লোকদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে অথচ তারা নিজেরাই সেই কালাম শুধু যে মনোযোগ সহকারে শুনছে তাই নয়; বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা সিজদাও করেছে। লোকদের এ ভর্ৎসনা হতে বাঁচার জন্য তখন তারা একটা মিথ্যা কথাও বলতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল, দেখুন, আমরা তো শুনতে পাচ্ছিলাম যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى পড়ার পর যেন পড়ছেন- تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى 'এ উচ্চ সম্মানিত দেবী। আর তাদের শাফাআত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়।' এ কারণে আমরা মনে করেছিলাম, মুহাম্মদ আমাদের আকিদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এ কারণেই আমরা তাঁর সঙ্গে একত্র হয়ে সিজদা করতে কোনো দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য কয়টি শুনতে পেয়েছে বলে দাবি করেছে, এই গোটা সূরার পূর্বাপর প্রেক্ষিতের সাথে তার বিন্দুমাত্রও সামস্য আছে এবং তাতে এ বাক্য কয়টিও পড়া হয়ে থাকতে পারে- এরূপ কথা কেবলমাত্র পাগলরাই চিন্তা করতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : মক্কার কাফেররা কুরআন মাজীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যে আচরণ অবলম্বন করে আছে, তা যে একান্ত ভুল সেই কথা জানিয়ে দেওয়া ও আমাদের এসব বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াই এ ভাষণের মূল বিষয়বস্তু।

কথা আরম্ভ করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোনো বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন, তোমরা যেমনটা তাঁর সম্পর্কে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। ইসলামের এ শিক্ষা ও দাওয়াত তিনি নিজের কল্পনা হতেও বানিয়ে নেননি- যেমনটি তোমরা মনে করে নিয়েছ; বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন, তা একান্তই ওহী বৈ কিছুই নয়, যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়। তোমাদের সামনে তিনি যে মহাসত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর নিজের ধারণা অনুমান কল্পনায় রচিত নয়। তার সবই তাঁর নিজ চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখা মহাসত্য বিশেষ। এ জ্ঞান তাঁকে যে ফেরেশতার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাঁকে তিনি নিজে দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহর বিরাট মহান নিদর্শনাবলি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজের কল্পনাবশে কোনো কথা বলেন না, যা বলেন নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখে তবে বলেন। কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি দৃষ্টিমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে- এমন জিনিস নিয়ে, যা সে নিজে দেখতে পায় না, তাহলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এখানে তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে- **প্রথমত** শ্রোতাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ কর তা নিছক ধারণা, অনুমান ও মনগড়াভাবে স্থির করে নেওয়া কতকগুলো কথার উপরই তার ভিত্তি সংস্থাপিত। তোমরা লাত-মানাত ও উযযার ন্যায় কতিপয় দেবীকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ, অথচ প্রকৃত 'ইলাহ' হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর একবিন্দুও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাগণকে মনে করে বসেছ আল্লাহর কন্যা-সন্তান, অথচ তোমরা নিজেরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর। তোমরা নিজেরা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের এসব মা'বুদ আল্লাহ তা'আলা দ্বারা তোমাদের কাজ উদ্ধার করিয়ে দিতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার হলো, তারা তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর নিকটবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও একত্র হয়ে আল্লাহ দ্বারা কোনো কথা মানিয়ে নিতে পারে না। তোমরা এ ধরনের যেসব আকিদা বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছ এর মধ্যে কোনো একটিও কোনোরূপ নির্ভুল জ্ঞান কিংবা প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয়।

দ্বিতীয়ত লোকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ অধিকর্তা। যে লোক তাঁর দেখানো পথের অনুসারী সেই সত্যানুসারী। যে লোক তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নয়, সে-ই পথভ্রষ্ট।

তৃতীয়ত কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার শত শত বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফাসমূহে সত্য দীনের যে কয়টি মৌলিক বিষয় বিবৃত হয়েছে তা এ সূরার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে।

এ সূরার আমল : যে ব্যক্তি সূরা নাজম হরিণের চামড়ায় লিখে হাতে বেঁধে রাখবে, সে বিজয়ী হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالنَّجْمِ الثُّرَيَّا إِذَا هَوٰى لا غَابَ ۔

১. নক্ষত্রের কসম সুরাইয়া তারকা, যখন তা অস্তমিত হয় গোপন হয় বা ডুবে যায়।

٢. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ وَمَا غَوٰى ج مَا لَابَسَ الْغَيَّ وَهُوَ جَهْلٌ مِنْ اِعْتِقَادٍ فَاسِدٍ ۔

২. তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি– অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ হেদায়েতের সরল পথ হতে বিচ্যুত হননি এবং বিপদগামীও হননি। অর্থাৎ তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হননি। [غَوٰى যেটা اَلْغَوَايَةُ হতে নির্গত হয়েছে] তার অর্থ হলো কুসংস্কারমূলক অন্ধ বিশ্বাস।

٣. وَمَا يَنْطِقُ بِمَا يَاتِيْكُمْ بِهِ عَنِ الْهَوٰى ط هَوٰى نَفْسِهِ ۔

৩. তিনি বলেন না ঐ সম্পর্কে যেটা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন [কুরআন বা ওহী সংক্রান্ত বিষয়াদি] কুপ্রবৃত্তি অনুসারে অর্থাৎ স্বীয় মনের প্রবৃত্তি অনুসরণে।

٤. اِنْ مَا هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى لا اِلَيْهِ ۔

৪. এটা [কুরআন] তো ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয় যা প্রত্যাদেশ হয় তাঁর প্রতি।

٥. عَلَّمَهُ اِيَّاهُ مَلَكٌ شَدِيْدُ الْقُوٰى لا

৫. তাকে শিক্ষা দান করেন এমন এক ফেরেশতা যিনি প্রবল শক্তিশালী।

٦. ذُوْ مِرَّةٍ ط قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ اَوْ مَنْظَرٍ حَسَنٍ اَىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَوٰى لا اِسْتَقَرَّ ۔

৬. [যে ফেরেশতা] প্রজ্ঞাসম্পন্ন শক্তি ও দৃঢ়তা সম্পন্ন অথবা আকৃতিতে অপরূপ সুন্দর অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) অতঃপর সে স্বীয় আকৃতিতে স্থির হয়েছিল। স্থির হয়ে দাঁড়াল।

٧. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ط اُفُقُ الشَّمْسِ اَىْ عِنْدَ مَطْلَعِهَا عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ بِحِرَاءَ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ سَاَلَهُ اَنْ يُّرِيَهُ نَفْسَهُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا فَوَاعَدَهُ بِحِرَاءَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ صُوْرَةِ الْاٰدَمِيِّيْنَ ۔

৭. তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে সূর্যের দিকে তথা সূর্য উদিত হওয়ার স্থলে তার মূল আকৃতিতে, নবী করীম ﷺ তাকে হেরা গুহা হতে দেখেছেন যে, পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দিগন্ত আবৃত হয়ে গিয়েছে। যা দেখা মাত্রই তিনি [নবীজী ﷺ] বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছেন। বস্তুত নবী করীম ﷺ তাকে তার সেই মূল আকৃতিতে প্রকাশ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেই আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা তিনি হেরাগুহায় হওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) মনুষ্য আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছেন।

৮. ثُمَّ دَنٰى قَرُبَ مِنْهُ فَتَدَلّٰى ۙ زَادَ فِى الْقُرْبِ ـ

৮. তারপর সে নিকটবর্তী হলো অর্থাৎ সে ফেরেশতা তার [মুহাম্মদ ﷺ -এর] নিকটবর্তী হলো। এরপর আরো নিকটবর্তী হলো অর্থাৎ অতি নিকটবর্তী হলো।

৯. فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَدْرَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ج مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى اَفَاقَ وَسَكَنَ رَوْعُهُ ـ

৯. ফলে রইল তাদের মাঝের ব্যবধান– সমপরিমাণ দুই ধনুকের পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা কম অর্থাৎ দুই ধনুক অপেক্ষা [কম] ইতোমধ্যে নবী করীম ﷺ -এর হুঁশ ফিরে আসে এবং তিনি স্থির হলেন।

১০. فَاَوْحٰى تَعَالٰى اِلٰى عَبْدِهٖ جِبْرَئِيْلَ مَآ اَوْحٰى ـ جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُذْكَرِ الْمُوْحٰى تَفْخِيْمًا لِشَاْنِهٖ ـ

১০. তখন ওহী করলেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অর্থাৎ জিবরাঈল– [পরবর্তীতে] যেটার ওহী করল জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর প্রতি। বিশেষ গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্যে ওহীর বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়নি।

১১. مَا كَذَبَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَنْكَرَ الْفُؤَادُ فُؤَادُ النَّبِيِّ مَا رَاٰى ـ بِبَصَرِهٖ مِنْ صُوْرَةِ جِبْرَئِيْلَ ـ

১১. মিথ্যারোপ করেননি– كَذَبَ পদটি তাখফীফ তথা তাশদীদ ব্যতীত শুধু যবর দিয়ে এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবেই হতে পারে। আর তাশদীদ-এর সূরতে অর্থ হবে অস্বীকার। অন্তঃকরণ– নবী করীম ﷺ -এর অন্তর, যা সে দেখেছে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর যে আকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

১২. اَفَتُمَارُوْنَهٗ تُجَادِلُوْنَهٗ وَتَغْلِبُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ـ خِطَابٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الْمُنْكِرِيْنَ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ لِجِبْرَئِيْلَ (ع) ـ

১২. তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? তাকে পরাভূত করার জন্যে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ ঐ বিষয়ের উপর যা সে দেখেছে [এ আয়াতে] ঐ সকল মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ কর্তৃক জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার ব্যাপারটি অস্বীকার করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَالنَّجْمِ : এখানে وَاوْ টা হলো قَسَمِيَّة আর اَلنَّجْمُ অর্থ হলো তারকা। বহুবচনে نُجُوْمٌ এবং اَنْجُمٌ আসে। এটা اِسْمِ جِنْسٍ-এর উপর اِسْمِيَّتٌ প্রাধান্য লাভ করেছে। যখন মুতলাকভাবে বলা হয় তখন 'সূরাইয়া' তারকা উদ্দেশ্য হয়। এখানে اَلنَّجْمُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এতে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা–

১. এক দলের অভিমত হলো তারকা জিনস উদ্দেশ্য।

২. আল্লাম সুদ্দী (র.) বলেন, যুহরা তারকা উদ্দেশ্য। আরবের এক সম্প্রদায় এর পূজা-অর্চনা করত।

৩. সুরাইয়া তারকা উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) এটাই গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ ও অন্যান্যরাও এটাকে উদ্দেশ্য করেছেন।

৪. কেউ কেউ বলেছেন। এর দ্বারা বেলদার ঘাম উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহর বাণী وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ -এর মধ্যে আল্লামা আখফাশ (র.) এটাই গ্রহণ করেছেন।

৫. কারো কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য।

৬. কেউ কেউ কুরআন উদ্দেশ্য করেছেন, তা نَجْمًا نَجْمًا বা কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। মুজাহিদ , ফররা ও অন্যান্যের এ অভিমত রয়েছে। এ ছাড়া ও আরো অনেক মতামত রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামত হলো- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরাইয়া তারকা। –[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

সুরাইয়া সাতটি তারকার সমষ্টিগত নাম। তন্মধ্যে ছয়টি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। আর একটি অস্পষ্ট। কেউ কেউ বলেন ৭টি তারকার সমষ্টিকে সূরাইয়া বলা হয়। লোকেরা সূরাইয়া দ্বারা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করে থাকে। 'শিফা' গ্রন্থে কাজী আয়াজ (র.) লিখেছেন যে, রাসূল ﷺ সূরাইয়ার এগারোটি তারকা দেখতে পেতেন, মুজাহিদ থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا هَوٰى : এর অর্থ হলো سَقَطَ এবং غَابَ

قَوْلُهُ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى : এটা عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। ضَلَالَةٌ প্রত্যেক ধরনের ভ্রষ্টতাকে বলা হয় চাই তা বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতা হোক বা আমলগত হোক। আর বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতাকে غَوَايَةٌ বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন ضَلَالٌ বলা হয় জ্ঞানগত ভ্রষ্টতাকে। আর আমলগত ভ্রষ্টতাকে غَوَايَةٌ বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, উভয়টি مُتَرَادِفٌ তথা সমার্থবোধক।

قَوْلُهُ عَنِ الْهَوٰى : اَلْهَوٰى এটা ইসমে মাসদার। অর্থ– মনের অবৈধ কামনা। عَنِ الْهَوٰى এটা مَا يَنْطِقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর কোনো কথাই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণে হয় না।

قَوْلُهُ اِنْ هُوَ : এখানে هُوَ -এর মারজি হলো نُطْق যা يَنْطِقُ -এর مَفْهُوم

قَوْلُهُ يُوْحٰى : এটা وَحْيٌ -এর সিফত مَجَازٌ -এর সম্ভাবনা কে শেষ করার জন্য এসেছে। (صَاوِيْ)

قَوْلُهُ عَلَّمَهُ اِيَّاهُ : ضَمِيْر مَنْصُوب مُتَّصِلٌ রাসূল ﷺ -এর দিকে ফিরেছে এবং প্রথম মাফউল এবং দ্বিতীয় ضَمِيْر مَنْصُوب مُنْفَصِلٌ যাকে মুফাসসির (র.) ঊহ্য মেনেছেন তা হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর তা وَحْيٌ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى : এটা উহ্য মাওসূফের সিফত যার প্রতি মুফাসসির (র.) مَلَكٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন উদ্দেশ্য হলো হযরত জিবরীল (আ.)।

قَوْلُهُ ذُوْ مِرَّةٍ : مِرَّةٍ শব্দের অর্থ হলো বাতেনী শক্তি। যেমন দৃঢ়তা, দ্রুত পট পরিবর্তন। আবার কেউ কেউ مِرَّةٍ দ্বারা ইলম এবং কেউ কেউ সৌন্দর্য উদ্দেশ্য নিয়েছেন। مَنْظَرٌ حَسَنٌ বলে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং شَدِيْدُ الْقُوٰى হলো প্রকাশ্য শক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ.)-কে জাহেরী ও বাতেনী শক্তি পরিপূর্ণভাবে দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ فَاسْتَوٰى : এটা عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى -এর উপর عَطْف হয়েছে

قَوْلُهُ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَدَلّٰى : এটা تَدَلّٰى থেকে মাযী-এর وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– সে অবতীর্ণ হলো, সে নিকটবর্তী হলো, সে লটকে আসল, এটা دَلَّيْتَ الدَّلْوَ فِى الْبِئْرِ হতে নির্গত। আমি কূপে বালতি ঝুলিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : নিকটবর্তী হওয়া অবতরণের পরে হয়। কাজেই নিকটবর্তী হলো এরপর অবতরণ করল– এটা অনুচিত মনে হচ্ছে।

উত্তর : মুফাসসির (র.) এই সংশয় নিরসনের জন্যই زَادَ فِى الْقُرْبِ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) নিকটবর্তী হলেন, এরপর আরো নিকটবর্তী হলেন।

আবার কেউ কেউ সংশয়ের এভাবে নিরসন করেছেন যে, বাক্যের মধ্যে পূর্বাপর হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– ثُمَّ تَدَلّٰى فَدَنٰى অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) অবতরণ করলন এবং নিকটবর্তী হলেন।

قَوْلُهُ قَابَ قَوْسَيْنِ : اَلْقَابُ وَالْقَيْبُ এবং اَلْقَادُ وَالْقِيْدُ অর্থ– পরিমাণ। আরবে মাপার ও অনুমান করার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্য হতে একটি হলো قَوْس বা ধনুক দ্বারা মাপা। এটা ছাড়াও আরবগণ নিম্নোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা মাপ নিরূপণ করত رُمْح [বর্শা] سَوْط [কোড়া, চাবুক] ذِرَاعٌ الْبَاعِ الْخُطْوَةِ [পা] اَلشِّبْرُ [বিঘত] فِتْرٌ [শাহাদত আঙ্গুল ও আংটির মধ্যখানের অংশ اَلْاِصْبَعُ [আঙ্গুল]। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) রাসূল ﷺ -এর এতই নিকটবর্তী হলেন যে, শুধুমাত্র দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্ব বাকি থাকল। কেউ বলেন, قَابَ এতটুকু দূরত্বকে বলা হয় যা ধনুকের হাতল ও কিনারার মাঝে হয়ে থাকে। এবং দুই ধনুকে দুটি قَابَ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَوْ اَدْنٰى : এখানে اَوْ টা بَلْ অর্থে হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– اَوْ يَزِيْدُوْنَ -এর মধ্যে اَوْ টা بَلْ অর্থে হয়েছে, আর যদি اَوْ তার আসলের উপর হয় তবে সংশয় দ্রষ্টার হিসেবে হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى اَفَاقَ : এটা উহ্যের غَايَتْ উহ্য ইবারত হলো ضَمَّهُ اِلَيْهِ حَتّٰى اَفَاقَ

قَوْلُهُ مَا كَذَبَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ : উভয়টিই কেরাতে সাব'আর অন্তর্ভুক্ত। তাশদীদের সুরতে অর্থ হবে– আপনার দৃষ্টি যা অবলোকন করেছে হৃদয় তার সত্যায়ন করেছেন। আর تَخْفِيْف -এর সুরতে অর্থে হবে যা কিছু আপনার দৃষ্টি দেখেছে হৃদয় তাতে সংশয় পোষণ করেনি। (صَاوِىْ)

قَوْلُهُ مِنْ صُوْرَةِ جِبْرَئِيْلَ : এটা مَا -এর বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَغْلِبُوْنَهُ : تُمَارُوْنَهُ -এর অন্য তাফসীর تَغْلِبُوْنَهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, تُمَارُوْنَهُ টা تَغْلِبُوْنَهُ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। যার কারণে تُمَارُوْنَهُ -এর সেলাহ عَلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা ছিল সূরা তূর। এতে একত্ববাদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান এবং প্রতিদানের বিষয় আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা নাজমেও উল্লিখিত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যকার যোগসূত্র স্পষ্ট।

اَلنَّجْمُ -এর অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনদের অভিমত : اَلنَّجْمُ শব্দের অর্থে মুফাসসিরীনদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ– কৃত্তিকা সপ্ত নক্ষত্র বা সুরাইয়া। ইবনে জারীর ও যামাখশারী (র.) এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা আরবি ভাষায় যখন শুধু اَلنَّجْمُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সাধারণত তার অর্থ হয় কৃত্তিকা সপ্ত নক্ষত্র সমষ্টি। সুদ্দী বলেন, এটার অর্থ– শুক্রগ্রহ বা যোহরা তারা। আর আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ আবূ ওবাইদা বলেন, এখানে اَلنَّجْمُ শব্দটি বলে নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো যখন সকাল হলো এবং সকল নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হলো। স্থান ও ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে এ শেষ অর্থটিই অগ্রাধিকার যোগ্য। মুজাহিদ হতে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এর অর্থ হলো আকাশের তারকারাজি। তিনি এটাও বলেন, এর অর্থ– "نُجُوْمُ الْقُرْاٰنِ" আর আখফাশ নাহবীর মতে اَلنَّجْمُ অর্থ হচ্ছে– মাটিতে বিস্তৃত ডালাবিহীন তরুলতা। –[কুরতুবী, জালালাইন]

وَالنَّجْمِ উক্তি দ্বারা শপথ করার রহস্য : আলোচ্য স্থানে "وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى" দ্বারা অস্ত যাওয়া নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। এ শপথ করার মূলে বিশেষ তাৎপর্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যখন নীল আকাশে ঝকঝক করতে থাকে, তখন অন্ধকারের মধ্যে তারকারাজির সেই ঝাপসা আলোকে চারপার্শ্বের জিনিসপত্র স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না। তখন বিভিন্ন জিনিসের অস্পষ্ট আকার-আকৃতি দেখে সেই সব সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার শিকার হওয়া কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। যেমন অন্ধকারে খানিকটা দূরত্ব হতে দণ্ডায়মান একটা বৃক্ষ দেখে সেটাকে ভূত মনে করা যেতেই পারে। বালুর স্তূপের মধ্য হতে কোনো পাথর খণ্ড উঁচু হয়ে থাকতে দেখে মনে হতে পারে যে, কোনো বিরাট জন্তু বসে আছে। কিন্তু তারকাসমূহ যখন অস্তমিত হয় এবং সকাল বেলায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তখন প্রত্যেকটি জিনিস তার স্বীয় রূপ ও আকার-আকৃতি নিয়ে প্রতিটি মানুষের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন কোনো জিনিসের সঠিকরূপ ও আকার-আকৃতির ব্যাপারে কোনো দ্বিধাবোধ বা সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয় না। তোমাদের মাঝে বসবাসকারী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিসত্তা কিছুমাত্র অন্ধকারে নিপতিত নয়। তা প্রভাত আলোকের মতোই উজ্জ্বল ও সর্বজনবিদিত। তোমরা নিশ্চিত জান, তোমাদের এ সঙ্গী এক অতীব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির এবং বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন, কুরাইশ বংশের লোকদের এমন ভুল ধারণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি যে অতীব সদিচ্ছাপরায়ণ ও সত্যপন্থি মানুষ, তাও ভালো করেই তোমাদের জানা রয়েছে। তিনি জেনে বুঝে কেবল নিজেই বাঁকাপথ অবলম্বন করেছেন তাই নয়, অন্য লোকদেরকেও এ বাঁকাপথে চলার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছেন, এমন কিছু মনে করা ঠিক হবে না।

ضَلَالَتْ ও غَوَايَةْ -এর মধ্যকার পার্থক্য : অনেকের মতে ضَلَالَتْ এবং غَوَايَةْ -এর অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। তবে তাদের মতে উভয় শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো ضَلَالَتْ -টা هِدَايَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহার হয়। আর غَوَايَةْ শব্দটি رُشْد শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا –

এবং قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ এতদ্ব্যতীত ضَلَالَتْ শব্দটি غَوَايَتْ শব্দের তুলনায় অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

কারো কারো মতে, ضَلَالَتْ অর্থ– জেনে বুঝে ভুল পথে চলা। আর غَوَايَةْ অর্থ না জেনে ভুল পথে চলা। অনেকের মতে ضَلَالَتْ অর্থ– সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া, আর غَوَايَتْ অর্থ– ভুল পথে অতিক্রম করা। কারো কারো মতে, ضَلَالَتْ শব্দের সম্পর্ক قَوْل -এর সাথে আর غَوَايَتْ শব্দের সম্পর্ক فِعْل -এর সাথে।

তোমাদের নবী বা রাসূল না বলে তোমাদের সাথী বলার কারণ : এখানে মহানবী ﷺ -এর নাম বা নবী কিংবা রাসূল শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে "তোমাদের সাথী" বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ বাইরে থেকে আগত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে; বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তার জীবনের কোনো দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবি করায় সেই তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাকে অভিযুক্ত করছ। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৮, পৃ. ১৮৬]

عَنْ طَرِيقِ الْهِدَايَةِ দ্বারা মুফাসসির কোন দিকে ইশারা করেছেন : মুফাসসির (র.) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ -এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন– مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ طَرِيقِ الْهِدَايَةِ مَا ضَلَّ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ضَلَالَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে– اَلْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ আর غَوَايَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে– مَعْصِيَةٌ অর্থাৎ তিনি শব্দ দু'টির মধ্যকার পার্থক্য ও ব্যবধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

আবার একথাও বলা যেতে পারে যে, ضَلَالَةٌ শব্দের সম্পর্ক সাধারণত قَوْل -এর সাথে হয়ে থাকে আর غَوَايَةٌ -এর সম্পর্ক সাধারণত فِعْل -এর সাথে হয়ে থাকে। –[কামালাইন]

قَوْلُهُ وَمَا يَنْطِقُ ..... عَلٰى مَا يَرٰى : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরি করে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোনো সম্ভাবনাই নেই; বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বুখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। যথা–

১. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কুরআন।
২. যার কেবল অর্থ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনো তা কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনো কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এ নীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এ ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তথা পয়গাম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তাঁরা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাঁদের এ ভুলও আল্লাহর কাছে কেবল ক্ষমার্হই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁর কিঞ্চিৎ ছওয়াবেরও অধিকারী হন।

এ বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সব কথাই যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কিছু বলেন না। অথচ সহীহ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রথমে নির্দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জবাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনো সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানবলি বের করেন। এ ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহীতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকতে পারে না।

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতভেদ : এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। যথা–

১. হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাফসীরের সারমর্ম হলো, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ এবং আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, اِسْتَوٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তাফসীরে মাযহারীতে এ তাফসীর অবলম্বিত হয়েছে।

২. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এ তাফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নাজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নাজম। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি বিতর্কের নয়। আসল কারণ হচ্ছে– হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব হাদীসের যে তাফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য এরূপ–

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرَائِيْلُ لَمْ يَرَهُ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ خُلِقَ عَلَيْهَا اِلَّا مَرَّتَيْنِ رَاٰهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سَادًّ اَعْظَمُ خَلْقِهٖ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

শা'বী হযরত মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন– মাসরূক বলেন এবং আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম [এবং আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল।] মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, অর্থাৎ বলেছেন– وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। [আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ হলো] তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তাঁর দেহাকৃতি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। –[ইবনে কাসীর]

সহীহ মুসলিমেও এ রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুবিয়াহ (র.) থেকে এ রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাষা এরূপ।

اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ لَا اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرَائِيْلَ مُنْهَبِطًا .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, না; বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।

–[ফাতহুল বারী খ. ৮, পৃ. ৪৯৩]

সহীহ বুখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেন– فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى তিনি জবাবে বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে ছয়শ বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জারীর (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ما كذب الفواد ما راى আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ রেখেছিল।

আল্লামা ইবনে কাসীরের বক্তব্য : ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, সূরা নাজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'দেখা' ও 'নিকটবর্তী হওয়া' বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ যার গিফারী, আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীর এ উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন, আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক জমানায় হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদারুন উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) দৃষ্টির অন্তরাল থেকে আওয়াজ দিতেন– হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আল্লাহর সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এ আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। তখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন, এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হযরত জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে। –[ইবনে কাসীর]

সারকথা হলো, আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে, উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। এ প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল– কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকট আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয় وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে এ দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-ও এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম, সূরা নাজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং হযরত জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নববী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থেও এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ ইজতিহাদ করেননি, অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। কেননা তিনি যুদ্ধে ইজতিহাদ করেছেন– এর উত্তর কি?

উত্তর : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی আয়াত হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো কথা বলেননি, কিন্তু এটা প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত কথা। কেননা তিনি তো অনেক যুদ্ধে ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনেক রকম ইরশাদ করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি অনেক বস্তুকে হারাম-অবৈধ করেছেন– যেসব বস্তুর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট দলিল ও প্রমাণ কুরআনে কারীমে নেই। সুতরাং তিনি যে নিজের প্রবৃত্তি হতে কোনো কথা বলেন না, এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদও ওহীর অন্তর্ভুক্ত। ওহী একটি قَاعِدَة كُلِّيَّة তথা ব্যাপক ভিত্তিক নীতি যার অনেক جُزْئِيَّاتٌ [শাখা-প্রশাখা] রয়েছে। নবী করীম ﷺ ঐসব جُزْئِيَّاتٌ -এর ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব নবীর ইজতিহাদ وَحْی خَفِیْ তথা বিলুপ্ত ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

এ ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তরে এটাও বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি তো পুরাপুরি প্রযোজ্য; এতদ্ব্যতীত তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন তা তিনটি পর্যায়ে পড়ত, এর বাইরে কোনো কথাই পড়ে না।

১. নবী করীম ﷺ দীনের দাওয়াত সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন অথবা কুরআনেরই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়নের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ওয়াজ-নসিহত করতেন, লোকদেরকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এ সব পর্যায়ে বলা সব কথাবার্তা ওহীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এসব ব্যাপারে তিনি হলেন কুরআনের সহকারী ব্যাখ্যাদাতা। যদিও এটা ওহীর প্রতিশব্দ নয়, কিন্তু এটা ওহী হতে পাওয়া জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি, তাঁরই উপর ভিত্তিশীল এসব কথা ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, কুরআনের শব্দ, ভাষা ও অর্থ সবকিছুই আল্লাহর নিকট হতে আসা। আর অন্যান্য সব বিষয়ের মূল ভাবধারা, বক্তব্য ও বিষয়াদি আল্লাহরই শেখানো, এগুলোকে তিনি নিজের ভাষায় প্রকাশ করতেন। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে কুরআনকে 'ওহীয়ে জলী' (وَحْی جَلِیْ) এবং তাঁর অন্যান্য যাবতীয় কথাবার্তাকে 'ওহীয়ে খফী' (وَحْی خَفِیْ) বলা হয়।

২. দ্বিতীয় প্রকারের কথাবার্তা তিনি বলতেন আল্লাহর কালিমার প্রচার-প্রসার ও প্রচেষ্টা পর্যায়ে। আল্লাহর দীন কায়েম করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া প্রসঙ্গে। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটা আমার নিজের কথা, অনেক সময় ইজতিহাদের ভিত্তিতে তিনি কথা বলেছেন। অতঃপর তার বিপরীত হেদায়েত [নির্দেশনা] নাজিল হয়েছে। এসব কথা ছাড়া অন্যান্য সব কথাই 'ওহীয়ে খফী' (وَحْی خَفِیْ) রূপে গণ্য।

৩. তৃতীয় ধরনের কথাবার্তা তিনি বলতেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। নবুয়তের কর্তব্য পালনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক ছিল না, যা তিনি নবী হওয়ার পূর্বে বলেছেন এবং পরেও বলেছেন। এসব কথাবার্তার ব্যাপারে কাফেরদের কোনো আপত্তিও ছিল না। সুতরাং এটা ওহীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর সেসব কথা সম্পর্কে "আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন"– এমন মনে করার কোনোই কারণ নেই।

"عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى" দ্বারা কোন কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী– عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট হতে নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষালাভ, আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ব্যাখ্যানুযায়ী شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) সহ অনেক তাফসীরকারের মতে আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তার মূল আকৃতিতে দেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আয়াতে কারীমায় বর্ণিত شَدِيْدُ الْقُوٰى এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গুণ। আর এ ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণও রয়েছে। কেননা, সূরার আয়াতসমূহ নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নাজিলকৃত। তাছাড়া নবী করীম ﷺ হতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ সকল আয়াতের তাফসীরে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথারই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ ذُوْ مِرَّةٍ : হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এর অর্থ বলেছেন- সৌন্দর্যমণ্ডিত, ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জায়েদ ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ- শক্তিমান। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন এর অর্থ- প্রজ্ঞা ও কলা-কৌশল। হাদীস শরীফে বর্ণিত- لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ বাক্যে ذِيْ مِرَّةٍ -এর অর্থ হলো- সুস্থ-সবল ও পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন।

এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- বুদ্ধিবৃত্তি ও দৈহিক শক্তি উভয় দিক দিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে।

قَوْلُهُ اُفُقٌ : اُفُقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- দিগন্ত। আর দিগন্ত বলে আকাশের পূর্ব কোণকে বুঝানো হয়। সূর্য যেখান থেকে উদিত হয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে দেয়।

قَوْلُهُ اِسْتَوٰى : "ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى" আয়াতে বর্ণিত اِسْتَوٰى শব্দের অর্থ হচ্ছে- اِسْتَقَرَّ হযরত জিবরীল (আ.) তাঁর প্রকৃত রূপ ও আকার আকৃতির উপর প্রকাশিত হয়েছেন। যেরূপ আকৃতি নিয়ে তিনি ওহী নিয়ে আসতেন সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেননি। উল্লেখ্য যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকালে ওহীর আকার ধারণ করতেন।

প্রকৃতরূপ ও আকার-আকৃতি নিয়ে আগমনের কারণ হচ্ছে রাসূল ﷺ হযরত জিবরীল (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন [জিবরীল] উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন তিনি। যা জুড়ে তিনি বসেছিলেন তা সূর্যের দিগন্ত ছিল।

বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কোনো নবীই হযরত জিবরীল (আ.)-কে তাঁর মূল-অবয়বে দু'বার দেখেননি। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ তাঁকে দু'বার তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে আর একবার আকাশে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ এমন কি দু' ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। অর্থাৎ আকাশের উচ্চতর পূর্ব দিগন্ত হতে হযরত জিবরীল (আ.) আত্মপ্রকাশ করার পর মহানবী ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। তিনি অগ্রসর হতে হতে তাঁর উপর এসে শূন্যলোকে ঝুলে থাকলেন। এরপর তিনি মহানবী ﷺ -এর দিকে ঝুঁকলেন এবং এতোই সন্নিকটে অবস্থান করলেন যে, তাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দু'টি ধনুকের সমপরিমাণ কিংবা তা থেকেও কম দূরত্ব ব্যবধান থাকল। মুফাসসিরগণ قَابَ قَوْسَيْنِ -এর অর্থ সাধারণত দু'ধনুক সমান পরিমাণ অর্থ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) হাত দ্বারা قَوْس শব্দটির অর্থ ব্যক্ত করেছেন। তারা قَابَ قَوْسَيْنِ -এর অর্থ করেছেন তখন তাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দু'হাতের দূরত্ব ছিল। -[ইবনে কাসীর]

হাশিয়ায়ে জালালাইনে আছে قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ ধনুকের তানা ও ধরার কবজের মধ্যকার ব্যবধান। ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়ে থাকে। এখানে দু'টি ধনুক (قَوْسَيْنِ) -এর মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ হলো আরব জাতির লোকদের একটি প্রচলিত অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে সাধারণ শ্রোতাদেরকে মূল বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহিলি যুগে আরব জাতির লোকদের দু'জনের মধ্যে শান্তি-চুক্তি ও মিত্রতা স্থাপন করতে ইচ্ছা করলে উভয়ই নিজ নিজ ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সুতা প্রতিপক্ষের দিকে রাখত এবং নিজ নিজ ধনুক এক সাথে মিলিয়ে শান্তি-চুক্তি ও মিত্রতার শপথ করত। অতঃপর উভয় পক্ষই একত্রে তীর নিক্ষেপ করত। আল্লাহ তা'আলা এখানে এ উদাহরণ পেশ করে জিবরাঈল (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর অতীব নিকটবর্তী হওয়ার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর এত বেশি নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যবর্তী ব্যবধান দু'ধনুক পরিমাণ তথা এর চেয়ে কম ছিল। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

এ নৈকট্যের মাধ্যমে এ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় যে, নবী করীম ﷺ -কে এসব কথা শয়তান শুনিয়েছে। কেননা কাফের ও মুশরিকদের মাঝে কেউ কেউ উপরিউক্ত বিশ্বাসও করত। اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলা তো সন্দেহ হতে পবিত্র; সুতরাং তিনি সন্দেহ প্রকাশক শব্দ اَوْ ব্যবহার করলেন কেন? : বক্তা যদি নিজের উপস্থাপিত বক্তব্যে সন্দিহান হয়ে থাকেন তা হলে তিনি সন্দেহজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এখানে মূল বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা যিনি সন্দেহ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কেন স্বীয় বক্তব্যে সন্দেহজ্ঞাপক শব্দ اَوْ ব্যবহার করেছেন?

এর জবাব হলো- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ আয়াতে أَوْ শব্দটি সন্দেহের কারণে ব্যবহৃত হয়নি; বরং أَوْ শব্দটি এখানে অতীব নৈকট্যের অর্থ বুঝার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর এত বেশি নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, দু'জনের দূরত্বের পরিমাণ দু'ধনুকের অধিক ছিল না; বরং তাঁদের উভয়ের অবস্থান দু'ধনুক পরিমাণ দূরত্বের চেয়েও কম দূরত্বে ছিল। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ; উক্ত আয়াতের দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। যথা- ১. তিনি ওহী পাঠালেন তাঁর বান্দার প্রতি যা কিছু ওহী পাঠালেন। ২. এরূপ তিনি ওহী পাঠালেন নিজ বান্দার প্রতি যা কিছু ওহী করলেন।

প্রথম অনুবাদের দৃষ্টিতে আয়াতের বক্তব্য হয়, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর বান্দার প্রতি ওহী দিলেন, তাঁর ওহী দেওয়ার যা কিছু ছিল। আর দ্বিতীয় অনুবাদে আয়াতের তাৎপর্য হবে। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বান্দার নিকট ওহী নাজিল করলেন যা কিছু তাঁর ওহী করার ছিল। তাফসীরকারগণ এ উভয় প্রকার অর্থই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপরের আলোকে বুঝা যায় প্রথম অর্থই সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ। -[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ দৃষ্টি যা কিছু দেখেছে তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। অর্থাৎ দিবালোকে, পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত অবস্থায় ও খোলা চোখে নবী করীম ﷺ -এর এই যে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হলো, তাতে তাঁর মনে এ কথা জাগ্রত হয়নি যে, এটা দৃষ্টির ভ্রম কিংবা তিনি কোনো জিন বা শয়তান দেখতে পেয়েছেন বা জাগ্রত অবস্থায় তিনি কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁর চক্ষু যা কিছু দেখেছিল,. তাঁর অন্তর তা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিল। তাঁর উপলব্ধি ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্যবেক্ষণের হুবহু অনুরূপ, তিনি যাকে দেখছিলেন তিনি প্রকৃতই জিবরাঈল (আ.) কিনা এবং তিনি যে ওহী দিয়েছিলেন তা প্রকৃতই আল্লাহর ওহী কিনা? এ বিষয়ে তাঁর হৃদয়-মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগেনি। -[তাফসীরে কাবীর, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

أَوْحَىٰ ফে'লের ফা'য়েল : أَوْحَىٰ ফে'লের ফা'য়েল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- أَوْحَىٰ ফে'লের ফায়েল হলো হযরত জিবরাঈল (আ.)। আর কারো কারো মতে, أَوْحَىٰ ফে'লের ফা'য়েল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

প্রথমোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে فَأَوْحَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا أَوْحَىٰ আর দ্বিতীয় অভিমতের বিচারে আয়াতের অর্থ হবে- فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَىٰ عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ

উপরিউক্ত আলোচনার দৃষ্টিতে أَوْحَىٰ جِبْرِيْلُ إِلَىٰ عَبْدِهِ তথা জিবরাঈল 'তাঁর নিজের বান্দার দিকে ওহী করলেন- এটা কখনো হতে পারে না। এ কারণে অবশ্যই তার অর্থ হবে- আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি ওহী করলেন। কিংবা আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে নিজের বান্দার প্রতি ওহী করলেন।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُوْحَىٰ بِهٖ [যে সম্পর্কে ওহী করা হলো] -এর উল্লেখ নেই। কারণ এখানে ওহী অবতীর্ণ করার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিতি পেশ করা। যেন নবী করীম ﷺ ও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, জিবরাঈল ওহী নিয়ে এসে থাকেন; শয়তান বা জিন নয়। তবে আরবি অলংকারশাস্ত্রের কায়দা অনুসারে বুঝা যায় যে, اَلْمُوْحَىٰ بِهٖ উল্লেখ না করা অর্থাৎ তাকে مُبْهَمْ রাখার উদ্দেশ্য হলো ওহীর মর্যাদা বর্ণনা করা। -[ফাতহুল কাদীর]

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ আয়াতে প্রত্যক্ষকারী কে? : مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ আয়াতে বর্ণিত رَأَىٰ ফে'লের ফায়েল কে বা কি কিংবা প্রত্যক্ষকারী কে? এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১. رَأَىٰ ফে'লের ফায়েল হলো اَلْفُؤَادُ অর্থাৎ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْفُؤَادُ অন্তর যা কিছু দেখল, তাতে সে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি।

২. رَأَىٰ ফে'লের ফায়েল হলো اَلْبَصَرُ অর্থাৎ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْبَصَرُ দৃষ্টি যা কিছু দেখল, অন্তর তাতে সংমিশ্রণ করে নি।

৩. رَأَىٰ ফে'লের ফা'য়েল হলো مُحَمَّدٌ ﷺ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু দেখলেন তাঁর অন্তর তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। -[তাফসীরে কাবীর]

আলোচ্য আয়াতস্থিত مَا رَأَىٰ বাক্যে اَلْمَرْئِىْ তথা প্রত্যক্ষিত বস্তুর নির্ণয় : مَا رَأَىٰ বাক্যে যে দেখার কথা বলা হয়েছে, তা কাকে বা কি জিনিস দেখার কথা বলা হয়েছে, তাতে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথা বলা হয়েছে।

২. এখানে আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্যজনক নিদর্শনাবলি দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

৩. এখানে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٣. وَلَقَدْ رَاٰهُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ نَزْلَةً مَرَّةً اُخْرٰى ۙ

১৩. তিনি ফেরেশতাকে তাঁর নিজ আকৃতিতে অন্য একবারও দেখেছেন।

١٤. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى . لَمَّا اُسْرِىَ بِهٖ فِى السَّمٰوٰتِ وَهِىَ شَجَرَةُ نَبْقٍ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَا يَتَجَاوَزُهَا اَحَدٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ .

১৪. সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। যখন নবী করীম ﷺ মি'রাজের রাত্রে আসমানে গিয়েছেন। سِدْرَة হলো আরশের ডান পার্শ্বে বরই গাছের সীমা, ফেরেশতা প্রমুখ কেউই তা অতিক্রম করতে পারে না।

١٥. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ط تَاْوِىْ اِلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ وَاَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ اَوِ الْمُتَّقِيْنَ .

১৫. তার নিকট জান্নাতুল মা'ওয়াও রয়েছে যেখানে ফেরেশতা শহীদ ও মুত্তাকীগণের রূহসমূহের ঠিকানা।

١٦. اِذْ حِيْنَ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهٖ وَاِذْ مَعْمُوْلَةٌ لِرَاٰهُ .

১৬. যখন সিদরাতুল মুন্তাহাকে ঢেকে রেখেছিল যা ঢেকে রেখেছিল– পাখী ইত্যাদি। এখানে اِذْ পদটি رَاٰهُ -এর مَفْعُوْل তথা مَعْمُوْل

١٧. مَا زَاغَ الْبَصَرُ مِنَ النَّبِيِّ وَمَا طَغٰى . اَىْ مَا مَالَ بَصَرُهُ عَنْ مَرْئِيهِ الْمَقْصُوْدِ لَهٗ وَلَا جَاوَزَهٗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .

১৭. দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি এবং অতিক্রমও করেনি অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর দৃষ্টি লক্ষ্যস্থল হতে অপসারিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য অতিক্রম করেনি সেই রাতে।

١٨. لَقَدْ رَاٰى فِيْهَا مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى . اَىِ الْعِظَامَ اَىْ بَعْضَهَا فَرَاٰى مِنْ عَجَائِبِ الْمَلَكُوْتِ رَفْرَفًا خُضْرًا سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ وَجِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

১৮. তিনি সেই রাতে তাঁর প্রভুর বড় বড় আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছেন। অর্থাৎ কোনো কোনো বড় নিদর্শন। যেমন আশ্চর্যজনক সৃষ্টির মধ্যে সবুজ রফরফ দেখেছেন যা সমগ্র নভোমণ্ডলকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছিল এবং তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছিলেন যার ছয়শত ডানা ছিল।

١٩. اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۙ

১৯. আচ্ছা আপনি কি লাত এবং ওজ্জা সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন?

٢٠. وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا الْاُخْرٰى صِفَةُ ذَمٍّ لِلثَّالِثَةِ وَهِىَ اَصْنَامٌ مِنْ حِجَارَةٍ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَعْبُدُوْنَهَا وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ .

২০. এবং তৃতীয় মানাত -এর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন? যা পূর্বোক্ত দুটি ব্যতীত অপর একটি। اُخْرٰى এটা ثَالِثَةَ -এর দুর্নামসূচক বিশেষণ। আর এগুলো হলো পাথর দ্বারা নির্মিত প্রতিমা, মুশরিকরা যাদের পূজা করেছিল এবং তারা বুঝত যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।

وَمَفْعُوْلُ اَرَاَيْتُمُ الْاَوَّلُ اللَّاتُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَالثَّانِىْ مَحْذُوْفٌ وَالْمَعْنٰى اَخْبِرُوْنِىْ اَلِهٰذِهِ الْاَصْنَامِ قُدْرَةٌ عَلٰى شَىْءٍ مَّا فَتَعْبُدُوْنَهَا دُوْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَادِرِ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَلَمَّا زَعَمُوْا اَيْضًا اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ الْبَنَاتِ نَزَلَ ـ

افرأيتم -এর প্রথম مفعول হলো লাত এবং তার উপর যাদের আত্‌ফ করা হয়েছে এবং এর দ্বিতীয় مفعول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আমাকে অবহিত কর যে, এ প্রতিমাগুলোর কোনো বিষয়ের উপর কোনো ক্ষমতা আছে কিনা? যার প্রেক্ষিতে তোমরা পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে তাদের পূজা করতে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান আছে বলে ধারণা করত, বস্তুত তারা নিজেরা কন্যা সন্তান অপছন্দ করত। তাই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২١. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ـ

২১. তোমাদের জন্য ছেলে আর আল্লাহর জন্য মেয়ে- এরূপ হওয়া।

২২. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ـ جَائِرَةٌ مِنْ ضَازَهُ يَضِيْزُهُ اِذْ ظَلَمَهُ وَجَارَ عَلَيْهِ ـ

২২.. এটা তো বড় অসঙ্গত বণ্টন। ضِيْزٰى শব্দটি ضَازَ - يَضِيْزُ - হতে নিষ্পন্ন। অর্থ- অত্যাচার করল।

২৩. اِنْ هِىَ مَا الْمَذْكُوْرَاتُ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَىْ سَمَّيْتُمْ بِهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَهَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا اَىْ بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ فِىْ عِبَادَتِهَا اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج مِمَّا زَيَّنَهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ اَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ط عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ بِالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ فَلَمْ يَرْجِعُوْا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ ـ

২৩. উল্লিখিত বিষয়গুলো কতগুলো নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ রেখেছে। প্রতিমারূপে তোমরা এগুলোর পূজা কর। আল্লাহ তা'আলা এদের ইবাদত করার জন্যে কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। তারা এ সকল প্রতিমার পূজা-অর্চনা করার ব্যাপারে শুধু ভিত্তিহীন ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যা শয়তান ও তাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে যে, তারা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের নিকট হেদায়েত এসেছে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় অকাট্য প্রামাণাদিসহ। তবুও তারা তাদের পূর্বাবস্থা হতে ফিরে আসেনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَاْوٰى : এটা মাসদার এবং اِسْمِ ظَرْف অর্থ দাঁড়ানো, থাকা, অবস্থান গ্রহণ করা, বসবাসের স্থান, ঠিকানা। বাবে ضَرَبَ; যদি আর সেলাহ اِلٰى আসে তাহলে অর্থ হবে আশ্রয় নেওয়া। যদি সেলাহ لَامْ আসে তবে অর্থ হবে মেহেরবানি করা। যেমন- اَوٰى لَهٗ অর্থ হলো- তার উপর মেহেরববানি করল, অনুগ্রহ করল।

قَوْلُهُ لَقَدْ رَاٰى : এখানে لَامْ টা جَوَاب قَسَمْ -এর উপর হয়েছে এর قَسَمْ হলো উহ্য اُقْسِمُ

قَوْلُهُ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى : مِنْ টা হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ এবং رَاٰى -এর মাফউল যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন আর كُبْرٰى হলো اٰيَاتِ -এর সিফত।

প্রশ্ন : اَلْاٰيَات হলো মওসূফ যা বহুবচন আর كُبْرٰى হলো সিফত একবচন কাজেই মওসূফ ও সিফাতের মধ্যে তো সামঞ্জস্য হলো না।

উত্তর : اَلْاٰيَات হলো এমন বহুবচন যে, তার সিফত وَاحِدْ مُؤَنَّثْ নেওয়া বৈধ রয়েছে। এছাড়া মওসূফ ও সিফতের মধ্যে দূরত্বের কারণে তার আরো অতিরিক্ত সৌন্দর্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। -[জুমাল]

এর মধ্যে অন্য আরেকটি তারকীব এরূপও হতে পারে- رَاٰى হলো اَلْكُبْرٰى-এর মাফউলে বিহী, আর مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهٖ হলো حَالْ مُقَدَّمْ উহ্য ইবারত হবে- لَقَدْ رَاٰى الْاٰيَاتِ الْكُبْرٰى حَالَ كَوْنِهَا مِنْ جُمْلَةِ اٰيَاتِ رَبِّهٖ

قَوْلُهٗ رَفْرَفًا : এর অর্থ হলো গালিচা, কার্পেট। رَفْرَفًا خُضْرًا সবুজ গালিচা, সবুজ কার্পেট, সুজলা সুফলা বাগান, এর একবচন হলো رَفْرَفَةٌ -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهٗ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى : এখানে اِسْتِفْهَامْ টা ধমকের জন্য এসেছে لَاتَ সেই ভূতের নাম যাকে কা'বা শরীফে স্থাপন করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এই ভূত তায়েফে ছিল, আর এটা বনূ ছাকীফের দেবতা ছিল। এর তাহকীক করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, এটা لَتَّ السَّوِيْقَ হতে নির্গত। لَاتَ হলো اِسْم فَاعِلْ-এর সীগাহ, অর্থ- খামির তৈরিকারী, সংমিশ্রণকারী। এক ব্যক্তি যে হাজ্জাজকে ছাতু গুলিয়ে পান করাতো। কালবী (র.) বলেন, তার আসল প্রকৃত নাম সরমা ইবনে গমাম ছিল। যখন সে মৃত্যু বরণ করে তখন যে পাথরের উপর বসে সে ছাতু গোলাতো এবং পান করাতো সেই পাথরে একটি বড় ভূতের আকৃতি একে রেখে দিল। পরবর্তীতে লোকেরা এর পূজা শুরু করে দেয়, এটা সেই লাত।

قَوْلُهٗ عُزّٰى : এটা اَعَزٌّ-এর مُؤَنَّثْ এটা গাতফান গোত্রের ভূতের নাম। কেউ কেউ বলেন যে, এটা একটা বাবলা গাছ ছিল। মহানবী ﷺ হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করে তা কেটে ফেলেন। যখন তিনি তা কেটে ফেললেন তখন তা হতে একটি পেত্নী মাথার চুল এলোমেলো করে মাথায় হাত রেখে উচ্চৈঃস্বরে কটুবাক্য ব্যবহার করতে বেরিয়ে আসল। হযরত খালেদ (রা.) তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। হযরত খালেদ (রা.) তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ -কে জানালে তিনি বললেন, এটাই হলো উজ্জা।

قَوْلُهٗ مَنَاةَ : এটা একটি পাথর ছিল, যেটা হুযাইল এবং খোযায়াদের দেবতা ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটা বনূ ছাকীফের দেবতা ছিল। এটা مَنٰى يَمْنٰى থেকে নির্গত, অর্থ হলো প্রবাহিত করা। যেহেতু তার সমীপে অসংখ্য পশু জবাই হতো যে কারণে অনেক রক্ত প্রবাহিত হতো। এ কারণেই এর নাম مَنَاة রাখা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَلْاُخْرٰى : এটা ثَالِثَة-এর صِفَت ذَمّ অর্থাৎ মর্যাদার দৃষ্টিকোণ হতে তৃতীয় নম্বরে।

প্রশ্ন : যখন ثَالِثَة বলে দিল তখন তার اُخْرٰى হওয়াটা নিজে নিজেই বুঝা গেল। এরপর اُخْرٰى বলার কি প্রয়োজন?

উত্তর : اَلْاُخْرٰى হলো صِفَت ذَمّ কেননা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদায় পেছনে। উল্লেখ ও গণনার মধ্যে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ অর্থাৎ ضُعَفَائُهُمْ لِرُؤَسَائِهِمْ

قَوْلُهٗ الثَّانِيْ مَحْذُوْف : اَللّٰتَ তার মা'তূফগুলোর সাথে মিলে اَرَاَيْتُمْ بِمَعْنٰى اَخْبِرُوْنِيْ-এর প্রথম মাফউল, আর اَلِهٰذِهِ الْاَصْنَامِ الخ এটা جُمْلَه اِسْتِفْهَامِيَّة হয়ে দ্বিতীয় মাফউল।

قَوْلُهٗ تِلْكَ : تِلْكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْه হলো قِسْمَةٌ যা তার পূর্বের جُمْلَة اِسْتِفْهَامِيَّة-এর মাফহুম।

قَوْلُهٗ ضِيْزٰى : এটা ضَيْزٌ থেকে নির্গত, অর্থ হলো জুলুম; يَاء-এর কারণে ضَاد-এর যেরকে পেশ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমনটি بِيْضٌ-এর মধ্যে করা হয়েছে। কেননা فِعْلٰى-এর ওযন সিফতের জন্য ব্যবহার হয় না।

প্রশ্ন : মুফাসসির (র.) سَمَّيْتُمُوْهَا-এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের সমাধান করা, প্রশ্নটি হলো اَسْمَاء-এর নাম রাখা যায় না যেমনটি سَمَّيْتُمُوْهَا হতে বুঝা যায়; বরং مُسَمّٰى-এর নাম রাখা হয়।

উত্তরের সারমর্ম হলো বাক্যের মধ্যে حَذْف ; রয়েছে। মূল বাক্য ছিল- سَمَّيْتُمْ بِهَا-এর **মাফউল উহ্য রয়েছে। আর** তা হলো اَصْنَامًا যেমনটি মুসান্নিফ (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَللّٰتَ : اَللّٰتَ শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশ কারীগণ اَللّٰتَ শব্দের ت অক্ষরে তাখফীফ করে اَللّٰتَ পড়েছেন। বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলার জাতি নাম 'আল্লাহ' হতে গৃহীত। কেউ কেউ বলেছেন, اَللّٰتَ শব্দটি لَاتَ - يَلِيْتُ হতে সংগৃহীত। সুতরাং اَللّٰتَ শব্দের শেষাংশে ت অক্ষরটি মৌলিক ও আসল। কেউ কেউ বলেছেন, এটা অতিরিক্ত, তার আসল হলো لَوٰى - يَلْوِىْ কেননা মুশরিকরা এর প্রতি নিজেদের মাথা নত করে এর তাওয়াফ করত। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, اَللّٰتَ শব্দের উপর ت না ধরে وَقْف করা হবে। অধিকাংশ কারীগণ বলেছেন ت অক্ষর ধরে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। কাসায়ী (র.) বলেছেন (ه) ধরে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। ফাররা ও অন্যান্যকারীরা বলেছেন, মূল কুরআনের অনুসরণ করার প্রয়োজনে اَللّٰتَ শব্দে ت অক্ষর ধরে ওয়াক্‌ফ করাই উত্তম।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইবনে জুবাইর, মনসূর ইবনে মু'তারিম, আবূ সালেহ, আবূ জাওজা, ও হামীদ (র.) প্রমুখ اَللّٰتَ শব্দের ت অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে اَللّٰتَّ পড়েছেন। ইবনে কাসীর (র.) হতে এ কেরাতই বর্ণিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কাশশাফ]

قَوْلُهُ مَنٰوةَ : مَنٰوةَ শব্দেও দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ কারীগণ مَنَاةَ শব্দে বর্ণিত اَلِف অক্ষর দ্বারা مَنَاةَ পড়েছেন। এরা الف অক্ষরকে হামজা (أ) বানিয়ে পড়েননি। কিন্তু ইবনে কাসীর, ইবনে মুহায়সিন, মুজাহিদ ও সালামী হামীদ, مَنَاةَ শব্দে বর্ণিত আলিফ (ا) অক্ষরের স্থলে হামযা বসিয়ে তার উপর মদ দিয়ে مَنْٓاءَةَ পড়েছেন।

অধিকাংশ কারীগণ মূল কুরআনের অনুসরণ করত مَنَاةَ শব্দের ة অক্ষরের উপর ت বলবৎ রেখে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলেছেন। ইবনে কাসীর ও ইবনে মুহায়সিন, ه ধরে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলেছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ ضِيْزٰى : ضِيْزٰى শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ কারীগণ ضِيْزٰى শব্দের ى [প্রথম] অক্ষরে সাকিন দিয়ে কোনো হামজা ব্যতীতই ضِيْزٰى পড়েছেন। ইবনে কাসীর (র.) একটি সাকিনযুক্ত হামজাযোগ করে ضِئْزٰى পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَتَّبِعُوْنَ : يَتَّبِعُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। অধিকাংশ কারীগণ يَتَّبِعُوْنَ-কে- جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর শব্দ হিসেবে পড়েছেন। যা মূল কুরআনের শব্দ। তবে ইবনে ওমর, আইয়ূব ও ইবনে সামাইকা শব্দটিকে تَتَّبِعُوْنَ তথা جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ এর- مُضَارِعْ হিসেবে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى : **শানে নুযূল** : মক্কার কাফেররা লাত, মানাত ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করত। তায়েফবাসী ছাকীফ সম্প্রদায়ের লোকেরা লাত নামক প্রতিমার পূজা করত। কুরাইশ বংশের লোকেরা ওজ্জার পূজা করত। আর হেলাল সম্প্রদায়ের লোকেরা মানাত প্রতিমার পূজা করত। তারা এ সকল দেব-দেবীকে ফেরেশতাদের মর্যাদা দিত এবং এদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল দেব-দেবী তাদের জন্য পরকালে সুপারিশ করবে ও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও হতে রক্ষা করবে। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবাস্তব জল্পনা-কল্পনা ও দেব-দেবীর ভিত্তিহীন ইবাদতের ধারণা খণ্ডন করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, এ সকল কল্পনা-জল্পনা ও প্রতিমা পূজার কোনো গুরুত্ব নেই।

قَوْلُهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ -এর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার। এ সাক্ষাৎকারে তিনি নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে স্বীয় প্রকৃত আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বলা হয়েছে, এ সাক্ষাৎকারের স্থান হলো সিদরাতুল মুন্তাহা। সে সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতুল মাওয়া তার নিকটেই অবস্থিত। سِدْرَةٌ [সিদরাতুন] আরবি ভাষায় বরই বা কুল গাছকে বলা হয়। আর مُنْتَهٰى শব্দের অর্থ সর্বশেষ বিন্দু। سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى শব্দের অর্থ হলো সেই বরই গাছটি যা সর্বশেষ বিন্দুতে অবস্থিত। আল্লামা আলুসী তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– اِلَيْهَا يَنْتَهِىْ عِلْمُ كُلِّ عَالِمٍ وَمَا وَرَاءَهَا لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ

এখানেই সর্বজগতের জ্ঞান নিঃশেষ ও পরিসমাপ্ত। এর পরে যা কিছু রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ কিছুই জানে না।

ইবনে জারীর (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে এবং ইবনে আসীর (র.) তাঁর اَلنِّهَايَةُ কিতাবে প্রায় এই একই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বস্তু জগতের সর্বশেষ সীমা-বিন্দুতে অবস্থিত সে বরই গাছটি কিরূপ এবং তার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থা কি? তা জানা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট এ বিশ্বলোকের এমন সব রহস্যময় ব্যাপারভুক্ত, যে পর্যন্ত আমাদের বোধশক্তি পৌঁছতে পারে না।

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى এবং اٰيَةُ الْكُبْرٰى -এর দ্বারা উদ্দেশ্যের বর্ণনা ও তার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা : سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى আরশের ডান পার্শ্বে বেহেশত সীমান্তে একটি বরই বৃক্ষ। তাকে 'সিদরাতুল মুন্তাহা' বলার কারণ হলো, কোনো ফেরেশতা এবং কোনো সৃষ্টিই ঐ সীমান্ত অতিক্রম করার শক্তি রাখে না। একমাত্র নবী করীম ﷺ ব্যতীত কেউই ঐ সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ সে এলাকা আল্লাহর নূরে জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। যা কোনো সৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। আর ঐ গাছের পাদদেশে আরশের নির্দেশাবলি ও রহমতের জ্যোতি অবতারিত হয়। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, ঐ গাছের একটি পাতা হাতির কানের মতো বড়-চৌড়া এবং ফলগুলো মটকার মতো বৃহদাকার। এক মটকার পরিমাণ হলো ঐ পাত্র যাতে পাত্রে সাড়ে নয় কলসি পানি ধরে।

اٰيَةُ الْكُبْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা জগতের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলি ও ঐ রফরফ যেটাকে রাসূল ﷺ দেখে ছিলেন, যা সমগ্র আসমানকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ছয়শত ডানার সাথে দেখতে পেয়েছিলেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) اٰيٰتِ الْكُبْرٰى -এর তাফসীর بَعْضَهَا ও اَلْعُظْمٰى দ্বারা করে ইঙ্গিত করেন যে, এখানে مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْض -এর জন্য যা رَاٰى ক্রিয়াপদের কর্মপদ। আর اَلْكُبْرٰى শব্দটি اٰيٰتِ -এর صِفَتْ; তার অর্থ হলো, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি অসীম হওয়াতে তা গণনাকরণ অসম্ভব। আর সবগুলোর দর্শনও সম্ভবপর নয়। কাজেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলি ও আশ্চর্য-অদ্ভুত কুদরতের কিয়দাংশ অবলোকন করেছিলেন।

اٰيٰتُ الْكُبْرٰى ও سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى -এর দ্বারা মি'রাজের ঘটনা উপলব্ধি হয়। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে এবং হাকিম (র.) 'মুসতাদরীক' এর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহে শায়িত ছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) রাত্রিকালে তাঁর নিকট গমন করে তাঁকে জাগ্রত করলেন এবং কাবাঘরের পার্শ্বে নিয়ে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর সীনা মুবারক খুলে ধৌত করলেন। অতঃপর 'বোরাকে' আরোহণ করিয়ে তাঁকে সিরিয়ার বায়তুল মুকাদ্দিস নামক পবিত্র ঘরে নিয়ে হাজির করলেন এবং ঐ খুঁটির সাথে 'বোরাক' কে বাঁধলেন। বোরাক হলো আরোহণের একটি বেহেশতী প্রাণী এবং যা গাধার চেয়ে কিয়দ ছোট; খচ্চর হতে খানিক বড়, ধবধবে সাদা। উপরন্তু তিনি তথায় অবতরণ করে বায়তুল মুকাদ্দিসে প্রবেশ করলেন। আল্লাহর হুকুমে তথায় সকল আম্বিয়া আওলিয়াদের রূহ ও ফেরেশতার বিশাল জামায়াত সমবেত হলেন। তিনি ইমামতি করে দু' রাক'আত নামাজ পড়ালেন; যাতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব সকল আম্বিয়া ও মুরসালীনসহ সর্বস্তরের সৃষ্টির উপর পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর সকলের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করে বের হলেন। হযরত জিবরাঈল বেহেশতী তশতরীতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য এক পাত্রে দুধ ও এক পাত্র মদ আনয়ন করলেন। নবী করীম ﷺ দুধ গ্রহণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আপনি আপনার ফিতরাতই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে আকাশপথে গমন করলেন। বোরাকে আরোহণ করে নবী করীম ﷺ জিবরাঈলের সাথে চললেন। প্রত্যেক আসমানে গিয়ে জিবরাঈল ডাক দিলে আসমানের দ্বার খোলা হয় চতুর্দিক থেকে আসমানবাসীরা তাঁকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে থাকেন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.) দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর সাথে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে, সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রত্যেকেই তাঁকে আপনজন হিসেবে স্বাগতম জানিয়ে এগিয়ে নেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) মসজিদে বায়তুল মা'মুরের মধ্যে একটি খুঁটির সাথে টেক দিয়ে বসে আছেন। ঐ মসজিদে প্রত্যহ ৭০ হাজার ফেরেশতা নামাজ পড়ে থাকে। যে জামাত চলে যায়, তারা আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরবে না। এভাবে সিলসিলা চালু রয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে সিরদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলেন, সেখানে সবুজ রফরফ আগমন করল। নবী করীম ﷺ তাতে আরোহণ করলেন, রফরফ নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে আরশে পৌঁছায় এবং নবী করীম ﷺ -এর সাথে আল্লাহর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। তিনি উম্মতের পক্ষ হতে উম্মতের

সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছান এবং আল্লাহ তা'আলা নবীকে সালাম পাঠ করলে নবী করীম ﷺ সকল মুমিন উম্মতের পক্ষ হতে সালাম গ্রহণ করেন এবং আরশবাহী ফেরেশতাগণ "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ" বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উপরন্তু সেখানে যা কথাবার্তা হওয়ার তা হলো যার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ আয়াতে– "فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى" দ্বারা এবং উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে ফিরে আসেন। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আপনার উম্মতের পক্ষে এ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহর নিকট গিয়ে আরো কমিয়ে আসুন। কাজেই নবী করীম ﷺ বারবার গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত করে কমিয়ে সবশেষে পাঁচ ওয়াক্তেই নিয়ে ফিরলেন। আর সেই রাত্রে তিনি বেহেশত-দোজখও প্রত্যক্ষ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় জমিনের ফিরেন। সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, যাওয়ার কালে বন্ধ করা তালা দেখে গিয়েছেন, আবার এসে ঝুলন্ত পেলেন। মাছের একটি কান কাটতে যেটুকু সময় লাগে ঐ সময়ও লাগেনি। ভোরে যখন মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন মক্কার কাফেররা উপহাস করতে থাকে। তারা প্রমাণ স্বরূপ বায়তুল মুকাদ্দাসের নমুনা জানতে চাইলে তিনি তাও বর্ণনা করেন। যাতে অনেকে ঈমান আনল আর অনেকেই গোমরাহ হলো। সর্বপ্রথম তা বিশ্বাস করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান : এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জান্নাত এখনো বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এটাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না; বরং এখনো এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নিচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসের কোনো রেওয়ায়াতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত "وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ" থেকে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোনো ভারি ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এ আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নি রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোনো মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এ বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোনো প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এ প্রস্তরাবরণের নিচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

قَوْلُهُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى আয়াতে سِدْرَةٌ শব্দটি اَلْمُنْتَهٰى শব্দের প্রতি মুযাফ হয়েছে। এ ইযাফত কোন প্রকার ইযাফত? এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে–

১. এটা إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلٰى مَكَانِهٖ স্থানের দিকে বস্তুর ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে–

(١) اَشْجَارُ الْجَنَّةِ لَا تَيْبَسُ وَلَا تَخْلُوْا مِنَ الثِّمَارِ –

(٢) اَشْجَارُ بَلْدَةِ كَذَا لَا تَطُوْلُ مِنَ الْبَرْدِ

এ প্রকার ইযাফতের মুন্তাহা এমন একটি স্থান যার নিকট কোনো ফেরেশতা পৌঁছতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো রূহও ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারে না।

২. এটা إِضَافَةُ الْمَحَلِّ إِلَى الْمَحَلِّ فِيْهِ স্থানের অবস্থার প্রতি স্থানের ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে– وَمَحَلُّ السَّوَادِ - كِتَابُ الْفِقْهِ এমতাবস্থায় মুন্তাহা সিদরার নিকট। অর্থাৎ– سِدْرَةٌ عِنْدَ مُنْتَهَى الْعُلُوْمِ

৩. এটা اِضَافَةُ الْمِلْكِ اِلٰى مَالِكِهٖ মালিকের প্রতি মালিকানার ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে- دَارُ زَيْدٍ وَاَشْجَارُ عُمَرَ এমতাবস্থায় اَلْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ হলো তা, যার মূলে আছে سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ এখানে اَلْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ হলো আল্লাহ তা'আলা। এ ইযাফত দ্বারা سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى -এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى : এখানে اَفَرَاَيْتُمْ -এর শুরুর হামযাটি ইনকারের জন্য এসেছে। এর মাধ্যমে মুশরিকদের মূর্তিপূজার ভর্ৎসনা ও ঘৃণা করা উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বে আল্লাহর ইবাদতের উপর অকাট্য প্রমাণাদির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সারকথা হলো- আল্লাহ ছাড়া যদিও অন্য কারো মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যদিও তার স্থান সুউচ্চ হয়, তবুও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের তুলনায় তার মর্যাদা বহুগুণে নীচে। মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে কারো তুলনা করা যাবে না এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের উপযোগী। হে অংশীদারবাদী মুশরিকরা! তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করছ, আল্লাহর দরবারে তা তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না। -[সাবী, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ جَنَّةُ الْمَاْوٰى : জান্নাতুল মাওয়া শব্দের অর্থ হলো সেই জান্নাত যা অবস্থানের স্থান হতে পারে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন- এটা সে জান্নাত যা পরকালে ঈমান ও তাকওয়া সম্পন্ন লোকদেরকে দেওয়া হবে। এ আয়াতে দলিল হিসেবে পেশ করে তিনি এটাও বলেছেন যে, এ জান্নাত আকাশ মণ্ডলে রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন- এটা সে জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহ সংরক্ষিত হয়। এটা সেই জান্নাত নয় যা পরকালে পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাসও এ কথাই বলেছেন। তিনি আরো খানিকটা বাড়িয়ে বলেছেন যে, পরকালে ঈমানদার লোকদেরকে যে জান্নাত দেওয়া হবে তা আকাশ মণ্ডলে নয়। তার স্থান হলো এ পৃথিবী।

قَوْلُهُ اللَّاتَ؟ : লাত কাবাগৃহে অবস্থিত একটি দেবীর নাম। কারো মতে, লাত তায়েফে বনূ সাকীফের দেবী। মূলত লাত এক ব্যক্তির নাম ছিল, যে একটি পাথরের নিকট বসত এবং হাজিদেরকে আহার করাত। তার মৃত্যুর পর পাথরটি লাত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। আর লোকেরা তখন হতে পাথরটি পূজা করত।

اَللَّاتَ শব্দের অর্থে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে اَللَّاتَ শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ। এটাকে اَللّٰهَةُ হতে اَللَّاتَ করা হয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেছেন- اَللَّاتَ এটা لَوٰى - يَلْوِىْ হতে গৃহীত, অর্থ- ঘোরা ও কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। যেহেতু মুশরিকীনরা তার দিকে ফিরত ও তার সম্মুখে ঝুঁকে পড়ত। তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত, এজন্য তাকে লাত বলা হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, শব্দটির উচ্চারণ হলো لَتَّ লাত্তা। অর্থ- লেপন।

قَوْلُهُ الْعُزّٰى : اَلْعُزّٰى শব্দটি اَلْاَعَزُّ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এটা একটি দেবীর নাম। কারো করো মতে- اَلْعُزّٰى শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম اَلْعَزِيْزُ হতে গৃহীত। বর্ণিত আছে যে, তা একটি বৃক্ষ, যার পূজা করা হতো।

اَلْعُزّٰى শব্দের অর্থ সম্মানিত, এটা ছিল কুরাইশ বংশের লোকদের বিশেষ দেবী এবং তার অবস্থান বা আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্লা' উপত্যকার 'হুবাজ' নামক স্থানে। বনূ হাশেম গোত্রের মিত্র বনূ শাইবান গোত্রের লোকেরা ছিল তার পূজারী। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তার জিয়ারত করত। তার জন্য মানত করত। পূজার অর্ঘ্য পেশ করত এবং তার উদ্দেশ্যে বলিদান করত। কা'বাঘরের ন্যায় তার দিকে কুরবানির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো। আর অন্যান্য মূর্তিও দেব-দেবীর তুলনায় অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা তাকে দেখানো হতো। সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন আবূ উহাইহা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলো, আবূ লাহাব তখন তাকে দেখতে গেল। আবূ লাহাব উহায়হাকে ক্রন্দনরত পেয়ে জিজ্ঞাসিল- হে আবূ উহাইহা! তুমি কেন কাঁদছ? তুমি কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভয় পাচ্ছ? ভয় পেয়ে লাভ কি? জন্ম যেহেতু নিয়েছ, মৃত্যুকে তো আলিঙ্গন করতেই হবে। আবূ উহাইহা বলল, আমি মরার ভয়ে কাঁদার লোক নই; আমি তো এজন্য কাঁদছি যে, আমার তিরোধানের পর ওজ্জার পূজা অর্চনা কিভাবে চলবে! আবূ লাহাব বলল, তোমার জীবিতাবস্থায় যেরূপে তার পূজা চলছে, তোমার মৃত্যুর পরও সেভাবেই চলবে। আবূ উহায়হা একথা শুনে বলল, আমি নিশ্চিত হলাম। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।

'মানাত' পরিচিতি : মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত 'কুদাইদ' নামক স্থানে মানাত নামক দেবতা অবস্থিত। কারো কারো মতে এটা মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত একটি ঘর ছিল। বনু কা'ব এর পূজা করত। কারো মতে, এটা হুজাইল ও খুজয়া গোত্রের দেবতা ছিল। মক্কাবাসীরাও এর পূজা করত। কারো কারো মতে লাত, উজ্জা ও মানাত পাথর দ্বারা নির্মিত দেবতা যা কা'বা গৃহের ভেতরে অবস্থিত ছিল। মুশরিকীনরা সেগুলোর পূজা করত এবং মানতের জন্য এদের নামে উৎসর্গ করত। হজের মৌসুমে হাজীগণ মানাতের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে 'লাব্বাইক! লাব্বাইক!' উচ্চারণ করত।

قَوْلُهُ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى অর্থাৎ "তোমাদের জন্য কি পুত্র সন্তান আর কন্যাগুলো আল্লাহর জন্য। এটাতো হলো বড় প্রতারণাপূর্ণ বন্টন।" বলা হচ্ছে, মক্কার মুশরিকরা বলত- মূর্তি ও প্রতিমা এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। অথচ তাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির কন্যাসন্তান জন্ম নিত তখন সে তা অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণ ও বণ্টনকে অপছন্দ করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এর মাধ্যমে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, এ দেবীগণকে তোমরা আল্লাহর কন্যা বানিয়ে নিয়েছ। আর এ হাস্যকর আকীদা রচনা করার সময় তোমরা এতটুকু কথাও চিন্তা-বিবেচনা করলে না যে, নিজেদের জন্য তোমরা কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জাকর মনে কর, অথচ আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে ধরে নিয়ে তাঁর জন্যই কন্যাসন্তান সাব্যস্ত কর, এটা অপেক্ষা অবিচারমূলক আচরণ আর কি হতে পারে?

ধারণার প্রকার ও তার বিধান : ظَنّ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-

১. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা এ প্রকার ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত ছিল।

২. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত ব্যবহৃত হয়। 'একীন' তথা দৃঢ় বিশ্বাস সেই বাস্তব সম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না। যেমন কুরআনে কারীম ও হাদীসে মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীত ظَنّ তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়ে থাকে যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয় ; বরং দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এ দলিল অকাট্য নয়- যাতে অন্য কোনো সম্ভাবনা না থাকে। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞান ও বিধান। প্রথম প্রকারের জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধানকে يَقِينِيَّاتٌ তথা 'দৃঢ় বিশ্বাস প্রসূত বিধানাবলি' এবং দ্বিতীয় প্রকার ইসলামি বিধান বা শরিয়তের বিধানে গ্রহণযোগ্য। এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এ ধারণাপ্রসূত বিধানাবলি অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। সকলেই এ বিষয়ে একমত। যে ধারণাকে আলোচ্য আয়াতে নাকচ করা হয়েছে তা হচ্ছে ভিত্তিহীন ও অমূলক কল্পনা। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আয়াতসমূহে উল্লিখিত মুশরিকদের পথভ্রষ্টতার দু'টি কারণ : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী হওয়া তথা তাদের গোমরাহীর দু'টি মৌলিক কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, কোনো জিনিসকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের অংশ ও দীন বানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞানের প্রয়োজন। এ কথা তারা মোটেই অনুভব করে না। তারা নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতেই একটা কথা মনে করে নেয় এবং তার উপর এমন দৃঢ় ঈমান স্থাপন করে যেন তাই প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য। কুরআন তাদের এ প্রকার ধারণা ও অনুমানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন- "إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ" অর্থাৎ "লোকেরা [মুশরিকরা] নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করছে"। দ্বিতীয় হলো, তারা মূলত তাদের নফসের কামনা-বাসনা ও লালসার অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে। তাদের মন চায়, এমন এক মা'বুদ যদি তাদের হতো, যে তাদের যাবতীয় বৈষয়িক কাজকর্ম তো করে দেবেই, সে-ই সঙ্গে পরকাল যদি কখনো হয়ও তবে সেখানেও সে তাদেরকে ক্ষমা পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে; কিন্তু হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেবে না। নৈতিকতার চরিত্রে তাদেরকে বাধবে না। এ কারণে তারা রাসূলদের উপস্থাপিত জীবনাদর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। নিজেদের হাতে গড়া দেব-দেবীগুলোর পূজা মনগড়াভাবে গ্রহণ করা তাদের মনঃপূত।

অনুবাদ :

٢٤. اَمْ لِلْاِنْسَانِ اَىْ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَمَنّٰى ز مِنْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ .

২৪. মানুষ কি তা পায় যা সে কামনা করে যে, প্রতিমাসমূহ তাদের জন্য সুপারিশ করবে। ব্যাপারটি এমন নয়।

٢٥. فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى . اَىِ الدُّنْيَا فَلَا يَقَعُ فِيْهِمَا اِلَّا مَا يُرِيْدُهُ تَعَالٰى .

২৫. মূলত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই জন্য। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না।

٢٦. وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ اَىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لَهُمْ فِيْهَا لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَرْضٰى . عَنْهُ لِقَوْلِهٖ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهَا لَا تُوْجَدُ مِنْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِذْنِ فِيْهَا مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ .

২৬. আকাশমণ্ডলীতে অনেক ফেরেশতা রয়েছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি সম্মানের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতি দানের পর তাদেরকে যে বিষয়ে যাকে ইচ্ছা স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হতে এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى অর্থাৎ যার উপর তিনি সন্তুষ্ট সে ভিন্ন আর কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। আর এটাও জানা কথা যে, সুপারিশকারীগণ তখনই সুপারিশ করবেন যখন তারা সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হন। যেমন আয়াতে আছে– مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ [অর্থাৎ কে আছে যে তার সম্মুখে অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে।]

٢٧. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى . حَيْثُ قَالُوْا هُمْ بَنَاتُ اللّٰهِ .

২৭. নিশ্চয় যারা পরকালের ব্যাপারে অবিশ্বাসী, তারাই ফেরেশতাগণকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। যেমন– তারা বলে থাকে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

٢٨. وَمَا لَهُمْ بِهٖ بِهٰذَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ فِيْهِ اِلَّا الظَّنَّ ج الَّذِىْ تَخَيَّلُوْهُ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ج اَىْ عَنِ الْعِلْمِ فِيْمَا الْمَطْلُوْبُ فِيْهِ الْعِلْمُ .

২৮. বস্তুত এ উক্তির ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে যা তারা ধারণা করে। অথচ সত্যের ব্যাপারে ধারণার কোনো গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে বিষয়ে জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

٢٩. فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا اَىِ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ .

২৯. সুতরাং তাদের থেকে বিমুখ হোন যারা আমার স্মরণ হতে বিরত হয়েছে। স্মরণ তথা কুরআন। আর যে পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। এ বিধান জিহাদ সংক্রান্ত আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল।

৩০. ذٰلِكَ اَىْ طَلَبُ الدُّنْيَا مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ط اَىْ نِهَايَةُ عِلْمِهِمْ اَنْ اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ـ اَىْ عَالِمٌ بِهِمَا فَيُجَازِيْهِمَا ـ

৩০. এটা তথা পার্থিব কামনা তাদের জ্ঞানের প্রান্তসীমা। অর্থাৎ তাদের জ্ঞানের শেষপ্রান্ত। যে জন্য তারা পরকালের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যে তার পথ হতে বিপথগামী হয়েছে এবং তিনিই সে ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি উভয় সম্পর্কেই সম্যক জ্ঞাত এবং তাদের উভয়কেই প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ : এখানে كَمْ টা হলো كَمْ خَبَرِيَّة আধিক্যতা বর্ণনা করার জন্য, যদিও এটা مُفْرَدْ হয়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে বহুবচন। কাজেই এটা لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ-এর অনুযায়ী হয়েছে। আর كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ হলো মুবতাদা আর لَا تُغْنِىْ হলো তার খবর। উভয়টিই مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَكْرَمَهُمْ : এটা تَعَجُّبِيَّه ফেরেশতাগণের সংখ্যাধিক্য বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهَا لَا تُوْجَدُ مِنْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِذْنِ فِيْهَا : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণে একটি উদ্দেশ্য হলো সংশয় নিরসন করা যে, لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের সুপারিশ তো থাকবে; কিন্তু তা কোনো উপকারে আসবে না, অথচ ব্যাপার হলো যে, তাদের কোনো সুপারিশই থাকবে না।

মুফাসসির (র.) উল্লিখিত ইবরাতের মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছেন যে, عَدَمْ اِغْنَاءِ شَفَاعَتٍ এটা عَدَم شَفَاعَتْ-এর অর্থে। এর দ্বারা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো এটাও বর্ণনা করা যে, শাফায়াতের জন্য দুটো কথা জরুরি। প্রথমত যার জন্য সুপারিশ করা হয় আল্লাহ তার সুপারিশে সন্তুষ্টও এ কথা لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا الخ-এর থেকে বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত সুপারিশকারীর অনুমতিও থাকতে হবে। এটা مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ দ্বারা বুঝা যায়। যখন এই উভয় বিষয়টি একত্র হবে তখনই সুপারিশ হবে; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ اَىْ عَنِ الْعِلْمِ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ টা عَنْ অর্থে আর حَقّ টা عِلْم অর্থে হয়েছে।

مَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ **-এর মহল্লে ইরাব** : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন– وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কতইনা সম্মানিত। এখানে وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ বাক্যটি جُمْلَة تَعَجُّبِيَة আশ্চর্যবোধক বাক্য, যা ফেরেশতাদের অধিক সম্মান বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে ফেরেশতাদের কতই না সম্মান ও মর্যাদা– এতদসত্ত্বেও তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। [হ্যাঁ, তবে যদি কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোল্লিখিত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দরবারে মুশরিকদের পূজনীয় দেবতার কোনো কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব নেই। বস্তুত সবকিছুর অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং কাউকেও আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা জায়েজ নয়। মুশরিকরা দাবি করত যে, আমরা তো কাউকেও আল্লাহর সাথে শরিক করি না, আমরা শুধু বলে থাকি যে, মূর্তিগুলো শুধু আমাদের জন্য সুপারিশকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য

আয়াত অবতীর্ণ করে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে এ সকল মূর্তি তোমাদের জন্য কিভাবে সুপারিশ করবে? বস্তুত এদের সুপারিশ করার কোনো অধিকার নেই। কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত কারো পক্ষে সুপারিশ করা আদৌ সম্ভব নয়।

يَشَاءُ-এর পর يَرْضٰى বলার হিকমত : আল্লাহ তা'আলার يَشَاءُ-এরপর يَرْضٰى শব্দটি বলার ফায়দা হলো মূলকথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি শুধু يَشَاءُ বলতেন, তাহলে শ্রোতার মনে مَشِيَّةٌ-এর ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যেত। এ কারণে يَرْضٰى বলেছেন। যাতে সে জানতে ও বুঝতে পারে যে, مَشِيَّةٌ শুধু ঈমানদারদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। তথা আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু ঈমানদার লোকদের মধ্য হতেই কাউকে সুপারিশের সুযোগ দেবেন।

মুশরিকরা কেন ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলিঙ্গে ডাকত : কুরআনে কারীমে রয়েছে– إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى অর্থাৎ মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলিঙ্গে ডাকত। তারা তাদের এ মন্তব্যের পেছনে দুটি যুক্তি প্রদর্শন করত। যথা–

১. কুরআনে কারীমে مَلٰٓئِكَةٌ শব্দের শেষে ة স্ত্রীলিঙ্গের অক্ষর রয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, ফেরেশতারা নারী জাতি এবং আল্লাহর কন্যা।

২. কুরআনে কারীমে আছে– فَسَجَدَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাদের সঙ্গে فِعْل مُؤَنَّث ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ স্ত্রী জাতি।

বস্তুত তাদের এ জ্ঞান নেই যে, مَلٰٓئِكَةٌ শব্দের শেষাংশে ة টি تَاءِ تَانِيْث নয়; বরং তা تَاء مُبَالَغَه তাদের দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর হলো, فَاعِلْ যখন جَمْع تَكْسِيْر مُظْهَرْ হয়। তখন فِعْل-কে مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয় নেওয়া জায়েজ। সুতরাং তাদের দাবি ভিত্তিহীন ও অমূলক।

আকাশের কেউ তো সুপারিশ করতে পারবে না, তবুও كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ বলার কারণ কি? : দেব-দেবীদের প্রতি লক্ষ্য করে মুশরিকরা বলত, এরা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এ আয়াত দ্বারা তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করণই উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, ফেরেশতাগণের মাঝে একজন ফেরেশতার সুপারিশ কবুল করা হবে না। তখন অত্র আয়াতের মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হতো না। আর এ জন্যই كَمْ অর্থাৎ اَلْكَثِيْرُ বলা হয়েছে مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ বলা হয়নি। কারণ এতে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। –[তাফসীরে কাবীর]

কিভাবে বলা যাবে যে, মুশরিকরা আখিরাত বিশ্বাস করে না : অথচ তারা বলে– هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ 'এসব দেব-দেবী আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য শুধু সুপারিশ করবে।' এ কারণেই আমরা তাদের পূজা করি। তাদের এ কথা হতে বাহ্যত বুঝা যায় তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে নতুবা তারা কেন বলল, 'আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে।' আল্লাহর দরবার বা তাঁর নিকট সুপারিশ মানেই আখিরাতকে বিশ্বাস করা। এমতাবস্থায় তাদেরকে আখিরাতের অবিশ্বাসী কিভাবে বলা যেতে পারে?

এ প্রশ্নের দু'টি জবাব হতে পারে। একটি হলো, তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করত; কিন্তু বিশ্বাস অনুপাতে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করত না। তাদের এহেন আচরণকেই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো, তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করত ঠিকই; কিন্তু সেখানে একত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হিসাব বা কৈফিয়ত দেওয়াটাকেই বিশ্বাস করত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আয়াত দ্বারা আরবের মুশরিকরা উদ্দেশ্য। তারা هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ বলত ঠিকই; কিন্তু এ কথার মাধ্যমে তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করেছে– এমন নয়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো ঐসব মূর্তিদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে নেওয়া। কেননা আখিরাত সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো "وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ اٰتِيَةً" অর্থাৎ আমরা কিয়ামতের আগমনের কথা কল্পনাও করি না।

এছাড়া এ প্রশ্নের জবাব এও হতে পারে যে, তারা নবী-রাসূলগণের বর্ণনা বা চাহিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী আখিরাতকে স্বীকার করত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কখনো তো ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে ধারণা মূলত কোনো কাজেই আসে না : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا" 'আর ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো উপকারেই আসে না।' অথচ ধারণা-অনুমান কোনো কোনো সময় কাজে আসে। যা আমরা নবী করীম ﷺ -এর জীবনাদর্শ হতে জানতে পারি। তিনি কোনো কোনো জিহাদের ময়দানে ধারণার ভিত্তিতে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে বাস্তবে কাজ করে সফলও হয়েছিলেন। তবে এখানে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না এটা কোন ব্যাপারে বলা হয়েছে? তা জেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। এ আয়াতে যে ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ধারণা-অনুমান তাতে কেনো কাজেই আসবে না, তা হলো "اَلْاُمُوْرُ الْاِعْتِقَادِيَّةُ" অর্থাৎ যেসব কর্ম ও হুকুম আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, যেমন তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত ঐসব ব্যাপারে ধারণা-অনুমান কোনো কাজে আসে না। এমনিভাবে শরিয়তের অন্যান্য মৌলিক হুকুম আহকাম নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে নয়। তবে যেসব আহকামের সম্পর্ক সমাজের সাথে সম্পর্কিত ঐসব স্থানে ক্ষেত্র বিশেষ ধারণা-অনুমান কাজে আসতে পারে। এ প্রকারের ধারণা-অনুমানকে তো ইসলাম অস্বীকার করে না। اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ-এ আয়াত হতেও এ প্রকার ধারণা ও অনুমান বাদ পড়বে, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আল্লাহ কুরআনের তিনটি স্থানে 'ধারণা-অনুমান' করতে নিষেধ করেছেন, তার তাৎপর্য কি? : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের তিনটি স্থানে ظَنّ বা ধারণা হতে তার বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর ঐসব স্থানে (تَسْمِيَة) নাম ও (دُعَاء) দোয়ার পরেই এটা নিষেধ করেছেন। দু'টি স্থান এ সূরায় আর একটি স্থান সূরা হুজুরাতে।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنْ هِىَ اِلَّا اَسْمَاۤءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

২. আরো ইরশাদ করেন– اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا-

৩. অপর আয়াতটি হচ্ছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

এ সকল আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, শরিয়তের বিভিন্ন রুকনের হেফাজত করার চেয়ে ব্যক্তির মুখ ও জিহ্বা হেফাজত করা উত্তম। মিথ্যা বলাটা হাত-পায়ের বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং তার দ্বারা ছোট খাটো গুনাহ করার চেয়ে অধিক পাপ ও নিকৃষ্টকর্ম। কারণ উক্ত তিনটি স্থানেই বস্তুকে নিজস্ব স্থান হতে হটিয়ে মিথ্যা আচরণের সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

১. তারা প্রথম স্থানে এমন সকল বস্তুর প্রশংসা করেছে, যাদের প্রশংসা করা অন্যায় এবং তা মিথ্যা। কারণ তারা প্রশংসা প্রাপ্তির উপযুক্ত নয়। যথা– লাত, উজ্জা ও মানাতের তারা প্রশংসা করেছে, অথচ বাস্তবিকপক্ষে তারা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত ও যোগ্য নয়।

২. তারা দ্বিতীয় স্থানে ফেরেশতাগণের কুৎসা করেছে অথচ তাঁরা কুৎসা পাওয়ার মতো নন। তাঁরা হলেন নূরের তৈরি আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক বান্দা। তাঁরা নরও নন আবার নারীও নন। অথচ মুশরিকরা তাঁদেরকে নারী ধারণা করে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। [নাউজুবিল্লাহ]

৩. তারা তৃতীয় স্থানে এমন সব ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে কুৎসা রচনা করেছে যে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই এবং ছিলও না। এটা সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এজন্যই অযথা ধারণা সঠিক নয়। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى الخ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "অতএব হে নবী! যে লোক আমার স্মরণ হতে বিমুখ হয় এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, তাকে তারই অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।"

অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির পেছনে লেগে থেকে এবং তাকে প্রকৃত কথা বুঝাবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করো না। কেননা এরূপ ব্যক্তি এমন কোনো দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত হবে না, যার ভিত্তি আল্লাহকে স্বীকার করা ও আনুগত্য করার উপর স্থাপিত যা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার উর্ধ্বস্থিত কোনো উচ্চতর লক্ষ্য এবং মূল্যমানের দিকে মানুষকে

আহ্বান জানায় এবং যাতে পরকালীন চিরন্তন ও শাশ্বত সাফল্যকেই চরম ও পরম লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এ ধরনের বস্তুবাদী ও আল্লাহ-বিমুখ ব্যক্তিকে দীনের পথে নিয়ে আসার জন্য শ্রম-মেহনত করার পরিবর্তে সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়, যারা আল্লাহর জিকির শোনার জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ এবং যারা দুনিয়া-প্রীতি ও বৈষয়িকতার কঠিন রোগে আক্রান্ত নয়। -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

কুরআনে কারীম পরকাল ও কিয়ামত অবিশ্বাসীদের এ অবস্থা বর্ণনা করেছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পাশ্চাত্যের কুশিক্ষা এবং তা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা-সাধনা আর পার্থিব জগতের প্রতি আমাদের লোভ-লালসা ও ধ্যান-ধারণা আমাদের মুসলিম জাতির লোকদেরকে পরকাল অবিশ্বাসীদের মতোই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সব জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এহেন অবস্থার ব্যক্তিদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

بِهٖ যমীরের مَرْجِعٌ কোনটি হবে? : وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ আয়াতে বর্ণিত بِهٖ যমীরের مَرْجِعٌ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যথা-

১. যমখশারী (র.) বলেছেন- بِهٖ যমীরটি মুশরিকদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমূলক কথা-বার্তার দিকে ফিরেছে অর্থাৎ- إِنَّهٗ عَائِدٌ إِلٰى مَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ

২. إِنَّهٗ عَائِدٌ إِلٰى مَا تَقَدَّمَ فِى الْاٰيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ عِلْمٍ এটা পরবর্তী আয়াতে যে ইলম বা জ্ঞানের কথা এসেছে ঐ জ্ঞান বা ইলমের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ مَا لَهُمْ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ فَيُشْرِكُوْنَ 'আল্লাহ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই বলেই তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরিক করত।

অপর এক কেরাতে بِهٖ মুযাক্কারের যমীরের স্থলে মুয়ান্নেসের যমীর هَا অর্থাৎ بِهَا পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এ هَا যমীরের مَرْجِعٌ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। যথা-

১. যমীরটি আখেরাতের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ مِنْ عِلْمٍ

২. এটা তাসমিয়ার দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ عِلْمٍ

৩. এটা ফেরেশতাদের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ مِنْ عِلْمٍ

অনুবাদ :

٣١. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط اَىْ هُوَ مَالِكٌ لِذٰلِكَ وَمِنْهُ الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِىْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالتَّوْحِيْدِ وَغَيْرِهٖ مِنَ الطَّاعَاتِ بِالْحُسْنٰى ج اَىِ الْجَنَّةِ وَبَيَّنَ الْمُحْسِنِيْنَ بِقَوْلِهٖ.

৩১. আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তা'আলার জন্য। অর্থাৎ তিনি এ সবগুলোর অধিকারী। আর তন্মধ্যে পথভ্রান্ত ও সুপথগামীও রয়েছে। যাকে ইচ্ছা তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করেন। যাতে তিনি মন্দ কাজে লিপ্তদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন, অর্থাৎ শিরক ইত্যাদির। আর তাওহীদ ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে যারা সৎকর্মশীল তাদের প্রতিদান দেন উত্তম পুরস্কারের মাধ্যমে অর্থাৎ বেহেশত।

٣٢. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط هُوَ صِغَارُ الذُّنُوْبِ كَالنَّظْرَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسَةِ فَهُوَ اِسْتِثْنَاۤءٌ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللَّمَمَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط بِذٰلِكَ وَبِقَبُوْلِ التَّوْبَةِ وَنَزَلَ فِيْمَنْ كَانَ يَقُوْلُ صَلَاتُنَا صِيَامُنَا حَجُّنَا هُوَ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ اَىْ خَلَقَ اَبَاكُمْ اٰدَمَ مِنَ التُّرَابِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ جَمْعُ جَنِيْنٍ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ج فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط لَا تَمْدَحُوْهَا اَىْ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْجَابِ اَمَّا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْتِرَافِ بِالنِّعْمَةِ فَحَسَنٌ هُوَ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَنِ اتَّقٰى.

৩২. সৎকর্মশীলদের পরিচয় হচ্ছে– যারা ছোট অপরাধ ব্যতীত গুরুতর পাপ ও অপরাধ এবং অশ্লীলতা হতে বিরত থাকে। لَمَمٌ অর্থ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ, যেমন– কুদৃষ্টি করা, চুম্বন ও স্পর্শ করা। قَوْلُهٗ اِلَّا اللَّمَمَ এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; অর্থ হলো বড় গুনাহ হতে বিরত থাকা দ্বারাই ছোট গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক প্রশস্ত ও অপরিসীম ক্ষমার অধিকারী, বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ও তওবা কবুল করার মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যারা আমার নামাজ, আমার রোজা, আমার হজ বলে দাবি প্রকাশ করে। তিনি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। যখন তোমরা তোমাদের মায়ের উদরে ভ্রূণরূপে অবস্থান করতেছিলে। اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসা করো না। অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের প্রশংসা করো না অহংকারমূলকভাবে, হ্যাঁ, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার্থে হলে তা দোষণীয় নয়। তিনিই মুত্তাকীগণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمِنْهُ الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِىْ الخ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উপকারিতা হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা।

প্রশ্ন হলো আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর জন্য بِالذَّاتِ প্রমাণিত রয়েছে। আর যা بِالذَّاتِ প্রমাণিত হয় তা مَعْلُوْلٌ بِالْعِلَّةِ হয় না। অথচ এখানে مِلْكُ سَمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ কে- لِيَجْزِىَ الَّذِىْ الخ -এর عِلَّتْ বলা হয়েছে।

উত্তরের সারকথা হলো لِيَجْزِىَ টা اِضْلَالْ [ভ্রষ্টতা] ও হেদায়েতের تَعْلِيْل যা مِلْكُ سَمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উহ্য ইবারত এরূপ হবে- يُضِلُّ وَيَهْدِىْ لِيَجْزِىَ এটা হওয়াও বৈধ যে, لَامٌ টা عَاقِبَتْ -এর জন্য হবে। অর্থ হবে- সকল কিছু এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্যে ভালোও থাকবে এবং মন্দও থাকবে অর্থাৎ নেককারগণও থাকবে এবং বদকাররা ও থাকবে। নেককারদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বদকারদেরকে মন্দ প্রতিফল দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ الخ : এটা اَلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا থেকে بَدَلْ হয়েছে অথবা عَطْف بَيَانْ হয়েছে অথবা نَعْتْ হয়েছে অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের মাফঊল হয়েছে অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ- هُمُ الَّذِيْنَ

قَوْلُهُ اَللَّمَمَ : অর্থাৎ ছোট গুনাহ। لَمَمْ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কম, অল্প, ছোট হওয়া। এর থেকেই তার ব্যবহার রয়েছে اَلَمَّ بِالْمَكَانِ অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান করল, اَلَمَّ بِالطَّعَامِ অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ খেয়েছে। এমনিভাবে কোনো জিনিসকে শুধুমাত্র স্পর্শ করা অথবা তার নিকটবর্তী হওয়া অথবা কোনো কাজ একবার দু'বার করা, তার উপর সর্বদা না করা। না থাকা। অথবা শুধুমাত্র অন্তরে খেয়াল কর এই সকল সুরতকেই لَمَمْ বলা হয়। -[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

এই مَفْهُوْم এবং ব্যবহারের কারণেই তার অর্থ ছোট গুনাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বড় গুনাহের সূচনাতে লিপ্ত হওয়া; কিন্তু বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অথবা একবার বা দুবার কোনো গুনাহ করে ফেলা। এরপর সর্বদার জন্য তাকে পরিত্যাগ করা। অথবা কোনো গুনাহের খেয়াল হৃদয়ে আসা। কিন্তু কর্যত তার নিকটবর্তী না হওয়া। এই সবগুলোই ছোট গুনাহ যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে ক্ষমা করে দিবেন।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ : অর্থাৎ اِلَّا اللَّمَمَ টা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ অর্থাৎ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি কবীরার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ : **শানে নুযূল :** হযরত সাবিত ইবনে হারিছ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন ইহুদিদের কোনো ছোট শিশু মৃত্যুবরণ করত তখন তারা বলত, এটা صِدِّيْق সত্যবাদী। নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত কথা হলো, প্রত্যেক শিশুকে আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন, হয় সে নেককার হবে অথবা গুনাহগার। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে। -[লুবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى : **শানে নুযূল :** কালবী ও মুকাতিল (র.) বলেছেন- কিছু সংখ্যক লোক আমলে সালিহ তথা নেক আমল করত, অতঃপর বলত, আমাদের নামাজ, আমাদের সিয়াম, আমাদের হজ ও আমাদের জিহাদ [আমল সম্পর্কে তাদের এ প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল গর্ব করা] তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। -[খাযিন]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ ...... اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى : এ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গুনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لَمَمْ শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যতিক্রমের সারমর্ম হচ্ছে যে, ছোটখাটো গুনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না। لَمَمْ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। যথা-

১. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাটো গুনাহ। সূরা নিসার আয়াতে একে سَيِّئَاتْ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এ উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইবনে কাসীর (র.) বর্ণনা করেছেন।

২. এর অর্থ সেসব গুনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়। এ উক্তিও আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সেও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোনো অশ্লীলকার্য ও কবীরা গুনাহ হয়ে যায় অথবা গুনাহ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে ও গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা কৃত গুনাহের উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাটো গুনাহ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তাফসীরের সার-সংক্ষেপে لَمَّمْ -এর তাফসীরে এমন গুনাহের কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

قَوْلُهُ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ : এখানে اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোনো জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলে। আয়াতে মানুষের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোনো ভালো ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরি করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তাওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেজগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালোমন্দ সবকিছু সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভালো হবে কি মন্দ হবে, তা এখনো জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল; বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আল্লাহভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম ও অবিচল থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালামা (রা.)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা', যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য "فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ" আয়াত তেলাওয়াত করে এ নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম আহমদ (র.) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন, তুমি যদি কারো প্রশংসা করতে চাও, তবে একথা বলে কর যে, আমার জানা মতে এ ব্যক্তি সৎ, আল্লাহভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক-পবিত্র কিনা, তা আমি জানি না।

اَللَّمَمُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতের اَللَّمَمُ শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। যথা-

১. কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করা, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত না করা।
২. যত সগীরা গুনাহ রয়েছে, সবই اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. যে সগীরা গুনাহ বারে বারে করা হয় না, এতে অভ্যস্ত হয় না, এমন সগীরা গুনাহকেও اَللَّمَمُ বলা হয়। কেননা সগীরা গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা আর সগীরা গুনাহ থাকে না; বরং কবীরা হয়ে যায়।
৪. তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, এর দু'টি পন্থা রয়েছে।
ক. এমন গুনাহ, আল্লাহ দুনিয়াতে যার শাস্তির কথা ঘোষণা করেননি, এমন কি আখিরাতেও কি শাস্তি হবে তার কোনো ঘোষণা নেই, এটি اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত।
খ. যদি কোনো গুনাহ মুসলমানদের দ্বারা হয়ে যায়, এরপর সে ঐ গুনাহ থেকে তওবা করে ফেলে, তখন তা اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

كَبَائِرُ ও فَوَاحِشُ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত :

১. যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে জাহান্নামের ধমক দিয়েছেন তা হলো كَبَائِرُ আর যেই গুনাহের কারণে দুনিয়ায় গুনাহকারীর উপর শাস্তি আবশ্যক হয় তাকে فَوَاحِشُ বলে।
২. যেই গুনাহকে হালাল মনে করলে গুনাহগার কাফের হবে তাকে كَبَائِرُ বলে। আর যেই গুনাহকে হালাল মনে করলে গুনাহগার কাফের হবে না তাকে فَوَاحِشُ বলে।
৩. যে গুনাহের কর্তা তওবা ব্যতীত ক্ষমা পাবে না তাকে كَبَائِرُ বলে। আর যার কর্তা তওবা ব্যতীত ক্ষমা পাবে তাকে فَوَاحِشُ বলে।

اَلْكَبَائِرُ শব্দের কেরাতের বর্ণনা : اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ আয়াতে বর্ণিত كبائر শব্দের দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. অধিকাংশ কারীদের মতে كَبَائِرُ তথা বহুবচনের শব্দে পড়া হবে।
২. হযরত হামযা, কেসায়ী, আ'মাশ (র.) প্রমুখের মতে كَبِيْرُ তথা একবচন পড়া হবে।

قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ : لِيَجْزِىَ -এর সম্পর্ক কার সাথে? : لِيَجْزِىَ শব্দটি ضَلَّ এবং اِهْتَدٰى শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। মূল ইবারত হলো- هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ اَوِ اهْتَدٰى لِيَجْزِىَ الْمُضِلَّ مِنَ الْمُكَلَّفِيْنَ اَوِ الْمُهْتَدِيْنَ مِنْهُمْ -

৩৩. اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ۙ عَنِ الْاِيْمَانِ اَيْ ارْتَدَّ لَمَّا عُيِّرَ بِهٖ وَقَالَ اِنِّيْ خَشِيْتُ عِقَابَ اللّٰهِ فَضَمِنَ لَهُ الْمُعَيِّرُ اَنْ يَّحْمِلَ عَنْهُ عَذَابَ اللّٰهِ اِنْ رَجَعَ اِلٰى شِرْكِهٖ وَاَعْطَاهُ مِنْ مَالِهٖ كَذَا فَرَجَعَ .

৩৪. وَاَعْطٰى قَلِيْلًا مِنَ الْمَالِ الْمُسَمّٰى وَّاَكْدٰى . مَنَعَ الْبَاقِيَ مَاْخُوْذٌ مِنَ الْكُدْيَةِ وَهِيَ اَرْضٌ صُلْبَةٌ كَالصَّخْرَةِ تَمْنَعُ حَافِرَ الْبِئْرِ اِذَا وَصَلَ اِلَيْهَا مِنَ الْحَفْرِ .

৩৫. اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى . يَعْلَمُ مِنْ جُمْلَتِهٖ اِنَّ غَيْرَهٗ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ لَا وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اَوْ غَيْرُهٗ وَجُمْلَةُ اَعِنْدَهُ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ لِرَاَيْتَ بِمَعْنٰى اَخْبِرْنِيْ .

৩৬. اَمْ بَلْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ۙ اسفار التورية او صحف قبلها .

৩৭. وَ صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ۙ تَمَّمَ مَا اُمِرَ بِهٖ نَحْوُ وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ .

৩৮. وَبَيَانُ مَا اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى . اِلٰى اٰخِرِهٖ وَاَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَيْ اَنَّهٗ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ ذَنْبَ غَيْرِهَا .

অনুবাদ :

৩৩. আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ হয়েছে। অর্থাৎ সে ঈমান ত্যাগ করল তখন তাকে ঈমান আনয়নের কারণে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তখন সে বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করি। লজ্জাদাতা বলল, যদি সে শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তবে তার উপর আপতিত শাস্তি বহন করার দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে, আর তার সম্পদ হতে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেবে। ফলে সে শিরকে ফিরে আসল।

৩৪. অথচ সে কম দিল, প্রতিশ্রুত মাল হতে বিরত থাকল। আর অবশিষ্ট মাল দেওয়া হতে। اَكْدٰى শব্দটি كُدْيَةٌ হতে নিষ্পন্ন। আর তাহলো পাথরতুল্য শক্ত মাটি। যখন কোনো ব্যক্তি সেই মাটিতে কূপ খনন করতে চায় তখন সেই মাটি তাকে কূপ খনন হতে বাধা প্রদান করে।

৩৫. তার নিকট কি عِلْمِ غَيْب [অদৃশ্যের জ্ঞান] আছে যে, সে দেখবে অর্থাৎ জানতে পারবে। তন্মধ্য হতে একটি হলো, অপর কেউ তার পরকালীন আজাব বহন করবে না, কখনো না। সে ব্যক্তিটি হলো ওলীদ ইবনে মুগীরা বা অন্য কেউ। আর اَعِنْدَهٗ বাক্যটি যা اخبرنى অর্থে তা رَأَيْتَ-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل ব্যবহৃত।

৩৬. নাকি তাকে অবগত করা হয়নি। সে সম্পর্কে যা মূসা (আ.)-এর কিতাবে রয়েছে। তাওরাতের অধ্যায়সমূহে বা তৎপূর্ববর্তী সহীফাসমূহে।

৩৭. আর ইব্রাহীম (আ.)-এর সহিফায় যিনি পুরোপুরিভাবে পালন করেছেন পূর্ণ করেছেন– যে বিষয়ে তাকে আদেশ করা হয়েছে। যেমন– وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ

৩৮. পূর্বোক্ত مَا -এর বিবরণ এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না [শেষ পর্যন্ত] আর قَوْلُهٗ اَلَّا تَزِرُ -এর اَنْ টি مُثَقَّلَه অর্থাৎ اَنّ -এর নূন তাশদীদ বিশিষ্ট হতে اَنْ مُخَفَّفَه নূন সাকিন বিশিষ্ট হয়েছে। তথা কোনো ব্যক্তি অন্য কারো পাপ বহন করবে না।

٣٩. وَاَنْ اَىْ اَنَّهُ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ـ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ سَعْىِ غَيْرِهِ الْخَيْرَ شَىْءٌ ـ

৩৯. আর এই যে, ان হরফটি মূলত انه ছিল। মানুষ তাই অর্জন করে যা সে চেষ্টা করে। সফলতার বিষয়ে সুতরাং অন্যের সাফল্যের চেষ্টা হতে সে কিছুই লাভ করতে পারবে না।

٤٠. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ـ اَىْ يُبْصِرُهُ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৪০. আর এই যে, তার চেষ্টা তাকে অচিরেই দেখানো হবে। অর্থাৎ তার শ্রমের ফল সে পরকালে পাবে।

٤١. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى ـ اَلْاَكْمَلَ يُقَالُ جَزَيْتُهُ سَعْيَهُ وَبِسَعْيِهِ ـ

৪১. অতঃপর তাকে যথার্থ প্রতিদান প্রদান করা হবে পরিপূর্ণরূপে। যেমন বলা হয়– [যেমন কর্ম তেমন ফল]।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى : এখানে হামযা টা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْر -এর জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ رَاَيْتَ : এটা اخبرنى -এর অর্থে হয়েছে। اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূল তার সেলাহ -এর সাথে মিলে প্রথম মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَاَكْدٰى : এটা تَوَلّٰى -এর উপর আতফ হয়েছে। আর قَلِيْلًا -কে মাসদারের সিফত অর্থাৎ اَعْطٰى اِعْطَاۤءً قَلِيْلًا আবার قليلا -কে মাফউলে বিহী বলাও বৈধ।

قَوْلُهُ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ : এখানে اِسْتِفْهَامْ-এর হামযাটি অস্বীকারমূলক এবং বাক্যটি জুমলা হয়ে رَاَيْتَ -এর দ্বিতীয় মাফউল।

قَوْلُهُ تَوَلّٰى : এর অর্থ হলো اَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ অর্থাৎ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করল এরপর মুরতাদ হয়ে গেল। অধিকাংশের অভিমত হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আয়াত তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ : اَعْطَا -এর উহ্য যমীর تَوَلّٰى -এর উহ্য فَاعِلْ -এর দিকে। আর ه যমীরে বারেয এটা ضَمِنَ -এর فَاعِلْ -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিম্মাদার اَلَّذِىْ تَوَلّٰى -এর উপর দুটি বিষয় আবশ্যক করেছে। একটি তো হলো তাওহীদকে পরিত্যাগ করে শিরকের দিকে ফিরে এলো। দ্বিতীয় হলো ضَمَان -এর পরিবর্তে সম্পদের একটি বিশেষ পরিমাণ তাকে দিয়ে দিল। আর ضَامِنْ নিজের উপর শুধুমাত্র একটি জিনিস আবশ্যক করল। আর তা হলো পরকালে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষার জিম্মাদারী।

قَوْلُهُ تَمَّمَ مَا اُمِرَبِهِ : হযরত ইবরাহীম (আ.) উক্ত বিধানাবলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছেন যে, বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণত সন্তান জবাই করা, অগ্নিতে নিপতিত হওয়া, দেশ ত্যাগ ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى .....الخ : শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. বর্ণিত আছে কোনো এক লোক ঈমান আনার পর, তার জনৈক বন্ধু তাকে তিরস্কার করে বলল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করেছ? জবাবে সে বলল, আমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তার বন্ধু তাকে বলল, আমাকে কিছু ধন-সম্পদ দাও তার বিনিময়ে তোমার আজাব আমি বহন করে নেব এবং তুমি আজাব হতে মুক্তি পাবে। অতঃপর সে তাকে কিছু অর্থ দিল; কিন্তু বন্ধু তাকে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো অর্থ চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করে কিছু অর্থ দিয়ে দিল। সবশেষে সে বন্ধু বাকি অর্থের জন্য একটি সাক্ষ্যযুক্ত দলিল লিখে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[জালালাইন, কামালাইন]

২. হযরত মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ ও মুকাতিল (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতগুলো ওলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নবী করীম ﷺ -এর দীনের আনুগত্য করেছিলেন, তখন কোনো এক মুশরিক তাকে তিরস্কার করল এবং বলল, কেন তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছ এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য করেছ এবং ধারণা করে নিয়েছ যে, তারা সবাই জাহান্নামী? জবাবে সে বলল, আমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করছি। তখন সে তার গুনাহের বোঝা বহন করে নেবে বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল এ শর্তে যে, সে যদি তাকে কিছু মাল প্রদান করে এবং শিরকের কাজে ফিরে আসে তাহলে সে তার আজাবের বোঝা বহন করবে। অতঃপর সে তার প্রতিশ্রুত বিষয়ের কিয়দাংশ তাকে দান করল আর অবশিষ্ট অংশ আটকে দিল, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

মুকাতিল (র.) আরো বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরআনে কারীমের প্রশংসা করল, অতঃপর তা হতে ফিরে গেল। তখন وَأَعْطٰى قَلِيْلًا আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দী, কালবী ও মুসাইয়্যাব ইবনে শুরাইক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত ওসমান (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) সদকা-খয়রাত করতেন। তখন তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ সারাহ বলল, হে ওসমান! তুমি এটা কি করছ? তোমার তো কোনো সম্পদই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আমার অনেক গুনাহ আছে, আর আমি যা করছি এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই চাচ্ছি এবং তাঁর ক্ষমার প্রত্যাশা করছি। তখন আবদুল্লাহ তাঁকে বলল, তুমি আমাকে তোমার উট দান কর, আর আমি তোমার সব গুনাহের দায়িত্ব গ্রহণ করব। তখন তিনি তাকে তা দান করলেন এবং তার উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন, আর সদকা-খয়রাতের ব্যাপার কিছুটা বন্ধ করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى وَأَعْطٰى قَلِيْلًا وَأَكْدٰى আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.) পূর্বের তুলনায় আরো বেশি বেশি দান-খয়রাত করতে লাগলেন। –[কুরতুবী]

মৃত্যুর পর উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা : এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

আবূ নু'আঈম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার রূহ কবজ করে নেন, তখন দু'জন ফেরেশতা তাকে নিয়ে আসমানে হাজির হয় এবং আরজ করে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে এ মুমিনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলে, এখন তুমি তাকে ডেকে নিয়েছো, তাই আমাদের এখন অনুমতি দান কর, আমরা যেন জমিনে অবস্থান করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জমিন আমার বান্দাদের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাই তোমরা উভয়ে এ বান্দার কবরে অবস্থান কর, আর আমার তসবীহ তাহলীল এবং তাকবীর পাঠে কিয়ামত পর্যন্ত মশগুল থাক, আর এ মুমিন বান্দার জন্যে তার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি পথ খোলা থাকে। যথা– ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কোনো দ্বীনি কিতাব রচনা করে যায় এবং মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়। ৩. যদি মৃত ব্যক্তির নেককার সন্তান তার জন্য দোয়া করে। মৃত ব্যক্তি এ তিনটি পন্থায় উপকৃত হতে পারে।

ইমাম আহমদ (র.) লিখেছেন, যদিও সদকায়ে জারিয়া এবং উপকারী ইলম মানুষের নিজের আমলের ফলশ্রুতি; কিন্তু নেককার সন্তানের দোয়ায় তার কোনো মেহনত থাকে না, এতদসত্ত্বেও এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

তাবারানী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর নেককার বান্দাদের মর্তবা বুলন্দ করবেন। বান্দা আরজ করবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! কিভাবে আমার মর্তবা বুলন্দ হলো? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, তোমার পুত্র তোমার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করেছে, এজন্য তোমার মর্তবা বুলন্দ হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরের ভেতর মানুষের এমন অবস্থা হয়, যেমন কোনো ডুবন্ত ব্যক্তির অবস্থা, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি তথা আপনজনদের কাছে সে আশা করে এবং অপেক্ষা করে তাদের দোয়ার জন্যে, যদি কেউ তার জন্যে দোয়া করে, তবে সে দোয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু থেকে তার নিকট প্রিয় হয়। পৃথিবীর অধিবাসীদের দোয়ার কারণে কবরবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের সমান ছওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্যে জীবিতদের এ হাদিয়া হয় ইস্তেগফার। –[বায়হাকী]

তাবারানী (র.) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের প্রতি দয়া করা হয়েছে, আমার উম্মত গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে এবং বেগুনাহ হয়ে কবর থেকে বের হবে। মুমিনগণ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে, ফলে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে দোজখ থেকে বের হবে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার হয়। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়– وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ "আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে মাগফিরাত দান কর, আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।"

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন, তিনি কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার ধারণা হলো, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে তিনি কিছু দান খয়রাত করতেন, আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি ছওয়াব পাবেন? রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর মায়ের ইন্তেকাল হলো। তিনি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছে, আমি উপস্থিত ছিলাম না, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান খয়রাত করি তা কি তাঁর নিকট পৌঁছবে? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। সাদ (রা.) আরজ করলেন, তবে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, আমার বাগানটি আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে খয়রাত করলাম। -[বুখারী]

ইমাম আহমদ (র.) লিখেছেন, হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে, এখন তাঁর জন্যে কোন জিনিসের খয়রাত সবচেয়ে উত্তম? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, পানি। একথা শ্রবণ করে হযরত সা'আদ (রা.) একটি কূপ খনন করালেন এবং বললেন, এটি সা'আদের মায়ের জন্যে। তাবারানী (র.) এ হাদীস হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নফল খয়রাত করে তবে সে যেন তার পিতা মাতার পক্ষ থেকে করে। এর ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবে। আর তার নিজের ছওয়াবেও কম করা হবে না।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়, এরপর সে মৃত ব্যক্তির জন্যে দান খয়রাত করা হয়, তবে হযরত জিবরাঈল (আ.) নূরের একটি পাত্রে সেই দান নিয়ে মৃত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কবরের অধিবাসী! তোমার বাড়ির লোকেরা তোমার জন্য এ তোহফা প্রেরণ করেছেন, তুমি তা গ্রহণ কর। এভাবে সে মৃত ব্যক্তি তোহফা গ্রহণ করে এবং আনন্দিত হয়। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী কবরের অধিবাসীর জন্যে কোনো কিছু প্রেরিত না হওয়ার কারণে সে চিন্তিত হয়। -[তাবারানী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতার জন্যে দোজখ থেকে নাজাত লিপিবদ্ধ করে দেন, তাদের জন্য হজ পরিপূর্ণ হয়, আর যে হজ করলো তার ছওয়াবও কম করা হয় না।

আবূ আব্দুল্লাহ সাকাফী (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, যার পিতা-মাতা হজ করতে পারেনি, সে যদি তাদের জন্যে হজ করে তবে কি হুকুম? নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তার পিতা-মাতা আজাদ হয়ে যাবে, আর আসমানে তাদের রূহগুলোকে সুসংবাদ দেওয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, তুমি বল যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো, আর তুমি তা তোমার মায়ের পক্ষ হতে আদায় করতে তবে কি তা আদায় হয়ে যেতো? স্ত্রীলোকটি আরজ করলো, জি হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন রাসূল ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ করতে আদেশ দিলেন। -[তাবারানী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত লোকের পক্ষ থেকে হজ করবে, সে এত ছওয়াবই পাবে যা মৃত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাছুর পাঠ করে বলে যে, এ সূরাসমূহের ছওয়াব এ কবরস্থানের সকল নারী পুরুষকে বখশিশ করলাম, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবরস্থানের সকলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রম করে এবং এগারো বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং কবরস্থানের মৃতদের তা বখশিশ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঐ কবরস্থানের সকলের সংখ্যা মোতাবেক তাকে ছওয়াব দান করবেন।

قَوْلُهُ أَكْدٰى : শব্দটি كُدْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أَكْدٰى -এর অর্থ এই যে, প্রথম কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তপর পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তাফসীর হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদা (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى : শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোনো এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আজাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোনো অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার বিকল্প দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিজিকদাতা। চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনের এই বাণীর সত্যতা, কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হতো, তবু ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আসতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে বলেন– اَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلَالًا বিলাল, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশঙ্কা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى : এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وفى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وَفّٰى শব্দের এই তাফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখের মতে।

কোনো কোনো হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وَفّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরিউক্ত তাফসীরের পরিপন্থি নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ আল্লাহর বিধানাবলি প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রিসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত আবূ ওসামা (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বললেন, তুমি কি জান এর মর্মার্থ কি? হযরত আবূ ওসামা (রা.) আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অর্থ এই যে– وَفّٰى عَمَلَ يَوْمِهٖ بِاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ অর্থাৎ তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে [ইশরাকের] চার রাকাত নামাজ পড়ে নেন। –[ইবনে কাসীর]

তিরমিযীতে আবূ যর (রা.) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اِبْنَ اٰدَمَ اَرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ.

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে اَلَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন? কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

–[ইবনে কাসীর]

হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)–এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা : কুরআন পাক পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোনো আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠারো আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হযরত

মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দু'টি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই- أَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى এবং وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى ; এখানে وِزْر শব্দের আসল অর্থ হলো বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারো হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ অর্থাৎ কোনো শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দাংশও বহন করার সাধ্য কারো হবে না।

একের গুনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না : এই আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোনো আজাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করবে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর দরবারে একের গুনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আজাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয়। অথবা সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়। -[মাযহারী] এমতাবস্থায় তার আজাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে- وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى -এর সারমর্ম এই যে, অপরের আজাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারো নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে না এবং ফরজ রোজা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরজ নামাজ ও রোজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরে কোনো আইনগত খটকা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ ও জাকাতের প্রশ্নে বেশির বেশি এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনগত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ করতে পারে অথবা অপরের জাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভারে নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

'ঈসালে ছওয়াব' তথা মৃতকে ছওয়াব পৌছানো : উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক বক্তি অপরের ফরজ ঈমান, ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা আদায় করে তাকে ফরজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরি হয় না যে, এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খায়রাতের ছওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলেমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার। -[ইবনে কাসীর]

কেবল কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব অপরকে দান করাও পৌছানো জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েজ নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়াব যেমন অপরকে পৌছানো যায়, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের ছওয়াব অপরকে পৌছানো জায়েজ। এরূপ ছওয়াব পৌছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী (র.) বলেন, অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মুমিন ব্যক্তি অপরের সৎকর্মের ছওয়াব পায়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হলো, এগুলো অন্যান্য পয়গাম্বরের শরিয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হতো। তাঁদের শরিয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করছিল।

قَوْلُهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى : অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরি।

অনুবাদ :

٤٢. وَاَنَّ بِالْفَتْحِ عَطْفًا وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا وَكَذَا مَا بَعْدَهَا فَلَا يَكُوْنُ مَضْمُوْنُ الْجُمَلِ فِى الصُّحُفِ عَلَى الثَّانِىْ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ـ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُجَازِيْهِمْ ـ

৪২. আর এই যে اَنَّ হরফটির প্রথমাক্ষর যবরের সাথে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হিসেবে। আর مُسْتَانِفَه [স্বতন্ত্র] বাক্য হিসেবে যেরের সাথে। এর পরবর্তী আয়াতে اَنَّ -এর ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে দ্বিতীয় তারকীব অনুযায়ী جُمْلَه مُسْتَانِفَه হলে সহীফার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। সবকিছুর সমাপ্তি আপনার প্রতিপালকের দিকে। মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন।

٤٣. وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ مَنْ شَاءَ اَفْرَحَهٗ وَاَبْكٰى لا مَنْ شَاءَ اَحْزَنَهٗ ـ

৪৩. তিনি যাকে ইচ্ছা হাসান খুশি করেন। আর যাকে ইচ্ছা কাঁদান চিন্তিত করেন।

٤٤. وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ فِى الدُّنْيَا وَاَحْيٰى لا لِلْبَعْثِ ـ

৪৪. তিনিই দুনিয়ায় মৃত্যু দান করেন এবং পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করেন।

٤٥. وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

৪৫. আর তিনি নারী ও পুরুষ দুই শ্রেণিকে সৃষ্টি করেন।

٤٦. مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ اِذَا تُمْنٰى ص تُصَبُّ فِى الرَّحِمِ ـ

৪৬. শুক্রবিন্দু ধাতু হতে, যখন তা জরায়ুতে পৌছে।

٤٧. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ الْاُخْرٰى الْخَلْقَةَ الْاُخْرٰى لِلْبَعْثِ بَعْدَ الْخَلْقَةِ الْاُوْلٰى ـ

৪৭. আর এই যে, তাঁরই দায়িত্বে প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা পুনরুত্থানের জন্য। نَشْاَةً শব্দটি مَدّ [মদ] ও قَصْر [কসর] উভয়রূপে পড়া যাবে।

٤٨. وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى النَّاسَ بِالْكِفَايَةِ بِالْاَمْوَالِ وَاَقْنٰى اَعْطَى الْمَالَ الْمُتَّخَذَ قِنْيَةً ـ

৪৮. আর তিনিই মানুষকে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ দানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করেন। সম্পদ দান করেন, যা সে সঞ্চয় করেছে।

٤٩. وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى لا هِىَ كَوْكَبٌ خَلْفَ الْجَوْزَاءِ كَانَتْ تُعْبَدُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

৪৯. আর তিনি শে'রা নক্ষত্রের মালিক। এটা جَوْزَاء নক্ষত্রের পেছনের একটি নক্ষত্র। জাহিলিয়া যুগে তার ইবাদত করা হতো।

٥٠. وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَانِ الْاُوْلٰى لا وَفِى قِرَاءَةٍ بِاِدْغَامِ التَّنْوِيْنِ فِى اللَّامِ وَضَمِّهَا بِلَا هَمْزَةٍ هِىَ قَوْمُ هُوْدٍ وَالْاُخْرٰى قَوْمُ صَالِحٍ ـ

৫০. আর তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। এক কেরাত মোতাবেক عَادْ শব্দের তানভীনকে اَلْاُوْلٰى-এর لَامْ অক্ষরের সাথে اِدْغَامْ করা হয়েছে এবং لَامْ -এর উপর পেশ দিয়ে হামযা ব্যতীত পড়া হয়েছে। প্রথম আদ বলতে হুদ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো সালেহ (আ.)- এর সম্প্রদায়।

٥١. وَثَمُوْدَ بِالصَّرْفِ اِسْمٌ لِلْاَبِ وَبِلَا صَرْفٍ اِسْمٌ لِلْقَبِيْلَةِ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى عَادٍ فَمَآ اَبْقٰى مِنْهُمْ اَحَدًا ـ

৫১. আর তিনিই ছামুদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন। উল্লেখ্য যে ثَمُوْدُ শব্দটি যদি مُنْصَرِف রূপে পড়া হয় তবে তা দ্বারা গোত্রের আদি পিতা উদ্দেশ্য হবে। যদি غَيْرُ مُنْصَرِفْ রূপে পড়া হয় তবে ছামুদ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হবে। আর এটা عَادٌ -এর উপর عَطْف হবে। মোটকথা তিনি তাদের কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

٥٢. وَقَوْمُ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اَىْ قَبْلَ عَادٍ وَثَمُوْدَ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى مِنْ عَادٍ وَثَمُوْدٍ لِطُوْلِ لُبْثِ نُوْحٍ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا وَهُمْ مَعَ عَدَمِ اِيْمَانِهِمْ بِهٖ يُؤْذُوْنَهُ وَيَضْرِبُوْنَهُ ـ

৫২. আর নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের পূর্বে। নিশ্চয় তারাই ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য। হযরত নূহ (আ.) আদ ও ছামুদ জাতির মাঝে দীর্ঘ ৯৫০ বৎসরকাল অবস্থান করেন। তারা তাকে অমান্য করত এবং সাথে সাথে কষ্ট দিত ও প্রহার করত।

٥٣. وَالْمُؤْتَفِكَةَ وَهِىَ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ اَهْوٰى ـ اَسْقَطَهَا بَعْدَ رَفْعِهَا اِلَى السَّمَاءِ مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ بِاَمْرِهٖ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِذٰلِكَ ـ

৫৩. আর উৎপাটিত আবাসভূমিকে তথা হযরত লূত (আ.)-এর জনপদকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলাম। সেটাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে উল্টিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশে জমিনে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالْفَتْحِ عَطْفًا وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا : অর্থাৎ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -এর মধ্যকার اِنَّ-এর মধ্যে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমটি হলো– اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -এর উপর আতফ করা হবে এবং اِنَّ -কে مَنْصُوْب পড়া হবে। এ সূরতে فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى পর্যন্ত مَا -এর বয়ান হবে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ مَضْمُوْن টা صُحُفُ مُوْسٰى এবং صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ হবে। আর اِنَّ -কে যের দিয়ে পাঠ করা হয় তবে وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى হতে শেষ পর্যন্ত جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ হবে এবং শেষ পর্যন্ত مَضْمُوْن টা صُحُفُ مُوْسٰى ও صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ হবে না, বরং শুধুমাত্র প্রথম তিনটি তথা ১. اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ ২. وِزْرَ اُخْرٰى ৩. اِنَّ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى এর-وَاِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى مَضْمُوْن টা صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ এবং مُوْسٰى হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا : এখানে مَا بَعْدَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى হতে নিয়ে وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পর্যন্ত।

বি. দ্র. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -এর مَا-এর বয়ানে ১১ স্থানে اِنَّ এসেছে এটা সেই সুরতে হবে যখন بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى -এর আতফ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ الخ -এর উপর হবে, তখন اَنَّ -কে مَفْتُوْح পড়া হবে, অন্যথায় শুধুমাত্র প্রথম তিন জায়গায় مَفْتُوْح হবে। আর বাকি আট জায়গায় مَكْسُوْر হবে।

قَوْلُهُ وَاَقْنٰى : এটা اِقْنَاءٌ মাসদার থেকে মাযীর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থাৎ তিনি একত্র করলেন। অর্থাৎ اَعْطَى الْمَالَ

قَوْلُهُ الَّذِىْ اَتَّخَذَ قِنْيَةً : قِنْيَةٌ এমন সম্পদকে বলা হয় যাকে সঞ্চয় করা হয় এবং ব্যয় করার ইচ্ছা থাকেনা, আরবি ভাষাভাষীগণ ও মুফাসসিরগণ اَقْنٰى -এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَقْنٰى -এর অর্থ করেছেন- اَرْضٰى তথা সন্তুষ্ট করে দিলেন, ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে এর অর্থ করেছেন- قَنَعَ তথা নিশ্চিন্ত করে দিল।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু তাকে দেওয়া হয় তাই হলো اَقْنَا

আবূ উবাইদ ও অন্যান্যদের মতে اَقْنٰى শব্দটি قِنْيَةٌ হতে নির্গত যার অর্থ হলো সংরক্ষিত ও অবশিষ্ট মাল। যেমন, ঘর জমি, বাগান ইত্যাদি।

ইবনে যায়েদ, ইবনে কায়সান এবং আখফাশ اَقْنٰى -এর অর্থ اَفْقَرَ করেছেন। অর্থাৎ সে দরিদ্র বানালো। ইবনে জারীর (র.) এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন এবং اِفْعَالٌ -এর হামযাকে سَلْبِ مَاخَذْ -এর জন্য নিয়েছেন। যেমন اَشْكٰى -এর سَلْبِ شِكَايَتْ অর্থে। পূর্বাপর আলোচনা প্রেক্ষিতেও এই অর্থ অধিক উপযোগী মনে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ের আলোচনা আসছে। অর্থ হলো- তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র বানিয়েছেন।

قَوْلُهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى : شِعْرٰى হলো আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। এটাকে كَلْبِ اَكْبَرْ -ও বলা হয়। এছাড়াও আরো বিভিন্ন নাম রয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয় Dog Star আরবে এর পূজা করা হতো। কুরাইশ বংশীয় বনূ খুযাআ বিশেষভাবে এই তারকার পূজা করত। বলা হয় যে, এটা সূর্য থেকে ২৩ গুণ বেশি আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু তার দূরত্ব আট আলোকবর্ষ হতেও অধিক দূরে হওয়ার কারণে সূর্য হতে ছোট এবং অনুজ্জ্বল দেখা যায়। আলোর গতি বেগ প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ মাইল। এর পূজা সর্বপ্রথম আরম্ভ করেছিল কুরাইশ বংশীয় সর্দার আবূ কাবশা। আবূ কাবশা রাসূল ﷺ-এর মাতৃকুলের দিক দিয়ে جَدُّ اَعْلٰى ; এ কারণেই কুরাইশগণ তাঁকে ইবনে আবী কাবশা বলত। এই সম্পর্কের কারণে যখন রাসূল ﷺ আরবে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন তখন লোকেরা তাকে ইবনে আবী কাবশা বলা আরম্ভ করে দিল। অর্থাৎ আবূ কাবশা স্বীয় যুগে যেভাবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে তারকা পূজা শুরু করে দেয়, অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ -ও মূর্তিপূজা পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদতের সূচনা করেন। এটা প্রচণ্ড গরমের সময় জাওযা নক্ষত্রের পর উদিত হয়। এটাকে شِعْرٰى يَمَانِىْ -ও বলা হয়। এর বিপরীতে একটি شِعْرٰى شَامِىْ -ও রয়েছে। সেটা আলোকোজ্জ্বল তারকার অন্তর্ভুক্ত। এটাকে كَلْبِ اَصْغَرْ বলা হয়।

قَوْلُهُ الْمُؤْتَفِكَةُ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِيْتِفَاكٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلْ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ ,বহুবচনে اَلْمُؤْتَفِكَاتُ অর্থ- উল্টে ফেলা জনপদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদ। যা বর্তমানের মৃত সাগরের পাড়ে বিদ্যমান ছিল; যাদের সবচেয়ে বড় শহর ছিল 'সান্দূম' বা 'সাদূম'। হযরত লূত (আ.)-এর নির্দেশ অমান্যকরণ, অত্যাচার নির্যাতন ও লাওয়াতাত তথা সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে নাস্তনাবুদ করে দিয়েছিলেন।

اِنَّ অব্যয়ে **আরোপিত দুটি কেরাত : "قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى** : -এর ان -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ শব্দটি পূর্বোক্ত اِنَّ শব্দের উপর مَعْطُوْفٌ হিসেবে অধিকাংশ ক্বারীগণ فَتْحَهْ -এর সাথে পড়েছেন। কারো মতে اِنَّ الْمُنْتَهٰى। বাক্যটিকে جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ ধরে اِنَّ শব্দে كَسْرَهْ দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى : ... وَاَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ আয়াতটি بِمَا হতে বদল হিসেবে مَحَلاً مَجْرُوْرْ হয়েছে। অথবা, তা একটি উহ্য مُبْتَدَا -এর خَبَرْ হিসেবে مَحَلاً مَرْفُوْعْ হয়েছে, অর্থাৎ- ذَالِكَ اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ অথবা তা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلاً مَنْصُوْبْ -ও হতে পারে।

عَادًا الْاُوْلٰى **শব্দে বর্ণিত কেরাতদ্বয় :** عَادَانِ الْاُوْلٰى শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। হযরত নাফে ও আবূ আমর عَادًا শব্দের তানভীনকে الْاُوْلٰى শব্দের لَامْ অক্ষরে ইদগাম করে এবং لَامْ অক্ষরে পেশ দিয়ে কোনো হামযা ছাড়াই পড়েছেন। আর অধিকাংশ কারীগণ عَادًا শব্দের তানভীনকে لَامْ -এর মধ্যে ইদগাম করে হামযা বলবৎ রেখে عَادًا الْاُوْلٰى পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের নিকটই পৌঁছতে হবে।' আসলে দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং তার আনন্দ ভোগ করার জন্য যা কিছুই নির্মাণ ও তৈরি করুক না কেন তাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছতে হবে। এটাই মানুষের শেষ লক্ষ্য ও শেষ গন্তব্যস্থল। এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। তার রবের দরবার ছাড়া অন্য কোথাও মাথা গোজার সুযোগ থাকবে না। আল্লাহর দরবারে তার স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম হবে। এ মহাসত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মে সত্যিকার পরিবর্তন আনতে পারে। বস্তুত পক্ষে কারো চিন্তাশক্তিতে যদি এ অনুভূতির উদ্রেক হয় যে, তার শেষ পরিণতি আল্লাহর নিকট যা হতে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না, তখন তার কর্মপন্থা ও কর্মধারা ঐ সত্যের ভিত্তিতেই সূচিত হবে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে থাকবে। জীবনের সূচনা হতেই তার হৃদয় সর্বদাই তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকবে। -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى : আল্লামা কুরতুবী (র.) আল্লাহর আয়াত- "وَاَنَّهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى" -এর তাফসীরে কয়েকটি রেওয়ায়েত ব্যক্ত করেন। যথা-

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর শপথ নবী করীম ﷺ কখনো বলেননি যে, কোনো লোকের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে আজাব দেওয়া হয়েছে; বরং তিনি বলেছেন, কাফের ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তার আজাব বৃদ্ধি করে দেন। আর তিনি হাসিয়েছেন ও কাঁদিয়েছেন আর একজনের বোঝা অপরজন বহন করবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) অপর এক রেওয়ায়েতে বলেছেন, নবী করীম ﷺ একদল সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় তারা হাসছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেছেন যে, اَنَّهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى অর্থাৎ তিনিই হাসিয়েছেন ও কাঁদিয়েছেন।

হযরত আতা (র.) বলেন, তিনিই আনন্দ দান করেছেন এবং কাঁদিয়েছেন। কেননা আনন্দ হাসি আনে আর চিন্তায় কান্না আনে।

হযরত হাসান (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে হাসিয়েছেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে কাঁদিয়েছেন। কারো অভিমত হচ্ছে- যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা আনন্দ দিয়ে দুনিয়াতে হাসিয়েছেন। আর যাকে ইচ্ছা চিন্তা দিয়ে কাঁদিয়েছেন।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদেরকে অনুগ্রহ দ্বারা হাসিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। আর ঐ সকল লোকদের কাঁদিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযীর মতে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আখিরাতে হাসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদেরকে কাঁদিয়েছেন।

যাহহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে গাছপালা ও বৃক্ষ দ্বারা মাটিকে হাসিয়েছেন এবং বৃষ্টির দ্বারা কাঁদিয়েছেন।

হযরত যুন্নূন (র.) বলেন, মহান রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদের হৃদয়কে হাসিয়েছেন এবং কাফেরদের হৃদয়কে কাঁদিয়েছেন।

قوله وانه امات واحيى : এ আয়াতের উদ্দেশ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যুর উৎসসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

কারো কারো মতে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করে রেখেছেন। এর সমর্থনে তারা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও উপস্থাপন করেছেন, তা হলো- اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন। ইবনে বাহার (র.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ কাফেরকে কুফর দ্বারা মৃত্যু দান করেছেন আর মুমিনকে ঈমানের মাধ্যমে জীবন দান করেছেন।

কারো কারো মতে, এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা আমাদের বাপ দাদাদের মৃত বানিয়েছেন আর সন্তানদেরকে জীবন দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের শুক্রধাতুকে মৃত বানিয়েছেন, আর তা হতে নবজাত শিশুকে জীবন দিয়েছেন।

কারো মতে, এখানে জীবন দ্বারা উর্বরতা বুঝানো হয়েছে। আর মৃত্যু দ্বারা অনুর্বরতা বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

عَادًا الْأُوْلَى -এর মর্মার্থ এবং তাদের ধ্বংসের কারণ : عَادًا الْأُوْلَى 'প্রথম আদ' বলতে বুঝায় প্রাচীনতম আদ জাতি, যাদের প্রতি হযরত হূদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত হূদ (আ.)-কে অমান্য ও অগ্রাহ্য করার প্রতিফলরূপে এ জাতিটি যখন আজাবে নিমজ্জিত হলো, তখন কেবলমাত্র সে লোকেরাই রক্ষা পেয়েছিল যারা নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদেরই পরবর্তী বংশধরদেরকে عَادُ أُخْرٰى দ্বিতীয় আদ বলা হয়।

আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তারা কুরআনে কারীম ও ইতিহাসে প্রথম আদ (عَادُ أُوْلٰى) ও দ্বিতীয় আদ (عَادُ أُخْرٰى) নামে পরিচিত। হযরত হূদ (আ.) তাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আদ জাতির লোকেরা হযরত হূদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে নেয়নি এবং তাঁর অবাধ্য ছিল। এ কারণে তারা رِيْحٌ صَرْصَرٌ ঝঞ্ঝাবায়ুর আজাব দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির লোকদের পরে আদ সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। -[মাযহারী]

ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের একটি শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিল, বজ্রনিনাদের ফলে তাদের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে পড়লে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেছেন, আদ সম্প্রদায় দু'টির প্রথম সম্প্রদায় হযরত হূদ (আ.)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণে উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা প্রবাহে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আদের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বজ্রনিনাদে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম আদ হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের প্রপৌত্রের নাম ছিল এবং তার পরবর্তী বংশধর হলো দ্বিতীয় আদের সম্প্রদায়। -[হাশিয়াতুল জামাল]

বায়যাভী (র.) বলেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সম্প্রদায় সর্বপ্রথম আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়েছিল এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। -[বায়যাভী]

কারো মতে হূদ (আ.)-এর জাতির লোকেরা প্রথম আদ, আর ইরাম সম্প্রদায়ের লোকেরা দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত।

প্রধান তাফসীরকারদের অধিকাংশের মতে, এখানে আদ সম্প্রদায় জাতির লোকদের পরিচয় উদ্দেশ্য নয়, তাদের একের পর এক ধ্বংসের বিবরণ দেওয়াই উদ্দেশ্য। -[হাশিয়াতুল জামাল]

قَوْلُهُ وَأَنَّهُ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى : غِنَاءٌ শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اِغْنَاءٌ শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اَقْنٰى শব্দটি قُنْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন; যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

قَوْلُهُ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى : شِعْرٰى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোনো কোনো সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই: যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

قَوْلُهُ وَأَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَنِ الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقٰى : 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হূদ (আ.)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আজাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। -[মাযহারী]

সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, ফলে তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আজাব আসে। ফলে তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

قَوْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى : مُؤْتَفِكَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ- সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

অনুবাদ :

٥٤. فَغَشَّاهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا غَشّٰى ج اَبْهَمَ تَهْوِيْلاً وَفِىْ هُوْدٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ .

৫৪. তখন এর পর প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। যা ব্যাপারটির বিভীষিকা প্রকাশার্থে তার বিবরণ প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। আর সূরা হুদ-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে– فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ

٥٥. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ بِاَنْعُمِهِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ تَتَمَارٰى . تَشُكُّكُ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اَوْ تُكَذِّبُ .

৫৫. হে মানুষ! অতঃপর তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে তার একত্ব ও কুদরতের সাক্ষ্য বহনকারী অনুগ্রহরাজির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। অথবা অস্বীকার করবে।

٥٦. هٰذَا مُحَمَّدٌ ﷺ نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى . مِنْ جِنْسِهِمْ اَىْ رَسُوْلٌ كَالرُّسُلِ قَبْلَهُ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ كَمَا اُرْسِلُوْا اِلٰى اَقْوَامِهِمْ .

৫৬. ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ পূর্ববর্তী ভয় প্রদর্শন-কারীদের মধ্যে একজন, তাঁদেরই জাতীয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাসূলগণের ন্যায় একজন রাসূল। তাঁকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন– পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

٥٧. اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ج قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ .

৫৭. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। মহাপ্রলয়ের দিন নিকটবর্তী হয়েছে।

٥٨. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نَفْسٌ كَاشِفَةٌ ط اَىْ لَا يَكْشِفُهَا وَيُظْهِرُهَا اِلَّا هُوَ كَقَوْلِهِ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ .

৫৮. আল্লাহ তা'আলা ব্যাতীত কেউই তা ব্যক্তকারী নয়। অর্থাৎ তিনি ভিন্ন আর কেউ তা ব্যক্ত ও প্রকাশ করতে পারবে না। যেমন– لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ তা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ ঘটাবে না। এখানে এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

٥٩. اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَىْ الْقُرْاٰنِ تَعْجَبُوْنَ لا تَكْذِيْبًا .

৫৯. তোমরা কি এ বাণী সম্পর্কে তথা কুরআন সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছ। অসত্যারোপের উদ্দেশ্যে।

٦٠. وَتَضْحَكُوْنَ اِسْتِهْزَاءً وَلَا تَبْكُوْنَ لا لِسِمَاعِ وَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ .

৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করছ, বিদ্রূপার্থে, আর কাঁদছ না এর প্রতিশ্রুতি ও হুমকীব্যঞ্জক আয়াতসমূহ শ্রবণ করে।

٦١. وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ . لَاهُوْنَ غَافِلُوْنَ عَمَّا يُطْلَبُ مِنْكُمْ .

৬১. আর তোমরা চরম উদাসীন তোমাদের নিকট যা চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে অসতর্ক ও উদাসীন।

٦٢. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَاعْبُدُوْا . وَلَا تَسْجُدُوْا لِلْاَصْنَامِ وَلَا تَعْبُدُوْهَا .

৬২. তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর উপাসনা কর, প্রতিমাকে সিজদা করো না এবং তাদের উপাসনা করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَفِيْ هُوْدٍ فَجَعَلْنَا : এভাবে বলাটা বিশুদ্ধ ছিল যে- وَفِيْ هُوْدٍ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا অথবা পুনরায় وَفِي الْحَجَرِ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا বলা।

قَوْلُهُ تَشُكُّ : تَتَمَارٰى-এর তাফসীর تَشُكُّ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَفَاعَلْ টা تَعَدَّدْ فِى الْفَاعِلِ হতে মুক্ত।

قَوْلُهُ نَفْس : মুফাসসির (র.) نَفْس উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَاشِفَةٌ শব্দটি উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ سَامِدُوْنَ وَقِيْلَ هُوَ الْغِنَاءُ : اَلسَّمُوْدُ اللَّهْوُ (ن) وَقِيْلَ الْاِعْرَاضُ وَقِيْلَ الْاِسْتِكْبَارُ

قَوْلُهُ مَا غَشّٰى : مَا غَشّٰى উক্তিটি তার পূর্বের تَغَشّٰى ফে'লের مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ বা فَاعِلْ হিসেবে مَرْفُوْعُ الْمَحَلِّ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ : وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ আয়াতের দু'টি মহল্লে ইরাব হতে পারে। যথা-

১. وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ হলো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ যা দ্বারা নির্বোধ মানুষ সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এর কোনো মহল্লে ইরাব নেই। এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

২. এছাড়া وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ বাক্যটি حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ- اَلنَّفْىُ عَنْكُمُ الْبُكَاءُ فِىْ حَالِ كَوْنِكُمْ سَامِدِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের নির্বোধ হওয়া অবস্থায় তোমাদের থেকে ক্রন্দন চলে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى : অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হলো।

قَوْلُهُ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى : শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আজাবের ঘটনাবলি শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে!

قَوْلُهُ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى : هٰذَا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী পয়গাম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সকল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান।

قَوْلُهُ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ : অর্থাৎ নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

قَوْلُهُ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ : هٰذَا الْحَدِيْثِ বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং একটি মুজেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গুনাহ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ : سُمُوْدٌ -এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ হলো গান-বাজনা করা এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

قَوْلُهُ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا : অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবি এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এই আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মসুলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সূরা নাজম পাঠ করে তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সিজদা করল, একজন কুরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোনো ছওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তাওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সূরা নাজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন; কিন্তু তিনি সিজদা করেননি। এই হাদীসদৃষ্টে এটা বলা জরুরি হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর অজু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থি অন্য কোনো ওজর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরি হয় না, পরেও করা যায়।

মাসআলা : ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী (র.) ও অধিকাংশ আহলে ইলমের নিকট এ আয়াত পাঠে সিজদা করা আবশ্যক। ইমাম মালেক (র.) যদিও এ আয়াত পাঠান্তে সিজদা করতেন [যেমনটি কাজী ইবনুল আরাবী (র.) আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন] কিন্তু তাঁর মাসলাক এই ছিল যে, এখানে সিজদা করা আবশ্যক নয়। তাঁর মতের পক্ষে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর এ রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমি রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে সূরা নাজম পাঠ করেছি; কিন্তু তিনি সিজদা করেননি। -[বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

কিন্তু এই হাদীস সিজদা আবশ্যক হওয়াকে লাজেম করে না। কেননা এর দ্বারা সর্বোচ্চ এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ সেই সময় সিজদা করেননি। কিন্তু পরেও সিজদা করেননি এটা প্রমাণিত হয় না। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূল ﷺ পরবর্তীতে সিজদা করেছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য রেওয়ায়েত সুস্পষ্ট রয়েছে যে, এ আয়াতে তিনি আবশ্যকরূপে সিজদা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং মুত্তালিব ইবনে আবী ওবায়দা'আ (রা.)-এর مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ যখন প্রথমবার হরমে এই সূরা পাঠ করেছেন তখন তিনি সিজদা করেছেন। তার সাথে মুসলমান ও মুশরিক সকলেই সিজদা করেছে। -[বুখারী, আহমদ ও নাসায়ী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ নামাজে সূরা নাজম পাঠ করে দীর্ঘ সময় সিজদায় থেকেছেন। -[বায়হাকী, ইবনে মরদবিয়া]

সুবরাতুল জুহানী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) ফজরের নামাজে সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করেছেন এবং এরপর উঠে সূরা যিলযাল পড়ে রুকূতে গিয়েছেন। -[সাঈদ ইবনে মানসূর]

ফায়েদা : সর্বপ্রথম যে সূরায় সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় সেটা হলো সূরা নাজম। -[বুখারী]

মাসআলা : এ আয়াতের উপর সিজদা ওয়াজিব।

মাসআলা : যার উপর সিজদা করবে, তাতে নত হওয়া ব্যতীত উহাকে উচুতে উঠানো বৈধ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . اِنْفَلَقَ فِلْقَتَيْنِ عَلٰى اَبِىْ قُبَيْسٍ وَقُعَيْقَعَانَ اٰيَةً لَهُ ﷺ وَقَدْ سُئِلَهَا فَقَالَ اشْهَدُوْا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

১. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ দু'টুকরো হয়ে গেছে। এক টুকরা 'আবী কুবাইস' পাহাড়ে আরেক টুকরা 'কু'য়াইকিআন' পাহাড়ে। রাসূল ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ। যখন রাসূল ﷺ থেকে মুজেযা কামনা করা হয়েছিল তখন তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো। –[বুখারী ও মুসলিম]

٢. وَاِنْ يَّرَوْا اَىْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اٰيَةً مُعْجِزَةً لَهُ ﷺ كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ . قَوِيٌّ مِنَ الْمِرَّةِ الْقُوَّةِ اَوْ دَائِمٌ .

২. তারা অর্থাৎ মক্কার কুরাইশরা কোনো নিদর্শন দেখলে রাসূল ﷺ -এর কোনো মুজেযা যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ করা। মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটাতো চিরাচরিত জাদু। مِرَّةٌ অর্থ– اَلْقُوَّةُ বা دَائِمٌ

٣. وَكَذَّبُوْا النَّبِىَّ ﷺ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاۤءَهُمْ فِى الْبَاطِلِ وَكُلُّ اَمْرٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُسْتَقِرٌّ . بِاَهْلِهِ فِى الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ .

৩. তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নবী করীম ﷺ -কে এবং নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে বাতিল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাপারই ভালো হোক বা মন্দ হোক লক্ষ্যে পৌঁছাবে তার হকদারসহ জান্নাতে বা জাহান্নামে।

٤. وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاۤءِ اَخْبَارُ هَلَاكِ الْاُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهُمْ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ . لَهُمْ اِسْمُ مَصْدَرٍ اَوْ اِسْمُ مَكَانٍ وَالدَّالُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ وَازْدَجَرْتُهُ وَزَجَرْتُهُ نَهَيْتُهُ بِغِلْظَةٍ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ مَوْصُوْفَةٌ .

৪. তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ তাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতির ধ্বংসের সংবাদ। যাতে আছে সাবধান বাণী তাদের জন্য। مُزْدَجَرٌ শব্দটি اِسْمِ مَصْدَرْ কিংবা اِسْمِ مَكَانْ আর مُزْدَجَرٌ -এর دَالْ -টি اِفْتِعَالْ -এর تَاءْ হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। আর اِزْدَجَرْتُهُ এবং زَجَرْتُهُ -এর অর্থ হলো– আমি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। আর مَا টা مَوْصُوْلَةٌ অথবা مَوْصُوْفَةٌ

٥. حِكْمَةٌ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ اَوْ بَدَلٌ مِنْ مَا اَوْ مِنْ مُزْدَجَرٌ بَالِغَةٌ تَامَّةٌ فَمَا تُغْنِ تَنْفَعُ فِيْهِمُ النُّذُرُ ۙ جَمْعُ نَذِيْرٍ بِمَعْنَى مُنْذِرٍ اَىْ اَلْاُمُوْرُ الْمُنْذِرَةُ لَهُمْ وَمَا لِلنَّفْيِ اَوْ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ وَهِىَ عَلَى الثَّانِىْ مَفْعُوْلٌ مُقَدَّمٌ ـ

৫. এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান এটা উহ্য মুবতাদার খবর কিংবা مَا বা مُزْدَجَرٌ হতে بَدَلٌ হয়েছে। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি। اَلنُّذُرُ শব্দটি نُذُرٌ -এর বহুবচন অর্থ- مُنْذِرٌ অর্থাৎ তাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী বিষয়সমূহ। আর مَا টা হয়তো نَفِى -এর জন্য অথবা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ -এর জন্য। দ্বিতীয় সুরতে এটি تُغْنِىْ-এর মাফউলে মুকাদ্দাম হবে।

٦. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ هُوَ فَائِدَةُ مَا قَبْلَهُ وَبِهِ تَمَّ الْكَلَامُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ هُوَ اِسْرَافِيْلُ وَنَاصِبُ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ بَعْدُ اِلَى شَىْءٍ نُكُرٍ ۙ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا اَىْ مُنْكَرٍ تُنْكِرُهُ النُّفُوْسُ لِشِدَّتِهِ وَهُوَ الْحِسَابُ ـ

৬. অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এটা পূর্ববর্তী বাক্যের ফায়েদা এবং এর দ্বারাই বাক্যটি পূর্ণ হয়ে গেছে। যেদিন আহবানকারী আহবান করবেন তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। আর يَوْم -এর نَاصِبْ হলো পরবর্তী يَخْرُجُوْنَ ফে'লটি এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে। نُكُرٌ শব্দটির كَافْ বর্ণের পেশ ও সাকিন উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ অপছন্দনীয় বস্তু। যাকে তার কঠোরতার কারণে নফস অপছন্দ করবে। আর সেটা হলো হিসাবের দিন।

٧. خُشَّعًا ذَلِيْلًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ خُشَّعًا بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الشِّيْنِ مُشَدَّدَةً اَبْصَارُهُمْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَخْرُجُوْنَ اَىْ النَّاسُ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ـ لَا يَدْرُوْنَ اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَيْرَةِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَخْرُجُوْنَ ـ

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে خَاشِعًا অর্থ- লাঞ্ছিত, অপদস্ত। অন্য কেরাতে রয়েছে خُشَّعًا তথা خَاءْ বর্ণে পেশ شِيْن বর্ণে তাশদীদসহ যবর। আর خُشَّعًا টা يَخْرُجُوْنَ -এর ضَمِيْر فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে, সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে অর্থাৎ মানুষেরা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। ভয় এবং পেরেশানীর কারণে সেদিন তারা বুঝাতে পারবে না যে, কোথায় চলছে? আর এই বাক্যটি يَخْرُجُوْنَ -এর فَاعِلْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

٨. كَذَا قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ اَىْ مُسْرِعِيْنَ مَادِّىْ اَعْنَاقِهِمْ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ مِنْهُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ـ اَىْ صَعْبٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ كَمَا فِى الْمُدَّثِّرِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

৮. এমনিভাবে আল্লাহর বাণী- مُهْطِعِيْنَ তারা ভীত-বিহবল হয়ে আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে অর্থাৎ দ্রুত ঘাড় উঠিয়ে আসবে। কাফেররা বলবে তাদের মধ্য থেকে কঠিন এই দিন অর্থাৎ খুবই কঠিন হবে কাফেরদের উপর যেমন সূরা মুদ্দাচ্ছির -এর মধ্যে রয়েছে- يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

٩. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَبْلَ قُرَيْشٍ قَوْمُ نُوحٍ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا نُوْحًا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ اَىْ اِنْتَهَرُوْهُ بِالسَّبِّ وَغَيْرِهِ ـ

৯. এদের পূর্বে কুরাইশদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায়ও ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে قَوْم -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। তারা অস্বীকার করেছিল আমার বান্দাকে হযরত নূহ (আ.)-কে আর বলেছিল, এতো এক পাগল, আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁরা তাকে বকাবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে শাসিয়েছিল।

١٠. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ بِالْفَتْحِ اَىْ بِاَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ـ

১০. তখন তিনি তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিলেন اِنِّىْ শব্দটির হামযা যবর বিশিষ্ট অর্থাৎ بِاَنِّىْ আমি তো অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।

١١. فَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ مُنْصَبٍّ اِنْصِبَابًا شَدِيْدًا ـ

১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম فَفَتَحْنَا শব্দটির تَاءٌ বর্ণে تَشْدِيْد ও تَخْفِيْف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আকাশের দ্বারা প্রবল বারি বর্ষণে।

١٢. وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا تَنْبَعُ فَالْتَقَى الْمَاءُ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ عَلٰى اَمْرٍ حَالٍ قَدْ قُدِرَ ج بِهِ فِى الْاَزَلِ وَهُوَ هَلَاكُهُمْ غَرْقًا ـ

১২. এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ তখন পৃথিবীতে নালা/ঝরনা উপচে পড়ল। অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো আকাশ ও পাতালের পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে আযলে আর সে অবস্থা হলো তাদের ডুবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

١٣. وَحَمَلْنٰهُ اَىْ نُوْحًا عَلٰى سَفِيْنَةٍ ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ـ وَهِىَ مَا تُشَدُّ بِهِ الْاَلْوَاحُ مِنَ الْمَسَامِيْرِ وَغَيْرِهَا وَاحِدُهَا دِسَارٌ كَكِتَابٍ ـ

১৩. তখন আরোহণ করালাম হযরত নূহ (আ.)-কে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে। دُسُرٌ এমন বস্তুকে বলা হয় যার মাধ্যমে কাঠগুলোকে মিলানো হয়। যেমন– কীলক, পেরেক, তারকাটা। এর একবচন হলো دِسَارٌ যেমন كِتَابٌ -এর বহুবচন হয় كُتُبٌ

١٤. تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ج بِمَرْاٰى مِنَّا اَىْ مَحْفُوْظَةً بِحِفْظِنَا جَزَآءً مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اُغْرِقُوْا اِنْتِصَارًا لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَهِىَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُرِئَ كَفَرَ بِنَاءً لِلْفَاعِلِ اَىْ اُغْرِقُوْا عِقَابًا لَهُمْ ـ

১৪. যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; আমার দৃষ্টির সম্মুখে অর্থাৎ আমার হেফাজতে। এটা পুরস্কার جَزَاءً শব্দটি উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ اُغْرِقُوْا اِنْتِصَارًا তার জন্য যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন আর তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। كُفِرَ শব্দটি তথা كُفِرَ مَعْرُوْف রূপেও পঠিত আছে فَاعِلْ হওয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ তাদের নাফমানির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

١٥. وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اَىْ اَبْقَيْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ اٰيَةً لِمَنْ يَّعْتَبِرُ بِهَا اَىْ شَاعَ خَبَرُهَا وَاسْتَمَرَّ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ مُعْتَبِرٍ مُتَّعِظٍ بِهَا وَاَصْلُهُ مُذْتَكِرٍ اُبْدِلَتِ التَّاءُ دَالًا مُهْمَلَةً وَكَذَا الْمُعْجَمَةُ وَاُدْغِمَتْ فِيْهَا ـ

১৫. আমি একে রেখে দিয়েছি অর্থাৎ এ কর্মকে অবশিষ্ট রেখেছি এক নিদর্শন রূপে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়। অর্থাৎ সেই ঘটনা প্রচার হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট রয়েছে গেছে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী। مُدَّكِرٌ আসলে ছিল مُذْتَكِرٌ এখানে تَاءْ -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এরপর ذَالْ -কে دَالْ -এ রূপান্তরিত করে دَالْ কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছেন।

١٦. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ اَىْ اِنْذَارِىْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ وَكَيْفَ خَبَرُ كَانَ وَهِىَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ وَالْمَعْنٰى حَمْلُ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلَى الْاِقْرَارِ بِوُقُوْعِ عَذَابِهِ تَعَالٰى بِالْمُكَذِّبِيْنَ بِنُوْحٍ مَوْقِعَهُ ـ

১৬. কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী نُذُرْ অর্থ হলো اِنْذَارِىْ এটা اِسْتِفْهَامْ تَقْرِيْرِىْ আর كَيْفَ হলো كَانَ -এর খবর। আর كَيْفَ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর আয়াতের অর্থ হলো সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে হযরত নূহ (আ.)-এর মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের উপর শাস্তি পতিত হওয়ার স্বীকারোক্তির উপর অবহিত করতেছে যে, শাস্তি যথাস্থানে পতিত হয়েছে।

١٧. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ اَوْ هَيَّأْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ مُتَّعِظٍ بِهِ وَحَافِظٍ لَهُ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اِحْفَظُوْهُ وَاتَّعِظُوْا وَ لَيْسَ يُحْفَظُ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرُهُ ـ

১৭. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণের জন্য; আমি একে সহজ করে দিয়েছি মুখস্থ করে সংরক্ষণ করার জন্য অথবা আমি একে প্রস্তুত করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারী এবং একে হিফজকারী উদ্দেশ্য। এখানে اِسْتِفْهَامْ টা اَمْر -এর অর্থে। অর্থাৎ একে হিফজ করো এবং এর থেকে উপদেশ অর্জন কর। আর কুরআন ব্যতীত আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্য হতে অন্য কোনো কিতাব মৌখিকভাবে মুখস্থ করা হয় না।

١٨. كَذَّبَتْ عَادٌ نَبِيَّهُمْ هُوْدًا فَعُذِّبُوْا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ اَىْ اِنْذَارِىْ لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ اَىْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ـ

১৮. আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের নবী হযরত হূদ (আ.)-কে। ফলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমার তাদেরকে ভয় দেখানো কিরূপ ছিল? অর্থাৎ জায়গা মতোই পতিত হয়েছে। আর তাকে স্বীয় উক্তি- اِنَّا اَرْسَلْنَا দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

١٩. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا اَىْ شَدِيْدَةَ الصَّوْتِ فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ شُؤْمٍ مُّسْتَمِرٍّ لا دَائِمِ الشُّؤْمِ اَوْ قَوِيَّهُ وَكَانَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ اٰخِرَ الشَّهْرِ ـ

১৯. তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অর্থাৎ ভীষণ গর্জনকারী নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে ধারাবাহিক অকল্যাণ বা শক্তিশালী অকল্যাণ। আর তা ছিল মাসের শেষ বুধবার।

২০. تَنْزِعُ النَّاسَ تَقْلَعُهُمْ مِنْ حُفَرِ الْاَرْضِ الْمُنْدَسِّيْنَ فِيْهَا وَتَصْرَعُهُمْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ فَتَدُقُّ رِقَابَهُمْ فَتَبِيْنُ الرَّأْسُ عَنِ الْجَسَدِ كَاَنَّهُمْ وَحَالُهُمْ مَا ذُكِرَ اَعْجَازُ اُصُوْلُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ مُنْقَلِعٍ سَاقِطٍ عَلَى الْاَرْضِ وَشُبِّهُوْا بِالنَّخْلِ لِطُوْلِهِمْ وَذُكِّرَ هُنَا وَاُنِّثَ فِى الْحَاقَّةِ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ مُرَاعَاةً لِلْفَوَاصِلِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ ـ

২০. মানুষকে তা উৎখাত করেছিল তাদের মাথার কুঞ্চন ভূপাতিত করা হচ্ছিল, তাদের ঘাড় কেটে দেওয়া হচ্ছিল। যার কারণে তাদের মস্তক শরীর হতে পৃথক হয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তাদের উল্লিখিত অবস্থা এরূপ ছিল যে, যেন তারা উন্মুলিত খর্জুরকাণ্ডের ন্যায়। তাদের দেহ দৈর্ঘ্যাকৃতির হওয়ার কারণে তাদেরকে খেজুর গাছের দেহের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এখানে نَخْلٌ -কে পুংলিঙ্গ আর সূরা হাক্কাহ -এর মধ্যে উভয় স্থানে فَوَاصِلْ -এর কারণে نَخْلٌ خَاوِيَةٌ স্ত্রীলিঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ

২১. কি কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

২২. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ

২২. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ : এখানে اِقْتَرَبَ -এর তাফসীর قَرُبَ দিয়ে করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَزِيْد টা مُجَرَّدْ -এর অর্থে হয়েছে। যেমন اِقْتَدَرْ শব্দটি قَدَر -এর অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : مُجَرَّدْ -কে مَزِيْد দ্বারা কেন ব্যক্ত করলেন?

উত্তর : قَرُبَ -এর অর্থের মধ্যে مُبَالَغَہ প্রকাশ করার জন্য, কেননা অতিরিক্ত বর্ণ অতিরিক্তি অর্থকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ : তৃতীয় এবং চৌদ্দ তারিখের রাতের মাঝের চাঁদকে قَمَرْ বলা হয়। এর পূর্বের চাঁদকে هِلَال এবং চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে بَدْرٌ বলা হয়।

قَمَر হলো আমাদের نِظَامِ شَمْسِى -এর নিকটতম গ্রহ। পূর্ববর্তী তাহকীক [তত্ত্বানুসন্ধান] অনুসারে পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব হলো দু'লাখ চল্লিশ হাজার মাইল। কিন্তু নতুন তাহকীক অনুযায়ী পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব হলো দুই লাখ ছাব্বিশ হাজার নয়শত সত্তর দশমিক নয় মাইল। এর পূর্বে এত বিশুদ্ধ পরিমাপ আর কখনো করা হয়নি।

قَوْلُهُ قَوِىٌّ اَوْ دَائِمٌ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُسْتَمِرٌّ -এর অর্থ বর্ণনা করা। মুফাসসির (র.) مُسْتَمِرٌّ -এর দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হলো শক্তিশালী অর্থে। এ সুরতে مُسْتَمِرٌ টা مِرَّةٌ হতে নির্গত হবে। কেননা مِرَّةٌ -এর অর্থ হলো শক্তি। যখন বিষয়টি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়, তখন বলা হয় اِسْتَمَرَّ الشَّئُ অর্থাৎ বিষয়টি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হলো। আয়াতের অর্থ হলো– এটা খুবই শক্তিশালী জাদু।

দ্বিতীয় হলো مُسْتَمِرٌ অর্থ– সর্বদা। তখন এটা اِسْتِمْرَارٌ হতে নির্গত হবে। যার অর্থ হলো সর্বদা বা পূর্ব থেকেই চলে আসছে, অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাতদিন তথা প্রতিনিয়ত জাদুকরের ধারা চালিয়ে রেখেছেন। উল্লিখিত দুটি অর্থ ছাড়াও مُسْتَمِر -এর আরো দুটি অর্থ রয়েছে যেগুলোকে মুফাসসির (র.) পছন্দ করেছেন। সেগুলো হলো–

১. অতিক্রমকারী, অতিবাহিত, অতিক্রান্ত, ধ্বংসশীল। অস্তিত্বহীন। এ সূরতে এটা مَارٌّ যা ذَاهِبٌ অর্থে তা হতে নির্গত তখন আয়াতের অর্থ হবে- যেভাবে অন্যান্য জাদু চলে গেছে এভাবে সেও চলে যাবে। তার প্রভাবও বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

২. বিস্বাদ, অমনোপুত, তিক্ত। এ সুরতে مُسْتَمِرٌّ -টি مَرٌّ হতে নির্গত হবে যার অর্থ- তিক্ত, বিস্বাদ। তখন আয়াতের অর্থ হবে- যেভাবে তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না, অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কথাও মুজেযা আমাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।

প্রশ্ন : كَذَّبُوْا -এর আতফ يُعْرِضُوْا -এর উপর হয়েছে مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো مُضَارِعْ আর মা'তূফ হলো مَاضِىْ এতে কি রহস্য রয়েছে?

উত্তর : এতে রহস্য হচ্ছে এই যে, مَاضِىْ -এর সীগাহ এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাটা তাদের পুরাতন অভ্যাস, নতুন কোনো অভ্যাস নয়।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ : এর মধ্যে مِنْ -টি হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ উদ্দেশ্য হলো উম্মতের সেই সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُزْدَجَرٌ : এর মধ্যে مِيْمْ -টি হলো مَصْدَرْ مِيْمِىّ যা اِزْدِجَارٌ অর্থে। আবার اِسْمُ مَكَانٍ -ও হতে পারে। অর্থাৎ তাদের কাছে এমন খবর এসেছে যা اِزْدِجَارٌ -এর স্থানে। مِنَ الْاَنْبَاءِ এটা حَالٌ হওয়ার কারণে نَصَبٌ -এর স্থানে হয়েছে এবং مَا হলো ذُو الْحَالِ আর مَا টা مَوْصُوْفَةٌ এবং مَوْصُوْلَةٌ উভয়ই হতে পারে। আর উভয় সুরতেই مَا টা جَاءَ ফে'লের فَاعِلْ হয়েছে আর فِيْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ এবং বাক্যটি مَا -এর صِلَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا تُغْنِى النُّذُرُ : এখানে مَا টা اِسْتِفْهَامِيَّةٌ এবং نَافِيَةٌ উভয়টি হতে পারে। اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হওয়ার সুরতে تُغْنِىْ -এর মাফউলে মুকাদ্দাম হবে- اَىَّ شَيْءٍ تُغْنِىْ النُّذُرُ

قَوْلُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوْف : অর্থাৎ- هُوَ حِكْمَةٌ

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ : এটা اِهْطَاعٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلْ -এর সীগাহ এবং يَخْرُجُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থ হলো- ঘাড় উঁচু করে দ্রুত চলা।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الْكَافِرُ : এটা جُمْلَهٌ مُسْتَاْنِفَهٌ; এই সুরতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব হবে। কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনা থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, ঐ সময় কাফেরদের কি হবে?

উত্তর দিয়েছেন যে, তারা বলবে, এই দিন বড় কঠিন হবে। আবার কেউ কেউ يَخْرُجُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সেই সুরতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, جُمْلَهٌ যখন حَالٌ হয় তখন তাতে একটি رَابِطْ থাকা জরুরি অথচ এখানে তো কোনো رَابِطْ নেই।

উত্তর : মুফাসসির (র.) مِنْهُمْ উহ্য মেনে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنَى قَوْمٍ : এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের জবাব দান উদ্দেশ্য-

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো এই যে, قَوْمٌ যা পুংলিঙ্গ كَذَّبَتْ -এর ফায়েল। তাই দেখা যাচ্ছে যে, فِعْلْ এবং فَاعِلْ -এর মধ্যে সমতা নেই। কেননা ফে'ল হলো مُؤَنَّثْ আর فَاعِلْ হলো مُذَكَّرٌ

উত্তর : قَوْمٌ শব্দটি অর্থের হিসেবে مُؤَنَّثْ অর্থাৎ اُمَّةٌ অর্থে এটা অধিক সংখ্যককে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُؤَنَّثْ مَعْنَوِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا : عُيُوْنًا শব্দটি تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে যা মাফউল হতে পরিবর্তিত। উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে- فَجَّرْنَا عُيُوْنَ الْاَرْضِ ; আবার কেউ কেউ فَاعِلْ থেকে পরিবর্তিত বলেছেন। উহ্য ইবাতর হলো এরূপ যে- اِنْفَجَرَتْ عُيُوْنُ الْاَرْضِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কামার প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা কামার মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৫৫ আয়াত, ৩৪২ বাক্য এবং ১, ৪০৩টি অক্ষর রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এ সূরার ফজিলত : আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মর্মে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা কামার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় সে হাজির হবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৬ পৃ. ১৪৭]

বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফেতর নামাজে সূরা ক্বাফ এবং সূরা কামার পাঠ করতেন।

এ সূরার আমল : সূরা কামারকে জুমার দিন নামাজের পূর্বে লিপিবদ্ধ করে পাগড়ির ভেতর রাখা হলে ঐ ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে থাকবে, সে জাদুসহ সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মূল বক্তব্য : এ সূরার প্রারম্ভেই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি বিশেষ মুজেযার উল্লেখ রয়েছে, যা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের দলিল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এ সূরায় কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ সূরায় তাওহীদ এবং রিসালতের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ঈমান ও নেক আমলের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি নাফরমানির শাস্তি সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায় মানুষের পুনর্জীবনের কথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে কুরআন কারীমকে সহজ করা হয়েছে। পূর্বকালে যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করেছে, তাদের কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে? তা-ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন- আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউনের দলবল প্রভৃতিকে তাদের নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার উল্লেখ এ সূরায় রয়েছে।

শানে নুযূল : মক্কার কাফেররা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বলল, যদি আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের নবী হন, তবে তার প্রমাণ উপস্থাপন করুন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি প্রমাণ দেখতে চাও? তখন কাফেররা বলল, যদি আপনি এ চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের শর্তারোপের কারণে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এবং তাঁর দোয়া কবুল হলো।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা : আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। মক্কার কাফেররা স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। চন্দ্রের অর্ধেক সাফা নামক পাহাড়ের উপর চলে গেল। বাকি অর্ধেক চলে গেল কু'আইকিয়ান নামক পাহাড়ের দিকে। তখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দেখে নাও। এই বিরাট এবং বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে এ সূরার প্রারম্ভে, আর এটিই প্রিয়নবী ﷺ নবুয়তের অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সূরার পরিসমাপ্তি পথভ্রষ্ট লোকদের বঞ্চিত এবং ধ্বংস হওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি ঈমানদার, মুত্তাকী পরহেজগারদের শুভ-পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মক্কার অধিবাসীরা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ মর্মে আর্জি পেশ করল যে, আপনার কোনো মুজেযা প্রদর্শন করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন। হেরা পর্বতের এক দিকে একখণ্ড, আর অন্য দিকে আরেক খণ্ড। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মক্কাতে দেখেছি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের পূর্বে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত রয়েছে। এদৃশ্য দেখে কাফেররা বলল চন্দ্রের উপর জাদু করা হয়েছে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

আল্লামা বগভী (র.) বুখারী শরীফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। একখণ্ড পাহাড়ের উপর, আর একখণ্ড পাহাড়ের নিচে চলে যায়।

কিন্তু এমন প্রকাশ্য মুজেযা দেখেও মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। ঈমান আনা তো দূরের কথা; বরং তারা একথাও বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জাদু করেছেন। অথবা চাঁদকে জাদু করেছেন। অথচ এ চন্দ্র বিদারণের ঘটনাটি কিয়ামতের সম্ভাবনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন একদিন আসবে, যেদিন এই বিশ্ব বিদীর্ণ হয়ে যাবে, চন্দ্র বিদারণের এই ঘটনা দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরা নাজম اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলিল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেযা আলোচিত হয়েছে। কেননা কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন, আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির

ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরো কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুজেযা হিসেবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মুজেযাটি আরো এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজেযা : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোনো নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজেযা প্রকাশ করেন। এই মুজেযার প্রমাণ কুরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মুতঈম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মুজেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (র.) ও ইবনে কাসীর (র.) এই মুজেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মুজেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বাদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরায় হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মুজেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্র হয়ে গেল। কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মুজেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবেন না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরক তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মুজেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। -[বয়ানুল কুরআন]

এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন-

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَالُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا .

অর্থাৎ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে ফেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন-

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِقَّيْنِ حَتّٰى نَظَرُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জারীর (রা.)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে-

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَاَخَذَتْ فِرْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাক্ষ্য দাও! সাক্ষ্য দাও!

আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন-

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اَهْلُ مَكَّةَ هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ ابْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ اُنْظُرُوا السُّفَّارَ فَاِنْ كَانُوْا رَاَوْا مَا رَاَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ . وَاِنْ كَانُوْا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ فَسُئِلَ السُّفَّارُ قَالَ وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوْا رَأَيْنَا .

অর্থাৎ মক্কায় [অবস্থানকালে] চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কুরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে জাদু করেছেন। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বিদেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থা দেখেছে বলে স্বীকার করে। -[ইবনে কাসীর]

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব : গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জবাব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবি মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহুল্য, মুজেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাসবিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মুজেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোনো কোনো দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোনো কোনো দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকবে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোনো প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোনো দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোনো খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মালাবাবের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ : مُسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ- দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো সময়ে مَرَّ ও اِسْتَمَرَّ চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এইযে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُسْتَمِرٌّ শব্দের এক অর্থ হচ্ছে- শক্ত ও কঠোর। আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক (রা.) এই তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত জাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেরদেরকে প্রবোধ দিল।

قَوْلُهُ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ : اِسْتِقْرَارٌ-এর শাব্দিক অর্থ- স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে, জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ : اَلْاِهْطَاعُ-এর শাব্দিক অর্থ- মাথা তোলা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহবানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোনো কোনো স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

قَوْلُهُ مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ : وَازْدُجِرَ-এর শাব্দিক অর্থ- হুমকি প্রদর্শন করা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ.)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল, যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন! তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

قَوْلُهُ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ : অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

قَوْلُهُ ذَاتُ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ : اَلْوَاحٌ শব্দটি لَوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ- কাঠের তক্তা। دُسُرٌ শব্দটি دِسَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ- পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো নৌকা।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : ذِكْر -এর অর্থ দ্বিবিধ ১. মুখস্থ করা। ২. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যাবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি স্তরে, প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বুকে আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কুরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলি চয়ন করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسَّرْنَا -এর সাথে لِلذِّكْرِ সংযুক্ত করে আরো বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কুরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহিল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরি হয় না যে, কুরআন পাক থেকে বিধানাবলি চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোনো কোনো মুসলমান উপরিউক্ত আয়াতকে সম্বল করে কুরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলি চয়ন করতে চায়। উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুঠে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ : **আদ জাতির ঘটনা** : অর্থাৎ আদ জাতির নিকট হযরত হূদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাঁর হেদায়েত মেনে নেয়নি। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন; কিন্তু তারা তাতেও সতর্ক হলো না। এরপর কেমন হয়েছিল তাদের প্রতি আমার আজাব?

আদ জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির প্রতি আপতিত আজাবের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ : বর্ণিত আছে যে, দুর্ধর্ষ আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যে, ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করা হয়, তা অব্যাহত থাকে সাত রাত আট দিন পর্যন্ত; ক্ষণিকের জন্যেও এতে কোনো বিরাম দেওয়া হয়নি। অবাধ্য আদ জাতির জীবনে এ দিনগুলো ছিল অত্যন্ত অশুভ। কেননা এ অবাধ্য জাতির সমুচিত শাস্তিস্বরূপ এ ভয়াবহ ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

مُسْتَمِرٌّ শব্দটির অর্থ হলো, ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু ততদিন অব্যাহত ছিল, যতদিন আদ জাতির একটি মানুষও জীবিত ছিল।

অথবা এর অর্থ হলো, সে আজাবের দিনগুলো এত অশুভ ছিল যে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা কাউকে রেহাই দেয়নি; এ বায়ু সকলকে ধ্বংস করেছে।

অথবা এর অর্থ হলো, চরম দুঃখজনক এবং চরম কষ্টদায়ক শাস্তি। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যেদিন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হয়, সেদিন ছিল বুধবার এবং মাসের শেষ তারিখ।

قَوْلُهُ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ : অর্থাৎ যেভাবে প্রবল বায়ু খেজুর বৃক্ষকে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে, সেভাবে গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু অবাধ্য আদ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের গৃহ থেকে বের করে আছড়ে ফেলে, তাদের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, সে সংকটময় মুহূর্তে কোনো কোনো লোক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু তাদেরকে সেখান থেকে বের করে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আপতিত গজবী বায়ু আদ জাতির লোকদেরকে তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারা ছিল শক্তিশালী দেহের অধিকারী। কিন্তু ধ্বংসের পর মনে হলো উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে ধরাশায়ী হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ : তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আজাবের ভয়াবহতা প্রকাশ করার লক্ষ্যেই এ কথাটি বার বার বলা হয়েছে, যেভাবে তারা দুনিয়াতে তাদের অন্যায় অনাচার ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করেছে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতেও তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

অনুবাদ :

٢٣. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ جَمْعُ نَذِيْرٍ بِمَعْنَى مُنْذِرٍ اَىْ بِالْاُمُوْرِ الَّتِىْ اَنْذَرَهُمْ بِهَا نَبِيُّهُمْ صَالِحٌ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ وَيَتَّبِعُوْهُ .

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করেছিল نُذُرٌ শব্দটি نَذِيْرٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর যার মাধ্যমে তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন, যদিও তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তার অনুসরণ করেনি।

٢٤. فَقَالُوْا اَبَشَرًا مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِشْتِغَالِ مِنَّا وَاحِدًا صِفَتَانِ لِبَشَرًا نَتَّبِعُهٗ مُفَسِّرٌ لِلْفِعْلِ النَّاصِبِ لَهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْىِ الْمَعْنٰى كَيْفَ نَتَّبِعُهٗ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَّا وَلَيْسَ بِمَلَكٍ اَىْ لَا نَتَّبِعُهٗ اِنَّاۤ اِذًا اَىْ اِنِ اتَّبَعْنَاهُ لَفِىْ ضَلٰلٍ ذِهَابٍ عَنِ الصَّوَابِ وَّسُعُرٍ جُنُوْنٍ .

২৪. তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরন করব بَشَرًا শব্দটি مَا اُضْمِرَ -এর কায়দার ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর مِنَّا এবং وَاحِدًا উভয়টি بَشَرًا -এর সিফত হয়েছে। আর نَتَّبِعُهٗ এটা بَشَرًا -এর فِعْل نَاصِبٌ -এর مُفَسِّرٌ আর اِسْتِفْهَامْ টা نَفِىْ -এর অর্থে। অর্থ হলো আমরা তাঁর অনুসরণ কেন করব? আমরা তো এক বিশাল জামাত। আর সে তো আমাদেরই একজন এবং ফেরেশতাও নয়। অর্থাৎ আমরা তাঁর অনুসরণ করব না। যদি আমরা তাঁর অনুসরণ করি তবে তো আমরা ভ্রষ্টতায় ও উম্মত্ততায় পতিত হবো। অর্থাৎ সঠিক রাস্তা হতে ছিটকে পড়ব।

٢٥. ءَاُلْقِىَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكِهٖ الذِّكْرُ الْوَحْىُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا اَىْ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ فِىْ قَوْلِهٖ اِنَّهٗ اُوْحِىَ اِلَيْهِ مَا ذَكَرَهٗ اَشِرٌ مُتَكَبِّرٌ بَطِرٌ .

২৫. আমাদের মধ্যে কি তাঁরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? অর্থাৎ তার দিকে ওহী প্রেরণ করা হয়নি। اَلْقِىَ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয় সুরতে উভয়ের মধ্যে اَلِفْ বৃদ্ধি করে এবং اَلِفْ বৃদ্ধি না করে পড়া বৈধ রয়েছে। সে তো একজন মিথ্যাবাদী তাঁর এ উক্তির/ দাবির ক্ষেত্রে যে, যা কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন তা তাঁর উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। দাম্ভিক। অর্থাৎ অহঙ্কারী।

٢٦. قَالَ تَعَالٰى سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا اَىْ فِى الْاٰخِرَةِ مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ . وَهُوَ هُمْ بِاَنْ يُّعَذَّبُوْا عَلٰى تَكْذِيْبِهِمْ لِنَبِيِّهِمْ صَالِحٍ .

২৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন– আগামীকল্য তারা জানবে অর্থাৎ পরকালে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক অথচ মিথ্যাবাদী তারা নিজেরাই কেননা তাদেরকে তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

٢٧. اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ مُخْرِجُوْهَا مِنَ الْهَضْبَةِ الصَّخْرَةِ كَمَا سَاَلُوْا فِتْنَةً مِحْنَةً لَّهُمْ لِنَخْتَبِرَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ يَا صَالِحُ اَىْ اِنْتَظِرْ مَا هُمْ صَانِعُوْنَ وَمَا يُصْنَعُ بِهِمْ وَاصْطَبِرْ ز اَلطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ اَىْ اِصْبِرْ عَلٰى اَذَاهُمْ .

২৭. আমি পাঠিয়েছি একটি উষ্ট্রী তাদের চাহিদা অনুপাতে পাথর হতে। তাদের পরীক্ষার জন্য যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর হে সালিহ! অর্থাৎ তারা কি করে? এবং তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়? এবং ধৈর্যশীল হও اِصْطَبِرْ শব্দটির طَاءْ বর্ণটি বাবে اِفْتِعَالْ -এর تَاءْ হতে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। অর্থাৎ তুমি তাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্য্যধারণ কর।

٢٨. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ مَقْسُوْمٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ فَيَوْمٌ لَهُمْ وَيَوْمٌ لَهَا كُلُّ شِرْبٍ نَصِيْبٍ مِنَ الْمَاءِ مُحْتَضَرٌ - يَحْضُرُهُ الْقَوْمُ يَوْمَهُمْ وَالنَّاقَةَ يَوْمَهَا فَتَمَادَوْا عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ مَلُّوْهُ فَهَمُّوْا بِقَتْلِ النَّاقَةِ -

২৮. তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত তাদের মাঝে ও উষ্ট্রীর মাঝে। একদিন তাদের জন্য আর একদিন উষ্ট্রীর জন্য। এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিন উপস্থিত হবে এবং উষ্ট্রী তার জন্য নির্ধারিত দিন উপস্থিত হবে। সে সকল লোক এ অবস্থার উপর দীর্ঘকাল অটল থাকল। অতঃপর বিরক্ত হয়ে গেল। তখন তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করার সঙ্কল্প করল।

٢٩. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ قُدَارًا لِيَقْتُلَهَا فَتَعَاطٰى تَنَاوَلَ السَّيْفَ فَعَقَرَ - بِهِ النَّاقَةَ اَىْ قَتَلَهَا مُوَافِقَةً لَهُمْ -

২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গী কুদার কে আহ্বান করল উষ্ট্রীকে হত্যার জন্য। সে তাকে ধরে অর্থাৎ তরবারি হাতে নিয়ে [উষ্ট্রীর কুঁজে আঘাত করল] অর্থাৎ তাদের পরামর্শ মতে হত্যা করল।

٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ - اَىْ اِنْذَارِىْ لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ اَىْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ -

৩০. কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী অর্থাৎ আমার তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার পূর্বে শাস্তি থেকে ভয় দেখানো। অর্থাৎ তা সঠিক স্থানেই পতিত হয়েছে। আর সেই শাস্তিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

٣١. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ هُوَ الَّذِىْ يَجْعَلُ لِغَنَمِهِ حَظِيْرَةً مِنْ يَابِسِ الشَّجَرِ وَالشَّوْكِ يَحْفَظُهُنَّ فِيْهَا مِنَ الذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ وَمَا سَقَطَ مِنْ ذٰلِكَ فَدَاسَتْهُ هُوَ الْهَشِيْمُ -

৩১. আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়ার প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। مُحْتَظِرْ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে স্বীয় বকরির সংরক্ষণের জন্য শুকনো ঘাস, কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা খোঁয়াড় বানায়, তাতে সে বকরিগুলোকে বাঘ-ভল্লুক থেকে রক্ষা করে। আর ঐ ঘাস থেকে যখন কিছু পড়ে যায় তখন বকরিগুলো তাকে দলিত মথিত করে ফেলে, এটাকেই هَشِيْم বলা হয়।

٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -

৩২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٣٣. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ اَىْ بِالْاُمُوْرِ الْمُنْذِرَةِ لَهُمْ عَلٰى لِسَانِهِ -

৩৩. লূত সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল সতর্ককারীদেরকে, অর্থাৎ সেই বিষয়গুলোকে যার মাধ্যমে হযরত লূত (আ.)-এর ভাষায় তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

٣٤. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا رِيْحًا تَرْمِيْهِمْ بِالْحَصْبَاءِ وَهِيَ صِغَارُ الْحِجَارَةِ الْوَاحِدَةِ دُوْنَ مَلْءِ الْكَفِّ فَهَلَكُوْا إِلَّا اٰلَ لُوْطٍ ط وَهُمُ ابْنَتَاهُ مَعَهُ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ . مِنَ الْاَسْحَارِ أَيْ وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَوْ أُرِيْدَ مِنْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لِمَنْعِ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ مَعْدُوْلٌ عَنِ السَّحَرِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِاَلْ وَهَلْ أُرْسِلَ الْحَاصِبُ عَلٰى اٰلِ لُوْطٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَعَبَّرَ عَنِ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَعَلَى الثَّانِيْ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجِنْسِ تَسَمُّحًا .

৩৪. আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা অর্থাৎ এমন বায়ু যা তাদের উপর কংকর বর্ষণ করত। আর তা ছিল ছোট ছোট কংকর। এক মুষ্ঠি সমানও না। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয় আর হযরত লূত (আ.)-এর পরিবারের সাথে তাঁর দু'কন্যাও ছিল। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রের শেষাংশে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট দিনের প্রাতঃকালে। যদি নির্দিষ্ট দিনের সকাল উদ্দেশ্য হয় তবে غَيْرُ مُنْصَرِفْ হবে। কেননা এটা اَلسَّحَرْ এবং مَعْرِفَهْ থেকে পরিবর্তিত। কেননা তার হক হলো مَعْرِفَهْ-এর মধ্যে اَلِفْ এবং لَامْ-এর সাথে ব্যবহার হবে। তবে লুত পরিবারের উপর পাথর বর্ষণকারী বায়ু প্রেরিত হয়েছে কিনা? এ বিষয়ে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম সুরতে অর্থাৎ তা প্রেরণের সুরতে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে, আর দ্বিতীয় সুরতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে। যদি مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর جِنْس থেকে হয় تَسَمُّحْ হিসেবে।

٣٥. نِعْمَةً مَصْدَرٌ أَيْ إِنْعَامًا مِنْ عِنْدِنَا ط كَذٰلِكَ أَيْ مِثْلُ ذٰلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ . أَنْعَمْنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَرُسُلِهِ وَأَطَاعَهُمْ .

৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ نِعْمَةً শব্দটি মাসদার اِنْعَامًا অর্থে। আমি এভাবেই অর্থাৎ এই জিনিসের মতো আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি, যারা কৃতজ্ঞ। এ অবস্থায় যে, সে মুমিন হবে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে।

٣٦. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ خَوَّفَهُمْ لُوْطٌ بَطْشَتَنَا أَخْذَتَنَا إِيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ فَتَمَارَوْا تَجَادَلُوْا وَكَذَّبُوْا بِالنُّذُرِ بِإِنْذَارِهِ .

৩৬. তাদেরকে সতর্ক করেছিল হযরত লূত (আ.) তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে শাস্তি দ্বারা তাদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। ঝগড়া করল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

٣٧. وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ أَيْ سَأَلُوْهُ أَنْ يُّخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ أَتَوْهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَضْيَافِ لِيَخْبُثُوْا بِهِمْ وَكَانُوْا مَلَائِكَةً .

৩৭. তারা হযরত লূত (আ.)-এর নিকট হতে তাঁর মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল অর্থাৎ তাঁর থেকে এটা প্রার্থনা করল যে, তাদের মাঝে ও আগত মেহমানগণের মাঝে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না রাখে, যাতে তারা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। আর তারা ছিলেন ফেরেশতা।

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ أَعْمَيْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا بِلَا شَقٍّ كَبَاقِي الْوَجْهِ بِأَنْ صَفَقَهَا جِبْرَئِيلُ بِجَنَاحِهِ فذوقوا فقلنا لهم ذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ . أَيْ إِنْذَارِيْ وَتَخْوِيْفِيْ أَيْ ثَمْرَتَهُ وَفَائِدَتَهُ .

তখন আমি তাদের দৃষ্টি লোপ করে দিলাম অর্থাৎ তাদেরকে অন্ধ করে দিলাম এবং চোখকে চোখের গর্ত ছাড়া চেহারার অনুরূপ করে দিলাম এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বীয় পাখা দ্বারা তাদের চোখে আঘাত করেন। এবং আমি বললাম আস্বাদন কর আমি তাদেরকে বললাম তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম। অর্থাৎ আমার শাস্তি ও ভয় দেখানোর পরিণাম ফল।

৩৮. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ . دَائِمٌ مُتَّصِلٌ بِعَذَابِ الْأَخِرَةِ .

৩৮. প্রত্যূষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল। প্রাতঃকালে অনির্দিষ্ট দিনের। পরকালের শাস্তির সাথে মিলিতকারী শাস্তি।

৩৯. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .

৩৯. এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

৪০. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

৪০. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالْأُمُوْرِ الَّتِيْ اَنْذَرَهُمْ بِهَا : এখানে مُنْذِرٌ-এর তাফসীর اَلْاُمُوْرُ الْمُنْذِرُ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُنْذِرٌ দ্বারা নবীগণ উদ্দেশ্য নন; বরং উদ্দেশ্য হলো সে সকল কাজ, যার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে: দ্বিতীয় এমন একটি সুরতও হতে পারে যে, نُذُرٌ এটা نَذِيْرٌ অর্থ رُسُلٌ-এর বহুবচন। আর نُذُرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল। আর نَذِيْرٌ-এর পরিবর্তে نذر বহুবচনের সীগাহ আনার মাঝে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক রাসূলকে অস্বীকার করার অর্থ হলো সকল রাসূলকে অস্বীকার করা।

قَوْلُهُ مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِشْتِغَالِ : অর্থাৎ بَشَرًا শব্দটি مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ-এর নীতিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اَنَتَّبِعُ بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ; এখানে نَتَّبِعُهُ হলো নসবদানকারী উহ্য ফে'লের মুফাসসির।

قَوْلُهُ جُنُوْنٌ : এখানে سُعُرٌ-এর তাফসীর جُنُوْنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سُعُرٌ হলো مُفْرَدٌ তথা একবচন; বহুবচন নয়। এর অর্থ হলো স্বল্প জ্ঞান/ অপরিপক্ক জ্ঞান। বলা হয়– نَاقَةٌ مَسْعُوْرَةٌ তথা পাগলের মতো বিচরণকারী উষ্ট্রী। سُعُرٌ শব্দটি نَارٌ অর্থে ব্যবহৃত سَعِيْرٌ-এর বহুবচনও হতে পারে।

قَوْلُهُ فِتْنَةً : এটা مُرْسِلُوْا-এর مَفْعُوْلٌ لَهُ অর্থাৎ আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি শক্ত পাথর হতে উষ্ট্রী বের করে আনব।

قَوْلُهُ وَبَيْنَ النَّاقَةِ : এটা বৃদ্ধি করণ দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সংশয়ের নিরসন করা যা আল্লাহর বাণী– اَلْمَاءُ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ দ্বারা জানা যায় যে, পানির পালা বণ্টন হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, অথচ পানির বণ্টন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন উষ্ট্রীও সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। এ সংশয় নিরসনের জন্যই وَبَيْنَ النَّاقَةِ বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لَهُمْ : ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা শু'আরা-এর আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সূরা শু'আরাতে বিষয়টি فَعَقَرُوْهَا বহুবচনের সীগাহ দ্বারা এসেছে। আর এখানে فَعَقَرَ তথা একবচনের সীগার সাথে এসেছে। এখানে تَطْبِيْقٌ এভাবে হয়েছে সরাসরি হত্যাকারী তো কুদার একাই ছিল। তবে হত্যার পরামর্শে সকলেই শরিক ছিল। এ কারণেই এখানে সরাসরি হত্যাকারীর দিকেই হত্যার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আর সূরা শু'আরাতে পরামর্শে অংশগ্রহণকারী সকলকে শরিক করে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هَشِيْم : এটা صِفَتْ مُشَبَّهْ -এর সীগাহ এবং ইসমে মাফঊল مَشْهُوْم অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ– টুকরো কুটরো কৃত, দলিত মথিত।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَسْحَار : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سِحْر টা نَكِرَهْ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اُرِيْدَ مِنْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لِمَنْعِ مِنَ الصَّرْف : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো بِسَحَرْ শব্দটি سِحْر কেননা এটা نَكِرَهْ মানার সুরতে مَنْعُ صَرْف -এর সববসমূহ হতে একটি سَبَبْ তথা عَدْل পাওয়া যায়। কেননা مُنْصَرِفْ টা اَلسَّحَرْ হতে مَعْدُوْل হয়ে এসেছে। আর যদি তা দ্বারা নির্দিষ্ট দিনের প্রাতঃকাল উদ্দেশ্য করা হয় তাতে عَلَمِيَّتْ -ও পাওয়া যাবে। এই সুরতে তাতে দুই সবব তথা عَدْل এবং عَلَمِيَّتْ পাওয়া যাওয়ার কারণে তা غَيْرُ مُنْصَرِف হবে।

قَوْلُهُ تَسَمُّحًا : এক নোসখায় تَسَامُحًا রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো– اِلَّا اٰلَ لُوْط -কে- مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ স্বীকৃতি দেওয়া ছাড় দেওয়ারই নামান্তর। অন্যথায় এর কোনোই সুরত নেই। কেননা اٰلُ لُوْط ও قَوْم বা সম্প্রদায়েরই একটি অংশ। যার কারণে এটা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটাকে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ نِعْمَةً مَصْدَر : অর্থাৎ نِعْمَةً টা نَجَّيْنَا -এর مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হয়েছে, যা بِغَيْرِ لَفْظِهٖ তাকিদের জন্য হয়েছে কেননা نَجَّيْنَا টা اَنْعَمْنَا -এর অর্থে হয়েছে এবং نَجَّيْنَا -এর مَفْعُوْلْ لَهُ -ও হতে পারে এবং উহ্য ফে'লের مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ بِلَفْظِهٖ -ও হতে পারে। অর্থাৎ– اَنْعَمْنَا نِعْمَةً

قَوْلُهُ تَجَادَلُوْا وَكَذَّبُوْا : এটা فَتَمَارَوْا -এর তাফসীর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ে অপনোদন করা। সংশয় হলো تَمَارَوْا -এর صِلَهْ তো بَاءْ আসে না। অথচ এখানে সেলাহ بَاءْ এসেছে।

উত্তর : জবাবের সার হলো যে, تَمَارَوْا টা تَجَادَلُوْا এবং كَذَّبُوْا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার কারণে بَاءْ -এর দ্বারা এর সেলাহ নেওয়া বৈধ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ .... اِنَّا اِذًا لَفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ : **সামূদ জাতির ঘটনা** : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির শিক্ষণীয় ঘটনার বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সামূদ জাতির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অবাধ্য সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর রিসালতকে অস্বীকার করে। তাঁর বিরোধিতা করার কোনো যুক্তি তাদের নিকট ছিল না। তাই তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তাঁর নির্দেশেই উঠাবসা করবো? এমন তো হতে পারে না। এমন কাজ করলে আমরা পথভ্রষ্ট এবং পাগল বলে বিবেচিত হবো।

سُعُرْ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয়বার فِيْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ বাক্যাংশে। এখানে سُعُرْ -এর অর্থ– জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত ছিল সামূদ জাতির অবাধ্যতার বিবরণ। এ আয়াতেও তাদের নাফরমানি এবং ধৃষ্টতার উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে– اَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-কে কটাক্ষ করে বলে, আমাদের মধ্যে কি নবুয়তের যোগ্য একমাত্র তিনিই ছিলেন, যত প্রত্যাদেশ, উপদেশ তাঁর নিকটই অবতীর্ণ হচ্ছে ; অথচ আমাদের মধ্যেও ওহী লাভের যোগ্য অনেক লোকই রয়েছে, তবে কি আমরা কোনো কাজেরই নই? মূলত তাঁর নবুয়তের দাবি সত্য নয়।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّابٌ اَشِرٌ : সে বড়াই করে বেড়ায়। নবুয়তের দাবি করে সে আমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতে চায়। এভাবে সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি নৈতিক দুর্বলতার অপবাদ দেয়।

قَوْلُهُ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ : এ আগামীকাল কথাটির অর্থ হলো, যেদিন তাদের উপর আজাব নাজিল হবে, সেদিন তারা জানতে পারবে– কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক? আর তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, এর অর্থ কিয়ামতের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনই তারা জানতে পারবে যে, কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক?

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো মৃত্যুর পরই জানতে পারবে– কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক?

قَوْلُهُ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ : সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর নিকট তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ মুজেযা প্রদর্শনের দাবি উত্থাপন করল এবং তারাই প্রস্তাব করল, এ পাথরের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গাভীন লাল বর্ণের উষ্ট্রী বের করে আনুন, তাহলে আমরা আপনার নবুয়তের সত্যতা বিশ্বাস করবো। তখন আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আ.)-কে বললেন- إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি উষ্ট্রী প্রেরণ করছি, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতএব, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং দেখ তারা [ঐ উষ্ট্রীর সাথে] কী করে? তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে থাক, আর তারা তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, এর উপর সবর অবলম্বন কর। আল্লাহ পাকের আদেশ না আসা পর্যন্ত তাদের প্রতি আজাব তরান্বিত করার কথা বলো না।

-[তাফসীরে আল বাহরুল মুহীত খ. ৮, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ : অর্থাৎ পানি বণ্টন করা হয়েছে, একদিন সামূদ জাতির জন্যে, আরেক দিন হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীর জন্যে। মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী পানি পান করে চলে গেলে সামুদ জাতির লোকেরা আসবে এবং তাদের উষ্ট্রী পানি পান করবে। কিন্তু এ হতভাগা সামূদ জাতি ঐ উষ্ট্রীর জন্যে একদিন নির্দিষ্ট হবে- তা সইতে পারেনি। তারা হিংসা-ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং তাদের এক সাথী উষ্ট্রীটির শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলে। তাই এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অর্থাৎ এরপর তারা তাদের এক সাথীকে আহবান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ ব্যক্তির নাম ছিল কাদার ইবনে সালেফ। -[ইবনে কাসীর [উর্দূ] পারা- ২৭ পৃ. ৪৬]

উল্লেখ যে, এ ঘটনার পর সামুদ জাতি আল্লাহ পাকের আজাবে পতিত হলো।

قَوْلُهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرٌ : বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) তখন এত জোরে গর্জন করেন যে, সামূদ জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির কলিজা ফেটে যায়, তারা দলিত মথিত কাঁটাবনের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন এ ঘটনার উল্লেখ করেছে এভাবে- إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ "নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করি একটি গুরুগর্জন, পরিণামে তারা দলিত মথিত কাঁটাবনের ন্যায় রয়ে যায়।"

অর্থাৎ ক্ষণিকের মধ্যেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি হুংকারই যথেষ্ট ছিল। كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ -এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مُحْتَظِر সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তার বকরির হেফাজতের জন্যে বৃক্ষ, ডালা এবং কাঁটা একত্র করে, যাতে করে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে তার বকরির হেফাজত করতে পারে। সে বৃক্ষ-শাখা এবং কাঁটা দ্বারা যে দেয়াল তৈরি করে, তার কোনো অংশ যদি ভেঙ্গে পড়ে আর বকরিরা সেগুলো দলিত মথিত করে তবে সেগুলোকে هَشِيْم বলে।

যাহোক, সামূদ জাতি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করেছিল, আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তাই তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। তাদের ঘটনা পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা : ইতিপূর্বে আদ এবং সামূদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়েছে। তারাও তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত নবীকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তিনি তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত হওয়ার জন্যে আহবান করেছেন এবং আখিরাতের আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তারা হযরত লূত (আ.)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর একজন নবীকে অস্বীকার করা দুনিয়ার সকল নবী রাসূলগণকে অস্বীকার করার নামান্তর, তাই তাদেরকেও আল্লাহ পাকের আজাব পাকড়াও করেছে।

قَوْلُهُ إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে লূত-সম্প্রদায়ের নাফরমানির কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর প্রস্তরবাহী প্রচণ্ড ঝড়, তবে লূত পরিবারের উপর নয়, তাদেরকে আমি শেষ রাতে রক্ষা করেছিলাম।

হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় অত্যন্ত মন্দ ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের হেদায়েতের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকে, তাঁর রিসালতকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের অবাধ্যতা ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তাদের প্রতি আজাবের সিদ্ধান্ত হয়, হযরত লূত (আ.)-এর নিকট আল্লাহর

পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের আগমন হয়, তাঁরা সকলেই অল্পবয়সী বালকদের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের সঙ্গেই ছিলেন। লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তিনি গৃহের দ্বার বন্ধ করে দেন; কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়। হযরত লূত (আ.) অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আত্মপ্রকাশ করলেন এবং হযরত লূত (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, তারা আমাদের নিকট আসতে পারবে না। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর একটি ডানা দিয়ে তাদের প্রতি আঘাত করলেন। পরিণামে তৎক্ষণাত লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধ হয়ে গেল। তারা ঘরের ভেতর ঘোরাফেরা করতে শুরু করলো। বের হওয়ার পথ পেল না। অবশেষে হযরত লূত (আ.) অন্ধ অবস্থায় এ ঘৃণ্য চরিত্র বিশিষ্ট লোকদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এরপর শুরু হলো সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতি আসমানি গজব। প্রথমে প্রস্তরবাহী ঝড় প্রবাহিত হতে লাগল এবং ঐ ঝড়ের সময় দুরাত্মা কাফেরদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হলো। প্রত্যেকটি প্রস্তরের মধ্যে সে ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যার প্রতি ঐ প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল। অবশ্য এ আজাব শুরু করার পূর্বে আল্লাহ পাক দয়া করে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে [তাঁর স্ত্রী ব্যতীত] আজাবের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে বের করে নিলেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ : আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। নবী রাসূলগণ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং মন্দ পথ বর্জন করার তাগিদ করেছেন, অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, সতর্ক হওয়া এবং মন্দ কাজ পরিহার করা। কিন্তু লূত সম্প্রদায় সতর্ক হওয়ার স্থলে আরো বেশি অবাধ্য হলো এবং হযরত লুত (আ.)-এর নিকট যে ফেরেশতাগণ মানবাকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন তাঁদেরকে তারা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চাইল। পরিণামে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধ করে দেন।

قَوْلُهُ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ : **مُرَاوَدَةٌ** শব্দের অর্থ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। হযরত লূত (আ.) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। হযরত লুত (আ.) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা কামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল-বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গাম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি এবং ইহকালেও নানা আজাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহর আজাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে লূত ও কওমে ফিরাউন– এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহর আজাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষ কুরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে– **فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرُ** অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহর আজাব নেমে এলো, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে– **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ** অর্থাৎ আল্লাহর এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেরদের ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহস 'আদ, সামূদ ও ফিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশি নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে!

অনুবাদ :

٤١. وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ النُّذُرُ ج الْاِنْذَارُ عَلٰى لِسَانِ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا .

৪১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল ফেরাউনসহ তার জাতির নিকট সতর্ককারী হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর জবানিতে, তবে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

٤٢. بَلْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا اَىْ التِّسْعِ الَّتِىْ اُوْتِيْهَا مُوْسٰى فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ اَخْذَ عَزِيْزٍ قَوِيٍّ مُّقْتَدِرٍ قَادِرٍ لَا يُعْجِزُهُ شَىْءٌ .

৪২. বরং তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল অর্থাৎ নয়টি নিদর্শন, যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম সুকঠিন শাস্তি দ্বারা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে প্রবল ক্ষমতাধর কোনো কিছুই তাকে ব্যর্থ ও অক্ষম করতে পারে না।

٤٣. اَكُفَّارُكُمْ يَا قُرَيْشُ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰئِكُمْ الْمَذْكُوْرِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ فَلَمْ يُعَذَّبُوْا اَمْ لَكُمْ يَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فِى الزُّبُرِ ج اَلْكُتُبِ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ بِمَعْنَى النَّفْىِ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ .

৪৩. হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উল্লিখিত নূহ সম্প্রদায় হতে ফেরাউন পর্যন্ত যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না নাকি তোমাদের রয়েছে হে কুরাইশ সম্প্রদায় অব্যাহতির কোনো সনদ শাস্তি হতে পূর্ববর্তী কিতাবে? এখানে উভয় স্থানেই اِسْتِفْهَامْ টা نَفِىْ -এর অর্থে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এরূপ নয়।

٤٤. اَمْ يَقُوْلُوْنَ اَىْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ نَحْنُ جَمِيْعٌ اَىْ جَمْعٌ مُّنْتَصِرٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ .

৪৪. এরা কি বলে, কুরাইশ কাফেররা আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর।

٤٥. وَلَمَّا قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ اِنَّا جَمْعٌ مُّنْتَصِرٌ نَزَلَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ . فَهُزِمُوْا بِبَدْرٍ وَنُصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ .

৪৫. বদরের দিন যখন আবূ জাহল বলল, আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বিজয় অর্জনকারী দল, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। সুতরাং বদরের ময়দানে তারা পরাজিত হলো এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন।

٤٦. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالسَّاعَةُ اَىْ عَذَابُهَا اَدْهٰى اَعْظَمُ بَلِيَّةً وَاَمَرُّ . اَشَدُّ مَرَارَةً مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا .

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। এবং কিয়ামত অর্থাৎ তার শাস্তি কঠিনতর ভয়ানক মসিবতের এবং তিক্ততর হবে মারাত্মক তিক্ত পৃথিবীর শাস্তির তুলনায়।

٤٧. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ هَلَاكٍ بِالْقَتْلِ فِى الدُّنْيَا وَسُعُرٍ نَارٍ مُسَعَّرَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ اَىْ مُهَيَّجَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ .

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত পৃথিবীতে হত্যার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ও বিকারগ্রস্ত। প্রজ্বলিত অগ্নিতে। مُسَعَّرَةٌ শব্দটির عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ অর্থাৎ পরকালে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিপতিত হবে।

٤٨. يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ـ اِصَابَةَ جَهَنَّمَ لَكُمْ ـ

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ পরকালে, তখন তাদেরকে বলা হবে– জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। তোমাদের জাহান্নামে প্রবেশের কারণে।

٤٩. اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ـ بِتَقْدِيْرٍ حَالٌ مِنْ كُلَّ اَىْ مُقَدَّرًا وَ قُرِئَ كُلُّ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَلَقْنٰهُ ـ

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে كُلَّ شَيْئٍ-এর নসব দানকারী ফে'ল হলো উহ্য ঐ ফে'ল, যার তাফসীর করতেছে خَلَقْنٰهُ ; আর بِقَدَرٍ এটা كُلَّ شَيْئٍ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرًا আবার كُلّ-কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوْع-ও পড়া হয়েছে। এর খবর হলো خَلَقْنٰهُ

٥٠. وَمَآ اَمْرُنَا لِشَىْءٍ نُرِيْدُ وُجُوْدَهُ اِلَّا اَمْرَةٌ وَّاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ۢبِالْبَصَرِ ـ فِى السُّرْعَةِ وَهِىَ كُنْ فَيُوْجَدُ اِنَّمَآ اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

৫০ আমার আদেশ তো আমি যে বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করি একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মতো। দ্রুততার ক্ষেত্রে। আর সেই হুকুম হলো كُنْ [হও] শব্দটি। তখন সে বস্তুটি অস্তিত্বে এসে যায়। আর সেই হুকুম তখনই হবে যখন তিনি কোনো বস্তুর জন্য كُنْ বলার ইচ্ছা করেন, ফলে তখন তা হয়ে যায়।

٥١. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ اَشْبَاهَكُمْ فِى الْكُفْرِ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اُذْكُرُوْا وَ اتَّعِظُوْا ـ

৫১. আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মতো দলগুলোকে অর্থাৎ কুফরির ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে। অতএব তা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? এখানে اِسْتِفْهَامٌ-টি اَمْر অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণ করো।

٥٢. وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ اَىِ الْعِبَادُ مَكْتُوْبٌ فِى الزُّبُرِ ـ كُتُبِ الْحَفَظَةِ ـ

৫২. তাদের সকল কার্যকলাপ আছে অর্থাৎ বান্দারা যে কাজ করে তা লিখিত আছে আমলনামায় সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের কিতাবে।

٥٣. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مِنَ الذَّنْبِ اَوِ الْعَمَلِ مُسْتَطَرٌ مُكْتَتَبٌ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ ـ

৫৩. আছে ছোট বড় সবকিছুই গুনাহ অথবা কাজ লিপিবদ্ধ। লওহে মাহফূযে।

٥٤. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَنَهَرٍ ۙ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ وَقُرِئَ بِضَمِّ النُّوْنِ وَالْهَاءِ جَمْعًا كَاَسَدٍ وَاُسُدٍ اَلْمَعْنٰى اَنَّهُمْ يَشْرَبُوْنَ مِنْ اَنْهَارِهَا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالْخَمْرَ ـ

৫৪. মুত্তাকীগণ থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে নহর দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য। نَهَرٌ শব্দটিকে বহুবচনের ভিত্তিতে نُوْن এবং هَاء বর্ণে পেশ দিয়েও পঠিত রয়েছে। যেমনটা اَسَدٌ এবং اُسُدٌ-এর মধ্যে হয়েছে। অর্থ হলো তারা পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নহর থেকে পান করবেন।

٥٥. فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ مَجْلِسِ حَقٍّ لَا لَغْوَ فِيْهِ وَلَا تَأْثِيْمَ وَأُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ وَقُرِئَ مَقَاعِدِ الْمَعْنٰى اَنَّهُمْ فِىْ مَجَالِسَ مِنَ الْجَنَّاتِ سَالِمَةٍ مِنَ اللَّغْوِ وَالتَّاْثِيْمِ بِخِلَافِ مَجَالِسِ الدُّنْيَا فَقَلَّ اَنْ تَسْلَمَ مِنْ ذٰلِكَ وَاُعْرِبَ هٰذَا خَبَرًا ثَانِيًا وَبَدَلًا وَهُوَ صَادِقٌ بِبَدَلِ الْبَعْضِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مِثَالُ مُبَالَغَةٍ اَىْ عَزِيْزِ الْمُلْكِ وَاسِعِهِ مُقْتَدِرٍ ـ قَادِرٍ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ اِشَارَةٌ اِلَى الرُّتْبَةِ وَالْقُدْرَةِ مِنْ فَضْلِهِ تَعَالٰى ـ

৫৫. উত্তম স্থানে/যোগ্য আসনে অর্থাৎ সত্য মজলিসে, সেথায় থাকবে না কোনো অহেতুক কথাবার্তা এবং গুনাহের কার্যক্রম। আর مَقْعَدٌ দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং তা مَقَاعِدَ [বহুবচনের সাথেও] পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে এমন মজলিসে হবে যা অহেতুক কথাবার্তা ও গুনাহের কার্যক্রম হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। পৃথিবীর মজলিস বা আসরের বিপরীত যা অহেতুক কথাবার্তা ও গুনাহের কার্যক্রম হতে খুব কমই মুক্ত থাকে। مَقْعَدُ صِدْقٍ -কে اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর হওয়ার ভিত্তিতে ই'রাব দেওয়া হয়েছে এবং جَنّٰتٌ হতে بَدَل -এর ভিত্তিতেও। আর সেটা بَدَلُ الْبَعْضِ ইত্যাদির উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে অর্থাৎ মুবালাগার ভিত্তিতে উদাহরণ টানা হয়েছে বাস্তবিক নিকটে হওয়া উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ তিনি প্রবল ক্ষমতাধর, কোনো বস্তুই তাঁকে অক্ষম ও অপারগ করতে পারে না। আর তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। এখানে عِنْدَ দ্বারা মর্যাদাগত নৈকট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর قُدْرَتْ [قُرْبَةْ] আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاِنْذَارْ : মুসান্নিফ (র.) نُذُرْ -এর তাফসীর اَلْاِنْذَارْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, نُذُرْ শব্দটি মাসদার, অর্থ– ভয় দেখানো, ভীতি প্রদর্শনকারী চিহ্নসমূহ। এখানে نُذُرْ টা نَذِيْر অর্থেও হতে পারে। অর্থ– ভীতি প্রদর্শনকারী। اَلْاٰيَاتُ التِّسْعُ হলো– ১. লাঠি ২. শুভ্র হাত ৩. দুর্ভিক্ষ ৪. اَلطَّمْسُ বা আকৃতি বিকৃতকরণ ৫. তুফান ৬. পঙ্গপাল ৭. উকুন ৮. ব্যাঙ ও ৯. রক্ত।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مِنْ اُولٰئِكُمْ : অর্থাৎ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্বেকার কাফের সম্প্রদায়ের চেয়েও তোমরা শক্তি ও কঠোরতায় প্রবল কিনা?

قَوْلُهُ اَدْهٰى : এটা دَاهِيَةٌ হতে اِسْمُ تَفْضِيْل -এর সীগাহ, অর্থ হলো কঠিন মসিবত যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ سُعُرٍ : অর্থাৎ– نَارٌ مُسَعَّرَةٌ তথা প্রজ্বলিত অগ্নি।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ : এটা উহ্য ফে'লের ظَرْف হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَيُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الخ আবার এটা سُعُرْ -এরও ظَرْف হতে পারে।

قَوْلُهُ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ : এখানে كُلَّ শব্দটি নসব সহকারে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ -এর নীতি অনুসারে জমহুরের কেরাত। আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা كُلٌّ পেশ দিয়ে পড়া হলে ভ্রান্ত বিশ্বাসের দিকে ধারণার জন্ম দিবে। আর তা হলো এই যে, كُلٌّ -কে মুবতাদা বলা হবে এবং خَلَقْنَاهُ টা জুমলা হয়ে شَيْئٍ -এর সিফত হবে এবং بِقَدَرٍ হবে তার খবর। অর্থ হবে– প্রত্যেক ঐ জিনিস যাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন পরিমাপ মতো, এর দ্বারা ধারণা হয় যে, কিছু জিনিস এরূপও রয়েছে যে, যা আল্লাহর সৃষ্টি নয়। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি ও পরিমিত। নসবের সুরতে অর্থ হবে– আমি প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।

সারকথা : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ -এর মধ্যে দুটি اِحْتِمَالْ রয়েছে। যথা- ১. رَفْع ২. نَصَبْ ; এরপর رَفْع -এর সুরতে আবার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বিশুদ্ধ ও অপরটি ফাসেদ। যদি خَلَقْنٰهُ কে كُلّ -এর খবর বানিয়ে দেওয়া হয় তবে এটা বিশুদ্ধ হবে। অর্থ হবে- প্রতিটি জিনিসই আমি পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ। তবে رَفْع -এর সুরতে অন্য আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে যেটা ফাসেদ। আর সেটা হলো خَلَقْنٰهُ টা شَيْءٍ -এর সিফত আর بِقَدَرٍ এটা كُلّ -এর খবর হবে। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে ফাসেদ। এর অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আমি সৃষ্টি করেছি, তা পরিমিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু জিনিস এমনও রয়েছে, যা غَيْرُ اللّٰهِ -এর সৃষ্টিকৃত। আর সেটা পরিমিত নয়। এটা মুতাযেলাদের মাযহাব। তবে كُلّ -কে نَصَبْ পড়ার সুরতে ফাসেদ অর্থের সম্ভাবনাই থাকে না। আর نَصَبْ -এর সুরতটা এরূপ হবে যে, هَلّ টা উহ্য ফে'লের মাফউল হবে যার তাফসীর পরবর্তী ফে'ল (خَلَقْنٰهُ) করতেছে। তাকে بَابُ اِشْتِغَالْ এবং مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর কায়দা বলে। এর بِقَدَرٍ টা بِتَقْدِيْرٍ -এর অর্থে এবং এটা ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ এই সুরতে خَلَقْنٰهُ -কে كُلَّ شَيْءٍ -এর সিফত বানানোর সম্ভাবনা নেই যে, ফাসেদ অর্থের ধারণা হবে। কেননা صِفَتْ টা মওসূফের আমেল হয় না। আর যা عَامِلْ হয় না, তা আমেলের তাফসীরও হয় না।

قَوْلُهُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ : এখানে পূর্বের বিপরীত كُلّ -এর উপর رَفْع সুনির্দিষ্ট। কেননা নসবের সুরতে অর্থ বিনষ্ট হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা যদি كُلّ -এর উপর নসব পড়া হয় তাহলে উহ্য ইবারত হবে- فَعَلُوْا كُلَّ شَيْءٍ فِى الزُّبُرِ অর্থাৎ তারা সব জিনিসকেই লওহে মাহফূযে ঢুকিয়েছে। অথচ লওহে মাহফূযে ঢুকানোর কাজ আল্লাহর সৃষ্টির নয়। এছাড়া আমলকারীদের কর্ম ব্যতীত লওহে মাহফূযে আরো অনেক বস্তু রয়েছে যার সাথে আমলকারীগণের কোনোই সম্পর্ক নেই। আর رَفْع -এর কেরাতের সুরতে অর্থ হবে- তারা যে আমলই করে তা লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত।

قَوْلُهُ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ : এখানে نَهَر যদিও একবচন কিন্তু جَنّٰتٌ যেহেতু বহুবচন এ কারণে جَنّٰتٌ -এর মুনাসাবাতে جِنْسٌ উদ্দেশ্য, যাতে করে তাতে বহুবচনের অর্থের ধর্তব্য হয়ে যায়। فَوَاصِلْ -এর রেয়ায়েতে একবচন নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো কেরাতে نُهُر বহুবচনের সাথেও পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ اَىْ مَقَامٍ حَسَنٍ : এর মধ্যে মওসূফের ইযাফত সিফতের দিকে হয়েছে। فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ -এর মধ্যে দু'টি তারকীব হতে পারে। যথা- ১. এটা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর আর فِىْ جَنّٰتٍ হলো প্রথম খবর। ২. جَنّٰتٌ থেকে بَدْلُ الْبَعْضِ কেননা مَقْعَدُ صِدْقٍ টা جَنّٰتٌ -এরই কিছু অংশ।

قوله وغيره : এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ টা بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ -ও হতে পারে। কেননা جَنّٰتٌ টা مَقْعَدِ صِدْقٍ -এর উপর সম্বলিত হওয়াকে শামিল করে।

قَوْلُهُ عِنْدَ مَلِيْكٍ : যদি مَقْعَدِ صِدْقٍ -কে بَدَل বলা হয় তবে عِنْدَ مَلِيْكٍ টা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর হবে, আর যদি مَقْعَدِ صِدْقٍ -কে اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর বলা হয়। তবে عِنْدَ مَلِيْكٍ টা اِنَّ -এর তৃতীয় খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ : **ফেরাউন ও তার দলবলের ঘটনা :** আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার দলবলের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের তথা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল, তাঁর আনিত আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল। আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যে নয়টি বিধান জারি করা হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে সেসব বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, তা হলো- ১. কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করো না। ২. চুরি করো না। ৩. ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ো না। ৪. যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাকে হত্যা করো না। ৫. কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না। ৬. জাদু করো না। ৭. সুদ গ্রহণ করো না। ৮. কোনো চরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিও না। ৯. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করো না। আর ইহুদিদের জন্যে একটি বিশেষ হুকুম ছিল- শনিবার দিনের সম্মান রক্ষা কর, সেদিন দুনিয়ার কাজ করো না।

যে, দু'জন ইহুদি হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর নিকট এ কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা উভয়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কদম মুবারক চুম্বন করলো এবং বলল, আপনি আল্লাহ পাকের সত্য নবী। হুজুর ﷺ তখন ইরশাদ করলেন, তবে আমার অনুসরণ থেকে কে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? তারা বলল, আমরা যদি আপনার অনুসারী হই, তবে ইহুদিরা আমাদের মেরে ফেলবে।

قَوْلُهُ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ : এ আয়াতে সে যুগের মুসলমানদেরকে এ মর্মে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত আদ, সামূদ, লূত এবং ফেরাউন জাতির নাফরমানি ও তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, পূর্বের কাফেরদের এ ভয়াবহ পরিণতি দেখার পরও হে মুসলমানগণ! তোমাদের এ যুগের কাফেররা, বিশেষত মক্কাবাসী কুরাইশরা আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি অতীত কালের কাফেরদের তুলনায় উত্তম যে, আল্লাহ আজাব থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাবে? এমন তো নয়; বরং যে কেউ এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে, তার শাস্তি অবধারিত।

قَوْلُهُ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ : অর্থাৎ হে মক্কার কাফেররা! তবে কি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহে মুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হও, তাঁর রাসূলকে অস্বীকার কর তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না? এমন মুক্তিপত্রও তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ : অথবা তারা কি একথা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? আমরা সর্বদা সংরক্ষিত থাকব, কেউ আমাদের প্রতি বিজয়ী হওয়ার কথা চিন্তাও করবে না। এমনও তো নয়; অবশেষে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত হবে এবং তোমাদের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, اَكُفَّارُكُمْ বলে এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে মক্কাবাসীর প্রতি, আর সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানগণকে, আর اُولٰئِكُمْ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.) ও লূত (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতিসমূহের প্রতি ও ফেরাউনের দলবলের প্রতি এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমাদের যুগের কাফেররা কি উল্লিখিত কাফেরদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? বেশি সম্পদশালী? বা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে পূর্বেকার কাফেরদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন? এমন তো নয়; বরং এ যুগের কাফেররা পূর্বযুগের কাফেরদের ন্যায়ই, অথবা তাদের চেয়েও অধিক মন্দ। অতএব, পূর্বকালের কাফেরদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তাদের অবস্থাও সেরূপ শোচনীয় হবে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অতীতের অনেক পথভ্রষ্ট জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং কিভাবে তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে, তার বিবরণের পর মক্কাবাসীকে তাদের অবস্থা মূল্যায়ন করার আহ্বান করা হয়েছে এ মর্মে যে, তোমরা কি পূর্বের কাফেরদের চেয়ে উত্তম? যে অপরাধে তাদের শাস্তি হয়েছে, সে অপরাধে তোমরা অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কি শাস্তি হবে না? অথবা তোমাদের জন্যে কি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মুক্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে? অথবা তোমরা কি এমন অপরাজেয় শক্তিশালী দল যে, তোমাদের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না?

আর এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ অর্থাৎ অচিরেই এ দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কাফেররা যত দৌরাত্ম্যই প্রদর্শন করুক না কেন, অচিরেই তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হবে। তারা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তখন তাদের প্রকৃত অবস্থা তারা দেখতে পাবে। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে এবং পঞ্চম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে পবিত্র কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

–[তাফসীরে আল বাহরুল মুহীত খ. ৮, পৃ. ১৮৩]

قَوْلُهُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ : অর্থাৎ বদর এবং খন্দকে কাফেরদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে অপমান ও লাঞ্ছনা তারা ভোগ করেছে, এটিই শেষ নয়; বরং তাদের আসল শাস্তি হবে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন বড়ই বিপদজনক এবং কঠিনতর। দুনিয়াতে তারা যে শাস্তি পেয়েছে, আখিরাতের আজাবের তুলনায় তা কোনো শাস্তিই নয়, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের কঠিন শাস্তির ভূমিকা স্বরূপ, আখিরাতের শাস্তি বর্ণনাতীত।

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ : অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা কাফের মুশরিক, যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা পথহারা দিশেহারা– তারা সত্য থেকে দূরে তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর আখিরাতে দোজখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা কাফের, মুশরিক তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকারগ্রস্ত, তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল, আখিরাত সম্পর্কে বে-খবর, অথচ ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৩]

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ "সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে– দোজখের শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর"। অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন উপুর করে দোজখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা ছিল অপরাধী, সেই অপরাধেরই শাস্তি তারা ভোগ করবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُجْرِمِيْنَ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ইতিপূর্বে اَكُفَّارُكُمْ বলে শুধু মক্কার কাফেরদরেকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ : শানে নুযূল : মুসলিম শরীফ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মুশরিক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে ঝগড়া করার নিমিত্তে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়, তখন اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ থেকে بِقَدَرٍ পর্যন্ত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ১১, পৃ. ২০৮, রূহুল মা'আনী খ. ২৭. পৃ. ৯৪]

قَوْلُهُ قَدَرًا : শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরিমাপ করা, কোনো বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণির বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরি করেছেন। আঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরি করেননি; দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরিয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহর তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ কোনো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টিলাভ করে, তা এই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টিলাভ করে।

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসিক। আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজূসী [অগ্নিপূজারী কাফের] থাকে। আমার উম্মতের মজূসী তারা, যারা তাকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খরব নিও না এবং মরে গেলে তাদের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না।

–[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَمَآ اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ .... فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমাদের ন্যায় অনেক কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন, কেউ তাতে বাধা দিতে পারেনি, এসব কথা শুনেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আর আল্লাহ পাকের কাজ তো চোখের পলকের ন্যায় ক্ষণিকের মধ্যেই হয়ে যায়, তাঁর ইচ্ছা হলেই তা বাস্তবায়িত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে চোখের পলকের ন্যায়। –[কালবী]

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ : কিরামুন কাতেবীন নামক দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেকটি মানুষের ডান এবং বাম কাঁধে কর্তব্যরত রয়েছেন। প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা হচ্ছে, আর তাই আমলনামা হিসেবে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে দেওয়া হবে এবং সে আমলনামার ভিত্তিতেই পুরস্কার বা শাস্তি হবে। ছোট-বড় যাবতীয় কীর্তিকলাপই আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সকল বিবরণই সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, যথাসময়ে তা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে তার আমলনামা দিয়ে বলা হবে- اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ "তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর! আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট"।

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ - فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিক এবং তাকদীরে অবিশ্বাসী লোকদের কীর্তিকলাপ এবং তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে নেককার পরহেজগার বান্দাগণের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা এ জীবনে জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে, তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাঁর প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে জীবনকে আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং আমানত মনে করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, তারা বেহেশতের বাগানে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অবস্থান করবে, আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে, মনের আনন্দে সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন, ন্যায়বিচার কায়েমকারী নেককার লোকেরা আল্লাহ পাকের নিকট নূরের মিম্বরে আসীন হবে। তারা সেসব লোক, যারা নিজেদের পরিবারবর্গের মধ্যে, আর যা কিছু তাদের কাছে রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের হুকুমের বরখেলাফ কিছু করে না; বরং তারা সুবিচার কায়েম করে এবং সুবিচারের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করে। –[মুসলিম শরীফ]

তাফসীরকারগণ বলেছেন, مَقْعَدْ صِدْقٍ [সত্যবাদিতার স্থান] কথাটির তাৎপর্য হলো, এমন স্থান যেখানে কোনো গুনাহ বা অহেতুক কথা হবে না, এর দ্বারা জান্নাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক 'মাকাম' শব্দের গুণ বর্ণনা করেন صِدْقٍ শব্দ দ্বারা। এর তাৎপর্য হলো, যারা সত্যবাদী, তারাই সেখানে আসন পাবেন।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৬, মাযহারী খ. ১, পৃ. ২১০]

সূরা রাহমান

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার শুরুতে বর্ণিত আর-রাহমান শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর-রাহমান অর্থ– পরম করুণাময়। এ সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পরম করুণাময় আল্লাহর গুণ পরিচয়ের বাহ্যিক প্রকাশ, প্রতিফল ও নিদর্শনাদির উল্লেখ রয়েছে। এ সূরার অপর একটি নাম হলো 'উরূসুল কুরআন'। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সৌন্দর্য রয়েছে। আর এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়, আর কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য হলো সূরা আর-রাহমান।

সূরা রাহমানের আয়াত সংখ্যা– ৭৬/৭৮, বাক্য সংখ্যা ৩৫১, আর অক্ষর হলো ১৬৩৬টি।

সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর প্রণীত তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সূরা রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের এবং হযরত আয়শা (রা.)-এর মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবনুন নুহাস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার মুকাতিল (র.) এ মতই পোষণ করতেন। –[রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৬]

নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ এ সূরাটি মক্কী হওয়ার প্রমাণ বহন করে–

* হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ-কে আমি হারাম শরীফে কা'বা ঘরের সেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে দেখেছি, যেখানে হাজরে আসওয়াদ অবস্থিত। যখন "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়নি, এটা সেই সময়ের কথা। এ নামাজে মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর মুখে "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" শব্দগুলো শুনেছিল। এ হতে জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি মহানবী ﷺ প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে অর্থাৎ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[মুসনাদে আহমদ]

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা মহানবী ﷺ সূরা রাহমান নিজে তেলাওয়াত করলেন কিংবা তাঁর সম্মুখে এ সূরাটি তেলওয়াত করা হলো। এরপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জিনেরা আল্লাহর এ প্রশ্নের যেরূপ জবাব দিয়েছিল তোমাদের নিকট হতে সেরকম জবাব শুনতে পাই না কেন? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসিলেন, জিনদের জবাব কিরূপ ছিল? তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি যখন "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" আয়াত পাঠ করতাম তখন তারা "لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ" অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রভুর [আল্লাহর] কোনো একটি নিয়ামতকেও অস্বীকার করি না। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা আহকাফে মহানবী ﷺ -এর পবিত্র জবানে জিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তখন রাসূল ﷺ নামাজে সূরা রাহমান তেলাওয়াত করেছিলেন। এটা নবুয়তের দশম বছরের ঘটনা। রাসূল ﷺ তখন তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনকালে 'নাখলা' নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এটা হতে জানা যায় যে, সূরা হিজর ও সূরা আহকাফের পূর্বে সূরা রাহমান অবতীর্ণ হয়েছিল। –[তাফসীরে তাবারী]

* হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর হতে ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম একদা পরস্পর বলাবলি করলেন যে, কখনো কুরাইশরা কাউকে প্রকাশ্যে বা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে তাদেরকে একবার আল্লাহর এ কালাম শুনিয়ে দেবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এটা এমন লোকের করা উচিত যার বংশ ও পরিবার প্রবল শক্তিশালী। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহই হেফাজতকারী। এরপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) দ্বি-প্রহরে মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সূরা রাহমান পাঠ করা শুরু করে দিলেন। এ কারণে কুরাইশরা তাঁর উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাদেরকে শুনিয়েই যেতে থাকলেন।

এ সকল বর্ণনা হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা কামারে নবুয়তের সত্যতার দলিল হিসেবে প্রিয়নবী ﷺ -এর মুজেযার উল্লেখ রয়েছে। এরপর অতীতের বিভিন্ন জাতির নাফরমানির উল্লেখ করে তাদের উপর যেসব আজাব এসেছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আল্লাহর অনন্ত অসীম নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

এ সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা রাহমান আপন বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সূরার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী। এ সূরার মিষ্টি মধুর শব্দ চয়ন এবং আশাব্যঞ্জক ভাব মানুষ মাত্রকে আকৃষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের আশীষে মানুষ আশান্বিত হয়। মানব মন কৃতজ্ঞ হয়। এ সূরাটি ছন্দের মাধুর্য, সুর লহরী এবং ভাষার অলংকারে মুগ্ধ হয়ে পৌত্তলিকরা পর্যন্ত সৎকাজে অনুপ্রাণিত হতো।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সঙ্কলন করেছেন। মহানবী ﷺ একদা সাহাবীগণের মজলিসে আগমন করে এ সূরার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, হে লোক সকল! আমি এ সূরা জিনদেরকে শুনিয়েছি। আমি যখন এ আয়াত "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" তেলাওয়াত করেছি। তখন জিনেরা এ বলে জবাব দিয়েছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য রয়েছে সকল প্রশংসা। কিন্তু তোমরা এ সূরা শ্রবণ করে নীরব রইলে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরা নামাজ ব্যতীত অন্য সময় যদি তেলাওয়াত বা শ্রবণ করা হয় তবে সুন্নত হলো উল্লিখিত আয়াতের পর জবাব প্রদান করা। আর নামাজের অবস্থায় জবাব দেওয়া যাবে না তবে বিষয়টি চিন্তায় আনতে পারে।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরা রাহমানে মানুষ ও জিনদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, অপরিসীমতা, তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর মোকাবিলায় এদের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং তাঁর নিকট এদের জবাবদিহী করার চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার অতীব সাংঘাতিক পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। জিনদেরও মানুষের ন্যায় ইচ্ছা-ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। জিনদের মধ্যেও মানুষের মতো আল্লাহর অনুগত ও বিদ্রোহী রয়েছে। মহানবী ﷺ -এর আনীত কুরআনের দাওয়াত মানব-দানব উভয়ের জন্যেই উপস্থাপিত হয়েছে– এ কথাটিকে এ সূরাটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

সূরার মূল বক্তব্য :

* আল্লাহর রহমতের দাবি হচ্ছে– কুরআনে কারীম মানুষের হেদায়েতের জন্য এসেছে।
* এক আল্লাহ ছাড়া বিশ্বলোকের সকল ব্যবস্থাপনায় অন্য কারো প্রভুত্ব চলছে না।
* এ বিশ্বলোকের গোটা ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনোক্রমেই এ ভারসাম্যকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না।
* মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরত ও বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা বলার সাথে মানব ও দানবরা আল্লাহর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে, তার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।
* মানব ও দানবকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া চিরন্তন ও শাশ্বত আর কোনো সত্তা নেই।
* মানুষ ও জিন জাতিকে যাবতীয় কর্মের হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এ থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই। এটা কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হবে।
* এ সূরায় পৃথিবীর নাফরমান জিন ও ইনসানের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে।
* পৃথিবীতে মানব ও দানবের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে, পরকালকে ভয় পেয়েছে তাদেরকে প্রদেয় নিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এ সূরাটি রাসূল ﷺ -এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর অপার করুণা বলেই জগতের সর্ববৃহৎ বস্তু হতে শুরু করে অতি ক্ষুদ্র বস্তু পর্যন্ত সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নাম স্মরণ করে চলতেন। রাসূল ﷺ ও আল্লাহর এ পবিত্র নাম "আর রাহমান" সর্বদা উচ্চারণ করতেন। এটা শুনে মক্কার প্রকৃতি বিশিষ্ট সত্যবিমুখরা অবাক হতো ও বিস্ময়বোধ করত এবং অবজ্ঞা সহকারে বলত 'রাহমান' আবার কে? তাঁকে তো আমরা জানি না। এ সূরা তাদের মূর্খতাসুলভ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়।

এ সূরার ফজিলত : পবিত্র কুরআনের মধ্যে সূরা রাহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। বান্দার প্রতি আল্লাহর কি অশেষ দান রয়েছে? এ সূরায় বার বার সে কথাই আলোকপাত করা হয়েছে। এ সূরার আমল রুজি-রোজগারের জন্য বিশেষ ফলদায়ক। নির্দোষ ব্যক্তি মামলায় পড়লে, শত্রুকে বাধ্য করতে হলে, কারো চোখে অসুখ হলে, প্লীহারোগে আক্রান্ত হলে এ সূরা পাঠ করে রোগীর প্লীহার উপর ফুঁক দেবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরা নিয়মিত পাঠ করবে, তার চেহারা কিয়ামতের দিন চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সর্বদা এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তির মন প্রফুল্ল থাকবে। তাকে দুশ্চিন্তা অস্থির করে তুলতে পারবে না। তার যে কোনো দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। যে ব্যক্তি সূরা রাহমান এগারো বার পাঠ করবে আল্লাহর রহমতে তার সকল নেক উদ্দেশ্য হাছিল হবে।

সূরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ : যখন "قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ الخ" আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবূ জাহেল, ওয়ালীদ, ওতবা, শায়বা প্রমুখ বলতে লাগল, রহমান কে? আমরা তো তা জানি না, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার অনেক গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে; তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করা হলো।

বস্তুত মানুষের প্রতি আল্লাহর দানের কোনো সীমা নেই, শেষও নেই। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, যৌবন, জীবনের যাবতীয় উপকরণ– এক কথায় সবকিছুই আল্লাহর মহাদান। এ অসীম দানের মধ্যে আলোচ্য সূরায় মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের পরওয়ার দিগারের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।
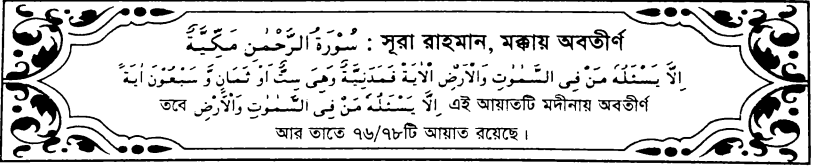
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلرَّحْمٰنُ ۙ

১. 'আর-রাহমান' [পরম দয়ালু আল্লাহ]।

٢. عَلَّمَ مَنْ شَاءَ الْقُرْاٰنَ ط

২. শিক্ষা দিয়েছেন যাকে ইচ্ছা কুরআন।

٣. خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ اَىْ الْجِنْسَ.

৩. তিনিই মানব [জাতি] - কে সৃষ্টি করেছেন।

٤. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ النُّطْقَ.

৪. তিনি তাকে কথা বলা বা ভাব প্রকাশ করা শিখিয়েছেন।

٥. اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ.

৫. চন্দ্র ও সূর্য হিসেবের সাথে [নিয়ন্ত্রিত] রয়েছে অর্থাৎ গণনায় চলাচল করে।

٦. وَالنَّجْمُ مَا لَا سَاقَ لَهُ مِنَ النَّبَاتِ وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَاقٌ يَسْجُدَانِ. يَخْضَعَانِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُمَا.

৬. আর তৃণলতা কাণ্ডবিহীন উদ্ভিদ আর বৃক্ষ তথা কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই আল্লাহর সিজদায় [অবনত] রয়েছে এদের নিকট হতে যা কামনা করা হয়, সে হুকুমের সম্মুখে এরা অনুগত থাকে।

٧. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ اَثْبَتَ الْعَدْلَ.

৭. আর তিনি আসমানকে সু-উচ্চ করেছেন এবং তিনিই ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

٨. اَلَّا تَطْغَوْا اَىْ لِاَجْلِ اَنْ لَّا تَجُوْرُوْا فِى الْمِيْزَانِ مَا يُوْزَنُ بِهٖ.

৮. যেন তোমরা পরিমাপে [কম-বেশির ক্ষেত্রে] সীমালঙ্ঘন না কর। পরিমাপযোগ্য বস্তুতে।

٩. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ تَنْقُصُوا الْمَوْزُوْنَ.

৯. আর ন্যায়পরায়ণতার সাথে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর, [ন্যায়সঙ্গতভাবে] আর পরিমাপে কম করো না ওজনকৃত পণ্যে কম করো না।

١٠. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا اَثْبَتَهَا لِلْاَنَامِ ۙ لِلْخَلْقِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَغَيْرِهِمْ.

১০. আর তিনিই জমিনকে সৃষ্টজীবের জন্য স্থাপন করেছেন [প্রতিষ্ঠা করেছেন] মানব, জিন ইত্যাদি সকল সৃষ্টির জন্য।

١١. فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ الْمَعْهُوْدُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ اَوْعِيَةُ طَلْعِهَا .

১১. তাতে ফল এবং খোসাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। [গুচ্ছের বাইরের আবরণ, এটা দ্বারা নুতন ফল বুঝিয়েছেন।]

١٢. وَالْحَبُّ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ ذُوا الْعَصْفِ التِّبْنِ وَالرَّيْحَانُ ج اَلْوَرَقُ اَوِ الْمَشْمُوْمُ .

১২. আর তুষযুক্ত শস্যদানা যেমন– গম, যব ইত্যাদি তৃণ বিশিষ্ট ও সুগন্ধ পুষ্প রয়েছে– [যেমন পাতা ও নানাবিধ শাক সব্জী।]

١٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ نِعَمِ رَبِّكُمَا يَاَيُّهَا الْاِنْسُ وَالْجِنُّ تُكَذِّبٰنِ . ذُكِرَتْ اِحْدٰى وَثَلٰثِيْنَ مَرَّةً وَالْاِسْتِفْهَامُ فِيْهَا لِلتَّقْرِيْرِ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا لِيْ اَرٰىكُمْ سُكُوْتًا لَلْجِنُّ كَانُوْا اَحْسَنَ مِنْكُمْ رَدًّا مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مِنْ مَرَّةٍ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ اِلَّا قَالُوْا وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ .

১৩. অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! [এত অফুরন্ত নিয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও] তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? অত্র সূরায় এ আয়াতটি একত্রিশবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ [প্রশ্নবোধকটি] এখানে تَقْرِيْر বা সাব্যস্তকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাকেম (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাদেরকে সূরা 'রাহমান' শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনান। অতঃপর বললেন, তোমরা নীরব কেন? তোমাদের অপেক্ষা জিন জাতিই উৎকৃষ্ট। যেহেতু যতবারই আমি তাদের সম্মুখে "فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ" পাঠ করেছি, তদুত্তরে প্রত্যেকবারই তারা বলেছে– "لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ" [হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোনো নিয়ামতই অস্বীকার করি না; বরং আমরা আপনার প্রশংসাই বর্ণনা করি।]

١٤. خَلَقَ الْاِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِيْنٍ يَابِسٍ يُسْمَعُ لَهٗ صَلْصَلَةٌ اَيْ صَوْتٌ اِذَا نُقِرَ كَالْفَخَّارِ لا وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنَ الطِّيْنِ .

১৪. আল্লাহ মানুষকে তথা আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক মৃত্তিকা হতে, বিশুদ্ধ মাটি যাতে আঘাত করলে ঠন ঠন শব্দ বেজে উঠে, পোড়ামাটির মতো। আর ফাখখার হলো সেই মাটি, যা আগুনে পোড়ানো হয়।

١٥. وَخَلَقَ الْجَآنَّ اَبَا الْجِنِّ وَهُوَ اِبْلِيْسُ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ج هُوَ لَهَبُهَا الْخَالِصُ مِنَ الدُّخَانِ .

১৫. এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন জিন জাতির পিতাকে আর সে হলো ইবলিস। নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এমন বিশুদ্ধ অগ্নিশিখা, যা ধোঁয়ামুক্ত।

١٦. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

১৬. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা উভয়ে স্বীয় পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

١٧. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ مَشْرِقِ الشِّتَاءِ وَمَشْرِقِ الصَّيْفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ج كَذٰلِكَ .

১৭. তিনি উভয় উদয়াস্থল শীত ও গ্রীষ্মের এবং অনুরূপ উভয় অস্তাচল শীত ও গ্রীষ্মের পালনকর্তা।

١٨. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

১৮. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে।

١٩. مَرَجَ اَرْسَلَ الْبَحْرَيْنِ الْعَذْبَ وَالْمِلْحَ يَلْتَقِيٰنِ لا فِيْ رَأْيِ الْعَيْنِ .

১৯. তিনি সম্মিলিত করেন প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র মিষ্ট ও লোনা, যারা পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে।

٢٠. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ حَاجِزٌ مِنْ قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لَا يَبْغِيٰنِ لَا يَبْغِيْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ فَيَخْتَلِطَ بِهٖ .

২০. এতদুভয়ের মধ্যে একটি অন্তরায় রয়েছে আল্লাহর কুদরতের প্রতিবন্ধক যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মিশ্রিত হয়ে পড়বে না। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ হতে পারে না।

٢١. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২১. অতএব [হে জিন ও মানুষ!] তোমরা স্বীয় রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার রকবে?

٢٢. يَخْرُجُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مِنْهُمَا مِنْ مَجْمُوْعِهِمَا الصَّادِقِ بِاَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمِلْحُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ج خَرَزٌ اَحْمَرُ اَوْ صِغَارُ اللُّؤْلُؤِ .

২২. বের হয়ে থাকে (يَخْرُجُ) ক্রিয়াপদটিকে ফায়েল [কর্তৃবাচ্য] ও মাফঊল [কর্মবাচক] উভয় প্রকার ক্রিয়াপদ রূপে পাঠ করা যায়। উভয় সমুদ্র হতে অর্থাৎ উভয়ের সমষ্টি হতে, যা লবণাক্ত সমুদ্রের উপর আরোপিত হয়ে থাকে মুক্তা ও প্রবাল লালমুক্তা অথবা ছোট ছোট মতি।

٢٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা স্বীয় পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

٢٤. وَلَهُ الْجَوَارِ السُّفُنُ الْمُنْشَاٰتُ الْمُحْدَثَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ج كَالْجِبَالِ عِظَمًا وَارْتِفَاعًا .

২৪. আর তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জাহাজসমূহ যা [বিচরণশীল] চলাচলকারী সমুদ্রের মধ্যে পর্বত সদৃশ উচ্চতা ও বিশালতায় পাহাড়ের ন্যায়।

٢٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২৫. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلسَّمَاءُ : اَلسَّمَاءُ শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ- اَلسَّمَاءُ শব্দের (ء) হামযা অক্ষরের উপর اِشْتِغَالْ -এর ভিত্তিতে نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ সাম্মাক مُبْتَدَأْ -এর ভিত্তিতে اَلسَّمَاءُ শব্দের হামযাকে رَفْع দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تُخْسِرُوْا : لَا تُخْسِرُوْا শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ لَا تُخْسِرُوْا শব্দটি بَابْ اِفْعَالْ হতে নির্গত হওয়ার কারণে তার (ت) অক্ষরের উপর ضَمَّةْ এবং (س) অক্ষরের নিচে كَسْرَةْ দিয়ে "وَلَا تُخْسِرُوْا" পড়ে থাকেন। বেলাল ইবনে আবূ বুরজা প্রমুখ ক্বারীগণ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ হতে গৃহীত হওয়ার ভিত্তিতে উক্ত শব্দের ت ও س অক্ষরদ্বয়ের উপর فَتْحَةْ দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ : اَلْحَبُّ - ذُوالْعَصْفِ - وَالرَّيْحَانُ শব্দগুলো فَاكِهَةٌ শব্দের উপর مَعْطُوْف ধরে তাদের শেষ অক্ষরসমূহের উপর ضَمَّةٌ দিয়ে পড়েছেন। আর ইবনে আমের প্রমুখ ক্বারীগণ اَلْحَبُّ - ذُوالْعَصْفُ শব্দ দুটি نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। কারণ শব্দদ্বয় اَلْاَرْض -এর مَعْطُوْف হয়েছে। হামযা ও কাসায়ী (র.) وَالرَّيْحَانُ শব্দের নিচে كَسْرَةٌ দিয়ে পড়েছেন। এখানে প্রথম কেরাতটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম।

قَوْلُهُ الرَّحْمٰنُ : اَلرَّحْمٰنُ শব্দটির তারকীব নিয়ে তাফসীরকারদের নিম্নোক্ত মতদ্বন্দ্ব রয়েছে–

* কেউ কেউ বলেন– اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মুবতাদা মাহযূফের খবর হবে। মূল বাক্যটি হবে– اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ
* কোনো মুফাসসির বলেন– اَلرَّحْمٰنُ হলো মুবতাদা। আর পরবর্তী আয়াত عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ হলো খবর।
* কারো কারো মতে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মুবতাদা আর তার খবর মাহযূফ বা উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে– اَلرَّحْمٰنُ رَبُّنَا
* কতিপয় তাফসীরকারকের মতে এখানে اَلرَّحْمٰنُ -এর পূর্বে একটি هُوَ উহ্য আছে যা মুবতাদা হবে। আর اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ মিলে তার খবর হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম দু'টি তারকীবের ভিত্তিতে اَلرَّحْمٰنُ একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। আর শেষোক্ত তারকীবের ভিত্তিতে اَلرَّحْمٰنُ টি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়।

قَوْلُهُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ : اَلْاَرْض এবং اَلسَّمَاءُ শব্দ দুটি مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মহল্লান মানসূব হয়েছে। যার আমেল وُجُوْبًا قِيَاسًا উহ্য রয়েছে। কাজেই শব্দ দুটি তাদের আমেলসহ পৃথক পৃথক বাক্য। আর رَفَعَهَا এবং وَضَعَهَا হলো পৃথক বাক্য।

অথবা এ শব্দ দু'টি اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে মহল্লান মারফূ' হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبُّ : "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ" -এর رَبُّ শব্দটির মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. মশহুর এবং মুতাওয়াতির কেরাত হচ্ছে رَبُّ শব্দের ب -এর উপর পেশ দিয়ে পড়া।

২. ইবনে আবূ আইলার মতে رَبِّ শব্দের ب -এর নিচে কাসরা দিয়ে পড়া হবে।

قَوْلُهُ يَخْرُجُ : يَخْرُجُ শব্দটির মধ্যেও নিম্নোক্ত দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. মশহুর কেরাত হলো– يَخْرُجُ -এর يَاءٌ -এর উপর যবর এবং رَاءٌ হবে পেশযুক্ত।

২. নাফে এবং আবূ আমরের মতে يُخْرَجُ -এর يَاءٌ -এর উপর পেশ এবং رَاءٌ যবরযুক্ত হবে।

قَوْلُهُ الْمُنْشَئَاتُ : এখানে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. অধিকাংশ কারীদের মতে اَلْمُنْشَئَاتُ -এর ش -এর উপর যবর দ্বারা হবে। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. হযরত হামযা ও আবূ বকরের মতে اَلْمُنْشِئَاتُ -এর ش -এর নিচে কাসরা হবে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : উল্লেখ্য যে, رَبُّ শব্দটির মহল্লে ই'রাব কেরাতের ভিত্তিতে হয়েছে। সকল কারীগণ رَبُّ শব্দের ب -কে পেশ দিয়ে পড়েছেন। এখানে رَبُّ শব্দটি নিম্নোক্ত তিনটি কারণে মারফূ' হয়েছে–

১. رَبُّ শব্দটি মুবতাদা। এর খবর হচ্ছে– مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ আর "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" বাক্যটি জুমলায়ে মুস্তানাফা।

২. رَبُّ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর। মূল বাক্য হবে– هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

৩. رَبُّ الْمَشْرِقِ বাক্যটি خَلَقَ الْاِنْسَانَ -এর خَلَقَ ফে'লের যমীর হতে بدل হয়েছে। এ তিন কারণে رَبُّ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

তবে ইবনে আবী আইলা رَبِّ -এর ب টি কাসরা দিয়ে পড়েছেন। কারণ এটি لِرَبِّكُمَا হতে বদল অথবা بَيَانٌ হওয়ায় মাজরূর হয়েছে।

قَوْلُهُ يَلْتَقِيَانِ : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ আয়াতে يَلْتَقِيَانِ ফে'লটি তার ফায়েলের সাথে মিলিত হয়ে اَلْبَحْرَيْنِ হতে حَالٌ হয়েছে। এটা حَالٌ مُقَارِنَةٌ -এর কাছাকাছি। এটা ছাড়া يَلْتَقِيَانِ টা اَلْبَحْرَيْنِ হতে حَالٌ مُقَارِنَةٌ হওয়াও বৈধ।

قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ : এ বাক্যটি জুমলায়ে মুস্তানাফাহ হতে পারে এবং حَالٌ -ও হতে পারে। তাছাড়া وَبَيْنَهُمَا যরফটি নিজেই حَالٌ হতে পারে। আর بَرْزَخٌ হলো উক্ত ظَرْف -এর ফায়েল। এটি অধিক যুক্তিসঙ্গত মত।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ যদি جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ বা حَالٌ হয়ে থাকে তবে তার ذُوالْحَالِ কোনটি হবে? এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা-

১. الْبَحْرَيْنِ হলো এর ذُوالْحَالِ

২. يَلْتَقِيَانِ ফে'লের ফায়েল বা তাতে উহ্য هُمَا যমীর ذُوالْحَالِ হবে।

قَوْلُهُ لَا يَبْغِيَانِ : এখানে يَلْتَقِيَانِ হলো প্রথম। আর দ্বিতীয় حَالٌ টি لَا يَبْغِيَانِ টি الْبَحْرَيْنِ হতে দ্বিতীয় حَالٌ হয়েছে। لِئَلَّا يَبْغِيَانِ টি حَالٌ مُعَلَّلَةٌ-এর পর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বাক্যটি لِئَلَّا يَبْغِيَانِ হওয়া উচিত। কারো কারো মতে মূল বাক্যটি ছিল এরপর اَنْ এর সাথে حَرْف عِلَّتْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে لَا يَبْغِيَانِ হয়ে فِعْل مَرْفُوْع হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ : **শানে নুযূল :** এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ফুরকানের আয়াত "وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا" [অর্থাৎ "তাদেরকে যখন বলা হয় রহমানকে সিজদা কর, তখন তারা মূর্খতা ও বিরোধিতাবশত বলে রহমান কি জিনিস? আমরা কি তাঁকেই সিজদা করব? যাকে সিজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বেড়ে যায়।"] যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কার কাফেররা ঘৃণা ভরে বলে, আমরা রহমান বলতে ইয়ামামার রহমানকে বুঝি। হে মুহাম্মদ ﷺ! যে রহমানের সম্মুখে তুমি আমাদেরকে সিজদা করার আহ্বান করছ, তার সামনে আমরা মাথা নত করতে পারব না। আর ইয়ামামার রহমান ছাড়া আমাদের অনেক ইলাহ রয়েছে, যাদের সামনে আমরা মস্তক অবনত করি। এ আয়াতটি তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে।

অথবা মক্কার কাফের মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, ইয়ামামা প্রদেশের 'মুসায়লামাতুল কায্যাব' নামে একজন মানুষ যিনি রহমান বা দয়ালু নামে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। আলোচ্য আয়াতটি তাদের বক্তব্যের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

অথবা, اَلرَّحْمٰنُ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই গুণবাচক নাম। এ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদেরকে অবগত করিয়ে দেওয়া। কেননা রহমান শব্দটির প্রচলন তাদের মধ্যে কম ছিল। বস্তুত ইসলামি শিক্ষার প্রতি তাদের এতই ঘৃণা ছিল যে, ইসলামি শব্দগুলোর প্রতিও তারা ঘৃণাপোষণ করত। কুরআনে এ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হওয়ায় তারা শব্দটির বিরোধী হয়েছে। এ কারণে এ আয়াতটির মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআনের রচয়িতা নন; বরং শিক্ষাদাতা। মহান রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন এর রচয়িতা, যাঁর বিশেষ গুণ হলো রহমান বা পরম দয়ালু। এ কুরআনুল কারীমের শিক্ষা তিনিই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -কে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ : আল্লাহর বাণী- "اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ" অর্থাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তিনিই মুহাম্মদ ﷺ -কে এই কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা দেওয়ার মর্মার্থ কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির জীবন-যাপনের সঠিক হেদায়েত সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জীবন-বিধান শিক্ষা দেওয়া। যা অন্যান্য আসমানি গ্রন্থে পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়নি। ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা দুনিয়ার সকল মানবের হেদোয়েতের জন্য নবী করীম ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। এখানে কুরআনে কারীমের শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তার উপস্থাপিত জীবনাদর্শ বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ : আল্লাহ তা'আলার বাণী- "اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ" -এর মধ্যে خَلَقَ الْاِنْسَانَ-এর আগে عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ-এর উল্লেখ করেছেন। অথচ বাহ্যত تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ-এর উল্লেখ خَلَقَ الْاِنْسَانَ-এর পরে হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন। কারণ তিনিই সকল জ্ঞান ও কৌশলের আধার। তবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ এখানে একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন; তা এই যে, মানবজাতি সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনে কারীমের শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে যে সংবিধান অনুসরণ করতে হবে তা হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনের শিক্ষাই হবে মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর বিপরীত পথ অনুসরণ করলে বিপথগামী ও অভিশপ্ত হবে। আল্লাহ তাকে কঠিন আজাব প্রদান করবেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা خَلَقَ الْاِنْسَانَ-এর উল্লেখ করার পূর্বে عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ-এর আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত হলো- "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন"। যার ফলে মানুষ সহস্র প্রকারে উপকৃত হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ মানুষের খালেক বা সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁরই দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিকুলের হেদায়েত করা। এ কারণেই আল্লাহর নিকট হতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া একদিকে যেমন তাঁর পরম দয়াশীলতার অনিবার্য দাবি, তেমনি তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ারও অপরিহার্য

দাবি কুরআন অবতরণ; সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টির বিবিধ ব্যবস্থা ও কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া সাধারণ ব্যাপার। কুরআন শিক্ষা পাওয়ার পর মানুষ কিভাবে চলবে, এ তত্ত্ব কুরআনের একটি মূল আলোচ্য বিষয়। এ কথাটি কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন– এক আয়াতে বলেছেন– "وَاِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى" "অর্থাৎ পথ-প্রদর্শন ও কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া আমার কর্তব্য"। অপর স্থানে বলেছেন– "وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ" অর্থাৎ সরল সঠিক পথ বলে দেওয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ আয়াতে বর্ণিত بَيَانٌ -এর মর্মকথা : তাফসীরকারগণ بَيَانٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন– بَيَانٌ -এর অর্থ ভাষা অথবা সকল বস্তুর নাম, এ ক্ষেত্রে আয়াতে اِنْسَانٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন– اِنْسَانٌ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য আর بَيَانٌ দ্বারা হারাম হতে হালালের বর্ণনা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হারাম হতে হালাল বস্তুকে পার্থক্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বিপথ হতে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন– بَيَانٌ অর্থ ভালো ও মন্দের বর্ণনা। অর্থাৎ আল্লাহ ভালো ও মন্দের বর্ণনা দিয়েছেন, তবে بَيَانٌ -এর উত্তম অর্থ হলো, প্রত্যেক জাতি যেই ভাষায় কথা বলে থাকে, তাদেরকে ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়া আর اِنْسَانٌ দ্বারা সকল মানুষই উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাদের নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন; যেই ভাষায় তারা কথা বলে থাকে। –[ফাতহুল কাদীর]

কেউ কেউ বলেন– بَيَانٌ অর্থ– মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করা। অর্থাৎ কথা বলা, নিজের বক্তব্য ও মনের ভাবধারা প্রকাশ করা। মনের ভাব প্রকাশ করা বা কথা বলা মানবজাতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি হতে পৃথক সত্তার অধিকারী প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে মানুষের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক চেতনা ও বোধ স্বাভাবিকভাবেই রেখে দিয়েছেন। এর দরুনই মানুষ পাপ-পুণ্য; হক-বাতিল, জুলুম-ইনসাফ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে।

قَوْلُهُ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ : সূর্য এবং চন্দ্র হিসেবের সাথে চলছে এবং হিসেবের অনুসরণে চলা বাধ্য। কারণ, মানুষ এ পৃথিবীর দিবা-রাত্রি, ফসল ও মৌসুমের হিসাব তথা বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহে গতি ও কিরণ রশ্মির ভিত্তিতে করছে এবং দুটি গ্রহের চলাচল ও পরিভ্রমণের আলোকে চলছে। এদের গতির উপর শীত গ্রীষ্ম এবং বার মাসের গণনা তথা মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এদের মাধ্যমেই দিবা-রাত্রির পার্থক্য এবং ঋতু পরিবর্তন নির্ধারিত হয়ে থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও বিভিন্ন কক্ষপথ অতিক্রম করে যাওয়ার যেই নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাতে এক বিন্দু পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম হয়নি। পরিভ্রমণের ফলে চন্দ্র ও সূর্যের-ক্ষয় হয়নি। এরা সৃষ্টির প্রথম হতে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের দায়িত্ব আদায় করে যেতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রভুত্বের নীতি।

আল্লাহর সৃষ্টি ও মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে ভাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য নিয়ম, মেশিন যতই শক্ত হোক না কেন, কিছুদিন চলার পর তা মেরামত করা এবং কক্ষপথে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর মেরামত করার সময় তা অকেজো হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রবর্তিত বস্তুর কোনো সময় মেরামতের প্রয়োজন হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারার কোনো পার্থক্যও হয় না। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম ও মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য। এ জন্য গ্রহ দুটি মানুষের জন্য নিয়ামত বটে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বিজ্ঞান ও আল্লাহর বিধানের মধ্যে পার্থক্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন– "وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ" অর্থাৎ "চন্দ্র ও সূর্য একটা হিসেবের অনুসরণে বাধ্য।" আলোচ্য আয়াতের মূলবক্তব্য হচ্ছে– এ পৃথিবীতে সময়, দিন, তারিখ ফসল ও মৌসুমের হিসাব তথা বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহের গতি ও কিরণরশ্মির ভিত্তিতে চলছে। পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহের চলাচল ও পরিভ্রমণের আলোকে চলছে। মানব জীবনের সকল কাজকর্ম এদের উপরই নির্ভর করে। দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন, মাস ও বছর এদের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও বিভিন্ন কক্ষপথ অতিক্রম করে যাওয়ার যে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হয় না; এটা এমন অটল বিধান যা লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে কোনোরূপ ব্যতিক্রম হয়নি। এতো পরিভ্রমণের ফলে চন্দ্র ও সূর্যের কোনোই ক্ষয় হয়নি। সৃষ্টির শুরু হতে অদ্যাবধি এরা নিজ নিজ কর্ম যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এরা নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যেতে থাকবে। কখনো এগুলোর কোনোরূপ মেরামতের প্রয়োজন হবে না। এটাই আল্লাহর ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মানব আবিষ্কৃত বস্তু হতে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হতবুদ্ধি করে রেখেছে। তবে আল্লাহর সৃষ্টি ও মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে এ বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মানুষের আবিষ্কৃত বস্তু যতোই মজবুত হোক না কেন কিছু দিন সার্ভিস দেওয়ার পর তাতে মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর মেরামত করার সময় তা অকেজো হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের কোনোই খুঁত নেই এবং থাকবেও না। এটাই আল্লাহর বিধান ও মানুষের অর্জিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য।

بِحُسْبَانٍ-এর তাফসীরে بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর তাফসীর بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, بِحُسْبَانٍ শব্দটি مُفْرَدْ বা একক যা এখানে حِسَابٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপভাবে كُفْرَانٌ - رُجْحَانٌ ইত্যাদি মুফরাদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা ব্যতীত حُسْبَانٌ শব্দটি حِسَابٌ শব্দের বহুবচনও হতে পারে। যথা- شِهَابٌ শব্দের বহুবচন হলো- شُهْبَانٌ এবং رَغِيفٌ শব্দের বহুবচন হলো رُغْفَانٌ মাস ও মৌসুমের দিক বিবেচনা করে চাঁদ ও সূর্য উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে এর নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের সাথে স্তরসমূহ ও রাশিগুলো অতিক্রম করতে থাকে। এ কথার প্রতি ইমাম মহল্লী (র.) بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ : আয়াতে اَلنَّجْمُ শব্দটির দ্বারা এখানে শ্যামলা বা তৃণলতা উদ্দেশ্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এখানে نَجْم শব্দ দ্বারা তৃণলতা এবং যে গাছের কাণ্ড হয় না, এমন গাছ বুঝানো হয়েছে। কেননা এ শব্দটির পর اَلشَّجَرُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর شَجَرٌ বলা হয় কাণ্ডযুক্ত বৃক্ষরাজিকে। কাজেই এখানে نَجْم দ্বারা কাণ্ডবিহীন বৃক্ষ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজি ও ভূমণ্ডলের বৃক্ষরাজি প্রণিপাত করছে। এতদুভয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যা উদ্দেশ্য, তারা তাই সমাধা করে আসছে। আর এ অর্থের প্রতি يَسْجُدَانِ শব্দটিও পূর্ববর্তী আয়াত ..... اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ইঙ্গিত পোষণ করে। পক্ষান্তরে এখানে কাণ্ডবিহীন গাছ উদ্দেশ্য হওয়া অধিক শোভনীয়; যাতে আয়াতের পূর্বাপর সামঞ্জস্যতা, পারস্পরিক সংযোগ এবং সাম্যতা রক্ষা পায়। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)-এর মতটিও যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেন, ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ের বিচারে দ্বিতীয় অর্থ তথা আকাশমণ্ডলের তারকা-নক্ষত্র অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা এ শব্দটির প্রচলিত ও সর্বজন জ্ঞাত অর্থ এটাই। আর সূর্য ও চন্দ্রের পর নক্ষত্ররাজির উল্লেখ খুব স্বাভাবিক, সামঞ্জস্যতা সহকারেই হয়েছে বলতে হবে। সূরা হজ্জেও নক্ষত্রসমূহ ও গাছপালার সিজদায় অবনত হওয়ার কথা বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -[ইবনে কাসীর]

অতএব আয়াতের মর্মার্থ হবে- "নভোমণ্ডলের তারকাপুঞ্জ আর পৃথিবী বক্ষের বৃক্ষরাজি সবকিছুই মহান আল্লাহর অনুগত, তাঁর নিকট বিনীত ও তাঁর আইন-বিধান পালনকারী।"

'সিজদার' প্রকৃত অর্থ হলো- 'মাটির উপর মুখমণ্ডল রেখে সম্মান প্রদর্শন করা, কিন্তু এখানে রূপক অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তারকাপুঞ্জ ও গাছপালা কোনো নড়াচড়া বা মস্তক অবনত না করে নিজ নিজ স্থানে স্থির থেকে আল্লাহর সিজদায় রয়েছে। অতএব আয়াতে 'সিজদা' রূপকভাবে বলা হয়েছে। এটা ছাড়াও সূরা হজ্জে রয়েছে-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ .... وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ "তুমি কি এটা দেখ না? আল্লাহর সমীপে সকলেই মস্তক অবনত করছে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে এবং সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও পর্বতমালা এবং বৃক্ষরাজি, আর সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও।" কাজেই এখানে 'সিজদার' উদ্দেশ্যগত অর্থ "আনুগত্য প্রকাশ করা" গ্রহণ করা হয়েছে। সকল বস্তু স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশ করে। সৃষ্টি জগতের এ বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সিজদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

-[তাফসীরে কবীর, বয়ানুল কুরআন]

اَلْمِيْزَانُ শব্দটি তিনবার বলার তাৎপর্য : اَلْمِيْزَانُ শব্দটি তিনটি আয়াতে তিনবার ধারাবাহিক উল্লেখ করার তাৎপর্য হচ্ছে- প্রথম আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দের অর্থ- দাঁড়ি-পাল্লা। কেননা 'মীজান' তথা দাঁড়ি-পাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচার। তাফসীরকারগণ এখানে মীজানের অর্থ করেছেন 'সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা'। আর 'মীজান' প্রতিষ্ঠিত করেছেন -এর অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলাও বিশ্বলোকের এ সমগ্র ব্যবস্থাটিকে পরম সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর দ্বিতীয় আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দে مَعْنَى الْمَصْدَر অর্থাৎ اَلْوَزْنُ উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- 'আল্লাহ মীজান বা মাপযন্ত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশি করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও; যা পরস্পর বিরোধের কারণ হবে। অথবা اَلْعَدْلُ ইনসাফ বা ন্যায়বিচার উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা মাপযন্ত্র নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা ন্যায় বিচারে কম-বেশি করে জুলুম করতে না পার। অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজ নিজ অধিকার প্রদান করতে পার।

আর তৃতীয় আয়াতে- اَلْمِيْزَانُ অর্থ হলো اَلْمَوْزُوْنُ তথা ওজনকৃত বস্তু। এমতাবস্থায় তিন আয়াতের অর্থ হবে- 'আল্লাহ মাপযন্ত্র নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে ওজনে কমবেশি করে জুলুম না করতে পার। ইনসাফ সহকারে মীজান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনকৃত বস্তুকে কম করিও না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, "اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ" আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দের স্থলে

اَلْوَزْنَ শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না? উত্তরে বলতে পারি যে, اَلْوَزْنَ শব্দটি مُتَعَدِّىْ সুতরাং اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ এটাই। আয়াতের অর্থ হবে যে, "অন্যের কিছু ওজন করার সময় যেন কম ওজন না কর।" এমতাবস্থায় এর বিপরীত অর্থ হবে নিজের বেলায় কম ওজন করতে পারবে– এটা কখনো হতে পারে না। কেননা ইসলাম একমাত্র শোষণমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। এটা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দটি ব্যবহার হওয়ার কারণে নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অন্যকেও ক্ষতির দিকে ঠেলে দেবে না।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ : আল্লাহর বাণী– "وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ" অর্থাৎ পৃথিবীকে "আনাম" এর জন্য বানিয়েছেন। আয়াতে বর্ণিত اَلْاَنَامِ শব্দের অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকুল। তাতে মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু, জীবন্ত সৃষ্টি শামিল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– اَلْاَنَامُ বলতে এমন সব জিনিস বুঝায় যাতে প্রাণ আছে। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিকুল। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, সমস্ত জীবন্ত সত্তাই اَلْاَنَامُ -এর অন্তর্ভুক্ত। হাসান বসরী (র.) বলেন, মানুষ জিন উভয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। যাহহাক (র.) বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই اَنَامٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে আয়াতটির বক্তব্য হলো, আল্লাহ পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, এটা বিচিত্র ধরনের জীব-জন্তু ও জীবন্ত সৃষ্টির জন্য বসবাস করার ও জীবন-যাপন করার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু পৃথিবী নিজ ক্ষমতা বলে ও স্ব-ইচ্ছাক্রমে এরূপ হয়ে যায়নি, সৃষ্টিকর্তা এটাকে এরূপ বানিয়েছেন বলেই এরূপ হয়েছে। তিনি স্বীয় সৃষ্টি-কৌশলের দরুনই এটাকে এমনভাবে সংস্থাপিত করেছেন এবং এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যার ফলে এখানে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাস ও জীবন-যাপন সম্ভবপর হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ الخ : **আয়াতে ফলের কথা আগে বর্ণনা করার হিকমত :** আল্লাহ তা'আলার বাণী– "فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ" দুটি আয়াতে আল্লাহ প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু ফলের আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি প্রধান খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সু-স্বাদু ফলের আলোচনা করেছেন।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এটার হিকমত হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা প্রথমত ছোটখাটো বস্তুর উল্লেখ করে পরবর্তীতে বড় বড় বস্তুর আলোচনা করেছেন। এটা একটি সৌন্দর্যময় সংযোজন। আরবি পরিভাষায় একে "بَابُ الْاِبْتِدَاءِ بِالْاَدْنٰى وَالْاِرْتِفَاعِ بِالْاَعْلٰى" বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের চাহিদার ক্ষেত্র খেজুরের চেয়ে নিম্নস্তরের। আর খেজুর দানার চেয়ে নিম্নস্তরের বলেই আল্লাহ প্রথমত ফল অতঃপর খেজুর এবং সর্বশেষ দানার উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে কবীর]

আয়াতদ্বয়ের শব্দসমূহের অর্থ : আয়াতে اَلْاَكْمَامُ শব্দটি বহুবচন। তার একবচনে كَمٌّ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– গিলাফ বা খোসা। আর অভিধানে গম, সরিষা ইত্যাদির ভূষিকে اَلْعَصْفُ বলা হয়। এখানে ذُوالْعَصْفِ -এর অর্থ তৃণলতা বা ঘাস উদ্দেশ্য। আল্লামা বায়যাভী (র.)-এর মতানুসারে اَلْعَصْفُ হলো শুকনো ঘাসের চূর্ণপাতা এবং اَلرَّيْحَانُ -এর অর্থ– সুগন্ধি। আল্লাহ তা'আলা মাটি হতে উৎপন্ন বৃক্ষ হতে হরেক রকমের সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো সময় اَلرَّيْحَانُ শব্দটি রিজিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয়– "خَرَجْتُ لِطَلَبِ رَيْحَانِ اللّٰهِ" আমি বের হলাম আল্লাহর রিজিক অন্বেষণে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اَلرَّيْحَانُ শব্দের তাফসীরে এ অর্থই করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

فَاكِهَةٌ শব্দটি নাকেরা ও اَلنَّخْلُ শব্দ মা'রিফা হওয়ার রহস্য : "فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ" আয়াতে فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা এবং اَلنَّخْلُ -কে মা'রিফা নেওয়ার রহস্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ–

* اَلنَّخْلُ বা খেজুর গরম প্রধান দেশে অধিক ফলন দেয় এবং তা কোনো কোনো মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়। মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় শুধু খেজুরের উপরেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর প্রতিটি যুগ ও সময়ে মানুষ প্রধান খাদ্যের জন্য মুখাপেক্ষী। আর এ কারণে তা সবার নিকট পরিচিত থাকে। তাই اَلنَّخْلُ -কে মা'রেফা আনা হয়েছে। আর ফল-ফলাদি সর্বদা সর্বত্র পাওয়া যায় না। তাই তা মানুষের নিকট অপরিচিত বিধায় فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।
* اَلنَّخْلُ বা খেজুর এককভাবে আল্লাহর এক মহা নিয়ামত যার সাথে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে فَاكِهَةٌ সুস্বাদু খাবার, যা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেগুলো গণনা করা কঠিন। এ কারণে اَلنَّخْلُ -কে মারেফা এবং فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ : فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতে اٰلَاۤء শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- নিয়ামত, দান, অবদান ইত্যাদি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। আর এ অর্থটি যথার্থ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী ﷺ -এর এ বাণী- পবিত্র কুরআনে বারবার ব্যবহৃত এ প্রশ্নের জবাবে জিনেরা বলত- "لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তোমার নেয়ামতসমূহের কোনো একটিকেও আমরা মিথ্যারোপ করি না। কাজেই সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। এটা ছাড়াও اٰلَاۤء শব্দটির আরো দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. কুদরত বা কুদরতের পূর্ণতা। ইবনে যায়েদ (র.) বলেন- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا -এর অর্থ فَبِاَيِّ قُدْرَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ "আল্লাহর কোন কুদরতটিকে......." ইবনে জারীরের মতেও اٰلَاۤء শব্দটির এরূপ অর্থ হবে। -[তাবারী]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াতসমূহ নিয়ামত বর্ণনার জন্য নয় এবং এর দ্বারা কুদরত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

২. সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য, উত্তম পছন্দসই গুণাবলি পরিপূর্ণতা ও বাড়তি গুণাবলি। এ অর্থ মুফাসসিরগণ গ্রহণ করেননি।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : এ আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথা-

১. মানুষ ও জিনকে এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে-

ক. আনাম জিন ও মানুষের নাম। আল আনাম শব্দের দ্বারা যে জাতিকে বুঝানো হয়েছে তার প্রতি যমীরে খেতাব ফিরবে।

খ. 'আনাম' মানুষের নাম আর তাতে শামিল থাকবে জিন। কাজেই যমীরটি اَلْمَنْوِيُّ -এর প্রতি ফিরবে।

গ. মুখাতাব কে বা কারা তা নিয়তে আছে, শব্দে নেই।

২. এ আয়াতে মানুষের মধ্যকার নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং খেতাবের যমীর তাদের উভয়ের দিকে ফিরবে।

৩. উপরিউক্ত আয়াতকে কোনো কোনো কেরাতে "فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تُكَذِّبُ" পড়া হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা শুধু মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৪. উক্ত আয়াতে সব প্রাণীকেই মূলত সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু শব্দে মাত্র দু'জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. তাকযীব অর্থাৎ মিথ্যারোপ করা কখনো শুধু অন্তর আবার কখনো শুধু মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অন্তর ও মুখকে সম্বোধন করে تُكَذِّبَانِ বলেছেন।

৬. মুকাযযিব বা মিথ্যা আরোপকারী দু'ধরনের। যথা- ১. নবীকে মিথ্যা আরোপকারী এবং ২. কুরআনের মিথ্যারোপকারী। এ দু'ধরনের মিথ্যাবাদীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৭. মুকাযযিব কখনো কার্যের দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে, আবার কখনো মিথ্যার নীতি তার অন্তরে গ্রথিত থাকে। এ দু'ধরনের মিথ্যারোপকারীকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মূলকথা হলো উপরোল্লিখিত আলোচনাগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে আয়াতে শুধুমাত্র জিন ও মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর]

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ আয়াতটির পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা "فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ" আয়াতটি এ সূরায় একত্রিশবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো করে জানেন।

তবে তাফসীরকারদের এ বিষয়ে মূল বক্তব্য হচ্ছে- দু'টি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটির বার বার উল্লেখ করেছেন। একটি হলো তাঁর নিয়ামত ও অবদানসমূহের ধারণা শ্রোতাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর অপরটি হলো তাঁর নিয়ামত ও অবদান সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। -[ফতূহাতে ইলাহিয়া, খাযিন]

গণনা করে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ শেষ করা যায় না। যদি কুরআনে কারীমে তার গণনা করা হতো তাহলে বিশাল গ্রন্থে রূপায়িত হতো। অথচ তাঁর নিয়ামতের স্মরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা এ কারণে এ সূরায় তাঁর কতগুলো নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন এবং তার পরপরই প্রশ্ন করেছেন- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে"? যেমন অনুগ্রহকারী অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যখন সে অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়- তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, তোমাকে আমিই তো বিত্তবান বানিয়েছি? তুমি কি বস্ত্রহীন ছিলে না, তোমাকে আমিই তো বস্ত্র পরিধান করিয়েছি? তা তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে? তুমি কি সহায়হীন ছিলে না, আমিই তো তোমাকে সহায়তা দিয়েছি? আমার এ অবদানের কথা তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে? আরবি ভাষায় এ জাতীয় অনেক প্রথা প্রচলিত আছে।

এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের উপর প্রমাণ হিসেবে মানুষ সৃষ্টির কথা এবং তাদের বাকশক্তি দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রতি দানকৃত নিয়ামতসমূহ যেমন আসমান ও পৃথিবী আর চন্দ্র-সূর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে?।

-[ফতূহাতে ইলাহিয়া, খাযিন]

অথবা এ আয়াত দ্বারা জিন ও মানুষের মধ্য হতে যারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা ভোগ করেও শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাদের এহেন কার্যকলাপ ও নীতির তিরস্কার করা হয়েছে। -[ফতূহাতে ইলাহিয়া]

সারকথা হলো- আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষ ও জিনকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই উপরিউক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

কুরআন মাজিদে মানুষ সৃষ্টির উপাদান :

١. كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (اٰلِ عِمْرَانَ - ٥٩)

٢. بَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (اَلسَّجْدَةُ - ٧)

٣. اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ (اَلصّٰفّٰتُ - ١١)

٤. اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ (ص ٧٢-٧١)

٥. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً (اَلنِّسَآءُ - ١٠)

٦. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّآءٍ (اَلسَّجْدَةُ - ٥-٨)

٧. فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ (اَلْحَجُّ - ٥)

প্রকৃত পক্ষে উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার ধারাবাহিক বিন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মাটিরও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়গুলোতে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে মানুষ সৃষ্টির উপাদান বর্ণনা করা হয়েছে। -[জালালাইন]

জিন সৃষ্টির উপাদান : আল্লাহর বাণী- "وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ" অর্থাৎ জিনদেরকে আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি করেছেন। আয়াতে "نَارٌ" শব্দ কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে যে আগুন হয় তা নয়; বরং এক বিশেষ ধরনের আগুন বুঝানো হয়েছে। আর مَارِجٌ অর্থ শুধু আগুনের স্ফুলিঙ্গ যার সাথে ধোঁয়া নেই। এর তাৎপর্য হলো, প্রথম জিনকে নিছক আগুনের স্ফুলিঙ্গ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে তারই সন্তানাদির সাহায্যে তার বংশধারা চলেছে। এ প্রথম জিন, সমগ্র জিন-জাতির জন্য আদি জিন। যেমন- হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির জন্য আদি মানব। জীবন্ত মানুষ হওয়ার পর তিনিও তাঁর বংশোদ্ভূত মানুষের মাটির অংশ হতে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দেহের কোনো সরাসরি সাদৃশ্য সেই মাটির সাথে থাকল না।

পূর্ণাঙ্গ দেহ মাটির অংশ হতে গঠিত হলেও এখন অস্থি, চর্ম, মাংস ও রক্তের রূপ ধারণ করেছে। আর এতে প্রাণের সঞ্চার হওয়ার পর সেই মাটির স্তূপটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম জিনিস হয়ে গেছে। জিনদের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। তাদের মূলসত্তা এক অগ্নিময় সত্তা; নিছক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নয়। তারা বিশেষ ধরনের বস্তুগত দেহসত্তাসম্পন্ন।

মানুষকে মাটির দিকে এবং জিনকে আগুনের দিকে সম্বোধন কেন করা হলো : মানব ও জিন সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে- মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস। তথাপিও পবিত্র কুরআনে মানবসৃষ্টির উপাদান মাটি এবং জিন সৃষ্টির উপাদান আগুন কেন বলা হলো?

এর উত্তরে তাফসীরে জালালাইনের গ্রন্থকার বলেন যে, মানুষ ও জিন সৃষ্টির মূল উপাদান যদিও মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস; কিন্তু মানুষের সৃষ্টিতে মাটির ব্যবহার অধিক হওয়ায় মানুষের সৃষ্টিকে মাটির দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর জিনদের সৃষ্টিতে আগুনের সর্বাধিক ব্যবহার হওয়ায় জিনের সৃষ্টিকে আগুনের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

مَغْرِبَيْنِ ও مَشْرِقَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ শব্দদ্বয় দ্বারা শীত ও গ্রীষ্মকালীন উদয়াচল ও অস্তাচল উদ্দেশ্য। কারণ শীতকালে সূর্য যে স্থান হতে উদিত হয় এবং যে স্থানে অস্ত যায়, গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান তাতে থাকে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য প্রায় মাথার উপর দিয়ে যায়। কিন্তু শীতকালে তা দক্ষিণ আকাশে একটু সরে যায়। ২১ শে মার্চ তারিখে সূর্য ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়। তার পর হতে ক্রমশঃ ২১ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়। এর পর ২২ শে

ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে উদিত হয়। ২২ শে ডিসেম্বরের পর সূর্য আবার উত্তরদিকে সরে উদিত হয়ে থাকে। আর ঠিক অস্তমিত হওয়ার ব্যাপারটিও অনুরূপ। আর এই এক সময় এক এক স্থানে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলকে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় কোথাও مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ আবার কোথাও مَشَارِقُ এবং مَغَارِبُ হয়েছে। অতএব مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ দ্বারা مُفَصَّلَيْنِ ও مَوْسِمَيْنِ উদ্দেশ্য এবং ঋতুর এই পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। আর পূর্বাপর সকল আয়াতে যেহেতু দুই দুটি নিয়ামত তথা বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করা হয়েছে, তাদের সাথে نَظْمٌ ও سِلْسِلَة সঠিক রাখার জন্য এ আয়াতের শ্রুতিমাধুর্যের জন্য এখানেও مَشْرِقٌ -এর স্থলে مَشْرِقَيْنِ এবং مَغْرِبٌ -এর স্থলে مَغْرِبَيْنِ বলা হয়েছে। অন্যথা مَشْرِقٌ একটি এবং مَغْرِبٌ -ও একটি।

قَوْلُهُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ অর্থাৎ দুটি সমুদ্রকে আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করেছেন, যেগুলো পাশাপাশি অবস্থান করছে। কারো মতে يَلْتَقِيَانِ সমুদ্র দুটির দুপার্শ্ব দিয়ে মিলিত হওয়ার কারণে বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– بَحْرَيْنِ দ্বারা আসমান ও জমিনের দুটি সমুদ্রকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পারস্য ও রোমের সমুদ্রকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন– بَحْرَيْنِ দ্বারা মিঠা ও লোনা এই দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য। আয়াতে যে দুটি সমুদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পরস্পর মিশ্রিত না হওয়ার কথা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার এ অপার শক্তি বা কুদরত প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে– "بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ" অর্থাৎ উভয় সমুদ্রের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না। সারকথা হলো লবণাক্ত এবং মিঠাস্রোতে সম্মিলিত হলেও আল্লাহর অপার কুদরতে উভয় পৃথক পৃথক থাকে।

قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ : আল্লাহর বাণী– "يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ" অর্থাৎ দুই সমুদ্র সংক্রান্ত অপর নিয়ামত এই যে, এতদুভয়ের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়ে থাকে। মুক্তা এবং প্রবাল রত্নের উপকারিতা এবং নিয়ামত হওয়া প্রকাশ্য ব্যাপার। আর যারা লবণাক্ত সমুদ্র হতে তাদের আবির্ভাব হওয়া নির্দিষ্ট বলে মত প্রকাশ করেন তাদের নিকট অর্থ এই হবে যে, উক্ত দুটি সমুদ্রের সমষ্টি হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়ে থাকে। কেননা উক্ত সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে এক হয়ে গিয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন]

আয়াতে উল্লিখিত لُؤْلُؤٌ ছোট ছোট মুক্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আর مَرْجَانٌ বলতে ছোট বড় সব ধরনের মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন– لُؤْلُؤٌ হলো বড় বড় মুক্তা আর مَرْجَانٌ হলো ছোট ছোট মুক্তা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– مَرْجَانٌ হলো লাল পাথর। মুক্তা ও প্রবাল রত্ন বের হওয়ার জন্য লোনা এবং মিঠা সমুদ্রের সঙ্গম শর্ত নয়; বরং বিভিন্ন স্থান হতে মুক্তা ও প্রবালরত্ন বের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এটাও একটি। এটা ছাড়া আরেকটি অভিনব গুণ হচ্ছে এখানে লোনা এবং মিঠা পানির সমুদ্রও একসঙ্গে মিলিত রয়েছে। মিঠা পানি বিশিষ্ট সমুদ্রের প্রবাহিত হয়ে পানি লোনা সমুদ্রে পতিত হলে তা হতে মুক্তা বের করে নেওয়া যায়। এজন্য লোনা সমুদ্রকে মুক্তার উৎস বলা হয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র হতে মুক্তা বের হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুক্তা ভারত ও পারস্য উপসাগরে জন্মে আর মারজান বৃক্ষের ন্যায় সমুদ্রে অংকুরিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ : আল্লাহ বলেন, আরো একটি নিয়ামত এই যে, আল্লাহর আয়ত্তে ও ইচ্ছায় রয়েছে জাহাজসমূহ যা দৃষ্টিপথে সমুদ্রের মধ্যে পর্বতমালার ন্যায় সুউচ্চ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উল্লিখিত কথার মর্মার্থ এই যে, নৌকা, স্টীমার ইত্যাদি যদিও মানুষের তৈরি, সমুদ্রের বুক চিরে যদিও মানুষ তা পরিচালনা করে, তবুও ভুল বুঝতে নেই। মানুষ, মানুষের এই সৃষ্টি বুদ্ধি, পরিচালনার ক্ষমতা, সাগর এবং সাগরের পানি ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহর তৈরি, আল্লাহর দান। অতএব সমুদ্রগর্ভের মণিমুক্তা, সমুদ্রের উপরের যানবাহন সকলই যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দান, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। اَلْجَوَارُ জাহাজের নাম কিংবা তার গুণ বিশেষ, তা সাগরে চলে বেড়ায় এবং এ উদ্দেশ্যেই তাকে নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য তাকে جَارِيَةٌ বলা হয়।

অনুবাদ :

٢٦. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا اَىِ الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ فَانٍ لا هَالِكٍ وَعُبِّرَ بِمَنْ تَغْلِيْبًا لِلْعُقَلَاءِ .

২৬. যত কিছু আছে অর্থাৎ প্রাণীর মধ্য হতে ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত ধ্বংসশীল। নশ্বর। "مَنْ" টি বিবেকবানদের প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

٢٧. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذَاتُهٗ ذُو الْجَلَالِ الْعَظْمَةِ وَالْاِكْرَامِ ج لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنْعُمِهٖ عَلَيْهِمْ .

২৭. আর আপনার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে যিনি মহিমাময় মহত্ত্বের অধিকারী এবং দয়ারও অধিকারী ঈমানদারদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত দ্বারা দয়া করে থাকেন।

٢٨. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২৮. [সুতরাং হে জিন ও মানবজাতি! এত অফুরন্ত ও মহান নিয়ামত সত্ত্বেও] তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٢٩. يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ بِنُطْقٍ اَوْ حَالٍ مَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالرِّزْقِ وَالْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَقْتٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ج اَمْرٍ يُظْهِرُهٗ فِى الْعَالَمِ عَلٰى وَفْقِ مَا قَدَّرَهٗ فِى الْاَزَلِ مِنْ اِحْيَاءٍ وَاِمَاتَةٍ وَاِعْزَازٍ وَاِذْلَالٍ وَاِغْنَاءٍ وَاِعْدَامٍ وَاِجَابَةِ دَاعٍ وَاِعْطَاءِ سَائِلٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

২৯. আকাশসমূহ এবং জমিনের অধিবাসীগণ সকলেই তাঁর সমীপে প্রার্থী হয়। অর্থাৎ প্রকাশ্য কথা বা অবস্থার দ্বারা ইবাদতের উপর সামর্থ্য রিজিক ও মাগফেরাত ইত্যাদি যা কিছুর প্রতি তারা মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সময় কোনো না কোনো কাজে রত পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সৃষ্টির প্রারম্ভে স্থিরীকৃত আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে, আর তা হলো জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া, সম্মানিত করা, অপমানিত করা, ধনী করা, নির্ধন করা, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা এবং সাহায্যপ্রার্থীকে দান করা ইত্যাদি পার্থিব দয়া।

٣٠. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৩০. অতএব [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٣١. سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنَقْصُدُ لِحِسَابِكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ج الْاِنْسُ وَالْجِنُّ .

৩১. অচিরেই আমি তোমাদের জন্য অবসর লাভ করব শীঘ্রই তোমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার প্রতি মনোযোগ দেব। হে জিন ও মানব সম্প্রদায়!

٣٢. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৩২. সুতরাং [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٣. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا تَخْرُجُوْا مِنْ اَقْطَارِ نَوَاحِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط اَمْرُ تَعْجِيْزٍ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ج بِقُوَّةٍ وَلَا قُوَّةَ لَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৩. হে জিন ও মানবের দল! যদি তোমরা সামর্থবান হও যে, তোমরা অতিক্রম করবে বের হয়ে যাবে সীমা হতে প্রান্ত হতে আসমান ও জমিনের তবে, তোমরা বের হয়ে যাও। এ আদেশ تَعْجِيْز তথা অক্ষম করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। [কিন্তু] সামর্থ্য ব্যতীত অতিক্রম করতে কিংবা বের করতে পারবে না শক্তির সাহায্যে। আর তোমাদের এটা করার কোনো শক্তি নেই।

٣٤. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৩৪. অতএব, [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٥. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لا هُوَ لَهَبُهَا الْخَالِصُ مِنَ الدُّخَانِ اَوْ مَعَهُ وَنُحَاسٌ اَىْ دُخَانٌ لَا لَهَبَ فِيْهِ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ج تَمْتَنِعَانِ مِنْ ذٰلِكَ بَلْ يَسُوْقُكُمْ اِلَى الْمَحْشَرِ .

৩৫. তোমাদের উভয় জাতির উপর অগ্নিশিখা প্রেরিত হবে, ধোঁয়াযুক্ত অগ্নিশিখা এবং ধুম্র অর্থাৎ শিখাহীন ধোঁয়া, তখন তোমরা তা অপসারণ করতে পারবে না তা প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে পারবে না; বরং তা তোমাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

٣٦. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৩৬. অতএব [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -এর মধ্যে هَا সর্বনামটির মারজি' হলো اِسْم আর مَنْ যা مَوْصُوْل তা দ্বারা اَلْاَرْض তথা ভূ-পৃষ্ঠের সকল বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ كُلُّ مَنْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। اَلْاَرْض শব্দটি مُؤَنَّثْ سِمَاعِىْ এ কারণে তার যমীরটি مؤنث হয়েছে।

قَوْلُهُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ : আ'মাশ ও ইবরাহীম سَنَفْرُغُ শব্দের ن অক্ষরের স্থলে ى অক্ষর ধরে তার উপর ضَمَّة এবং ر অক্ষরের উপর فَتْحَة দিয়ে سَيَفْرَغُ পড়েছেন। ইবনে শিহাব سَنَفْرَغُ শব্দের ر ও ن অক্ষরে فَتْحَة দিয়ে سَنَفْرَغُ পড়েছেন। কেসায়ী (র.) বলেছেন- এটা বনূ তামীম গোত্রের ভাষা। আবূ আমের سَنَفْرَغُ শব্দের ن অক্ষরের পরিবর্তে ى ধরে তাও ر অক্ষরের উপর فَتْحَة দিয়ে পড়েছেন سَيَفْرَغُ শব্দটি হামযা ও কেসায়ী (র.) ى দ্বারা পড়েছেন। অন্যান্য সকল ক্বারীগণ سَنَفْرُغُ পড়েছেন।

قَوْلُهُ اَيُّهَا : اَيُّهَا শব্দের ه অক্ষরে ضَمَّة দিয়ে উবাই اَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ পড়েছেন। আর অন্যান্য সব ক্বারীগণ اَيُّهَا শব্দের ه অক্ষরে فَتْحَة দিয়ে اَيُّهَا الثَّقَلٰنِ পড়েছেন।

قَوْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ : كُلَّ يَوْمٍ অংশটি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে পূর্ববর্তী يَسْئَلُهُ -এর ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب ; আর এখানে يَوْم দ্বারা দিন উদ্দেশ্য নয়, বরং সময়কে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ : يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ অংশটি جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ ; যার কোনো مَحَلِّ اِعْرَابْ নেই। অথবা مِنْ وَجْهٍ হাল হয়েছে। তার মধ্যে عَامِلْ হবে يَبْقٰى ক্রিয়াপদ। مَسْئُوْلًا مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আকাশ ও জমিনের অধিবাসীদের হতে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় তিনি বিরাজমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ الخ : আর ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত প্রাণী অবস্থিত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একমাত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।" যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিকারী। যেহেতু উভয় জাতি তথা জিন ও মানবজাতিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। কারণ তারা পৃথিবীর অধিবাসী, সেহেতু ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কেবল পৃথিবীবাসীর উল্লেখ হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাঁর ব্যক্তিগত গুণ এবং অপরটি অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মহৎ হয়েও নিজের বান্দার প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া করে থাকেন। যেহেতু বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণ, যা পারলৌকিক নিয়ামতও বটে, সুতরাং অন্যান্য নিয়ামতের ন্যায় এ নিয়ামতটির অনুগ্রহও

প্রদর্শন করেছেন। আয়াতে جَلَالْ গুণ দ্বারা সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করা এবং কাফেরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে وَعِيْد বা সাবধান করা হয়েছে। আর اِكْرَامْ গুণ দ্বারা ঈমানদার লোকদেরকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আর আয়াতে বর্ণিত "وَجْهُ رَبِّكَ" -এর তাৎপর্য এই যে, নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে মানব ও জিন জাতিকে অবহিত করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত করার অর্থ হলো উভয় জাতিকে প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এই প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ رَبّ শব্দের সাথেই সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং তিনি وَجْهُ رَبِّكَ বলেছেন। আর যেখানে ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য, সেখানে وَجْهُ اللّٰهِ বলা হয়েছেন। আর وَجْه শব্দটি مُتَشَابِهَاتْ -এর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার এরূপ যে, তার আভিধানিক অর্থ জানা থাকা সত্ত্বেও যার মর্মার্থ আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। এ জাতীয় مُتَشَابِهَاتْ -এর ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। তাই এ শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন– مَا يَلِيْقُ بِشَانِهٖ অর্থাৎ وَجْه এমন সত্তা যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য। কারো মতে-এর অর্থ جِهَةْ আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর জাত ও সত্তা। উল্লেখ যে, এই অর্থটিই প্রসিদ্ধ।

قَوْلُهُ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আসমান ও জমিনের যেখানেই যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহর মুহতাজ, আল্লাহর কাছেই সকলের আবেদন-নিবেদন এবং বিনীত প্রার্থনা। তবে কিসের জন্য প্রার্থনা করে? তার উল্লেখ নেই।

আল্লামা রাযী (র.) বলেন, তাদের বিনীত প্রার্থনা দুটি বিষয়ে হতে পারে। যথা– ১. আসমান ও জমিনে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট নিজের জন্য শক্তি-ক্ষমতা ও তাওফীক কামনার মাধ্যমে দোয়া করে থাকে। তারা আল্লাহর রহমত এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যেই শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করে। ২. আসমান ও জমিনের প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট ইলম প্রত্যাশা করে প্রার্থনা করে। তিনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। তিনি ছাড়া কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, আর জগদ্বাসীদের নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনাও প্রকাশ্য ব্যাপার, আর আসমানে বসবাসকারীদের যদিও পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রহমত এবং অনুগ্রহের প্রয়োজন তো অবশ্যই রয়েছে।

قَوْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ : এর অর্থ হলো, আসমান-জমিনের সবকিছুরই প্রার্থনা আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। মর্মার্থ এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর নিকট নিজেদের আবেদন-নিবেদন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আবেদন পেশ করা ও তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই كُلَّ يَوْم -এর সাথে هُوَ فِيْ شَاْنٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সব সময়ই আল্লাহর স্বতন্ত্র কাজ, নিত্যনতুন সাজ, কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ জন্মেছে, কেউ পীড়িত হয়েছে, কেউ আরোগ্য লাভ করেছে, কেউ উন্নতি করছে, আবার কারো পতন হচ্ছে। আল্লাহর নির্দেশেই এ সব ঘটছে। তাই তিনি নিত্যনতুনরূপে, নব নব সাজে বিরাজ করছেন।

এর অর্থ এই নয় যে, কার্য করা তাঁর সত্তার অপরিহার্য কর্ম উদ্দেশ্য। অন্যথায় অস্থায়ী কার্যাবলির স্থায়ী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে; বরং মর্মকথা হলো, যত প্রকারের কার্যকলাপ পৃথিবীতে হচ্ছে, সমস্তই আল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। কাজেই এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ বলার আরো একটি উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের কথা প্রত্যাখ্যান করা। তারা বলতো, আল্লাহ শনিবার কোনো কাজ-কর্ম করেন না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) আয়াতে يَوْمٌ বলতে সময়কে বুঝানো হয়েছে; এর অর্থ দিবস নয়। শব্দটি شَاْنٌ -এর জন্য ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلٰنِ : অর্থাৎ হে জিন ও মানব! আমি তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের নিমিত্তে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত লোকদেরকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি এবং অবাধ্যদেরকে সতর্ক করেছেন। سَنَفْرُغُ শব্দটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) سَنَفْرُغُ শব্দের তাফসীরে "سَنَقْصِدُ لِحِسَابِكُمْ" [অর্থাৎ শীঘ্রই আমি তোমাদের কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়ার ইচ্ছা রাখি] বলেছেন। এটা দৃঢ় ইচ্ছা এবং পূর্ণ মনোযোগের অভিব্যক্তি। বস্তুত আল্লাহর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ ইচ্ছা হয়ে থাকে। এখানে প্রকৃত অবসর গ্রহণের অর্থ এজন্য নেওয়া যেতে পারে না যে, তৎপূর্বে এমন লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়, যা অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া হতে বিরত রাখে, অথচ তা আল্লাহর শানের খেলাফ। আর ইমাম কুরতুবী (র.) এর অর্থ করেছেন, শীঘ্রই তোমাদের কৃতকর্ম যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা রাখি।

জিন ও মানুষকে ثَقَلَيْنِ বলার কারণ : ثِقْلٌ শব্দের অর্থ বোঝা। যেহেতু জিন ও ইনসান জীবন-মরণ, সভ্যতা ও অসভ্যতার দিক হতে ভূ-পৃষ্ঠে বোঝা স্বরূপ। সেহেতু এদেরকে ثَقَلَيْنِ বা দুটি বোঝা বলা হয়েছে। আর সকল বস্তু যার পরিমাণ আছে এবং সেই পরিমাণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তা-ই ثَقَلٌ বা বোঝা। ইমাম জাফর সাদেক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরা পাপের বোঝা বহন করে বলে এদেরকে ثَقَلَيْنِ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে– إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ

قَوْلُهُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ الخ : আসমান-জমিনে সর্বত্রই একমাত্র আল্লাহর একাধিপত্য; নিখিলের কেউই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়। জিন ও মানুষ যদি মনে করে, আসমান-জমিনের কোনো গোপন পথে আল্লাহর রাজত্বের বাইরে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তবে তা ভুল, প্রথমত যাবে কোথায়? আল্লাহর ক্ষমতাধীন নয় এমন কোনো জায়গা কি কোথাও আছে? যাবেই বা কেমন করে বিনা সনদে, বিনা পরোয়ানায়, বিনা পাসপোর্টে কি কেউ রাষ্ট্রের বাইরে যেতে পারে? অতএব আল্লাহর কাছ থেকে কি তারা তাঁর রাষ্ট্রের বাইরে যাবার সনদ বা পাসপোর্ট লাভ করেছে; বলাবাহুল্য এই পাসপোর্ট লাভ যেমন সম্ভব নয়, তেমিন কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়, অতএব সাবধান হয়ে যাও।

قَوْلُهُ اَمْرُ تَعْجِيْزٍ : মুফাসসির (র.)-এর উক্তি اَمْرُ تَعْجِيْزٍ -এর অর্থ হলো, আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে যেতে মাখলুকের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রকাশের ও প্রমাণের জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন যে, যদি চাও আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে চলে যাও! কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এমন কি মরণ পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা করলেও তা হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ কথাটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে।

এ আয়াতে اَلْاِنْسُ-এর পূর্বে اَلْجِنَّ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– মানুষ অপেক্ষা জিন জাতি পালিয়ে যাওয়ার অধিক ক্ষমতা রাখে। তারা আকাশে উড়তে পারে। তাই মানবজাতির পূর্বেই জিন জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ الخ : شُوَاظٌ বলা হয় ধোঁয়াবিহীন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে। আর نُحَاسٌ বলা হয় অগ্নিবিহীন ধুম্রকুণ্ডকে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামীদেরকে দুই প্রকারের আজাব দেওয়া হবে। কোথাও ধুম্রবিহীন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধুম্রকুণ্ড দ্বারা আজাব দেওয়া হবে।

অত্র আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা ধরে কোনো কোনো তাফসীরকার এরূপ অর্থ করেছেন, হে জিন ও মানুষ! তোমাদের আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য নেই। যদি তোমরা এ ধরনের কর্ম করার প্রচেষ্টা চালাও, তাহলে তোমরা যে দিকেই পালাতে যাবে, সেই দিকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুণ্ড তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করা হবে এবং তা তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। যার মোকাবিলাও তোমরা করতে পারবে না। এ বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া যেহেতু হেদায়েতের কারণ, সেহেতু এটা একটি মহান নিয়ামত।

অনুবাদ :

৩৭. فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ انْفَرَجَتْ أَبْوَابًا لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَتْ وَرْدَةً أَيْ مِثْلَهَا مُحَمَّرَةً كَالدِّهَانِ كَالْأَدِيمِ الْأَحْمَرِ عَلَى خِلَافِ الْعَهْدِ بِهَا وَجَوَابُ إِذَا فَمَا أَعْظَمَ الْهَوْلَ.

৩৭. অনন্তর যখন আসমান বিদীর্ণ হবে ফেরেশতাগণের অবতরণের জন্য দরজা উন্মুক্ত হবে। তখন তা লালবর্ণ ধারণ করবে। গোলাপের ন্যায় যেন তা রক্ত তেলের ন্যায়। লাল চামড়ার ন্যায়, যা আসল অবস্থার বিপরীত হবে। আর إِذَا -এর جَوَابٌ হলো فَمَا أَعْظَمَ الْهَوْلَ অর্থাৎ বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

৩৮. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

৩৮. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৯. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ. عَنْ ذَنْبِهِ وَيُسْئَلُونَ فِي وَقْتٍ أُخَرَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَالْجَانُّ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي بِمَعْنَى الْجِنِّيِّ وَالْإِنْسُ فِيهِمَا بِمَعْنَى الْإِنْسِيِّ.

৩৯. অনন্তর সেই দিন কোনো মানুষকেও তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না এবং কোনো জিনকেও না। এ দিন ছাড়া অন্য সময়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" [অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করব।] এখানে এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে اَلْجَانُّ শব্দটি জিন অর্থে ও اَلْإِنْسُ শব্দটি মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪০. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

৪০. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৪১. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ أَيْ سَوَادِ الْوُجُوهِ وَزُرْقَةِ الْعُيُونِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ج

৪১. অপরাধীদের তাদের আকৃতি দ্বারা চিনা যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ও নীলবর্ণের চক্ষুযুগল দ্বারা। অনন্তর তাদের মাথার চুল ও পা-সমূহে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৪২. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. أَيْ تُضَمُّ نَاصِيَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى قَدَمَيْهِ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ وَيُلْقَى فِي النَّارِ.

৪২. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের মাথার ঝুঁটি এবং পা পেছন দিক হতে অথবা সম্মুখ দিক হতে একত্র করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

৪৩. وَيُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.

৪৩. এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে– এটাই সেই জাহান্নাম যদ্বিষয়ে অপরাধীরা অসত্য আরোপ করত।

৪৪. يَطُوفُونَ يَسْعَوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ مَاءٍ حَارٍّ آنٍ ج شَدِيدِ الْحَرَارَةِ يُسْقَوْنَهُ إِذَا اسْتَغَاثُوا مِنْ حَرِّ النَّارِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ كَقَاضٍ.

৪৪. তারা ছুটাছুটি করবে দৌড়াদৌড়ি করবে জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে যা অত্যন্ত উত্তপ্ত। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে তারা যখন পানি প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে। آنٍ শব্দটি এ স্থানে قَاضٍ -এর ন্যায় مَنْقُوص

৪৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

৪৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ : لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ আয়াতে উল্লিখিত ه যমীরের مَرْجِعْ উহ্য রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ الْمُجْرِمُ عَنْ ذَنْبِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ অর্থাৎ- উক্ত যমীরের ব্যাখ্যা। جِنْ এবং اِنْسْ

قَوْلُهُ اِذَا انْشَقَّتْ : اِذَا انْشَقَّتْ-এর জবাবটি উহ্য রয়েছে। মূলবাক্যটি হবে- "اِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَمَا اَعْظَمَ الْهَوْلَ" অথবা এরূপ হবে- "اِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتِ الْحَالُ عَسِيْرًا جِدًّا" পরবর্তী বাক্যটি তথা "فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" হলো তার ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ كَالدِّهَانِ : كَالدِّهَانِ শব্দটির তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. كَالدِّهَانِ হলো দ্বিতীয় খবর।

২. এটা وَرْدَةً-এর সিফত।

৩. এটা كَانَتْ-এর حَالٌ-ও হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, دِهَانٌ শব্দটি دَهْنٌ শব্দের جَمْع বা বহুবচন। যেমন- قُرْطٌ শব্দটি قِرَاطٌ-এর বহুবচন এবং رُمْحٌ শব্দটি رِمَاحٌ-এর বহুবচন। এ অভিমতই পোষণ করেছেন হযরত যাহ্হাক ও মুজাহিদ (র.)। তখন আয়াতের অর্থ হবে- "يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ" -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" অর্থাৎ "যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে।"

এ কালামটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ অতঃপর কি হবে তখন, যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে? এটা কিয়ামতের দিনের কথা। আকাশমণ্ডল দীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে নভোমণ্ডলের বন্ধন ঢিলা হয়ে যাওয়া, নভোমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া এবং উর্ধ্বলোকের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। আকাশণ্ডল তখন লাল চামড়ার মতো রক্তিম বর্ণ হয়ে যাবে এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে- সে মহা হুলস্থুলের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী হতে আকাশমণ্ডলের দিকে তাকাবে, সে স্পষ্ট অনুভব করবে, সমস্ত উর্ধ্বজগতে যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

অর্থাৎ আজ তোমরা কিয়ামতকে অসম্ভব ব্যাপার সাব্যস্ত করছ। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ঘটাতে অক্ষম। কিন্তু যখন সে সমস্ত ঘটনাই নিজেদের চোখে সংঘটিত হতে দেখবে, যার সংবাদ আজ তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তখন তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ কুদরতকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ-এর অর্থ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ "প্রত্যেকটি জিনিস যা এ পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল।"

এখানে তিনি নভোমণ্ডলে বসবাসকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন- "فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ" নভোমণ্ডল যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হবার জন্য তা অনেক দরজায় রূপান্তরিত হবে তখন অবস্থা কি হবে?

কথিত আছে যে, এ বাক্যাংশের মর্মার্থ হলো নভোমণ্ডলের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করা। কেননা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এখন এখানে নভোমণ্ডল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। কারো মতে এ আয়াতাংশ দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা তা দ্বারা ধুম্রকুণ্ড ও ধুম্রবিহীন আগুন নিক্ষেপ করার চেয়ে ভয়াবহ একটি বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো নভোমণ্ডলের দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। -[খাযিন]

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ আয়াতের তাশবীহের ব্যাখ্যা : আয়াতে উল্লিখিত তাশবীহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

উল্লিখিত আয়াতে السَّمَاءُ হলো مُشَبَّهٌ - وَرْدَةً كَالدِّهَانِ হলো مُشَبَّهٌ بِهِ - كَ হলো حَرْفُ التَّشْبِيْهِ এবং لَوْنٌ ও دِهَانٌ হলো وَجْهُ التَّشْبِيْهِ ; وَرْدَةٌ অর্থ- রক্তিম বর্ণ। আর دِهَانٌ অর্থ- তেলের গাদ বা লাল চামড়া। অতএব তাশবীহের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে- إِذَا انْفَجَرَتِ السَّمَاءُ فَصَارَتْ كَلَوْنِ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ أَوِ الْمُهْلِ أَوِ الْأَدِيْمِ الْأَحْمَرِ

অর্থাৎ, যখন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন তা রক্তিম বর্ণ অথবা তেলের গাঁদের মতো বা লাল চামড়ার মতো হয়ে যাবে। -[তাফসীরে কাবীর, জালালাইন, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

"فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ" ও "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ" আয়াত দু'টির সামঞ্জস্য : فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ ও জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। পক্ষান্তরে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সব মানুষ ও জিনকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

বাহ্যত যদিও আয়াত দু'টির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও গরমিল দেখা যাচ্ছে; কিন্তু মূলত তাদের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। কেননা আখিরাতের অনেকগুলো স্তর ও স্থান রয়েছে। হতে পারে এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে, সে সময়ে যে স্থানে মানুষ ও জিন অবস্থান করবে, সেখানে তাদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। অতএব "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ" আয়াতের সাথে এ আয়াতের কোনো গরমিল নেই। এছাড়া এ প্রশ্নের আরো একটি জবাব হতে পারে- তা হলো এই যে, আখিরাতে তাদেরকে কোনো প্রশ্নই করার প্রয়োজন নেই। কেননা অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে। অতএব, উল্লিখিত দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনো গরমিল নেই। -[তাফসীরে কাবীর, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

قَوْلُهُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ অর্থাৎ সেদিন কোনো মানুষ ও কোনো জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না।

এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক অমুক গুনাহ করেছ কিনা? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা এবং আল্লাহ তা'আলার আদিজ্ঞানে (اَلْعِلْمُ الْأَزَلِيُّ) পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে; বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কেন তোমরা অমুক অমুক গুনাহ করেছ? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপ তাফসীর করেছেন। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, অপরাধীদের শাস্তি দানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করবে না যে, তোমরা এ গুনাহ করেছ কি না? তাদেরকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কেননা প্রত্যেক গুনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এ চিহ্ন দেখে তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হ্যাঁচড়িয়ে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। পরবর্তী "يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ" আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। উপরিউক্ত দু'টি তাফসীরের সারমর্ম হচ্ছে- হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এ ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গুনাহ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আল্লাহর আদিজ্ঞান বা তাদের নিজেদের চিহ্নের ভিত্তিতেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এটা ঐ সময়ের কথা যখন একবার তাদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর তারা অস্বীকার করবে তখন কসম করবে। উপরিউক্ত তিনটি তাফসীর কাছাকাছি, তাতে কোনো বিরোধ নেই। -[ইবনে কাসীর]

سِيْمَا শব্দের মর্মার্থ, কিয়ামতের দিনে অপরাধীদের নিদর্শন : سِيْمَا শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, আলামত। হযরত হাসান (র.) বলেছেন, বিমর্ষ ম্লান মুখাবয়ব ও ভীত-সন্ত্রস্ত চক্ষুদ্বয়। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

কিয়ামতের দিন একটি বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সব মানুষ একত্র হবে। সেখানে কে অপরাধী এবং কে নিরপরাধী তা কোনো মানুষ বা জিনকে জিজ্ঞেস করা হবে না। অপরাধীদের বিমর্ষ-ম্লান মুখাবয়ব, তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত চক্ষুদ্বয়, তাদের ঘাবড়ে যাওয়া আকার-আকৃতি এবং তাদের সর্বাঙ্গ হতে প্রবহমান ঘর্ম-ই অপরাধীদের পরিচয় দিয়ে দেবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) سِيْمَا শব্দের যে অর্থ করেছেন, এর আলোকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন অপরাধীদের চিহ্ন হবে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুনীলাভ। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এ চিহ্নের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

٤٦. وَلِمَنْ خَافَ اَىْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوْعِهِمْ مَقَامَ رَبِّهٖ قِيَامَهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْحِسَابِ فَتَرَكَ مَعْصِيَتَهٗ جَنَّتٰنِ .

৪৬. আর যে ব্যক্তি ভয় করতে থাকে অর্থাৎ তাদের উভয়ের জন্য অথবা তাদের সকলের জন্য নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে হিসাব-নিকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং গুনাহ পরিত্যাগ করে তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।

٤٧. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৪৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٤٨. ذَوَاتَا تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ عَلَى الْاَصْلِ وَلَامُهَا تَاۤءٌ اَفْنَانٍ ج اَغْصَانٍ جَمْعُ فَنَنٍ كَطَلَلٍ .

৪৮. এতদুভয়ে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। ذَوَاتَا শব্দটি এখানে ذَوَاتٌ শব্দের দ্বিবচন। মূলের ভিত্তিতে তার লাম বর্ণ تَاءٌ বর্ণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। اَفْنَانٍ অর্থ- اَغْصَانٌ ; এটা فَنَنٌ-এর বহুবচন। যেমন طَلَلٌ -এর বহুবচন اَطْلَالٌ।

٤٩. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৪৯. অতএব, তোমরা স্বীয় রবের কোন অনুগ্রহ কে অস্বীকার করবে?

٥٠. فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ج

৫০. উভয় বেহেশতে দুটি প্রবহমান প্রস্রবণ রয়েছে।

٥١. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৫১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٢. فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فٰكِهَةٍ فِى الدُّنْيَا اَوْ كُلِّ مَا يَتَفَكَّهُ بِهٖ زَوْجٰنِ ج نَوْعَانِ رَطْبٌ وَيَابِسٌ وَالْمُرُّ مِنْهُمَا فِى الدُّنْيَا كَالْحَنْظَلِ حُلْوٌ .

৫২. উভয় বেহেশতে রয়েছে সকল প্রকার ফল যা পৃথিবীতে পাওয়া যেত। অথবা, রুচিসম্মত ও মজাদার জিনিসসমূহ। তাজা ও শুষ্ক দুই দুই প্রকার ফল হবে। পৃথিবীতে যা টক ও বিস্বাদ ফল যেমন মাকাল তাও সেখানে মিষ্টি মধুর হবে।

٥٣. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৫৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٤. مُتَّكِـِٕيْنَ حَالٌ عَامِلُهٗ مَحْذُوْفٌ اَىْ يَتَنَعَّمُوْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ وَالظَّهَائِرُ مِنَ السُّنْدُسِ . وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرُهُمَا دَانٍ . قَرِيْبٌ يَنَالُهُ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ .

৫৪. তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে এটা حَالٌ তার عَامِلٌ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ "يَتَنَعَّمُوْنَ" [সুখ উপভোগ করবে।] রেশমী বসনাবৃত শয্যাসমূহের উপর অবস্থান করবে। মোটা রেশম দ্বারা গদি, আর তার উপরের চাদর চিকন রেশমের দ্বারা প্রস্তুত হবে। উভয় বেহেশতের ফল এতদুভয়ের ফল তাদের নিকটবর্তী হবে। এরূপ নিকটবর্তী হবে যে, তা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত ব্যক্তি লাভ করবে।

٥٥. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৫৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٦. فِيْهِنَّ فِى الْجَنَّتَيْنِ وَمَا اشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَالِيِّ وَالْقُصُوْرِ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ الْعَيْنِ عَلٰى أَزْوَاجِهِنَّ الْمُتَّكِئِيْنَ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ يَفْتَضُّهُنَّ وَهُنَّ مِنَ الْحُوْرِ أَوْ مِنْ نِّسَاءِ الدُّنْيَا الْمُنْشَاٰتِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ.

৫৬. তন্মধ্যে উভয় বেহেশতে ও তন্মধ্যস্থিত সৌধরাজি ও অট্টালিকাসমূহে বহু আনত দৃষ্টিসম্পন্নাগণ থাকবে যাদের নয়নযুগল কেবলমাত্র স্বীয় স্বামীদের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। মানব ও জিন জাতির মধ্য হতে যারা শয্যায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আছে। যাদেরকে স্পর্শ করেনি– স্বামী-স্ত্রী সংঘটিত কোনো ব্যবহার তাদের সাথে হয়নি। এরা জান্নাতের হুর অথবা, পৃথিবীর রমণীগণের মতো নূতনভাবে পয়দা করা হবে। ইতঃপূর্বে কোনো মানব অথবা কোন জিন।

٥٧. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

৫৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فُرُشٍ : অধিকাংশ কারীগণ فُرُشٍ শব্দের ر ও ف অক্ষরদ্বয়ের উপর পেশ দিয়ে فُرُشٍ পড়েছেন। আবূ হায়ওয়া ف অক্ষরের উপর পেশ ও ر অক্ষর সাকিন করে فُرْشٍ পড়েছেন।

قَوْلُهُ جَنٰى : جَنٰى শব্দে দু'টি কেরাআত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ جَنٰى শব্দের ج অক্ষরের উপর জবর দিয়ে جَنٰى পড়েছেন। ঈসা ইবনে ওমর ج অক্ষরের নিচে যের দিয়ে جِنٰى পড়েছেন।

قَوْلُهُ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَ جَنَّتَانِ : جَنَّتٰنِ শব্দটি মুবতাদা মুআখখার এবং مَوْصُوْف আর لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ কালামটি খবরে মুকাদ্দাম। এখন ذَوَاتَا أَفْنَانٍ শব্দ দুটি مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে جَنَّتٰنِ- এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَّكِئِيْنَ : مُتَّكِئِيْنَ পদটি একটি উহ্য ফে'লের যমীর হতে حَالٌ হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। মূল বাক্যটি ছিল– يَتَنَعَّمُوْنَ مُتَّكِئِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ নিয়ামত ভোগ করবে হেলান দেওয়া অবস্থায়।

عَلٰى فُرُشٍ কিসের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে? : عَلٰى فُرُشٍ শব্দ দুটি جَارٌّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে একটি উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। যার মূলে ছিল يَتَنَعَّمُوْنَ عَلٰى فُرُشٍ অথবা تَفَكَّهُوْنَ عَلٰى فُرُشٍ

قَوْلُهُ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ : وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ কালামের جَنَا الْجَنَّتَيْنِ শব্দ দুটি مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে مُبْتَدَأٌ হয়েছে। আর دَانٍ হলো তার خَبَرٌ

قَوْلُهُ فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ : فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ আয়াতের বর্ণিত هُنَّ যমীরটির مَرْجِعٌ হলো جَنَّتٰنِ ও اَنْعُمُهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ الخ : **শানে নুযূল** : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ الخ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) কিয়ামতের দিন, হিসাব-নিকাশ, মীজান, জাহান্নাম ও জান্নাত সম্বন্ধে আলোচনা করে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছেন, হায়! আমি যদি এ তৃণলতা বা ঘাসের মধ্যকার একটি ঘাস হতাম, তাহলে কোনো জন্তু এসে আমাকে খেয়ে ফেলত, আমার জন্য এটা কতোইনা ভাল হতো! কিন্তু আফসোস! আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তখন উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে আল্লাহভীরু লোকদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে–

২. ইবনে আবূ হাতেম (র.) ইবনে শাওযিব হতে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. হযরত আতিয়া ইবনে কায়েস (রা.) বলেছেন, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তির শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বলেছিলেন– সম্ভবত আমি আল্লাহকে চিনি এবং আমি বিপথগামী। অতএব আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলে দাও। রাবী বলেছেন, এ কথার পর লোকটি একরাত একদিন পর্যন্ত মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহর নিকট তওবা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তওবা কবুল করেছেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (র.) প্রমুখ বলেছেন, আয়াতটি সর্বসাধারণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। নির্দিষ্ট করে এটা কারো শানে অবতীর্ণ হয়নি। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে এর যোগসূত্র : পূর্বোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা, ভয়াবহ পরিণতি এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বলেছেন। অতঃপর এখানে তিনি সৎ ও মুত্তাকী লোকদের অবস্থা এবং তাদের জন্য তৈরি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। –[কুরতুবী]

মুফতী শফী (র.) বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার লোকদের উত্তম প্রতিফল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দু'উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দু'উদ্যান এবং তাতে জান্নাতীদের জন্য যা পরিবেশন করা হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ অর্থাৎ আর আল্লাহর সম্মুখে পেশ হবার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দু'খানি বাগান রয়েছে।'

অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন যে, مَقَامَ رَبِّهٖ দ্বারা কিয়ামতের দিন মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে হিসেবের জন্য হাজির হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

এর অর্থ হচ্ছে– দুনিয়াতে যে লোক নিজের চিন্তা ও কল্পনায় এ বিশ্বাস করে যে, একদিন আমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সকল কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। আর আল্লাহ সৎকর্মের জন্য ভালো প্রতিদান তথা জান্নাত আর অসৎকর্মের জন্য খারাপ প্রতিদান তথা জাহান্নাম দিবেন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দু'টি বাগান রয়েছে। যে ব্যক্তি সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে হিসাব দেওয়ার চিন্তা করে সে কখনো পাপকার্জে জড়িত হতে পারে না। ফলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবীসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন– مَقَامَ رَبِّهٖ-এর অর্থ হচ্ছে– আমাদের প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই আল্লাহ জানেন ও দেখেন। তাঁরই দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ। আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় ও পাপকর্ম হতে রক্ষা করে এবং দূরে রাখে। ফলে সে সৎকর্ম করতে পারে। আর এ কারণেই তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

উল্লেখ্য যে, মানব ও দানব হতে যে কেউ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করে গুনাহ হতে মুক্ত থাকবে সে নিঃসন্দেহে বেহেশত লাভ করবে।

قَوْلُهُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوْعِهِمْ : জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ" আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– "لِكُلٍّ مِّنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوْعِهِمْ جَنَّتَانِ" অর্থাৎ তাদের [জিন ও মানুষ] প্রত্যেকের জন্য অথবা সকলের জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

১. একটি জান্নাত আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী মানুষের জন্য হবে। আর অপরটি পরহেযগার জিনদের জন্য হবে।
২. মানব ও জিন উভয়ের মধ্যে যারা আল্লাহভীরু তাদের সহীহ ও নির্ভুল আকীদা বিশ্বাসের জন্য এক জান্নাত। আর তাদের সৎকর্মের জন্য আরেক জান্নাত হবে।
৩. তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আত্মিক ও আরেকটি দৈহিক জান্নাত দেওয়া হবে।
৪. মানব ও দানবকে ইবাদতের সুফল স্বরূপ একটি জান্নাত দেওয়া হবে আর পাপ হতে বেঁচে থাকার কারণে আরেকটি জান্নাত দেওয়া হবে।
৫. মানব ও দানব তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ একটি জান্নাত লাভ করবেন আর আরেকটি পাবেন আল্লাহর অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে।

কারো কারো মতে দুটি জান্নাতের একটি হচ্ছে– আল্লাহভীরু লোকদের তৈরিকৃত আর অপরটি হচ্ছে– ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। অথবা কারো কারো মতে একটি জান্নাত তার নিজের জন্য প্রদান করা হবে আর অপরটি তার স্ত্রীদের জন্য প্রদান করা হবে। কারো মতে একটি জান্নাত হবে তার অবস্থানের জন্য আর অপরটি তার বিনোদনের জন্য। কারো মতে একটি জান্নাত হলো বেহেশতের উচ্চশ্রেণির লোকদের জন্য আর অপরটি নিম্নশ্রেণির লোকদের জন্য। আবার কারো মতে দুটি জান্নাত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এক জান্নাত হতে অপর জান্নাতে স্থানান্তরিত হয়ে অধিক আরাম উপভোগ করা।

মুকাতিল (র.) বলেন, এক জান্নাত আদনান, আর অপর জান্নাত না'ঈম হবে। আর মুহাম্মদ বিন আলী তিরমিযী (র.) বলেন, এক জান্নাত আল্লাহভীতির বিনিময়ে আর এক জান্নাত রিপুর তাড়না পরিত্যাগ করার কারণে প্রদত্ত হবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফরজসমূহ সম্পন্ন করার কারণে এক জান্নাত ও নফলসমূহের কারণে একটি জান্নাত প্রদত্ত হবে।

আয়াতে প্রথমে দুটি বাগান এবং পরে আরো দুটি বাগানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত খাস বান্দাগণের জন্য। আর শেষোক্ত দুটি সাধারণ মুমিনের জন্য।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী কারা? : "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ" এবং "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ" আয়াতে উল্লিখিত উদ্যানে কারা প্রবেশ করবে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ইতোপূর্বে "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ" আয়াতের অর্থের শিরোনামে প্রথমোক্ত দুটি উদ্যান বা জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের কথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহর ভয়ে গুনাহ ও পাপ কাজ হতে দূরে থাকবে, তারা ঐ দুটি উদ্যানের অধিবাসী হবে।

কিন্তু শেষোক্ত দুটি উদ্যানের অধিবাসী কে বা কারা হবে তা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে নির্দিষ্ট করে বলেননি। তবে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ দুটি উদ্যান প্রথমোক্ত দু উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ" পূর্বোক্ত দুটি উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। এটা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ ঈমানদার লোকেরা যারা নৈকট্যশীলদের (مُقَرَّبِيْنَ) তুলনায় কিছুটা নিম্ন মর্যাদার।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ আরো অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরিউক্ত তাফসীরই অগ্রগণ্য বলে ধারণা করা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ" এবং "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ"-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন– "جَنَّتٰنِ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبِيْنَ وَجَنَّتٰنِ مِنْ وَرِقٍ لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ" অর্থাৎ স্বর্ণ নির্মিত দুটি উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য, আর রৌপ্য নির্মিত দুটি উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার লোকদের জন্য। –[ইবনে কাসীর, দুররে মানসূর]

এছাড়া দুররে মানসূরে হযরত বারা ইবনে আজিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে– "اَلْعَيْنَانِ اللَّتَانِ تَجْرِيَانِ خَيْرٌ مِنَ النَّضَّاخَتَيْنِ" প্রথমোক্ত দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِيَانِ তথা প্রবহমান বলা হয়েছে, তা শেষোক্ত দুটি উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتٰنِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে প্রবহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) –[ইবনে কাসীর, ফতূহাতে ইলাহিয়া, দুররে মানসূর]

قَوْلُهُ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ : ذَوَاتَانِ শব্দটিতে দুটি লোগাত আছে– ১. ذَوَاتَا শব্দটি মূল শব্দের দিক হতে ذَاتٌ-এর দ্বিবচন। ২. আর অপর লোগাত হলো ذَوَاتَا تَانِيْث যার দ্বিবচন এর- ذُوْ এটা ى হলো لَامْ كَلِمَةٌ এবং وَاوْ হলো عَيْن كَلِمَةٌ যার ذُوْتَةٌ ব্যবহার হয়। গ্রন্থকার প্রথমোক্ত শব্দের প্রতি নিজের মত প্রকাশ করেন।

আর اَفْنَانٌ শব্দের অর্থ হলো اَغْصَانٌ শব্দটি فَنَنٌ-এর বহুবচন। যেমনিভাবে غُصْنٌ-এর বহুবচন اَغْصَانٌ এবং ظِلٌّ-এর বহুবচন اَظْلَالٌ; সম্ভবত এর মৌলিক অর্থ ডালসমূহই উদ্দেশ্য। অথবা, এটা বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতরাজির সমষ্টি হতে রূপক অর্থে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জান্নাত দুটি ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলো ছাড়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও হবে।

قَوْلُهُ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ" দুটি বাগানে দুটি ঝর্ণা সদা প্রবহমান।' এ কালামটি প্রথমোক্ত দুটি জান্নাতের– দ্বিতীয় বিশেষণ বা সিফাত। তাতে জান্নাতদ্বয়ের দ্বিতীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দুটি উদ্যানের প্রত্যেকটির নিম্নে দিয়ে একটি করে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে। এ কথা সবারই জানা আছে যে, উদ্যান ও জান্নাতের নিম্নে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে তা দেখতে কতোই না সৌন্দর্যময়। কতোই না মধুর সে দৃশ্য। আজকের দুনিয়ায় যারা আরাম ও ভোগ বিলাসে সর্বদা ব্যস্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা জলটঙ্গী তৈরি করে তথায় গ্রীষ্মকালে বসবাস করে। কিন্তু আখিরাতের এ জান্নাত ও উদ্যান কোনো একটি মৌসুমের জন্য সীমিত নয় সর্বদাই তার বিলাস ভবন থাকবে।

قَوْلُهُ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ : আলোচ্য আয়াতটি জান্নাতদ্বয়ের তৃতীয় বিশ্লেষণ, আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে।

১. উভয় বাগানের ফলসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ও অভিনব হবে। এক বাগানে গেলে এক ধরনের ফল অন্য বাগানে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের ফল দৃষ্টিগোচর হবে।

২. বাগান দুটির একটিতে সুপরিচিত ফল হবে যদিও স্বাদে-গন্ধে স্বতন্ত্র ধরনের হবে। অন্য বাগানের ফলগুলো হবে অভিনব, যা কখনো কল্পনা করেনি।

জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, উভয় জান্নাতে সকল রকম ফল রয়েছে, যা দুনিয়াতেও পরিচিত অথবা উভয় জান্নাতে সকল প্রকার রুচিপূর্ণ বস্তুসমূহ রয়েছে। ঐ সকল ফল ও মজাদার বস্তুসমূহ দুপ্রকারের হবে– তাজা ও শুষ্ক। দুনিয়াতে যা তিক্ত ছিল, যেমন– حَنْظَلٌ বা মাকাল, তাও তথায় সুমিষ্ট হবে। –[জালালাইন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে–

مَا فِي الدُّنْيَا شَجَرَةٌ حُلْوَةٌ وَلَا مُرَّةٌ اِلَّا وَهِيَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى الْحَنْظَلِ اِلَّا اَنَّهُ حُلْوٌ –

অর্থাৎ, পৃথিবীর মিষ্ট ও তিক্ত সকল প্রকারের গাছ এমন কি حَنْظَلٌ বা মাকালও জান্নাতে সুমিষ্ট হবে।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন, কামালাইন, ফতুহাতে ইলাহিয়া]

কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর এ উক্তি দ্বারা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত দুটি জান্নাতের উপর এখানে উল্লিখিত জান্নাত দুটির ফজিলত ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা এখানে দুটি জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে একই ফলের দুপ্রকার স্বাদ ও মজার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যে জান্নাতদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে একটি ফলে দুধরনের স্বাদের কথা বর্ণনা করা হয়নি। –[ফতুহাতে ইলাহিয়া]

قَوْلُهُ جَنَّةُ الْاٰخِرَةِ مُخَالِفَةً لِجَنَّةِ الدُّنْيَا : পরকালীন উদ্যান দুনিয়ার উদ্যান হতে ভিন্নতর : আল্লামা রাযী (র.) বলেন, আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য আখিরাতে যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন তা তিনটি কারণে পৃথিবীর উদ্যান হতে ভিন্নতর। যথা–

১. সাধারণ পৃথিবীর গাছ-গাছালি ও তরুলতার ফল ফলাদি তার উপরিভাগে হয়ে থাকে। ফলে মানুষ ইচ্ছে করলেই তা হতে যে কোনো সময় উপকৃত হতে পারে না। অনেক সময় তা গাছ থেকে ছিড়ে নিতে পারে না। পক্ষান্তরে পরকালে যারা জান্নাতী হবেন তারা কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধ করলে অমনিতেই তা তার নিকট হাজির হয়ে যাবে।

২. মানুষ পৃথিবীতে ফল-ফলাদি সংগ্রহ ও আহরণের জন্য চেষ্টা করে থাকে এবং নানা কৌশলের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে থাকে, পক্ষান্তরে পরকালে তা নিজেই জান্নাতীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পড়বে। এজন্য জান্নাতবাসীদের কোনোরূপ কষ্ট পোহাতে হবে না।

৩. যখন মানুষ পৃথিবীতে কোনো একটি গাছের ফলের নিকট পৌঁছবে তখন অপর গাছের ফল হতে দূরবর্তী হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে পরকালে প্রতিটি গাছের ফল একই সময় একই স্থানে তার নিকট উপস্থিত থাকবে। –[তাফসীরে কাবীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরকালে জান্নাতের গাছগুলো এতোই নিচে নেমে আসবে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। সে দাঁড়ানো থাকুক বা বসা থাকুক বা হেলান দিয়ে থাকুক।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতের ফল সংগ্রহের জন্য হস্ত প্রসারিত করবে, তখন দূরত্ব ও কাঁটা তাকে বঞ্চিত করবে না। আল্লাহ এ বিষয়টিকেই "وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ" আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ : جَنٰى শব্দটি زَبَرْ সহযোগে اِسْمٌ مَقْصُوْرٌ ; অর্থ– ফল জন্ম হওয়া বা ফল লাভ হওয়া কিংবা ফল গুটিয়ে নেওয়া। جَنٰى ক্রিয়াপদটি কর্ম পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনিভাবে قَبْضٌ শব্দটি مَقْبُوْضٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ মুবতাদা ও খবর হয়েছে। دَانٍ শব্দটি মূলে ছিল دَانِوٌ যেমন– غَازٍ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ তা'লীল হয়ে غَازٍ হয়েছে। অনুরূপভাবে دَانِوٌ শব্দ তা'লীল হয়ে دان হয়েছে।

আল্লাহর দোস্ত মুমিনগণ বেহেশত হতে ফলসমূহ গুটিয়ে নেবে। ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ইচ্ছা করলে শুয়ে শুয়ে অথবা বসে বসে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দূরত্ব ও কাঁটার কারণে তাদের হাত ফলগাছসমূহ হতে ফিরে আসবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, তিন কারণে দুনিয়ার জান্নাত হতে আখিরাতের জান্নাত ভিন্নতর। যথা–

১. দুনিয়ার ফল গাছের মাথা স্বাভাবিকভাবে মানুষের থেকে দূরে হয়। কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এলায়িত ব্যক্তির সন্নিকট করে ফল দেওয়া হবে।

২. দুনিয়ার মানুষকে ফল পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয় এবং গাছ নাড়াতে হয়; কিন্তু আখিরাতে ফল তার কাছেই এসে যাবে এবং ফল নিয়ে খাদেমগণ তার চারদিকে চক্কর দেবে।

৩. দুনিয়াতে মানুষ এক গাছের ফলের নিকট গেলে অন্য গাছের ফল তার থেকে দূরে থাকে; কিন্তু আখিরাতে একই সময়ে সব ধরনের ফল তার নিকটে এসে যাবে।

قَوْلُهُ فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ : قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ শব্দটি তাহকীকের জন্য اِسْمُ فَاعِلٌ -কে তার মানসূবের উদ্দেশ্যে ইজাফত করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে قَصَرُ طَرْفِهِ عَلٰى كَذَا বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার কারণে তার مُتَعَلِّقْ হজফ করা হয়েছে। তাহলে عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ অর্থ হলো– বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরী তরুণীর, যারা তাদের স্বামীদের চারদিকে অবস্থিত থাকবে। অথবা, এর অর্থ হলো তাদের সৌন্দর্যের কারণে রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হয়ে তাদের স্বামীগণ তারা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তারা এমন কুমারী হবে যাদের সাথে ইতঃপূর্বে কারো সাথে সঙ্গম হয়নি এবং তাদের সতীচ্ছেদ তথা যোনীপথ এমন সংকীর্ণ হবে নাযার দরুন দুনিয়াতে প্রথম সহবাসে কষ্ট হয়। এরা হবে হয়ত বেহেশতের হুর অথবা নব তৈরি রমণী। মুক্তার ন্যায় চকচকে দেহ হবে তাদের। মোটকথা, দর্শকদের দৃষ্টি হরণ করবে তাদের রূপ লাবণ্য।

নারীদের সৌন্দর্যের পূর্বে তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য : এখানে আল্লাহ তা'আলা নারীদের রূপ ও সৌন্দর্যের আলোচনা করার পূর্বে তাদের লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও সতীত্বের বিবরণ দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে– নারীদের আসল বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নির্লজ্জ ও উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া। নারীর লজ্জাশীলতা ও চরিত্রবতী হওয়াই আসল ও প্রকৃত ভূষণ। তাদের দৃষ্টি সলজ্জভাবে অবনত হওয়াই শোভনীয়। সুন্দরী নারীরা পৃথিবীতে ক্লাবঘর ও প্রেক্ষাগৃহে সহ-সম্মেলনে বিপুলভাবে ভীড় জমিয়ে থাকে। আর সারা দুনিয়ায় বাছাই করা সুন্দরীদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় একত্র করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কুরুচি সম্পন্ন ও চরিত্রহীন লোকেরাই তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। যে রূপ ও সৌন্দর্য যে কোনো কামনা ও পঙ্কিল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, আমন্ত্রণ জানায় এবং যে কোনো ক্রোড়ে ঢলে পড়তে প্রস্তুত হয়, সে রূপ ও যৌবনে সুরুচি ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই কিছুমাত্র উদ্দীপনাবোধ করতে পারে না।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে জান্নাতী লোকদের জন্য যে পবিত্র আত্মা ও দেহবিশিষ্ট ললনাদের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এটা প্রথমোক্ত জান্নাতদ্বয়ের চতুর্থ সিফাত ও বিশেষণ। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

قَوْلُهُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ" অর্থাৎ কোনো মানুষ বা জিন তাদের এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে স্পর্শও করেনি।

طَمْثٌ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ হায়েজের রক্ত। যে নারীর হায়েজ হয় তাকে طَامِثٌ বলা হয়ে থাকে। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকে طَمْثٌ বলা হয়। এখানে শেষোক্ত অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব طَمْثٌ শব্দের শেষ অর্থের আলোকে আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো জিন স্পর্শ করেনি।

২. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে জান্নাতে এরূপ অঘটন সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এ কথাটির আসল অর্থ হলো নেককার মানুষের ন্যায় নেককার জিনেরাও জান্নাতে প্রবশে করবে। সেখানে জিন ও মানুষ উভয় জাতিরই মহিলা হবে। সবই লজ্জাশীল ও অস্পর্শিতপূর্ব হবে। কোনো জিন স্ত্রীলোক তার জান্নাতী জিন স্বামীর পূর্বে অপর কোনো জিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না, কোনো মানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃতা হবে না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

এসব রমণী যাদেরকে কেউই স্পর্শ করেনি– তারা কে বা কারা? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তারা হলো اَلْحُوْرُ الْعِيْنُ তথা জান্নাতের হুর। কেননা তাদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব স্বামীদের পূর্বে কেউই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারো মতে, তারা হলো نِسَاءُ الدُّنْيَا দুনিয়ার নারীগণ যাদের এমন পবিত্র চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের সৃষ্টি হতে কেউই তাদের স্পর্শ করতে পারে নি। কারো মতে তারা হলো ঐসব রমণী যারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব তাদেরকে কেউই স্পর্শ করতে পারেনি। –[খাযিন]

অনুবাদ :

٥٨. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ صَفَاءً وَالْمَرْجَانُ ج اَىِ اللُّؤْلُؤُ بَيَاضًا .

৫৮. তারা যেন ইয়াকুত পরিচ্ছন্নতায় ও প্রবাল রত্নমুক্তা সাদাবর্ণে।

٥٩. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৫৯. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٠. هَلْ مَا جَزَاۤءُ الْاِحْسَانِ بِالطَّاعَةِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ج بِالنَّعِيْمِ .

৬০. তবে কি هَلْ টি مَا অর্থে ব্যবহৃত ইহসানের [উত্তম কাজের] প্রতিদান আনুগত্যের ইহসান ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে? বেহেশত দান করা।

٦١. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٢. وَمِنْ دُوْنِهِمَا اَىِ الْجَنَّتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ جَنَّتٰنِ ج اَيْضًا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ .

৬২. আর সেই দুটি ব্যতীত অর্থাৎ উল্লিখিত জান্নাত দুটি ব্যতীত আরো দুটি বেহেশত রয়েছে আরো যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।

٦٣. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٤. مُدْهَآمَّتٰنِ ج سَوْدَاوَانِ مِنْ شِدَّةِ خُضْرَتِهِمَا .

৬৪. সেই উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের ঘনসবুজ হওয়ার কারণে শ্যামল বর্ণ ধারণকারী।

٦٥. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٦. فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ . فَوَّارَتَانِ بِالْمَاۤءِ لَا يَنْقَطِعَانِ .

৬৬. সেই উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে দুটি ঝর্ণা উথলিত হতে থাকবে পানির ফোয়ারা অবিরাম প্রবাহিত হবে।

٦٧. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج

৬৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٨. فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ج هُمَا مِنْهَا وَقِيْلَ مِنْ غَيْرِهَا .

৬৮. সেই উদ্যান দুটিতে নানাবিধ ফল এবং খেজুর ও আনার থাকবে, খেজুর ও আনার ফলের মধ্য হতে হবে। মতান্তরে এ দুটি তা ব্যতীত হবে।

٦٩. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৯. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٠. فِيْهِنَّ اَىِ الْجَنَّتَيْنِ وَقُصُوْرِهِمَا خَيْرَاتٌ اَخْلَاقًا حِسَانٌ ج وُجُوْهًا

৭০. সেগুলোতে রয়েছে অর্থাৎ বেহেশত দুটিও তার সৌধরাজিতে উত্তম স্বভাবসম্পন্না রূপসীগণ আকৃতি বিচারে।

٧١. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৭১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٢. حُوْرٌ شَدِيْدَاتُ سَوَادِ الْعُيُوْنِ وَبَيَاضِهَا مَقْصُوْرٰتٌ مَسْتُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ ج مِنْ دُرٍّ مُجَوَّفٍ مُضَافَةً اِلَى الْقُصُوْرِ شَبِيْهَةً بِالْخُدُوْرِ -

৭২. এই হুরগণ যাদের চোখের মণি নির্মল সাদা ও প্রগাঢ় কাল হবে সুরক্ষিতা হবে পর্দায় অবস্থানকারিণী খীমাসমূহের মধ্যে যা ফাঁকা মুক্তার দ্বারা নির্মিত হবে। আর এ সকল খীমা হুরগণের জন্য পর্দাতুল্য হবে।

٧٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

৭৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ قَبْلَ اَزْوَاجِهِنَّ وَلَا جَاۤنٌّ ج

৭৪. এদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ তার পূর্বে অর্থাৎ তাদের স্বামীগণের পূর্বে আর না কোনো জিন।

٧٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

৭৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٦. مُتَّكِئِيْنَ اَىْ اَزْوَاجُهُنَّ وَاِعْرَابُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ جَمْعُ رَفْرَفَةٍ اَىْ بُسُطٍ اَوْ وَسَائِدَ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ج جَمْعُ عَبْقَرِيَّةٍ اَىْ طَنَافِسَ -

৭৬. এরা হেলান দিয়ে বসবে অর্থাৎ তাদের স্বামীগণ, তার পূর্বে উল্লিখিত اِعْرَابٌ -এর অনুরূপ। সবুজ নকশীদার رَفْرَفٌ শব্দটি رَفْرَفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ শয্যা অথবা তাকিয়া ও অতিসুন্দর গালিচার উপর عَبْقَرِيٌّ শব্দটি عَبْقَرِيَّةٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ গালিচা।

٧٧. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

৭৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٨. تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ - تَقَدَّمَ وَلَفْظُ اِسْمٍ زَائِدٌ -

৭৮. আপনার প্রতিপালকের নাম বড় বরকতপূর্ণ, যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু। এরূপ আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। আর اِسْمٌ শব্দটি অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرَاتٌ : অধিকাংশ ক্বারীগণ خَيْرَاتٌ শব্দটির ى অক্ষরের উপর সাকিন দিয়ে خَيْرَاتٌ পড়েছেন এবং অন্যান্য ক্বারীগণ ى অক্ষরের উপর তাশদীদ দিয়ে خَيِّرَاتٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ رَفْرَف : অধিকাংশ ক্বারীগণ একবচন হিসেবে رَفْرَفٌ পড়েছেন। আর হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) প্রমুখ বহুবচন হিসেবে رَفَارِفٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ عَبْقَرِيٌّ : অধিকাংশ ক্বারীগণ عَبْقَرِيٌّ শব্দটি একবচনের ভিত্তিতে পড়েছেন আর হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বহুবচনের ভিত্তিতে عَبَاقَرِيٌّ পড়েছেন। কেউ কেউ عَبَاقِرُ -ও পড়েছেন।

قَوْلُهُ خُضْر : অধিকাংশ ক্বারীগণ خُضْرٌ শব্দের خ অক্ষরে ضَمَّةٌ আর ض সাকিন করে পড়েছেন। কেউ কেউ ض ও خ অক্ষরের উপর ضَمَّةٌ দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ ذِىْ : অধিকাংশ ক্বারীগণ ذِى الْجَلَالِ শব্দটি رَبِّكَ -এর صِفَةٌ হিসেবে ذِى الْجَلَالِ পড়েছেন। ইবনে আমের (র.) ذُوالْجَلَالِ শব্দটিকে اِسْمٌ -এর صِفَةٌ ধরে ذُوالْجَلَالِ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ : এ আয়াতটির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে– এটা قَاصِرَاتٌ -এর সিফাত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– এটা قَاصِرَاتٌ হতে 'হাল' হয়েছে।

يَاقُوْتٌ অর্থ হচ্ছে– এমন উত্তম হীরা যাকে আগুন পুড়ে ফেলতে পারে না। আর مَرْجَانٌ অর্থ হচ্ছে– মুক্তা। يَاقُوْتٌ বা হীরা সাধারণত লাল বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ জান্নাতী রমণীদেরকে ইয়াকূত পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে– তারা এমন শ্বেতবর্ণের হবে, যা লাল মিশ্রিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা রংয়ের রাজা হলদে মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের নয়। এর উত্তর হচ্ছে– জান্নাতী রমণীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে হীরার সাথে তুলনা করা হয়েছে, রংয়ের ভিত্তিতে নয়।

مَرْجَانٌ অর্থ হলো– মুক্তা। মুক্তা সাদা ও লাল উভয় বর্ণেরই হতে পারে। তাফসীরে খাযিনে রয়েছে, ছোট ছোট মুক্তাকে مَرْجَانٌ বলা হয়, যা খুব বেশি সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ জান্নাতী রমণীদের দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ধরনের উপমা দ্বারা তাদের মর্যাদা বাড়ানোই উদ্দেশ্য।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতী নারীদের দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জান্নাতী নারীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় يَاقُوْتٌ হীরা পাথরের ন্যায়। আর রংয়ের দিক দিয়ে তারা ছোট ছোট মুক্তার মতো শ্বেত রংয়ের হবে [যা হালকা হলুদ রং দ্বারা মিশ্রিত]। –[তাফসীরে খাযিন, কাবীর]

জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনাকারী হাদীসসমূহের কয়েকটি : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ" তারা এমনই সুন্দরী রূপসী, যেমন হীরা ও মুক্তা। এ আয়াতে জান্নাতী নারীদের রূপ ও সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকার যেসব হাদীসের উল্লেখ করেছেন– তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রথম যে জামাত জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার আকৃতি হবে পূর্ণিমা রজনীর উজ্জ্বল চন্দ্রের মতো।

٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يُرٰى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حُلَّةً حَتّٰى يُرٰى مُخُّهَا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– জান্নাতী নারীদের একজন যদি বের হয়ে আসে তা হলে সত্তর জোড়া কাপড়ের উপর দিয়ে তার উজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হবে এমন কি তার মূল দেহ দেখা যাবে।

٣. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اِنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَتَلْبَسُ سَبْعِيْنَ حُلَّةً فَيُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْاَحْمَرُ فِى الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ .

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেছেন, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা সত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করলেও তার বাইরে থেকে তাদের শরীরের আসল পরিগঠন এমনভাবে দেখা যাবে যেমন রক্তিম রংয়ের শরবত সাদা গ্লাসে দেখা যায়।

٤. وَقَالَ الْحَسَنُ هُنَّ فِىْ صَفَاءِ الْيَاقُوْتِ وَبَيَاضِ الْمَرْجَانِ -

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, জান্নাতী হূরেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হীরা পাথরের ন্যায়, আর রংয়ের দিক দিয়ে তারা হলুদ রং বিশিষ্ট ছোট ছোট সাদা মুক্তার ন্যায়।

قَوْلُهُ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদেরকে শুভ প্রতিফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মূল আয়াতে اِحْسَانٌ শব্দটি দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত اِحْسَانٌ ও শেষোক্ত اِحْسَانٌ -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রথমোক্ত اِحْسَانٌ -এর অর্থ طَاعَةٌ - আনুগত্য এবং শেষোক্ত اِحْسَانٌ -এর অর্থ نَعِيْمٌ জান্নাত করেছেন। –[জালালাইন]

ইমাম রাযী (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, এর তাফসীরে অনেক কথার উল্লেখ রয়েছে, এমন কি এটা সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে, যার প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীরে একশত কথা বর্ণিত হয়েছে। আয়াত তিনটি হলো– ১. فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ - ২. وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا - ৩. هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ আয়াতের তাফসীরে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে তার মধ্য হতে প্রসিদ্ধ ও অতি নিকটবর্তী কতগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

১. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতিফল জান্নাত ছাড়া আর কি হতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" একনিষ্ঠ বিশ্বাসের সাথে বলল, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।
২. পৃথিবীর ইহসানের প্রতিফল আখিরাতে ইহসান হবে।
৩. যে মহান সত্তা প্রচুর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দ্বারা তোমাদের দুনিয়াতে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পরকালে নাঈম নামক জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তার প্রতি তোমাদের ইহসান ইবাদত ও তাকওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ তিনটি কথার মূল বিষয় হচ্ছে– যে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে, তার প্রতি অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করাই উচিত। –[তাফসীরে কাবীর]

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন– "هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا الْجَنَّةَ" অর্থাৎ যে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কি হতে পারে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– "مَا جَزَاءُ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَعَمِلَ بِمَا جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ ﷺ اِلَّا الْجَنَّةَ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ বিনে কোনো উপাস্য নেই স্বীকার করল এবং রাসূল ﷺ-এর আনীত জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আমল করল, তার প্রতিফল হলো জান্নাত। –[কুরতুবী, খাযিন]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ "هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ" আয়াত পাঠ করে বলেন, তোমরা জান কি! তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জানেন। এরপর মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন, যার প্রতি আমি তাওহীদের নিয়ামত বর্ষণ করেছি, তার প্রতিফল নিশ্চিতরূপে জান্নাত হবে। –[কুরতুবী, খাযিন, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ" : এ আয়াতে دُوْن শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতানুসারে এর অর্থ হচ্ছে– কোনো উঁচু জিনিসের অপেক্ষা নিচু হওয়া।
২. তার দ্বিতীয় অর্থ কোনো উত্তম ও উৎকৃষ্ট অধিক মর্যাদাবান জিনিসের তুলনায় হীন ও সামান্য হওয়া। এটা ইবনে যায়েদের উক্তি। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]
৩. তার তৃতীয় অর্থ কোনো জিনিস তা ব্যতিরেকে অন্যটি হওয়া।

–[তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থের উল্লেখ করা হয়েছে।]

অর্থের এ বিভিন্নতার কারণে আয়াতটির মোটামুটি অর্থ এ হতে পারে যে, জান্নাতী লোকদের পূর্ববর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরো দুটি বাগান বা জান্নাত দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, এ দুটি বাগান উপরে বলা দুটি বাগানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদা ও কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাগান দুটি হয় উচ্চ স্থানে হবে, আর এ দুটি তার তুলনায় নিম্নস্থানে অবস্থিত হবে। অথবা পূর্ববর্তী বাগান দুটি অতীব উচ্চ মান-মর্যাদার হবে। তার তুলনায় এ দুটি কম মানের, কম গুরুত্বের হবে। প্রথম সম্ভাবনা গ্রহণ করা হলে তার অর্থ হবে এ দুটি অতিরিক্ত বাগানও সেই জান্নাতী লোকদেরকেই আলাদাভাবে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা গ্রহণ করা হলে এর অর্থ হবে, প্রথম বাগান দুটি আল্লাহর অতীব নিকটবর্তী লোকদের জন্য, আর দুটি বাগান ডানপন্থি তথা اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ -এর জন্য। এ দ্বিতীয় অর্থটির গ্রহণ যোগ্যতা অধিক মনে হয়। কেননা সূরা ওয়াকি'আয় নেককার লোকদেরকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের লোক হবে 'সাবিকীন' তথা পূর্ববর্তী লোকগণ। তাদেরকেই 'মুকাররাবীন' -ও বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হলো 'আসহাবুল-ইয়ামীন' ডানপন্থিগণ। তাদের 'আসহাবুল-মাইমানা' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আর এ দুশ্রেণির লোকদের জন্য দু জান্নাতের পরিচিতিও আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। –[ফতূহাতে ইলাহিয়া]

উপরন্তু এ সম্ভাবনার সমর্থনে রয়েছে সেই হাদীস, যা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে তাঁর পুত্র আবূ বকর বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– দুটি জান্নাত সাবিকীন বা মুকাররাবীনের জন্য হবে। তাদের তৈজসপত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী সবই স্বর্ণের হবে। আর দুটি জান্নাত পরবর্তী লোকদের বা ডানপন্থিদের জন্য হবে। তাদের প্রত্যেকটি জিনিস রৌপ্যের হবে। –[ফাতহুল বারী, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

পরবর্তী জান্নাতদ্বয়ের গুণাগুণ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা প্রথম দুটি জান্নাত ও তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাতে যাঁরা বসবাস করবেন তাঁদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। এখানে وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ আয়াতে তিনি অপর দুটি জান্নাত ও তার অধিবাসী এবং এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ধারাবাহিক কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী দুটি জান্নাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

১. তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় দান প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে– مُدْهَآمَّتٰنِ ; مُدْهَامَّةٌ শব্দের অর্থ– এমন ঘন-গাঢ় সবুজ, যা চরম মাত্রার সতেজতার কারণে প্রায় কাল দেখা যায়। এটা সবুজ-শ্যামল বাগানের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ বলে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছিল তা দ্বারা এ গুণটিও শামিল রয়েছে।

মোটকথা, এ দুটি বাগান ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ হবে।

২. জান্নাতদ্বয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ দুটি বাগানে দুধারা ঝর্ণার মতো উৎক্ষিপ্তমান অর্থাৎ তাদের নিচে দিয়ে দুটি ঝর্ণাধারা সর্বদাই প্রবহমান আছে। নিঃসন্দেহে এটা বাগানদ্বয়ের অন্যতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বৈশিষ্ট্য ও গুণের কারণে তারা সর্বদাই জান্নাতীদের জন্য কল্যাণ ও বরকত বহন করে আনতে পারবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ঝর্ণা দুটি মিশক ও কর্পুর নিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর প্রবাহিত হতে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, ঝর্ণা দুটি মিশক ও আম্বর জান্নাতীদের ঘরে ঘরে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টাপুর টুপুর বর্ষণ করতে থাকবে।

৩. জান্নাতদ্বয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো "فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ" অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। অর্থাৎ জান্নাত দুটি খাদ্য-দ্রব্য ও ফল-মূল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে; যাদের ভাণ্ডার কোনো দিন খালি পড়ে থাকবে না।

৪. জান্নাতদ্বয়ের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো "فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ" অর্থাৎ এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

অর্থাৎ উভয় জান্নাতে উপরে বর্ণিত নিয়ামতসমূহ এবং জান্নাতীদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য-সামগ্রী তাদের জন্য সর্বদা নিয়োজিত তো অবশ্যই থাকবে, তবে তাদের সুন্দর ও মধুময় জীবন যাপন ও দৈহিক কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য নিয়োজিত থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

৫. জান্নাতদ্বয়ের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো "حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ" অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিত হূরগণও হবেন। এখানে তাঁবুসমূহ বলে সম্ভবত সে ধরনের তাঁবুসমূহ বুঝানো হয়েছে যা বড় বড় রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রমোদ ও বিহার কেন্দ্রসমূহ তৈরি করানো হয়। এ সকল কথার তাৎপর্য হচ্ছে– জান্নাতী লোকদের স্ত্রীগণ তাদের সাথে তাদের প্রাসাদোপম বাসভবনসমূহে বসবাস করতে থাকবে। আর তাদের ভ্রমণকেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন স্থানে তাঁবু খাটানো থাকবে। আর তাতে হুরগণ তাদের জন্য আনন্দ ও স্বাদের সামগ্রী পরিবেশন করবেন।

৬. উভয় জান্নাতের ৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় তারা এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। এ কথার দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ খুবই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে, আমোদ আহলাদে হাসি-খুশি, স্বাদ ও মজা উপভোগ করবে। এর নিগূঢ় কথা হচ্ছে- এ স্বাদ উপভোগ করার প্রকৃত স্থান হলো জান্নাত যা এ সকল সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ হবে। –[খাযিন]

আয়াতে হুরদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন– فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ অর্থাৎ, এ সকল নিয়ামতের মধ্যে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা রমণীগণও থাকবে। এখানে স্ত্রীদের আলোচনার পর হুরদের কথা উল্লেখ করে এটা বুঝানো হয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের থেকে আলাদা ধরনের মহিলা হবে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা ও এ ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসিলাম, হে রাসূল ﷺ ! পৃথিবীর নারীগণ উত্তম না হুরগণ! জবাবে মহানবী ﷺ বললেন– পৃথিবীর নারীগণ হুরদের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, এর কারণ কি! রাসূল ﷺ বললেন, পৃথিবীতে নারীগণ নামাজ-রোজাসহ অন্যান্য অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছে।

–[ইবনে কাসীর, তাবারানী, খাজিন]

অপর এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী মহিলাদের থেকে কোনো একজন পৃথিবীতে প্রকাশ পেত তবে আকাশ-পাতাল ও এর মধ্যবর্তী সকল স্থান আলোকিত হয়ে পড়ত এবং তার সুগন্ধিতে সমগ্র দুনিয়া বিমোহিত হয়ে যেত।

তাফসীরকার তাঁর هُمَا مِنْهَا কথা দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ "দুটি বাগানে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে।" এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন- هُمَا مِنْهَا অর্থাৎ খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা দ্বারা তিনি ফিকহের একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে কেউ যদি শপথ করে যে, আমি ফল খাব না, অতঃপর যদি খেজুর ও আনার খায় তা হলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যরা বলেছেন, ঐ ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা অধিকাংশ ফিকহবিদদের নিকট খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ যদি এই বলে শপথ করে যে, আমি ফল খাব না, অতঃপর সে খেজুর ও আনার খায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় আর তা হলো এই যে, খেজুর ও আনার যদি ফলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হলে অন্যান্য ফল থেকে খেজুর ও আনারকে আলাদা করে উল্লেখ করা হলো কেন? এ প্রশ্নের জবাব হলো- অন্যান্য ফলের মধ্য হতে তাকে আলাদা করে বলার উদ্দেশ্য হলো এ দুটি ফলের অধিক গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, এ দুটি ফল তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, তাদেরকে আলাদা করে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তারা ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ফল শুধু খাদ্য ও পানীয়ের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু আনার দ্বারা ঔষধও তৈরি করা হয়। সুতরাং তা শুধুমাত্র ফল নয়। আর উসূলের কায়দা হলো- مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ-এর তুলনায় مَعْطُوفٌ-এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু বিদ্যমান থাকলে তা عَطْف করা যায় না। সুতরাং কেউ যদি শপথ করে যে, 'আমি গোশত খাব না' তখন মাছ তার আওতায় পড়ে না। কেননা গোশত ও মাছের মধ্যে পার্থক্য বেশি আছে।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলকথা হলো খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে তাদেরকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব কেউ যদি ফল না খাওয়ার শপথ করে অতঃপর খেজুর ও আনার খায়, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[কামালাইন, জালালাইন, তাফসীরে কাবীর, খাযিন]

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ **আয়াত দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে** : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অর্থাৎ "বড়ই বরকতশালী মহান, মহা সম্মানিত, মাহাত্ম্যপূর্ণ আল্লাহর নাম।" সূরার মাঝামাঝিতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ" "প্রত্যেকটি জিনিস যা এ পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর মহান সত্তা-ই অবশিষ্ট থাকবে।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষে উপরিউক্ত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন কথা দ্বারা তিনি এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ায় মানুষকে যে নিয়ামতসমূহ দান করা হয়েছিল তা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এসব নিয়ামতের যিনি একমাত্র দাতা, তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উচিত এবং প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাসবীহ পাঠের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নবী করীম ﷺ সর্বদাই নামাজের পর তাসবীহ পাঠ করতেন। হাদীসে আছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهٖ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নামাজ শেষ করার পর তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার নিকট শান্তির প্রত্যাশা করি। বড়ই বরকতশালী তুমি! হে মহীয়ান! মহা সম্মানিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ নামাজের সালাম শেষ করার পর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করা পর্যন্ত বসতেন- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -[খাযিন, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

মোটকথা, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মূল দাতার তাসবীহ পাঠ করার জন্য আহ্বান করেছেন। কেননা সবকিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবেন মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لا قَامَتِ الْقِيَامَةُ .

১. যখন কিয়ামত ঘটবে, অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হবে।

٢. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ . نَفْسٌ تُكَذِّبُ بِأَنْ تَنْفِيَهَا كَمَا نَفَتْهَا فِي الدُّنْيَا .

২. এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না যে, তাকে অস্বীকার করবে যেমনিভাবে পৃথিবীতে তাকে অস্বীকার করেছিল।

٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ لا هِيَ مُظْهِرَةٌ لِخَفْضِ أَقْوَامٍ بِدُخُوْلِهِمُ النَّارَ وَلِرَفْعِ أُخْرِيْنَ بِدُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ .

৩. এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত; তা সম্প্রদায়সমূহের নীচুতাকে প্রকাশ করে দিবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশের কারণে এবং অপর সম্প্রদায়ের উচ্চতাকে প্রকাশ করে দিবে তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণে।

٤. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا لا حُرِّكَتْ حَرَكَةً شَدِيْدَةً .

৪. যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে অর্থাৎ প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়া করবে।

٥. وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا لا فُتِّتَتْ .

৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।

٦. فَكَانَتْ هَبَاءً غُبَارًا مُّنْبَثًّا لا مُنْتَشِرًا وَإِذَا الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنَ الْأُوْلٰى .

৬. ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়; দ্বিতীয় إِذَا টা প্রথম إِذَا হতে بَدَلٌ হবে।

٧. وَّكُنْتُمْ فِي الْقِيٰمَةِ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا ثَلٰثَةً .

৭. তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণিতে।

٨. فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ لا وَهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ . تَعْظِيْمٌ لِشَأْنِهِمْ بِدُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ .

৮. ডান দিকের দল তারা সে সকল লোক হবেন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো মুবতাদা। আর مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো তার খবর। কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা জান্নাতে প্রবেশ করার কারণে। এটা তাদের মহান মর্যাদার বিবরণ।

٩. وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ اَلشِّمَالِ بِاَنْ يُّؤْتٰى كُلٌّ مِنْهُمْ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ط تَحْقِيْرٌ لِشَانِهِمْ بِدُخُوْلِهِمُ النَّارَ .

৯. এবং বাম দিকের দল এভাবে যে, প্রত্যেকের আমল তাদের বাম হাতে প্রদান করা হবে কত হতভাগা বাম দিকের দল তারা দোজখে প্রবেশ করার কারণে, এটা তাদের নিকৃষ্ট অবস্থার বর্ণনা।

١٠. وَالسّٰبِقُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ مُبْتَدَأٌ السّٰبِقُوْنَ ۙ تَاكِيْدٌ لِتَعْظِيْمِ شَانِهِمْ وَالْخَبَرُ .

১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো কল্যাণের প্রতি, আর তারা হলেন নবীগণ। এটা মুবতাদা। অগ্রবর্তী তাদের উচ্চ মর্যাদার জন্য তাকীদ এবং খবর।

١١. اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ج

১১. তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত।

١٢. فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

১২. নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।

١٣. ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ مُبْتَدَأٌ اَىْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ .

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে মুবতাদা অর্থাৎ অতীত উম্মতগণের মধ্য হতে এক বড় দল।

١٤. وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ط مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمُ السّٰبِقُوْنَ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَهٰذِهِ الْاُمَّةُ وَالْخَبَرُ .

১৪. অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মতের মধ্য হতে। আর তারা হলো অগ্রবর্তী পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে এবং এই উম্মতের মধ্য হতে এবং এটা খবর।

١٥. عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ مَنْسُوْجَةٍ بِقُضْبَانِ الذَّهَبِ وَالْجَوَاهِرِ .

১৫. স্বর্ণখচিত আসনে অর্থাৎ স্বর্ণ ও মুক্তার তার দিয়ে নির্মিত।

١٦. مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ حَالَانِ مِنَ الضَّمِيْرِ فِى الْخَبَرِ .

১৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। খবরের যমীর থেকে উভয়টি حَالٌ হয়েছে।

١٧. يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ اَىْ عَلٰى شَكْلِ الْاَوْلَادِ لَا يَهْرَمُوْنَ .

১৭. তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা অর্থাৎ তারা বাচ্চাদের আকৃতিতে হবে; বৃদ্ধ হবে না।

١٨. بِاَكْوَابٍ اَقْدَاحٍ لَا عُرٰى لَهَا وَّاَبَارِيْقَ ۙ لَهَا عُرًى وَخَرَاطِيْمُ وَكَاْسٍ اِنَاءِ شُرْبِ الْخَمْرِ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ اَىْ خَمْرٍ جَارِيَةٍ مِنْ مَنْبَعٍ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا .

১৮. পানপাত্র যাতে হাতল থাকবে না কুঁজা যাতে হাতল ও নলা থাকবে ও পেয়ালা নিয়ে মদপান করার পাত্র প্রস্রবণনিঃসৃত সুরাপূর্ণ অর্থাৎ শরাবের এমন প্রবাহিত প্রস্রবণ যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

١٩. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ . بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا مِنْ نَزَفِ الشَّارِبِ وَانْزَفَ اَىْ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهَا صُدَاعٌ وَلَا ذَهَابُ عَقْلٍ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

১৯. সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না يُنْزَفُونَ শব্দের زَا، বর্ণে যবর ও যের উভয়রূপেই পঠিত। এটা نَزَفَ الشَّارِبِ وَانْزَفَ হতে নির্গত। অর্থাৎ এতে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানও বিলুপ্ত হবে না। পৃথিবীর শরাব এর বিপরীত। কেননা তাতে জ্ঞান লোপ পায়।

٢٠. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ لا

২০. আর তাদের পছন্দ মতো ফলমূল,

٢١. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ لا

২১. এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশত নিয়ে।

٢٢. وَلَهُمْ لِلْاِسْتِمْتَاعِ وَحُورٌ نِسَاءٌ شَدِيْدَاتُ سَوَادُ الْعُيُونِ وَبَيَاضُهَا عِينٌ ضِخَامُ الْعُيُونِ كُسِرَتْ عَيْنُهُ بَدَلَ ضَمِّهَا الْمُجَانَسَةِ الْيَاءِ وَمُفْرَدُهُ عَيْنَاءُ كَحَمْرَاءَ وَفِى قِرَاءَةٍ بِجَرِّ حُورٍ عِينٍ .

২২. এবং থাকবে তাদের উপভোগের জন্য হুর অর্থাৎ এমন নারী যাদের চোখের কালো অংশ/চোখের রাজা খুবই কালো হবে এবং চোখের সাদা অংশ খুবই সাদা হবে। আয়তলোচনা বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট। عِيْن শব্দের মধ্যে يَاء -কে عَيْن -এর সাদৃশ্যের কারণে যের দেওয়া হয়েছে। এর একবচন হলো عَيْنَاءُ যেমন حُمْرٌ -এর একবচন হলো حَمْرَاءُ রয়েছে। অপর এক কেরাতে حُوْرٍ عِيْنٍ টি جَرّ -এর সাথে রয়েছে।

٢٣. كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ج الْمَصُونِ .

২৩. সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

٢٤. جَزَاءً مَفْعُولٌ لَهُ اَوْ مَصْدَرٌ وَالْعَامِلُ مُقَدَّرٌ اَىْ جَعَلْنَا لَهُمْ مَا ذُكِرَ لِلْجَزَاءِ اَوْ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

২৪. তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। جَزَاءً এটা مَفْعُول لَهُ অথবা মাসদার এবং عَامِل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا لَهُمْ مَا ذُكِرَ لِلْجَزَاءِ অথবা جَزَيْنَاهُمْ

٢٥. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا فِى الْجَنَّةِ لَغْوًا فَاحِشًا مِنَ الْكَلَامِ وَلَا تَاْثِيْمًا لا مَا يُؤْثِمُ .

২৫. তারা শুনবে না সেথায় জান্নাতে অসার অথবা পাপবাক্য।

٢٦. اِلَّا لٰكِنْ قِيلًا قَوْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا بَدَلٌ مِنْ قِيلًا فَاِنَّهُمْ يَسْمَعُونَهُ .

২৬. সালাম আর সালামবাণী ব্যতীত। এটা قِيلًا হতে بَدَلْ হয়েছে। কেননা তারা তা শুনতে পাবে।

٢٧. وَاَصْحٰبُ الْيَمِينِ لا مَا اَصْحٰبُ الْيَمِينِ لا

২৭. আর ডানদিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল!

٢٨. فِىْ سِدْرٍ شَجَرِ النَّبْقِ مَخْضُودٍ لا شَوْكٍ فِيهِ .

২৮. তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুল-বৃক্ষ, مُسَدَّرٌ অর্থ- কুলবৃক্ষ।

٢٩. وَطَلْحٍ شَجَرِ الْمَوْزِ مَنْضُودٍ لا بِالْحَمْلِ مِنْ اَسْفَلِهِ اِلٰى اَعْلَاهُ .

২৯. কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ طَلْح অর্থ কলাগাছ, যা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ভরপুর/বোঝাই করা থাকবে।

৩০. وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ لا دَائِمٍ ـ

৩০. সম্প্রসারিত ছায়া স্থায়ী।

৩১. وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ لا جَارٍ دَائِمًا ـ

৩১. সদা প্রবহমান পানি সর্বদা প্রবাহিত।

৩২. وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لا

৩২. প্রচুর ফলমূল।

৩৩. لَّا مَقْطُوْعَةٍ فِيْ زَمَنٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ لا بِثَمَنٍ ـ

৩৩. যা শেষ হবে না কোনো কালে এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। মূল্য পরিশোধের জন্য।

৩৪. وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ط عَلَى السُّرُرِ ـ

৩৪. আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ খাটসমূহের উপর।

৩৫. اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً لا اَيِ الْحُوْرَ الْعِيْنَ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ـ

৩৫. তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। অর্থাৎ ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরদেরকে, যাদেরকে প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যতিত সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৬. فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا لا عَذَارٰى كُلَّمَا اَتَاهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ وَجَدُوْهُنَّ عَذَارٰى وَلَا وَجَعَ ـ

৩৬. তাদেরকে করেছি কুমারী যখনই তাদের স্বামীগণ তাদের নিকট আসবে তাদেরকে কুমারীই পাবে এবং কোনো কষ্টও হবে না।

৩৭. عُرُبًا بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا جَمْعُ عَرُوْبٍ وَهِيَ الْمُتَحَبِّبَةُ اِلٰى زَوْجِهَا عِشْقًا لَهُ اَتْرَابًا لا جَمْعُ تِرْبٍ اَيْ مُسْتَوِيَاتٍ فِي السِّنِّ ـ

৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা عُرُبًا শব্দটির رَاء বর্ণটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত। এটি عَرُوْبٌ -এর বহুবচন, عَرُوْبٌ বলা হয় এমন নারীকে যে প্রেমাসক্তের মতো তার স্বামীকে ভালোবাসে। اَتْرَابٌ শব্দটি تِرْبٌ -এর বহুবচন; অর্থ– সমবয়স্কা নারী।

৩৮. لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ صِلَةٌ اَنْشَانَاهُنَّ اَوْ جَعَلْنَاهُنَّ ـ

৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্য। لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ এটা جَعَلْنَاهُنَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অথবা اَنْشَانَاهُنَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ ; অর্থাৎ এই জিনিসগুলো ডানদিকের লোকদেরকে জন্য হবে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : وَاقِعَه হলো কিয়ামতের বিভিন্ন নামের মধ্য হতে একটি নাম, কিয়ামত নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার কারণে একে وَاقِعَه বলা হয়।

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : -এর اِذَا -এর মধ্যে অনেকগুলো দিক রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই–

اِذَا টা ظَرْف مَحْض -এর জন্য হবে। অর্থাৎ তাতে শর্তের অর্থ নেই। আর তার عَامِل হলো لَيْسَ আর তার অর্থটা نَفِيْ-এর উপর مُتَضَمِّنْ হওয়ার কারণে যেন এমন বলা হলো যে, اِنْتَفَى التَّكْذِيْبُ وَقْتَ وُقُوْعِهَا

অথবা شَرْطِيَه হবে এবং তার جَوَابْ টা উহ্য হবে। উহ্য ইবারত হবে– اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ আর এটা তার মধ্যে عَامِلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا : এখানে لَامْ টা فِيْ অর্থে হয়েছে। মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَيْسَ نَفْسٌ كَاذِبَةٌ تُوْجَدُ فِيْ وَقْتِ وُقُوْعِهَ -এখানে كَاذِبَة -এর মওসূফ نَفْس উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ : এটা هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর। যেমনটি মুফাসসির (র.) هِيَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন। مُظْهِرَةٌ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, خَفْض এবং رَفْع ইলমে আযালীর হিসেবে উহ্য রয়েছে। কিয়ামত সেটাকে প্রকাশ করে দিবে।

قَوْلُهُ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ : এই اِذَا টা হয়তো প্রথম اِذَا হতে بَدَلٌ হবে যেমনটি মুফাসসির (র.) পছন্দ করেছেন। অথবা দ্বিতীয় اِذَا টি প্রথম اِذَا -এর تَاكِيْد হবে অথবা এটা شَرْطِيَّة হবে এবং তার عَامِلٌ উহ্য হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, তার পরের فِعْل (رُجَّتْ) আমেল হবে।

قَوْلُهُ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ : এখানে اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো প্রথম মুবতাদা, مَا اِسْتِفْهَامِيَّة হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ জুমলা হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। দ্বিতীয় মুবতাদা স্বীয় খবরের সাথে মিলে প্রথম মুবতাদার খবর।

প্রশ্ন : খবর যদি জুমলা হয় তখন তাতে একটি عَائِد থাকা জরুরি; কিন্তু এখানে عَائِد নেই কেন?

উত্তর : اِسْم ظَاهِر টা যমীরের স্থলাভিষিক্ত। তাই عَائِد -এর প্রয়োজন নেই। বাক্যেরও এই তারকীব হবে। مَا যদিও বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আসে; কিন্তু কখনো কখনো তার মাধ্যমে সিফত ও হালত সম্পর্কে প্রশ্ন করাও উদ্দেশ্য হয়। যেমন– তুমি বললে مَا زَيْدٌ ? তখন বলা হবে عَالِمٌ অথবা طَبِيْبٌ

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ : এটার ثَاء বর্ণে পেশ দিয়ে অর্থ হলো– মানুষের বড় দল। আর ثَاء বর্ণে فَتْح হলে অর্থ হবে– বকরির পাল।

قَوْلُهُ مَوْضُوْنَةٍ : اَلْوَضْنُ অর্থ হলো نَضْدُ الدِّرْعِ বা বর্ম পরিধান করা। এখানে সাধারণভাবে বুনানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى سُرُرٍ مَوْضُوْنَةٍ : এটা ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ مُسْتَقِرِّيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে মুবতাদার খবর। আর مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ এই উভয়টি مُسْتَقِرِّيْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে। আবার এটা مُقَرَّبُوْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থ হলো– يَدُوْرُ حَوْلَهُمْ لِلْخِدْمَةِ غِلْمَانٌ لَا يَهْرَمُوْنَ وَلَا يَتَغَيَّرُوْنَ .

قَوْلُهُ لَا يَهْرَمُوْنَ : এটা مُخَلَّدُوْنَ -এর তাফসীর

قَوْلُهُ اَبَارِيْقَ : এটা اِبْرِيْقٌ -এর বহুবচন, অর্থ– পানপাত্র; এটা بَرِيْقٌ থেকে নির্গত। এই পাত্রগুলো যেহেতু খুবই উজ্জ্বল হবে এ কারণে এটাকে اِبْرِيْقٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ عِيْنٌ : এটা মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) তার উক্তি– لَهُمْ لِلْاِسْتِمْتَاعِ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَخْضُوْض : এটা خَضَدَ الشَّجَرَ خَضْدًا থেকে নির্গত। বাবে ضَرَبَ থেকে, অর্থ হলো কণ্টক ভেঙ্গে ফেলা।

قَوْلُهُ بِثَمَنٍ : যদি মুফাসসির (র.) بِشَيْءٍ বলতেন, তবে উত্তম হতো। কেননা শুধুমাত্র মূল্য ও দামের কারণেই নয়; বরং কোনো কারণেই জান্নাতীগণকে নিষেধ করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ওয়াকি'আ প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। –[বায়হাকী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মরদবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।
–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ২৭ পৃ. ১২৮]

এ সূরার আয়াত সংখ্যা - ৯৬, বাক্য ৮৭৮ আর অক্ষর হলো ১৯০৩ টি।

নামকরণ : ওয়াকি'আহ্ কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম। যেহেতু এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম শক্তি এ অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে তার সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

জীবনের ন্যায় মৃত্যু সত্য, আর মৃত্যুর ন্যায় হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানও সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতে কামেলার প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে কিয়ামতের দিনের মহাবিচারের ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করা আদৌ কঠিন নয়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় বেহেশতের সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই মনোমুগ্ধকর

এ **সূরার ফজিলত :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সূরা ওয়াকি'আ পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকেও তা শেখাও, এটি হলো 'সূরাতুল গিনা'।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে। -[ইবনে আসাকের, দায়লামী]

সূরা ওয়াকি'আর আমল :

১. তাফসীরে হক্কানীতে আছে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন এটি প্রাচুর্যের সূরা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে কখনো দারিদ্র ও অভাবে পতিত হবে না। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ১২৮]
২. যদি কেউ নিজের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এবং রিজিকের প্রাচুর্য কামনা করে, তবে তাকে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার রাত্রে মাগরিবের নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং ইশার নামাজের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তারপর প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর এবং মাগরিবের নামাজের পর ১বার এ সূরা পাঠ করতে হবে। এ আমলের বরকতে এর পাঠক শীঘ্রই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।
৩. এ সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে রাখলে সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর রিজিকপ্রাপ্ত হওয়া যায়।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আসন্ন সন্তানপ্রসবা নারীর সঙ্গে এ সূরা বেঁধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একচল্লিশবার সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে, তবে তার আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া হবে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করছে, তবে তার রিজিক বৃদ্ধি করা হবে এবং আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে তার হেফাজত করা হবে।

সূরা ওয়াকি'আর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব: অন্তিম রোগশয্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন : ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা.) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

হযরত ওসমান গনী(রা.) বলেন- مَا تَشْتَكِيْ অর্থাৎ আপনার অসুখটা কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- ذُنُوْبِيْ অর্থাৎ আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।
হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন- مَا تَشْتَهِيْ অর্থাৎ আপনার বাসনা কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- رَحْمَةَ رَبِّيْ অর্থাৎ আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।
হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন- আমি আপনার জন্য কোনো চিকিৎসক ডাকব কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- اَلطَّبِيْبُ اَمْرَضَنِيْ অর্থাৎ চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।
হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন- আমি আপনার জন্য সরকারি বায়তুলমাল থেকে কোনো উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا -এর কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন, উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আপনি তো চিন্তা করেছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ করি না। কারণ আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করবে, সে কখনো উপবাস করবে না। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা রাহমানের শুরুতে আল্লাহ পাকের কুদরত, হিকমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে, এরপর এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উল্লেখ করে কিয়ামত কায়েম হওয়ার মাধ্যমে এ জগতের ধ্বংসের ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার প্রারম্ভেই কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা রহমানে আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানানো হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা রাহমানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সে কঠিন দিনের জন্যে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এ সূরায় একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামত এমনি এক মহাসত্য, যাকে অস্বীকার করা যায় না, যাকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায় না, যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন একদল লোক সম্মানিত হবে, আরেক দল লোক অপমানিত হবে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ

করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর। ইরশাদ হয়েছে- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ . خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ . অর্থাৎ যখন কিয়ামত ঘটবে, যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই, যা কিছু লোককে করবে অবনত আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

সূরা রাহমানের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, কখন প্রকাশিত হবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা?

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : ইবনে কাসীর (র.) বলেন, ওয়াকি'আ কিয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা এর বাস্তবতায় কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ : كَاذِبَةٌ শব্দটি عَاقِبَةٌ -এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

قَوْلُهُ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই বাক্যের তাফসীর এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً : **হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে :** ইবনে কাসীর (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডান পার্শ্বে থাকবে। তারা হযরত আদম (আ.)-এর ডান পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাত দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরেশের বামদিকে একত্র হবে। তারা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

قَوْلُهُ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ : ইমাম আহমদ (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে, যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ (র.) বলেন, سَابِقِيْنَ তথা অগ্রবর্তীগণ বলে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (র.)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছে তারা অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারো কারো মতে, যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ : ثلة শব্দের অর্থ- দল। আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে, বড় দল। -[রূহুল মা'আনী]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা : আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে। এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তাফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। যথা-

১. হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ এই তাফসীর করেছেন। হযরত জাবের (রা.) -এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তাফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাদীসে বলা হয়েছে, যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ নাজিল হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) বিস্ময় সহকারের আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশি এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাজিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

اِسْمَعْ يَا عُمَرُ مَا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ اَلَا وَاِنَّ مِنْ اٰدَمَ اِلَىَّ ثُلَّةٌ وَاُمَّتِىْ ثُلَّةٌ

অর্থাৎ শোন হে ওমর! আল্লাহ নাজিল করেছেন যে, পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমার পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত হবে অপর বড় দল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম ব্যথিত হন যে, আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হবো। তখন ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ আয়াতখানি নাজিল হয়। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা [অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী] জান্নাতে সমগ্র উম্মতের মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকি অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে। –[ইবনে কাসীর]

এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা প্রথম আয়াত قَلِيْلٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত ثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জবাবে 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর (রা.) দুঃখিত হওয়ার কারণে এরূপ হতে পারে হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় যখন ثُلَّة [বড় দল] শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলো, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গাম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মোকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মাদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

২. তাফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুরূনে উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে, উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত : যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরো বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন! অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তীগণের তাফসীর প্রসঙ্গে এ কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ– مَنْ مَضٰى مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ পূর্ববর্তীগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, আলেমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ হোক। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থনে হযরত আবূ বকরা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস করা হয়েছে।

عَنْ اَبِیْ بَکْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ فِیْ قَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ قَالَ هُمْ جَمِیْعًا مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

"একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে" আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন, তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তাফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মুহাম্মাদী হবে। -[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কুরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোনো উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে- এটা সুদূরপরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَنْتُمْ تَتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ اٰخِرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে- এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম, নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন وَالَّذِیْ نَفْسُ بِیَدِهٖ اِنِّیْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে সত্তার করায়ত্ত্ব আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। -[বুখারী, মাযহারী]

اَهْلُ الْجَنَّةِ مِاَةٌ وَعِشْرُوْنَ صَفًّا ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ

অর্থাৎ জান্নাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্যে থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরিক হবে।

উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়েই থাকে।

قَوْلُهٗ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে যে, مَوْضُوْنَةٍ-এর অর্থ হলো- স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

قَوْلُهٗ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ : অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোনো তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهٗ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ : اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ- গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اَبَارِيْقُ শব্দটি اِبْرِيْقٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- কুজা। كَاْسٌ-এর অর্থ সুরা পানের পিয়ালা। مَعِيْنٌ-এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি ঝরনা থেকে আনা হবে।

قَوْلُهٗ لَا يُصَدَّعُوْنَ : এটা صَدْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাচক্র দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

قَوْلُهٗ لَا يُنْزِفُوْنَ : نَزْفٌ-এর আসল অর্থ- কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে نَزْفٌ-এর অর্থ হলো- জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

قَوْلُهٗ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ : অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোশত। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোশত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ : মুমিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেউ তো নিছক আল্লাহ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোনো নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আজাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আজাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ পাপী মুমিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আজাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ : জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কুরআন পাক মানুষের বোধগম্য ও পছন্দসই বস্তু সমস্ত উল্লেখ করেছে। আরবরা সেসব চিত্ত বিনোদন ও ফলমূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْر -এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَخْضُوْد -এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طَلْح -এর অর্থ কলা مَنْضُوْد -এর অর্থ কাঁদি কাঁদি। ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -এর অর্থ আছে অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। مَاءٍ مَّسْكُوْبٍ -এর অর্থ- মাটির প্রবাহিত পানি।

قَوْلُهُ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ : প্রচুর ফল। অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশি হবে এবং এর প্রকারও অনেক হবে। لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মৌসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোনো ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মৌসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোনো ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে; কোনো মৌসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে; কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোনো বাধা থাকবে না।

قَوْلُهُ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ : فُرُش শব্দটি فِرَاشٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বিছানা, ফরাশ। উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয় এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারো কারো মতে, এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত। -[মাযহারী] এই অর্থ অনুযায়ী مَرْفُوْعَة -এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً : اَنْشَاء শব্দের অর্থ- সৃষ্টি করা। هُنَّ সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فِرَاش -এর অর্থ জান্নাতে বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিযাতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে আগমন করলেন! তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি আরজ করলাম, সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাস্যচ্ছলে বললেন- لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ অর্থাৎ জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেল! কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধরা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اَبْكَارًا : এটা بِكْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ عُرُبًا : এটা عَرُوْبَة -এর বহুবচন। অর্থ- স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

قَوْلُهُ اَتْرَابًا : এটা تِرْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ- সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে। -[মাযহারী]

অনুবাদ :

٣٩. وَهُمْ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ

৩৯. তাদের অনেক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে,

٤٠. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

৪০. এবং অনেক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

٤١. وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ

৪১. আর বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!

٤٢. فِىْ سَمُوْمٍ رِيْحٍ حَارَّةٍ مِنَ النَّارِ تَنْفُذُ فِى الْمَسَامِ وَّحَمِيْمٍ مَاءٍ شَدِيْدِ الْحَرَارَةِ.

৪২. তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে سُمُوْم বলা হয় অগ্নি উত্তপ্ত বায়ুকে, যা লোমকূপ ভেদ করে চামড়ার ভিতরে ঢুকে যাবে।

٤٣. وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ دُخَانٍ شَدِيْدِ السَّوَادِ.

৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, يَحْمُوْم -এর ধোঁয়াকে বলা হয় যা খুবই কালো হবে।

٤٤. لَا بَارِدٍ كَغَيْرِهٖ مِنَ الظِّلَالِ وَّلَا كَرِيْمٍ حَسَنِ الْمَنْظَرِ.

৪৪. যা শীতল নয় যেমন অন্যান্য ছায়া শীতল হয়ে থাকে এবং আরামদায়কও নয়। অর্থাৎ উপভোগ্য দৃশ্যও নয়।

٤٥. اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا مُتْرَفِيْنَ مُنَعَّمِيْنَ لَا يَتْعَبُوْنَ فِى الطَّاعَةِ.

৪৫. ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল পৃথিবীতে ভোগ বিলাসে পুণ্যের জন্য কষ্ট সহ্য করত না।

٤٦. وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ اَىِ الشِّرْكِ.

৪৬. তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে অর্থাৎ শিরকে।

٤٧. وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ائِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ فِى الْهَمْزَتَيْنِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

৪৭. আর তারা বলত, মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি উত্থিত হবো আমরা? ءَاِذَا এবং اَئِنَّا -এর মধ্যে উভয় স্থানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে এবং উভয় সুরতে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٤٨. اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ. بِفَتْحِ الْوَاوِ لِلْعَطْفِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَهُوَ فِىْ ذٰلِكَ وَفِيْمَا قَبْلَهٗ لِلْاِسْتِبْعَادِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ عَطْفًا بِاَوْ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ اِنَّ وَاسْمِهَا.

৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? এখানে اَوَ -এর وَاو টি যবরের সাথে আতফের জন্য এবং হামযাটা اِسْتِفْهَام -এর জন্য এবং এই اِسْتِفْهَام এখানে ও এর পূর্বে اِسْتِبْعَاد -এর জন্য। অপর এক কেরাতে وَاو টি সাকিন সহকারে اَوْ দ্বারা আতফ করে। আর اِنَّ ও তার ইসিমের مَحَلّ হলো মা'তুফ আলাইহি।

٤٩. قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

৪৯. বলুন, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ।

٥٠. لَمَجْمُوعُونَ لا إِلَى مِيقَاتِ لِوَقْتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ أَيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

৫০. সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

٥١. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لا

৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্তকারী অস্বীকারকারীরা!

٥٢. لَاٰكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ بَيَانٌ لِلشَّجَرِ.

৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে مِنْ زَقُّومٍ -এটা شَجَرَة -এর বয়ান হয়েছে।

٥٣. فَمَالِئُونَ مِنْهَا مِنَ الشَّجَرِ الْبُطُونَ.

৫৩. এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে অর্থাৎ ঐ বৃক্ষ থেকে।

٥٤. فَشٰرِبُونَ عَلَيْهِ أَيِ الزَّقُّومِ الْمَأْكُولِ مِنَ الْحَمِيمِ ج

৫৪. পরে তোমরা পান করবে তার উপর ভক্ষিত যাক্কুমের উপর অত্যুষ্ণ পানি।

٥٥. فَشٰرِبُونَ شُرْبَ بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَضَمِّهَا مَصْدَرُ الْهِيمِ ط الْإِبِلِ الْعِطَاشِ جَمْعُ هَيْمَانَ لِلذَّكَرِ وَهَيْمٰى لِلْأُنْثٰى كَعَطْشَانَ وَعَطْشٰى.

৫৫. আর পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। شُرْب শব্দটির شِيْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকতই হতে পারে। এটা মাসদার। আর اَلْهِيْمُ তৃষ্ণার্ত উটকে বলা হয়। এটা هَيْمَانَ -এর বহুবচন, এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো هَيْمٰى অর্থ তৃষ্ণার্ত উটনী। যেমন- عَطْشٰى এবং عَطْشَانَ

٥٦. هٰذَا نُزُلُهُمْ مَا أُعِدَّ لَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

৫৬. এটাই হবে তাদের জন্য আপ্যায়ন। যা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কিয়ামতের দিন।

٥٧. نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ أَوْجَدْنَاكُمْ عَنْ عَدَمٍ فَلَوْلَا هَلَّا تُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ إِذَا الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَةِ.

৫৭. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছি। তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না? পুনরুত্থানে। যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনরায় উঠাতেও সক্ষম।

٥٨. أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ط تُرِيقُونَ الْمَنِيَّ فِيْ أَرْحَامِ النِّسَاءِ.

৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে যে বীর্য তোমরা স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে পৌছে দাও।

٥٩. أَأَنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرٰى وَتَرْكِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ تَخْلُقُونَهُ أَيِ الْمَنِيَّ بَشَرًا أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُونَ.

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর অর্থাৎ বীর্য হতে মানুষ নাকি আমি সৃষ্টি করি? أَأَنْتُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয় হামযাকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করে এবং তাকে تَسْهِيل [সহজিকরণ] করে, সহজকৃত এবং, দ্বিতীয় হামযার মাঝে اَلِف বৃদ্ধি করে এবং এটাকে পরিত্যাগ করে চারো স্থানে পঠিত হয়েছে।

٦٠. نَحْنُ قَدَّرْنَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۙ بِعَاجِزِيْنَ .

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি। قَدَّرْنَا শব্দটির دَالْ বর্ণে তাশদীসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং আমি অক্ষম নই।

٦١. عَلٰى عَنْ اَنْ نُّبَدِّلَ نَجْعَلَ اَمْثَالَكُمْ مَكَانَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ نُخْلِقَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنَ الصُّوَرِ كَالْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ .

৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জান না। আকৃতিসমূহ হতে। যেমন– বানর ও শূকরের আকৃতিতে।

٦٢. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ فِى الذَّالِ .

৬২. তোমরা তো অবগত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে اَلنَّشْاَةُ শব্দটি অন্য এক কেরাতে شِيْن বর্ণে سُكُوْن -এর সাথে এসেছে। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? এখানে تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দ্বিতীয় تَاء -কে ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٦٣. اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ؕ تُثِيْرُوْنَ الْاَرْضَ وَتُلْقُوْنَ الْبَذْرَ فِيْهَا .

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? যে জমি চষে তাতে বীজ বপন কর।

٦٤. ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ تُنْبِتُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ .

৬৪. তোমরা কি তাতে অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরিত করি?

٦٥. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا نَبَاتًا يَابِسًا لَا حَبَّ فِيْهِ فَظَلْتُمْ اَصْلُهٗ ظَلِلْتُمْ بِكَسْرِ اللَّامِ فَحُذِفَتْ تَخْفِيْفًا اَيْ اَقَمْتُمْ نَهَارًا تَفَكَّهُوْنَ حُذِفَتْ مِنْهُ اِحْدَى التَّاءَيْنِ فِي الْاَصْلِ تَعْجَبُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَتَقُوْلُوْنَ .

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। অর্থাৎ শুষ্ক ঘাসে, ফলে তাকে একটি শস্যদানা ও উৎপাদিত হবে না। তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। فَظَلْتُمْ মূলত ছিল ظَلِلْتُمْ তথা لَامْ বর্ণটি যেরযুক্ত সহজীকরণের জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সারা দিন পেরেশান হয়ে যাও। আর تَفَكَّهُوْنَ -এর মধ্যে মূলত একটি تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আশ্চর্যের মধ্যে থেকে যাও এবং বলতে থাক।

٦٦. اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۙ نَفَقَةَ زَرْعِنَا .

৬৬. আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের বীজ বপনের খরচের।

٦٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ مَمْنُوْعُوْنَ رِزْقَنَا .

৬৭. বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমাদের জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

٦٨. اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ؕ

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ?

٦٩. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ السَّحَابِ جَمْعُ مُزْنَةٍ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ .

৬৯. তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, নাকি আমি তা বর্ষণ করি। مُزْنٌ শব্দটি مُزْنَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– মেঘ।

٧٠. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا اُجَاجًا مِلْحًا لَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ فَلَوْلَا فَهَلَّا تَشْكُرُوْنَ.

৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। ফলে তা পান করার অনুপুযুক্ত হয়ে পড়বে। /পান করা অসম্ভবপর হয়ে পড়বে। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?

٧١. اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ. تُخْرِجُوْنَ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ.

৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? অর্থাৎ যা তোমরা সবুজ বৃক্ষ হতে বের কর।

٧٢. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا كَالْمَرْخِ وَالْعَفَارِ وَالْكَلْخِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ.

৭২. তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, যেমন غَفَار، مَرْخ ও كَلْخ নাকি আমি সৃষ্টি করি?

٧٣. نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً لِنَارِ جَهَنَّمَ وَّمَتَاعًا بُلْغَةً لِّلْمُقْوِيْنَ. لِلْمُسَافِرِيْنَ مِنْ اَقْوَى الْقَوْمِ اَيْ صَارُوْا بِالْقَوِيِّ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ اَيِ الْقَفْرُ وَهُوَ مَفَازَةٌ لَا نَبَاتَ فِيْهَا وَلَا مَاءَ.

৭৩. আমি একে করেছি নিদর্শন জাহান্নামের আগুনের জন্য স্মারক এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। مُقْوِيْنَ শব্দটি اَقْوَى الْقَوْمِ হতে নির্গত। অর্থাৎ মরুভূমিতে পৌঁছে গেছে। اَلْقِوٰى শব্দটির قَاف বর্ণে যের এবং يَاء টি মদ সহকারে অর্থাৎ قَفْر তথা মরুভূমি/শূন্য প্রান্তর। এরূপ শূন্য প্রান্তর যাতে পানি ও তরুলতা কিছুই নেই।

٧٤. فَسَبِّحْ نَزِّهْ بِاسْمِ زَائِد رَبِّكَ الْعَظِيْمِ اَيِ اللّٰهِ.

৭৪. সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ আল্লাহর। আর আয়াতে اِسْم শব্দটি অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هُمْ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ سَمُوْم : এর অর্থ লু হাওয়া, গরম বাষ্প, বিষের মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রচণ্ড গরম বায়ু। এটা مُؤَنَّث سَمَاعِىٌّ বহুবচনে سَمَائِمُ; এটাকে এ কারণে سَمُوْم বলা হয় যে, এটা শারীরে লোমকূপের মাধ্যমে চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে। এর থেকে اَلسُّمُّ অর্থ– বিষ নির্গত হওয়া। কেননা বিষও চামড়ার ভিতর প্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ইল্লত হওয়ার কারণে تَعْلِيْلِه হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বামপন্থিরা এ জন্য শাস্তির উপযুক্ত হবে যে, তার স্বী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লিপ্ত ও মত্ত হওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে বড় গোনাহ শিরক ও কুফরিতেও অটল ছিল এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে ছিল।

قَوْلُهُ اِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : মুফাসসির (র.) এখানে وَتَرْكِه -এর বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। যাতে চারটি কেরাত হয়ে যায়। মুফাসসির (র.)-এর কেরাত দ্বারা শুধুমাত্র দুটি কেরাতই বুঝে আসে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ اِسْمِ اِنَّ وَاِسْمِهَا : এখানে اِنَّ وَاِسْمِهَا -এর মধ্যে مَعَ টা وَاو অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ -এর আতফ اِنَّ -এর مَحَلّ উপর তার اِسْم সহ হয়েছে। এ কারণেই اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ টা مَرْفُوْع হয়েছে। এটা সেই সুরতে হবে যখন اِنَّ -এর খবর لَمَبْعُوْثُوْنَ -এর উপর অগ্রগামী মানা হবে, উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে– اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ وَاٰبَاؤُنَا অন্যথায় لَمَبْعُوْثُوْنَ -এর ضَمِيْر مَرْفُوْع مُسْتَتِرْ -এর উপর আতফ হবে।

প্রশ্ন : ضَمِيْر مَرْفُوْع مُسْتَتِر مُتَّصِل -এর উপর আতফ করতে হলে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি, যা এখানে বিদ্যমান নেই। উহ্য ইবারত لَمَبْعُوْثُوْنَ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : যখন مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه -এর মাঝে পার্থক্য না থাকে তখন ضَمِيْر مُنْفَصِل দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি। অন্যথায় নয়। এখানে اَوْ اٰبَائُنَا -এর মধ্যে هَمْزَه اِسْتِفْهَام দ্বারা পার্থক্য বিদ্যমান।

قَوْلُهُ لِوَقْتٍ اَىْ فِىْ وَقْتٍ : مِيْقَاتٌ টা وَقْتٌ অর্থে হয়েছে। আর لَامٌ টা فِىْ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : لَمَجْمُوْعُوْنَ -এর সেলাহ فِىْ আসে, اِلٰى নয়। অথচ এখানে اِلٰى আনা হয়েছে।

উত্তর : لَمَجْمُوْعُوْنَ এটা لَمَسُوْقُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এর সেলাহ اِلٰى আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَالِـئُوْنَ مِنْهَا : এখানে مِنْهَا -এর যমীর شَجَر -এর দিকে ফিরেছে اِسْم جِنْس হওয়ার কারণে। কেননা اِسْم جِنْس -এর মধ্যে مُؤَنَّث ও مُذَكَّر উভয়টি হওয়ারই অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْهِيْم : ভীষণ তৃষ্ণার্ত উটকে اَلْهِيْمُ বলা হয় আর اِسْتِسْقَاء রোগকে هَيَامٌ বলা হয়। যাতে খুব বেশি তৃষ্ণা অনুভূত হয়। এমন কি অধিক পানি পান করার পরও পরিতৃপ্ত হয় না, এই ব্যাধিকে জলান্ধরও বলা হয়। মুফাসসির (র.)-এর বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هِيْم শব্দটি هَيْمَان [যা পুং লিঙ্গ] এবং هَيْمٰى [যা স্ত্রী লিঙ্গ উভয়েরই বহুবচন। মুফাসসির (র.)-এর هِيْم কে هَيْمَان -এর বহুবচন লেখাটা লেখার ভ্রান্তি মাত্র। এটা বলাও বৈধ যে, এটা اَهْيَمُ -এর বহুবচন। কেননা هِيْم টা মূলত هُيْم ছিল [هَاء বর্ণটি পেশ সহকারে] حُمْر -এর ওযনে هَاء এর পেশকে يَاء -এর অনুসরণে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং فُعْل হলো اَفْعَل -এর বহুবচন, যেমন حُمْر টা اَحْمَرُ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا :

প্রশ্ন : لَوْ -এর জবাবে لَامٌ নেওয়া আবশ্যক হয়। কাজেই لَجَعَلْنَاهُ হওয়া উচিত ছিল। তা না করে কি কারণে لَامٌ -কে ফেলে দেওয়া হলো?

উত্তর : এখানে لَام تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই। কেননা মেঘের মালিকানা এবং পানি লবণাক্তকরণ কোনো মানুষের শক্তিতে নেই। এ কাজের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ক্ষেত ও ভূমি এর বিপরীত। তাতে মালিকানা সম্প্রসারিত। এ কারণেই পূর্বে لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا -এর মধ্যে لَام تَاكِيْد নেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ : ثُلَّةٌ শব্দের অর্থ এবং اَوَّلِيْن ও اٰخِرِيْن -এর তাফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হযরত আদম (আ.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اٰخِرِيْنَ তথা পরবর্তীগণ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা মুমিন মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثُلَّةٌ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, তারা পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তীগণ এই উম্মতের মধ্যে থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মুমিন মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোনো যুগ 'আসহাবুল ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

قَوْلُهُ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডানদিকের লোকদের জন্যে জান্নাতে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াত থেকে যারা ভাগ্যাহত, বদনসীব, যারা কাফের, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ, যারা বামদিকের দলে থাকবে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ـ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ـ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُوْمٍ ـ অর্থাৎ আর বামদিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা। তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস এবং ফুটন্ত পানিতে। তারা থাকবে ধোঁয়াচ্ছন্ন ছায়ার। যা ঠাণ্ডাও হবে না এবং আরামদায়কও হবে না। তাদের সুখও থাকবে না, শান্তিও থাকবে না, আর থাকবে না তাদের মান সম্মান। অপমান এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হবে তাদের জীবন-সাথী। দুঃখ-দুর্দশায় বিপদাপদে তারা থাকবে জর্জরিত, এর কারণ এই যে, তারা দুনিয়ার জীবনে ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, কুফারি ও নাফরমানিতে ব্যস্ত, আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ, দম্ভ ও অহংকার ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, তারা ছিল আত্মবিস্মৃত, তারা বিস্মৃত হয়েছিল তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে, শিরক ও কুফরকে তারা কল্যাণের পথ মনে করেছিল, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তারা জিদ বজায় রেখেছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে- اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ـ

ইতিপূর্বে তারা [অর্থাৎ দুনিয়াতে] ভোগ বিলাসে মত্ত থাকত, এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত থাকতে জিদ করতো। اَلْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থাৎ অত্যন্ত বড় অপরাধ যেমন শিরক। ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, এটি হলো জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা। কেননা কাফেররা মিথ্যা শপথ করে বলতো যে, তাদের পুনর্জীবন দেওয়া হবে না, তাদের পুনরুত্থান হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلْحِنْثِ الْعَظِيْمِ শব্দটি দ্বারা কুফর ও শিরককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন"। বস্তুত কাফেররা শুধু যে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসে মত্ত এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা আখিরাতও বিশ্বাস করতো না। তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং বিদ্রূপ করে বলতো, আমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবো, চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, এরপর কি আবার জীবিত হবো? তা কি করে সম্ভব? তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত মতের জবাবে ইরশাদ করেছেন-

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ .... اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ـ

অর্থাৎ '[হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, পূর্ববর্তীরা এবং পরবর্তীরা সকলকে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে। এরপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা' [তোমাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তথা দোজখের শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর]।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন যে, হে রাসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমাদের সকলকে অবশেষে একদিন তথা কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে, তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

হযরত রাসূলে করীম ﷺ কিয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন দোজখ থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি কানও থাকবে, এর দ্বারা সে দেখবে, শুনবে। তার একটি রসনা থাকবে তা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তিন প্রকার লোকের উপর- ১. প্রত্যেক অবাধ্য এবং একগুয়ে লোকের উপর। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরিক করে অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ৩. যে ছবি প্রস্তুত করে। তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন এমন এক দোজখী ব্যক্তিকে একবার দোজখে ডুবিয়ে আনা হবে, যে দুনিয়ার জীবনে সর্বাধিক ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভোগ বিলাস করছো? কখনো কি তুমি সুখ শান্তি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছো? তখন সে বলবে, আল্লাহ পাকের শপথ! কখনো না [অর্থাৎ অল্পক্ষণ দোজখের কঠোর শাস্তি দেখার পর অবস্থা এমন হবে যে, সে ব্যক্তি

সারা জীবনের ভোগ বিলাসকে এক মুহূর্তে ভুলে যাবে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এমন একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে ডুবিয়ে আনা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্টে ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহ পাকের শপথ! আমি কখনো কোনো রকম দুঃখ কষ্ট দেখিনি [অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করার পর সে দুনিয়ার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে।]

মূলত আলোচ্য আয়াতসমূহে দোজখের কঠিন শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে দোজখের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ পরিণামদর্শী হয়, এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا অর্থাৎ "তারা দোজখে গরম পানি এবং পুঁজ ব্যতীত কোনো পানীয়ের স্বাদে গ্রহণ করবে না"।

আরো ইরশাদ হয়েছে- يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ অর্থাৎ "তাদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে, পরিণামে তাদের উদরের সবকিছু এবং চামড়াসমূহ গলে বের হয়ে যাবে"।

এমনি আরো বহু আয়াতে দোজখের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে [আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন]।

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরের মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষেরই সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোশ উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে! এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে, এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে, সবকিছু কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলির মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলিকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রথম খোদ মানবসৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোশ উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা তিনি প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত একটি দাবি করে এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানবসৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পরস্পরিক মিলনই মানবসৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে- أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরি করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে

একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোনো খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোনো বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোনো স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা আপনি তৈরি হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরি হলো, কিভাবে হলো? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরি করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ মহান] বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এর পরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোনো জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানবুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি। ইরশাদ হচ্ছে- وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোনো জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তন হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আজাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ : খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানবসৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অঙ্কুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জবাব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অঙ্কুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাজতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্যে থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরি করেছে বলে দাবিও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্যে থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরি করল? জবাব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলো সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ : مُقْوِيْنَ শব্দটি اِقْوَاءٌ থেকে এবং اِقْوَاءٌ শব্দটিকে قَوَاءٌ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো- মরু। কাজেই قَوِيٌّ শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমারই শক্তি সার্থ্যের ফসল।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে; এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

অনুবাদ :

٧٥. فَلَآ أُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۙ بِمَسَاقِطِهَا لِغُرُوْبِهَا .

৭৫. আমি শপথ করছি এখানে لَا টা অতিরিক্ত নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের সেগুলো অস্তমিত হওয়ার।

٧٦. وَإِنَّهٗ أَيِ الْقَسَمُ بِهَا لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۙ أَيْ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ ذَوِى الْعِلْمِ لَعَلِمْتُمْ عِظَمَ هٰذَا الْقَسَمِ .

৭৬. অবশ্যই এটা এদের শপথ এক মহা শপথ যদি তোমরা জানতে অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে এই শপথের মহত্ত্ব জেনে নিবে।

٧٧. إِنَّهٗ أَيِ الْمَتْلُوُّ عَلَيْكُمْ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۙ

৭৭. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ যা তোমাদের নিকট পঠিত হচ্ছে সম্মানিত কুরআন।

٧٨. فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۙ مَصُوْنٍ وَهُوَ الْمُصْحَفُ .

৭৮. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে আর তা হলো মাসহাফ।

٧٩. لَا يَمَسُّهٗٓ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ط أَيِ الَّذِيْنَ طَهَّرُوْا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْأَحْدَاثِ .

৭৯. যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। لَا يَمَسُّهٗ এটা খবর نَهْى অর্থে। অর্থাৎ যারা নিজেদের কে অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে নিয়েছেন।

٨٠. تَنْزِيْلٌ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৮০. এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

٨١. أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْقُرْاٰنِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ مُتَهَاوِنُوْنَ مُكَذِّبُوْنَ .

৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে কুরআনকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে? গুরুত্ব না দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

٨٢. وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ مِنَ الْمَطَرِ أَيْ شُكْرَهٗ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ . بِسُقْيَا اللّٰهِ حَيْثُ قُلْتُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا .

৮২. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ অর্থাৎ আল্লাহর পরিতৃপ্ত করাকে مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا বলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ? অর্থাৎ অমুক তারকা উদিত হওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়েছে।

٨٣. فَلَوْلَآ فَهَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ وَقْتَ النَّزْعِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ .

৮৩. পরন্তু কেন নয়- প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় সুতরাং যখন রূহ বের হওয়ার সময় খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

٨٤. وَأَنْتُمْ يَا حَاضِرِى الْمَيِّتِ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ إِلَيْهِ .

৮৪. এবং তোমরা হে মৃতের নিকট উপস্থিত লোকেরা! তখন তাকিয়ে থাকো তার দিকে।

٨٥. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ بِالْعِلْمِ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ مِنَ الْبَصِيْرَةِ أَيْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

৮৫. আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর জ্ঞানের দিক থেকে। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না تُبْصِرُوْنَ টা بَصِيْرَةٌ হতে নির্গত। অর্থাৎ আমার বিদ্যমানতার জ্ঞান তোমাদের হয় না।

٨٦. فَلَوْلَاَ فَهَلَّا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ . مُجْزِيِيْنَ بِأَنْ تُبْعَثُوْا اَىْ غَيْرَ مَبْعُوْثِيْنَ بِزَعْمِكُمْ .

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও। অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে না।

٨٧. تَرْجِعُوْنَهَا تُرَدُّوْنَ الرُّوْحَ إِلَى الْجَسَدِ بَعْدَ بُلُوْغِ الْحُلْقُوْمِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فِيْمَا زَعَمْتُمْ فَلَوْلَا الثَّانِيَةُ تَاكِيْدٌ لِلْاُوْلٰى وَإِذَا ظَرْفٌ لِتَرْجِعُوْنَ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الشَّرْطَانِ وَالْمَعْنٰى هَلَّا تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيْنَ فِىْ نَفْيِهِ اَىْ لِيَنْتَفِىَ عَنْ مَحَلِّهَا الْمَوْتَ .

৮৭. তবে তোমরা তা ফিরাও না কেন? অর্থাৎ রূহ কণ্ঠাগত হওয়ার পর তোমরা একে শরীরের দিকে ফিরিয়ে দাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমাদের ধারণা মতে। দ্বিতীয় لَوْلَا টি প্রথম لَوْلَا -এর تَاكِيْد আর بَلَغَتْ -إِذَا -এর মধ্যে إِذَا টা تَرْجِعُوْنَ -এর ظَرْف হয়েছে। আর تَرْجِعُوْنَ -এর সাথে দুটি শর্ত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ তোমরা যদি পুনরুত্থান না হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তবে তাকে কেন ফিরিয়ে নাও না? যাতে করে মৃত্যুটা نَفْس -এর মহল হতে مُنْتَفِى হয়ে যাবে।

٨٨. فَاَمَّا إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ .

৮৮. যদি সে মৃত ব্যক্তি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়।

٨٩. فَرَوْحٌ اَىْ فَلَهُ اِسْتِرَاحَةٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ رِزْقٌ حَسَنٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَهَلِ الْجَوَابُ لِاَمَّا اَوْ لِاِنْ اَوْ لَهُمَا اَقْوَالٌ .

৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে আরাম ও উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান, فَرَوْحٌ এটা হয়তো اَمَّا -এর জবাব হবে অথবা إِنْ -এর জবাব হবে অথবা উভয়ের জবাব হবে। এতে কয়েকটি [তিনটি] মত রয়েছে।

٩٠. وَاَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ من اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ .

৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়।

٩١. فَسَلٰمٌ لَّكَ اَىْ لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ مِنْ جِهَةِ اَنَّهُ مِنْهُمْ .

৯১. তবে তাকে বলা হবে, তোমার প্রতি শান্তি অর্থাৎ তার জন্য শাস্তি হতে নিষ্কৃতির শান্তি, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! কেননা সে আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্গত।

٩٢. وَاَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّالِّيْنَ ۙ

৯২. কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়।

٩٣. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ

৯৩. তবে রয়েছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা।

٩٤. وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ .

৯৪. এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

٩٥. إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ج مِنْ اِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ اِلٰى صِفَتِهِ .

৯৫. এটা তো ধ্রুব সত্য। এটা مَوْصُوْف তার সিফতের দিকে ইযাফতের অন্তর্গত।

٩٦. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ . تَقَدَّمَ

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ : জমহুর মুফাসসিরগণের মতে لَا টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। فَأُقْسِمُ অর্থে যেমন- لَا وَاللّٰهِ

কেউ কেউ এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, لَا টা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণাকে نَفِى করার জন্য। আর مَنْفِى উহ্য রয়েছে। আর তা হলো কাফেরদের বাক্য এবং এটা لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُ অর্থে। ইমাম ফাররা বলেন যে, এই لَا টা نَفِى -এর জন্য এবং এটা لَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا تَقُوْلُوْنَ অর্থে হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে দুর্বল বলেছেন।

قَوْلُهُ مَوَاقِعُ : এটা مَوْقِعٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তারকা অস্তমিত হওয়ার স্থান বা সময়।

কেউ কেউ مَوْقِعٌ দ্বারা তারকার মঞ্জিলসমূহ উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ এর দ্বারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা কুরআনে কারীমও রাসূল ﷺ -এর উপর ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ : لَا أُقْسِمُ হলো কসম আর إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ হলো জওয়াবে কসম। আর لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ হলো কসম ও জওয়াবে কসমের মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه আর جُمْلَه مُعْتَرِضَه -এর মধ্যেও সিফত ও মাওসূফের মধ্যে لَوْ تَعْلَمُوْنَ جُمْلَه مُعْتَرِضَه রয়েছে আর তা হলো

قَوْلُهُ لَعَلِمْتُمْ عَظَمَ هٰذَا الْقَسَمِ : এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা মুফাসসির (রা.) -এর জবাব উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُصْحَفُ : কেউ কেউ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ দ্বারা লওহে মাহফূজ উদ্দেশ্য করেছেন। এই সূরতে لَا يَمَسُّهُ -এর অর্থ হবে- لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْمُطَهَّرُوْنَ এই সুরতে পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা নাজায়েজ হওয়ার দলিল হবে না।

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ এটা বাস্তবতার বিপরীত। কেননা অনেক লোকেরা পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করে। আর কুরআন তো বাস্তবতার বিপরীত কোনো খবর পরিবেশন করে না।

উত্তর : এখানে খবরটা نَهِى -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ مُنَزَّلٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تَنْزِيْلٌ মাসদারটা مُنَزَّلٌ ইসমে মাফঊল অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ : এখানে اِسْتِفْهَامٌ টা ধমকির জন্য এসেছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এটা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ مُدْهِنُوْنَ : مُدْهِنُوْنَ শব্দটি إِدْهَانٌ হতে إِدْهَانٌ ও تَدْهِيْنٌ -এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে তৈল লাগিয়ে মসৃণ ও নরম করা। এর থেকেই مُدَاهَنَتْ فِى الدِّيْنِ দ্বীনের ব্যাপারে খোশামোদ পছন্দ করা। এর লাযেমী অর্থ নেফাকও আসে। যে জিনিসের উপর তৈল লাগিয়ে নরম ও মসৃণ করা হয়, তার ভিতরটা বাহিরের বিপরীত হয়ে থাকে। উপরে নরম ও মসৃণ মনে হলেও ভিতরে তার বিপরীত হয়ে থাকে। নেফাকের মধ্যেও এরূপই হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত কুফর উদ্দেশ্য। কুরআনকে স্বাভাবিক ও সাধারণ মনে করা ও গুরুত্ব না দেওয়াও إِدْهَانٌ -এর মিসদাক।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَطَرِ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রিজিক দ্বারা রিজিকের কারণ উদ্দেশ্য। أَىْ شُكْرَهُ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ইবারতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- تَكْفُرُوْنَ شُكْرَ الْمَطَرِ তথা আল্লাহর না-শোকরি করা তোমরা নিজেদের ব্যস্ততা ও খাদ্য বানিয়ে নিয়েছ। এমন কি আল্লাহপ্রদত্ত বৃষ্টিকেও তোমরা কোনো কোনো তারকার উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত করে থাকো।

قَوْلُهُ بِسَقْيَا اللّٰهِ : এটা মাসদার ; স্বীয় فَاعِلٌ -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। মূলে ছিল- سَقَى اللّٰهُ

قَوْلُهُ إِذَا ظَرْفٌ لِتَرْجِعُوْنَ : إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ এটা تَرْجِعُوْنَ এর- ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে। تَرْجِعُوْنَ -এর সাথে দুটি শর্ত সংশ্লিষ্ট, একটি হলো إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ এবং অপরটি হলো إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো সেটা উভয়টি جَزَاء হয়েছে।

ফায়েদা : বাক্যের মধ্যে قَلْب হয়েছে। বাক্যটির অর্থ হলো– هَلَّا تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيْنَ فِيْ نَفْيِهِ

قَوْلُهُ فَلَهُ رَوْحٌ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, رَوْح হলো মুবতাদা আর فَلَهُ হলো খবরে মুকাদ্দাম।

قَوْلُهُ هَلِ الْجَوَابُ لِاَمَّا اَوْ لِاِنْ اَوْ لَهُمَا : فَرَوْحٌ الخ হলো জওয়াব। এতে তিনটি মতামত রয়েছে । যথা– ১. اَمَّا -এর জওয়াব। ২. اِنْ -এর জওয়াব ৩. উভয়টিরই জওয়াব। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হলো فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ الخ হলো اَمَّا -এর জওয়াব। আর اِنْ -এর জওয়াবটা উহ্য রয়েছে। কেননা اِنْ -এর জওয়াবটা বেশি বেশি উহ্য থাকে।

قَوْلُهُ اَىْ لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَذَابِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, سَلَامٌ টা سَلَامَتٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ اَنَّهُ مِنْهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -এর মধ্যে مِنْ টা تَعْلِيْلِيَّة অর্থাৎ- مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ مِنْهُمْ

قَوْلُهُ فَنُزُلٌ : এটা মুবতাদা, তার খবর لَهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– لَهُ نُزُلٌ

قَوْلُهُ تَقَدَّمَ : অর্থাৎ سَبِّحْ এটা نَزِّهْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং اِسْم শব্দটি অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ : قَسَم -এর শুরুতে অতিরিক্ত لَا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয়– لَا وَاللّٰهِ ; মূর্খতা যুগের কসমে لَا وَاَبِيْكَ সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لَا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়: বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مَوَاقِعُ শব্দটি مَوْقِعٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নাজমেও وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ : যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কুরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কুরআন কারো রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। [নাঊযুবিল্লাহ]

قَوْلُهُ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ : অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহফূয বোঝানো হয়েছে لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তাফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যথা–

১. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহফূযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهٗ -এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহফূযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহফূযকে পাক পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ 'পাক পবিত্র লোকগণ' এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহফূয পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম। এছাড়া مَسّ শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না: বরং مَسّ তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে। অর্থাৎ লওহে মাহফূযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা লওহে মাহফূজকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। –[কুরতুবী]

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত 'সম্মানিত' শব্দটি কুরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে। তখন কুরআনের অর্থ হবে– সেই কপি, যাতে কুরআন লিখিত আছে এবং مَسّ শব্দটি হাতে সম্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমি এই আয়াতের যত তাফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তাফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-এর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মর্ম– فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ -এর বিশেষণ নয়, বরং কুরআনের বিশেষণ।

২. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مُطَهَّرُوْنَ তথা 'পাক পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা.) এই উক্তি করেছেন। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর] ইমাম মালেক (র.)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। –[কুরতুবী]

কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদ বলেন, কুরআনের অর্থ হলো– কুরআনের লিখিত কপি এবং مُطَهَّرُوْنَ -এর অর্থ হলো– এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর থেকে পবিত্র। বে-অজু অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। অজু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েজ ও নেফাসের অবস্থাকে 'হদসে আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। এই তাফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র.) থেকে বর্ণিত আছে। –[রূহুল মা'আনী]

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কুরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েজ নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে– বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-অজু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তাফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তাফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় পেয়ে কুরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কুরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাত নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তাফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তাফসীরের সমর্থনে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তাফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই–

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপ আছে– لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কুরআনকে স্পর্শ না করে। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, ইবনে আবী দাঊদ ও ইবনুল মুনজির থেকেও বর্ণিত আছে। তাবারানী ও ইবনে মরদুবিয়াহ বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ –[রূহুল মা'আনী]।

قَوْلُهُ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ : مُدْهِنُوْنَ শব্দটি إِدْهَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ– তৈল মালিশ করা। তৈল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ .... تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছেঃ

১. কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে কোনো শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য।

২. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে নত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবি যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা আপনোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকট থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্তে, এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাজত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে, যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহর নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহর নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক!

قَوْلُهُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবুশ শিমাল' তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে- إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ; অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : সূরার উপসংহারে রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাজের ভেতরে ও বাইরের সব তাসবীহ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাজকেও মাঝে মাঝে তাসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাজের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ كُلُّ شَىْءٍ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَجِىْءَ بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ . فِىْ صُنْعِهِ .

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই তার পবিত্রতা বর্ণনা করে। لِلّٰهِ -এর لام -টি অতিরিক্ত। আর مَنْ -এর পরিবর্তে مَا -কে ব্যবহার করেছেন অধিকাংশকে প্রাধান্য দেওয়া হিসেবে। তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় স্বীয় কর্মে।

٢. لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يُحْيِى بِالْاِنْشَاءِ وَيُمِيْتُ ج بَعْدَهٗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন সৃষ্টি করে এবং এরপর মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣. هُوَ الْاَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ بِلَا بِدَايَةٍ وَالْاٰخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ بِلَا نِهَايَةٍ وَالظَّاهِرُ بِالْاَدِلَّةِ عَلَيْهِ وَالْبَاطِنُ عَنْ اِدْرَاكِ الْحَوَاسِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

৩. তিনিই আদি, কোনো সূচনা ছাড়া সর্ববিষয়ের পূর্বে তিনিই অন্ত; তিনি অন্তহীনভাবে সর্ববিষয়ের পর থাকবেন তিনিই ব্যক্ত এর উপর প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে ও তিনিই গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা থেকে। এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٤. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط الْكُرْسِىِّ اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ يَدْخُلُ فِى الْاَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْاَمْوَاتِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ . وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كَالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَمَا يَعْرُجُ يَصْعَدُ فِيْهَا ط كَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهٖ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

৪. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিন অনুযায়ী। তার প্রথম দিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিন ছিল জুমাবার/শুক্রবার। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন অর্থাৎ কুরসির উপর তার শান অনুপাতে সমাসীন হয়েছে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে যেমন বৃষ্টির পানি এবং মৃতব্যক্তি ও যা কিছু তা হতে বের হয়ে যায়। যেমন তরুলতা, ঘাস ও খনিজ দ্রব্য। এবং আকাশ হতে যা কিছু নেমে আসে যেমন রহমত ও শাস্তি এবং আকাশে যা উত্থিত হয় যেমন সৎ আমল ও বদ আমল। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন জ্ঞানের হিসেবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

٥. لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ الْمَوْجُوْدَاتُ جَمِيْعُهَا .

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। বিদ্যমান সবকিছুই।

٦. يُوْلِجُ اللَّيْلَ يُدْخِلُ فِى النَّهَارِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اللَّيْلَ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ ط فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ النَّهَارَ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ .

৬. তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে ফলে তা বেড়ে যায় এবং রাত ছোট হয়ে যায় এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে ফলে তা বেড়ে যায় এবং দিন ছোট হয়ে যায়। তিনি তো অন্তর্যামী অর্থাৎ হৃদয়ে যে গোপন রহস্য ও বিশ্বাস লুকিয়ে আছে তা তিনি ভালো করেই জানেন।

٧. اٰمِنُوْا دُوْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط مِنْ مَالِ مَنْ تَقَدَّمَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ نَزَلَ فِىْ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَهِىَ غَزْوَةُ تَبُوْكٍ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا اِشَارَةٌ اِلٰى عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ .

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাক এবং ব্যয় কর আল্লাহর পথে আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে সে সকল মানুষের মালের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং তাতে তোমাদের পরবর্তীগণকে তোমাদের প্রতিনিধি বানাবেন। এ আয়াত গাযওয়াতুল উসরায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হলো তাবূক যুদ্ধ। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে হযরত উসমান (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।

٨. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ خِطَابٌ لِلْكُفَّارِ اَىْ لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ج وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَنَصْبِ مَا بَعْدَهُ مِيْثَاقَكُمْ عَلَيْهِ . اَىْ اَخَذَهُ اللّٰهُ فِىْ عَالَمِ الذَّرِّ حِيْنَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ اَىْ مُرِيْدِيْنَ الْاِيْمَانَ بِهٖ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ .

৮. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো বস্তুই তোমাদের অন্তরায় নেই। অথচ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহবান করতেছেন এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। اَخَذَ শব্দটি হামযার পেশ ও خَاء বর্ণে যেরসহ এবং উভয়টি যবরসহ এবং তার পরে যবরসহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের থেকে আলমে আযলে যখন তিনি নিজেই নিজেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর মাধ্যমে সাক্ষী বানিয়েছিলেন তখন সকলেই বলেছিল- بَلٰى [হ্যাঁ] যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ যদি এর উপর ঈমান আনতে চাও তবে দ্রুত করো।

٩. هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ ط الْاِيْمَانِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ فِىْ اِخْرَاجِكُمْ مِنَ الْكُفْرِ اِلَى الْاِيْمَانِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

৯. তিনিই তাঁর বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন কুরআনের আয়াত তোমাদেরকে কুফরির অন্ধকার হতে ঈমানের আলোতে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি কুফর হতে ঈমানের আলোতে বের করে আনার ক্ষেত্রে করুণাময়, পরম দয়ালু।

١٠. وَمَا لَكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اَلَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اَنْ فِى لَامِ لَا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط بِمَا فِيْهِمَا فَيَصِلُ اِلَيْهِ اَمْوَالُكُمْ مِنْ غَيْرِ اَجْرِ الْاِنْفَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اَنْفَقْتُمْ فَتُؤْجَرُوْنَ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ لِمَكَّةَ وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا مِّنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط اَلْجَنَّةَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

১০. তোমরা কেন তোমাদের ঈমানের পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? اَلَّا -এর اَنْ -এর نُوْن -টি لَا -এর মধ্যে ইদগাম তথা প্রবিষ্ট হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তাতে যা কিছু রয়েছে তা সহ তোমাদের সম্পদ ব্যয়ের বিনিময় ব্যতীতই তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। তবে যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার বিপরীত। এর উপর তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। كُلًّا শব্দটি এক কেরাতে رَفْع সহ রয়েছে তখন তা মুবতাদা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। ফলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিদান দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন : سَبَّحَ لِلّٰهِ -এর মধ্যে سَبَّحَ -কে لَ -এর সাথে مُتَعَدِّىْ নেওয়া হয়েছে। অথচ سَبَّحَ টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর : لَامْ টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। যেমন نَصَحْتُ لَهٗ এবং شَكَرْتُ لَهٗ অথবা تَعْلِيْل -এর জন্য। মুফাসসির (র.) سَبَّحَ لِلّٰهِ -এর তাফসীর نَزَّهَهٗ দ্বারা করে এবং فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নেরই সমাধান করেছেন।

قَوْلُهٗ بِاِنْشَاءِ : এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, يُحْيِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য জীবিত ছেড়ে দেওয়া নয়। যেমন নমরূদ কাউকে হত্যা করত এবং কাউকে জীবিত ছেড়ে দিত। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিতর্ক করে বলেছিল- اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ এবং দু'জন মানুষ [বন্দী] -কে ডেকে একজনকে হত্যা করল এবং একজনকে ছেড়ে দিল এবং বলল- اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ কাউকে হত্যা না করা এটা জীবিত করা নয়; বরং يُحْيِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- اِنْشَاءُ حَيَاتٍ

قَوْلُهُ الْكُرْسِىِّ : আরশ-এর তাফসীর اَلْكُرْسِىِّ দ্বারা না করে তার অবস্থার উপর রেখে দেওয়াই যথাযথ ছিল।

قَوْلُهُ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ : এটা পূর্ববর্তীগণের তাফসীর পরবর্তীগণ قَهْر এবং غَلَبَهْ দ্বারা এর তাফসীর করেছেন।

قَوْلُهُ وَالسَّيِّئَةَ : اَلسَّيِّئَةُ শব্দটি ফেলে দেওয়াই উত্তম/ ভালো ছিল। কেননা كَلِمَاتُ طَيِّبَاتٌ -ই আকাশে উঠে যায়; كَلِمَاتُ سَيِّئَاتٌ নয়।

قَوْلُهُ دُوْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই اٰمِنُوْا বলার কারণে تَحْصِيْلُ حَاصِلٍ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর : اٰمِنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের উপর সর্বদা সুদৃঢ় থাকা, যা মুমিনদের থেকেই কামনীয়।

قَوْلُهُ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ : এটা لَا تُؤْمِنُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ : এটা يَدْعُوْكُمْ -এর كُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ مُرِيْدِيْنَ الْاِيْمَانَ : এই ইবারত দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রথম বলেছেন- مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ; যার চাহিদা হলো সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ মুমিন নয়। এরপর বললেন- اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্বোধিতগণ মুমিন।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো তোমরা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান নিয়ে আসো, যদি তোমরা হযরত মূসা (আ.) -এর উপর বিশ্বাসী হও। কেননা তাদের শরিয়তের চাহিদা ও এটা যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

قَوْلُهُ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جَوَابُ شَرْطٍ উহ্য রয়েছে আর তা হলো- فَبَادِرُوْا الخ

قَوْلُهُ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلُ : এটা لَا يَسْتَوِىْ -এর ফায়েল। আর اِسْتَوٰى দুটি জিনিসের কমে হয় না, বুঝা গেল যে, তার مُقَابِلْ টা সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো- مَنْ اَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ

قَوْلُهُ كُلًّا : এটা وَعَدَ اللّٰهُ -এর মাফঊলে মুকাদ্দাম, তবে ইবনে আমের كُلٌّ -কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে رَفْع পড়েছেন। আর তার পরের অংশ হলো খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হাদীদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ২৯, এতে ৫৪৪টি বাক্য ও ২৪৭৬ টি অক্ষর রয়েছে।

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা হাদীদ মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬ পৃ. ১৮৮]

অবশ্য কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা নাজিল হয়েছে মঙ্গলবার দিন। এ সূরায় লৌহের সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক লৌহ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, আর হাদীদ অর্থ- লৌহ। তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা হাদীদ'।

বর্ণিত আছে যে, এই মঙ্গলবার দিন হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবীল হাবিলকে হত্যা করেছিল।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় ইসলামি শরিয়তের বুনিয়াদী বিধি-নিষেধ এবং মৌলিক আকীদা তথা তাওহীদ সম্পর্কে হেদায়েত রয়েছে, চরিত্র মাধুর্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ সূরায়। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দীন দুনিয়ার সঠিক কল্যাণ লাভের জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া, চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করা। এ সূরার মূল বক্তব্যকে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. বিশ্বজগৎ এক আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, তিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সব কিছুর একমাত্র মালিক। সব কিছুই রয়েছে তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর কর্তৃত্বে কোনো কিছুই শরীক নেই।

২. সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, আল্লাহ পাকের দীনকে কায়েম করার জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মত্যাগের পরিচয় দেওয়া।

৩. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়, এর দ্বারা মানুষের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহে ব্যয় করাই কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা এ সূরা শুরু করা হয়েছে এবং একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে এবং সৃষ্টিমাত্রই আল্লাহ পাকের কুদরত হিকমত এবং তাঁর একত্ববাদের সাক্ষী হয়ে আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি এমন আদি, যার পূর্বে কিছুই নেই, আর তিনি এমন শেষ, যার পরে আর কিছুই নেই। তিনি এমন প্রকাশ যে, তাঁর কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সর্বত্র, তিনি এমন গুপ্ত যে, মানব দৃষ্টি এমনকি অন্তর্দৃষ্টিরও তিনি উর্ধ্বে।

সূরার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

এ সূরার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে কোনো প্রকার ওয়াসওয়াসা উপলব্ধি করে, তবে সে যেন [এ সূরার নিম্নোক্ত] আয়াতখানি পাঠ করে– هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –[আবূ দাউদ শরীফ, ইতকান]

এ সূরার আমল : সূরা হাদীদকে লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে তীর এবং তরবারি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

জ্বর এবং ফোঁড়ার ব্যাপারেও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা হাদীদ পাঠ করছে, তবে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আখিরাতের আলোচনা ছিল। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের কথা দিয়ে তাওহীদের প্রতি ঈমানের উপরই আখিরাতের সাফল্য নির্ভরশীল, তাই দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

অথবা উভয় সূরার সম্পর্ককে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। পূর্ববর্তী সূরার শেষ কথা ছিল, "হে রাসূল ! আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করুন"! আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, "আসমান জমিনের সবকিছু আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।"

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য : যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা 'তাসবীহযুক্ত সূরা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমু'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত–

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও জিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়। –[মাযহারী]

শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোনো সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানি কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। –[ইবনে কাসীর]

এই আয়াতের তাফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দশটির অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট: অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। যথা– ১. যা বাস্তবেই ধ্বংশীল। যেমন– পার্থিব ধন-দৌলত ইত্যাদি। ২. যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোজখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভালো-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয় না এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনজিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেফত। −[রূহুল মা'আনী]

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোনো বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা ও তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

قَوْلُهُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ : এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্র করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى বলে এই আঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে−

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ . قَالُوْا اَقْرَرْنَا . قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ .

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে "তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপ সঙ্গত হতে পারে?

জবাব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই− مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : مِيْرَاثٌ অভিধানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيْرَاثٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে সে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বোতভাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহর নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন একদিন আমরা একটি ছাগল জবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বণ্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে। আমি আরজ করলাম শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন, গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে খাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। −[মাযহারী]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোনো সময় ব্যয় করলে পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত ছওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে-

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ .

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

২. যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণির লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণি অপর শ্রেণি থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণি অপেক্ষা বেশি।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ২. যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরিক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশি।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণির মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকো ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোনো দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি করে তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগদান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোনো মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাস্বল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তুভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামি পতাকা উড্ডীন হয়। তখন পবিত্র কুরআনের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে- يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ; কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির বিরোধিতা ও নির্যাতন আশঙ্কার উর্ধ্বে উঠে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছে এবং বিপদ মুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানি শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণি সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে- وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ পরস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কেরামের সেই শ্রেণিদ্বয়ের জন্য, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কুরআনি ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র.) বলেন, এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ـ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ـ

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌছবে না। সেখানে তাদের মন যা চাইবে, তারা চিরকাল তা ভোগ করবে।

আলোচ্য আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কুরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোনো গুনাহ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না, তওবা করে নেবেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গুনাহ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও সর্বোচ্চ কোনো কষ্টের মাধ্যমে গুনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর মৃত্যুর পর আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আজাব পরকাল ও জাহান্নামের আজাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর জগতের আজাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোনো সাহাবী কোনো গুনাহ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আজাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আজাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়; ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় : সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তারা রাসূল ﷺ -এর উম্মতের মাঝখানে আল্লাহর তৈরি সেতু, তাদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা পৌছার কোনো পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাসগ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোনো পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোনো কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গুনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না; বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা দ্বারা তাঁরা একটি ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোনো গুনাহ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবিলায় শূন্যের কোটায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহভীরু। সামান্য গুনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গুনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গুনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফিরাতই নয়, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি অনুযায়ী তা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখেছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদিও কোনো পর্যায়ে তাদের সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মোকাবিলায় তার কোনো মর্যাদা নেই। কেননা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস : সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালোবাসা পোষণ করার এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নীরব থাকা এবং যে কোনো এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরি। আকাঈদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে।

অনুবাদ :

١١. مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ بِاِنْفَاقِ مَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ يُّنْفِقَهٗ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهٗ بِالتَّشْدِيْدِ مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ كَمَا ذُكِرَ فِى الْبَقَرَةِ وَلَهٗ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ اَجْرٌ كَرِيْمٌ مُقْتَرِنٌ بِهٖ رِضًى وَاِقْبَالٌ.

১১. কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে? স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে উত্তম ঋণ এভাবে যে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যয় করবে। তাহলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করে দিবেন তার জন্য। অন্য কেরাতে فَيُضَعِّفَهٗ শব্দটির عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ রয়েছে দশ হতে সাত শতের অধিক। যেমনটি সূরা বাকারায় বর্ণিত রয়েছে। এই বৃদ্ধির সাথে এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। অর্থাৎ এই প্রতিদানের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং কবুলিয়ত বা গ্রহণযোগ্যতা।

١٢. اُذْكُرْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَمَامَهُمْ وَ يَكُوْنُ بِاَيْمَانِهِمْ وَيُقَالُ لَهُمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ اَىْ دُخُوْلُهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১২. সেদিনের কথা স্মরণ করুন যেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে তাদের সম্মুখভাগে সামনে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হবে। তাদেরকে বলা হবে- আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের অর্থাৎ তাতে প্রবেশের যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।

١٣. يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا اَبْصِرُوْنَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الظَّاءِ اَىْ اَمْهِلُوْنَا نَقْتَبِسْ نَاْخُذِ الْقَبَسَ وَالْاِضَاءَةَ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ لَهُمْ اِسْتِهْزَاءً بِهِمْ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَرَجَعُوْا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِسُوْرٍ قِيْلَ هُوَ سُوْرُ الْاَعْرَافِ لَهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِى الرَّحْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَظَاهِرُهٗ مِنْ جِهَةِ الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ط

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম আমাদের দিকে দেখ। অপর এক কেরাতে اَنْظِرُوْنَا-এর হামযাতে যবর এবং ظَاءْ বর্ণে যের দিয়ে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা কর/আমাদেরকে অবকাশ দাও। যাতে আমরা গ্রহণ করতে স্ফুলিঙ্গ ও আলো গ্রহণ করতে পারি। তোমাদের জ্যোতির কিছু। বলা হবে- তাদেরকে উপহাসের স্বরে তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তখন তারা ফিরে যাবে অতঃপর তাদের মাঝে স্থাপিত হবে তাদের এবং মুমিনদের মাঝে একটি প্রাচীর; বলা হয়েছে যে, সেটা হলো আ'রাফের প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত মুমিনগণের দিকে এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের দিকে থাকবে শাস্তি।

١٤. يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط عَلَى الطَّاعَةِ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِالنِّفَاقِ وَتَرَبَّصْتُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الدَّوَائِرَ وَارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِيْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ الْاَطْمَاعُ حَتّٰى جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ الْمَوْتُ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ .

১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছে নেফাক তথা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে মুমিনগণের উপর বিপদাপদের। সন্দেহ পোষণ করেছিলে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসল অর্থাৎ মৃত্যু আর মহা প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।

١٥. فَالْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلٰىكُمْ ط اَوْلٰى بِكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ .

১৫. আজ তোমাদের নিকট হতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না يُؤْخَذُ শব্দটি يَاءٌ এবং تَا যোগে অর্থাৎ تُؤْخَذُ এবং يُؤْخَذُ উভয়রূপেই পঠিত। এবং যারা কুফরি করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য তোমাদের জন্য উত্তম কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

١٦. اَلَمْ يَاْنِ يَحِنْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَزَلَتْ فِيْ شَاْنِ الصَّحَابَةِ لَمَّا اَكْثَرُوا الْمِزَاحَ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنَ الْحَقِّ الْقُرْاٰنِ وَلَا يَكُوْنُوْا مَعْطُوْفٌ عَلٰى تَخْشَعَ كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ الزَّمَنُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اَنْبِيَائِهِمْ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط لَمْ تَلِنْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ .

১৬. যারা ঈমান এনেছে, তাদের সময় কি আসেনি? এই আয়াত সাহাবায়ে কেরামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা হাসি তামাশায় মেতে উঠলেন হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? وَمَا نَزَلَ শব্দটি زَاءٌ তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে এবং তারা যেন না হয় এটা تَخْشَعَ-এর উপর আতফ হয়েছে। পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো। তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের ও তাদের নবীগণের মাঝে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল আল্লাহর স্মরণের জন্য নরম থাকল না। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

١٧. اِعْلَمُوْا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط بِالنَّبَاتِ فَكَذٰلِكَ يَفْعَلُ بِقُلُوْبِكُمْ بِرَدِّهَا اِلَى الْخُشُوْعِ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِنَا بِهٰذَا وَغَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

১৭. তোমরা জেনে রাখ! উল্লিখিত মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তরুলতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে তোমাদের অন্তকরণের সাথেও এরূপই করবেন তাকে خُشُوْعٌ-এর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে। আমি নিদর্শনগুলো বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যা প্রত্যেক পদ্ধতিতে আমার কুদরত ও ক্ষমতাকে বুঝায়। যাতে তোমরা বুঝতে পার।

١٨. إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ مِنَ التَّصَدُّقِ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ أَيِ الَّذِيْنَ تَصَدَّقُوْا وَالْمُصَّدِّقٰتِ اللَّاتِيْ تَصَدَّقْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَخْفِيْفِ الصَّادِ فِيْهِمَا مِنَ التَّصْدِيْقِ الْاِيْمَانِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا رَاجِعٌ إِلَى الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ بِالتَّغْلِيْبِ وَعَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ فِيْ صِلَةِ اَلْ لِاَنَّهُ فِيْهَا حَلَّ مَحَلَّ الْفِعْلِ وَذِكْرُ الْقَرْضِ بِوَصْفِهِ بَعْدَ التَّصَدُّقِ تَقْيِيْدٌ لَهُ يُّضٰعَفُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشْدِيْدِ اَيْ قَرْضُهُمْ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

১৮. দানশীল পুরুষগণ এটা تَصَدُّقٌ হতে নির্গত تَاءٌ -কে صَادٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা সদকা করছে দানশীল নারীগণ যারা সদকা করেছে। এক কেরাতে اَلْمُصَدِّقَاتُ শব্দের صَادٌ বর্ণে তাশদীদবিহীন রয়েছে যা تَصْدِيْقٌ হতে নির্গত এবং উদ্দেশ্য হলো ঈমান। এবং যারা উত্তম দান করে এটা تَغْلِيْبًا স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দিকে ফিরেছে। এবং فِعْل -এর আতফ এই اِسْم -এর উপর যা اَلْ -এর সেলাহ্-এ এসেছে এজন্য জায়েজ যে, এখানে اِسْم টা فِعْل -এর অর্থে হয়েছে। আর দানের উল্লেখের পরে ঋণকে তার সিফাতের সাথে উল্লেখ করা تَصَدُّقٌ বা দানকে مُقَيَّدٌ করার জন্য। তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি يُضَاعَفُ শব্দটি অন্য কেরাতে يُضَعَّفُ তথা عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে, অর্থাৎ তাদের ঋণকে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

١٩. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ الْمُبَالِغُوْنَ فِي التَّصْدِيْقِ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط عَلَى الْمُكَذِّبِيْنَ مِنَ الْاُمَمِ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ النَّارِ.

১৯. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সিদ্দীক অর্থাৎ تَصْدِيْق -এর ক্ষেত্রে মুবালাগাকারী ও শহীদ পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতির উপর। তদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরি করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে যা আমার একত্ববাদের উপর প্রমাণবহ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী অর্থাৎ অগ্নিবাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : এখানে কয়েকটি তারকীব হতে পারে। যথা–

১. مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হলো মুবতাদা ذَا হলো তার খবর। الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ হলো তার بَدَلٌ বা সিফত।

২. مَنْ ذَا হলো মুবতাদা আর الَّذِيْ হলো তার খবর।

৩. ذَا হলো মুবতাদা আর الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ মওসুল সেলাহ মিলে সিফত। আর مَنْ হলো খবর। এতে اِسْتِفْهَامٌ -এর অর্থ থাকার কারণে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيُضَاعِفُ : এখানে فَاءٌ -এর পরে اَنْ উহ্য থাকার মাধ্যমে جَوَابُ اِسْتِفْهَامٍ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اِسْتِيْنَافٌ অথবা يُقْرِضُ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ رِضًا وَاِقْبَالٌ : এখানে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْفٌ মিলে مُقْتَرِنٌ -এর ফায়েল হয়েছে।

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَوْمَ টা উহ্য ফে'লের যরফ হয়েছে। অর্থাৎ সেই দিনকে স্মরণ কর। আবার এটাও হতে পারে যে, اَجْرٌ كَرِيْمٌ -এর ظَرْف হবে। তৃতীয় আরেকটি সুরত এটাও হতে পারে যে, এটা يَسْعٰى -এর ظَرْف হবে অর্থাৎ তুমি দেখতে পাবে যে, সেদিন মুমিন নর-নারীর জ্যোতি তাদের সম্মুখে দৌড়াতে থাকবে।

قَوْلُهُ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ : এটা جُمْلَهْ حَالِيَهْ হয়েছে। তবে এই সুরতে يَسْعٰى -يَوْم কে- এর عَامِلْ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ : يَكُوْنُ -কে উহ্য মেনে এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে যে, وَبِاَيْمَانِهِمْ টা يَسْعٰى -এর অধীনে হয়েছে। অর্থ হবে যে, জ্যোতি তাদের ডান দিকে তাদের থেকে দূরে থাকবে। কেননা اِيْمَانٌ দ্বারা সকল দিকই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ دُخُوْلُهَا : এটাকে উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَنّٰتٌ উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে بُشْرٰكُمْ মুবতাদার খবর উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : অর্থাৎ- دُخُوْلُ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ : এটা يَوْمَ تَرَى থেকে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ : এখানে بَابٌ টা জুমলা হয়ে نُوْر -এর প্রথম সিফত। আর اَلرَّحْمَةُ بَاطِنُهٗ فِيْهِ হলো দ্বিতীয় সিফত।

قَوْلُهُ الْغَرُوْرُ : غَرُوْرٌ শব্দটি غَيْن বর্ণে যবর হলে অর্থ হবে শয়তান, যেমনটি মুফাসসির (র.) বলেছেন, আর যদি غَيْن বর্ণে পেশ হয় তবে شُذُوْذًا ওজনে মাসদার। অর্থ হবে- اِغْتِرَاءٌ بِالْبَاطِلِ তথা বাতিলের মাধ্যমে ধোঁকা খাওয়া।

قَوْلُهُ مَأْوٰكُمُ النَّارُ : এখানে مَأْوٰكُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর اَلنَّارُ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আবার এর উল্টোও হতে পারে তা জায়েজ।

قَوْلُهُ هِيَ مَوْلٰكُمْ : مَوْلًا টা মাসদারও হতে পারে অর্থাৎ وَلَايَتِكُمْ তথা ذَاتُ وَلَايَتِكُمْ অথবা مَكَانٌ অর্থে হবে অর্থাৎ مَكَانُ وَلَايَتِكُمْ অথবা اَوْلٰى অর্থেও হতে পারে যেমন هُوَ مَوْلَاهُ অর্থাৎ اَوْلٰى بِهٖ আর যদি مَوْلًا শব্দটি وَلِيٌّ হতে নির্গত হয় তবে নিকটবর্তী অর্থে হবে। অর্থাৎ আগুন তোমাদের নিকটে। هِيَ مَوْلًا অর্থ হবে- هِيَ نَاصِرُكُمْ অর্থাৎ সেই আগুন তোমাদের সাহায্যকারী। এটা বিদ্রূপাত্মক।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : জমহুরের নিকট يَأْنِ শব্দটি হামযা সাকিন ও نُوْن যেরযুক্ত। رَمٰى যা اِنّٰى -يَانِيْ -يَرْمِيْ -এর ওজনে মুযারে -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। يَاءٌ টা শুরুতে حَرْف جَازِمْ আসার কারণে পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ رَاجِعٌ اِلَى الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ -এর আতফ হয়েছে দুই ইসিম অর্থাৎ اَلْمُصَّدِّقِيْنَ এবং اَلْمُصَّدِّقَاتُ -এর উপর। শুধুমাত্র প্রথমটির উপর মানার সুরতে صِلَةٌ পরিপূর্ণ হয়ে আতফহীন হওয়া আবশ্যক হবে, যা বৈধ নয়।

প্রশ্ন : اَقْرَضُوا اللّٰهَ -এর আতফ اَلْمُصَّدِّقِيْنَ -এর উপর হয়েছে যা ইসিম, কাজেই ফে'লের আতফ ইসিমের উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে যা বৈধ নয়।

উত্তর : যে اِسْم -এর উপর اَلَّذِيْ অর্থে ব্যবহৃত اَلِفْ . لَامْ আসে, সেই اِسْم টা ফে'লের হুকুমে হয়ে যায়। কাজেই এখানে عَطْف বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْقَرْضِ بِوَصْفِهٖ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : اَلْمُصَّدِّقِيْنَ [صَادْ বর্ণে তাশদীদসহ] সদকা দানকারী। এরপর বললেন- وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا -এর অর্থও সদকা করা। কাজেই اَلْمُصَّدِّقِيْنَ -কে উল্লেখের পরে وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল, এটা তো تَكْرَارٌ হয়ে গেল।

উত্তর : জবাবের সার হলো এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকাকে উত্তম সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ সদকা ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে হতে হবে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য। কাজেই تَكْرَارٌ টা অহেতুক হয়নি।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ : এখানে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হলো মুবতাদা اُولٰٓئِكَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর هُمْ -কে তৃতীয় মুবতাদা বলাও বৈধ। আর اَلصِّدِّيْقُوْنَ হলো তার খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর হলো। এরপর দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবরসহ মিলে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

আবার هُمْ -কে ضَمِيْرِ فَصْل বলাও বৈধ। আর اُولٰٓئِكَ এবং তার খবর মিলে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে আল্লাহ পাককে ঋণ দেওয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

অর্থাৎ কে আছে যে, আল্লাহ পাককে ঋণ দেবে উত্তম রূপে [খাঁটি অন্তরে], তাহলে তিনি বৃদ্ধি করবেন তার ছওয়াব, অধিকন্তু তার জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম্য : আল্লাহ পাককে ঋণ দেওয়ার যে কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে ব্যয় করা। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজের স্ত্রী-পুত্র ওপরিবারের জন্যে ব্যয় করা।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পর্যায়ে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো জিহাদে আল্লাহর রাহে দান করা এবং জিহাদের পর নিজেরাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করা, এতদ্ব্যতীত এর বিনিময়ে আখিরাতে লাভ হবে বিরাট মর্যাদা :

ইমাম রাযী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাহায্যে করার, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার এবং দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাহে ব্যয় করাকে 'করজ' বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি যেন করজের ন্যায়ই একটি সৎকাজ।

তাফসীরকারগণের মতে, এর দ্বারা সেসব খাতে ব্যয় করা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, যেসব নফল আর্থিক ইবাদত রয়েছে, এর দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যাহোক, আয়াতের মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর রাহে দান করা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যয় করাই আল্লাহ পাককে করজ দেওয়া। যে এভাবে আল্লাহর রাহে দান করবে, আল্লাহ পাক তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন এবং অধিকন্তু জান্নাতে সে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ দাহদাহ আনসারী (রা.) হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের নিকট করজ চেয়েছেন? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তখন তিনি বললেন, দয়া করে আপনার হাতকে বাড়িয়ে দিন। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর মোবারক হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত দাহদাহ (রা.) হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দস্তে মোবারকে হাত রেখে বললেন, আমার অমুক বাগান, যাতে ছয়শত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, আমি তা আমার প্রতিপালককে দিয়ে দিয়েছি। তাঁর পরিবারবর্গ ঐ বাগানেই ছিল। তিনি ঐ বাগানের দরজায় এসে স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বললেন, আমি এ বাগান আল্লাহ পাকের দরবারে দিয়ে দিয়েছি, অতএব তোমরা বের হয়ে চলে এসো! এরপর বললেন, সন্তানদেরকেও নিয়ে এসো! তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনি অনেক লাভজনক ব্যবসা করেছেন। তাঁর স্ত্রী শিশু সন্তানদেরকে নিয়ে জরুরি মালপত্রসহ বের হয়ে আসলেন। তখন হযরত রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, জান্নাতের বাগান এবং জান্নাতের ফলের গাছ, যার শাখা প্রশাখা হবে ইয়াকূত এবং মুক্তার, আল্লাহ পাক আবূ দাহদাহকে দান করেছেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৭, পৃ. ১২৬]

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহর রাহে দান করাকে 'করজ' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করার মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, আল্লাহর রাহে দান করার বিনিময় অবশ্যই আদায় করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর এর বদলে আল্লাহ পাক অনেক মূল্যবান পুরস্কার দান করবেন। মূল পুঁজি থেকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা তার চেয়েও বেশি দান করা হবে।

قَوْلُهٗ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ : অর্থাৎ "সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করছে।"

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুল সিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, হযরত আবূ উমামা (রা.) একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরিক হোন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হলো–

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মঞ্জিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মঞ্জিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মঞ্জিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বতসম, কারো খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারো মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে তাও আবার কখনো জ্বলে উঠবে এবং কখনো নিভে যাবে। -[ইবনে কাসীর]

অতঃপর হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, মুনাফিক ও কাফেদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কুরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে-

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا . وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

তিনি আরো বলেন, মুমিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মতো হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা তো আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না, তেমনি মুমিনের নূর দ্বারা কোনো কাফের ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না। -[ইবনে কাসীর]

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মঞ্জিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বণ্টন করা হবে, সেই মঞ্জিল থেকেই কাফের মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোনো প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুলসিরাতের নিকটে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকে প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল সিরাতে পৌছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যা-ই হোক, মুনাফিকরা তখন মুমিনগণকে অনুরোধ করবে একটু এসো, আমরাও তেমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ দুনিয়াতেও নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জবাব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ তারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টাই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মুমিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে। তাই তারা শেষ পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছে-

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا .

মুসলিম, আহমদ ও দারা কুতনীতে বর্ণিত হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে, প্রথমে মুমিন ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফেরদের ন্যায় নূর পাবে না; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারো নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই? অতএব আল্লাহর জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে : তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকরের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো-

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহল ইবনে সা'আদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবুদ্দারদা, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَ بُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَ لَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাজ যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামাজ তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামাজ আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফেরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তাবারানী বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররামা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে। –[মুসনাদে আহমদ]

৫. দায়লামী সংকলিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হজের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, হজ ও ওমরার ইহরাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতরে দিন নূর হবে। –[তাবারানী]

৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –[মুসনাদে বাযযার]

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে। –[তিরমিযী]

قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ...... انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ : অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই। তাদেরকে বলা হবে, ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا যেখানে নূর বণ্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মুমিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

قَوْلُهُ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ : অর্থাৎ মুমিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকবরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মুমিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মুমিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাবে মুমিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আজাব।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ الْحَقِّ : অর্থাৎ মুমিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির এবং যে সত্য নাজিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

قَوْلُهُ خُشُوْعِ قَلْبٍ : এর অর্থ– অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। –[ইবনে কাসীর] কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ হলো– এর বিধান তথা আদেশ-নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। –[রূহুল মা'আনী]

এটা মুমিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাজিল করবে। –[ইবনে কাসীর]

ইমাম আ'মাশ বলেন, মদীনায় পৌছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে, এই হুঁশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়। মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্য তাৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং এখাত ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা.উঠিয়ে নেওয় হবে। -[ইবনে কাসীর]

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? ইরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদা ও আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আজেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আমার উম্মতের সব কিছুতেই কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন كُلُّكُمْ صِدِّيْقٌ وَشَهِيْدٌ অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আবূ হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জবাবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করুন- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ

কিন্তু কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণিকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই-

اُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ .

এই আয়াতে পয়গাম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা- সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি। নতুবা প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণির লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দেয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অনবধান ও খেয়াল খুশিতে মগ্ন, তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَللَّعَّانُوْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَآءَ অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইজ্জতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরজ করল, আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইজ্জতের উপর হামলা চালাবে- এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের উম্মতের মোকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে। -[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোনো মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই পয়গাম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছে, সেই পয়গাম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

٢٠. اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ تَزَيُّنٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط اَىِ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا وَاَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِيْنُ عَلَيْهَا فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ كَمَثَلِ اَىْ هِىَ فِىْ اِعْجَابِهَا لَكُمْ وَاضْمِحْلَالِهَا كَمَثَلِ غَيْثٍ مَطَرٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ الزُّرَّاعَ نَبَاتُهُ النَّاشِئُ عَنْهُ ثُمَّ يَهِيْجُ يَيْبَسُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط فُتَاتًا يَضْمَحِلُّ بِالرِّيَاحِ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لِمَنْ اٰثَرَ عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط لِمَنْ لَمْ يُؤْثِرْ عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَا التَّمَتُّعُ فِيْهَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ .

অনুবাদ :

২০. তোমরা জেনে রেখো! পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। অর্থাৎ তাতে ব্যাপৃত হয়ে যাওয়া, কিন্তু আনুগত্য এবং যে জিনিস তার সাহায্যকারী হয় [যেমন তওবা] তা পরকালীন কর্মের অন্তর্গত। তার উপমা অর্থাৎ ঐ সকল জিনিসের উপমা তোমার জন্য আশ্চর্যজনক হওয়ার মধ্যে এবং বিলুপ্ত হওয়ার মধ্যে বৃষ্টি যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে তা থেকে উৎপন্ন তরুলতা অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। অতঃপর বাতাসের মাধ্যমে নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি সে ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে। এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। সে ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়নি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

٢١. سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَوْ وَصَلَتْ اِحْدٰىهُمَا بِالْاُخْرٰى وَالْعَرْضُ السَّعَةُ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো। যদি একটিকে অপরটির সাথে মিলানো হয়, আর عَرْض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রশস্ততা। যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

٢٢. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ بِالْجَدْبِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ كَالْمَرَضِ وَفَقْدِ الْوَلَدِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ يَعْنِى اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا نَخْلُقَهَا وَيُقَالُ فِى النِّعْمَةِ كَذٰلِكَ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ لا

২২. যে বিপর্যয় আসে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যেমন- রোগ-বালাই এবং সন্তানের তিরোধানে তা লিপিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ লওহে মাহফূযে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই এবং নিয়ামতের ক্ষেত্রেও এরূপই বলা হবে। যেমনটি মসিবতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।

٢٣. لِكَيْلَا كَيْ نَاصِبَةٌ لِلْفِعْلِ بِمَعْنَى أَنْ أَيْ أَخْبَرَ بِذٰلِكَ تَعَالٰى لِئَلَّا تَأْسَوْا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا فَرَحَ بَطَرٍ بَلْ فَرَحَ شُكْرٍ عَلَى النِّعْمَةِ بِمَآ اٰتٰىكُمْ ط بِالْمَدِّ أَعْطَاكُمْ وَبِالْقَصْرِ جَاءَكُمْ مِنْهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ مُتَكَبِّرٍ بِمَا أُوْتِيَ فَخُوْرٍ لا بِهِ عَلَى النَّاسِ.

২৩. এটা এজন্য যে, لِكَيْلَا -এর মধ্যে كَيْ টা হলো ফে'লের নসব দানকারী أَنْ -এর অর্থে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার সংবাদ দিয়েছেন তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন বিমর্ষ না হও এবং হর্ষোৎফুল্ল না হও সে নিয়ামতের উপর যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, গর্ব-অহঙ্কারের ভিত্তিতে যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য اٰتٰكُمْ শব্দটির হামযাটি মদ সহকারে হলে অর্থ হবে- أَعْطَاكُمْ এবং মদবিহীন হলে অর্থ হবে- جَاءَكُمْ مِنْهُ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না উদ্ধত তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে অহংকারীকে তার নিয়ামতের কারণে মানুষের উপর।

٢٤. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط بِهِ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ ضَمِيْرُ فَصْلٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُقُوْطِهِ الْغَنِيُّ عَنْ غَيْرِهِ الْحَمِيْدُ لِأَوْلِيَائِهِ.

২৪. যারা কার্পণ্য করে নিজেদের উপর আবশ্যকীয় বিষয়ে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় তাদের জন্য কঠোর ধমকি রয়েছে। যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের উপর আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ হতে সে জেনে রাখুক আল্লাহ তো هُوَ হলো ضَمِيْر فَصْل আবার এক কেরাতে هُوَ উল্লেখ নেই। অভাবমুক্ত অন্যের থেকে প্রশংসার্হ। তার বন্ধুদের জন্য।

٢٥. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الْقَوَاطِعِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْمِيْزَانَ الْعَدْلَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ أَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْمَعَادِنِ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ يُقَاتَلُ بِهِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ مَعْطُوْفٌ عَلٰى لِيَقُوْمَ النَّاسُ مَنْ يَّنْصُرُهُ بِأَنْ يَّنْصُرَ دِيْنَهُ بِآلَاتِ الْحَرْبِ مِنَ الْحَدِيْدِ وَغَيْرِهِ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط حَالٌ مِنْ هَاءِ يَنْصُرُهُ أَيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَائِبًا عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْصُرُوْنَهُ وَلَا يَبْصُرُوْنَهُ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ. لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى النُّصْرَةِ لٰكِنَّهَا تَنْفَعُ مَنْ يَأْتِيْ بِهَا.

২৫. নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি ফেরেশতাগণকে নবীগণের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ অকাট্য দলিলাদি সহকারে এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি দিয়েছি লৌহ আমি তা বের করেছি খনি হতে যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এর মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয় ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে। لِيَعْلَمَ -এর আতফ لِيَقُوْمَ النَّاسُ -এর উপর হয়েছে; কে সাহায্য করে অর্থাৎ কে তাঁর দীনকে লৌহ নির্মিত অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যক্ষ না করেও بِالْغَيْبِ এটা يَنْصُرُهُ -এর ه থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের থেকে অদৃশ্য থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা তাঁর সাহায্য করে অথচ তাকে দেখে না। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবে যে সাহায্য করবে, তারই উপকার হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىِ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا : এতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদও সন্তান-সন্ততি মূলত খারাপ জিনিস নয়, তবে এতে ডুবে যাওয়া ও গভীরভাবে মনোনিবেশ করা অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ اَىْ هِىَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ اِعْجَابِهَا টা هِىَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ الزُّرَّاعُ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كُفَّارٌ শব্দটি كَافِرٌ অর্থ- কৃষক -এর বহুবচন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- اَلْكُفَّارُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلزُّرَّاعُ বা কৃষক। আজহারী (র.) বলেন, আরবে কৃষককে كَافِرٌ বলা হয়। কেননা সে বীজকে মাটিতে ঢেকে দেয়। অর্থাৎ يَكْفُرُ অর্থ হলো يَسْتُرُ

قَوْلُهُ مَا التَّمَتُّعُ فِيْهَا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا উহ্য মুযাফের সাথে মুবতাদা। যাতে করে مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -এর حَمْل টা حَيٰوةُ الدُّنْيَا -এর উপর হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْعَرْضُ السَّعَةُ : এটা একটি প্রশ্নের জবাবে এসেছে। প্রশ্ন হলো জান্নাতের عَرْض তথা প্রস্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু দৈর্ঘ্যের বিবরণ প্রদান করা হয়নি কেন?

উত্তর : উত্তরের সার হলো- এখানে عَرْض দ্বারা প্রস্থ উদ্দেশ্য নয়, যা লম্বার বিপরীত; বরং মুতলক প্রশস্ততা উদ্দেশ্য যাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ فِى النِّعْمَةِ كَذٰلِكَ : যেমনিভাবে জান ও মালের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে বালা মসিবত আসে অনুরূপভাবে নিয়ামত ও শান্তিও তাঁর নির্দেশ ও নির্ধারণেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنْهُ : অর্থাৎ- مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ لَهُ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ اَلخ হলো মুবতাদা। আর তার খবর لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ : এখানে مَنْ হলো شَرْطِيَّةٌ ; এর জবাব উহ্য রয়েছে। আর তা হলো- فَالْوَبَالُ عَلَيْهِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আজাবে আক্রান্ত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিক ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই : প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

قَوْلُهُ لَعِبٌ وَلَهْوٌ : لَعِبٌ শব্দের অর্থ- এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। আর لَهْو হলো এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোনো উপকার অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ -এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সম-সাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙ্গিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায় যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ হীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মঞ্জিল। এ মঞ্জিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর তথা বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কুরআন পাক উল্লিখিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে- كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا غَيْث ; غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّارْ শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনে কোনো তাফসীরবিদ كُفَّارْ শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কেবল কাফেররাই আনন্দিত হয় না, বরং মুসলমানরাও হয়। জবাব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এ সুন্দর ফসল আল্লাহর কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে "কাফের আনন্দিত হয়" বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ : অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আজাব । কঠোর আজাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আজাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আজাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিদওয়ান তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আজাব ও ছওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশি করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে-

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ.

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোনো ভরসা নেই। অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোনো রোগ অথবা ওজর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা.) তাঁর উপদশাবলিতে বলেন, তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং তা হতে সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জিহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা.) বলেন, জামাতের নামাজে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। -[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سَمٰوٰتٌ বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে; অর্থ এই অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশি হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ, ঐ পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতেও বেশি। عَرْض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত তো লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারব না; আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারব। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ الخ : দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। যথা- ১. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ২. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে-

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে, বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুযে জগৎসৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্য ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰكُمْ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালোমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও ছওয়াব হাসিল করতে হবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ : পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– والله لا يحب كل مختال فخور অর্থাৎ আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ .... بَأْسٌ شَدِيْدٌ :

ঐশী কিতাব ও পয়গাম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা : بَيِّنَاتٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য বিধানাবলিও হতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য মুজেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। –[ইবনে কাসীর] পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাজিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তাফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بَيِّنَاتٌ বলে মুজেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলির জন্য কিতাব নাজিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মিজান' নাজিল করারও উল্লেখ আছে। মিজানের আসল অর্থ– পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও মিজান -এর অর্থে শামিল আছে। যেমন– আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিজানের বেলায়ও নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাজিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম্বরগণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মিজান নাজির করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মিজান নাজিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলি নাজিল করা। কুরতুবী (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাজিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজির বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ– اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নাজিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা রহমানের وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে مِيْزَانٌ শব্দের সাথে وَضَعَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাজিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মিজানের পর লৌহ নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাজিল করার মানে সৃষ্টি করা। কুরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাজিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাজিল হয় না; বরং পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাজিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহফূযে লিখিত ছিল এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। –[রূহুল মা'আনী]

আয়াতে লৌহ নাজিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ১. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। ২. এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গাম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা পয়গাম্বরগণও আসমানি কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোনো প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া বলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীজানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীজান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এ বস্তুদ্বয় নাজিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। অন্যথায় এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

قَوْلُهُ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ : রূহুল মা'আনীতে আছে, এখানে وَاوْ অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবেও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ জেনে নেন, কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে? আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

২৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ يَعْنِى الْكُتُبَ الْاَرْبَعَةَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَالزَّبُوْرَ وَالْفُرْقَانَ فَاِنَّهَا فِىْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২৬. আমি হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। অর্থাৎ চারটি কিতাব তথা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন, এই সবগুলোই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানাদির মধ্যে এসেছে। কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৭. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ لا وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةً هِىَ رَفْضُ النِّسَاءِ وَاتِّخَاذُ الصَّوَامِعِ نِ ابْتَدَعُوْهَا مِنْ قِبَلِ اَنْفُسِهِمْ مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ مَا اَمَرْنَاهُمْ بِهَا اِلَّا لٰكِنْ فَعَلُوْهَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج اِذْ تَرَكَهَا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ وَكَفَرُوْا بِدِيْنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَدَخَلُوْا فِىْ دِيْنِ مُلْكِهِمْ وَبَقِىَ عَلٰى دِيْنِ عِيْسٰى كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاٰمَنُوْا بِنَبِيِّنَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ـ

২৭. অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ। আর তা হলো নারীকে পরিত্যাগ করে গীর্জাকে আকড়ে ধরা এটা তো তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রত্যাবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এই বিধান দেইনি। অর্থাৎ আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিনি, অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি যখন তাদের অধিকাংশই তা পরিত্যাগ করল, এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত ধর্মের অস্বীকারকারী হয়ে গেল এবং স্বীয় রাজন্যবর্গের ধর্মের অনুসারী হয়ে গেল। তাদের অনেকে হযরত ঈসা (আ.) ধর্মের উপর সুদৃঢ় রইলো। অতঃপর আমাদের নবী করীম ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন করল। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

২৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِعِيْسٰى اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى عِيْسٰى يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ نَصِيْبَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهٖ لِاِيْمَانِكُمْ بِالنَّبِيَّيْنِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ عَلَى الصِّرَاطِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لا

২৮. হে মুমিনগণ! হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন তাঁর অনুগ্রহে নবীগণের [দু'নবীর]। উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে তিনি তোমাদেরকে দিনে আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। পুলসিরাতের উপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٢٩. لِئَلَّا يَعْلَمَ اَىْ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ الَّذِيْنَ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِمُحَمَّدٍ ﷺ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيْرُ الشَّانِ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ خِلَافَ مَا فِىْ زَعْمِهِمْ اَنَّهُمْ اَحِبَّاءُ اللّٰهِ وَاَهْلُ رِضْوَانِهٖ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ يُعْطِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط فَاٰتَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

২৯. এটা এ জন্য যে, যাতে জানতে পারে অর্থাৎ তোমাদেরকে এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন কিতাবীগণ অর্থাৎ তাওরাতের অধিকারীগণ, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। اَنْ টা হলো ثَقِيْلَة থেকে تَخْفِيْف কৃত। এর اِسْم হলো ضَمِيْر شَانْ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। তাদের ধারণার বিপরীত যে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং সন্তুষ্টভাজন, অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করে থাকেন কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করেছেন যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرَاهِيْمَ : এখানে وَاوْ -টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো لَقَدْ اَرْسَلْنَا -এর تَعْظِيْم এবং اِعْتِنَاء শব্দটি উহ্য রয়েছে। اُقْسِمُ তথা قَسْم আর جَوَابُ قَسْم -এর জন্য। আর لَامْ টি হলো رُسُلَنَا আর বৃদ্ধির জন্য قَسْم -কে تَكْرَار আনা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : উভয় নবী বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে- সকল নবীগণ তাদেরই বংশধর। হযরত নূহ (আ.) হলেন আবুল ছানী বা দ্বিতীয় পিতা। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন- আরব, রূম ও বনী ইসরাঈলের পিতা।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا : এটা অগ্রবর্তী দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে হয়েছে। আর اَلنُّبُوَّةَ হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ الْكِتَابُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْكِتَابُ -এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টা جِنْس -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةً : অধিকাংশের মতে رَهْبَانِيَّةً শব্দটি اِشْتِغَالْ -এর নিয়ম অনুপাতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اِبْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ اِبْتَدَعُوْهَا আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা رَأْفَةً -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ বলা হয়েছে আর اِبْتَدَعُوْهَا হলো رَهْبَانِيَّةً -এর সিফত।

قَوْلُهُ لٰكِنْ فَعَلُوْهَا : اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে এবং এটাকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ -ও বলা হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّٰهِ এই সুরতে عُمُوْمِ اَحْوَالْ থেকে اِسْتِثْنَاء হবে। আর كَتَبَ অর্থ হলো قَضٰى

قَوْلُهُ رَهْبَانِيَّةً : رَهْبَانِيَّةً -এর অর্থ হলো ইবাদত ও মুজাহাদার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা এবং জন-কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে একাকীত্ব গ্রহণ করা رَهْبَانِيَّةً শব্দটি رَا বর্ণে পেশ দিয়েও পঠিত রয়েছে, তখন এটা رُهْبَانٌ -এর দিকে নিসবত হবে যা رَاهِبٌ -এর বহুবচন। যেমন رُكْبَانٌ টা رَاكِبٌ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ اَيْ اَعْلَمَكُمْ بِذَالِكَ لِيَعْلَمَ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِئَلَّا -এর মধ্যে لَامْ টা অতিরিক্ত যা تَاكِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : اَللّٰهُ হলো মুবতাদা, আর ذُوالْفَضْلِ হলো তার খবর। আর اَلْعَظِيْمِ হলো اَلْفَضْلِ -এর সিফত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গাম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মিজান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ.)-এর এবং পরে পয়গাম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গাম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। আর যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার সবই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গাম্বরগণের পরম্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম উল্লেখ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর শরিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ.) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رَاْفَةٌ ও رَحْمَتٌ শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন– رَاْفَةٌ -এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কারো প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। যথা–

১. সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رَاْفَةٌ বলা হয়।
২. কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رَحْمَتٌ বলা হয়। মোটকথা رَاْفَةٌ -এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رَحْمَتٌ -এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رَاْفَةٌ -কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رَاْفَةٌ ও رَحْمَتٌ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাতহ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ; কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে কেরামের আরো একটি বিশেষ গুণ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ -ও বর্ণিত হয়েছে : অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোনো স্থানই সেখানে ছিল না।

قَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةَ ن ابْتَدَعُوْهَا : সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরি ব্যাখ্যা : رَهْبَانِيَّةٌ শব্দটি رُهْبَانٌ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। رُهْبَان ও رَاهِبٌ -এর অর্থ– যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণি ইঞ্জীলের বিধানাবলির প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হলো। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবিলার শক্তি তাঁদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তাঁরা رَاهِبٌ অথবা رُهْبَانٌ তথা 'সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত হতো এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رَهْبَانِيَّتٌ তথা 'সন্ন্যাসবাদ' নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোনো বিষয়কে আল্লাহর জন্য নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারো উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোনো ব্যক্তি নিজে কোনো বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরিয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করলে গুনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নজর-নিয়াজ আসতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল; আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমতো পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর (র.) বর্ণিত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আজাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়। সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে সাথে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরিয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরি করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরি করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন

করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কুরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরি করে নিয়েছিল, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا [তা যথাযথভাবে পালন করেনি]।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اِبْتَدَعُوْا শব্দটি بِدْعَتْ থেকে উদ্ভূত হলেও এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে- كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন- وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً .

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোনো কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رَهْبَانِيَّةٌ শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رَهْبَانِيَّةٌ শব্দের আগে اِبْتَدَعُوْا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তাই বলেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত তাফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কুরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনোরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথভাবে পালন করেনি। এটাও اِبْتِدَاعٌ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কুরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হতো, তবে তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়; বরং পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হতো।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিশুদ্ধ কথা এই যে, رَهْبَانِيَّةٌ শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। যথা-

১. কোনো অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কুরআন পাকের يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوْا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানালি পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

২ অনুমোদিত কাজ-কর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না; কিন্তু কোনো পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা করে কোনো অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন যেমন- পরিণামে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে কিংবা কোনো কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো কোনো বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সুফী বুজুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ এটা দ্বারা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয়; বরং তাকওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

৩. কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই ছওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে- لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাজতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজে অপরাধী হয়েছে।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ : এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেলায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতেই এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রিস্টানদের জন্য اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্ভবত এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবি। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরিউক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক ছওয়াব হযরত মূসা (আ.) অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরিয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় ছওয়াব শেষনবী ﷺ -এর উপর ঈমান ও তাঁর শরিয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোনো ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরিয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সৎকর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই ছওয়াবের অধিকারী হয়।

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ : এখানে لَا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলি এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভে সক্ষম হবে না; বরং যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপা লাভে সমর্থ হবে।

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُوْنَ : অষ্টাবিংশতিতম [২৮তম] পারা

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ : সূরা আল-মুজাদালাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ কথা স্বীকৃত যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ সে হিসেবে অত্র সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত تُجَادِلُكَ শব্দ হতে গ্রহণ করে এর নামকরণ করা হয়েছে মুজাদালাহ বা মুজাদিলাহ। مُجَادَلَة-এর অর্থ হলো– বাদানুবাদকারী বা বিতর্ককারী নারী। কেননা, এ সূরার প্রথমেই এমন একজন মহিলার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে যে নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর যিহার [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ তুমি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়] সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেছিল এবং বারবার এমন দাবি উত্থাপন করছিল যে, আপনি এমন কোনো উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনঃপুনিক কথাকে মহান আল্লাহ মুজাদালাহ বলেছেন। যার ফলে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে মুজাদালাহ। এতে ৩টি রুকূ'; '২২টি আয়াত, ৪৭৩ টি বাক্য এবং ১৯৯২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : মুজাদালার এ ঘটনা কবে ও কখন সংঘটিত হয়েছে হাদীসের কোনো বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা আহযাব যুদ্ধের [৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের] পরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আহযাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথা বলার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ "তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' কর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।' কিন্তু 'যিহার' করা যে কি রকমের পাপ বা অপবাদ তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি; এ ধরনের কাজ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়নি; কিন্তু আলোচ্য সূরায় যিহার সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তা হতে জানা গেল যে, সূরা আহযাবে বলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে এ সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরার শুরুতে ১ নম্বর হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি-বধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. ৭ নম্বর আয়াত হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'তানাজী' অর্থাৎ গোপন কান-পরামর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইহুদি ও মুনাফিকরা মু'মিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কান-পরামর্শে লিপ্ত হতো। এখানে কান-পরামর্শের হুকুম ও তার পরিণাম সম্বন্ধে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনার বাণীও শুনানো হয়েছে এ কথা বলে যে, মুনাফিক ও ইহুদিদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। পরে ইহুদিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
৩. ১১ নম্বর আয়াত হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসলিম জনগণকে বৈঠক ও মজলিসের সভ্যতা সংক্রান্ত আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিখানো হয়েছে। বিশেষত নবী করীম ﷺ-এর মজলিসে কি রকম আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
৪. ১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সে মানদণ্ডের কথা, যার ভিত্তিতে দীন ইসলামের প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে, তা যাঁচাই করা হয়। অর্থাৎ সেই হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগযু ফিল্লাহ'র হাকীকত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য যা নিতান্তই প্রয়োজন। –[সাফওয়া ও যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর অত্র সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا

মূলত প্রাক-ইসলামি যুগে যদি কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলে বসত তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত এবং তাদের উভয়ের মিলনের পথ চিররুদ্ধ হয়ে যেত। –[নূরুল কোরআন]

সূরার আমল : এ সূরা কোনো রুগ্‌ণ ব্যক্তির নিকট পাঠ করলে সে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। আর যদি কেউ এ সূরা লিপিবদ্ধ করে খাদ্যদ্রব্যে রাখে, তবে খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ থাকে। কারো জ্বর হলে আসরের নামাজের পর এ সূরা তিনবার পাঠ করে দম করলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তার জ্বর ভালো হয়ে যায়। –[নূরুল কোরআন]

সূরার [স্বপ্নের] তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি সূরা মুজাদালাহ স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে– যদি সে আলিম হয় তবে তার শত্রু পরাজিত হয়, আর যদি যে আলিম না হয় তবে দুশমনের বিজয়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। –[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ تُرَاجِعُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ فِيْ زَوْجِهَا الْمُظَاهِرُ مِنْهَا وَكَانَ قَالَ لَهَا اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ وَقَدْ سَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَجَابَهَا بِاَنَّهَا حُرِمَتْ عَلَيْهِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَعْهُوْدُ عِنْدَهُمْ مِنْ اَنَّ الظِّهَارَ مُوْجِبُ فِرْقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ اَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ق وَحْدَتَهَا وَفَاقَتَهَا وَصِبْيَةً صِغَارًا اِنْ ضَمَّتْهُمْ اِلَيْهِ ضَاعُوْا اَوْ اِلَيْهَا جَاعُوْا وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا تَرَاجَعَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَالِمٌ .

১. অবশ্যই শুনেছেন আল্লাহ সেই মহিলাটির কথা যে মহিলা বাদ প্রতিবাদ করছিল আপনার সাথে কথা কাটাকাটি করছিল আপনার সাথে হে নবী স্বীয় স্বামীর সম্পর্কে যে তার সাথে যিহার করার মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল (اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ) তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। তখন উক্ত মহিলা রাসূল ﷺ -কে সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ কথা বলে জবাব প্রদান করেছিলেন যে, উক্ত মহিলা তার উপর হারাম হয়ে গেছে; যেমনিভাবে তাদের মধ্যে এ প্রথা চলে আসছিল যে, যিহার করার দ্বারা স্ত্রীগণ স্বামী হতে চির বিচ্ছেদ বা চিরতরে হারাম হয়ে যায়। আর ঐ মহিলাটির নাম ছিল খাওলা বিনতে ছা'লাবা, আর উক্ত যিহারকারী পুরুষটির নাম ছিল আওস ইবনে সামেত (রা.) আর সে মহিলাটি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছিল, তার একাকিত্বতা, অনাহারিত্বতা, ছোট ছোট সন্তানদের ব্যাপারে যে, যদি তাদেরকে স্বামীর নিকট রেখে যায় তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার (খাওলার) নিকট থাকে তাহলে ক্ষুধার্ত থাকবে, আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করছিলেন আপনাদের বাদানুবাদ। অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শ্রবণকারী সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা বিজ্ঞ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ : বাক্যটি تُجَادِلُكَ-এর উপর আতফ। এখানে এক جُمْلَة-কে অন্য جُمْلَه-এর উপর আতফ করা হয়েছে। এ جُمْلَه-এর কোনো ই'রাব নেই, কারণ এ جُمْلَه টি اَلَّتِيْ-এর صِلَه।

কোনো কোনো মুফাসসির وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ বাক্যটিকে حَالْ বলাও বৈধ মনে করেন। অর্থাৎ সে নিজের অবস্থার অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে। তখন مُبْتَدَأ উহ্য মানতে হবে, অর্থাৎ وَهِيَ تَشْتَكِيْ কারণ যখন বিশুদ্ধ আরবিতে مُضَارِعْ-এর সাথে وَاوْ মিলিত হয় তখন সেখানে مُبْتَدَأ উহ্য মানা হয় বাক্যটিকে اِسْمِيَّة করার জন্য।

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ -এর দাল-কে إِظْهَارٌ করে পঠিত হয়েছে। আবূ আমর হামযা, কাসায়ী دَالٌ -কে سِيْن -এর মধ্যে إِدْغَامٌ করে قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ পড়েছেন। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا : জমহুর تُجَادِلُكَ পড়েছেন। অর্থাৎ তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে। কোনো কোনো কেরাতে تحاورك পঠিত হয়েছে অর্থাৎ সে তোমার সাথে কথোপকথন করেছে। –[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ الخ আয়াতের শানে নুযূল :

১. বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কত পবিত্র সত্তার অধিকারী সেই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র বিশ্বের কথা শ্রবণ করেন। ঐ স্ত্রীলোকটি যখন এ ঝগড়া নিয়ে এসেছিল ; সে আমার কক্ষেই বসেছিল এবং এ কথা বলছিল তখন আমি আমার ঘরের এক কোণে বসা ছিলাম কিন্তু আমি তার সব কথা শুনতে পারিনি; অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সপ্ত আসমানের উপরে বসে তার কথা শ্রবণ করেছিলেন। সে যখন বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করি। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতগুলো নিয়ে হাজির হলেন। –[মাযহারী, বুখারী, তাবারী]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে যখন কোনো লোক নিজের স্ত্রীকে اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়] এ কথাটি বলত তখন সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে লোক নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন, তিনি হলেন আউস। অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, রাসূল ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। যখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল। তখনই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[দুররে মানছূর, বায়হাকী]

৩. খাউলা বিনতে ছা'লাবা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আউস ইবনে সামেত আমার সাথে যিহার করেছিলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়েছিলাম অভিযোগ করার জন্য। তখন তিনি [রাসূল ﷺ] আমার সাথে সে ব্যাপারে কথোপকথন করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহকে ভয় করো, আউস তোমার চাচাতো ভাই।

আমি চলে আসার পূর্বেই কুরআনের আয়াত قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا হতে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا - পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে একজন দাস আযাদ করতে হবে। উত্তরে আমি বললাম, সে দাস আযাদ করতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে বৃদ্ধ লোক, তার রোজা রাখার শক্তি নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আমি বললাম, সদকা করার মতো তার কাছে কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে আরও এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এ এহসান করে ভালো করলে। যাও সেগুলো দিয়ে তার পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। অপর এক বর্ণনায় ষাট সা' বলা হয়েছে।

–[রাওয়ায়েউল বয়ান, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ]

৪. বর্ণিত আছে যে, আউস ইবনে সামেত একদিন তাঁর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবাকে নামাজরত অবস্থায় দেখলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন, আর আউস স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। যখন সে নামাজের সালাম ফিরাল তখন স্বামী তাকে কামনা করলেন। স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি রাগন্বিত হলেন এবং তার সাথে যিহার করলেন, তখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, আউস আমাকে যখন বিবাহ করেছিল তখন আমি যুবতী ও কামনীয় ছিলাম, যখন আমার বয়স বাড়ল এবং সন্তানাদির সংখ্যা বাড়ল তখন সে আমাকে তার মায়ের মতো করল। আমার কিছু ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, সে বাচ্চাদেরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমার সাথে দিলে অভুক্ত থাকবে। এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে ফয়সালা দেওয়ার মতো কিছু নেই। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ তাকে বলেছেন, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেতো তালাক দেয়নি, সে আমার সন্তানদের পিতা এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার জন্য

হারাম হয়ে গেছে। তখন সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে আমার ক্ষুধা ও দুঃখের অভিযোগ করছি। রাসূল যতই তাকে বলছিলেন যে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছে, ততই সে ক্রন্দন করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। যখন সে এ রকম অবস্থায় ছিল তখন রাসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তন হয়ে গেল এবং কুরআনের এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে? সে উত্তরে বলল, না, আল্লাহর কসম! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রোজা রাখতে পারবে কি? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক একবার দু'বার খেতে না পারলে আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং মনে হতে থাকে যে আমার মৃত্যু আসবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করতে পারবে কি? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনি আমাকে সদকা দিয়ে সাহায্য করলে পারবো। তখন রাসূল তাকে পনের সা' খাদ্য দান করলেন এবং আউসও নিজের পক্ষ হতে সমপরিমাণ দিয়ে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করলেন। -[কাবীর, খাযেন, ইবনু কাছীর]

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ : قَدْ এখানে আশা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং বাদানুবাদকারী মহিলা উভয়ই আশা করেছিল যে, আল্লাহ মহিলার তর্ক-বিতর্ক এবং অভিযোগ শুনুক এবং এ সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধান অবতীর্ণ করুক। -[কাশ্শাফ, রূহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

سَمِعَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সে মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, এ বাক্যের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কেবল শুনেছেন বা জানিয়েছেন এ অর্থ নয়। -[কাশ্শাফ, রূহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ মহিলাটির দু'টি কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا -এর মধ্যে তার বাদানুবাদ। বাদানুবাদটি ছিল এ রকম, যতবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলছিলেন যে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ, সে প্রতিবারই তদুত্তরে বলছিল, আল্লাহর কসম সে আমাকে তালাক দেয়নি।

তার দ্বিতীয় কথাটি হলো আল্লাহর দরবারে তার অভিযোগ। আর সে অভিযোগটি হলো তার এ উক্তি যে, আল্লাহর কাছে আমার দুঃখ আর ক্ষুধার কথা জানিয়ে অভিযোগ করছি, আরও বলছি যে, আমার কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : يَسْمَعُ শব্দটি مُضَارِعٌ-এর হওয়ার কারণে নতুনত্ব বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথোপকথন চলেছে। আল্লাহর শুনাও অব্যাহতভাবে চলছে।

تَحَاوُرَكُمَا 'তোমাদের কথোপকথন' এখানে রাসূল ﷺ -এর সাথে স্ত্রীলোকটিকেও একই সাথে সম্বোধন করে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

আর দুই জায়গায় আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি তরবিয়াত দানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। -[কাবীর]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এভাবে এ পবিত্র সূরা আরম্ভ করে আল্লাহ তা'আলা একদল মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ স্ত্রীলোকটির সাহায্যে ছিলেন তদ্রূপ তাদের সঙ্গেও আছেন, তাদের যে কোনো ছোট বড় সমস্যাবলির সমাধান দানের জন্য। তিনি তাদের দৈনন্দিন সমস্যাবলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাদের স্বাভাবিক সমস্যায় সাড়া দেন।

হযরত খাওলা (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.) ব্যবহার : হযরত আবূ ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রা.) একবার তাঁর খেলাফতের আমলে কিছু সংখ্যক লোক সাথে নিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মহিলা তাকে ডাক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) আহ্বানকারী সেই মহিলার নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে দাঁড়িয়ে তার কথা মনযোগের সাথে শ্রবণ করতে লাগলেন। এরপর সেই মহিলা যা চাইলেন তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একজন বৃদ্ধার কথায় থেমে গেলেন এবং আপনার জন্য এত লোক অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি তাকে চেন? এ মহিলা কে? ইতিহাসে সেই মহীয়সী নারী খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.) যাঁর অভিযোগ মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে শ্রবণ করেছেন। যদি আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা নয় সারারাত তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলতেন, তবে আমি তাঁর খেদমতে সর্বক্ষণ হাজির থাকতাম, তবে শুধু এটুকু যে নামাজের সময় নামাজ আদায় করে নিতাম- এরপর তাঁর কথা শ্রবণ করতাম। -[ইবনে কাছীর, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٢. اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ اَصْلُهُ يَتَظَهَّرُوْنَ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الظَّاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاَلِفٍ بَيْنَ الظَّاءِ وَالْهَاءِ الْخَفِيْفَةِ وَفِىْ اُخْرٰى كَيُقَاتِلُوْنَ وَالْمَوْضِعُ الثَّانِىْ كَذٰلِكَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَبِلَا يَاءٍ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ بِالظِّهَارِ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط كِذْبًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ لِلْمُظَاهِرِ بِالْكَفَّارَةِ .

২. যারা যিহার করে يَظَّهَّرُوْنَ শব্দটি মূলত يَتَظَهَّرُوْنَ ছিল ، تَا -কে ظَا -এর মধ্যে اِدْغَامْ করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে ظَا ও هَا -এর মধ্যখানে একটি আলিফ সহকারে يُظَاهِرُوْنَ পঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও শব্দটি একই রূপে বিভিন্ন কেরাতে পঠিত হয়েছে। তোমাদের মধ্য হতে তাদের স্ত্রীগণের সাথে। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো তারাই যারা اَلّٰٓئِىْ শব্দটি هَمْزَة ও يَا সহকারে এবং يَا ব্যতীত উভয়রূপে পঠিত হয়েছে। তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা তো যিহার করার মাধ্যমে বলে থাকে অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথা মিথ্যা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল যিহারকারীকে কাফ্ফারা আদায় সাপেক্ষে।

٣. وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا اَىْ فِيْهِ بِاَنْ يُّخَالِفُوْهُ بِاِمْسَاكِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا الَّذِىْ هُوَ خِلَافُ مَقْصُوْدِ الظِّهَارِ مِنْ وَصْفِ الْمَرْأَةِ بِالتَّحْرِيْمِ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اَىْ اِعْتَاقُهَا عَلَيْهِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط بِالْوَطْئِ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৩. আর যারা আপন স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে, অতঃপর প্রত্যাহার করতে চায় তাদের বক্তব্য, অর্থাৎ জিহার সংক্রান্ত বিষয়ে। এ মর্মে যে, যিহার কার্যের ব্যতিক্রমধর্মী মনোবাঞ্ছা করতে চায়, আর যিহারকৃত স্ত্রীকে পুনরায় বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ [বা বহাল] রাখতে চায় যা যিহারের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি হয়, অর্থাৎ স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করা, তবে একটি দাসমুক্ত করে দেওয়া, অর্থাৎ কৃতদাস আজাদ করে দেওয়া তার কর্তব্য হবে। তারা পরস্পর মিলনের পূর্বে সহবাসের মাধ্যমে। উল্লিখিত বাণীর সাহায্যে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অতি ভালোভাবে অবগত আছেন।

٤. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَىِ الصِّيَامَ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط عَلَيْهِ اَىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُّدٌّ مِّنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ ذٰلِكَ اَىِ التَّخْفِيْفُ فِى الْكَفَّارَةِ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَتِلْكَ اَىِ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ بِهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

৪. অনন্তর যে ব্যক্তি গোলাম না পায় তবে রোজা রাখবে দু'মাস অনবরত পরস্পর মিলামিশার পূর্বে। আর যে ব্যক্তি এটাতেও সক্ষমতা না রাখে অর্থাৎ অবিরাম দু'মাস রোজা পালনে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করা তার কর্তব্য অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। এতে مُقَيَّدْ -কে مُطْلَقْ -এর উপর স্থাপন করা হয়েছে। শহরে প্রচলিত প্রধান খাদ্য হতে ১ মুদ্দ সমপরিমাণ খাদ্য করে প্রত্যেক মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে। উক্ত নির্দেশ এ জন্য যে, অর্থাৎ কাফফারাহ -এর সহজতম ব্যবস্থা যাতে তোমরা বিশ্বাস আনয়ন কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর। আর এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, আর কাফিরগণের জন্য এ সকল বিধি-বিধান অস্বীকার করার কারণে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, পীড়াদায়ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ .... فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : ইসমে মাউসূল প্রথম মুবতাদা فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ দ্বিতীয় مُبْتَدَأٌ এ দ্বিতীয় مُبْتَدَأٌ -এর খবর উহ্য। অর্থাৎ فَعَلَيْهِمْ অথবা فَكَفَّارَتُهُمْ -কে এখানে উহ্য মানা হয়েছে। দ্বিতীয় مُبْتَدَأٌ আর خَبَرٌ মিলে جُمْلَه হয়ে প্রথম مُبْتَدَأٌ -এর খবর হয়েছে। এ جُمْلَه তে فَاء প্রবেশ করেছে مُبْتَدَأٌ তে শর্তের অর্থ লুকিয়ে থাকার কারণে।

قَوْلُهُ لِمَا قَالُوْا : ইবনুল আম্বারী বলেছেন, لِمَا-এর جَارٌ আর مَجْرُوْر উভয়টি نَصَب-এর স্থানে, কারণ তা يَعُوْدُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। এখানে مَا মাসদারিয়া, যার تَقْدِيْر হবে يَعُوْدُوْنَ لِقَوْلِهِمْ এ মাসদারটি مَفْعُوْل-এর স্থানে হওয়ার কারণে মানসূব। –[রাওয়ায়ে', ই'রাবুল কোরআন]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ : ذٰلِكَ - مُبْتَدَأٌ -এর খবর উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ذٰلِكَ وَاقِعٌ - ذٰلِكَ ইসমে ইশারাটি مَحَلًّا مَنْصُوْب ও হতে পারে, তখন تَقْدِيْر হবে فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا ।

قَوْلُهُ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ : হাফস ও আসেম يُظْهِرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে ضَمَّة এবং هَا তে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন।

নাফে', ইবনু কাছীর ও আমর يَظَّهَّرُوْنَ অর্থাৎ يَاء -কে فَتْح -কে اَلِف- حَذْف করে এবং هَا ও ظَاء তে তাশদীদ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন।

হামযা, কেসায়ী এবং হালাফ يَظَّاهَرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে فَتْح এবং ظَاء তে তাশদীদ ও اَلِف বৃদ্ধি করে পড়েছেন। হাসান, কাতাদাহ يَظَّهِرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে فَتْح এবং هَاء তে তাশদীদ ও كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ ...... وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের স্ত্রীগণ মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন, তারা অসম ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল।

يُظَاهِرُوْنَ শব্দটি ظِهَارٌ হতে উদ্ভূত হয়েছে। স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার এক বিশেষ পদ্ধতিকে ظِهَارٌ বলা হয়। আর তা হলো স্বামী স্ত্রীকে বলবে اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ [তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় হারাম।] এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য কিন্তু রূপক ভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। –[কুরতুবী, মা'আরেফুল কোরআন]

জাহিলিয়া যুগে আরবরা এভাবে স্ত্রীকে তালাক দিত বলে বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ আছে, কিন্তু আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে কোনো লোক স্ত্রীর সাথে রাগ করে বলে দিত اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তার দ্বারা স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যেত। এভাবে হারাম অবস্থায় বাকি থাকত। হালাল হবার কোনো বিধান ছিল না, যার ফলে তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। সে স্ত্রীলোকটিকে তালাকপ্রাপ্তাও মনে করা হতো না। তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হলে তার জন্য অন্য পথ খুঁজে নেওয়া সম্ভব হতো। তা ছিল নারী সমাজের উপর স্বামীদের এক প্রকার জুলুম, যা জাহিলিয়া যুগের নারী সমাজকে সহ্য করতে হয়েছে। –[যিলাল]

ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে এবং তা সংঘটিত হলে সমাধানের ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ এ আয়াতে জাহিলিয়া যুগের সে সামাজিক সমস্যার সমাধান দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যিহার নকল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, স্ত্রী কখনো মাতা নয়, যাতে মাতার ন্যায় হারাম হতে পারে। মাতাতো সেই নারী যিনি জন্ম দিয়েছেন। স্ত্রী কেবল একটা কথা দ্বারা মাতায় পরিণত হতে পারে না। সুতরাং এ কথাটি একটা বাস্তবতা বিবর্জিত নিন্দিত কথা। –[কাবীর]

স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা নিন্দনীয় হওয়ার কারণ : যিহারকারী স্ত্রীকে মা বলেনি, কেবল মায়ের সাথে তুলনা করছে মাত্র, কিভাবে তা নিন্দিত ও মিথ্যা হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ কথাটি মিথ্যা এ কারণে যে, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ কথাটি خَبَرٌ , اِنْشَاء না হয়। খবর হলে মিথ্যা এ কারণে যে, স্ত্রী হালাল আর মাতা হারাম। হালাল মহিলাকে হারাম মহিলার সাথে তাশবীহ দান বা তুলনা করা মিথ্যা।

আর যদি ইনশা হয়ে থাকে তবুও মিথ্যা, কারণ তখন অর্থ হবে ইসলামি শরিয়ত স্ত্রীকে হারাম করার উপায় হিসেবে এ বাক্যটিকে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি শরিয়ত এভাবে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এ হুকুম দান করার জন্য এ বাক্যকে ইনশা হিসেবে গ্রহণ করাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। -[রাওয়ায়েউল বায়ান, কাবীর]

যিহার কি তালাকের ন্যায় বৈধ না হারাম? : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাহিলিয়া যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হতো। এর দ্বারা স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যেত বটে কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা হতো না। কারণ এতে স্ত্রীকে চির হারাম মায়ের সাথে তুলনা করা হয়।

ইসলামে এ যিহার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তারা নিন্দিত ও মিথ্যা কথা বলে, এ কথার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যিহারকে হারাম ঘোষণা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ যিহারকে কবীরা গুনাহ বলে দাবি করেছেন। সুতরাং যে লোক যিহার করল সে লোক মিথ্যাবাদী ও শরিয়ত বিরোধী।

ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে যিহার হারাম। অতএব, যিহার করা বৈধ নয়। যিহার তালাক হতে ভিন্ন, কারণ যিহার অবৈধ আর তালাক বৈধ। এরপরও যে লোক যিহার করবে সে লোক হারামের মুরতাকিব বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

যিহারের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ : ظِهَارٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার তা ظَهْرٌ হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- পিঠের সাথে পিঠের মোকাবিলা করা, রাগান্বিত করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা, এক কাপড়ের উপর অন্য কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। -[লিসানুল আরব, রূহুল মা'আনী, আহকাম]

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফকীহগণ যিহারের দুই রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন-

১. জমহুর বলেছেন, যিহার হলো স্ত্রীকে "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের সমতুল্য" এমন কথা বলা, যেমন আরবরা বলত- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ.

২. আহনাফ, আওযায়ী, ছাওরী এক বর্ণনায় এবং শাফেয়ী ও যায়েদ ইবনে আলী তার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, যিহার হলো, 'স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে চির দিনের জন্য হারাম এমন কোনো মুহরিমা মহিলার সাথে তাকে তুলনা করা'। -[ফিকহুস সুন্নাহ]

حَقِيقَةُ الظِّهَارِ تَشْبِيهُ ظَهْرٍ حَلَالٍ بِظَهْرٍ مُحَرَّمٍ فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ فَهُوَ ظِهَارٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.

যিহারকারীগণকে আল্লাহ তা'আলা مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ কেন বলেছেন? : আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যিহারকারী স্বীয় স্ত্রীকে আপন মায়ের সাথে তুলনা করেছে মাত্র, মা বলেনি, তথাপিও তা নিন্দিত করা কিভাবে হতে পারে?

এটার জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ কথাটি মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, তা খবরও হয়, অথবা ইনশাও হয়।

খবর হলে মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, হালাল স্ত্রীকে হারাম মাতার সাথে তুলনা করা অশুদ্ধ। সুতরাং তা মিথ্যা। ইনশা হলে মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এ বাক্য দ্বারা মাতার সাথে তুলনা করার অনুমতি প্রদান করেনি এবং এ বাক্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সুতরাং তা মিথ্যা এ জন্য مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলা হয়েছে।

অথবা, مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলার কারণ হলো, শরিয়ত অথবা عَقْل অথবা طَبِيعَتْ-এর বিবেচনায় তা নিন্দিত কথা। তাই আল্লাহ তা'আলা مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলেছেন। -[কাবীর, আবীছউদ, রাওয়ায়েউল বয়ান]

প্রশ্ন: প্রকাশ্য আয়াতের দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, কেবল জন্মদানকারিণীই মাতা অথচ অন্য আয়াতে এটার ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। তোমাদের ধাত্রী, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মাতা তা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর. আয়াতের সরাসরি বর্ণনায় যা প্রকাশ পায় তাই কেবল আয়াতের উদ্দেশ্য নয়; বরং আয়াতের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে স্ত্রীগণকে মাতার সাথে তুলনার দ্বারা তারা মাতা হয় না; যাতে তারা মাতার ন্যায় হারাম হওয়াও আবশ্যক হয় না। আর শরিয়তে ইসলামও স্ত্রীদেরকে হারাম করার জন্য এ নির্দেশ দেয়নি; অথবা শব্দ দ্বারা হারাম হওয়ার জন্য শব্দটিকে سَبَبٌ হিসেবে নির্ধারিত করেনি। সুতরাং যেহেতু এ শব্দটি سَبَب حُرْمَة-এর জন্য নির্ধারিত করেনি; তা এর জন্য ব্যবহার করাও মিথ্যাবাদী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অন্য দিকে অপরাপর আয়াতে যেভাবে وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ বলা হয়েছে তা দ্বারা জন্মদানকারিণী মা -এর কথা বুঝানো হয়নি; বরং তা দ্বারা চির مُحَرَّمَاتْ -এর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন আয়াতের অর্থে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যিহার করার জন্য জন্মদানকারিণী মায়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া আবশ্যক নয়। চিরতরে বিবাহ করা হারাম এমন যে কোনো পর্যায়ের মহিলাদের সাথে তাশবীহ দিয়ে যিহার করলেই হয়ে যাবে।

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর হেজাজের অধিবাসীদের ভাষানুপাতে أُمَّهَاتِهِمْ-এর تَا -এ কাসরা দিয়ে পড়েছেন। আর মুফাযযল আসেম হতে বর্ণনা করে أُمَّهَاتُهُمْ-এর تَا -এ পেশ দিয়ে পড়েছেন। ইবনু মাসউদ بِأُمَّهَاتِهِمْ অর্থাৎ بَا বৃদ্ধি করে পড়েছেন। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, বাহরুল মুহীত, রাওয়ায়েউল বায়ান]

পূর্বাপর যোগসূত্র : উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল, স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করার জন্য যিহার করা হারাম। স্বামী যদি স্ত্রীর বিচ্ছেদ চায়, তাহলে বৈধ পন্থা হলো তালাক দেওয়া। যিহারকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ স্ত্রীকে মাতা বলা একটা অসার ও মিথ্যা কথা।

এখানে এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যদি কোনো মূর্খ ও অবাচীন ব্যক্তি যিহার করে বসে, তবে এ বাক্যের কারণে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। তবে স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তার থাকবে না; বরং স্ত্রীকে ভোগ করতে চাইলে তাকে পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করা ব্যতীত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। এ কাফ্ফারা হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, যা ডিঙানো হারাম। যারা এ বিধান লঙ্ঘন করবে পরকালে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ "وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ .... لِمَا قَالُوْا" : হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) يَعُوْدُوْنَ শব্দের তাফসীর করেছেন يَنْدَمُوْنَ শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ যিহার করার পর তারা অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। -[মা'আরেফুল কোরআন]

মুজাহিদ, তাউস, ছাওরী এবং ওসমান বিত্তী বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ হলো, ইসলামে জাহিলিয়া যুগের যিহারের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা। তাঁদের মতে এ আয়াতের অর্থ হবে, জাহিলিয়া যুগে যেসব লোকদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীর সাথে যিহার করা, ইসলাম গ্রহণের পর এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছিল, অতঃপর যারা যিহার করবে তাদেরকে গোলাম আজাদ করতে হবে। সুতরাং তাদের মতে ইসলামে যিহার প্রথা ফিরিয়ে আনার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

আবুল আলীয়া ও আহলে যাহির বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ হলো, পুনর্বার যিহারের শব্দাবলি উচ্চারণ করা। অতএব, তাঁদের মতে যিহারের শব্দ একবার উচ্চারণ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেই কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ -এর অর্থ হলো اَلْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ তথা সহবাস করার ইচ্ছা করা। সুতরাং যিহারের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, সহবাসের ইরাদা করলেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো, اَلْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ অর্থাৎ জিহার করার পর স্ত্রীকে পুনর্বার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাওয়া। সুতরাং স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিতে চাওয়াই হলো কাফ্ফারার কারণ। অপর এক বর্ণনায় সহবাস আর স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা উভয়কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا -এর অর্থ হলো- أَىْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشٰى كَفَّهُ الْغِشْيَانِ অর্থাৎ যখন মিলিত হতে ইচ্ছা করবে তখনই কাফ্ফারা আদায় করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর দীর্ঘ দিন তালাক না দিয়ে স্ত্রী হিসেবে আবদ্ধ রাখাই হলো ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ, সুতরাং যিহারের পর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তালাক না দিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আহমদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতামত কাছাকাছি, কারণ সহবাসের ইচ্ছা স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা, মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ও যিহারের পর তালাক না দেওয়ার অর্থই হলো- যে স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে সে স্ত্রীর সাথে পুনর্বার জীবন-যাপনের ইচ্ছা পোষণ করা। সুতরাং لِمَا قَالُوْا -এর لَامْ -এর অর্থ হলো إِلٰى অর্থাৎ তারা নিজেদের উপর যা হারাম করে দিয়েছিল, সহবাসের ইচ্ছা দ্বারা তা প্রত্যাহার করল।

ইমাম ফাররা বলেছেন, لِمَا قَالُوْا -এর অর্থ হলো عَمَّا قَالُوْا অর্থাৎ যা বলেছিল তা হতে ফিরে আসে।

ইসলামে যিহারের হুকুম : ইসলামে যিহারের হুকুম হলো, যিহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীর সাথে যিহার করার জন্য অগ্রসর হওয়া কোনো মুসলমানের জন্য কখনো বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ .

অতএব, যিহার করা হারাম, বরং শাফেয়ী ফকীহগণ বলেছেন, যিহার করা কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি যিহার করতে অগ্রসর হবে সে লোককে মিথ্যুক ও শরিয়ত বিরোধী মনে করা হবে এবং তার উপর এ কর্মকাণ্ডের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কারণ সে যা বলেছে তা মিথ্যা বলেছে। –[রাওয়ায়েউল বায়ান, ফিকহুস সুন্নাহ]

যিহার করার ফলে কি কি হারাম হয়? : স্ত্রীর সাথে যিহার করার ফলে দু'টি কাজ হারাম হয়ে যায়–

১. যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস এবং অন্যান্য যৌনক্রীড়া হারাম হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছে,– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا

২. পুনর্বার স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–
وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا .....
সহবাসের সাথে অন্যান্যভাবে উপভোগও হারাম হয়ে যায়, যথা– চুম্বন, আলিঙ্গন, স্পর্শ, মর্দন ইত্যাদি। তা মালিকী, হানাফী এবং হাম্বলীদের অভিমত।

ইমাম ছাওরীর এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, কেবল সহবাসই হারাম হয়, কারণ مَسَّ বলতে সহবাস বুঝানো হয়েছে। –[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : এ অংশের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, যারা নিজ-স্ত্রীর সাথে যিহার করল অতঃপর সেই যিহার হতে প্রত্যাবর্তনের ইরাদা করল তাদেরকে কাফ্ফারা হিসেবে একজন দাস বা দাসী আজাদ করতে হবে। অতঃপর ইমামগণের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়েছে যে, সেই দাস বা দাসী কি মু'মিন হতে হবে, না মু'মিন ও কাফির যে কোনো একটি আজাদ করলেই চলবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, এ দাসকে অবশ্যই মু'মিন হতে হবে নতুবা কাফ্ফারা আদায় হবে না। কারণ–

১. কতলের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে উম্মতে মুসলিমার ইজমা হয়েছে যে, অবশ্যই মু'মিন দাস আজাদ করতে হবে, কারণ সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ অর্থাৎ মু'মিন দাস আজাদ করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটি, مُطْلَقٌ (শর্তহীন) হলেও পূর্বোক্ত مُقَيَّدٌ (শর্তসাপেক্ষ) আয়াতের উপর প্রয়োগ করতে হবে।

২. আজাদী হলো এক রকমের পুরস্কার, সুতরাং সেই আজাদীর সাথে ঈমানের শর্ত লাগানোর মানে হলো সেই পুরস্কার আল্লাহর বন্ধুদেরকে দান করা, আর কাফিরদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা। এক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত জুড়ে না দেওয়ার অর্থ হবে– আল্লাহর দুশমনদের জন্য সেই পুরস্কার ও নিয়ামত উপভোগ করতে পারার পথ খুলে রাখা। সুতরাং ঈমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া অপরিহার্য। –[কাবীর]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যে কোনো দাস নারী হোক বা পুরুষ হোক, মু'মিন বা কাফির আজাদ করলেই চলবে। এক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ–

১. ঈমান শর্ত হলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কতলের কাফ্ফারায় যেমন জুড়ে দিয়েছেন তেমনিই জুড়ে দিতেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেখানে مُطْلَقٌ রেখেছেন সেখানে مُطْلَقٌ আর যেখানে مُقَيَّدٌ করেছেন সেস্থানে مُقَيَّدٌ রাখতে হবে।

২. হানাফীরা আরো বলেছেন, এখানে ঈমানের শর্তারোপ করার অর্থ হলো زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ যা প্রকৃতপক্ষে مَنْعٌ বা রহিতকরণ। এ রহিতকরণ অবশ্যই কুরআন বা خَبَر مَشْهُوْر দ্বারা হতে হবে। উল্লেখ্য এ ক্ষেত্রে দুটার একটাও নাই।

–[কাবীর, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا : অর্থাৎ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। اَنْ يَتَمَاسَّا -এর তাফসীরে ইমামদের মতান্তর রয়েছে। জমহুর ফিক্হবিদগণ [মালিকী, হানাফী ও হাম্বলী] বলেছেন اَنْ يَتَمَاسَّا -এর অর্থ হলো সহবাস এবং সহবাসের পূর্বের যাবতীয় যৌনকেলী, যেমন– চুম্বন, মুয়ানাকা ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতে এবং ইমাম ছাওরী (র.) বলেছেন, এ বাক্যের অর্থ হলো, সহবাস। সুতরাং কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস ছাড়া অন্যান্য কামক্রীড়া বৈধ। জমহুর তাদের স্বপক্ষে দলিল দিয়ে বলেছেন–

১. اَنْ يَتَمَاسَّا -এর مَسَّ শব্দ যে কোনো রকমের স্পর্শ বুঝায়। অতএব, যে কোনো রকমের যৌনোপভোগ হারাম।

২. যে মায়ের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে, সে মায়ের সঙ্গে যে কোনো ধরনের কামক্রীড়া যেমনি হারাম ঠিক তেমনি যিহারকৃত স্ত্রীর সঙ্গেও যাবতীয় কামক্রীড়া হারাম।

৩. যে লোকটি নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিল সে লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, مِنْ قَبْلِ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন না করা পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) কাছে যেয়ো না।
উপরিউক্ত কারণগুলোর কারণে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে যাবতীয় কামক্রীড়া হারাম।
–[রাওয়ায়েউল বায়ান, আয়াতুল আহকাম]

কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্পর্শ করলে কাফ্ফারা কি বৃদ্ধি পাবে? : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রা.) বলেছেন যে. যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে। সাথে সাথে সময় চলে যাওয়ার কারণে কাফ্ফারাও পতিত হয়ে যাবে।

জমহুর বলেছেন, এ কারণে সে গুনাহগার হবে, তাকে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে পৃথক করে রাখতে হবে।–(রাওয়ায়েউল বায়ান)

মুজাহিদ বলেছেন, তাকে দু'টো কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় মাযহাব হচ্ছে জমহুরের মাযহাব। কারণ এক হাদীসে আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো যে, তিনি [যিহারকারী] কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন, তখনও রাসূল ﷺ তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে বলেছেন। –[জামেউল ফাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ .... خَبِيْرٌ :

ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা দ্বারা যিহারের কাফ্ফারা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ বিধান লোকদেরকে যিহার থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে উপদেশ দানের জন্য অথবা তোমাদের নিজেদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমরা যা কিছু কর তা সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো আমলই গোপন নেই। যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত আমলের খবর রাখেন তোমাদের উচিত তাঁর দেওয়া বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ الخ :

এ আয়াতে যারা দাস মুক্ত করতে অপারগ তাদেরকে ক্রমাগতভাবে দু' মাস রোজা রাখতে বলা হচ্ছে। এ দু' মাসের মধ্যে একদিনও বিনা ওজরে রোজা না রাখলে তাকে আবার প্রথম হতে আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। আর যদি সফর বা রোগের কারণে রোজা রাখতে না পারে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী, মালিক, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, হাসান বসরী, শা'বী ইত্যাদির মতে বাকি রোজা পূর্ণ করলেই চলবে, প্রথম হতে আবার আরম্ভ করার প্রয়োজন হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তাকে পুনরায় প্রথম হতে আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا : এ বাক্যের তাফসীর উপরে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তুএখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো, যে লোক যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে ক্রমাগত দু' মাস রোজা রাখার সময়ের মধ্যে সহবাস বা যৌনাবেদন সৃষ্টিকারী কোনো কার্য করল, তাকে কি করতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুহাম্মদ আলী 'তাফসীরু আয়াতিল আহকাম' -এ লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ, মালিক ও আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মতে বলেছেন যে, তাকে আবার প্রথম হতে রোজা পূর্ণ করতে হবে। কারণ অত্র আয়াতে দু' মাস ক্রমাগতভাবে রোজা রাখতে বলা হয়েছে– একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর অপর এক মত হচ্ছে, লোকটিকে প্রথম হতে রোজা পূর্ণ করতে হবে না। কেবল বাকি রোজা রাখলেই চলবে। কারণ এ সহবাস দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হয়নি। সুতরাং দু' মাসের ক্রমাগত রোজার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি। মনে রাখতে হবে ক্রমাগতের শর্তের মধ্যে সহবাসহীন হতে হবে তেমন কোনো শর্ত নেই।
–[আয়াতুল আহকাম]

قَوْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا : অর্থাৎ যার পক্ষে ক্রমাগতভাবে ষাটটি রোজা রাখা সম্ভব হবে না, তবে সে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। বিভিন্ন কারণে রোজা রাখা সম্ভব না হতে পারে, যেমন– রোগের কারণে বা বার্ধক্যের কারণে অথবা অত্যন্ত কষ্টের কারণে কারো পক্ষে ষাটটি রোজা ক্রমাগতভাবে রাখা সম্ভব না হলে তাকে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে হবে।

এ আয়াতে একজন মিসকিনকে কতটুকু খাদ্য দান করতে হবে বা ক্রমাগত দান করতে হবে কিনা তা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু কয়েকটি হাদীসে অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব অথবা খেজুর দান করতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। সে কারণেই হানাফী ইমামগণ অর্ধ সা' বা এক সা' উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে আদায় করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.) -এর মতে এক মুদ্দ দান করতে হবে। ক্রমাগত দান করতে হবে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে জমহুর বলেছেন, যে কোনোভাবেই দান করা চলবে। ক্রমাগতভাবে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। –[আয়াতুল আহকাম]

খাদ্য দানের ক্ষেত্রেও কি স্পর্শ করার পূর্বে দান করা শর্ত? : আল্লাহ তা'আলা যিহারের কাফ্ফারা আলোচনা প্রসঙ্গে দাস আযাদ এবং রোজার ক্ষেত্রে স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করার শর্ত আরোপ করেছেন; কিন্তু মিসকিনদেরকে খাদ্য দানের ক্ষেত্রে শর্তহীন রেখেছেন। সুতরাং তা হতে বুঝা যায় যে, খাদ্য দানের পূর্বে অথবা, খাদ্য দানের মধ্যে সহবাস করলে গুনাহগার হবে না। শেখ আলী ছায়েছ বলেছেন, কোনো কোনো লোক তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত বলে দাবি করেছেন; কিন্তু তা ভুল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আসল অভিমত হলো, খাদ্য দানের পূর্বে বা খাদ্য দানের সময় সহবাস করলে গুনাহগার হবে। তবে তাকে পুনর্বার খাদ্য দান করতে হবে না। তা-ই জমহুর ফকীহদের অভিমত। –[আহকামুল কুরআন আলী ছায়েছ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ : ذٰلِكَ ইসমে ইশারা দ্বারা কাফ্ফারা সহজকরণ বা উপরিউক্ত সংক্রান্ত বিধানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফ্ফারা সংক্রান্ত এ বিধান এ জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো এবং তোমাদের জন্য যা বিধান হিসেবে দান করেছেন তা মেনে চলো। আর জাহিলিয়া যুগে তোমরা যা করতে তা পরিত্যাগ করো।

قَوْلُهُ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : تِلْكَ দ্বারা উল্লিখিত কাফ্ফারার বিধান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিধান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এ সীমানা লঙ্ঘন করো না। এসব সীমা লঙ্ঘনকারী কাফিরদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। এ আয়াতে এসব বিধান লঙ্ঘনকারীকে কাফির বলা হয়েছে ভয় প্রদর্শন ও কঠোর হুঁশিয়ারির নিমিত্তে।

কোন কার্য দ্বারা যিহার ভঙ্গ হবে? : এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে মূলত ইতঃপূর্বে হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْئِ সহবাসের ইচ্ছা দ্বারা যিহার ভঙ্গ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, কাতাদাহ (র.) -এর মতও তাই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْاِمْسَاكِ بِنُقْصَانٍ يُمْكِنُ مُفَارَقَتُهَا فِيْهِ অর্থাৎ এমন সময় পর্যন্ত স্ত্রীকে আটক করে রাখার ইচ্ছা করা যে সময়ের ভিতর স্ত্রী পৃথক থাকতে পারে। (তাফসীরে মাদারেক ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে يَحْصُلُ بِاسْتِبَاحَةِ اِسْتِمْتَاعِهَا (–সাবী) তাফসীরে যামানে এ মতে বর্ণিত হয়েছে যে,

يَحْصُلُ نَقْضُ الظِّهَارِ بِاِمْسَاكِهَا زَمَانًا يَقَعُ الْفُرْقَةُ وَفِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ بِمُجَرَّدِ اِمْسَاكِهَا بِطَرِيْقِ الزَّوْجِ عَقِيْبَ الظِّهَارِ زَمَانًا يُمْكِنُهُ مُفَارَقَتُهَا فِيْهِ.

مَسّ অর্থ কি? তার পদ্ধতি কি? مَسّ-এর অর্থ সম্পর্কে কি মতভেদ রয়েছে? : উক্ত আয়াতে مَسّ -এর অর্থ হচ্ছে– ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগানো ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, مَسّ-এর অর্থ وَطْى বা সহবাস করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন [তাফসীরে মাদারিকে বর্ণিত–]

اَلْمُمَاسَّةُ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا مِنْ جِمَاعٍ اَوْ لَمْسٍ اَوْ نَظْرٍ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَفِىْ رُوْحِ الْبَيَانِ عَلٰى قَوْلِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا اَىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَسْتَمْتِعَ كُلٌّ مِنَ الْمُظَاهِرِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِالْاٰخَرِ جِمَاعًا وَتَقْبِيْلًا وَلَمْسًا وَنَظْرًا اِلٰى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ .

অর্থাৎ তাফসীরে মাদারেকের বর্ণনা মতে مَسّ-এর অর্থ স্ত্রী হতে সহবাস, স্পর্শ, অথবা তার লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ্য করার দ্বারা স্বাদ উপভোগ করাকে مَسّ বলা হয়।

আর তাফসীরে রূহুল বয়ানের বর্ণনা মতে قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا-এর ব্যাখ্যা অংশে বলা হয়েছে مَسّ এর অর্থ– যিহারকারী ও যিহারকারিণী পরস্পর পরস্পর হতে সহবাস, চুম্বন, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোঁয়া অথবা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রতি খাহেশের সাথে লক্ষ্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধ ভোগ করাকে مَسّ বলা হয়েছে। কেননা اَلْمَسُّ শব্দটি উক্ত সকল প্রক্রিয়াকে শামিল করে।

মিসকিনকে কিভাবে খাবার খাওয়াবে? : ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-এর মতানুসারে এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্য প্রতি মিসকিনকে দিলেই চলবে। কিন্তু কয়েকটি হাদীসের বর্ণনা সাপেক্ষে ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী ইমামগণের মতে অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব অথবা খেজুর প্রতি মিসকিনকে দিলেই চলবে। জমহুরের মতে যদি একই দিন ষাট মিসকিন খাইয়ে দেওয়া হয় অথবা একজন করে ৬০ দিন ষাটজনকে খাইয়ে দেওয়া হয়, অথবা প্রতিদিন ১ জনকে ১ দিনের সমান খাদ্য দেওয়া হয় তাহলেও চলবে। (كَمَا فِىْ اٰيَةِ الْاَحْكَامِ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে একই ব্যক্তিকে একই দিন ৬০ দিনের সমান খাদ্য দিয়ে দিলে জায়েজ হবে না। শাফেয়ীগণের মতে তাও শুদ্ধ হবে, যেভাবে কাপড় দেওয়া জায়েজ হবে। হানাফীগণের যুক্তি এই যে, اِطْعَامٌ শব্দের অর্থ– খাদ্য খাইয়ে দেওয়া। সুতরাং একজন মিসকিনকে ৬০ দিনের খাদ্য একত্রে খাওয়ানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই ৬০ দিনে ১ জনকে খাওয়ালে তা শুদ্ধ হবে। –[শরহে বেকায়াহ্ ও হেদায়া]

নেশাগ্রস্ত লোকের যিহার বর্তিত হবে কি? : নেশাগ্রস্ত হয়ে যিহার করলে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদগণ ও চার ইমামের মতে তার যিহার কার্যকার হবে; কিন্তু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নেশা সম্বন্ধে জেনে-শুনে নেশাপানকারী হতে হবে এবং এমন ব্যক্তির তালাকও বর্তিত হবে। এর কারণ এই যে, সে নিজেই ইচ্ছাকৃত বেহুঁশ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেওয়া যিহার ও তালাক ধর্তব্য নয়। রোগ অথবা পিপাসিত অবস্থায় নেশা ও মধ্যপান করার পর মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতেও তালাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতেও তালাক হবে না।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যেমন নেশা দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত হয় বটে তবে কি বলে অথবা কি করে তা সঠিকভাবে বলতে পারে তখন তার যিহার বর্তিত হবে না। অন্যথায় বর্তিত হবে।

মুসলিম ও জিম্মিদের যিহারে হুকুম কি? : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে কেবলমাত্র মুসলমানদের যিহার ধর্তব্য হতে পারে, জিম্মিদের জন্য এতদ সম্পর্কীয় কোনো বিষয় গণ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বলেছেন– اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ অর্থাৎ আয়াতে মাত্র মুসলমানদেরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় উক্ত বিষয়ে সম্বোধিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর মতে মুসলমান ও জিম্মি উভয়ই যিহারের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, জিম্মিদের জন্য সাওম কার্যকর হবে না, বাকি দুই প্রকারের কাফ্ফারা তাদের দেওয়া আবশ্যক হবে।

যদি কয়েকবার যিহার করে তার হুকুম কি? : যদি কোনো স্ত্রীলোককে একই মজলিসে বা একাধিক মজলিসে একাধিকবার যিহার করা হয়; তবে প্রত্যেকবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তবে যিহারকারী যদি এ কথা বলে যে, আমার নিয়ত ছিল একবার যিহার করা; কিন্তু কথাটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্য একাধিকবার বলেছি এমতাবস্থায় একবার কাফ্ফারা আদায়ই যথেষ্ট হবে। –[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

٥. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ يُخَالِفُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا اُذِلُّوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِيْ مُخَالَفَتِهِمْ رُسُلَهُمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ط دَالَّةً عَلٰى صِدْقِ الرَّسُوْلِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ بِالْاٰيَاتِ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ .

৫. যারা বিরুদ্ধাচরণ করে বিরোধিতা করে আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রেরিত রাসূলের, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে লাঞ্ছিত করা হবে। যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীগণকে তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে। আর আমি স্পষ্ট নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করছি যা রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্য বহনকারী। আর অস্বীকারকারীদের জন্য নিদর্শনাবলিতে রয়েছে অপমানকর শাস্তি হীন অপদস্থকারী।

٦. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ .

৬. সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে অবহিত করা হবে তদ্বিষয়ে যা তারা আমল করেছে। আল্লাহ তৎসমুদয়ই সংরক্ষণ করেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সম্যক দ্রষ্টা।

٧. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ بِعِلْمِهٖ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

৭. তুমি কি দেখনি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই অবগত আছেন তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থজন হিসেবে বিরাজ করেন না। তাঁর অবহিতির মাধ্যমে। আর না পাঁচজনের মধ্যে, যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম অথবা অধিক হোক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিবেন, যা তারা আমল করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٨. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز هُمُ الْيَهُوْدُ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ مِنْ تَنَاجِيْهِمْ اَيْ تَحَدُّثِهِمْ سِرًّا نَاظِرِيْنَ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُوْقِعُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرِّيْبَةَ .

৮. তুমি কি দেখ না তাকাও না তাদের প্রতি যাদেরকে গোপন পরামর্শ হতে বারণ করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাই পুনরাবৃত্তি করে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে এবং তারা গোপন পরামর্শ করে পাপাচারিতা, সীমালজ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যচারিতা সম্পর্কে এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এরূপ শলা-পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন, যা তারা মুসলমানদেরকে দেখিয়ে করত। এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাতে মুসলমানগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয়।

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ اَلسَّامُ عَلَيْكَ أَيِ الْمَوْتُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا هَلَّا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ ط مِنَ التَّحِيَّةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ إِنْ كَانَ نَبِيًّا حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمَصِيرُ هِيَ.

তারা যখন আপনার নিকট আগমন করে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে হে রাসূল! এমন বাক্য দ্বারা, যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি তা হলো তাদের কথিত اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ আস-সামু আলাইকুম। অর্থাৎ মৃত্যু আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তজ্জন্য কেন لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত আল্লাহ আমাদেরক শাস্তি দেন না। এভাবে অভিবাদন করার কারণে। যদি সত্যই তিনি নবী হতেন, কাজেই বুঝা গেল তিনি নবী নন। তাদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত শাস্তি। যেথায় তারা নিক্ষিপ্ত হবে। বস্তুত তা নিকৃষ্টতম নিবাস তা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا يَكُونُ : সাধারণের কেরাত হলো يَكُونُ অর্থাৎ يَاء সহকারে। نَجْوٰى শব্দটি مُؤَنَّثٌ হলেও يَكُونُ এবং نَجْوٰى-এর মধ্যে مِنْ থাকার কারণে يَكُونُ ক্রিয়াটা مُذَكَّرٌ পঠিত হয়েছে। আবূ জা'ফর ইবনে কা'কা, আ'রাজ, আবূ হাইওয়া ও ঈসা مَا تَكُونُ অর্থাৎ تَاء সহকারে পড়েছেন।

وَلَا أَكْثَرَ শব্দে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর أَكْثَرَ অর্থাৎ ثَاء এবং رَاء তে যবর দিয়ে পড়েছেন, আর যুহ্‌রী এবং ইকরামা أَكْبَرَ অর্থাৎ بَاء দ্বারা পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَيَتَنَاجَوْنَ : হামযা, খালাফ, রুয়াইছ يَنْتَجُونَ অর্থাৎ يَفْتَعِلُونَ-এর ওজনে পড়েছেন। এ কেরাতকে আবদুল্লাহ এবং তাঁর সাথীগণ গ্রহণ করেছেন। অন্যারা وَيَتَنَاجَوْنَ অর্থাৎ يَتَفَاعِلُونَ-এর ওজনে পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এবং আবূ হাতেম এ কেরাতকেই গ্রহণ করেছেন। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : যাহহাক, মুজাহিদ এবং হোমাইদ وَمَعْصِيَاتِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ جَمْع اَلِفْ সহকারে পড়েছেন। আর জমহুর مَعْصِيَةٌ অর্থাৎ مُفْرَدٌ পড়েছেন। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "ثَلَاثَةٍ" : ফাররা'র মতে ثَلَاثَةٍ - نَجْوٰى-এর صِفَتٌ হওয়ার কারণে অথবা نَجْوٰى-এর মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে مَكْسُوْر [যেরবিশিষ্ট] হবে। তবে কোনো فِعْل উহ্য মেনে مَفْتُوْح পড়লেও বৈধ হবে। ثَلَاثَةٍ-এর نَجْوٰى-এ স্থানের بَدَلْ হিসেবে رَفْع দেওয়াও বৈধ। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ خَمْسَةٍ : خَمْسَةً মানসূব। কারণ خَمْسَةً এখানে উহ্য ক্রিয়া يَدْعُونَ-এর فَاعِلٌ - هُمْ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ وَلَا يَتَنَاجَوْنَ حَالَ كَوْنِهِمْ خَمْسَةً -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَلَا أَكْثَرَ : وَلَا أَكْثَرَ শব্দটি نَجْوٰى শব্দের উপর عَطْف করে مَكْسُوْر পাঠ হয়েছে। আবার অনেকেই مَحَلِّ نَجْو-এর উপর عَطْف করে مَرْفُوْع পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে যিহারের কাফ্‌ফারার আদেশ প্রদানের পাশাপাশি এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ সব হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা, মু'মিন মাত্রই কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার বিধান মান্য করা। আর যারা তাঁর বিধান অমান্য করে তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে তাদের ভয়াবহ পরণতির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ ..... شَيْءٍ شَهِيْدٌ : পূর্ব বর্ণিত আয়াতে ইসলামের আহকামসমূহের অনুসরণ করার প্রতি তাকিদ ছিল। এ আয়াতসমূহে আল্লাহর নাফরমানদের শাস্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ও সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের বিরোধিতা করে থাকে একদিন না একদিন অবশ্যই এমন বেইজ্জতী তাদেরকে ভোগ করতেই হবে যা বর্ণনা করার মতো নয়। এহেন বেআদবি করার কারণে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও এভাবে অপমানজনক অবস্থায় জগত হতে চিরতরে নিধন হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে কতইনা সুন্দরভাবে ভালোমন্দের জ্ঞান দান করেছি। আমার একত্ববাদ ও রাসূলগণের রিসালাত দ্বারা তাদেরকে ভূষিত করেছি, তথাপিও তারা অসৎ পথ হতে ফিরে আসেনি; বরং নিজ নিজ নাফরমানির পথে অটল রয়েছে। তাই এ সকল দুরাচার কাফিরদের জন্য আমি অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট শাস্তি সাজিয়ে রেখেছি।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, যেদিন তাদের প্রত্যেককে কবর হতে পুনরুত্থান করে ময়দানে হাশরে একত্র করবো, অতঃপর তাদের এ সমস্ত নাফরমানির কার্যকলাপ সম্মুখে তুলে ধরবো, তখন তারা কি উত্তর দিবে? আমি তো তাদের সকল কৃতকর্ম তাদের আমলনামায় কিরামান-কাতেবীন দ্বারা লিখিয়ে রেখেছি। তারা সে সময় বুঝতে পারবে। তাদের ধারণা ছিল হয়তো আমি সব ভুলে গেছি। আসলে সকল বিষয়ই আমার নিকট রক্ষিত রয়েছে। তারা নিজের সকল কৃতকর্ম ভুলে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ভুলতে পারেন না।

কারণ তিনি সর্ব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিকারী সর্বক্ষণে ও সর্বস্থানেই আল্লাহ উপস্থিত থাকেন। আর আল্লাহর সমীপে সব কিছু আয়নার ন্যায় উজ্জ্বল ও ভাসমান, যা অতীতে ঘটেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে। সুতরাং এ আয়াত দু'টি দ্বারা আল্লাহ গাফেল ও অচেতন লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তারা সব কিছু ভুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো, তারা সর্বদা ফিসক ও ফুজুরীর কাজ করতে থাকে, আর সেই কাজগুলো অচেতন অবস্থায় করতে থাকে। সকল নাফরমানির কার্যেই আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির সুব্যবস্থা রয়েছে। কারণ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ আল্লাহ নাফরমানদেরকে ভালোবাসেন না। আর নাফরমানদের থেকে সর্বদা আল্লাহ বিমুখ হয়ে থাকেন। قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ -[মা'আরিফ, তাফসীরে আশরাফী]

قَوْلُهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا (اَلْاٰيَة) : এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়েছে। **এক.** সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই [কাউকে বাদ না দিয়ে] পুনরুত্থিত করবেন। **দুই.** সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন। অর্থাৎ একই অবস্থায় সকলকে একত্রে উত্থিত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করা হবে। তখন তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত আমলের হিসাব রেখেছেন। অথচ তারা নিজেরা সেসব আমল হতে অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে করে ভুলে গেছে; কিন্তু আল্লাহ ভুলতে পারেন না। কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা, কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না। -[কাবীর]

قَوْلُهُ كُنْتُمْ : كُنْتُمْ শব্দকে مُضَارِعْ ব্যবহার না করে مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ হলো- بِاِعْتِبَارِ مَا يَؤُوْلُ অথবা تَحَقُّقْ وُقُوْعْ তথা ভবিষ্যতে যা বাস্তবায়ন লাভ করা আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী তা مُضَارِعْ -এর صِيْغَة দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এরূপ বহু ব্যবহার রয়েছে। যেমন- اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এসেছে তথা শাস্তি আসা অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব অবাধ্য লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যারা পরকালকে ভুলে থাকে। আর অত্র আয়াতে রয়েছে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ। এ পর্যায়ে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। মানুষ যত গোপনেই কোনো কাজ করুন না কেন এবং যত পরামর্শই করুন না কেন। সবই আল্লাহ তা'আলা দেখেন এবং শোনেন। -[নূরুল কোরআন]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের শানে নুযূল : উপরিউক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কয়েকটি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. ওয়াহেদী বলেছেন, মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, মুনাফিক এবং ইহুদিরা একে অপরের সাথে কানাকানি করত। তারা মু'মিনদেরকে বুঝাত যে, তাদের ক্ষতি করার জন্য এ কানাকানি করা হচ্ছে। এ অবস্থাদৃষ্টে মু'মিনগণ পেরেশান হতো। ইহুদি এবং মুনাফিকদের এ জাতীয় কর্মকাণ্ড যখন বৃদ্ধি পেল, তখন মু'মিনগণ রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন। তখন রাসূল ﷺ মু'মিনদের সামনে কানাকানি না করতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু তারা তা শুনল না। আবার কানাকানি করতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টি অবতীর্ণ করলেন। -[আসবাবুন নুযূল]

২. মুকাতিল বলেছেন, রাসূল ﷺ এবং ইহুদিদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল; কিন্তু যখন তাদের পার্শ্ব দিয়ে কোনো মুসলমান চলত তখন তারা একে অপরের সাথে কানাকানি আরম্ভ করত, যাতে ঐ মু'মিন অকল্যাণের ভয় করে। এ অবস্থাদৃষ্টে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কানাকানি করতে নিষেধ করলেন; কিন্তু তারা এ নিষেধাজ্ঞা শুনল না। তখন এ আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হলো। -[ফাতহুল কাদীর]

৩. ইবনে যাইদ বলেছেন, কোনো কোনো লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে নানা সমস্যার সমাধান চাইত এবং তাঁর সাথে কান পরামর্শ করত। তখন যুদ্ধ চলছিল। তা দেখে লোকেরা মনে করত যে, সে কোনো যুদ্ধ সম্বন্ধে বা বালা-মসিবত সম্বন্ধে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। এ কারণে তারা ভয় পেত। −[ফাতহুল কাদীর]

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

১. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন− একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট কয়েকজন ইহুদি আসল। তখন তারা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলল− اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ (অর্থাৎ আবুল কাসেম তোমার মৃত্যু হোক) তখন হযরত আয়শা (রা.) বললেন, وَعَلَيْكُمُ السَّامُ অর্থাৎ 'এবং তোমাদেরও মৃত্যু হোক।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা আল্লাহ অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না যে তারা বলছে اَلسَّامُ عَلَيْكَ 'তোমার মৃত্যু হোক'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে وَعَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপরও বলছি, তা কি শুনতে পাওনি? তখন আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

−[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন মুনাফিকগণ রাসূল ﷺ-কে সালাম করত তখন তারা বলত 'আসসামু আলাইকা', অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু বা ধ্বংস আসুক। −[ইবনে কাছীর]

وَيَقُولُونَ ...... الْمَصِيرُ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে কাছীর তার স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইমাম আহমদ (র.) -এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদিগণ উল্লিখিত নিয়মে নবী করীম ﷺ-কে সালাম প্রদর্শন করে চুপে চুপে বলতে থাকত যে, لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ তখন মহান আল্লাহ وَيَقُولُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ ...... الْمَصِيرُ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। −[মা'আরেফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ .... وَمَا فِي الْاَرْضِ (اَلْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই অবগত আছেন, তিন ব্যক্তির মনে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থজন হিসেবে বিরাজ করেন না। আর না পাঁচজনের মধ্যে যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না ...... অর্থাৎ হে জ্ঞানী শ্রোতা! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবহিত। আসমান-জমিনের কোনো বস্তুই তাঁর কাছে গোপন নয়। গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। লোকেরা গোপনে যেসব কানপরামর্শ করে তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সাথেই স্বজ্ঞানে উপস্থিত আছেন, তাদের অবস্থা ও আমল সম্বন্ধে তিনি অবহিত, তাদের অন্তরে যেসব ভাবনা-চিন্তার উদয় হয় সেসব সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত। বান্দার কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। তিনি কিয়ামত দিবসে− তা ভালো হোক বা মন্দ হোক যেসব আমল করছে তা সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন এবং প্রতিদান দিবেন। −[সাফওয়া]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত ইলম-এর আলোচনা দ্বারা আরম্ভ করেছেন, এ উক্তির মাধ্যমে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ এবং এ আয়াত শেষও করেছেন ইলম -এর আলোচনার মাধ্যমে এ উক্তি দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এ কথা বুঝবার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইলম جُزْئِيَّاتٌ এবং كُلِّيَّاتٌ সব কিছুকে শামিল করে আছে। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। −[সাফওয়া]

ثَلَاثَةٌ এবং خَمْسَةٌ সংখ্যা দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : এ সংখ্যা দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অনেক কারণ মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন−

১. সাধারণত কানাকানি তিনজন বা পাঁচজনের মধ্যেই হয়ে থাকে। এ কারণেই এ দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করেছেন।

২. অথবা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তার কোনোটি কানাকানিকারীর সংখ্যা ছিল তিনজন, আর কোনো কোনোটিতে সংখ্যা ছিল পাঁচজন, সে কারণেই বিশেষত এ দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। −[ফাতহুল কাদীর]

৩. এ সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কামালে রহমতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ যখন তিনজন লোক একত্রিত হয়, আর তাদের মধ্যে দু'জন কানাকানি আর গোপন পরামর্শে লেগে যায় তখন তৃতীয় ব্যক্তিটি একাকী থেকে যায়; এ অবস্থায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اَنَا جَلِيْسُكَ وَاَنِيْسُكَ অর্থাৎ "আমি তোমার সাথে বসেছি এবং তোমার মনোতুষ্টির জন্য উপস্থিত রয়েছি।" ঠিক তেমনি যখন পাঁচজন একত্রিত হয় আর দু'জন দু'জন কানাকানি করতে থাকে, তখন পঞ্চমজন একাকী থেকে যায়; কিন্তু যখন চারজন একত্রিত হয় তখন কেউ একাকী থাকে না। সুতরাং এখানে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, যে লোক সৃষ্টিজগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে একাকী রাখেন না। −[কাবীর]

৪. তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত এ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বেজোড় সংখ্যাই পছন্দনীয়। -[মা'আরেফুল কোরআন]

৫. বেজোড় সংখ্যা জোড় সংখ্যার চেয়ে উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। এখানে বেজোড় সংখ্যার উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে কোনো বিষয়ে তার প্রতি গুরুত্বদান অপরিহার্য।

৬. যে কোনো পরামর্শে অন্তত পক্ষে তিনজন থাকা উচিত, কারণ দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তখন তৃতীয়জন ফয়সালাকারী হিসেবে যেন থাকতে পারেন। এভাবে যে কোনো পরামর্শে দলাদলি হয়ে গেলে তখন সেখানে একজন অতিরিক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন সে ফয়সালা করতে পারে। -[কাবীর]

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- إِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا تَتَنَاجٰى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا الخ অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্র হবে তখন তৃতীয়জনকে ছেড়ে দু'জনে চুপে চুপে কিছু বলবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ব্যক্তি এসে না পৌঁছে, কারণ এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির অন্তরে ব্যথা জাগবে এবং তোমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে। অথবা তৃতীয় ব্যক্তি এমন কুধারণা করতে পারবে, তোমরা দু'জন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা করছ, তাই চুপেচুপে তোমরা দু'জনে বলছ। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ : আল্লামা ইবনে কাছীর বলেছেন, অনেকেই এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবি করেছেন যে, এ আয়াতে إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে তাদের সাথে থাকেন বলে বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, আল্লাহর জ্ঞান সাথে থাকা। এ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর শ্রবণ, আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখছে। আল্লাহর সৃষ্টি তাদেরকে অবলোকন করছে। তাঁর সৃষ্টির কোনো বিষয় তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি সব কিছু সম্বন্ধে অবহিত। -[ইবনে কাছীর]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি, শ্রবণ ও জ্ঞান-এর দিক দিয়ে সর্বাবস্থায় তাদেরকে সাথে রয়েছেন। তাদের কথা শুনেন জানেন এবং দেখেন। -[মা'আরেফুল কোরআন]

এ কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে আরশের উপর সমাসীন থাকা কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রমাণিত। কুরআনে বলা হয়েছে اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى "রাহমান আরশের উপর সমাসীন" এ আয়াতের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে ইমাম মালিক (র.) উত্তরে বলেছেন, 'ইস্তাওয়ার অর্থ জ্ঞাত, কিভাবে তা অজ্ঞাত এবং তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত'। -[ফাতহুল বারী]

আবূ মুতী বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ঐ লোক সম্বন্ধে বলেছেন যে লোক বলেন যে, আমার রব আসমানে আছেন না জমিনে আছেন তা আমি জানি না, সে লোক কুফরি করেছে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আর তাঁর আরশ সাত আসমানের উপর রয়েছেন।

আমি বললাম [আবূ মুতী] যা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন আছেন, তবে জানি না আরশ আসমানে না জমিনে? তখন তিনি বললেন, যে এ কথা বলে সে লোক কাফির। কারণ সে আরশ আসমানে হওয়াকে অস্বীকার করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইল্লিয়্যীনে রয়েছেন। তিনি উপর থেকেই ডাকেন, নিচে থেকে নয়।

-[আল-ফাতওয়া, আল-হামভিয়া, আল-কুবরা-২৮]

হাদীস শরীফে রূহ কবজ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন- حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ রূহকে নিয়ে যাওয়া হয় সে আসমান পর্যন্ত যেখানে আল্লাহ রয়েছেন।

-[মুসনাদে আহমদ]

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ .... لِمَا نُهُوْا عَنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি কি লক্ষ্য করেননি? ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যাদেরকে গোপনীয়ভাবে ইশারা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপরও গোপনে তারা ইশারায় কাজ হতে বিরত হয় না।

মুনাফিক সম্প্রদায় হুযূর ﷺ-এর মজলিসে আগমন করত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে ব্যথা জাগাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলের বিপক্ষীয় সমালোচনা গোপনে করত। আল্লাহ তাদের নিকৃষ্ট ধারণাসমূহ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করে দিলেন।

উক্ত আয়াতে কানাঘুষাকারী লোকগণ সম্বন্ধে মুফাসসিরগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেন মুনাফিকগণকেই আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ একদল কাফিরদের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম রাযী (র.) ইহুদিদের কথাই বর্ণনা করেছেন। কারণ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى দ্বারা যাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদেরকে লক্ষ্য করেই وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ

بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ বলেছেন। আর হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদিগণ যখন হযরতের সমীপে আগমন করত। তখন সালাম শব্দের পরিবর্তে আসসাম শব্দ ব্যবহার করত, যার অর্থ মৃত্যু এবং প্রত্যুত্তরে হুযূর ﷺ তাদেরকে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ বলে উত্তর দিতেন। ঘটনা চক্রে একদিন তারা এভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর সম্মুখে বললে হযরত আয়েশা (রা.) প্রতি উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ বলে উত্তর দিলেন। এরই অর্থ হলো- وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ সুতরাং আয়াতে ইহুদিগণই উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

আর আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নবীগণকে যে সকল শব্দ দ্বারা সালাম বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলো হলো سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ...... سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

قَوْلُهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এবং তারা গোপন পরামর্শ করে পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যাচারিতা সম্পর্কে।'

অর্থাৎ তারা পরস্পর এমন সব কথা বলে থাকে যাতে রয়েছে পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচারিতা। কারণ তাদের কথাবার্তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজি সম্বন্ধে হয়ে থাকে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা যখন তোমার নিকট আগমন করে তখন তারা তোমাকে অভিবাদন করে এমন বাক্য দ্বারা যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি।"

তাফসীরকারগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইহুদিরাই এ কাজ করত। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আসত তখন রাসূলকে অভিবাদনের স্বরে বলত اَلسَّامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু হোক।' তারা উচ্চারণটা এভাবে করত যে, সাধারণ লোকের কাছে বাহ্যত তা সালামই শুনাত; কিন্তু তারা মূলত এ বাক্য দ্বারা মৃত্যুই কামনা করত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জবাবে বলতেন, عَلَيْكُمْ কোনো কোনো বর্ণনায় وَعَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'এবং তোমাদের উপরও' তাই হোক, যারা তোমরা আমার জন্য কামনা করেছ। -[কাবীর, কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের কাছে আসল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, তোমরা জান কি এ লোক কি বলেছে? সাহাবীগণ বললন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে এমন বলেছে, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তখন সে লোকটাকে নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি আস্‌সামু আলাইকুম বলেছ? তখন সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন আহলে কিতাবগণ তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা তার জবাবে বলবে, তোমাদের উপর তাই হোক যা তোমরা বলেছ। তখনই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন আয়াতটি। وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ -[কুরতুবী]

জিম্মিদের সালামের জবাব দানের নিয়ম : ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মুসলমানদের সালামের মতো জিম্মিদের সালামের জবাবদান ওয়াজিব কিনা, সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, শা'বী, কাতাদা ওয়াজিব বলে মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক ও ইবনে ওয়াহাব (র.) বলেছেন, ওয়াজিব নয়। তবে কেউ জবাব দিতে চাইলে সে জবাবে কেবল وَعَلَيْكَ বলবে। আবার কেউ কেউ اَلسِّلَامُ অর্থাৎ سِيْن -এ যের দিয়ে জবাব দিতে বলেছেন। অর্থাৎ তোমার উপর পাহাড় পড়ুক। ইমাম মালিক (র.)-এর মত মেনে চলা এ ক্ষেত্রে উত্তম, কারণ পবিত্র হাদীসে [উপরউক্ত] তার স্বীকৃতি রয়েছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তজ্জন্য আল্লাহ কেন আমাদেরকে শাস্তি দেন না?" অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও যদি নবী হতেন তাহলে আমরা যা বলি তার জন্য আমাদেরকে আজাব দিতেন। তিনি সত্য নবী হলে আমাদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে না কেন? বলা হয়েছে- তারা আশ্চর্য হয়ে বলত, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের অভিবাদনের জবাব দিয়ে বলেন, তোমাদেরও মৃত্যু হোক। তিনি যদি নবী হতেন তাহলে তাঁর দোয়া আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে কবুল হতো এবং আমরা মরে যেতাম। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ অর্থাৎ "তাদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত শাস্তি।" পরকালে জাহান্নামে গিয়ে তারা এ কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করবে। আর সে জাহান্নাম হলো فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ নিকৃষ্টতম নিবাস। -[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

অনুবাদ :

٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

৯. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা গোপন পরামর্শ করো না পাপ কার্যে, সীমালঙ্ঘনতায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্যতা সম্পর্কীয়। আর গোপন পরামর্শ করো পুণ্য কার্যে ও আল্লাহভীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, আর সেই আল্লাহকে ভয় করবে যার সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

١٠. اِنَّمَا النَّجْوٰى بِالْاِثْمِ وَنَحْوِهٖ مِنَ الشَّيْطٰنِ بِغُرُوْرِهٖ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ هُوَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط اَىْ اِرَادَتِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

১০. ইত্যাকার কানাঘুষা পাপাচার ইত্যাদি বিষয় শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তার প্রবঞ্চনায় হয়ে থাকে। মুসলমানদেরকে মনঃক্ষুণ্নতায় ফেলতে পারে, বস্তুত সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনোই ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত, আর আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত মু'মিনগণের।

١١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا تَوَسَّعُوْا فِى الْمَجٰلِسِ مَجْلِسِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوِ الذِّكْرِ حَتّٰى يَجْلِسَ مَنْ جَآءَكُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج فِى الْجَنَّةِ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا قُوْمُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ فَانْشُزُوْا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الشِّيْنِ فِيْهِمَا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ بِالطَّاعَةِ فِىْ ذٰلِكَ وَيَرْفَعُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط فِى الْجَنَّةِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

১১. হে ঈমানদারগণ যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও প্রসারিত করো মজলিসে নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে, অথবা জিকিরের মজলিসে। যাতে পরবর্তী আগমনকারীগণ বসতে পারে। অপর এক কেরাতে مَجْلِسٌ শব্দটি বহুবচনের সাথে مَجَالِسٌ পঠিত হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন বেহেশতে আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, উঠে যাও নামাজের জন্য বা অন্যবিধ ভালো কাজের জন্য দাঁড়াও। তখন তোমরা উঠে যাও فَانْشُزُوْا শব্দটি অপর এক কেরাতে شِيْن -এর উপর পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছেন এ আদেশ পালনে আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আর মর্যাদায় সুমুন্নত করবেন তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে সম্যক অবহিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ : জমহুরের কেরাত হলো تَفَسَّحُ فِى الْمَجْلِسِ অর্থাৎ একবচনে। অসসুলামী, যার ইবনে হোবাইশ, আসেম تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ পড়েছেন। অর্থাৎ বহুবচন পড়েছেন। কাতাদাহ, হাসান, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ ও ঈসা ইবনে আমর تَفَسَّحُوْا-এর স্থানে تَفَاسَحُوْا পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

فَانْشُزُوْا أُنْشُزُوْا তে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : فَانْشُزُوْا ও أُنْشُزُوْا শব্দ দু'টির দু'টি কেরাত রয়েছে। নাফে, ইবনে ওমর ও আসেম فَانْشُزُوْا ও أُنْشُزُوْا অর্থাৎ شِيْن এ ضَمَّه দিয়ে পড়েছেন। অন্যরা উভয় স্থানে شِيْن -এর নিচে كَسْرَة দিয়ে أُنْشِزُوْا ও فَانْشِزُوْا পড়েছেন। তবে উভয় কেরাতের অর্থ হবে এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ উঠ। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ ইহুদি ও মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী কুপরামর্শের উল্লেখ ছিল। আর এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন প্রসঙ্গে কানাকানি ও গোপন পরামর্শ না করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর যদি কোনো পরামর্শ করতে হয় তবে তা যেন সৎকাজের জন্যই করা হয়।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত দু'টি আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুনাফিক গোষ্ঠীর নীতি এই যে, সর্বদা তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন ও লোকসান পৌঁছানোর মানসে লেগেই থাকত। আর মুমিনগণের অনিষ্ট সাধনের পন্থা খুঁজে বেড়াত, বিশেষত তারা সর্বদা এ কল্পনায় ব্যস্ত থাকত যে, কোনো প্রসঙ্গে তথা কোনো বিশষ ভূমিকা পালন করলে মুসলমানগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সতীর্থ বর্জন করতে বাধ্য হবে এবং তারা নির্দেশ লঙ্ঘন করবে। তাদের এ সকল বিষয়ের কানাকানির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করে তাদের সকল গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করে দিলেন।

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ...... وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর তখন তোমরা পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে গোপন পরামর্শ করো না।" অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের মধ্যে গোপন কথা বলবে তখন এমন কোনো কথা বলবে না যাতে পাপাচারিতা রয়েছে। যেমন মন্দ ও অশ্লীল কথা বলা বা অন্যের উপর অযথা সীমালঙ্ঘন করা অথবা রাসূলের বিরুদ্ধাচারিতা বা নাফরমানি করা। -[সাফওয়া]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন যে, 'স্পষ্টতই একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যেসব লোকের মন-মানসিকতা এখনো ইসলামি সংগঠনের প্রকৃতিতে পূর্ণভাবে গঠিত হয়নি; কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে ব্যাপারে তারা আলোচনা, পরামর্শ করার জন্য তাদের নেতাদের হতে দূরে একত্রিত হতো। যা ইসলামি জামায়াতের এবং ইসলামি সংগঠনের নীতি-প্রকৃতির বিরোধী ও পরিপন্থি। সংগঠনের কাম্য হলো সমগ্র চিন্তা-ভাবনা এবং প্রস্তাবনা প্রথমেই নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা এবং জামায়াতের মধ্যে পার্শ্ব বা উপদলের বিলোপ ঘটানো। এ কথাও স্পষ্ট যে, এসব উপদলের মধ্যে এমন অনেক কিছুই আলোচনা হতো যা ভাঙ্গন সৃষ্টির পথ খুলে দিত এবং ইসলামি দলের ক্ষতি করত। যদিও গোপন পরামর্শকারীদের অন্তরে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু চলমান সমস্যার ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করাই হতো কোনো কোনো সময় ক্ষতির কারণ এবং আনুগত্যের পরিপন্থি।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে তাদের সে গুণাবলির উল্লেখ করেছেন, যা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ .... اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ -এর তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কল্যাণ ও তাকওয়া বিষয়ে তোমরা পরামর্শ করো। আর তোমরা সে আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমরা সমাবিষ্ট হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন এবং তাঁর নিষেধ হতে বিরত থেকে মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদের সকলকেই তার আমলের প্রতিদান দিবেন। -[সাফওয়া]

এ আয়াতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তখন অর্থ হবে, 'হে বাহ্যত ঈমানদারগণ, অথবা হে এমন সব লোকেরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করে থাক।'

আবার কেউ কেউ এ আয়াতে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন, তখন অর্থ হবে, 'হে ঐ লোকেরা যারা হযরত মূসার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ।'-তবে প্রথমোক্ত মত অর্থাৎ মু'মিনগণ উদ্দেশ্য হওয়াই উত্তম।

অতঃপর মুসলিম জামায়াত হতে পৃথক হয়ে কানাকানি, গোপন পরামর্শ না করবার জন্য তাদেরকে বলতে গিয়ে বলেছেন, মুসলিম জামায়াত হতে আলাদা হয়ে কানাকানি ও গোপন পরামর্শ করতে দেখলে মুসলমানদের অন্তর অশান্তি ও চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে এবং তার ফলে মুসলিম সমাজে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এ কাজটিই করার জন্য শয়তান তৎপরতা চালিয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا النَّجْوٰى .... فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, গোপন পরামর্শতো শয়তানের দ্বারা হয়ে থাকে- তাদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর সক্ষম নয় তাদের কোনোই ক্ষতি সাধনে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে। আর আল্লাহর উপর নির্ভর করাই মু'মিনগণের কর্তব্য।

অর্থাৎ শয়তান মানুষদেরকে সে গোপন পরামর্শের দিকে প্ররোচিত করে যা মু'মিনদের দুশ্চিন্তা ও ভীতির কারণ হয়। -[কাবীর]

وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا এ অংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** গোপন পরামর্শ মু'মিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। **দুই.** শয়তান মু'মিনদের আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং মু'মিনদেরক উচিত কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখা। কারণ, যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে কখনো ব্যর্থ হয় না। তার প্রচেষ্টা বাতিল হয় না। -[কাবীর]

হাদীস শরীফে- যেসব অবস্থায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, বিশ্বাস নড়বড়ে হতে পারে-সেসব অবস্থায় গোপন পরামর্শ না করতে বলা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হবে সেখানে দু'জন তৃতীয়জনকে ছেড়ে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরো লোক না আসবে। কারণ এতে সে লোক মনঃক্ষুণ্ন হবে।

এটাই হলো ইসলামের আদব এবং শিক্ষা। এ আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে। তবে যেখানে গোপনীয়তা রক্ষা করার মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বা কারো দোষ গোপন করা হবে সে ক্ষেত্রে গোপনে পরামর্শ করার মধ্যে কোনো দোষ বা বাধা নেই। -[যিলাল]

تَنَاجِى -এর হুকুম : যদি কোথাও মজলিসে তিনজন থাকে তখন সে সময় একজনকে পৃথক রেখে দু' জনকে কানাকানি করতে নিষেধ করে হুযূর ﷺ একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَايَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهٗ . (بُخَارِىْ ، مُسْلِمْ ، تِرْمِذِىْ)

কুরতুবী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি সাধারণত সর্ব অবস্থা ও সর্ব কালকে শামিল করেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.), ইমাম মালিক (র.) এবং জমহুর মুহাদ্দেসীনগণের মতে কোনো ফরজ কার্যে, ওয়াজিব ও মানদুব বা মোস্তাহাব কার্যেও যদি কানাঘুষা হয় তথাপিও সে ক্ষেত্রে মনে ব্যথা জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত নির্দেশটি ইসলামের প্রথম যুগের জন্য ছিল, সে যুগে মুনাফিকগণ এ অবস্থায় কানাকানি করত। যখন ইসলামের প্রসারতা আসল তখন উক্ত অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেল।

আর কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে উক্ত অবস্থা সফর কালে অথবা এমন স্থানে ঘটত যেখানে পরস্পর নিরাপত্তার অভাব ছিল।

قَوْلُهٗ فَلَا تَتَنَاجَوْا : فَلَا تَتَنَاجَوْا -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : فَلَاتَتَنَاجَوْا হলো সাধারণ কেরাত। তবে ইয়াহইয়া ইবনে ওচ্ছাব, আসেম ও রুয়াইছ فَلَا تَنْتَجُوْا পড়েছেন।

পূর্বের সাথে সম্পর্ক : পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন যা তাদের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে এমন সব কাজের নির্দেশ দান করেছেন যা তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও মহব্বত বৃদ্ধি করবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করবে। -[সাফওয়া]

এ আয়াতের শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন সুফফায় ছিলেন। স্থানটি ছিল অপ্রশস্ত। রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারী এবং মুহাজির সাহাবীদেরকে সম্মান করতেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছু সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। মজলিস আগে থেকে পরিপূর্ণ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জন্য জায়গা করে দিবেন এবং আশায় তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বুঝতে পারলেন। এটা রাসূলের কাছে কষ্টকর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বদরে অনুপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজনকে বললেন, অমুক অমুক উঠ। যতজন দাঁড়িয়ে ছিল ততজনকে উঠিয়ে দিলেন। যাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হলো তাদের মনঃক্ষুণ্ন হলো এবং তাদের মুখমণ্ডলে মনঃক্ষুণ্নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। এ কারণেই মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল এবং বলতে লাগল তাদের ব্যাপারে ইনসাফ করা হয়নি। একদল লোক আগেই নিজেদের স্থান নিয়ে নিল এবং তারা [রাসূলের] কাছে বসতে চাইল; কিন্তু তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে যারা পরে আসল তাদেকে বসানো হলো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। -[কাবীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ আয়াত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাহ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন লোকেরা মজলিসে বসে পড়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে যেতে চাইলেন, কারণ তাঁর শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় দূর হতে তিনি শুনতে পেতেন না। তখন কোনো কোনো লোক তাঁর জন্য জায়গা প্রশস্ত করলে তিনি কাছে চলে গেলেন। তা কারো অপছন্দ হলো, যার ফলে উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হলো এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কথা শুনার জন্যই তিনি কাছে যেতে চান; কিন্তু অমুক লোক তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেন না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। -[কাবীর]

৩. ইবনে জারীর হযরত কাতাদাহ (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। আর সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে অনেক লোক আসা যাওয়া করতেন। তাদের সম্পর্কে অত্র আয়াত নাজিল হয়েছে, কেননা হুযূর ﷺ-এর কাছে বসার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করতেন, সকলেই আশা করতেন তাঁর বাণী শ্রবণ করতে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে। −[নূরুল কোরআন]

৪. আল্লামা বাগাবী (র.) ইকরামা এবং যাহ্হাক (র.) -এর সূত্রে লিখেছেন যে, আজান হওয়ার সাথে সাথে কিছু লোক নামাজের জন্য উঠতে দেরি করত, তখন وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا আয়াত নাজিল হয় তথা নামাজের জন্য যখন আজান হবে তখন উঠে দাঁড়াও। −[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ .... يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসে তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন।" এ আয়াতে মুসলমানদেরকে মজলিসের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে− اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ অর্থাৎ 'যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসের, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও।' এখানে যে মজলিসের কথা আছে সে মজলিস সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদা, যাহ্হাক ও মুজাহিদ বলেছেন, লোকেরা রাসূল ﷺ-এর মজলিসের কাছে বসার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো, তখন তাদেকে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত হাসান, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হোবাইব (র.) বলেছেন, এখানে মজলিস মানে যুদ্ধের মজলিস। কারণ সাহাবীগণ যখন যুদ্ধের কাতারে অংশ গ্রহণ করতেন তখন শাহাদত লাভের আশায় প্রথম কাতারে ঠাসাঠাসি করতেন, একজন আরেকজনকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতেন না। এ কারণেই তাদেরকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মজলিস মানে জিকির ও ওয়াজের মাহফিল। শানে নুযূল হতে বুঝা যায় মজলিস মানে জুমার খুতবার মজলিস।

কুরতুবী বলেছেন, এ আয়াতের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, যেসব মজলিসে মুসলমানগণ কল্যাণ এবং ছওয়াবের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় সেসব মজলিস এ আয়াতের শামিল। যে লোক আগে এসেছেন সে লোকই নিকটতম স্থনে বসার হকদার। তবে সে তার মুসলমান ভাইদের জন্য যতটুকু সম্ভব জায়গা প্রশস্ত করে দিবে। কারণ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো লোক অপর কোনো লোককে তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সে স্থানে বসবে না; কিন্তু তোমরা একে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করবে এবং খালি করে দিবে। −[বুখারী, মুসলিম, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন।' আল্লাহ কি প্রশস্ত করবেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অতএব, রিজিক, কবর, জান্নাত, বক্ষ, জায়গা ইত্যাদি যেসব ক্ষেত্রে বান্দা প্রশস্ততা কামনা করে সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ত করতে পারেন। −[কাবীর]

এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, আয়াত হতে বুঝা যাচ্ছে যে, যেসব লোক আল্লাহর বান্দাদের জন্য আরাম এবং কল্যাণের পথ খুলে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ প্রশস্ত করে দিবেন। কোনো জ্ঞানী লোকের জন্য এ আয়াতকে মজলিসের প্রশস্ততায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং আয়াতের অর্থ হলো মুসলমানদের কল্যাণ করা এবং তাদেরকে অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করবে।" −[কাবীর]

আয়াতে মজলিস দ্বারা কি উদ্দেশ্য? : আয়াত দ্বারা কোন মজলিস উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হযরত, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদাহ (র.) বলেন, লোকজন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে গিয়ে তাঁর দেহ মুবারক-এর নিকটে বসতে চেষ্টা করত এমনকি তা নিয়ে প্রতিযোগিতাও চলত। তখন তাদেরকে একে অপরের জন্য সভামঞ্চে জায়গা প্রসার করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আবূ হোবাইব, ইয়াযীদ, হাসান (র.) বলেন, এ আয়াতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মজলিস উদ্দেশ্য। কারণ, হুযূর ﷺ-এর সাথীবৃন্দের অভ্যাস ছিল যখন যুদ্ধের ডাক আসত তখন মজলিস উপস্থিত হতো এবং সাহাবীগণ শাহাদত লাভের ইচ্ছায় মজলিসের প্রথম কাতারে থাকার জন্য ঠাসাঠাসি করতেন এবং একে অপরকে স্থান দিতে ইচ্ছুক হতেন না। তাই তাদেরকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন (র.) বলেন এখানে জিকির ও নামাজের মজলিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো জুমার নামাজের মজলিস।

হযরত কুতুব রহমান (র.)-এর মতে উক্ত আয়াতে সাধারণ মজলিস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুসলমানগণের যাবতীয় ধর্মীয় ও জাগতিক সর্ব প্রকার মজলিসকেই বুঝানো হয়েছে; সুতরাং যে অগ্রে আসবে সে পরবর্তী আগন্তুককে স্থান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে সরে যাবে। তাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মসনদে আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত- لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوْا (اِبْنُ كَثِيْر) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সে যেন তথায় না বসে যায়; বরং তোমরা মজলিসের স্থান প্রসার করে দাও। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতেও আর একটি বর্ণনা রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন-

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ . لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا .
(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে প্রমাণিত হয় যে, বসা ব্যক্তিকে নিজ জায়গা হতে অন্য কেউ উঠানো জায়েজ নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ এভাবে করতে হবে যে, মজলিসের কর্তা অথবা পরিচালনাকারী যদি কাউকেও স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় তখন মজলিসের সম্মানার্থে তার সাথে বাড়াবাড়ি না করে নম্রতা ভদ্রতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে এবং কর্তার নির্দেশ পালন করতে হবে। কেননা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মজলিসের হিতার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলে তখন হয়তো নাড়াচাড়া করতে হবে।

অথবা, কোনো গুপ্ত বিষয়ে মজলিসের বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলোচনার প্রয়োজন হলে নড়াচড়া করা ব্যতীত তা সমাধান করা সম্ভব নাও হতে পারে, এমতাবস্থায় উঠে জায়গা প্রসার করতে হবে। তবে সর্ব ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, মজলিস পরিচালক অথবা কর্তার কর্তৃত্বের সময় নড়াচড়াকারী ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। অন্যথায় তা নাজায়েজ হবে।

اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا বক্তব্যের উদ্দেশ্য : এ বাক্যের তিনটি অর্থ হতে পারে- ১. প্রবেশকারীদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে যখন তোমাদেরকে উঠতে বলা হয় তখন উঠে যাও। ২. যখন তোমাদেরকে বলা হয় রাসূলের সম্মুখ হতে উঠে যাও, কথা দীর্ঘায়িত করো না তখন উঠে যাও। ৩. যখন তোমাদেরকে নামাজ, জিহাদ ও সমাজকল্যাণের কাজে এগিয়ে আসতে বলা হয় এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয় তখন তার জন্য তোমরা অগ্রসর হও ও প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তাতে অলসতা করো না। হযরত হযরত যাহহাক, ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, একদল লোক নামাজ পড়তে অলসতা করতে থাকে তখন তাদেরকে আজানের সাথে সাথে নামাজ আদায় করতে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ .... الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

অর্থাৎ যারা রাসূল ﷺ-এর কথা মেনে ঈমানের পরিচয় দেয় এবং যারা মু'মিনদের মধ্যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আলিমদের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, হে লোক সকল এ আয়াতের তাৎপর্য বুঝে নাও। জ্ঞানার্জনের প্রতি তোমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে মু'মিন আলিম সে মু'মিনকে- যে মু'মিন আলিম নয় তার উপর মর্যাদা দান করা হয়েছে।

কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কাছে মর্যাদার মানদণ্ড হলো ইলম ও ঈমান, মজলিসের মধ্যে বসা নয়। -[সাফওয়া, কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আলিমদের উচ্চ মর্তবার যে ঘোষণা রয়েছে তার কারণ এই যে, আলিমদের ইলম দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়। তাদের অনুসরণ করে অন্যরা নেক আমল করে। কিন্তু যে মু'মিন আলিম নয়; তার দ্বারা এমন কাজ অকল্পনীয়। -[কাবীর]

تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ : যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলে, তাদের জন্য রয়েছে এতে সুসংবাদ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের নেক আমলের ছওয়াব দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে। তাদের জন্য রয়েছে এতে সতর্কবাণী। কেননা তাদের অবাধ্যতার কারণে তিনি তাদের শাস্তি বিধানও করতে পারেন।

-[মাযহারী]

অনুবাদ :

١٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ اَرَدْتُّمْ مُنَاجَاتَهٗ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ قَبْلَهَا صَدَقَةً ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ط لِذُنُوْبِكُمْ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تَتَصَدَّقُوْنَ بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِمُنَاجَاتِكُمْ رَّحِيْمٌ بِكُمْ يَعْنِىْ فَلَا عَلَيْكُمْ فِى الْمُنَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهٖ .

১২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে চুপিসারে কথা বলবে তাঁর সাথে গোপন আলোচনার ইচ্ছা করবে। তবে তোমাদের গোপন কথার পূর্বে সদকাকে অগ্রবর্তী করবে তৎপূর্বে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক তোমাদের পাপের জন্য। অনন্তর তোমরা যদি অক্ষম হও যা দ্বারা সদকা করবে তাতে তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল তোমাদের গোপন আলোচনার জন্য পরম দয়ালু তোমাদের প্রতি। অর্থাৎ তবে গোপন আলোচনার জন্য তোমাদের উপর সদকা ব্যতীত আর কিছু কর্তব্য নেই। অতঃপর পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে।

١٣. ءَاَشْفَقْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَىْ اَخِفْتُمْ مِّنْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط لِلْفَقْرِ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا الصَّدَقَةَ وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ رَجَعَ بِكُمْ عَنْهَا فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اَىْ دُوْمُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর এ শব্দটি উভয় হামযা বহাল রেখে, দ্বিতীয়টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত করে, দ্বিতীয় হামযাটিকে আলিফসহ, আলিফ ব্যতীত সহজ করে পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ তোমরা কি ভয় পাও? চুপিচুপি কথা বলার পূর্বে সদকা পেশ করার ব্যাপারে দারিদ্র্যের কারণে। অনন্তর যখন তোমরা আদায় করতে পারলে না সদকা আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এ বিধান প্রত্যাহার করত সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো অর্থাৎ এ সকল বিধানের পাবন্দী করো। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٤. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا هُمُ الْمُنَافِقُوْنَ قَوْمًا هُمُ الْيَهُوْدُ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ اَىِ الْمُنَافِقُوْنَ مِّنْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا مِنْهُمْ مِنَ الْيَهُوْدِ بَلْ هُمْ مُذَبْذَبُوْنَ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ اَىْ قَوْلِهِمْ اَنَّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ فِيْهِ .

১৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি? তাকাননি? সে সমস্ত লোকদের প্রতি যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তারা হলো মুনাফিক এমন সম্প্রদায়ের সাথে যারা ইহুদি সম্প্রদায়। ক্রোধান্বিত হয়েছেন আল্লাহ তাদের উপর, তারা নয় অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ ঈমানদারগণ হতে, আর নয় তাদের মধ্য হতেও অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায় হতে; বরং তারা দোদুল্যমান। আর তারা শপথ করে বসে মিথ্যার উপর অর্থাৎ তাদের উক্তি এমন যে, অবশ্যই তারা মু'মিন, অথচ তারা জানে যে, অবশ্যই তারা তাদের এ উক্তিতে মিথ্যাবাদী।

١٥. أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِيْ.

১৫. ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তি কঠিনভাবে অবশ্যই যা তারা করছিল তা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম। গুনাহের কার্য হতে।

١٦. اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً سِتْرًا عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ فَصَدُّوْا بِهَا الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْجِهَادِ فِيْهِمْ بِقَتْلِهِمْ وَاَخْذِ اَمْوَالِهِمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ.

১৬. তারা বানিয়ে রেখেছে তাদের শপথ শব্দগুলোকে ঢাল স্বরূপ। তাদের নিজেদের জীবন ও সম্পদসমূহের রক্ষার্থে, অতঃপর বিরত রাখে, তা দ্বারা ঈমানদারগণকে আল্লাহর পথ হতে, তাদের বিপক্ষে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের দ্বারা, অতএব, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। লজ্জাজনক।

١٧. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا ط مِنَ الْاِغْنَاءِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১৭. কখনো তাদের কোনো কাজে আসবে না তাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ হতে আল্লাহর শাস্তি হতে সামান্যতমও যে কোনো প্রকার উপকার, তারাই দোজখী, তারা তথায় চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ : এ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ জুমলাটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلَّ نَصَب -এর স্থানে অবস্থিত। অথবা এ جُمْلَه টিকে جُمْلَة مُسْتَانِفَة বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ : এ বাক্যটি تَوَلَّوْا قَوْمًا -এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : وهم يعلمون বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ অবস্থা এই যে, তারা যে মিথ্যা ও বাতিল কসম করছে, সে সম্পর্কে তারা অবহিত।

قَوْلُهُ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ : জমহুর اَيْمَانَهُمْ অর্থাৎ أ তে فَتْح দিয়ে يَمِيْنٌ-এর جَمْع করে পড়েছেন। তবে হাসান ও আবুল আলীয়া اِيْمَانَهُمْ অর্থাৎ أ তে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন। তখন অর্থ হবে- তারা তাদের বাহ্যত ঈমানকে তাদের হত্যার মোকাবিলায় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। সুতরাং হত্যার ভয়ে তাদের জবান ঈমান এনেছে; কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনয়ন করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : মুনাফিকরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে নিজেদেরকে তাঁর একান্ত আপন এবং অতি অন্তরঙ্গ বলে প্রকাশ করার অসৎ উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরামর্শ করত। তাঁর কানে কানে কথা বলার চেষ্টা করত। তারা যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট এ কথা প্রকাশ করতেই তারা এমন তৎপরতা দেখাত। এভাবে হযরত নবী করীম ﷺ-এর অনেক কাজের ক্ষতি হতো। অনেক লোক তাঁর দরবার থেকে বঞ্চিত হতো, ফলে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে কোনো পরামর্শ করার পূর্বে আল্লাহর রাহে দান-সদকা করার আদেশ দেওয়া হলো। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا .... نَجْوٰكُمْ صَدَقَتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা রাসূলের সাথে চুপিসারে কথা বলবে তবে তোমাদের গোপন কথার পূর্বে সদকাকে অগ্রবর্তী করবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ নির্দেশের কারণ ছিল তাই যে, মুসলমানরা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুব বেশি প্রশ্ন করতে লাগলেন, যার ফলে রাসূলের কষ্ট হচ্ছিল। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের এ বোঝা হালকা করার নিমিত্তে এ নির্দেশ প্রদান করলেন। -[ইবনে জারীর]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এ নির্দেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ফকির-মিসকিনদের লাভের ব্যবস্থা, মুনাফিক ও মুখলেসের মধ্যে এবং দুনিয়া পূজারী ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থীর মধ্যে পার্থক্যকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চুপিসারে আলোচনা করার পূর্বে সদকা দান তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে অতি উত্তম কাজ। কারণ তাতে আল্লাহর নির্দেশ পালন রয়েছে, যা গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ। তবে 'এ নির্দেশ পালন তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক' এ কথা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ নির্দেশ পালন করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ ওয়াজিব হলে উত্তম ও পরিশোধক না বলে শাস্তির কথা বলা হতো। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অনন্তর তোমরা যদি অক্ষম হও তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ দান করার মতো কিছু তোমাদের কাছে না থাকলে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি এ নির্দেশ জারি করেছেন সক্ষমদের উদ্দেশ্যে মোস্তাহাব হিসেবে। সুতরাং সদকাবিহীন চুপিসারে অসামর্থ্যরা কথা বলতে পারবে। –[সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ-এর তাফসীর : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, উক্ত বর্ণিত পন্থাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা। অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে গোপনে আলোচনা করতে হলে পূর্বশর্ত হিসেবে তোমরা তাঁর নিকট সদকা পেশ করতে হবে। এতে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনুসরণ রয়েছে। –সাবী]

মুফাসসির (র.) বলেন, উক্ত নির্দেশ পালনের দ্বারা গুনাহসমূহ (সগীরাহ) মাফ হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ অর্থাৎ সদকা দ্বারা আল্লাহ গোসসা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উক্ত আয়াত দ্বারা সদকা ফরজ বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং ইঙ্গিত স্বরূপ বুঝা যায় তা মোস্তাহাব হবে। ফরজ বা ওয়াজিব যদি হতো তবে তা লঙ্ঘনের কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ থাকত।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা চুপিসারে কথা বলতে চায় অথচ সদকা পেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে। তাদের জন্য বিনা সদকা-এর মাধ্যমেও (বিশেষ প্রয়োজনে) কথা বললে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন, অথবা তৎপরবর্তী আয়াত দ্বারাও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। –[সাবী]

কানাঘুষার পূর্বে সদকা দানের নির্দেশ কত দিন বহাল ছিল? : চুপে চুপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলার পূর্বে সদকা প্রদানের নির্দেশের সময়সীমা সম্বন্ধে বিভিন্ন মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মাত্র এক দিনের চেয়েও স্বল্প সময় উক্ত নির্দেশ বহাল ছিল।

হযরত মুতাকিল ইবনে ইয়াহইয়া (র.) বলেন, উক্ত নির্দেশ দশ দিন পর্যন্ত বহাল ছিল, অতঃপর মানসূখ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের বর্ণনা মতে দশদিনের মেয়াদটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

قَوْلُهُ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا .... صَدَقٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপিচুপি কথা বলার আগে সদকা পেশ করার ব্যাপারে। এখানে মু'মিনদেরকে নরম ও দয়ার্দ্র ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চুপিচুপি কথা বলার পূর্বে সদকা করলে দরিদ্র হবে বলে ভয় কর? তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিজিক দান করবেন। তিনি ধনী, আসমান-জমিনের ধনের ভাণ্ডার তাঁর হাতেই রয়েছে। –[সাফওয়া]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য সহজ করবার নিমিত্তে এ হুকুম রহিত করে বলেন,

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ, অনন্তর যখন তোমরা আদায় করতে পারলে না সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।

অর্থাৎ যখন তোমরা সদকা আদায় করতে পারলে না তখন তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূলের সাথে চুপিসারে সদকা না দিয়ে কথা বলবার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে মনে রাখবে যে, তোমাদের উপর ফরজকৃত নামাজ ও যাকাত তোমাদেরকে অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই হুকুম নিজ বান্দাদের বোঝা হালকা করবার নিমিত্তে রহিত করেছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, একদিনের একাংশ কেবল এ বিধান প্রবর্তিত করা হয়েছিল অতঃপর রহিত করা হয়েছে। –[সাফওয়া]

উক্ত আয়াতের উপর হযরত আলী (রা.)-এর আমল : মুজাহিদ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলার পূর্ব দান-খয়রাত করার হুকুম যখন নাজিল হলো তখন হযরত আলী (রা.) ব্যতীত আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে পারে না। একমাত্র হযরত আলী (রা.) এক দিনার দান করে কিছু কথা বলেছেন। এরপর আলোচ্য আয়াতের হুকুম মানসূখ হয় এবং সাধারণভাবে কথা বলার অনুমতি হয়। এ জন্য হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে– যার উপর আমার পূর্বে কেউ আমল করেনি এবং পরেও কেউ আমল করতে পারবে না। আর তা হলো আলোচ্য আয়াত। –[নূরুল কোরআন]

পূর্বাপর যোগসূত্র : এখান হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন যারা আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোনো প্রকার কাফেরের সাথে কোনো মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েজ নয়। কেননা মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। কাফের আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারো প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব রয়েছে তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণে কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু এ সব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথেই সম্পর্কিত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার-সহানুভূতি-শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে শামিল নয়। সুতরাং তা কাফেরদের সাথেও করা যাবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ ..... وَهُمْ يَعْمَلُوْنَ-এর শানে নুযূল : এর শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. বর্ণিত আছে যে, কিছু সংখ্যক মুনাফিক গুপ্তভাবে ইহুদিগণের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল এবং মুসলমানদের মজলিসে বসে তাদের আলোচনার রহস্য ও গুপ্ত বিষয়াদি ইহুদিগণের নিকট গিয়ে বলে দিত। যদি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণের কেউ তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করত তখন তারা ঈমান জাহির করত ও এ সম্পর্কে মিথ্যাভাবে হাজার বার শপথ করত ও কুটিলতা করত না। আর বলত আমরা তো তোমাদের মতোই মুসলমান। সুতরাং আল্লাহ তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[মাদারেক]

২. অন্যান্য রেওয়ায়াত মোতাবেক বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল ও তার সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সাথে বসাছিলেন। হঠাৎ হুযূর ﷺ বললেন, এখন তোমাদের নিকট এক নিষ্ঠুর ও শয়তান ব্যক্তি আসবে। তার কিছুক্ষণ পর 'নাবতাল' আসল। সে ছিল দেহাবয়ব বেঁটে ও গোধুম বর্ণ, হানফাশ্রুমণ্ডিত নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট। তাকে হুযূর ﷺ প্রশ্ন করলেন যে, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? তখন সে এবং তার সঙ্গীগণ মিথ্যা শপথ করে বলল, আমরা এটা বলিনি; আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদের প্রসঙ্গে মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারটি ভেঙ্গে সত্যতা প্রকাশ করে দিলেন। –[তাফসীর কাবীর, কুরতুবী]

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ...... خٰلِدُوْنَ -এর শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) বলেন, মুনাফিকগণ মনে করে কিয়ামত দিবসে সে কেবল মুক্তি পাবে। এ কথা সত্য হলে আমরাই হতভাগ্য হবো, যদি কিয়ামত সত্যই সংঘটিত হয়। আল্লাহর কসম করে আমরা বলছি যে, কিয়ামতের দিবসে কেবল আমরাই আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মুক্তি পাবো আর অন্য কেউই নয়। তাদের এ বলাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ করেন। –[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ .... اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি কি তাদের দেখেননি? যারা বন্ধুত্ব করে সে সম্প্রদায়ের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রুষ্ট হয়েছেন।'

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, মুনাফিকরা ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তারা মুসলমানদের বিভিন্ন খবর ইহুদিদের কাছে সরবরাহ করত। ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করত। ইহুদিরাই হলো সে সম্প্রদায় যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রুষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ "ইহুদিরা হলো সে সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং যাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন।" মুনাফিকরা ইহুদিদের কাছে মু'মিনদের খবরা-খবর সরবরাহ করত। –[কাবীর]

قَوْلُهُ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা নয় তোমাদের দলভুক্ত এবং না তাদের দলভুক্ত।" অর্থাৎ এ সমস্ত মুনাফিকগণ না মু'মিনদের দলভুক্ত আর না ইহুদিদের দলভুক্ত। বরঞ্চ তারা দোদুল্যমান অবস্থায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অপর এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলেছেন- مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ শা'বী বলেছেন, তারা না নিষ্ঠাবান মু'মিনদের দলভুক্ত আর না নিষ্ঠাবান কাফিরদের দলভুক্ত। কোনো দলের সাথেই তাদের ভালো সম্পর্ক নেই।

قَوْلُهُ وَيَحْلِفُوْنَ .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা মিথ্যা শপথ করে অথচ তারা নিজেরাও জানে", অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর নামে শপথ করেছে তা যে মিথ্যা তা তাদের জানা, তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে।

এ মিথ্যার অর্থ কি? : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেছেন, হয়তো বা তারা এ কথা বলে মিথ্যা শপথ করত যে তারা মু'মিন। অথবা তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গালি দিত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা এ রকম করেছ, তখন তারা তাদের প্রাণের ভয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে বলত যে, আমরা এমন বলিনি-করিনি। এ হলো সে মিথ্যা যা সম্বন্ধে তারা শপথ করত। -[কাবীর]

قَوْلُهُ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ...... مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সুকঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে তা অতিশয় মন্দ।" এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, কোনো কোনো মুহাক্কিক আলিমের মতে সুকঠিন শাস্তির মানে কবরের আজাব। তবে আল্লামা ছাবূনী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিফাকের কারণে তাদের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে অতীব কষ্টকর ও কঠোর আজাব প্রস্তুত রেখেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন- إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

قَوْلُهُ اتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ ...... سَبِيْلِ اللّٰهِ الْاٰيَة : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাঁরা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে, অনন্তর তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে জিন্নি বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে অর্থাৎ-

أَيْ اِتَّخَذُوْا إِظْهَارَ إِيْمَانِهِمْ جُنَّةً عَنْ ظُهُوْرِ نِفَاقِهِمْ وَكَيْدِهِمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ তারা তাদের নিফাক ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ার পথে তাদের প্রকাশ্য শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অথবা, আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুসলমানগণ যেন তাদেরকে হত্যা করতে না পারে সে জন্য তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যখনই তাদের প্রাণের ভয় দূর হয় তখন তারা ইসলামকে নিষিদ্ধ করে ও মানুষের অন্তরে ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ইমাম রাযী (র.) বলেন, পরকালে তাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا -এর কবরের শাস্তির কথা বলেছিলাম, আর এখানে পরকালের শাস্তির কথা বলছি, যাতে تَكْرَارْ না হয়। আবার কোনো কোনো লোক উভয় স্থানে আজাবের অর্থ পরকালের আজাব বলে দাবি করেছেন। তখন তা হবে কুরআনের এ আয়াতের মতো যাতে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ .

আল্লামা কুরতুবী বলেন, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে হত্যা এবং আজাব দ্বারা উভয় স্থানে অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকরা তাদের মিথ্যা শপথকে তাদের ধন-সম্পত্তি ও আত্মরক্ষার ঢাল এবং অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করছে। মুসলমানদের ছদ্মবেশে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করত অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধাও প্রদান করছে বটে। কিন্তু তাদের এ দু-মুখো অভিনয় কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তাদের কোনো কাজেই আসবে না। তাদের বিষয়-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তখন তাদের কিছু মাত্রও উপকার করতেও পারবে না; বরং চিরকালই দোজখে অবস্থান করতে হবে। তথা হতে কখনো বের হওয়া সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ শাস্তি হলো কবরের আজাব। এর কারণ এই যে, মুনাফিকরা মুখে ঈমানের দাবিদার ছিল। প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করলেও তাদের অন্তর ছিল কাফেরদের সাথে। তাদের বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত, চির অভিশপ্ত ইহুদি জাতির সাথে। অথচ মুসলমানদের নিকট তারা শপথ করে বলত, আমরা তো মুসলমান। -[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

১৮. اُذْكُرْ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ اَنَّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ ط مِنْ نَفْعِ حَلْفِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ كَالدُّنْيَا اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ـ

১৮. স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে। তখন তারা তাঁর নিকট শপথ করবে যে, তারা মু'মিন। যেমন তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করে যে, তারা উপকৃত হবে তাদের শপথের দ্বারা ইহজগতের ন্যায় উপকৃত হবে। সাবধান! এরাই তো মিথ্যাবাদী।

১৯. اِسْتَحْوَذَ اِسْتَوْلٰى عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ بِطَاعَتِهِمْ لَهٗ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَتْبَاعُهٗ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

১৯. তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে প্রাধান্য সৃষ্টি করেছে শয়তান তারা শয়তানের আনুগত্য করার ফলে ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দল তার অনুসারী। সাবধান! শয়ানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ يُخَالِفُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ ـ

২০. নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচরণ করে বিরোধিতা করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে পরাজিতগণের।

২১. كَتَبَ اللّٰهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اَوْ قَضٰى لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط بِالْحُجَّةِ اَوِ السَّيْفِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ـ

২১. আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন লাওহে মাহফূযে অথবা সিদ্ধান্ত করেছেন। অবশ্যই বিজয়ী হবো আমি এবং আমার রাসূল দলিল প্রমাণ দ্বারা অথবা তরবারি দ্বারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

২২. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ يُصَادِقُوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اَىِ الْمُحَادُّوْنَ اٰبَآءَهُمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ بَلْ يَقْصِدُوْنَهُمْ بِالسُّوْءِ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ كَمَا وَقَعَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض) ـ

২২. তুমি পাবে না এমন কোনো সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাসী যে, তারা বন্ধু মনে করে ভালোবাসে তাদের যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। যদিও তারা বিরুদ্ধাচারীগণ তাদের পিতা অর্থাৎ মু'মিনদের। অথবা তাদের পুত্র বা তাদের ভ্রাতা কিংবা তাদের গোত্র বরং তারা ঈমানের আলোকে তাদের ধ্বংস কামনা করে এবং তাদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর থাকে। যেমন সাহাবায়ে কেরামের অনেকে এরূপ করে দেখিয়েছেন।

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُوَادُّونَهُمْ كَتَبَ أَثْبَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ بِنُورٍ مِّنْهُ ط تَعَالَى وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوا عَنْهُ ط بِثَوَابِهِ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ط يَتَّبِعُونَ أَمْرَهُ وَيَجْتَنِبُونَ نَهْيَهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ.

অনুবাদ : তারাই যারা তাদের ভালোবাসে না, সে সকল লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সুদৃঢ় করেছেন স্থিতিশীল করেছেন ঈমানকে এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন রূহের দ্বারা জ্যোতি দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা। আর তিনি তাদেরকে প্রবিষ্ট করবেন বেহেশতে, যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর আনুগত্যের কারণে। আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তাঁর পক্ষ হতে প্রদত্ত প্রতিদানে। এরাই আল্লাহর দল। তারা তাঁর আদেশ মান্য করে এবং তাঁর নিষেধ হতে বেঁচে থাকে। জেনে রেখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে কৃতকার্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ .... هُمُ الْكَاذِبُونَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে। তখন তারা তাঁর নিকট শপথ করবে, যেমন তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করে যে, তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের জন্য কেয়ামত দিবসে যখন মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থিত করবেন তখন তারা দুনিয়াতে তোমাদের সামনেও যেমন মিথ্যা শপথ করে তেমনি আল্লাহর সামনেও মিথ্যা শপথ করে বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমরা মুশরিক ছিলাম না।" আর তারা মনে করবে যেমনি দুনিয়াতে মিথ্যা শপথ দ্বারা তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে তেমনি আখেরাতেও আল্লাহর আজাব ও শাস্তি হতে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

আবূ হাইয়ান বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে, এ মুনাফিকরা কিভাবে মনে করল যে, তাদের কুফরি عَلَّامُ الْغُيُوبِ আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে। তারা কিভাবে আল্লাহ তা'লাকে মু'মিনদের মতো ভাবতে পারল যে, মু'মিনগণ যেমন তাদের কুফরি আর নিফাক সম্বন্ধে অনবহিত আল্লাহ তা'আলাও তেমনি অনবহিত। মোদ্দাকথা হলো তারা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই দুনিয়াতে যেমন তাদের মুখ হতে মিথ্যা বের হয়ে পড়ে তেমনি আখেরাতেও তাদের মুখ হতে মিথ্যা বের হয়ে পড়বে। তারা এত বড় মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে পর্যন্ত মিথ্যা বলতে সাহস করবে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ .... فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে শয়তান। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল, সাবধান! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ শয়তান কুপ্ররোচণা দিয়ে দুনিয়ায় তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মুফাজ্জেল বলেছেন, তাদেরকে আবেষ্টিত করে রেখেছে।

فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ অর্থাৎ ফলে তাদেরকে আল্লাহর জিকির [স্মরণ] ভুলিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, যিকরুল্লাহ মানে আল্লাহর আনুগত্যকরণ সম্বলিত নির্দেশাবলি। কথিত আছে [এখানে] আল্লাহর নাফরমানি না করার জন্য দেওয়া হুঁশিয়ারী।

أُولَـٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ তারা শয়তানের দল, মানে শয়তানের অনুগত ও সহচর। সাবধান! শয়াতনের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা শয়তানের আনুগত্য করে জান্নাত হারিয়েছে এবং নিজেদের জন্য চিরতরে দোজখের আজাবকে আবশ্যক করে নিয়েছে। সুতরাং তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ ..... فِي الْأَذَلِّينَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সাবূনী বলেছেন, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারাই আল্লাহর রহমত হতে দূরে থাকার কারণে লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে। -[সাফওয়া]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, উপরে শয়তানের দলকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। এখানে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। এ বিরুদ্ধাচরণের ফলে তারা সর্বযুগের সর্বস্থানে অধিক লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সেহেতু আল্লাহর বিরোধীরা সীমাহীন লাঞ্ছনার ভাগী হবে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ كَتَبَ اللّٰهُ .... قَوِيٌّ عَزِيزٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন, অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূল ﷺ। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

মুনাফিকগণ মনে করত যে ইহুদিরা একটা বিরাট শক্তি। সে জন্য তারা ইহুদিদের কাছে এসে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করত। নানান বিষয়ে তাদের পরামর্শ চাইত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিরাশ করে এখানে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর দুশমনদের জন্য আল্লাহ পরাজয় ও বিপর্যয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং নিজের ও নিজের রাসূলের জন্য বিজয় সুনিশ্চিত করেছেন। -[যিলাল]

কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিজয়ী হবেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিজয়ী হওয়ার কোন কোন পদ্ধতি রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব বলেন ঈমান ও তাওহীদ শিরক ও কুফরির উপর বিজয় লাভ করেছে। আর এ দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে। শিরক ও পৌত্তলিকতার বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছে। আর দৈনন্দিন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর শিরক ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করেছে।

আর বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সত্যের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা হলেও দেখা যায় যে, তারা বিশ্বাস করে তাদের ধর্ম মূলত বাতিল এবং তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হয়তো বিশেষ কোনো স্বার্থে তারা ঈমান গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে। সম্ভবত ঈমানকে পুনরুজ্জিবীত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন এবং সময় মতো ঈমানের বাস্তবায়ন দেখা যাবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, তরবারি ও শক্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হবেন। কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের সম্মুখে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জয়ী হবেন। কোনো মুফাসসিরের মতে এ মতটি অগ্রাহ্য। কারণ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, মক্কা, খায়বর ও তায়েফ বিজয় হওয়ার পর মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগল যে, আশা করি রোম ও পারস্য মুসলমানদের করতলগত হবে। এটা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালূল মুনাফিক বলতে লাগল, তোমরা কিভাবে এত বড় আশা করছ। অথচ রোম ও পারস্য অধিপতিগণ অনেক সৈনিকের অধিকারী ও তোমাদের অপেক্ষা অনেক সাহসী। আল্লাহর শপথ, তোমাদের এহেন ধারণা বস্তবায়ন হবে না। তখনই উক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলের এ বিজয় কেবল যুক্তিগত নয়; বরং বস্তুগত ও বৈষয়িক। -[কুরতুবী, ইবনে কাছীর, কাবীর]

لَا تَجِدُ قَوْمًا (الْآيَةَ) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ : এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কয়েকটি কারণ বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত আবূ ওবাইদা ইবনুল জাররাহা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি উহুদ ময়দানে যুদ্ধের সময় নিজের পিতাকে হত্যা করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা জাররাহ বারবার তাকে হত্যা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তিনি পিতাকে এড়িয়েই যাচ্ছিলেন। জাররাহ যখন বারবার তাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন এক পর্যায়ে তিনিও আক্রমণ করে নিজের পিতাকে হত্যা করে ফেললেন। -[কুরতুবী]

২. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এ আয়াতটি হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের জন্য মনস্থ করলেন এবং তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তখন পরিকল্পনার কথা কয়েকজন বিশেষ সাহাবী ছাড়া বাকি সাহাবীদের কাছে গোপন রাখা হলো। হযরত আবু বালতায়া (রা.) এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার কাছে চিঠি দিলেন। এরপর যথাসময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে হযরত আবূ বালতায়ার এ চিঠি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। এ ঘটনার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। -[কুরতুবী]

৩. সুদ্দী বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্বন্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি পান করার পর যে পানি বাকি রয়েছে তা আমাকে দিন, আমার বাবাকে পান করাব। হয়তো আল্লাহ এ পানির বরকতে তার অন্তরকে পাক করে দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকি পানি তাঁকে দিলেন। তিনি সে পানি নিয়ে আসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) বলল, এটা কি? তিনি উত্তরে বললেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করা পানির বাকি পানি। এ পানি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, হয়তো আল্লাহ এ পানির বরকতে আপনার অন্তরকে পবিত্র করে দিবেন। তখন তাঁকে তাঁর পিতা বলল, তোমার মায়ের প্রস্রাব নিয়ে আস, তা এ পানির চেয়ে অধিক পবিত্র। তখন তিনি (আবদুল্লাহ) রাগান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আমার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, বরঞ্চ তুমি তার সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার ব্যবহার করবে। -[কুরতুবী]

৪. ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি শুনেছি যে, আবূ কুহাফা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালি-গালাজ করেছিল, তখন তার সন্তান আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যার ফলে তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যান, অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ঘটনা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সত্যিই কি তা করেছ, আর কখনো এ রকম করবে না। -[কুরতুবী]

৫. বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসআব ইবনে উমাইর (রা.) বদরের যুদ্ধে তার ভাই আবদ ইবনে উমাইরকে হত্যা করে ফেলেন, আর এ দিকে ইঙ্গিত করেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

৬. বদরের যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.), হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওবায়দা ইবনে হারিছ (রা.) তাঁদের নিজ নিজ নিকটাত্মীয়দের হত্যা করেছিলেন বিধায় অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[কামালাইন]

প্রথমে পিতা, তারপর পুত্র, তারপর ভ্রাতা, অতঃপর গোত্র দ্বারা আরম্ভ করার কারণ : তাফসীরে বাহরুল মুহীতে বলা হয়েছে যে, প্রথমে পিতার কথা বলা হয়েছে, কারণ তাদের আনুগত্য পুত্রদের উপর অপরিহার্য। তারপর পুত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ তাদের মুহব্বত অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। অতঃপর ভ্রাতার কথা বলা হয়েছে, কারণ ভ্রাতাদের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর গোত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ গোত্র দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, দুশমনদের উপর বিজয়ী হওয়া যায়। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সেই সকল লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন।" এখান হতেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের গণনা আরম্ভ করেছেন। একটি নিয়ামত হলো আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন, তখন কিভাবে তাদের অন্তরে আল্লাহর শত্রুদের মহব্বত থাকতে পারে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন রূহের দ্বারা তার পক্ষ হতে।" এখানে দ্বিতীয় নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে রূহ দান করে শক্তিশালী করা হয়েছে। এখানে রূহ অর্থ কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রূহের অর্থ হলো দুশমনদের উপর মু'মিনদের বিজয়। এ বিজয়কে রূহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, বিজয়ের মাধ্যমেই মু'মিনদের জীবনে প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল।-(কাবীর, সাফওয়া)

সুদ্দীর মতে, এখানে مِنْهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো ঈমান। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের রূহ দান করে শক্তিশালী করা হয়েছে। যেমন, কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا এখানে রূহ মানে অন্তরের নূর।

রাবী ইবনে আনাস বলেন, রূহের অর্থ হলো কুরআন ও কুরআনের হুজ্জত।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, জিবরাঈল।

আবার কেউ 'ঈমান'ও বলেছেন, আর কেউ 'রহমত' বলেছেন। এসব দ্বারা যে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ .... وَخٰلِدِيْنَ فِيْهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তিনি তাদেরকে প্রবিষ্ট করাবেন বেহেশতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করবে।" হলো সে তৃতীয় নিয়ামত যা মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। অর্থাৎ আখিরাতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

قَوْلُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।" এটা হলো মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত চতুর্থ নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল কবুল করে নিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারা আল্লাহ প্রদত্ত ছওয়াব পেয়েছে, অতএব তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, এ আয়াতে এক অতি গোপন بديع রয়েছে। আর তা হলো, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয় প্রতিবেশী ত্যাগ করল তখন তার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী নিয়ামত ও বিরাট সফলতা দান করত সন্তুষ্ট করলেন।

قَوْلُهُ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : উক্ত অংশে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে حِزْبَ اللّٰه বা আল্লাহর সেনাদল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আল্লাহ বলেন, তোমরা জেনে রাখবে যে, সর্বদা আল্লাহর দলই সফলতা অর্জন করবে। তাদের কাজ হলো এরা আল্লাহর নির্দেশিত কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সৎকর্মে সহায়তা করবে। অসৎকর্মে নিষেধ করবে। প্রয়োজনে আল্লাহর শত্রুদেরকে হত্যা করবে। যদিও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ছেলে সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন। আর আল্লাহর কার্য করতে সক্ষম হওয়ার চেয়ে বড় সফলতা আর কিছুই নয়। -[ফাতহুল কাদীর]

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা গোটা মানবকুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ হলো আল্লাহর দল অর্থাৎ حِزْبَ اللّٰه আর ইতি পূর্বে অপর ভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হিযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল সর্বদা জয়ী থাকবে। আর হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের দল সদা পরাভূত থাকবে ও সর্বশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

كَمَا قَالَ تَعَالٰى اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ . وَقَالَ اَيْضًا اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

سُوْرَةُ الْحَشْرِ : সূরা আল-হাশর

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ -এর হাশর শব্দটির নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা এমন সূরা যাতে اَلْحَشْرُ শব্দটি রয়েছে।

এ সূরার অপর নাম হলো সূরা বনূ নাযীর। হযরত ইবনে যোবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -কে বললাম, এটি সূরা হাশর। তিনি বললেন একে সূরা বনূ নাযীর বলো, কেননা এ সূরায় মদীনা শরীফ থেকে বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অত্র সূরায় ৪টি রুকূ', ২৪টি আয়াত, ৭৪৬টি বাক্য ও ১৭১২টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল : সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কাছে সূরা হাশর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এটা বনূ নাযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা আনফাল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে- قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ সূরা হাশর না বলে সূরা নাযীর বলো। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হলো, এ সূরায় যে আহলে কিতাবী লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে তা বনূ নাযীর সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ গোটা সূরাটিই বনূ নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বনূ নাযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে জুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের ছয়মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম ও বালাযূরীর বর্ণনায় তা চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই ঠিক। কেননা, সব বর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনার পর তা ঘটেছিল। আর বীরে মাউনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের অপমানজনক শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় ইহুদি ও মুনাফিকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকত।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধের বিবরণ নাজিল হয়েছে, আর সূরা হাশরে বনূ নাযীর গোত্রের বিবরণ নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরকে মদীনা মোনাওয়ারা থেকে তখন বহিষ্কার করা হয়, যখন নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধ শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, আর বনূ কোরায়যার ঘটনা ঘটে আহযাবের যুদ্ধের পর; দু'টি ঘটনার মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। -[নুরুল কোরআন]

সূরাটির বিশেষত্ব : মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কারো শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন অজু করে বিসমিল্লাহ -এর সাথে উক্ত সূরার শেষাংশে বর্ণিত আয়াত (لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا (اَلْاٰيَةَ পড়ে ব্যথাস্থানে ফুঁক দিয়ে দেয়, তাহলে উক্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর যদি সূরা হাশর -এর শেষ আয়াত অথবা পূর্ণ সূরাটি মৃতব্যক্তির মাথার পার্শ্বে বসে কিংবা মৃতদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে ছওয়াব বখশিশ করে দেওয়া হয়, তাহলে মৃতগণ কবরের আজাব হতে রক্ষা পাবেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরাহ আল-হাশর -এর বিষয়বস্তু কয়েকটি রয়েছে। তন্মধ্যে সূরার প্রথমাংশে আল্লাহর গুণাবলি ও কাফির বনূ নাযীর গোত্রের মদীনা হতে নির্বাসনের বিশেষ ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের বর্ণনাও রয়েছে। বনূ নাযীর গোত্র পক্ষান্তরে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল। তারা তাদের সময়কালে ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না। অপর দিকে তাদের যুদ্ধ হাতিয়ার অজস্র পরিমাণ ছিল। তাদের বাসস্থান মদীনার ভূমিতে শত শত বছর পূর্ব থেকেই ছিল এবং তারা অত্যন্ত সুকঠিন ও দৃঢ় দুর্গের পত্তন করেছিল। তাদের হীন ধারণা মতে তাদেরকে কোনো শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না। এতদসত্ত্বেও সর্বশেষ তাদের পরাজয় ঘটল এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলিম সেনাবাহিনী জয়ী হলেন। শত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এতে এ কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, যখনই যে জাতি আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় নামবে তখনই তারা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ ৫ম আয়াতে বর্ণিত বাণী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় আইনের ধারার ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ ও সামরিক সৈনিক কর্তৃক কোনো এলাকায় শত্রুদের মোকাবিলায় (শত্রু এলাকায়) পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপসমূহ ইসলামিক আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ তথা কুরআনে নিষিদ্ধ "ফাসাদ ফিল আরদ" -এর অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়।

৩. তৃতীয়াংশে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ১০ম আয়াতে ইসলামিক জিহাদ ও মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপোষ মীমাংসার ফলে অর্থ সম্পদসমূহ বিলি-বণ্টনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. চতুর্থাংশে উক্ত বনূ নাযীর গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধকালীন মুনাফিকগণের আচার-আচরণ ও কু-প্রবৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে।

৫. পঞ্চমাংশে (শেষাংশে) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে উপদেশবাণী, ঈমানের মূল উপকরণ এবং ঈমানদার ও বেঈমানের মাঝে পার্থক্য, আর ঈমানের গুরুত্বসহ আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনার প্রকাশ করা হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইরবাছ ইবনে সারিয়াহ (রা.) হতে একটি হাদীস রয়েছে, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বদা রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে মুসাব্বাহাত (অর্থাৎ এসব সূরাগুলো যেগুলোর পূর্বে سَبَّحَ يُسَبِّحُ سُبْحَانَ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে) পড়তেন। আর বলতেন উক্ত সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম। তন্মধ্যে সূরা-হাশর একটি। কেউ কেউ মতানৈক্যে বলেন, তার উত্তম আয়াতটি হলো– لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى الخ উক্ত বর্ণিত হাদীসটি হলো–

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রতিদিন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠান্তে সূরা হাশর -এর শেষ তিন আয়াত هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পাঠ করে থাকে, তখন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন ৭০,০০০ [সত্তর হাজার] ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যারা সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকে। যদি উক্ত দিবসে সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে থাকে, তাহলেও সারা রাত তাকে উক্ত গুণে ভূষিত করা হবে। –[মাযহারী ও ইতকান]

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল হাশর মদীনায় অবতীর্ণ

اَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَفِى الْاِتْيَانِ بِمَا تَغْلِيْبٌ لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِهٖ وَصُنْعِهٖ.

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা ব্যক্ত করে। ل হরফটি অতিরিক্ত আর অপ্রাণী-বাচক বস্তুর জন্য ব্যবহৃত অব্যয়, مَا ব্যবহার দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় তাঁর রাজত্ব ও কর্মকাণ্ডে।

٢. هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ هُمْ بَنُوْ النَّضِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ مِنْ دِيَارِهِمْ مَسَاكِنِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط هُوَ حَشْرُهُمْ اِلَى الشَّامِ وَاٰخِرُهُ اَنْ جَلَاهُمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِىْ خِلَافَتِهٖ اِلٰى خَيْبَرَ مَا ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ خَبَرُ اَنَّ حُصُوْنُهُمْ فَاعِلُهٗ بِهٖ تَمَّ الْخَبَرُ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ اَمْرُهٗ وَعَذَابُهٗ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِمْ مِّنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

২. তিনিই আহলে কিতাবগণের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে বহিষ্কৃত করেছেন তারা বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিগণ। তাদের আবাসভূমি হতে মদীনাস্থিত তাদের ঘর-বাড়ি হতে প্রথম সমাবেশেই এ বহিষ্কার শাম দেশে হয়েছিল। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে খায়বর প্রান্তরে নির্বাসিত করেন। তোমরা কল্পনাও করনি হে মু'মিনগণ! যে, তারা নির্বাসিত হবে। আর তারা কল্পনা করেছিল যে, তাদের রক্ষাকারী হবে তা اَنَّ এর খবর তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ এ শব্দটি তার فَاعِل যার মাধ্যমে খবর পূর্ণত্ব লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা হতে তাঁর শাস্তি হতে। কিন্তু তাদের নিকট পৌঁছল আল্লাহ তাঁর আদেশ ও শাস্তি এমন স্থান হতে, যা তারা কল্পনাও করেনি তাদের অন্তরে ধারণাও জাগেনি, মুসলমানদের পক্ষ হতে।

وَقَذَفَ اَلْقَى فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفَ بِقَتْلِ سَيِّدِهِمْ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ يُخْرِبُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مِنْ اَخْرَبَ بُيُوْتَهُمْ لِيَنْقُلُوْا مَا اسْتَحْسَنُوْهُ مِنْهَا مِنْ خَشَبٍ وَغَيْرِهٖ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ ـ

তা সঞ্চার করল উদ্রেক ঘটাল তাদের অন্তরে ত্রাস ও ভীতি اَلرُّعْبَ শব্দটি عَيْن হরফটিতে সাকিন ও পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। ত্রাস, তাদের দলপতি কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার মধ্য দিয়ে। তারা ধ্বংস করে ফেলল শব্দটি তাশদীদ যোগে تَخْرِيْبٌ হতে এবং তাখফীফের সাথে اَخْرَبَ হতে নিষ্পন্ন হিসাবে পঠিত হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি কাষ্ঠ ইত্যাদির মধ্য হতে তারা যা ভালো মনে করেছে তা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাদের স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হাতে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ : এ مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর حُصُوْنُهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ হলো مَانِعَتُهُمْ আর حُصُوْنُهُمْ -কে مَانِعَتُهُمْ -এর خَبَرٌ আবার اَنَّهُمْ -কে اَنَّهُمْ - مُبْتَدَأ -এর خَبَرٌ ও বলা যেতে পারে। তখন حُصُوْنُهُمْ টি আবার جُمْلَه اَنَّهُمْ-এর فَاعِلْ বলতে হবে। এ দ্বিতীয় তারকীবকে আবূ হাইয়্যান অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে প্রথম তারকীবটাই উত্তম।-(ফাতহুল কাদীর)

قَوْلُهُ الرُّعْبَ : اَلرُّعْبَ শব্দটিকে দু'টি পদ্ধতিতে পাঠ করা হয়ে থাকে- ১. অধিকাংশ কারীগণের মতে عَيْن كَلِمَه -কে সাকিন করে পড়তে হয়। যথা- اَلرُّعْبَ ২. অথবা, ইবনে আমের ও আলী (রা.) -এর মতে, তাকে (عَيْن كَلِمَه) পেশ প্রদান করে, যথা- اَلرُّعُبَ পড়া হয়।

قَوْلُهُ يُخْرِبُوْنَ : يُخْرِبُوْنَ শব্দে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : সাধারণের কেরাত হলো يُخْرِبُوْنَ অর্থাৎ تَخْفِيْف করে, যা اَخْرَبَ হতে উদ্গত। আচ্ছুলামী, হাসান, নসর ইবনে আসেম, আবুল আলীয়া, কাতাদাহ ও আবূ আমর يُخَرِّبُوْنَ অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন, যা تَخْرِيْب হতে উদ্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : উহুদ যুদ্ধের পর আহযাব যুদ্ধ বা খন্দক যুদ্ধের পূর্বে মদীনা হতে বনূ নাযীরকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সাহাবীদের বড় বড় দশজনকে নিয়ে যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.)ও ছিলেন- বনূ নাযীরের মহল্লায় গিয়েছিলেন, দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় আদায়করণের জন্য তাদেরকেও শরিক হওয়ার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে, তাদের সাথে পূর্বের চুক্তির শর্তানুযায়ী। সেখানে তারা নবী করীম ﷺ -কে মন-ভুলানো কথাবার্তায় মশগুল করে রাখল এবং ভিতরে ভিতরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে লেগে গেল। ষড়যন্ত্রটি ছিল এরূপ যে, যে বাড়ির দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে নবী করীম ﷺ আসন গ্রহণ করেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ হতে তাঁর উপর একটি বড় ভারি পাথর ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা করল; কিন্তু সে তার কুকীর্তি শুরু করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে দিলেন ও সমস্ত ব্যাপার তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি সহসা সেখান হতে উঠে পড়লেন ও মদীনায় চলে গেলেন।

মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে বনূ নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের এ ষড়যন্ত্র আর ওয়াদা ভঙ্গের কারণে, যা পূর্বেই তাদের সাথে হয়েছিল। নবী করীম ﷺ অনতিবিলম্বে তাদের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন, তোমাদের বিশ্বাস ভঙ্গমূলক ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি। কাজেই দশ দিনের মধ্যেই তোমরা মদীনা ত্যাগ

করে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে থাক, তাহলে তোমাদের বস্তিতে যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে সংবাদ পাঠাল–দুই হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো এবং বনূ কুরইযা ও বনূ গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে– তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক, নিজেদের স্থান কিছুতেই ত্যাগ করবে না। এ মিথ্যা আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করে তারা নবী করীম ﷺ-এর চূড়ান্ত নির্দেশের জবাবে বলে পাঠাল– আমরা এখান হতে চলে যাব না, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। এরপর চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম ﷺ তাদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত অবরোধ চলার পর [কোনো কোনো বর্ণনা মতে ছয় দিন আর কোনোটির মতে পনেরো দিন] তারা মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলো এ শর্তের ভিত্তিতে যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যা কিছুই তারা নিজেদের উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে যাবে। এভাবেই তাদের অধিকার হতে মদীনার ভূমিকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল। অবশিষ্টরা সিরিয়া ও খাইবারের দিকে চলে গেল। –[যিলাল]

قَوْلُهُ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى ..... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন– জলে-স্থলে, আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীর উপরে এবং অন্তরীক্ষে অবিস্থত আল্লাহর যে সকল সৃষ্টিকুল [মানব-দানব..... সর্বপ্রকার জীব ও নির্জীব] রয়েছে সব কিছুই নিজ ভাষায় তাঁর তাসবীহ এবং অপরিসীম ক্ষমতা আর মহাজ্ঞানের জয়গান গাচ্ছে। আর তাসবীহ পাঠ করছে এবং তিনিই বিজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (الْاٰيَة). আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে না, এমন কোনো কিছুই সৃষ্টিকুলে নেই। কিন্তু [হে মানব!] তোমরা তাদের সে তাসবীহগুলো বুঝতে পার না।

এ আয়াতটির তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা এ খবর দিয়েছেন যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, সম্মান করে ও একত্ববাদের বাণী ঘোষণা করে।

কতিপয় গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে যে, ইহুদি বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্করণ সম্পর্কে পর্যালোচনা আরম্ভ করার প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতটিকে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এ সত্য তথ্যটি মুসলমানদেরকে উপলব্ধি করে দেওয়ার জন্য যে. কাফির বনূ নযীরদের সঙ্গে মুসলমানদের যে ঘটনা ঘটেছিল তা মুসলমানদের ক্ষমতাবলে ও বাহুবলে হয়নি; বরং তা মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতের কীর্তি ও ফলাফল মাত্র।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "প্রজ্ঞাময় আল্লাহই আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের বনূ নাযীর গোত্রীয় কাফেরদেরকে তাদের বাসস্থান (মদীনা ভূমি) হতে শাম বা সিরিয়া দেশের প্রতি প্রথম সমাবেশে বহিষ্কৃত করে দেন।' তাদের দ্বিতীয় সমাবেশে হযরত ওমর ফারূক (রা.) তার খিলাফত আমলে তাদেরকে শাম হতে এবং পূর্ণ আরব উপদ্বীপ হতে খায়বর -এর প্রতি বহিষ্কৃত করে দেন, ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন– হে মু'মিনগণ! ইহুদিদের কাফির সম্প্রদায় তাদের বাসস্থান ত্যাগ করবে বলে তোমাদের সামান্যতম ধারণাও জন্মেনি। আর কাফির সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বসেছিল যে, আল্লাহর গজব ও শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী দুর্ভেদ্য দুর্গই যথেষ্ট। (বলা বাহুল্য) বনূ নাযীরের সুশক্ত কেল্লা, অজেয় দুর্গ ও প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম হেতু বিনা যুদ্ধে এত সহজে নিরস্ত্র, নিরবলম্বন মুসলমানগণ জয় করতে পারবে বলে তোমরা মুসলমানরা ধারণা করতে পারনি; অনুরূপভাবে বনূ নাযীরের ইহুদিগণও ভাবতে পারেনি যে, নিরীহ মুসলমানরা তো দূরের কথা বরং কোনো শক্তিই তাদের দুর্জয় কেল্লা জয় করারও তাদের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস করতে পারবে? এমন দুঃসাহসিক অভিযান, অতর্কিত আক্রমণ এবং শোচনীয় পরাজয় তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু আল্লাহর নির্দিষ্ট হুকুম যখন আসল তখন এমনই হলো, মুসলমানদের হাতেই এমনভাবে তাদের সর্বনাশ ঘটল, তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত তবে তাদেরকে এমনভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হতো না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলমীন তাদের দলপতি কা'ব ইবনে আশরাফ নামক প্রসিদ্ধ ইসলামের শত্রুকে আল্লাহর ইশারায় মুসলমানদের হস্তে অপ্রত্যাশিত হত্যার দ্বারা তাদের অন্তরে বিশেষ ভীতির সঞ্চার ঘটিয়ে দিলেন। এ ভয় উপচিয়ে মুসলমানদের হস্তে তারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। আর লোভ লালশায়, ক্ষোভে উত্তেজনায় তাদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পদ যাতে মুসলমানদের ভাগ্যে না জুটতে পারে তজ্জন্য তারা নিজেরা পোড়ামাটি নীতি অবলম্ব করে দেশত্যাগ করার মুহূর্তে নিজেদের হস্তে ও মুসলমানদের হস্তে নিজেদের ঘরবাড়ি বিনষ্ট ও

বিধ্বংস করে যায়। যা পূর্ব হতেই মুসলমানদের হাতে ধ্বংসের পথে পৌঁছতে থাকে, তা পুনরায় নিজেরাই ধ্বংসের ষোলকলা পরিপূর্ণ করে তোলে। বনূ নাযীর গোত্রীয় কাফেরদের বহিষ্কারের ঘটনা আলোকপাতের পর ঈমানদার মুসলমানদেরকে উপদেশ বাণীর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন– হে মু'মিন মুসলমান জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ! তোমরা উল্লিখিত ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করে নাও।

বনূ নাযীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বনূ নাযীর গোত্রটি ইহুদি জাতিরই একটি অংশ। তারা হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিল। তাদের পূর্ব-পুরুষগণ তাওরাতের আলিম ছিলেন। তাওরাতে শেষনবী ﷺ-এর আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ এমনকি এ কথারও বর্ণনা ছিল যে, তিনি মক্কা শরীফ হতে ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করবেন। এ গোত্র শেষনবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকবে এ প্রত্যাশায় সিরিয়া হতে স্থানান্তরিত হয়ে মদীনায় এসে বসবাস করতে থাকে। তাদের তৎকালীন লোকদের মধ্যে কিছু আলিম ছিলেন। যাঁরা নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর তাঁর নিদর্শনাদি দেখে তাঁকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তাদের কল্পনা ছিল যে, শেষনবী ﷺ হযরত হারুন (আ.) -এর বংশধরদের মধ্য হতে হবে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ইসরাঈল হতে না হয়ে বনী ইসমাঈল থেকে হয়েছে দেখে তারা হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ হিংসাকে কেন্দ্র করে তাদের ঈমান গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারা মনে মনে তাঁকে শেষনবী বলে জানত এবং মানত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের অভাবিত পূর্ণ বিজয়, তাদের এ প্রত্যয়কে আরো জোরদার করে তুলল। পরিশেষে উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় এবং কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। তখন তারা মক্কার কাফিরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেয়।

রাসূলে কারীম ﷺ মদীনা শরীফে উপনীত হয়েই মদীনার আশে-পাশের ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে এমন একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। সন্ধি পত্রে আরো বহুবিধ শর্ত ছিল। চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়েরই একটি হলো বনূ নাযীর। তারা মদীনার দুই মাইল দূরে বসবাস করত। সেখানে তাদের শক্তিশালী দুর্গ এবং বহু যোদ্ধা ছিল। উহুদের যুদ্ধ পর্যন্ত এ সকল গোত্র প্রকাশ্যভাবে কৃত সন্ধির প্রতি আনুগত্য ছিল। পরবর্তীতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাসঘাতকতার প্রারম্ভ এ থেকে যে, ওহুদ যুদ্ধের পর ইহুদির গোত্রপতি কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় গমন করে। তারা মক্কার কাফিরদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চুক্তির প্রাক্কালে কা'ব ইবনে আশরাফ এবং কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান তাদের স্ব-স্ব দল নিয়ে কা'বা ঘরের পর্দা ধরে শপথ করল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একে অন্যের সাহায্য করবে।

উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদন করে কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে আসলে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে তার নিফাক সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এতে হুযূর ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ জারি করেন এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এ বদবখতকে হত্যা করেন।

এর পরবর্তীতে বনু নাযীরের বিভিন্ন বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হতে থাকেন। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ওহী নিয়ে আগমন করেন এবং তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে বিদ্যমান চুক্তির শর্তানুসারে একটি রক্তপণের চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গমন করলে তারা হুযূর ﷺ-কে দেওয়ালের উপর হতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার সিদ্ধান্ত করেছিল।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দশ দিনের সময় দিয়ে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ জারি করেন। তাদের একাংশ খায়বরে এবং অন্যরা সিরিয়া গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে এদেরকে খায়বর ত্যাগে বাধ্য করলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ-এর অর্থ : لِأَوَّلِ-এর لَامْ - أَخْرَجَ ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ লামকে লামে তাওকীত অর্থাৎ সময় বুঝাবার লাম বলা হয়। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عِنْدَ أَوَّلِ الْحَشْرِ অর্থাৎ যারা কুফরি করেছে তাদেরকে প্রথম হাশরের সময় বহিষ্কৃত করেন। حَشْر শব্দের অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনগণকে একত্রি করা। কিংবা বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্রিত করে বের করা। বনূ নাযীরের এ একত্রিতকরণকে কেন প্রথম হাশর বলা হলো? এ প্রশ্নের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (র.) এবং অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, তা ছিল আহলে কিতাবদেরকে প্রথমবারের মতো একত্রিত করণ। অর্থাৎ এ বারই প্রথমবারের মতো তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পূর্বে তারা এ রকম লাঞ্ছনার শিকার আর কখনো হয়নি। কারণ ইতঃপূর্বে তারা ইজ্জত এবং সম্মানের অধিকারী ছিল।

২. মদীনা হতে তাদেরকে বহিষ্কারকরণকে আল্লাহ তা'আলা হাশর আখ্যা দিয়েছেন। একে প্রথম হাশর এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষকে কিয়ামতের দিন শাম রাজ্যের দিকে নিয়ে গিয়ে একত্রিত করা হবে তথায় তাদের হাশর হবে।

৩. এটা ছিল তাদের জন্য প্রথম হাশর। তাদের দ্বিতীয় হাশর হলো খায়বার হতে তাদেরকে হযরত ওমরের সিরিয়ায় নির্বাসিতকরণ।

৪. এ বাক্যের অর্থ হলো তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রথমবারই মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে তাদেরকে নির্বাসিত করল। কারণ, এ বারই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে প্রথম যুদ্ধ করলেন।

৫. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, তা প্রথম হাশর। দ্বিতীয় হাশর হবে এক আগুন মানুষদেরকে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যের দিকে নিয়ে গিয়ে একত্রিত করবে, তারা যেথায় রাত যাপন করবে সেখানে সে আগুন রাত যাপন করবে। তারা যেখানে থাকবে আগুন সেখানেই থাকবে। -[কাবীর]

হাশর মোট কয়বার হয়েছিল : হাশর মোট কয়বার হয়েছিল এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ছা'বী গ্রন্থে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে,

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَشْرَ اَرْبَعٌ (١) فَالْاَوَّلُ اِجْلَاءُ بَنِى النَّضِيْرِ (٢) ثُمَّ بَعْدَهُ اِجْلَاءُ اَهْلِ خَيْبَرَ (٣) ثُمَّ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قَعْرِ عَدْنَانَ تَسُوْقُ النَّاسَ (٤) ثُمَّ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَشْرُ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ .

বনূ নাযীরের জন্য কয়টি হাশর নির্দিষ্ট? : বনি নাযীরের প্রথম হাশর হলো মদীনা হতে বিতাড়িত হওয়া, আর দ্বিতীয় হাশর হলো খাইবার হতে শামের পথে হযরত ওমর (রা.) দ্বারা পরে বিতাড়িত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ হাশর হলো সমগ্র মানবজাতির ময়দানে মাহশারে একত্রিত হওয়া। সুতরাং এ দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তাদের তিনটি হাশর হলে তৃতীয় হাশর হবে কিয়ামত দিবসের হাশর। -[ফাতহুল কাদীর]

হাশরের ময়দান কোথায় হবে? : আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হাশরের ময়দান হবে সিরিয়াতে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সিরিয়ার মাটিতেই সকলকে একত্রিত করবেন। যে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে যেন এ আয়াত পাঠ করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, বনূ নাযীর গোত্র শত শত বছর পূর্ব থেকেই তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোত্রীয় লোক ব্যতীত অন্য কোনো বংশীয় লোক তাদের সাথে বসবাস করতে তারা দিত না। তারা নিজস্ব জনপদকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল। ঘরবাড়িগুলো তাদের গুহার আকারে নির্মিত ছিল। আর উপজাতিদের নীতিমালায় তাদের বসতি ছিল। লোকসংখ্যাও মুসলমানদের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না। মূল মদীনাবাসী বহুসংখ্যক লোক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল। এ সব কারণে তারা সশস্ত্র মোকাবিলা না করেই কেবলমাত্র আবরোধের চাপেই দিশেহারা হয়ে বস্তুভিটা পরিত্যাগ করে আবাহমান কালের জন্য চলে যেত হবে, এমন আশা মুসলমানরাও করেন নি। অপর পক্ষে ইহুদিগণও ধারণা করেছিল যে, যত বড় শক্তিই আসুক না কেন, কিছুই তাদেরকে টলাতে কখনও ক্ষমতাবান হবে না। যদিও তাদের গৌরব ও স্পর্ধার সর্বদিক ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তথাপিও স্বল্প আক্রমণে ও স্বল্প দিনে তাদেরকে কিছুই করতে পারবে না। আর তাদের সুরক্ষিত কিল্লাগুলো অতি সহজে বিজয় করার ধারণা আসাও সাধারণ বিবেকের বহির্ভূত। তথাপিও আল্লাহ তাদেরকে (ইহুদি বনূ নাযীরকে) মতান্তরে মাত্র ৬ দিন, অথবা ১৫ দিন, অথবা ২১ দিন, অথবা ১০ দিনের অবরুদ্ধে মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ : অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায় (ইহুদি বনূ নাযীর) তাদের সু-কঠিন দুর্গের উপর এত আস্থাবান ছিল যে, তাদের দুর্গই তাদেরকে আল্লাহর সর্বপ্রকার শাস্তি হতে মুক্ত রাখবে। অথবা, গায়েব হতে কোনো শক্তিই তাদের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

উক্ত আয়াতের মর্মবাণীর উপর একটি প্রশ্ন জাগতে পারে।

প্রশ্নটি হলো, ইহুদি জাতি নিশ্চিত জানত যে, তাদের এ যুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর সাথেই, তথাপিও তারা এ কথা কিভাবে বুঝতে সক্ষম হলো যে, তারা আল্লাহর সর্ব প্রকার কঠিন শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ইহুদি জাতি বিশ্ব জগতে বেশ চিহ্নিত বর্বর ও অসভ্য জাতি হিসেবে পরিগণিত। কেননা তারা অতীতকাল হতেই বহু নবী ও রাসূল এবং বুজুর্গকে নির্দোষে হত্যা করেছিল। এমনকি তারা উক্ত কার্যে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত উক্ত হত্যাকাণ্ডের উপর পরিতাপ বাণীও বর্ণনা করেনি। এর যুক্তি স্বরূপ 'দি হলি স্ক্রিপার জুইস পাবলিকেশন্স সোসাইটি অব আমেরিকা ১৯৫৪ সালে জন্ম বৃত্তান্ত অধ্যায় ২৫-২১ 'স্তোত্র' নামক গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই-

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকূব (আ.) একদা আল্লাহর সাথে পূর্ণ একটি রাত্র মল্লযুদ্ধ করে পরাজিত হননি। অতঃপর সকালবেলা আল্লাহ তা'আলা বললেন- এখন আমাকে যেতে দাও। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, আমি তোমাকে যেতে দিব না। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রশ্ন করলেন তোমার নাম কি? উত্তরে বললেন, ইয়াকূব। অতঃপর আল্লাহ বললেন, ভবিষ্যৎকালে তোমার নাম ইয়াকূব-এর পরিবর্তে ইসরাঈল হবে।

এ ঘটনা হয় হতে প্রতীয়মান যে, যাদের পূর্ব পুরুষ আল্লাহ সম্বন্ধে জেনে বুঝে বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, তাঁর বংশধররাও তো অনুরূপ করা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং তারা আল্লাহর বিরোধী হয়েও আল্লাহ কর্তৃক সুকঠিন শাস্তিসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়ার সাধনায় বসে থাকা স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ فَاَتَاهُمْ .... لَمْ يَحْتَسِبُوْا : এ বাক্যের দু'টি অর্থ করা হয়েছে-

১. আল্লাহর নির্দেশ তাদের উপর এমন দিক হতে আসল যেদিক হতে আসতে পারে বলে তারা কল্পনাও করে নি। আর তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে বহিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এ রকম কিছু তারা কখনো কল্পনা ও ধারণা করেনি। আর কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো, তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা। কারণ তার হত্যা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল।

২. বলা হয়েছে اَتَاهُمْ এবং لَمْ يَحْتَسِبُوْا শব্দদ্বয়ের ضَمِيْر -এর মারজা হলো মু'মিনগণ, অর্থাৎ মু'মিনদের উপর আল্লাহর সাহায্য আসল এমন দিক হতে যেদিক হতে সাহায্য আসতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করেনি।

আমাদের মতে প্রথম অর্থটাই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ এ বাক্যের আলোকে। কারণ বনূ নাযীরের অন্তরেই ভীতির সঞ্চার করা হয়েছিল- মু'মিনদের অন্তরে নয়।

৩. এ বাক্যের তৃতীয় আরও একটি অর্থ হতে পারে আর তা হলো এই যে, বনূ নযীর বাইরের দিক হতে কোনো সেনাবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করবে এ রকম ধারণা করত; কিন্তু তাদের উপর এমন দিক হতে আক্রমণ আসল যেদিক হতে আক্রমণ আসার কল্পনাও তারা করতে পারেনি। সেদিকটি হলো অন্তর ও মনের দিক। অর্থাৎ ভিতর হতে তাদের সাহস, হিম্মত ও প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিলেন, যার ফলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গ কাজে আসল না। -[যিলাল]

قَوْلُهُ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ : এ বাক্যের অর্থ হলো, 'তাদের উপর আল্লাহ আসল'। এ বাহ্যিক অর্থ জমহুরের মতে এখানে সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং আরশের উপর আছেন, সেখান হতে এসে তিনি তাদের উপর আক্রমণ করেছেন এ অর্থ হতে পারে না। সুতরাং এ বাক্যটির অর্থ করা হয়েছে اَىْ اَتَاهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ আসল, অথবা اَتَاهُمْ بَأْسُ اللّٰهِ وَعَذَابُهُ অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর মার এবং আজাব আসল। -[সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُخْرِبُوْنَ ...... الْمُؤْمِنِيْنَ (الاية) : অর্থাৎ "তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের ঘরবাড়ি তাদের স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হাতে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

অর্থাৎ দুই দিক হতে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। বাইরের দিক হতে মুসলমানরা অবরোধ করে তাদের দুর্গসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগলেন। আর ভিতর হতে তারা নিজেরাই প্রথমে মুসলমানদের পথরোধ করার জন্য নানাস্থানে পাথর ও গাছ দ্বারা প্রতিবন্ধক দাঁড় করলো। এ কাজের জন্য তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ করে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি করল। পরে তারা যখন নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, তাদেরকে এখান হতে বহিষ্কৃত হতেই হবে তখন তাদের বড় সাধের ও বড় আশায় নির্মিত ঘরবাড়ি তারা নিজেদের হাতেই ধ্বংস করতে আরম্ভ করল, যেন সেগুলো মুসলমানদের কোনো কাজে না লাগে। অতঃপর তারা নবী

করীম ﷺ -এর সাথে এই মর্মে সন্ধি করল যে, আমাদেরকে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হোক এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যা কিছু আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারি তা নিয়ে যাবায় অনুমতি প্রদান করা হোক। এ চুক্তি অনুযায়ী তারা চলে যাবার কালে তাদের ঘরবাড়ির দরসা জানালা ও খুটিগুলো পর্যন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে তো তাদের ঘরের ছাদের কাষ্ঠগুলো উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুসলমানগণ যখন ইহুদিদের বাড়ি ঘর দখল করতেন তখন তা ভেঙ্গে দিতেন যাতে করে যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়; আর ইহুদিরা একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করত এবং মুসলমানদের উপর পাথর বর্ষণ করত। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِي الْاَبْصَارِ : আল্লাহ তা'আলা এখানে আহলে কিতাব বনূ নাযীদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কৃত করার ঘটনার বর্ণনা দানের পর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, হে দৃষ্টিমান [মু'মিন] ব্যক্তিরা [এ ঘটনা হতে তোমরা] শিক্ষা গ্রহণ করো।

এ ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণের অনেকগুলো দিক রয়েছে।

১. এ ইহুদিরা আল্লাহকে স্বীকার করত, আল্লাহর কিতাব, নবী-রাসূল ও পরকালকে তারা মানত; এ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, তারা সেকালের মুসলমান ছিল; কিন্তু তারাই যখন দীন-ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিছক লালসা পরিপূরণ এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে সত্যে স্পষ্ট বিরোধিতা করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো দায়িত্বই বোধ করল না, তখন এরই ফলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের দিক হতে ফিরে গেল, নতুবা তাদের সাথে আল্লাহর যে কোনোরূপ শত্রুতা নেই– থাকতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। এদিক দিয়ে এ ইহুদিদের পরিণতি হতে স্বয়ং মুসলমানদেরকেই উপদেশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। তারাও যেন নিজেদেরকে ইহুদিদের ন্যায় আল্লাহর আদরের বান্দা মনে করে না বসে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে শামিল হয়ে থাকলে স্বতঃই তাদের জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ-সাহায্য বর্ষিত হতে থাকবে এরূপ অমূলক ধারণা যেন তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে না বসে। দীন ও নৈতিক চরিত্রের দায়িত্ব পালন করা তাদের জন্য জরুরি নয়–এমন অহমিকতা যেন তাদের মন-মগজকে কলুষিত করতে না পারে।

২. যেসব লোক জেনে বুঝে দীনের বিরোধিতা করে তাদের ধন-দৌলত, শক্তি সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণই তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা করবে– যারা মনে মনে এ আস্থা পোষণ করে, দুনিয়ার এসব লোককে জরুরি শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য।

৩. বনূ নাযীর তাদের সহায়-সম্পত্তি ও দৃঢ় দুর্গের উপর পুরোপুরী আস্থাশীল ছিল, তারা তাদের জনবলের উপরও নির্ভর করেছিল। এ সবের উপর নির্ভর করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তারা আল্লাহর উপর আস্থা রাখেনি। যার ফলে তাদের এ দুরাবস্থা। অতএব মুসলমানগণ যেন পুরোপুরি আল্লাহর উপর আস্থাশীল থাকে এ শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

৪. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ ইহুদিরা কুফরি, নবুয়ত অস্বীকার, ধোঁকাবাজিকরণের ফলে এ বিপদে পড়েছে এবং মদীনা হতে নির্বাসিত হয়েছে। সুতরাং মুসলমানরাও যেন মনে রাখে যে, নবুয়তের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ, ইসলামের প্রতি অমনোযোগিতা ও ধাঁকাবাজি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। –[কাবীর]

এ আয়াত কিয়াস হুজ্জত হওয়ার প্রমাণ : ওলামায়ে কেরাম فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِي الْاَبْصَارِ দ্বারা কিয়াস হুজ্জত হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কেননা কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া অথবা কোনো বস্তুকে অন্যের সাথে তুলনা করাকে اِعْتِبَارٌ বলা হয়। যেন বলা হয়েছে যে, "قِيْسُوْا الشَّئَ عَلٰى نَظِيْرِهٖ" 'হে জ্ঞানীগণ, তোমরা বস্তুকে সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে তুলনা করো, কিয়াস করো।' এ কিয়াস (পূর্বেকার উম্মতের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সে) শাস্তির উপর (বর্তমান) শাস্তির কিয়াসও হতে পারে অথবা শরিয়তের মূল বিষয়ের উপর শাখার (فُرُوْعٌ) কিয়াসও হতে পারে। মোদ্দাকথা, উক্ত আয়াত দ্বারা উসূলবিদগণ কিয়াসের উপর মযবুত দলিল পেশ করেছেন। –[নূরুল আনওয়ার]

অনুবাদ :

٣. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ قَضٰى عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ الْخُرُوجَ مِنَ الْوَطَنِ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ط بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ كَمَا فُعِلَ بِقُرَيْظَةَ مِنَ الْيَهُوْدِ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ .

৩. আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে অবধারিত না করতেন সিদ্ধান্ত না করতেন নির্বাসিত হওয়া স্বদেশ হতে বিতাড়িত হওয়া তবে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি প্রদান করতেন হত্যা ও বন্দী হওয়ার মাধ্যমে, যেমন বনূ কুরায়যা গোত্রীয় ইহুদিদের বেলায় তাই করা হয়েছিল। আর তাদের জন্য আখেরাতে দোজখের শাস্তি রয়েছে

٤. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا خَالَفُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ج وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهُ

৪. এটা এ জন্য যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী তাকে।

٥. مَا قَطَعْتُمْ يَا مُسْلِمِيْنَ مِّنْ لِّيْنَةٍ نَخْلَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ اَىْ خَيَّرَكُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَلِيُخْزِىَ بِالْاِذْنِ فِى الْقَطْعِ الْفٰسِقِيْنَ الْيَهُوْدَ فِىْ اِعْتِرَاضِهِمْ بِاَنَّ قَطْعَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ فَسَادٌ .

৫. তোমরা যে কর্তন করেছ হে মুসলমানগণ! খেজুর বৃক্ষগুলি খেজুর বৃক্ষ। কিংবা সেগুলোকে কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছ, তাও আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আল্লাহ তোমাদেরকে এ বিষয়ে ইচ্ছাধিকার দান করেছেন। আর লাঞ্ছিত করার জন্য কর্তনের অনুমতি দান পূর্বক পাপাচারীদেরকে ইহুদিদেরকে। তাদের এ সমালোচনার জবাবে যে ফলন্ত বৃক্ষ কর্তন করা পাপ।

٦. وَمَا اَفَاءَ رَدَّ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ اَسْرَعْتُمْ يَا مُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ مِنْ زَائِدَةٌ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ اِبِلٍ اَىْ لَمْ تُقَاسُوْا فِيْهِ مَشَقَّةً وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيْهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِى الْاٰيَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْاَصْنَافِ الْاَرْبَعَةِ عَلٰى مَا كَانَ يُقَسِّمُهُ مِنْ اَنَّ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ وَلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِىْ يَفْعَلُ فِيْهِ مَا يَشَاءُ فَاَعْطٰى مِنْهُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَثَلَاثَةً مِنَ الْاَنْصَارِ لِفَقْرِهِمْ .

৬. আর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের নিকট হতে যে 'ফাই' দিয়েছেন প্রত্যর্পণ করেছেন তার জন্য তোমরা দৌড়াওনি হাঁকাওনি, হে মুসলমানগণ অশ্ব কিংবা সওয়ারি উষ্ট্র مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ তোমরা এ ব্যাপারে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করনি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান সুতরাং তাতে তোমাদের কোনো অধিকার নেই; বরং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট, যাদের আলোচনা অন্য আয়াতে আসছে। অর্থাৎ চার শ্রেণির লোক, যাদের প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে তিনি এক-পঞ্চমাংশের মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বিতরণ করতেন। অবশিষ্ট তাঁরই জন্য থেকে যেত। তা দ্বারা তিনি যা ইচ্ছা করতেন। যেমন, তার একাংশ মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হতে তিনজনকে তাদের দারিদ্র্যের কারণে প্রদান করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا قَطَعْتُمْ : مَا-এর مَا قَطَعْتُمْ - مَحَلْ نَصَبْ এ অবস্থিত হয়েছে قَطَعْتُمْ ক্রিয়া مَفْعُوْل হওয়ার কারণে, যেন বলা হয়েছে اَىُّ شَئٍ قَطَعْتُمْ –[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَوْمًا عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন, আ'মাশ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَوْمًا عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন। অর্থাৎ তোমরা কর্তন করনি। কেউ কেউ قَوْمَاءُ عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন। আবার কেউ কেউ قَائِمًا عَلٰى اَصْلِهِ পড়েছেন। অর্থাৎ ضَمِيْر-কে مُذَكَّرْ করে পড়েছেন, তখন সে ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো لَفْظُ مَا আর পূর্বের কেরাতসমূহে ضَمِيْر ব্যবহারকরণ যথার্থ হয়েছে।–(কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّشَاقِ اللّٰهَ : হযরত তালহা ইবনে মুছাররেফ ও মুহাম্মদ ইবনে ছামছিকা وَمَنْ يُّشَاقِقْ অর্থাৎ আরো একটা ق অতিরিক্ত করে পড়েছেন। তবে বাকি ক্বারীগণ একটি ق -কে অন্য ق -এর মধ্যে اِدْغَامْ করে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا قَطَعْتُمْ (الاية) আয়াতের শানে নুযূল : বনূ নাযীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বনূ নাযীরকে তাদের নিজ বাড়িতেই অবরোধ করে রাখলেন এবং তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। তখন তারা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমিতো নিজেকে নবী বলে দাবি করা, ফিতনা ফ্যাসাদ অপছন্দ কর এবং তা বলে বেড়াও। এখন তুমি গাছ কাটতে ও জ্বালিয়ে দিতে কিভাবে নির্দেশ দিলে? তখন আল্লাহ তা'আলা مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ.... আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে বলে দিলেন যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছিল। –[কাবীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ .... فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে অবধারিত না করতেন নির্বাসিত হওয়া তবে তাদেকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি প্রদান করতেন। আর তাদের জন্য আখেরাতে দোজখের শাস্তি রয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বহিষ্কারকরণকে অবধারিত না করলে যা সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে, তাহলে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো। সন্ধি করে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করার পরিবর্তে তারা যদি লড়াই করত, তাহলে তারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাদের পুরুষরা নিহত হতো, তাদের স্ত্রীলোক এবং শিশু-সন্তানদেরকে ক্রীতদাস বানানো হতো। যেমন–ইতঃপূর্বে বানূ কুরায়যার সাথে করা হয়েছে। –[সাফওয়া] আর আখেরাতে জাহান্নামের আজাব তো রয়েছেই। তারা তাদের বাড়িঘর হতে সন্ধি করে নির্বাসিত হয়ে দুনিয়াতে প্রাণে বেঁচে গেলেও আখেরাতে দোজখের শাস্তি হতে কোনো ভাবেই রক্ষা পাবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর আজাবের যোগ্য হয়েছে; সুতরাং তা তাদেরকে যে কোনোভাবে অবশ্যই পেতে হবে। –[রুহুল মা'আনী, যিলাল]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا .... شَدِيْدُ الْعِقَابِ : তাদেরকে দুনিয়াতে বাড়িঘর হতে বহিষ্কৃতকরণ আর তাদের জন্য আখিরাতে দোজখের শাস্তি নির্ধারিতকরণ এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রবল বিরোধিতা করেছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

আহলে কিতাবগণের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে পরিণামে যে আজাব ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ঠিক তেমনি যেসব লোক সর্বযুগে সর্বস্থানে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদরেকেও তেমনি পরিণাম ভোগ করতে হবে। –[যিলাল]

اِخْرَاجْ এবং جَلَاءْ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য : جَلَاءْ এবং اِخْرَاجْ শব্দ দু'টির অর্থ বহিষ্কার-উচ্ছেদ হলেও উভয়ের মধ্যে দু' ধরনের বৈশিষ্ট বিদ্যমান। ১. جَلَاءْ হলো আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে বহিষ্কৃত হওয়া, আর اِخْرَاجْ কখনো আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে নির্বাসিত হওয়াকে বলা হয়। ২. جَلَاءْ গোটা একটা সম্প্রদায়, দল বা জামাতের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর اِخْرَاجْ গোটা দলের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি এক ব্যক্তির বহিষ্কারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন গাছগুলো কাটতে ও জ্বালিয়ে দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন? : এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, বনূ নাযীর গোত্রের বসতির চতুষ্পার্শ্বে খেজুর বাগান ছিল, সে বাগানের কিছু গাছ অবরোধ নিষ্কণ্টক ও সার্থক করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেটে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন- قَطَعُوْا مِنْهَا مَا كَانَ مَوْضَعُهَا لِلْقِتَالِ মুসলমানরা বনূ নাযীরের কেবল সে গাছপালাই কেটেছেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। -[কাবীর, তাফসীরে নীশাপুরী]

কয়টি গাছ কাটা হয়েছিল? : হযরত কাতাদাহ এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম বনূ নাযীরের কেবল একটি গাছ কেটেছিলেন এবং সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুসলমানরা কেবল একটি গাছ কেটেছিলেন এবং ঐ গাছটিকেই কেবল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। -[কুরতুবী]

বর্তমানেও শত্রুদের গাছপালা বাড়ি-ঘর ধ্বংসের বিধান : বর্তমানেও ধর্মযুদ্ধ চলাকালে কাফের মুশরিকদের ঘর-বাড়ি অথবা, খেত-খামার ধ্বংস করার বৈধতা প্রসঙ্গে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদের ঘর-দরজা, খেত-খামার, ঘর-বাড়ি ও গাছ-পালা ইত্যাদি সব কিছুই প্রয়োজনে ধ্বংস করা ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিধন করা বৈধ। তাঁর দলিল উক্ত আয়াত এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ জুমহুরে মুহাদ্দেসীন-এর অভিমতও এটাই।

আল্লামা শাইখ ইবনুল হুমাম (র.) বলেন- যদি কাফেরদেরকে পরাজয় বরণ করানোর জন্য হত্যাকাণ্ড, গাছপালা ও সম্পদ পোড়ানো এবং ঘর-বাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ জায়েজ হবে, অন্যথায় তা মাকরূহ হবে। لِاَنَّهٗ فَسَادٌ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّ الْحَاجَةِ وَمَا اُبِيْحَ اِلَّا لِحَاجَةٍ (মেরকাত ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৫৬, আশয়াতুল লুময়াত ৩য় খণ্ড ৪০৯ পৃ.) কারো মতে মদীনার খেজুর বৃক্ষ ১২০ প্রকারের ছিল। (تَنْظِيْم ج/٣) তবে যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকলে শত্রুপক্ষের অপদস্থের জন্য যে কোনো ব্যবস্থা জায়েজ হবে।

قَوْلُهٗ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য ও অর্থ এই-আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে কাফির বনূ নাযীর গোত্রীয় লোকদের সহায়-সম্পদ ও গাছপালা কেটে পুড়িয়ে নিধন করার অনুমতি এ জন্য প্রদান করেছেন, যেন কাফিরদের গাত্রদাহ হয়। এখানে ফাসিক বলতে ইহুদিগণকে বুঝানো হয়েছে। ইহুদিগণেরই চোখের সম্মুখে তাদের সাধের বাগ-বাগিচাসমূহ নষ্ট হচ্ছে। অথচ তারা কিছুই করতে পারছে না, দেখে তারা অন্তরে অত্যন্ত ক্ষোভ ও অপমান বোধ করবে। আর যা অকর্তিত অবস্থায় অবশিষ্ট থেকে যাবে তা ভবিষ্যতে মুসলমানদের ভোগে আসাব ভেবে তারা মনের জ্বালায় পুড়ে মরতে থাকবে। কাফেরদের উপর মুসলমানদের এহেন আচরণকে আল্লাহ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ বলে বর্ণনা করেছেন।

আর মুসলমানগণের কেউ কেউ গাছ না কাটার পক্ষে ছিলেন, কারণ তারা ভাবনা করলেন যে, উক্ত বৃক্ষগুলো পরবর্তীতে মুসলমান গণই ভোগ করবে, সুতরাং কেটে নষ্ট করার যুক্তি নেই। তবে বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর ও ইয়াযীদ ইবনে রূমান এর বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, যারা বৃক্ষরাজি কেটেছেন, তারা সত্যই নবী করীম ﷺ-এর মতে ও নির্দেশেই কেটেছেন। অপর দিকে প্রথমেই কিছুসংখ্যক সাহাবী মহানবী ﷺ-এর নির্দেশের আওয়াজ কর্ণগোচর না হওয়ায় বৃক্ষ কর্তনের কার্য বৈধ ও অবৈধতার লক্ষ্যে মতান্তর হয়ে গেল। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা আয়াত مَا قَطَعْتُمْ নাজিল করে কর্তন কার্য বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন। -[ইবনে জারীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটিও এ মত প্রকাশ করেছে এবং তাতে আরও বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এ মর্মে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ বৃক্ষ কেটেছে, আর কেউ বিরত রয়েছে, এখন কাদের কার্য যথার্থ হয়েছে, তাই রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করলেন। -[নাসায়ী]

ফকীহগণের মধ্যে যারা প্রথমোক্ত বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, তা নবী করীম ﷺ-এর ইজতিহাদ ছিল। উত্তরকালে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করে তাঁর প্রতি সমর্থন করলেন। [ইংরেজিতে তাকে Ratification বলা হয়] এতে বুঝা যায়, যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ছিল না, সে সকল ক্ষেত্রে নবী ﷺ ইজতিহাদ করতেন।

যে সকল ফকীহ দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা উক্ত দ্বিতীয় বর্ণনার আলোকে যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, মুসলমানদের দুই দল দু'টি পন্থায় অগ্রসর হয়েছেন। তবে তা নিজ ইজতেহাদের ভিত্তিতেই করেছেন। আল্লাহ পরবর্তীতে সকলকেই সমর্থন করে আয়াত নাজিল করেছেন।

لِيْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে لِيْنَةٌ দ্বারা কোন প্রকার খেজুর গাছ উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তত্ত্ব জ্ঞানীর মতে সর্বপ্রকার খেজুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয়, তবে তাতে আজওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কথা বলেছেন, ইকরামা এবং কাতাদাহ (র.)। ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মত পোষণ করেছেন।
২. ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, আজওয়া এবং বরনিয়া নামক খেজুর ব্যতীত অন্যান্য সকল খেজুর বৃক্ষকে لِيْنَةٌ বলা হয়।
৩. হযরত মুজাহেদ (র.) এবং আতীয়া (র.) বলেছেন, সকল খেজুর বৃক্ষকেই লীনাহ বলা হয়।
৪. হযরত সুফিয়ান (র.) বলেছেন, সর্বপ্রকার উত্তম খেজুরের বৃক্ষকেই লীনাহ বলা হয়।
৫. হযরত মোকাতেল (র.) বলেছেন, এক প্রকার বিশেষ খেজুরের বৃক্ষকে لِيْنَةٌ বলা হয়। এ খেজুরগুলোর বর্ণ হলুদ হয়; আর তা এত পরিচ্ছন্ন হয় যে, বাইরে থেকেও ভেতরের দানা পর্যন্ত দেখা যায়। আরবরা এ ধরনের খেজুরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। –[নূরুল কোরআন]

এ আয়াত হতে প্রাপ্ত শরিয়তের বিধান :

১. রাসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ। এ আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ানো ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়া উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছানুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কুরআনের কোনো আয়াতে এ দু' কাজের মধ্য থেকে কোনো কাজের আদেশ উল্লেখ নেই, সাহাবায়ে কেরাম যা করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এ আদেশ পালন করা কুরআনের আদেশ পালন করার মতো ফরজ।
–[মা'আরেফুল কোরআন]
২. যেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ থাকত না, তাতে নবী করীম ﷺ ইজতিহাদ করতেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদের ভিত্তিতেই বৃক্ষ কর্তন করতে ও পোড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরকালে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করে তার সমর্থন করলেন।
৩. হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.)-এর বর্ণনা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তে এ কাজ করেছিলেন অর্থাৎ গাছ কেটেছিলেন। এ কাজ করা উচিত কিনা পরে তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কতিপয় সাহাবী তাকে বৈধ বলেছেন, কতিপয় নিষেধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে উভয় মতের লোকদের কাজকে যথার্থ বলে ঘোষণা করলেন।

এ বর্ণনা হতে একদল ফকীহ ইস্তেম্বাত করে বলেছেন, বিশেষজ্ঞগণ সমুদ্দেশ্যে ইজতেহাদ করে যদি ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রহণ করেন, তাহলে তাদের মত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সবই বরহক সত্য হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনোটিকে গুনাহ বলা যাবে না। –[মা'আরেফুল কুরআন, কুরতুবী]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বনূ নাযীর গোত্রের প্রাণ ও আত্মসম্মানের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা ছিল। উক্ত আয়াতে তাদের সম্পদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, বনূ নাযীর যখন ঘর-বাড়ি ছেড়ে মদীন মুনাওয়ারার উপকণ্ঠ হতে চলে যায়, তখন যেভাবে খায়বারের মালে গনিমত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার কথা কোনো কোনো সাহাবী চিন্তা করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের সে ধ্যান-ধারণা দূর করে দেন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ : اَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ– প্রত্যার্পণ করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, "তাদের হতে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ করেছেন।" এটা হতে বুঝা যায় যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং এ ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে তাঁরই ইচ্ছা ও বিধান অনুযায়ী ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ ব্যবহার কেবল আল্লাহর মু'মিন বান্দারাই সঠিকভাবে করতে পারে, অন্যরা পারে না। এ কারণেই যেসব ধন-সম্পদ কাফেরদের হাত হতে মুক্ত হয়ে মু'মিনদের দখলে আসবে তার প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদা এই যে, সেগুলোর প্রকৃত মালিকই সেগুলোর আত্মসাৎকারীদের হাত হতে মুক্ত করে স্বীয় অনুগত বান্দাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাকে اَفَاءَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَيْءٌ [ফাই]-এর সংজ্ঞা : কাফেরদের হাত হতে যেসব ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যুদ্ধবিহীন মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই হলো 'ফাই' তার বিপরীত রয়েছে গনিমত।

غَنِيْمَةٌ-এর সংজ্ঞা : কাফেরদের হাত হতে যেসব ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের হাতে যুদ্ধের বিনিময়ে চলে আসে তাকে গনিমত বলা হয়। এ উভয় প্রকার ধন-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয়েছে فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ "তোমরা তার জন্য ঘোড়া ও উষ্ট্র কর্মে নিয়োজিত করনি।" ঘোড়া ও উষ্ট্র কর্মে নিয়োজিত করার অর্থ যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রম। সুতরাং এ ধন-সম্পদ গনিমতের মাল নয়, তা ফাইয়ের মাল। গনিমত সম্বন্ধে সূরা আনফালে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে مَآ اَفَاءَ। مِنْهُمْ-এর مَرْجِعٌ হলো اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ 'আহলে কিতাবের কাফিরগণ অর্থাৎ বনূ নাযীর। فَا-এর مُبْتَدَأٌ টা مُبْتَدَأٌ ; এ مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ উহ্য রাখা হয়েছে। যার تَقْرِيْرٌ হবে (فَلَا شَيْءَ مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهِ)

অর্থাৎ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন বনূ নাযীর হতে, তাতে তোমাদের কোনো হক নেই, এরপর তাদের হক না থাকার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'কারণ সে মালগুলো এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়িয়েছ।'

গনিমত ও ফাই -এর মধ্যে পার্থক্য :

اَلْفَيْءُ-এর পরিচিতি : কাফেরগণের মাল-সম্পদ যদি যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত অর্জিত হয়, তখন তাকে 'ফাই' বলা হয়। [তাফসীরে সাবী, হিদায়া] যথা– বনূ নাযীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

اَلْغَنِيْمَةُ-এর পরিচিতি : আর শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা সংঘর্ষের মাধ্যমে শত্রুদেরকে ধাওয়া করার পর তাদের হতে যে সম্পদ পাওয়া যায়, তাকে গনিমত বলা হয়। ইমাম আবূ ওবাইদ বলেন–

مَا يُنَلْ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيْمَةُ – وَمَا يُنَلْ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَيَصِيْرُ الدَّارُ دَارُ الْاِسْلَامِ فَهُوَ فَيْءٌ يَكُوْنُ النَّاسُ عَامًا وَلَا خُمُسَ فِيْهِ .

মূল কথা, গনিমতের মাল হিসেবে পরিগণিত হতে হলে কাফের ও মুসলমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ফাই-এর মালের জন্য যুদ্ধ শর্ত নয়।

* শরিয়ত বিশারদ অথবা ফকীহগণের মতে–

গণিমত সে অস্থাবর সম্পত্তি যা সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা কালে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্ত হতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া শত্রুদের ভূমি, ঘর-বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সবগুলো 'ফাই' বলে গণ্য হবে।

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ-এর মধ্যে هُمْ ضَمِيْر-এর প্রত্যাবর্তন স্থল কি? : উক্ত আয়াতে বর্ণিত هُمْ ضَمِيْر-এর مَرْجِعٌ ইহুদি বনূ নাযীর -এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ উক্ত ضَمِيْر-এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় ইহুদি বনূ নাযীর -এর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার আলোচনা রয়েছে। আর তাদের থেকেই 'ফাই' অর্জন করার ঘোষণা রয়েছে এবং আলোচনা তাদেরকে নিয়েই চলেছে। সুতরাং هُمْ ضَمِيْر-এর ইঙ্গিত তারাই। –(তাফসীরে কাবীর)

فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ-এর মধ্যে "ه" ضَمِيْر এর مَرْجِعٌ কি? : উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ عَلَيْهِ-এর ("ه" ضَمِيْر) মুসলমান ও কাফির বনূ নাযীর গোত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সে সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিতবহ। আর মুসলমানগণ কর্তৃক লব্ধ সম্পত্তিকেই বুঝানো এখানে মূল উদ্দেশ্য। কারণ, কিছু সংখ্যক লোক সে লব্ধ সম্পত্তি নিয়েই সমালোচনা করছিল। তখনই আল্লাহ (ضَمِيْر "ه") দ্বারা তার প্রতি ইশারা করে উক্ত বিষয় সম্পর্কে বলে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ .... مَنْ يَّشَاءُ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" অর্থাৎ এ মালগুলো 'ফাই' হলেও আল্লাহ এগুলোকে স্বীয় রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। কারণ সে মালগুলো তোমাদের যুদ্ধের বিনিময়ে প্রাপ্ত নয়; বরং শত্রুদের অন্তরে ভয় প্রবিষ্ট করিয়ে অর্জন করা হয়েছে। এটা অর্জনের জন্য লোকদেরকে সফর করতে হয়নি। ঘোড়াও উট দৌড়াতে হয়নি। লোকেরা বনূ নাযীরের অবরোধে যতটুকু উদ্যোগ আয়োজন করেছে তা অতি নগণ্য, আল্লাহ তাদের অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন তার সাথে তুলনা করা যায় না। এ কারণেই 'ফাই' নির্দিষ্ট হয়েছে রাসূলের জন্য।

অনুবাদ :

৭. مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى كَالصَّفْرَاءِ وَ وَادِى الْقُرٰى وَيَنْبُعَ فَلِلّٰهِ يَاْمُرُ فِيْهِ بِمَا يَشَاءُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِىْ صَاحِبِ الْقُرْبٰى قَرَابَةِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَالْيَتٰمٰى اَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ هَلَكَتْ اٰبَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ وَالْمَسٰكِيْنِ ذَوِى الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَىْ يَسْتَحِقُّهُ النَّبِىُّ وَالْاَرْبَعَةُ عَلٰى مَا كَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ اَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْاَرْبَعَةِ خُمُسَ الْخُمُسِ وَلَهُ الْبَاقِىْ كَىْ لَا كَىْ بِمَعْنَى اللَّامِ وَاَنْ مُقَدَّرَةٌ بَعْدَهَا يَكُوْنَ الْفَىْءُ عِلَّةُ الْقِسْمَةِ كَذٰلِكَ دُوْلَةً مُتَدَاوَلًا بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط وَمَآ اٰتٰكُمْ اَعْطَاكُمُ الرَّسُوْلُ مِنَ الْفَىْءِ وَغَيْرِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

৭. আল্লাহ তা'আলা এ জনপদবাসীগণ হতে তাঁর রাসূলকে যা দান করেছেন যেমন– সাফরা, ওয়াদীউল কোরা ও ইয়ানবু' নামক জনপদবাসীগণ হতে। তবে তা আল্লাহর জন্য তৎসম্পর্কে তিনি যা ইচ্ছা আদেশ করেন। এবং রাসূল ও রাসূলের স্বজনগণের জন্য বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রীয় রাসূলের স্বজনগণের জন্য আর অনাথদের জন্য মুসলমানদের সে সকল সন্তান যাদের পিতা মারা গেছে এবং তারা দরিদ্র মিসকিনদের জন্য মুসলমানদের মধ্য হতে অভাবীগণের জন্য। এবং পথিকগণের জন্য যে মুসলমান মুসাফির তার সঙ্গীগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উক্ত চার শ্রেণির লোক 'ফাই' -এর হকদার হবে। যাদের প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে তিনি তার পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ বিতরণ করতেন। আর অবশিষ্ট তাঁর জন্য রাখতেন। যেন كَىْ শব্দটি لَامْ অর্থে ব্যবহৃত এবং তারপর اَنْ উহ্য রয়েছে। না-হয় উক্ত 'ফাই' এরূপে বণ্টনের কারণ। আয়ত্তাধীন তোমাদের মধ্যকার ধনশালীগণের মধ্যে। আর যা তোমাদেরকে দান করেন বখশিশ করেন রাসূল 'ফাই' ইত্যাদি হতে তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।

৮. لِلْفُقَرَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَعْجَبُوْا الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ فِىْ اِيْمَانِهِمْ .

৮. অভাবগ্রস্তদের জন্য শব্দটি উহ্য ক্রিয়া اَعْجَبُوْا -এর সাথে সম্পর্কিত সে মুহাজিরগণের যারা স্বগৃহ ও সম্পদ হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী তাদের ঈমানে।

৯. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الْمَدِيْنَةَ وَالْاِيْمَانَ اَىْ اَلِفُوْهُ وَهُمُ الْاَنْصَارُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً حَسَدًا مِمَّآ اُوْتُوْا اَىْ اٰتَى النَّبِىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَمْوَالِ بَنِى النَّضِيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط حَاجَةٌ اِلٰى مَا يُؤْثِرُوْنَ بِهِ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ حِرْصَهَا عَلَى الْمَالِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

৯. আর যারা বসবাস করেছে নগরীতে মদীনায় এবং ঈমান আনয়ন করেছে অর্থাৎ ঈমানকে ভালোবেসেছে। তারা হলো আনসারগণ। এদের পূর্বে তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছে, তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। হিংসা তাতে যা মুহাজিরদেরকে প্রদত্ত হয়েছে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অংশ হতে বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিদের সম্পদের মধ্য হতে যা মুহাজিরদেরকে দান করেছেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে, যদিও তাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ততা রয়েছে যে জিনিসটি ত্যাগ করত প্রাধান্য দিয়েছে তৎপ্রতি নিজেদের প্রয়োজন থাকে। আর যে ব্যক্তি তার আন্তরিক কার্পণ্য হতে রক্ষা পেয়েছে সম্পদের প্রতি মোহাসক্তি হতে। তারাই সফলকাম।

১০. وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا حِقْدًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

১০. আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে মুহাজির ও আনসারগণের পর, কিয়ামত পর্যন্ত। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রণী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। শত্রুতা ঈমানদারগণের প্রতি। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়াবান ও পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً : জমহুর (يَكُوْنَ) অর্থাৎ ى সহকারে আর دُوْلَةً-কে যবর সহকারে পড়েছেন। অর্থাৎ كَيْلَا يَكُوْنَ ক্রিয়ার فَاعِلْ-কে উহ্য করে دُوْلَةً-কে مَفْعُوْل হিসাবে পড়েছেন। আবূ জা'ফর, আ'রাজ, হিশাম, আবূ হাইয়ান تَكُوْنَ অর্থাৎ تَا সহকারে আর دُوْلَةٌ-কে مَرْفُوْع পড়েছেন। অর্থাৎ تَكُوْنَ-এর كَانَ-কে তাম্মা হিসাবে دُوْلَةٌ-কে فَاعِلْ করে পড়েছেন, তখন উহ্য ইবারত হবে এ রকম– اَىْ كَيْلَا تَقَعَ اَوْ تُوْجَدَ دُوْلَةٌ ।

জমহুর دُوْلَةً-এর دَالْ পেশ সহকারে পড়েছেন। তবে আবূ হাইয়ান ও আচ্ছুলামী যবর সহকারে পড়েছেন। ঈসা ইবনে ওমর, ইউনুস ও আশজায়ী বলেছেন, উভয়ভাবেই পড়া যায়। উভয়ের অর্থ কিন্তু এক ও অভিন্ন। কেউ কেউ ভিন্ন অর্থও করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ : وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ বাক্যটি يَبْتَغُوْنَ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে, উভয় বাক্যটি حَالْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। প্রথম বাক্য হলো حَالْ مُقَارِنَةْ আর দ্বিতীয় বাক্য হলো حَالْ مُقَدَّرَةْ অর্থাৎ এখানে نَاوِيْنَ শব্দটি উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটি حَالْ مُقَارِنَةْ ও হতে পারে, কারণ এভাবে তাদের বহিষ্কৃত হওয়াটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাহায্যার্থে হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ : জমহুর يُوْقَ শব্দটিকে وَاوْ-এ سَاكِنْ দিয়ে এবং ق-এ تَخْفِيْف করে পড়েছেন। হযরত ইবনে ওমর (র.) ও আবূ হাইয়ান (র.) وَاوْ-এ فَتْح দিয়ে এবং ق-এ تَشْدِيْد দিয়ে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' -এর সম্পদ অর্জনের বিষয় আলোচনা করেছেন, আর অত্র আয়াতে 'ফাইয়ের' বিধান এবং এর অংশ বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুফাসসিরগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ নাযীর হতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ কেবল মুহাজিরদেরকে দিয়েছিলেন, কারণ তখন তারা গরিব ছিলেন। (কোনো কোনো বর্ণনায় আছে তিনজন গরিব আনসারীকেও দিয়েছেন) আনসারদেরকে তা হতে কিছুই দেননি, কারণ তারা সম্পদশালী ছিলেন, তখন কোনো কোনো আনসারী বললেন, এ ফাইয়ের মধ্যে আমাদেরও অধিকার রয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে বললেন যে, রাসূল যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর যা দেননি তার জন্য লালায়িত হয়ো না। -[সাফওয়া]

মুফাসসিরগণ আরও বলেছেন, এ আয়াত ফাইয়ের মাল সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতের হুকুম রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সমস্ত করেছেন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং তার মধ্যে 'ফাই' সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশও থাকবে। মোদ্দকথা হলো, মুসলমানগণ সব ব্যাপারে রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তাই হলো এ আয়াতের দাবি। মুফাসসিরগণ তাদের এ তাফসীরের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকটি হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন- "আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করবো তখন যতদূর সম্ভব তদনুযায়ী কাজ করো। আর যে কাজ হতে বিরত রাখবো তা পরিহার করে চলো।' -[বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ رَدَّ شَيْئًا اَمَرْتُ بِهٖ فَلْيَتَبَوَّاْ بَيْتًا فِيْ جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ اَبُوْ يَعْلٰى وَالطَّبَرَانِيْ)

'যে লোক আমার নামে মিথ্যা রটনা করেছে, অথবা আমার কোনো নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামে একটা বাড়ি নির্ধারণ করে নেয়।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, একবার তিনি ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক [ফ্যাশনাকারী] স্ত্রীলোকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, এ কথা শুনে জনৈক স্ত্রীলোক তার নিকট এসে বলল, এ কথাটি আপনি কোথায় পেলেন? আল্লাহর কিতাবে তো এরূপ কথা আমি কোথাও দেখতে পাই নি। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকতে, তাহলে এ কথাটি তুমি তাতে নিশ্চয় দেখতে পেতে। তুমি কি কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি পড়নি? وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

স্ত্রীলোকটি বলল, হ্যাঁ এ আয়াতটিতো আমি পড়েছি, তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, তাহলে আর কি, রাসূল ﷺ -ই তো এ সকল ফ্যাশন হতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এসব কাজে লিপ্ত স্ত্রীলোকের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বলল, এখন আমি বুঝতে পেরেছি।-[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ হাতেম]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআনে বলেছেন, এখানে একই উৎস হতে শরিয়ত তথা বিধান গ্রহণের মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। তেমনি এ আয়াত ইসলামি সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে। ইসলামি আইনের ক্ষমতা এ কারণেই যে, এ শরিয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ও হাদীস হিসাবে নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা রাখে না। এ শরিয়তের পরিপন্থি কোনো আইন রচনা করলে সে আইনের এ ক্ষমতা থাকবে না। কারণ সে আইনের প্রথম সনদ বা ভিত্তিই নেই, যা হতে ক্ষমতা অর্জন করবে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব-রচিত যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি, সাথে সাথে সে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপন্থি, যা উম্মত তথা জাতিকে ক্ষমতার উৎস বলে দাবি করে। অর্থাৎ যেখানে বলা হয়, জাতি নিজের জন্য যে রকম ইচ্ছা সে রকম আইন রচনা করতে পারবে এবং যাই রচনা করবে তাই ক্ষমতাশালী হবে। ইসলামে ক্ষমতার উৎস হলো সে আল্লাহর শরিয়ত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ে এসেছেন। উম্মতের কর্তব্য হলো এ শরিয়ত মেনে চলা, তার হেফাজত করা এবং বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে ইমাম হলো জাতীয় প্রতিনিধি, এখানেই জাতির অধিকার সীমাবদ্ধ। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন তার খেলাফ করার কোনো অধিকার জাতির নেই।

তবে এমন কোনো বিশেষ সমস্যা জাতির সামনে দেখা দিলে, যার সামাধান কুরআন অথবা হাদীসে নেই, তখন সে সমস্যা সমাধানের পথ হলো এমন আইন বিধান প্রণয়ন করা, যা রাসূল প্রদত্ত কোনো উসূলের খেলাফ না হয়। এটা দ্বারা সে দৃষ্টিভঙ্গির নিয়ম ভাঙ্গানো হচ্ছে না, বরং তা হলো তারই শিক্ষা (فَرْعٌ) সুতরাং মূলকথা হলো যে, কোনো বিধানে কুরআন এবং হাদীস থাকলে রাসূল যা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআন-হাদীসে না থাকলে এমন বিধান রচনা করতে হবে যা ইসলামের কোনো উসূলের পরিপন্থি হবে না; এখানেই জাতি এবং জাতির প্রতিনিধি ইমামের ক্ষমতা শেষ। এটা এমন এক অনন্য বিধান মানব-রচিত যেসব বিধানের কথা মানুষের জানা তাদের কোনো বিধানই এ বিধানের সমকক্ষ হতে পারবে না।

-[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالَى مَآ أَفَاءَ اللّٰهُ ...... وَابْنِ السَّبِيْلِ : আল্লাহ তা'আলা আপন রাসূলগণকে অপরাপর জনপদ তথা কাফেরগণ হতে ফাই ইত্যাদির যে সকল মাল প্রদান করে থাকেন, তাতে আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ ও রাসূল ﷺ -এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, পথের ভিখারী, ইত্যাদি লোকদের প্রাপ্য হক রয়েছে। তাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ পাওয়ার অধিকারী, কারণ উক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলমাত্র বনূ নাযীর গোত্রের 'ফাই' সম্পর্কেই নির্দেশ ছিল, বর্তমান আয়াতে যে কোনো ক্ষেত্রের 'ফাই' -এর সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ফাই-এর মালে একমাত্র রাসূলেরই অধিকার থাকবে। আল্লাহর নাম কেবল বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মালের ফজিলত ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নতুবা আল্লাহ তো সব সম্পদেরই মালিক। রাসূলের ﷺ অবর্তমানে ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক এর ব্যবহার যথাযথ জনকল্যাণ কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফাই থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে যে দান করতেন তাতে তারা (আত্মীয়রা) দরিদ্র হওয়া আবশ্যক নয়; বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তারা সকলেই পেতেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, তারা রাসূলের সাহায্যকারী হওয়ার কারণে পেতেন।

ধনের লেন-দেন আদান-প্রদান শুধুমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সীমিত না থাকে, ধনীরা যাতে মউজ না করে, গরিবরা যাতে দুর্ভোগ ভোগ করতে বাধ্য না হতে হয়। ধন যাতে ব্যক্তি বিশেষ অথবা গোষ্ঠী বিশেষের চির কুক্ষিগত না হয়ে থাকে। গরিব ধনী নির্বিশেষে যাতে সর্বসাধারণের হাতে ধনের আনা-গোনার পথ অবারিত থাকে। এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের তত্ত্বাবধানে যাতে অসুবিধা না হয়; তজ্জন্যই এমন বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর "ফাই"-এর মাল যে কোনো গোত্র থেকেই অর্জিত হবে। সে মালের ক্ষেত্রেই এ বিধান বলবৎ থাকবে। কারণ, مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى দ্বারা হুকুম আম হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর মতে উক্ত আয়াতে বর্ণিত "اَهْلُ الْقُرٰى" দ্বারা বনূ নাযীর, কুরাইযা, খাইবার, ফাদাক ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত সম্পদের কথা বলা হয়েছে। -[তাফসীরে আযহারী, আশরাফী, তাফসীরে তাহের]

হকদারদের সাথে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য : উপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নাম উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য হালাল পূত-পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেননি। 'ফাই' আর গনিমতের মাল কাফেরদের থেকে অর্জন করা হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ মাল নবীদের জন্য কিভাবে হালাল হলো? এখানে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন; কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে নবীদেরকে ঐশীবাণীসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা নবীদের দাওয়াতে সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিজিয়া ও খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে তাদের মোকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান-মাল সম্মানই নয়। তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয় তা কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়; বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এ সম্পদকে 'ফাই' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোনো হক নেই। যেসব হকদারকে তা হতে অংশ দেওয়া হবে, তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হবে। কাজেই এ ধন-সম্পদ আকাশ হতে বর্ষিত পানি এবং স্বউদ্গাত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত আছে যে, এ সব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ হতে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারো সদকা-খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচজন রয়ে গেল- রাসূল, তার আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। -[মা'আরেফুল কোরআন]

রাসূল ﷺ -এর অংশ প্রসঙ্গ : এ সম্পদে প্রথম হকদার রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি এ বিধানটি কিভাবে কার্যকর করেছেন-মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান হযরত ওমরের বর্ণনার ভিত্তিতে তা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম ﷺ এ অংশ হতে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের খরচাদি গ্রহণ করতেন। -[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি।]

এ সম্পদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে অংশ ছিল তা রাসূলের অন্তর্ধানের পর মওকুফ হয়ে যাবে- হানাফী মাযহাব মতে, কারণ খোলাফায়ে রাশেদীন তা মওকুফ করেছেন। রাসূলের অন্তর্ধানের পর তা খোলাফাদের জন্য হবে তা মনে করলে তারা তা মওকুফ করতেন না।

অন্য আর এক কারণ হলো, এ অংশ বণ্টন করা হয়েছে রাসূলের জন্য। রাসূল রিসালাত হতে উদ্ভূত। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে রিসালাত হলো এ অংশ বণ্টনের কারণ। সুতরাং রিসালাতের তিরোধানের সাথে সাথে এ অংশও মওকুফ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, যে অংশটি রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর তাঁর খলীফার জন্য থাকবে, কেননা তিনি তাঁর নেতৃপদে অসীন থাকার কারণেই তা গ্রহণ করতেন, রাসূল হিসাবে নয়।

তবে শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদগণের মত জমহুর ফকীহগণের মতের অনুরূপ। অর্থাৎ উক্ত হিসসা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণকর কাজেই ব্যয় হবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের হিসসা সম্পর্কে বর্ণনা : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ওফাতের পর পরই নির্ধারিত করা বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর (ذَوِى الْقُرْبٰى) তাঁর নিকট মতো আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্ধারিত অংশ প্রদান করার দু'টি কারণ তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে,

১. তাঁরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইসলাম প্রচার তথা ধর্মীয় কার্যে তাঁকে বিশেষ সহানুভূতি করতেন, সুতরাং সে লক্ষ্যে ধনী ও দরিদ্র সকলেই সমান অংশে অংশীদার হতেন।

২. আর হযরত ﷺ -এর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন কারো জন্য সদকা অথবা যাকাতের মাল খাওয়া সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আইন মোতাবেক হারাম ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য "ফাই" সম্পদের অংশ হালাল করে দিয়েছেন। আর অপর দিকে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ওফাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর নুসরত ও মদদ -এর পথ বন্ধ হয়ে গেল। সেহেতু তাঁর আত্মীয়গণের ধনাঢ্য লোকদেরকে দেওয়ার নিষ্প্রয়োজন দাঁড়াল। তখন কেবলমাত্র গরিব আত্মীয়দেরকে 'ফাই' এর মাল অপরাপর দরিদ্র فُقَرَاءُ -এর সমান অংশে দেওয়া ব্যবস্থা বহাল রাখা হলো। হ্যাঁ, যদিও রাসূলের ন্যায় তাঁর ধনাঢ্য লোকদেরকে দেওয়ার কারণ বন্ধ হয়ে গেল। তথাপিও কাফের আত্মীয়-স্বজনকে অন্যান্য সাধারণ (مَسَاكِيْن) মিসকিন হতে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবস্থা রইল। -[মা'আরেফুল কুরআন, হেদায়া]

আর যেহেতু জাকাত হতে রাসূলের ﷺ আত্মীয়গণ কোনো অংশ পেতেন না, সেহেতু অন্যান্যদের (অভাবগ্রস্তদের) তুলনায় রাসূলের আত্মীয় গরিবদের হকের প্রাধান্য দেওয়া হলো।

আত্মীয়-স্বজনদের অংশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)- এর খেলাফত আমলে প্রথম দুটি অংশ প্রত্যাহার করে অবশিষ্ট তিন অংশ অর্থাৎ এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ 'ফাই' প্রাপকদের মধ্যে শামিল থাকতে দেওয়া হলো এবং হযরত আলী (রা.)ও তাঁর খেলাফত আমলে এ নীতি অনুসারে কাজ করে গেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মদ বাকের -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো– হযরত আলী (রা.) -এর ব্যক্তিগত মত যদিও তাই ছিল, যা আহলে বায়ত -এর ছিল। (তা হলো, এ অংশ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কিন্তু তিনি হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) -এর মতের বিপরীত কাজ করতে রাজি হননি।

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর এ দু'টি অংশ তথা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিজের ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশ নিয়ে মত-বিরোধের সৃষ্টি হয়। কারো মত ছিল প্রথম অংশ (রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিজের অংশ) তাঁর খলীফার পাওয়া উচিত। অপর কিছু লোক এ মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় অংশ রাসূলে কারীম ﷺ -এর আত্মীয় স্বজনকেই দেওয়া উচিত। আবার কারো মত ছিল দ্বিতীয় অংশ খলীফার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, উভয় অংশই জিহাদের প্রয়োজনে ব্যয় হবে।

আতা ইবনে সায়েব (র.) বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁর খেলাফত আমলে নবী করীম ﷺ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশ বনূ হাশেমের লোকদেরকে দিতে শুরু করেছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহগণের মত হলো, এ পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করাই অধিক নির্ভুল কর্মনীতি। -[কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ১৯, ২১ পৃ.]

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত হলো যেসব লোক হাশেমী ও মোত্তালিব বংশোদ্ভূত বলে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সর্বজন জ্ঞাত হবে। তাদের ধনী-গরিব উভয় পর্যায়ের লোকদেরকে "ফাই" থেকে অংশ দেওয়া যেতে পারে।

হানাফী আলিমগণের মত হলো তাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র গরিব লোকদেরই তা হতে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের হকই বেশি হবে। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম মালেকে (র.)-এর মতে, এ ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের উপর কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যে খাত হতে যেরূপ সমীচীন বিবেচিত হবে ব্যয় করতে পারবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লোকজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া অধিক উত্তম।

-[শরহে কাবীর, ইবনে সাবীল]

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী ও অপর তিনজন ইমামের মধ্যে অপর একটি দিক নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শফেয়ী (র.)-এর মতে "ফাই" -এর সমস্ত মালকে পাঁচটি সমান অংশে বিভক্ত করে তার একটি অংশ উপরিউক্ত ব্যয়খাতসমূহে এমনভাবে ব্যয় করতে হবে যে, তার এক-পঞ্চমাংশ বনূ হাশেম ও বনূ মোত্তালেবের জন্য, এক-পঞ্চমাংশ এতিমদের জন্য, এক-পঞ্চমাংশ মিসকিনদের জন্য এবং এক-পঞ্চমাংশ পথিক মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করতে হবে। ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতে বণ্টন সমর্থন করেন না। তাদের মত হলো "ফাই" সাধারণ মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল সম্বন্ধে আলোচনা : যেসব ধন-সম্পদ শত্রুদের নিকট হতে পাওয়া যায়, সেসব সম্পদের হুকুম সম্বন্ধে কুরআনের তিন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত সূরা আল-আনফালে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ.

'আর জেনে রাখো, যুদ্ধে যা তোমরা গনিমত পাও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ।' –[সূরা আল-আনফাল–৪১]

দ্বিতীয়ত সূরা আল-হাশরের উপরিউক্ত প্রথম আয়াত, যাতে বলা হয়েছে– وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ (الاية)

তৃতীয়ত সূরা আল-হাশরের দ্বিতীয় আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ.

এ আয়াতগুলোর তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এ সব আয়াতে তিনটি আলাদা আলাদা হুকুম বিবৃত হয়েছে– সূরা আনফালে শত্রুদের যেসব সম্পত্তি যুদ্ধের ফলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া গেছে সেসব সম্পদের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে ধন-সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে চারভাগ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করতে হবে আর বাকি এক-পঞ্চমাংশ রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের জন্য বরাদ্দ হবে।

সূরা আল-হাশরের প্রথম আয়াতে যেসব ধন-সম্পদ কাফিররা ফেলে চলে গেছে, তারপর মুসলমানরা তা যুদ্ধ ছাড়াই পেয়েছে সেসব মলের শরয়ী হুকুম বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে তাতে সেনাবাহিনীর কোনো হক নেই। তা কেবল রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট।

সূরা আল-হাশরের দ্বিতীয় আয়াতে যেসব মাল চুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদের হাতে আসে অর্থাৎ জিজিয়া, খারাজ ইত্যাদির হুকুম বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো রাসূল, রাসূলের আত্মীয় স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরগণের জন্য। –[আয়াতুল আহকাম]

আবার কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, সূরা আনফালের আয়াতে যুদ্ধের বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পদের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, আর সূরা হাশরের উভয় আয়াতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু-সম্পদের হুকুম বিবৃত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেছেন যে, সূরা হাশরের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ সম্পদগুলোর প্রকৃত স্বরূপ এ নয় যে, সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এগুলো দখল করে নিয়েছে। আর এ কারণে এগুলোকে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তাদের অধিকার স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এ সমস্ত ধন-সম্পদের প্রকৃত হকদার কারা সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, সূরা হাশরের প্রথম আয়াতে যে ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট। আর সূরা হাশরের দ্বিতীয় আয়াত এবং সূরা আনফালের আয়াতে শত্রুদের কাছ থেকে যে কোনোভাবে প্রাপ্ত সম্পদের হুকুম বিবৃত হয়েছে। তবে এ অবস্থায় দু' আয়াতের মধ্যে কোনো একটিকে মানসূখ বা রহিত মানতে হবে। কারণ আনফালের আয়াতে এক-পঞ্চমাংশ রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন .... প্রমুখের জন্য বলা হয়েছে। আর এখানে সূরা হাশরের আয়াতে পুরোটাই রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

আবার কোনো কোনো মুফাসসির সূরা হাশরের প্রথম আয়তটিকেই মানসূখ বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু-সম্পদের হকদার ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে কেবল রাসূল ﷺ পরে সে হুকুম মানসূখ হয়ে যায় সূরার দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা। সুতরাং তাঁদের মতে আয়াত দু'টি একত্রে থাকলেও একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। –[আয়াতুল আহকাম]

আমাদের মতে তিনটি আয়াতে আলাদা আলাদা হুকুম বিবৃত হয়েছে। সুতরাং কোনো আয়াতই মানসূখ নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ : এখানে উপরিউক্ত সম্পদ বণ্টনের কারণ ব্যক্ত হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি কি হবে, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেন তা (সম্পদ) তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে; অর্থাৎ ধন-সম্পদের আবর্তন গোটা সমাজের মধ্যে অবাধ ও

সাধারণ হতে হবে। কেবল ধনশালী লোকদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে, কিংবা ধনীরা আরও অধিক ধনশাল আর গরিবররা আরও অধিক গরিব হতে থাকবে তা কুরআনের এ মূলনীতি নির্ধারণী আয়াতটির সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

ইসলামি অর্থনীতির এ নীতিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত কিন্তু তা এ মূলনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং যেসব বিধানে কেবল ধনিক শ্রেণির মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তা ইসলামি অর্থনীতির পরিপন্থি, ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারবে তবে বল্গাহীন মালিক হওয়ার সুযোগ নেই। বস্তুত কুরআন মাজীদে এ নীতিটিকে বলে দিয়েই ইতি করা হয়নি। ঠিক এ উদ্দেশ্যেই কুরআনে সূদকে হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরজ করা হয়েছে, গনিমতের মাল হতে এক-পঞ্চমাংশ সাধারণ্যে বণ্টন করার বিধান দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন কাফ্ফারার এমন সব পন্থা পেশ করা হয়েছে, যাতে ধন-সম্পদের স্রোত সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের দিকে প্রবাহিত হয়। মিরাস বণ্টনের পদ্ধতি রচনা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকতর ব্যাপক ক্ষেত্রে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নৈতিকতার দিক দিয়ে কার্পণ্যকে ও অতীব ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় এবং বদান্যতা ও দানশীলতাকে অতীব উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে। তা দান নয়, তাদের হক সুস্পষ্ট অধিকার হিসাবে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের উপর আরবের একটা বিরাট উৎস 'ফাই' সম্পর্কে এ আইন করে দেওয়া হয়েছে যে, তার একটা অংশ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের সাহায্য দানে ব্যয় করতে হবে, এ পর্যায়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস দু'টি– একটি যাকাত, দ্বিতীয়টি 'ফাই'।

মুসলমানদের নির্দিষ্ট পরিমাণ (نِصَابٌ) অতিরিক্ত সম্পদ, গৃহপালিত পশু, ব্যবসা পণ্য ও কৃষি ফসল হতে যাকাত গ্রহণ করা হয় এবং তার অধিকাংশই গরিব লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই' পর্যায়ে জিজিয়া ও ভূমি রাজস্বসহ এমন সমস্ত আয়ই গণ্য যা অমুসলমানদের নিকট হতে আসবে। তারও বিরাট অংশ গরিবের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সমস্ত আর্থিক ও সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যার ফলে ধন-সম্পদের উৎস ও উপায়ের উপর কেবলমাত্র ধনশালী ও প্রভাবশালী লোকদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম না হয়– ধন-সম্পদের স্রোত ধনীদের হতে গরিবের দিকে যেতে পারে, তা কেবলমাত্র ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে; বরং সব হবে তার বিপরীত ধারায়। উপরিউক্ত বিধান হতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মূলত ইসলামের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই এ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ব্যক্তির অগাধ মালিকানার উপর একটা বড় বাধা।

অতএব, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে; কিন্তু তাই বলে ইসলাম পুঁজিবাদ নয়, তেমনি পুঁজিবাদও ইসলাম হতে সৃষ্ট নয়, পুঁজিবাদ সুদ ও মজুদদারী ছাড়া কায়েম হতে পারে না, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক বিশেষ ব্যবস্থা যা একাকী সৃষ্ট, একাকী চলছে এবং একাকী আজ পর্যন্ত বাকি আছে– এমন এক বৈশিষ্টমণ্ডিত ব্যবস্থা যা ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুষম অধিকার ও হক সম্বলিত। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ .... فَانْتَهُوْا : উক্ত আয়াতাংশে মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা প্রত্যেক কার্য ক্ষেত্রে তোমাদের দলনেতা রাসূলুল্লাহ -এর অনুসরণ করো। তিনি তোমাদেরকে যা করার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন তাই করবে, আর যা থেকে বিরত থাকার হুকুম দান করেন তা হতে বিরত থাকবে। তাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে 'ফাই'-এর মালের প্রতি ইশারা করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে বলেন– 'ফাই'-এর মাল যেহেতু তোমাদের কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত অর্জন হয়েছে অথবা এমনি বিনা কষ্টে যা হস্তগত হয় তা বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর রাসূলকেই একক অধিকার দিয়েছেন, সার্বজনীন প্রয়োজন বশত যথা ইচ্ছা তিনিই তথায় তা খরচ করবেন। (হাকীমূল উম্মত) সুতরাং ধন হোক জ্ঞান হোক, অথবা আদেশ নিষেধ যাই হোক না কেন পয়গম্বর থেকে যার অনুমতি পাওয়া যায় মুসলমান মাত্রকেই তা সানন্দে ও সাগ্রহে বরণ করতে হবে। তাই শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করতেই হবে। আর পয়গম্বরের বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

উক্ত আয়াতখানি দ্বারা যদিও আল্লাহ ফাই-এর অংশীদারদের বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ তবুও অংশীদারদের কাকে কতটুকু দান করবেন সেই কথা রাসূলের উপর ন্যস্ত রয়েছে। যাকে না দেওয়া হয়ে থাকে সে যেন তা প্রাপ্ত হওয়ার চিন্তায় বিভোর না হয়। আর যারা বাহানা করে প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তাও জঘন্য অপরাধ হবে। –[তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন ও তাফসীর তাহের]

আর আয়াতটির প্রয়োগ কেবল ফাই -এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং সাধারণ দৃষ্টিতেও তাকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, এ প্রসঙ্গে হুযূর বলেছেন– اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)
আর রাসূলুল্লাহ -এর নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের ন্যায়, সুতরাং তার উপর হুবহু আমল করা ওয়াজিব। –[আল-হাদীস]

رَوَى اَبُوْ يَعْلٰى وَالطَّبْرَانِيْ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ رَدَّ شَيْئًا اَمَرْتُ بِهٖ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ -

قَوْلُهٗ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ : আয়াতের অনুসরণে বহু সংখ্যক সাহাবী প্রত্যেক কার্যে কুরআন মাজীদের নির্দেশের অনুগমন করতেন এবং তাকে (وَاجِبُ الْعَمَلِ) হিসাবে গ্রহণ করতেন। -[মাআরেফ]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে اٰتٰى শব্দের মোকাবিলায় نَهٰى শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় اٰتٰى শব্দটির অর্থ اَمَرَ যা نَهٰى শব্দের হুবহু বিপরীত অর্থবোধক। আর কুরআনে কারীমে نَهٰى শব্দের বিপরীতে اَمَرَ শব্দকে না নিয়ে اٰتٰى শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্ভবত তাই হতে পারে। যে বিষয় প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে [অর্থাৎ ফাই প্রসঙ্গে] তাতে আয়াতাংশ শামিল থাকবে।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এই কাপড় (পরণ থেকে) খুলে ফেল, তখন ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে বসল যে, এ প্রসঙ্গে আপনি কোনো আয়াত পেশ করতে পারবেন, যাতে সেলাইকৃত কাপড় ইহরামের অবস্থায় পরিধান করার কথা নিষেধ করা হয়েছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত আয়াত وَمَا اٰتٰكُمُ الخ পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

একদা ইমাম শাফেয়ী (র.) মানুষদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষমতা রাখি, সুতরাং তোমরা যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। অতঃপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইহরাম অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি (زَنْبُوْرْ) জাম্বুর মেরে ফেলল এখন তার কি হুকুম হবে? (কুরআনের মাধ্যমে উত্তর দিন) তখন ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত আয়াত وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ তেলাওয়াত করলেন এবং তার প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করে লোকটিকে তার হুকুম বলে সন্তুষ্ট করে দিলেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ..... الْعِقَابُ : 'তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো' আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলার পর মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।'

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে পূর্বোক্ত নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ছলচাতুরী করলে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে গড়িমসি করলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তার খবর রাখেন, তিনি এজন্য শাস্তি দিবেন।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ আয়াতে উপরিউক্ত দু' মূলনীতিকে মু'মিনদের অন্তরে তাঁর প্রথম উৎসের তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আহ্বান করেছেন তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং আল্লাহর আজাব হতে ভয় দেখাচ্ছেন "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী" এটাই হলো বড় জামিন যাতে গড়িমসি চলে না। যা হতে পলায়ন সম্ভব নয়। মুসলমানগণ জানেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন খবর রাখেন, তাদের আমল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। আরো জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদানকারী, তাদেরকে কেবল ধনীদের মধ্যে সম্পদের আবর্তন যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যা দান করেছেন তা সন্তুষ্ট চিত্তে এবং আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন, তাতে অবহেলা প্রদর্শন না করে বিরত থাকতে হবে। কারণ, তাদের সামনে এক কঠিন দিন রয়েছে। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মালে 'ফাই' সম্পর্কে গভীর আলোচনা ছিল, উক্ত আয়াত হতে রুকূর শেষ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াতে মুহাজির ও আনসার মুসলমানদের প্রশংসা ও তাঁদের কিছু প্রাপ্য হকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الخ-এর শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারগণ নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এই আবেদন পেশ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের এবং মুহাজিরদের মধ্যে আমাদের জমিন ভাগ করে দিন। অর্থাৎ মুহাজিরদেরকেও আমাদের জমিনের অর্ধেক দিয়ে দিন, যাতে তারা সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, জমিনের মালিকানা তোমাদেরই থাকবে। মালিকানায় কোনো অংশীদারিত্ব থাকবে না। অবশ্য তোমাদের জমিনে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ প্রদান করো এবং উৎপন্ন ফসলকে ভাগ করে নিও। তখন মহান আল্লাহ তাদের উদারতার কথা উল্লেখ করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[নূরুল কোরআন]

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আনসারকে মেহমান হিসাবে আহলে সুফফার একজন লোক দিলেন। আনসার সে লোকটিকে নিয়ে নিজ গৃহে গমন করলেন। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকে বললেন, বাড়িতে কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হলো, না, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, অতঃপর খাবার নিয়ে আসো। তুমি খাবার নিয়ে আসলে আমি বাতি নিভিয়ে দিবো। স্ত্রী আনসারীর কথা মতো কাজ করলেন। আনসারী খেতে বসে নিজের সামনের খাবার মেহমানের দিকে এগিয়ে দিলেন। অতঃপর সকালবেলায় মেহমানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আসমানের অধিবাসীগণ তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

–[বুখারী, মুসলিম, মা'আরিফুল কোরআন, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, আসবাবুন নুযূল]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলের একজন মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি ছাগলের মাথা উপঢৌকন দিলেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তার বাচ্চারা আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত। সে মতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয়জন চতুর্থজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে আসল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ –[মা'আরিফ, আসবাব]

সাহাবীদের اِيْثَارٌ (অন্যকে প্রাধান্য দান)-এর আরো বহু ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। মোটকথা হলো, আনসারগণ নিজেদের প্রয়োজন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা-ক্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে প্রাধান্য দান করতেন।

قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ الخ : لِلْفُقَرَاءِ শব্দটি وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ হতে بَدَل হয়েছে। যেন বলা হয়েছে, ইতঃপূর্বে যে চার প্রকারের লোকদেরকে অভাবের কারণে ফাই-এর হকদার বলা হয়েছে, সে লোকগুলো হলেন এ গরিব মুহাজিরগণ। যাদের পরিচয় হলো এই..... এই। –[কাবীর]

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ **আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে 'ফাই' -এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকিন এ মালের হকদার কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ তাদের দীনি খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।–(মা'আরিফুল কোরআন)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ **আয়াতের কারীমা হতে নির্গত শরয়ী মাসআলাসমূহ :** উক্ত আয়াত হতে ইসলামের নীতি অনুসারে কয়েকটি মাসআলা সাব্যস্ত করা যায়–

১. কাফেরগণ জবর দখল করে মুসলমানদের মালের উপর মালিকানা, অধিকার স্থাপন করতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে মুহাজিরদেরকে ফকির বলেছেন, অথচ তাদের দেশে সকল মাল সম্বল রয়েছে। সুতরাং এ মাসআলার জন্য আয়াতখানা প্রমাণ স্বরূপ।

২. এটা হতে আরো মাসআলা নির্ধারিত করা যায় যে, দেশত্যাগ অথবা নির্বাসিত ব্যক্তি সে দেশের সম্পদের উপর পরবর্তীতে মালিকানা স্বত্ব দাবি করতে পারে না।– (يُقَالُ لَهُ اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ)

৩. ধর্ম পরিবর্তনের কারণেও সম্পদের মালিকানা স্বত্ব থাকে তাকে ধর্ম পরিবর্তন اِخْتِلَافُ دِيْنَيْنِ বলা হয়। كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّنْزِيْلِ

৪. সদকা ও ফাই-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ও ধার্মিক দীনের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাবে।

৫. ইসলাম তথা ধর্ম রক্ষার্থে পুনর্বাসিত হলে, তাদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে ফাই অথবা সদকার মাল হতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. উক্ত ব্যবস্থা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের জন্য সীমিত নয়; বরং এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। –[মাদারেক]

উক্ত আয়াতটি মুহাজির সম্প্রদায়ের ফাজায়েল বর্ণনাকারী স্বরূপ : قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণের গুণ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে–

১. মুহাজিরগণ আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন করেছে। অর্থাৎ ঈমানদারের গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এর কারণেই তাদেরকে কাফের সম্প্রদায় ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজন থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। আর তারা জীবন দিয়ে হলেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হয়ে থাকবে। এ কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার দুরাচার ও অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে ফলে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাদের কেউ কেউ কখনো ক্ষুধার জ্বালায় অসহ্য হয়ে পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবার কেউ কেউ শীতের সম্বল না থাকার কারণে মাটির গর্ত তৈরি করে তাতে গা ঢাকা দিয়ে শীত হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। -[তাফসীর মাযহারী, কুরতুবী]

২. মুহাজিরগণ ইসলাম গ্রহণের পিছনে লালায়িত হয়ে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দেশান্তর হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে নয়। যাতে তাঁদের পূর্ণ এখলাসের সাথে আল্লাহমুখি হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

আর (فَضْلٌ) শব্দটি সাধারণত দুনিয়ার নিয়ামত ও (رِضْوَانٌ) শব্দটি পরকালীন নিয়ামতের জন্য বলা হয়। এ স্থলে উভয় শব্দ ব্যবহার করে এ মর্মটুকুই বুঝানো হয়েছে যে, ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়ে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় শান্তি এবং আখেরাতের শান্তি অর্জন করার কামনা করেছিলেন। সে মর্মেই আল্লাহ বলেছেন- يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا

৩. মুহাজিরগণ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির জন্য আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সাহায্য একান্ত আবশ্যক মনে করেছেন, কারণ আল্লাহর সাহায্য ও রাসূলের সাহায্যের অর্থই দীন -এর সাহায্য। সুতরাং তারা দীনের জন্য অশেষ ও অবর্ণনীয় জান-মাল কুরবানি করেছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ।

৪. মুহাজিরগণ মুখে স্বীকার করে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে যে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন তার উপর অটল রয়েছেন।

উক্ত আয়াতে সকল সাহাবী ও মুহাজিরগণের সত্যতার সাধারণ বর্ণনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁদের কাউকেও যদি মিথ্যাবাদী বলে গালি দেওয়া হয়, তাহলে তার ঈমান থাকবে না। রাফেযিয়া সম্প্রদায় তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) মুনাফেক বলে উক্ত আয়াতের নির্দেশের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং রাফেযিয়া সম্প্রদায় ঈমানদার নয়। অথচ রাসূল ﷺ উক্ত মুহাজিরগণের অসিলা দ্বারা দোয়া করতেন। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন- اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -[বাগাবী]

এ আয়াত দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের সত্যতার দলিল পেশ করা : যারা এ আয়াত হতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খেলাফত বৈধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে চান তাঁরা বলেন, সেসব ফকির মুহাজির ও আনসারগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলতেন, ইয়া খালীফাতু রাসূলিল্লাহ-[হে রাসূলুল্লাহর খলীফা] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁরা সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সুতরাং তারা যে 'ইয়া খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' বলতেন তাদেরও সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। যখন অবস্থা এই দাঁড়াল, তখন হযরত আবূ বকরের খেলাফত বৈধ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও অপরিহার্য হয়ে গেল। -[কাবীর]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত বৈধ প্রমাণ করার জন্য এ জাতীয় দলিল দুর্বল এবং অপ্রয়োজনীয়। কারণ তাঁর খেলাফত সাহাবীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আলী ও তাঁর খেলাফত মেনে নিয়েছিলেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ ...... هَاجَرَ اِلَيْهِمْ (الاية) : وَالَّذِيْنَ অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের اَلْمُهَاجِرِيْنَ শব্দের উপর عَطْف সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে "এ সম্পদ তাদের জন্যও যারা এ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে মদীনায় বসবাস আরম্ভ করেছিল। তারা ভালোবাসে সে লোকদেরকে যারা হিজরত করে মদীনায় এসেছে।"

পূর্বোক্ত আয়াতে মুহাজিরদের প্রশংসা করার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করেছেন।

تَبَوَّؤُا শব্দের অর্থ- অবস্থান গ্রহণ করা। এখানে اَلدَّارَ মানে দারুল হিজরত মদীনা তাইয়্যেবা, সুতরাং تَبَوَّؤُا الدَّارَ -এর অর্থ হলো মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছে; কিন্তু এখানে اَلدَّارَ -এর উপর اَلْاِيْمَانَ -কে عَطْف করা হয়েছে। অবস্থান গ্রহণ কোনো স্থান ও জায়গায় হতে পার। ঈমান কোনো জায়গা নয় যে, তাতে অবস্থান গ্রহণ সম্ভবপর হয়। তাই কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে اَخْلَصُوْا অথবা تَمَكَّنُوْا ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং ঈমানে পাকাপোক্ত ও খাঁটি হয়েছে।

এখানে এ ব্যাখ্যা করা যেতে পরে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

-[মা'আরিফুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর, কাবীর, কুরতুবী]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এখানে اَلدَّارَ-এর ال-কে مُضَافُ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মূলত دَارَ ছিল, اَلْهِجْرَةُ-اَلْاِيْمَانَ-এর মধ্যে مُضَافٌ-কেই حَذْفٌ করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে تَبَوَّؤُا دَارَ الْهِجْرَةِ وَ دَارَ الْاِيْمَانِ তখন উভয় دَارَ-এর অর্থ হবে মদীনা তাইয়্যেবা। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِهِمْ : مِنْ قَبْلِهِمْ-এর অর্থ : এখানে مِنْ قَبْلِهِمْ-এর هُمْ ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো, মুহাজিরগণ। অর্থাৎ যারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ঈমানকে খাঁটি করেছেন মুহাজিরদের পূর্বে। এখন এখানে প্রশ্ন উঠে تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ-এর যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম, "যারা মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং ঈমানকে পাকাপোক্ত করেছেন মুহাজিরদের পূর্বে" এটা কিন্তু বাস্তব সত্য ইতিহাসের পরিপন্থি। কারণ মূলত মুহাজিররাই প্রথমে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে, পরে ইসলাম মদীনায় সম্প্রসারিত হয়। এ প্রশ্ন হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মুফাসসিরগণ এখানে مُضَافُ اِلَيْهِ উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ هِجْرَتِهِمْ তথা তাদের হিজরতের পূর্বে। -[রূহুল মা'আনী]

আবার কেউ কেউ كَثِيْر শব্দটি উহ্য مُضَافٌ মেনেছেন, অর্থাৎ قَبْلَ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ অনেক মুহাজিরের পূর্বেই তারা ঈমান গ্রহণ করেছেন। -[সাফওয়া, ইবনে কাছীর]

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الخ আয়াতটি আনসারদের মর্যাদা বর্ণনা স্বরূপ : উক্ত আয়াতে تَبَوَّؤُا শব্দের পরে دَارَ সাথে ঈমানের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ বাসস্থান তৈরি করার জন্য কোনো স্থান বা ঘর আবশ্যক, ঈমনের সাথে বাসস্থান তৈরি করার অর্থের কোনো হেতু হয় না। তাই কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, এখনে تَمَكَّنُوْا অথবা, اَخْلَصُوْا শব্দ مَحْذُوْف মানতে হবে। তখন অর্থ হবে, আনসারগণ এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা হিজরতের যোগ্য স্থানে বাসস্থান তৈরি করেছেন এবং ঈমান গ্রহণ করে ঈমানের শক্তিতে শক্তিশালী হলেন।

অথবা, বলা যায় ঈমানকে اِسْتِعَارَهْ হিসেবে একটি রক্ষিত স্থানের সাথে تَشْبِيْه দিয়ে তথায় বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করে নেওয়ার অর্থ নেওয়া হয়েছে।

৩আর مِنْ قَبْلِهِمْ দ্বারা মুহাজিরগণের পূর্ববর্তীগণকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মতলব এই হবে যে, মদীনা তাইয়্যেবাহ -এর আনসারগণের আর একটি ফজিলত এই যে, যে শহরটি আল্লাহর دَارُ الْهِجْرَةِ অথবা دَارُ الْاِيْمَانْ হওয়ার উপযোগী ছিল, মুহাজিরগণের পূর্বে সে শহরটিতে আনসারগণ বসবাস রত আছেন। আর মুহাজিরগণ মদীনায় গিয়ে ঈমান দৃঢ় করার পূর্বেই আনসারগণ ঈমান গ্রহণ করে তথায় ঈমানদার হিসেবে অতি পাকা হয়ে আছেন। -[মা'আরেফুল কোরআন]

উক্ত আয়াতটি মদীনা মুনাওয়ারাহ-এর ফজিলত বর্ণনাকারীও বটে : কারণ উক্ত আয়াতে تَبَوَّؤُا শব্দটি স্থান নির্ধারণকরণের প্রতি ইঙ্গিতবহ, আর دار শব্দটি দ্বারা دَارُ الْهِجْرَةِ অথবা دَارُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ মদীনায়ে তাইয়্যেবাহ উদ্দেশ্য।

এ লক্ষ্যে ইমাম মালিক (র.) মদীনা শরীফকে দুনিয়ার সকল শহর হতে উত্তম শহর বলেছেন। কেননা পৃথিবীর যে সকল শহরগুলোতে ইসলামের আলো পৌঁছেছে, তাতে যুদ্ধ ব্যতীত পৌঁছতে পারেনি; কিন্তু মদীনা শরীফে বিনা যুদ্ধে ইসলাম পৌঁছেছে। এমনকি মক্কা শরীফে ইসলামের উৎপত্তিস্থল হওয়া সত্ত্বেও তথায় জিহাদ ব্যতীত ইসলামের জ্যোতি পৌছানো সম্ভব হয়নি। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ : "তারা ভালোবাসে সেসব লোকদেরকে যারা তাদের নিকট হিজরত করে এসেছেন।" এ কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন মদীনার অধিবাসী আনসারগণ তাদেরকে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন এবং তাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ মুহাজির ভাইগণকে দিয়ে দিলেন। -[খাযেন, সাফওয়া]

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আসলে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রস্তাব করলেন- আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান আছে। আপনি তা আমাদের ও মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, এ লোকেরা বাগ-বাগিচা চাষাবাদের কাজ জানে না। এরা যেখানে হতে এসেছে সেখানে বাগ-বাগিচা নেই। এমনকি হতে পারে না যে, এসব বাগ-বাগিচায় চাষাবাদের কাজ তো তোমরা করবে আর তা হতে ফসলের অংশ তাদেরকে দিবে? আনসাররা বললেন, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" -[বুখারী, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

মুহাজিরগণের জন্য আনসারদের ভালোবাসার বহু ঘটনা ও বহু ত্যাগের কথা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোথাও–অন্য কোনো সমাজে এ রকম নজির মিলা অসম্ভব। সাধারণত লোকেরা ভিটা-মাটিহীন নির্বাসিত মানুষকে স্থান দিতে চায় না। সর্বত্রই দেশী ও বিদেশীর প্রশ্ন উঠে; কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি; বরং নিজের বাড়িতেই পুনর্বাসিত করেছেন, নিজের ধন-সম্পদের অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা দেখে স্বয়ং মুহাজিরগণ আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, 'এ রকম ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত লোক আমরা কখনো দেখিনি।"

–[মুসনদের আহমদ, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً (الاية) : আনসারদের গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, لَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا এবং তাদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন (হিংসা) অনুভব করে না; তাতে যা মুহাজিরদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। এ আয়াত নিম্নোক্ত ঘটনার ইঙ্গিত করে।

যে সময় বনূ নযীর গোত্রের ফাই'য়ের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের এখতিয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোনো বাড়ি-ঘর, আর না ছিল কোনো সহায়-সম্বল। তাঁরা আনসারগণের বাড়িতে বাস করতেন এবং তাঁদের বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত-মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফাইয়ের সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রাসূল ﷺ আনসারদের সরদার সাবেত ইবনে কায়েসকে ডেকে বললেন, তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন, সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকবো না সমস্ত আনসারকে ডাকবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না সবাইকে ডাকো, অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন– আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা নিঃসন্দেহে অনন্য অসাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বনূ নাযীরের ধন-সম্পদ আপনাদের হস্তগত করেছেন। যদি আপনারা চাহেন তাহলে আমি এ সম্পদ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিবো এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এ সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায় সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দিবো এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নিবে।

এ বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দু'জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) ও সা'দ ইবনে মায়ায (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অভিমত এই যে, এ ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আপনি কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এ উক্তি শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা এ সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন এবং ধন-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, আনসারদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবূ দজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্র নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-কে ইবনে আবী হাকীমের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করলেন। –[মাযহারী, মা'আরেফুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى .... خَصَاصَةً : আনসারদের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ আর তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় তারা নিজেদের অভাব থাকলেও। اِيْثَارٌ -এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা।

خَصَاصَةٌ -এর অর্থ দারিদ্র, ক্ষুধা, প্রয়োজন, অভাব।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : شُحٌّ শব্দের অর্থ হলো– কৃপণতা। بُخْلٌ ও شُحٌّ শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحٌّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে شُحٌّ -এর অর্থ হলো অতিশয় কৃপণতা। হযরত ইবনে ওমর (রা.) شُحٌّ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, নিজের ধন-সম্পদ অন্যকে না দেওয়া شُحٌّ নয়। তবে شُحٌّ হলো যেসব ধন-সম্পদ তার নয় সেসব ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করা [হাদীস]।

* হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, شُحٌّ শব্দের অর্থ হলো তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে হজম করা, তবে তা কৃপণতা নয়।
* হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) বলেছেন, شُحٌّ হলো হারাম পথে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা এবং তার যাকাত আদায় না করা।

* কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন شُحّ শব্দের তাৎপর্য হলো এমন অদম্য লোভ যা নিষিদ্ধ পথে রোজগারের কারণ হয়।
* ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ করা, আর যা দান করার আদেশ দিয়েছেন তাকে কৃপণতার কারণে রেখে দেওয়া, যদি সে আল্লাহর পথে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করে তবে বলা যাবে যে এই বক্তি شُحّ থেকে সংরক্ষিত। –[নূরুল কোরআন]

شُحّ বা লোভ থেকে আমাদের সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত। شُحّ বা বখিলি সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, হুযূর ﷺ বলেন–

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ .(رواه البخاري في الْاَدَبِ وَالْمُسْلِمُ - وَالْمُسْنَدُ لِاَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ)

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা : ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ (র.)-এর বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন–একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে বসা ছিলাম, তখন তিনি বলেন, তোমাদের নিকট এখন একজন বেহেশতী আগমন করেছেন, এমতাবস্থায় আনসার গোত্রের একজন লোক বাম হাতে জুতা নিয়ে আসছেন যার দাড়ি হতে তাজা অজুর পানি ফোঁটায় ফোটায় বয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন একই ব্যক্তির মাধ্যমে একই ঘটনা প্রকাশ পেল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস থেকে উঠে গেলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) সে ব্যক্তির বেহেশতী হওয়ার গুপ্ত রহস্য জানবার জন্য তার পিছনে লাগলেন এবং সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কোনো কথা প্রসঙ্গে ঝগড়া করে শপথ করেছি যে, তিন দিন বাড়িতে যাবো না, সুতরাং আমাকে আপনার সাথে স্থান দেওয়া মুনাসিব মনে করলে স্থান দিন। তখন তিনি তাকে গ্রহণ করলেন ও স্থান দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ তিন রাত পর্যন্তই তার সাথে ছিলেন, কিন্তু রাতে তাহাজ্জুদ; এর জন্যও উঠতে দেখেননি বরং রাতে শোয়ার সময় কিছু তাছবীহ পাঠ করে শুতেন এবং ফজরের নামাজ রীতিমতো জামাতে পড়তেন। কিন্তু ভালো কথাবার্তাই সর্বদা বলতেন এবং অশ্লীল বলতেন না। তখন এ অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ-এর মনে তার আসল সম্পর্কে নিন্দনীয় ধারণা পোষণ করার উপক্রম হলে তিনি তাকে তার সকল ঘটনা ভেঙ্গে বললেন। এ কথা শুনে ব্যক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহকে বলল, আমার কাছে তো আপনি যা দেখেছেন, তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন আব্দুল্লাহ বাড়িতে ফিরে আসতে লাগলেন, তখনই সে ব্যক্তি আব্দুল্লাহকে পুনরায় ডাক দিয়ে বললেন, আমার একটি কথা মনে পড়ে তা হলো আমি কখনো কারো সাথে হাসাদ করি না এবং কাউকেও হিংসা করি না। অতিরিক্ত থাকলে তাই আমার আমল।

এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) নিশ্চিত হলেন ও বললেন এ দিকেই হযরত ﷺ-এর ইঙ্গিত ছিল এবং এটাই আপনাকে বেহেশতের কারণ বানিয়েছে। –[ইবনে কাছীর, নাসায়ী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا ...... سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ : এখানে মুহাজির ও আনসারদের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে। আর وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا এ আয়াতকে اَلْمُهَاجِرِيْنَ-এর উপর **عَطْف** করে বলা হয়েছে **'ফাই'**-এর মাল সে সমস্ত লোকদের জন্যও যারা এ অগ্রবর্তীদের পরে এসেছে। যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে ভাইকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।

এ আয়াত সমস্ত মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ মু'মিনগণ হয়তো মুহাজির, না হয় আনসার, নতুবা এদের পরে আগমনকারী অন্য যে কোনো মুসলমান। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, মুহাজির ও আনসারগণের পরে যাদের আগমন হয়েছে সেসব মুসলমানদের উচিত পূর্বের আনসার ও মুহাজিরদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে দোয়া করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং যেসব লোক এরূপ করবে না; বরং তাদেরকে গালাগালি করবে বা তাদেরকে খারাপভাবে চিহ্নিত করবে, এ আয়াত মতে তারা মু'মিনগণের দল হতে বের হয়ে যাবে। –[সাফওয়া]

মূলকথা, এ আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ আয়াত তাদের সবাইকে 'ফাই' -এর মালের হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণে-ই খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন। যাতে এ সব সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামি বাইতুল মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোনো কোনো সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আবেদন করলে তিনি এ আয়াতের বরাত দিয়ে জবাব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার

করতাম তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে?

-[কুরতুবী, মা'আরেফুল কুরআন]

হযরত ওমরের এই কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, এ সমস্ত বিজিত অঞ্চলই সাধারণ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' স্বরূপ থাকবে, যারা এ সব জমির চাষাবাদের কাজ করছে তা তাদেরই হাতে থাকবে এবং তার উপর খারাজ ও জিজিয়া বসিয়ে দেওয়া হবে। -[কিতাবুল খারাজ, আহকামুল কোরআন]

চাষাবাদের এ অধিকার বংশানুক্রমে তাদের অধস্তন পুরুষেরা লাভ করতে থাকবে। এ অধিকার তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে; কিন্তু এ জমি ক্ষেতের মালিক তারা নয়, মুসলিম মিল্লাতই এ সবের আসল মালিক। -[কিতাবুল আমওয়াল]

এ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে বিজিত দেশসমূহের যেমন ধন-মাল মুসলমানদের সমষ্টিক ও জাতীয় মালিকানা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা হলো-

১. যেসব জমি ও অঞ্চল কোনোরূপ সন্ধির ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে।
২. কোনো অঞ্চলের লোকেরা যুদ্ধ ব্যতীতই মুসলামানদের নিকট নিরাপত্তার আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যে যেসব বিনিময় মূল্য (فِدْيَةٌ) কিংবা ভূমিকর (خَرَاجٌ) অথবা জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হবে তা।
৩. যেসব জমি-জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি তার মালিকরা পরিত্যাগ করে ছেড়ে যাবে। [সর্ব প্রকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি]।
৪. মালিকবিহীন বিষয়-সম্পত্তি, যার কোনো মালিক বেঁচে নেই।
৫. যেসব জমি-জায়গা পূর্ব হতে কারো মালিকানাধীন নয়।
৬. যেসব শুরু হতেই লোকদের দখলে ছিল, কিন্তু সে সবের প্রাক্তন মালিকগণকে বহাল রেখে তাদের উপর জিজিয়া ও খারাজ ধার্য করা হয়েছিল।
৭. প্রাক্তন শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।
৮. প্রাক্তন শাসকদের মালিকানাভুক্ত জমি-জায়গা ও বিষয়-সম্পত্তি। -[কিতাবুল খারাজ, বাদায়ে ওয়া সানায়ে]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا ...... اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ : এখানে বলা হয়েছে পরবর্তীতে যারা আসে তারা পূর্বের মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, "আর আমাদের ঈমানদার লোকদের জন্য কোনো হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না, হে আমাদের রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।"

এ আয়াতে মুসলমান জনগণকে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দান করা হয়েছে। সে নৈতিক শিক্ষা এই যে, কোনো মুসলমানের অন্তরে অপর কোনো মুসলমানদের প্রতি এক বিন্দু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়; বরং পূর্ববর্তী লোকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা এবং তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের উক্তি না করাই তদের সঠিক ও নির্ভুল আচরণ।

মুসলমানদের সম্পদের উপর কাফিরগণের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ মাসআলা : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণকে ফকির আখ্যায়িত করেছেন [অথচ ইসলামের পরিভাষায় ফকির সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার কোনো সম্পদ বলতেই নেই (يَعْنِىْ وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ) এবং মিসকিন তাকে বলা হয় যার সামান্য সম্পদ আছে। অথবা কোনো কোনো ফকীহ তার বিপরীত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন] [অথবা কমপক্ষে যার بِقَدْرِ نِصَابٍ সম্পদ নেই সেই ফকির) আর মুহাজিরগণের মক্কা ভূমিতে অনেক সম্পদ রয়ে গিয়েছে। যদি হিজরতের পরও সে সম্পদে তাঁদের অধিকার থাকত, তাহলে তাদেরকে ফকির বলা জায়েজ হতো না। কুরআনে আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে ফকির বলেছেন?

তার উত্তর এই যে, আল্লাহ তাদেরকে ফকির বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, হিজরতের মুহূর্তে যে সম্পদ তারা মক্কাতে ফেলে এসেছে তাতে কাফিরগণ হস্তক্ষেপ করে ফেলেছে; সুতরাং তা তাদের মালিকানা হতে খারিজ হয়ে গেছে।

তাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, যদি কোথাও কোনো কাফির কোনো মুসলমানদের মালের উপর অধিকার স্থাপন করে ফেলে, অথবা কোনো دَارُ الْاِسْلَامْ এর উপর তারা জয়ী হয়ে মুসলমানদের সম্পদের উপর তারা প্রভুত্ব পেয়ে যায়, অথবা মুসলমান دَارُ الْاِسْلَامْ থেকে دَارُ الْحَرْبِ-এর দিকে হিজরত করে চলে যায়, তখন সে সম্পদের উপর মুসলমানদের মালিকানা সত্ত্ব থাকবে না এবং সে সম্পদ পুনরায় মুসলমানদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। হাদীস দ্বারা তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থের উক্ত অংশে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে।

-[মা'আরিফুল কোরআনেও এই মতই বর্ণিত]

অনুবাদ :

١١. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمْ بَنُو النَّضِيْرِ وَاِخْوَانِهِمْ فِى الْكُفْرِ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ فِى الْاَرْبَعَةِ اُخْرِجْتُمْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ فِىْ خُذْلَانِكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّامُ الْمُوَطِّئَةُ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ .

১১. আপনি কি দেখেননি লক্ষ্য করেননি মুনাফিকদের প্রতি। তারা আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে। তারা হলো বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিগণ ও কুফরির মধ্যে তাদের অন্যান্য সাথীগণ। যদি لَئِنْ -এর মধ্যে চার স্থানে لَامْ হরফটি قَسَمْ -এর জন্য। তোমরা বহিষ্কৃত হও মদীনা হতে তবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবো। আর আমরা মান্য করবো না তোমাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অপদস্থ করায় কারো আদেশ কোনো সময়েই। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও এখানে لَامُ قَسَمْ উহ্য করা হয়েছে। তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

١٢. لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ج وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ج وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ جَاءُوْا لِنَصْرِهِمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ قف وَاسْتَغْنٰى بِجَوَابِ الْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ فِى الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ .

১২. যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকগণ তাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, মুনাফিকগণ তাদের সাহায্য করবে না। আর যদি তারা এদের সাহায্য করেও সাহায্য করার জন্য আগমন করেও তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। পাঁচ স্থানেই জওয়াবে কসম থাকার কারণে শর্তের জওয়াব উহ্যরূপে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। অতঃপর তারা কোনোই সাহায্য পাবে না অর্থাৎ ইহুদিরা।'

١٣. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً خَوْفًا فِىْ صُدُوْرِهِمْ اَىِ الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ اللّٰهِ ط لِتَاْخِيْرِ عَذَابِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ .

১৩. বাস্তবিক পক্ষে তোমরা অধিক ভয়ঙ্কর ভয়ানক তাদের অন্তঃকরণে অর্থাৎ মুনাফিক গোষ্ঠীর অন্তরে। আল্লাহর তুলনায় তাঁর শাস্তি বিলম্বে আগমনের কারণে এটা এ কারণেই যে, তারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

١٤. لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ اَىِ الْيَهُوْدُ جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ اِلَّا فِىْ قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جِدَارٍ سُوْرٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ حَرْبُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط مُتَفَرِّقَةٌ خِلَافَ الْحِسْبَانِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ مِثْلُهُمْ فِىْ تَرْكِ الْاِيْمَانِ .

১৪. এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ ইহুদিগণ সকলে মিলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তবে হ্যাঁ সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে কিংবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করবে। এখানে جِدَارْ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে দেয়াল, আর অন্য এক কেরাতে جِدَارْ -এর পবিবর্তে جُدُرْ বলা হয়েছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দারুন সংঘর্ষ এখানে بَاْسُهُمْ অর্থ حَرْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের মধ্যকার বিরোধ আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছেন দলবদ্ধ অথচ তাদের অন্তরগুলো পরস্পর ভিন্ন। বিচ্ছিন্ন, ধারণার বিপরীত, এটা এ কারণেই যে, তারা এক নির্বোধ জাতি। ইমাম গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্বোধ জাতির সাদৃশ্য বলা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ نَافَقُوْا এটি পূর্ববর্তী اَلَمْ تَرَ হতে مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ : এখান থেকে اَبَدًا পর্যন্ত يَقُوْلُوْنَ -এর مَقُوْلَه বা مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ وَّرَاءِ جِدَارٍ : জমহুর মুফাসসির جُدُرٌ অর্থাৎ বহুবচন করে পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে মুহাসেন, ইবনে কাছীর, আবূ আমর (র.) جِدَارٌ অর্থাৎ একবচন করে পড়েছেন। আবূ উবাইদ, আবূ হাতেম প্রথম কেরাতকেই পছন্দ করেছেন, কারণ সে কেরাতটি قُرًى مُحَصَّنَةٍ -এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ এখানেও قُرٰى শব্দটিকে বহুবচন পঠিত হয়েছে। মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো লোক جُدْرٌ অর্থাৎ ج -এ যবর দিয়ে আর د -এ সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى : وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى শব্দটি দু'ভাবে পঠিত হয়েছে– ১. জমহুর شَتّٰى পড়েছেন। ২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) وَقُلُوْبُهُمْ اَشَتُّ পড়েছেন। অর্থাৎ شَتّٰى হতে اِسْمُ تَفْضِيْل اَشَتُّ করে পড়েছেন। অর্থাৎ তাদের অন্তর পুরোপুরিই বিচ্ছিন্ন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَشَدُّ رَهْبَةً : اَشَدُّ رَهْبَةً -এ অবস্থিত رَهْبَةً শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে। এ رَهْبَةً শব্দটি مَصْدَرٌ - مَبْنِىٌّ لِلْمَفْعُوْل হতে বা فِعْل مَجْهُوْل হতে, কারণ উদ্দেশ্য মু'মিনগণ, আর তারা হলো مَرْهُوْبٌ مِنْهُمْ (যাদেরকে ভয় করে) رَاهِبُوْنَ [যারা ভয় করে] নয়। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মু'মিনদের গুণাবলি আলোচনা করেছেন। অতঃপর এখানে ধোঁকাবাজ মুনাফিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। যারা মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করে মু'মিনগণের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। পরে তাদের সঞ্চিত ধোঁকাবাজি করেছিল। –[সাফওয়া]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন বনূ নাযীর গোত্রকে অবরুদ্ধ করতে ছিলেন এবং বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখনই তাদের দলীয় নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করল যে, আমরা সর্বদা তোমাদের পক্ষে কাজ করবো এবং তোমাদের সহানুভূতি করতে থাকব। যদি তোমাদেরকে মুসলমানগণ দেশান্তর করে দেয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে দেশান্তর হয়ে যাবো। তবে দু' হাজার সৈনিক এখন তোমাদের জন্য পাঠাচ্ছি। যখন সময় ঘনীভূত হলো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমণ করল, তখন মুনাফিকদের সেসব অঙ্গীকারের কোনো ফল দেখা গেল না। তাদের সে অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ .... يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কি দেখনি সে মুনাফিকদেরকে যারা আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে,...।" এখানে اَلَّذِيْنَ نَافَقُوْا বলে ইমাম সুদ্দীর মতে বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযা হতে যারা মুনাফিক হয়েছিল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [রূহুল মা'আনী]। তবে অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল, রেফায়া ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত মুনাফিকগণ পূর্বে ইহুদি ছিল না– তারা আনসারীদের মধ্যে ছিল, তাহলে কিভাবে يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمْ "তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে" একথা বলা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়? এ প্রশ্নের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া হয়েছে–

১. মুনাফিক এবং ইহুদিদেরকে পরস্পর ভাই এ জন্য বলা হয়েছে যে, উভয়েই একই সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের অবিশ্বাসী। মুসলমানগণ যেমন পরস্পর ভাই اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ তেমনি নবুয়তে অবিশ্বাসী কাফিররা সকলে পরস্পর ভাই– যেমন বলা হয়, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ

২. তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্য-সহযোগিতা ছিল, যার ফলে তাদের একদলকে অপর দলের ভাই বলা হয়েছে।

৩. তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতায় একে অপরের সাথে শরিক ছিল। যার ফলে তাদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে।

৪. আকিদা-বিশ্বাসে পারস্পরিক মিল ছিল বলে তাদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে। -[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : এখানে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ বলে আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে বনূ নাযীরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে কাফের এ জন্য বলা হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রতি কুফরি করেছিল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত তারা স্বীকার করত না বলে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ .... اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ : মুনাফিক সর্দার ইহুদি বনূ নাযীর গোত্রকে মুসলমানদের অবরোধ কালে যে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছিল এবং তাদের মনে সান্ত্বনা দান করেছিল এ উক্তিতে তাই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ দলপতিগণ বলেছিল, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তাহলে শপথের সাথে বলছি আমরা কালবিলম্ব না করেই তোমাদের সাথী হিসেবে স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত হবো। কারণ তোমরা বহিষ্কৃত হওয়া আর আমরা বহিষ্কৃত হওয়া একই কথা। আর এখন যা বলছি তা বহাল থাকবে। যদি কোনো প্রবঞ্চনাকারী আমাদেরকে তোমাদের বিপক্ষে প্রবঞ্চনা দ্বারা তোমাদের থেকে বিরত রাখতে চায়, তথাপিও তা আমরা কস্মিনকালেও মানবো না। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিবনা। আর যদি তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও অথবা হত্যাকাণ্ডে আটকে পড়ো তাহলে শপথের সাথে বলছি, আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। তাদের এ সব আশা সম্পূর্ণরূপে ধোঁকা মাত্র। আল্লাহ বলেন, তারা এ অঙ্গীকার কখনো পূরণ করবে না, অতীতেও এমনভাবে বহু ধোঁকা দিয়েছে। এরা মিথ্যাবাদী বলে আল্লাহ স্বয়ং বলে দিচ্ছেন। আল্লাহর উক্ত ঘোষণায় ইহুদি বনূ নযীরদের অন্তরে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হলো। কারণ এ অঙ্গীকার যদি সত্যই মিথ্যা হয়ে থাকে তবে ইহুদিগণ পরাজয় বরণ করা অনিবার্য। আর মুসলমানদের অন্তরে এতে অত্যন্ত খুশি সঞ্চার হয়েছে। কারণ এতে মুসলমানদের পক্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ : আয়াতের এ অংশের অর্থ হলো "যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এ মুনাফিকরা ইহুদিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, তাহলেও তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে এবং ইহুদিদেরকে তাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে যাবে।" কারণ পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা ইহুদিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না; সুতরাং এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কিভাবে তা ঘটতে পারে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন? এ প্রশ্ন এড়াবার জন্য আয়াতের অর্থ "যদি ধরে নেওয়া হয় যে ...." করা হয়েছে। যুজাজ এ আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, যদি তারা ইহুদিদের সাহায্য করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে পরাজিত হয়ে। অতঃপর ইহুদিরা বিজয়ী হতে পারবে না যখন তাদের সাহায্যদাতাগণ পরাজিত হবে। কোনো কোনো মুফাসসির ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ -এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ ঘটনার পর মুনাফিকরা আর কখনও বিজয়ী হতে পারবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তাদের নিফাক কোনো কাজে আসবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুনাফিকরা ইহুদিদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে আসেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। আর কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং সাহায্য অব্যাহত রাখবে না। তবে প্রথম অর্থই উত্তম অর্থ বলে মনে হয়। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের চারিত্রিক দুর্বলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আর অত্র আয়াতসমূহে তাদের অবস্থার আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ .... لَا يَفْقَهُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা মরদে মুজাহিদ, তোমাদের ভিতর ও বাহির এক, তোমাদের অন্তরে আল্লাহ রয়েছেন। তাই তারা তোমাদেরকে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক মনে করে। মূলত কাকে ভয় করতে হবে এটাও তাদের বিবেচনার বহির্ভূত। এ কারণেই তাদের অন্তরে একে অপরের জন্য ভালোবাসা জন্মাতে পারে না। তাদের অন্তরে এ ভয়ও রয়েছে যে, তোমরা তাদের কোনো গুপ্ত ব্যাপারে অবগত হয়ে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পার।

উক্ত আয়াতে فِىْ صُدُوْرِهِمْ -এর মধ্যে هُمْ -এর مَرْجِعْ মুনাফিকগণও হতে পারে। তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে- এ মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদের ভয় সর্বাধিক।

অথবা, هُمْ-এর مَرْجِعْ কেবলমাত্র ইহুদিগণ হতে পারে। তখন অর্থ হবে– ইহুদিগণের অন্তরে তোমরা আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভয়ের কারণ।

অথবা, هُمْ-এর প্রত্যাবর্তন স্থল উভয় সম্প্রদায় হতে পারে। তখন তোমরা অধিক ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নিতান্ত কম বরং আল্লাহর শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে তারা অনবহিত। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ : এখানে মুনাফিকদের প্রথম দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলমানগণ! ইহুদি সম্প্রদায় সাহসহীন গোত্র, তোমাদের সাথে কি করে একাকী যুদ্ধ করতে সাহস করবে; বরং গোটা ইহুদি জাতি মিলেও তোমাদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। তবে যদি তাদের বাসস্থানে কোথাও কিল্লা তৈরিকৃত থাকে, অথবা দালানের আড়ালে থেকে, নতুবা জমিনে গর্ত খনন করে তাতে লুকিয়ে যুদ্ধ করতে সাহস করবে। যেমনিভাবে খায়বার ইত্যাদিতে যুদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং হে মুসলিম জাতি! তোমরা কখনো ভয় করো না যে, তাদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হবে। তারা যুদ্ধ ক্ষমতায় খুবই দুর্বল জাতি; এদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাদের অন্তরে আল্লাহ তোমাদের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। –[আশরাফী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুনাফিক ও ইহুদিগণের দুর্বলতার আর একটি দিক তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, তারা একক শক্তিসম্পন্ন জাতি নয়। তাদের মধ্যে একতার অভাব রয়েছে। যদিও তোমরা তাদেরকে একদল ও এক খেয়ালের বলে মনে কর। তা ভুল ধারণা, তারা একই দলভুক্ত কেবলমাত্র মুনাফেক হওয়ার লক্ষ্যেই হয়েছে, তারা কেবলমাত্র এ জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিল যে, নিজেদের নগরের উপর মুহাম্মদ ﷺ -এর দল (বহিরাগত হিসেবে) কর্তৃত্ব করতে না পারে। তাদের স্বদেশীদের জন্য মদীনাবাসীগণ সর্বস্ব বিলীন করতে দেখে তাদের অন্তরে যেন শেল পড়েছিল। এ অসহনীয় হিংসা অন্তরে ঢুকে পড়ার কারণে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আশে পাশের ইসলামের দুশমন লোকদের সাথে যোগ সাজস করে কোনো না কোনোভাবেই বহিরাগত প্রতিপত্তি (মুসলমান) নির্মূল করে দেওয়ার লক্ষ্যে একজোট হয়েছিল। এটাই ছিল তাদের একমাত্র নেতিবাচক। তারা একত্রিভূত হওয়ার জন্য এটা ব্যতীত অন্য নেতিবাচক বিষয় কিছুই ছিল না। প্রত্যেক গোত্রপতিরই আলাদা আলাদা এক একটা বাহিনী ছিল। প্রত্যেকেই স্বীয় মাতাব্বুরী চালাবার জন্য সচেতন ছিল। প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না; বরং সত্য কথা এই যে, প্রত্যেকেরই জন্যে অন্যদের প্রতিপত্তি ছিল হিংসা ও বিদ্বেষ, এ কারণেই যাকে তারা সকলের শত্রু মনে করেছিল, তাকে উৎখাত করার জন্য পারস্পরিক শত্রুতা সাময়িকের জন্যও ভুলতে সক্ষম ছিল না।

তাদের এ আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই তারা মুসলমানদেরকে দেয়ালের পিছন থেকে যুদ্ধ করার ভয় দেখায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের একে অপরের দুশমন হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى আয়াত পেশ করেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালত সত্যতার অসংখ্য নাজির তাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ভাসার পরও তারা সেসব প্রমাণসমূহকে অকাট্য দলিলরূপে বোধগম্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা করছে। –[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١٥. كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا بِزَمَنٍ قَرِيْبٍ وَهُمْ اَهْلُ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ج عُقُوْبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِي الْاٰخِرَةِ مَثَلُهُمْ اَيْضًا فِيْ سِمَاعِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَتَخَلُّفِهِمْ عَنْهُمْ

১৫. তাদের পূর্ববর্তীগণের ন্যায়। অতি সম্প্রতি স্বল্প কিছুকাল পূর্বে। তারা বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকগণ। যারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে জাগতিক শাস্তি। আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি কষ্টদায়ক, আখেরাতে। তদ্রূপ মুনাফিকদের নিকট হতে শ্রবণ করা ও তাদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করার উদাহরণ হলো।

١٦. كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ كِذْبًا مِنْهُ وَ رِيَاءً.

১৬. শয়তানের ন্যায় যখন সে মানুষকে বলে, কুফরি করো। অতঃপর যখন সে কুফরি করে তখন সে বলে "আমি তোমার থেকে সম্পর্কমুক্ত, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' মিথ্যা ও রিয়াকারীর সাথে এ রূপে বলে থাকে।

١٧. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَيِ الْغَاوِيْ وَالْمُغْوِيْ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ اِسْمُ كَانَ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম অর্থাৎ ভ্রষ্টকারী ও ভ্রষ্ট। অপর এক কেরাতে পেশ যোগে كَانَ -এর اِسْم রূপে পঠিত হয়েছে। এই হবে যে, তারা উভয়ই জাহান্নামী। তারা তথায় চির অবস্থানকারী। এটাই জালিমদের প্রতিফল কাফেরদের।

١٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১৮. হে মু'মিনগণ আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে কিয়ামত দিবসের জন্য। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তৎসম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٩. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ تَرَكُوْا طَاعَتَهُ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اَنْ يُقَدِّمُوْا لَهَا خَيْرًا اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

১৯. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে তাঁর ইবাদত বর্জন করেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন যে, তারা নিজের জন্য পুণ্য অগ্রিম পাঠাবে। তারাই পাপাচারী।

٢٠. لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

২০. দোজখবাসী ও বেহেশতবাসী সমপর্যায়ের নয়। বেহেশতবাসীগণই কৃতকার্য।

٢١. لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ وَجُعِلَ فِيْهِ تَمْيِيْزٌ كَالْاِنْسَانِ لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مُتَشَقِّقًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ الْمَذْكُوْرَةُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ.

২১. আমি যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম এবং তাতে মানুষের ন্যায় পার্থক্য– জ্ঞান দান করা হতো তবে তুমি তাকে দেখতে বিনীত ও বিদীর্ণ বিখণ্ডিত, আল্লাহর ভয়ে । আর এ সকল উদাহরণ উল্লিখিত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে এবং ঈমান আনয়ন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ : قَرِيْبًا তারকীবে ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অন্য আর এক মতে ذَاقُوْا শব্দ قَرِيْبًا ক্রিয়ার مَفْعُوْل فِيْهِ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ : كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ এ বাক্যটি অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, مُبْتَدَأْ مَحْذُوْف-এর خَبَرْ আর সে مُبْتَدَأْ বা বিলুপ্ত مُبْتَدَأْ টি হলো مَثَلُهُمْ সুতরাং উহ্য বাক্যটি হবে– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ -

কোনো কোনো নাহুবিদের মতে, كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ এ বাক্যটি দ্বিতীয় خَبَرْ তখন তার এ দুই خَبَرْ-এর মধ্যে حَرْف - وَاوْ عَطْف-কে حَذْف করা হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে।

قَوْلُهٗ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكَ : জমহুর اِنِّىْ-এর ى-কে سَاكِنْ করে পড়েছেন। নাফে', ইবনে কাছীর ও আবূ ওমর ى-এ فَتْح সহকারে পড়েছেন।

قَوْلُهٗ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا : জমহুর عَاقِبَتَهُمَا শব্দটি كَانَ-এর خَبَرْ আর اَنَّهُمَا فِى النَّارِ-কে كَانَ-এর اِسْم হিসেবে عَاقِبَتَهُمَا তে نَصَبْ সহকারে পড়েছেন। হাসান ও আমর ইবনে উবাইদ عَاقِبَتُهُمَا তে رَفْع দিয়ে অর্থাৎ اِسْمِ كَانَ হিসেবে পড়েছেন।

قَوْلُهٗ خَالِدِيْنَ فِيْهَا : خَالِدِيْنَ শব্দটি জমহুর حَالْ হিসেবে مَنْصُوْب পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ, আ'মাশ, যায়েদ ইবনে আলী ও ইবনে আবী আবলী اَنَّ-এর خَبَرْ হিসেবে خَالِدَانِ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদি সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে ভয় করার বিষয় বর্ণনা ছিল। আর উক্ত আয়াতে তাদেরকে শয়তানের সাথে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাদের উদাহরণ সে লোকদের মতো, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলা হয়েছে যে, ইহুদি বনূ নাযীরের উদাহরণ সে লোকদের মতো যারা নিকট-অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। 'নিকট-অতীতে শাস্তি ভোগ করেছে' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে সাধারণত দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

এক. মক্কার কুরাইশদের সে কাফিরগণ যারা ইতঃপূর্বে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের সত্তরজন লোক নিহত হয়, আর সত্তরজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। তারা ইসলাম, মুসলমান ও নবীর বিরোধিতা করে এ রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক তেমনি বনূ নাযীরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। এটা হযরত মুজাহিদের অভিমত।

দুই. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হলো, যারা ইতঃপূর্বে শাস্তিভোগ করেছে তারা হলো ইহুদি বনূ কায়নুকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর মদীনার ইহুদিদের সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন তার একটি শর্ত ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের কোনো শত্রুকে ইহুদিরা কোনো প্রকার সাহায্য করবে না; কিন্তু এ চুক্তির কয়েক মাস পরে ইহুদি বনূ কায়নুকা এ শর্তের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। বদর যুদ্ধের সময় তারা মক্কার কাফিরদের সাথে গোপন যোগসাজশ করে। এ ঘটনার পর একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে বলে দেওয়া হয় "চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো সম্প্রদায় হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা যায়, তাহলে আপনি শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারেন।" এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনেরো দিন পর তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল, আমাদের সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে সিদ্ধান্তই নিবেন আমরা তাই মেনে নেবো।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুরুষগণকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন কিন্তু মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণ রক্ষার আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হবে, আর তাদের ধন-সম্পদ গনিমতের মালে পরিগণিত হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কায়নুকা মদীনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যায়।
ঠিক বনূ কায়নুকার মতো বনূ নাযীরকেও মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। সুতরাং তাদের উদাহরণ যথার্থই বনূ কায়নুকার মতোই হয়েছে। -[মা'আরেফুল কুরআন, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]
এ শাস্তি তো তারা এ দুনিয়াতে ভোগ করেছে, পরকালেও তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ ...... اِلٰى رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ : উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করেছেন। যারা বনূ নাযীর গোত্রকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সিদ্ধান্ত অবমাননা করার জন্য উত্তেজিত করেছিল এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ বাঁধলে সাহায্য করার অঙ্গীকার দিয়েছিল। মূলত যখন মুসলমানগণ বনূ নাযীরকে ঘেরাও করে বসেছেন তখন মুনাফিকগণের অঙ্গীকার দানকারীগণ কেউই সাহায্যার্থে এগিয়ে আসল না। তাকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন যে, শয়তান মানুষকে যখন আল্লাহর সাথে কুফরি ও নাফরমানি করার জন্য প্রভাবিত করে, তখন বলে وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ আমি তোমাদের হিতৈষী। অতঃপর যখন কুফরি করে বসে তখন সে উত্তর দেয়- اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ অর্থাৎ পরিশেষে সে আর কাফিরকে পাত্তা দেয় না। অতঃপর কাফির জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কালামুল্লাহ -এর সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ - (مَعَارِفُ الْقُرْآنِ)

তাফসীরে তাহের গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শয়তান কিয়ামতের দিনও এমন কথা বলবে।
বদরের যুদ্ধের দিনও জনৈক ব্যক্তি কাফেরের বেশে কাফেরদেরকে উত্তেজিত করার পর প্রচণ্ড সংঘর্ষ কালে এই (উপরে উল্লিখিত আয়াত মোতাবেক) বলে দূরে সরে গেছে, পলায়ন করেছে। এরূপে অন্যকে ফাসিয়ে নিজে চম্পট দেওয়াই তার কাজ। শয়তানের ন্যায় বনূ নাযীরদেরকেও এমনিভাবে উত্তেজিত করতে থাকে। অবশেষে যখন বনূ নযীরের বিপদ ঘনিয়ে আসল এবং দুঃসময় শুরু হলো হয়, তখন তারা নিজ নিজ ঘরে বসে থাকে। আর ঐ সময় মনে হয় যেন বনূ নাযীরের লোকদের সাথে কোনো কালেই তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শয়তানের ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলদের অলিগণ কুফরি করার প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাছীর ইত্যাদি গ্রন্থে বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।
এতদ সংক্রান্ত ঘটনা : বনী ইসরাঈলদের একজন রাহেব সর্বদা নিজ খানকাহ শরীফে থেকে দিনে রোজা রাখতেন ও সারা রাত্র ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। এভাবে তাঁর ৭০ বৎসর কেটে গেল। তখন শয়তান তাঁর পিছনে পড়ল। শয়তান তাকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় অতি বড় ধোঁকাবাজ একটি শয়তানকে ঐ রাহেবের সম্মুখে অতি বড় অলির বেশে ইবাদতে লিপ্ত করে দিল। অতঃপর রাহেব এ অবস্থা দেখে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল যে, সে তার চেয়েও বড় দরবেশ। তৎপর সে শয়তান রাহেবকে এমন কিছু আশ্চর্য ফলপ্রদ দোয়া শিখিয়ে দিল যা পড়ে ফুঁক দিলে রোগ মুক্ত হয়ে যায়। এরপর শয়তান কিছু সংখ্যক লোককে রোগাক্রান্ত করে চিকিৎসার জন্য ঐ রাহেবের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত এবং রাহেব দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে দিলে শয়তান তার প্রভাব আক্রান্ত ব্যক্তি হতে সরিয়ে দিল, অতঃপর রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

এ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান তার সর্দারের একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের উপর উক্ত প্রভাব বিস্তার করে তাকে রোগাক্রান্ত করে দিল এবং রাহেবের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়ে গেল। পরিশেষে উক্ত রাহেব সে মেয়েটির উপর আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে জেনা করে বসল এবং মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেল। তখন লজ্জার ভয়ে রাহেবকে শয়তান যুক্তি দিয়ে গর্ভবতী মেয়েটিকে হত্যা করিয়ে ফেলল। তখন মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন বিচারের জন্য আসল এবং রাহেবকে হত্যা করে শূলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেলল। এরপর শয়তানটি রাহেবের নিকট গিয়ে তাকে বলল, এখন তোমার প্রাণ রক্ষার কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। তবে যদি তুমি আমাকে সিজদা কর তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। অতঃপর রাহেব শয়তানকে সিজদা করল। তখনই শয়তান বলে উঠল– اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ الخ উক্ত ঘটনাটি এখনে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবী গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا ..... الظّٰلِمِيْنَ : উক্ত আয়াতটি একটি বিশেষ আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, শয়তান ও শয়তানের অনুসারী উভয় ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত হলো জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে চিরকাল বসবাস করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা দুরাত্মা জালিমদের শাস্তি এটাই নির্ধারণ করে রেখেছেন। اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ الخ –[তাফসীরে আশরাফী]

হযরত মোকাতেল (র.) বলেন, মুনাফিক এবং ইহুদিদের পরিণাম ছিল মানুষ এবং শয়তানের পরিণামের মতো, অর্থাৎ জাহান্নামী। (কাবীর) শয়তান এবং মানুষ কাফেরের পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। –[ফাতহুল কাদীর]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরা হাশরের শুরু থেকেই মুনাফিক, ইহুদি ও কাফের মুশরিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তির বর্ণনা এবং তাদের উদাহরণ পেশ করার পর সূরার শেষাংশে মু'মিনদেরকে সতর্কবাণী দান ও সৎকাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেন তাদের অবস্থা পূর্বে উল্লিখিত লোকদের অবস্থার মতো না হয়। –[সাফওয়া, মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ" الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ঈমানদার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলি প্রতিপালনের মাধ্যমেই আল্লাহকে ভয় করে চলো। দু'দিন পূর্বে হোক অথবা পরে হোক ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। মৃত্যুর পেয়ালা সকলকেই পান করতে হবে। لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর পরের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে আগামী দিনের জন্য আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর কিয়ামতের আসন্ন ও অশেষ দিনের জন্য কে কি অর্জন করেছে ভেবে দেখ। আর জেনে রাখো, আল্লাহ ও রাসূলের তাঁবেদারী, তাঁদের মর্জি মোতাবেক নিজের আচরণ গড়ে তোলা ইত্যাদিই পরকালের জন্য মূলধন। এ পুঁজি যে যত বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করতে পার সে তত বেশি সৌভাগ্যবান।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মালিক ইবনে দীনার (র.) বলেন, বেহেশতের দরজায় এ কথাটিও লিপিবদ্ধ রয়েছে– وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا رَبِحْنَا مَا قَدَّمْنَا خَسِرْنَا مَا خَلَفْنَا –[মা'আরিফ, তাহির, মাদারিক]

তাকওয়ার নির্দেশ দু'বার প্রদান করার কারণ : উক্ত আয়াতে তাকওয়া সম্বন্ধে দু'বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বলা হয়– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে– وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তার কারণ হচ্ছে– প্রথমবার ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক যাবতীয় সৎকর্ম অর্থাৎ ফরায়েয ওয়াজিবাত ইত্যাদি আদায় করার প্রতি তাকিদ প্রদান করে তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– فَقَالَ تَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

দ্বিতীয়বার যাবতীয় পাপাচার হতে মানবতাকে নিষ্কলুষ বা মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছে– فَقَالَ تَعَالٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ –[মা'আরিফ, কাবীর]

অর্থাৎ তাকওয়ার নির্দেশ বারংবার দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহভীতির প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। কেননা নাহুবিদগণের নীতিমালা অনুসারে اَلتَّكْرَارُ لِلتَّاكِيْدِ তাকওয়ার প্রসঙ্গে হযরত মালিক ইবনে দীনার (রা.) আরও বলেন–

اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ اَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ لِاَنَّهٗ قَرَنَ بِمَا هُوَ عَمَلٌ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ تَرْكِ الْمَعَاصِىْ لِاَنَّ قَرَنَ بِمَا هُوَ مَجْرَى الْوَعِيْدِ – (كَمَا فِىْ مَدَارِكِ التَّنْزِيْلِ)

কোনো কোনো মুফাসসির تَأْوِيْل করে বলেন, প্রথম তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা আল্লাহর প্রেরিত আহকামগুলোর অনুসরণে পরকালীন জীবনের সম্বল তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা বলা হয়েছে যে, তোমরা যে সকল সম্বল প্রেরণ করছ তা অকৃত্তিম ও পরকালে চলমান ও মূল্যায়ন হবে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য করো?

পরকালে অচল সম্বল বলে তাই গণ্য হবে। যে আমল দৃশ্যত তা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়নি; বরং কোনো নাম, যশ বা মানবিক স্বার্থের বশীভূত হয়ে করা হয়েছে।

অথবা, আমলটি দৃশ্যত নয়, বরং ধর্ম তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তা মূলত পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় তাকওয়ার শব্দটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পরকালের জন্য দৃশ্যত (রিয়াকারী) ইবাদত সম্বল হিসেবে যথেষ্ট নয়। –[মা'আরেফুল কোরআন]

কিয়ামত দিবসকে اَلْغَدُ (আগামীকাল) নামকরণের কারণ : এ আয়াতে কিয়ামত বুঝাবার জন্য غَدٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। কিয়ামতকে غَدٌ তথা আগামীকাল কয়েকটি কারণে বলা হয়েছে–

১. কিয়ামতকে আগামীকাল বলা হয়েছে কিয়ামত সুনিশ্চিত বুঝাবার জন্য, যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে না। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার পর কিয়ামতের আগমনও সুনিশ্চিত, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। –[ফাতহুল কাদীর]

২. কিয়ামতকে নিকটবর্তী বুঝাবার জন্য। আজকের পর আগামীকাল যেমন নিকটে, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও নিকটে। –[কাবীর]

৩. কিয়ামত দিবসকে আগামীকাল বলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝাতে চান যে, যে ব্যক্তি আজকের আনন্দ-ফুর্তি ও স্বাদ-আস্বাদনে নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, কালকে তার নিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবার ও মাথা গুঁজাবার জন্য ঠাঁই থাকবে কিনা তার চিন্তাও করে না। সে লোকটি যেমন অজ্ঞ, মূর্খ ও অপরিণামদর্শী তেমনি সে লোকটি নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারে যে লোক নিজের ইহজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে উদাসীন হয়ে যায় অথচ প্রকৃতপক্ষে পরকাল ঠিক তেমনিভাবে অবশ্যই আসবে যেমন আজকের পর আগামীকাল অবশ্যই আসবে।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ الاية বাক্যে نَفْس শব্দটিকে 'নাকেরা' ব্যবহার করার ফায়েদা : এখানে نَفْس শব্দটিকে نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্ট ব্যবহার করে প্রত্যেক নাফ্স বা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি লক্ষ্য করুক সে আগামীকাল কিয়ামতের জন্য কি কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ ..... الْفٰسِقُوْنَ : উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বিভিন্ন তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১. আল্লামা আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, উক্ত আয়াতখানি "যেমন কর্ম তেমন ফল" প্রবাদের ন্যায় বলা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কীয় কাজকর্মগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে এবং তাঁর আদেশ নিষেধগুলোর অবমাননা করেছে তাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। সুতরাং পরকালের মঙ্গলার্থে তারা কোনো কাজ আল্লাহর কৃপায় করে যেতে পারেনি।

২. কেউ বলেন, তার অর্থ ও তাফসীর এই যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহর জিকির ইত্যাদি ভুলে গেছে। অতঃপর তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর কার্যসমূহ করতে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. কেউ কেউ [ইমাম রাযী (রা.)] বলেন, যারা আল্লাহর হক সম্পর্কীয় কার্য করতে ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের নিজদের হক হতে তাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

৪. কারো মতে, উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো যারা নিজেদের সুদিনে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে, অতএব তাদের দুর্দিনেও আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ দ্বারা আয়াতে কাদেরকে সাব্যস্ত করা হলো? : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ফাসিক বলে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা হলো, যারা কবীরা গুনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে থাকে। অথবা, আল্লাহর যে কোনো প্রকার নির্দেশ অবমাননাকারীগণই আয়াতের উদ্দেশ্য। –[কাবীর, সাবী]

আল্লামা তাহের (র.) বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا الخ আয়াতের অর্থ হলো, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারা নিজেদের হিতাহিত ভালোমন্দ বুঝে উঠতে পারছে না, তাদের মতো হতভাগ্য কেউ নেই। তাদের কপালে চরম দুর্ভোগ ও আল্লাহর আজাব অনিবার্য। খবরদার, খবরদার, মু'মিনরা তোমরা তাদের মতো হয়ো না। আল্লাহকে ভুলে থেকে নিজেদের চরম সর্বনাশ ডেকে এনো না।

قَوْلُهُ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ মা'আরিফুল কোরআন গ্রন্থে উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ফলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি; বরং তারা নিজেরাই ক্ষতির দায়ে এত গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেছে যা তাদের কখনো ধারণা করাও সম্ভব হয়নি।

قَوْلُهُ "لَايَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ ..... الْجَنَّةِ (الاية) : প্রথমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য যা কল্যাণকর তার প্রতি তাদেরকে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ বলে আহ্বান করার পর কাফিরদের اَلَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ বলে ধমক দান করেছেন, অতঃপর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেছেন لَايَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ (الاية) "দোজখবাসী ও বেহেশতবাসী সমপর্যায়ের নয়, বেহেশতবাসীগণই কৃতকার্য।"

এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বজন স্বীকৃত এবং সর্বজ্ঞাত, তা সত্ত্বেও এরকম স্থানে তার উল্লেখকরণের উদ্দেশ্য হলো এ পার্থক্যের গুরুত্বের প্রতি সচেতন করা।

জিম্মি হত্যার বদলায় মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না বলে শাফেয়ীদের এ আয়াত হতে দলিল গ্রহণ : শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে বলেছেন যে, কোনো মুসলমানকে কোনো জিম্মি হত্যার কেসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দোজখবাসী [অর্থাৎ কাফের] আর বেহেশতবাসী [অর্থাৎ মুসলমান] সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং কাফের জিম্মি হত্যার বদলায় মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।

তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ এ ইস্তিদ্‌লালকে অসার মনে করে থাকেন। কারণ এ আয়াতে আখেরাতে জান্নাতবাসী এবং দোজখবাসীর মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান আলোচনা করা উদ্দেশ্য, দুনিয়াবী ব্যাপারে পার্থক্য বলা এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা জিম্মির কেসাসের দলিল দান যথার্থ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَوْ اَنْزَلْنَا .... لَرَاَيْتَهُ (الاية) : উপরে দোজখবাসী এবং জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না এ কথা বলে মু'মিনদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য কাজ করতে নসিহত করা হয়েছে। এ আয়াতে যে কুরআন এত সুন্দর সুন্দর নসিহত সম্বলিত সে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ (الاية) "আমরা যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে পেতে।"

অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের যদি আকল-জ্ঞান থাকত– যেমন মানুষের রয়েছে, অতঃপর তার উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হতো তাহলে তোমরা মানুষেরা দেখতে পেতে যে, পর্বত আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে এবং দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে।" সুতরাং তোমাদেরও উচিত কুরআনের নসিহত গ্রহণ করা, কুরআনের বিধান মেনে চলা। কারণ তোমাদের আকল-জ্ঞান রয়েছে।

কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা একটি রূপক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহর বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব এবং তাঁর সমীপে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বাধ্য-বাধকতার কথা কুরআন মাজীদে যেভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পর্বতের ন্যায় বিরাট সৃষ্টিও যদি তার সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারত এবং মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে নিজের আমলের জন্য যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে তা যদি সে জানতে পারত, তা হলে ভয়ে-আতঙ্কে সে কেঁপে উঠত। কিন্তু মানুষের নিশ্চিন্ততা ও চেতনাহীনতা অধিক বিস্ময়কর। তারা কুরআন বুঝে এবং তার সাহায্যে সেসব কিছুর মূলতত্ত্ব ও যথাযথ ব্যাপার জানতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না। যে বিরাট দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তারা আল্লাহর নিকট কি জবাবদিহি করবে সে বিষয়ে এক বিন্দু চিন্তা তাদেরকে প্রকম্পিত করে না; বরং দেখা যায় কুরআন শুনে কিংবা পড়ে উহা হতে তারা এক বিন্দু প্রভাব গ্রহণ করে না। মনে হয় তারা মানুষ নয় নিষ্প্রাণ-নির্জীব ও চেতনাহীন পাথর মাত্র। দেখাশুনা ও উপলব্ধি করা যেন তাদের কাজই নয়। মানুষের এ অবস্থা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক।

উদাহরণ দানের উদ্দেশ্য : এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন, "আমি এ সব দৃষ্টান্ত মানুষের উপকারের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে এবং উপকৃত হয়।" অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ দেখে এবং তাঁর একত্বের দলিল দেখতে পেয়ে তারা যেন ঈমান আনে। এ উদ্দেশ্যে কুরআনের এ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

২২. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ .

২৩. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الطَّاهِرُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ السَّلَامُ ذُو السَّلَامَةِ مِنَ النَّقَائِصِ الْمُؤْمِنُ الْمُصَدِّقُ رُسُلَهٗ بِخَلْقِ الْمُعْجِزَةِ لَهُمْ الْمُهَيْمِنُ مِنْ هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ اِذَا كَانَ رَقِيْبًا عَلَى الشَّيْءِ اَىِ الشَّهِيْدُ عَلٰى عِبَادِهٖ بِاَعْمَالِهِمْ الْعَزِيْزُ الْقَوِىُّ الْجَبَّارُ جَبَرَ خَلْقَهٗ عَلٰى مَا اَرَادَ الْمُتَكَبِّرُ ط عَمَّا لَايَلِيْقُ بِهٖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ نَزَّهَ نَفْسَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ .

২৪. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُنْشِئُ مِنَ الْعَدَمِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْاَحْسَنِ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تَقَدَّمَ اَوَّلَهَا .

অনুবাদ :

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়। তিনি করুণাময় ও পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, পুত-পবিত্র। তাঁর শানের উপযোগী নয়, এমন বস্তু হতে পবিত্র। তিনিই নিরাপদ দোষ-ত্রুটি হতে নিরাপদ ও মুক্ত। তিনিই সত্য প্রতিপন্নকারী রাসূলগণের জন্য মু'জিযা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদেরকে সত্য প্রতিপন্নকারী। তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী শব্দটি هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ হতে নিষ্পন্ন, যখন কোনো বস্তুর উপর রক্ষক নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ স্বীয় বান্দাগণের আমল রক্ষাকারী। তিনিই শক্তিধর শক্তিশালী তিনিই পরাক্রমশালী সৃষ্টির বিকৃতিকে স্বীয় ইচ্ছার আলোকে সংশোধনকারী। তিনিই মহিমান্বিত যা তাঁর শানের অনুপযোগী তা হতে। আল্লাহ পবিত্র তিনি স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। তারা যা অংশী সাব্যস্ত করে তা হতে তাঁর সাথে।

২৪. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দানকারী। আকৃতিদানকারী। তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ নিরানব্বই নাম যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর حُسْنٰى শব্দটি اَحْسَنُ শব্দের مُؤَنَّثْ স্ত্রীলিঙ্গ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। সূরার প্রারম্ভে এ সকল শব্দের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قُدُّوْسٌ : জমহুর قُدُّوْسٌ শব্দটির ق এ পেশ দিয়ে পড়েছেন। আবূ যর ও আবূ ছাম্মাক উভয়ই فَتْحٌ এ- ق দিয়ে পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ : জমহুর এ শব্দটি مِيْم -এ كَسْرَةْ দিয়ে اَلْمُؤْمِنُ পড়েছেন। অর্থাৎ اَمْنٌ হতে اِسْمُ فَاعِلْ পড়েছেন। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন শব্দটির মীমে فَتْحٌ দিয়ে اَلْمُؤْمَنُ পড়েছেন। অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْلْ পড়েছেন। আবূ

খাতেমের মতে এভাবে এ শব্দটিকে পড়া বৈধ নয়। কারণ তখন অর্থ হয়ে যায় যে, তিনি ভীত ছিলেন কেউ তাঁকে নিরাপত্তা বিধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শানে এ কথা বলা যায় না। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ الْمُصَوَّرُ : হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) এ শব্দটি اَلْبَارِئُ শব্দের مَفْعُوْلٌ بِهٖ হিসেবে مُصَوَّرَ অর্থাৎ وَاوْ এবং رَاء এ-نَصَبْ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ .... الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ" : এমন মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন মা'বূদের ইবাদত করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার আর কারো নেই, অথবা থাকতেও পারে না। সৃষ্টিজগতে সৃষ্টির নিকট যা অস্পষ্ট ও গোপন তিনি তাও অবগত আছেন, আর যা তার নিকট সুস্পষ্ট ও সু-প্রকাশিত সে বিষয়েও তিনি জ্ঞাত। যে সম্বন্ধে কারো অবগত হওয়া অসম্ভব, সে বিষয়েও তিনি অবগত আছেন। যা দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে তাও তাঁর নিকট স্পষ্ট। ইহকাল ও পরকালে তাঁর রহমত ও দয়ার ভাণ্ডার মাখলুকাতের জন্যই। উক্ত আয়াত হতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বান্দাগণ যা কিছু করে থাকে সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সবকিছু করা হয়। যেভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লাহর জন্য সর্বকিছু নিবেদিত করে থাকে। আর সকল নবীগণ ও রাসূলগণকে প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাঁর ইবাদত করা كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ সুতরাং সকলেই উক্ত আয়াতের লক্ষ্যে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধ্য থাকতে হবে। তথাপিও হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মক্কার নাস্তিকদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত প্রদানের কাজে বের হলেন, তখন তারা তা শুধু অবিশ্বাস করত না; বরং তাদের মক্কাগৃহে তৈরিকৃত ৩৬০ খোদার পূজায় মত্ত থাকত। সেগুলোকে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষক মনে করত। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন– اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا তারা কি এক ইলাহ -এর পরিবর্তে বহু খোদা নির্মাণ করেছে? অরো বলেন– او اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا তারা কি এমন কিছু সংখ্যক খোদা বানিয়ে নিয়েছে যারা কিছুই তৈরি করতে ক্ষমতা রাখে না।

উক্ত আয়াতে عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। হযরত সাহাল (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। কারো মতে, এর অর্থ যা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। কেউ কেউ বলেন, যা বান্দাগণ জেনেছে আর যা শুনেনি ও জানেনি সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ শব্দদ্বয় আল্লাহর গুণবাচক নাম, এগুলো اَلرَّحْمَةُ শব্দমূল হতে নির্গত হয়েছে।

–[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ .... الرَّحِيْمُ : عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এ বাক্যের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো 'গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে প্রাজ্ঞ।' সাহাল বলেছেন, এর অর্থ হলো 'আখেরাত এবং দুনিয়া সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ 'যা ঘটেছে এবং যা ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছু সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। আর কারো মতে اَلْغَيْبُ -এর অর্থ হলো 'যা বান্দা জানে না' আর اَلشَّهَادَةُ -এর অর্থ 'যা তারা জেনেছে এবং দেখেছে।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

اَلرَّحْمٰنُ অর্থাৎ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অর্থ 'তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু' এগুলো হলো আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম অর্থাৎ اَلرَّحْمٰنُ এবং اَلرَّحِيْمُ হলো আল্লাহ তা'আলার নাম, আর এ দু'টি যে মূল হতে উদ্গাত (অর্থাৎ اَلرَّحْمَةُ) তাহলো আল্লাহ তা'আলার গুণ বা সিফাত।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ কে তাকরার করার উদ্দেশ্য : "তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।" এ কথাটি পুনর্বার উল্লেখ করার কারণ হলো, তার প্রতি গুরুত্বদান। কারণ এতে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আর এটাই হলো তাওহীদের মূলকথা। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জিনজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ -এর মধ্যকার পার্থক্য : এ দু'টি শব্দ আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. اَلرَّحْمٰنُ শব্দের মধ্যে রহমতের আধিক্য রয়েছে, আর اَلرَّحِيْمُ -এর মধ্যে কিছুটা কম রয়েছে।

২. اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে اَلرَّحِيْمُ শব্দটি অন্যের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দু'টি শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতিসূক্ষ্ম।

৪. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়, আর রহীম বলা হয় তাঁকে যিনি পরকালে দয়া করবেন।

৫. হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, যিনি আসমান বাসীর প্রতি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়, আর যিনি দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করেন তাঁকে রাহীম বলা হয়।

৬. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, রহমান তিনিই যাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি স্বীয় বান্দার চাহিদা পূরণ করেন। আর রাহীম তিনিই যাঁর নিকট চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।

৭. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, রহমানের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় তোমার প্রতি দয়াবান। আর রাহীমের অর্থ হলো তিনি সকল বালা-মসিবত থেকে বান্দার হেফাজতকারী।

৮. কারো মতে, রহমান অর্থ হলো যিনি দোজখ থেকে নাজাত দান করেন, আর রাহীম অর্থ যিনি বান্দাকে বেহেশত দান করেন।

৯. কারো মতে রাহীম তিনি, যিনি মানুষের অন্তরে দয়া সৃষ্টি করেন। আর রহমান তিনি যিনি মানুষের দুঃখ দূর করেন।

১০. কেউ বলেন, যিনি মানুষের পাপসমূহ ক্ষমা করেন তিনি রাহীম, আর যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তিনি রহমান।

১১. কেউ কেউ বলেন, যিনি মানুষকে পাপসমূহ থেকে রক্ষা করে ইবাদতের তৌফিক দান করেন তিনি রহমান, আর যিনি পরকালের বিষয়ে দয়া করেন তিনি রাহীম।

১২. কারো মতে, যিনি পরকালের বিষয়ে দয়া করেন তিনি রাহীম, আর যিনি দুনিয়া জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন তিনি রহমান। –[নূরুল কুরআন]

قَوْلُهُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ .... اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি (আল্লাহ) মালিক বাদশাহ, অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি-নিরাপত্তা, শান্তি-নিরাপত্তাদাতা সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধানে শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী।

اَلْمَلِكُ – শব্দের অর্থ– বাদশাহ, নিরঙ্কুশ অধিনায়ক, শুধু اَلْمَلِكُ শব্দ ব্যবহার হওয়ায় তার অর্থ হয় তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিপতি, বাদশাহ, সবকিছুরই প্রকৃত মালিক তিনি। তাঁর এ মালিকানায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া অন্যান্য যারা মালিকানার দাবিদার প্রকৃতপক্ষে তাদের মালিকানা আল্লাহ তা'আলার দান।

اَلْقُدُّوْسُ – এ শব্দটি মুবালিগার সীগাহ বা আতিশয্যবোধক শব্দ, قُدْس -এর মূল। তার অর্থ সব রকমের দোষমুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি হতে পবিত্র। আর قُدُّوْسٌ -এর অর্থ এমন সত্তা যিনি কোনোরূপ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা, কিংবা অশোভনতা ও অসুচিতা হতে অনেক অনেক দূরে। মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কুদ্দূস হতে পারে না। অন্য কাউকেও আল্লাহর ন্যায় কুদ্দুস মনে করা হলে তা হবে শিরক।

اَلسَّلٰمُ – আল্লাহ তা'আলাকে এখানে 'সালাম' বলা হয়েছে। সালাম অর্থ– শান্তি, নিরাপত্তা। আল্লাহ কিভাবে 'সালাম' তার তিন রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহ 'সালাম' মানে আল্লাহ তা'আলার জুলুম হতে স্বীয় সৃষ্টিকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখেন। ২. যিনি সর্বপ্রকারের দোষ এবং দুর্বলতা হতে নিরাপদ ও মুক্ত। ৩. যিনি নিজের বান্দাদেরকে জান্নাতে 'সালাম' দাতা। যেমন, আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন– سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ কেউ কেউ বলেছেন, 'সালাম' মানে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে শান্তিদাতা। –[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাকে اَلسَّلٰمُ বলার তাৎপর্য হলো তিনি পুরোপুরি নিরাপদ, তা হতে কোনোরূপ বিপদ বা দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে পারে না অথবা তাঁর পরিপূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতায় কখনও ভাঙ্গন বা ভাটা পড়তে পারে, এটা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

اَلْمُؤْمِنُ – এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এটার অর্থ হয় আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর বিশ্বাসী। আর যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক। অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকারের আজাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন। –[মা'আরিফ]

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু তিনি নিরাপত্তা কাউকে দেন এটার উল্লেখ না হওয়ার কারণে স্বতই সমগ্র সৃষ্টিলোক এবং সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই এটার অন্তর্ভুক্ত বুঝায়।

اَلْمُهَيْمِنُ – এর তিনটি অর্থ, ১. পাহারাদার ও সংরক্ষণকর্তা। ২. পর্যবেক্ষক, এটা হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ এবং মুজাহিদের অভিমত। ৩. যিনি সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সদা কর্মতৎপর।

اَلْعَزِيْزُ – এ শব্দ এমন এক মহাপরাক্রমশালী সত্তা বুঝায়, যাঁর বিরুদ্ধে কেউই মাথা জাগাতে পারে না। যাঁর সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই। যার সম্মুখে অন্য সকলই নিঃশক্তি, অসহায় ও অক্ষম। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْجَبَّارُ – এ শব্দটি جَبْرٌ হতে উদ্গত, অর্থ– জোর করা ও শক্তি প্রয়োগ করা; কিন্তু তার আসল অর্থ সংশোধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ। جَبَّارٌ শব্দটি মুবালিগার সীগাহ অর্থাৎ আতিশয্যবোধক শব্দ। আল্লাহ তা'আলাকে جَبَّارٌ বলা হয়েছে এ অর্থে যে, তিনি তাঁর এ বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা বল প্রয়োগপূর্বক যথাযথ করে থাকেন; সুস্থ, সঠিক ও সবল করে রাখেন। এ ছাড়া জাব্বার শব্দের বিরাটত্ব ও মহানত্বের অর্থও নিহিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

اَلْمُتَكَبِّرُ – বড়ত্ব প্রকাশকারী, বড়াইকারী। প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী সে বড় হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে বড় মনে করা, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, বড়াই করে বেড়ানো। এটা মিথ্যা এবং গুনাহের কাজ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্বের দাবি করা মানে আল্লাহর বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি করা। –[মা'আরিফ, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : উপরে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি এবং নামসমূহের আলোচনার পর বিশেষত আল্লাহ তা'আলার মুতাকাব্বির গুণের আলোচনার পর বলা হয়েছে, "আল্লাহ পবিত্র মহান সে শিরক হতে যা লোকেরা করছে।"

এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষেরা যে মিথ্যা বড়ত্বের দাবি করে এবং মিথ্যা অহমিকার প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি করে, সেসব হতে আল্লাহ পবিত্র মহান। –[কাবীর]

বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, অর্থাৎ তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা-এখতিয়ার এবং গুণাবলিতে কিংবা তাঁর মূল সত্তায় অন্যকোনো সৃষ্টিকে তাঁর শরিকদার যারাই মনে করে মূলতই তারা একটা অযৌক্তিক কথা বলে। কোনো দিক দিয়েই এবং কোনো অর্থেই কেউ তাঁর শরিক হবে– এটা হতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

সংশয় নিরসন : এখানে কারো কারো মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে সে প্রশ্নটি হলো, এখানে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলির আলোচনা হয়েছে ঠিক সেসব গুণাবলি কোনো কোনো সৃষ্টির জন্যও কুরআনের অন্যত্র আছে বলে প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন, উপরে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ বলে যে رَحْمَةٌ বা দয়া আল্লাহর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে, অন্যত্র এ رَحْمَةٌ বা দয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও প্রমাণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ –

এ আয়াতে রাসূলের জন্য رَحْمَةٌ এবং رَاْفَةٌ গুণ দু'টি স্বীকার করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র এই رَاْفَةٌ গুণটি আল্লাহ তা'আলার আছে বলে দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ অতএব, এটা আল্লাহর গুণে রাসূলকে শরিক করা নয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাওহীদের আলিমগণ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা رَحْمَةٌ এবং رَاْفَةٌ গুণ দু'টি দ্বারা গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ গুণ দু'টি দ্বারা গুণান্বিত, তবে আল্লাহর গুণ এবং রাসূলের গুণের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, যেমন আল্লাহ এবং রাসূলের যাতের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার رَحْمَةٌ এবং رَاْفَةٌ নিজস্ব, আর রাসূলের رَحْمَةٌ এবং رَاْفَةٌ হলো আল্লাহ প্রদত্ত। অন্যান্য সিফাত বা গুণাবলি সম্বন্ধেও ঠিক একথা বলতে হবে।

আল্লাহর নাম এবং গুণাবলি পর্যালোচনার পদ্ধতি : আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলি সম্বলিত যেসব আয়াত বা হাদীস রয়েছে, সে সবের পর্যালোচনার পদ্ধতি হলো, সেসব গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার আছে বলে স্বীকার করা। তবে উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলি পর্যালোচনার সময় দু'টা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে–

১. কোনো সৃষ্টির সাথে আল্লাহর গুণাবলিকে তুলনা করা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা চলবে না। কারণ, আল্লাহ বলেছেন– فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" –[নাহল– ৭৪]

২. যেসব গুণাবলি স্বয়ং আল্লাহ নিজের জন্য আছে বলে স্বীকার করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জন্য আছে বলে দাবি করেছেন সেসব গুণাবলি আছে বলে স্বীকার করা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, প্রথমে আল্লাহর সদৃশ অস্বীকার করা হয়েছে অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দু'টি গুণ স্বীকার করা হয়েছে। এক, সর্বশ্রোতা দ্বিতীয়, সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং এ দুই সিফাত বা গুণ সম্বন্ধে বলতে হবে আল্লাহর শুনা এবং দেখা কোনো সৃষ্টির দেখা আর শুনার মতো নয়, বরং আল্লাহর দেখা এবং শুনা হলো আল্লাহর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিজস্ব।

বাকি গুণাবলি সম্বন্ধেও এ কথা বলতে হবে। অর্থাৎ সদৃশবিহীন স্বীকার করতে হবে এবং আল্লাহর যাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনো সৃষ্টির কোনো গুণকে তাঁর গুণের সাথে তুলনা করা চলবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى : সূরা হাশ্‌র -এর শেষোক্ত অংশে বর্ণিত আল্লাহর কয়েকটি সিফাতী নাম সম্পর্কে এখনো আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, বারী, মুসাওয়্যির অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা হতে শুরু করে বিশেষ আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে অস্তিত্ব স্থাপন হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নির্মাণ ও লালনের অধীন, কোনো জিনিসই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অস্তিত্বশীল অথবা তার নির্মাণ ও লালনে অন্য কারো এক বিন্দু দখল নেই। এ পর্যায়সমূহ একের পর এক এসে থাকে। প্রথম পর্যায় হলো خَلْقٌ -এর অর্থ– পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাণ নির্ণয় ও পরিকল্পনাকরণ। যেমন কোনো প্রকৌশলী একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম সংকল্প গ্রহণ করে যে, এ বিশেষ উদ্দেশ্য এ ধরনের ও রককমের একটি প্রাসাদ তৈরি করতে হবে। তখন মনের পর্দায় একটি চিত্র চিন্তা করে, উদ্দেশ্যানুসারে প্রস্তাবিত প্রাসাদের বিস্তারিত রূপ কি হবে তা সে চিন্তার রং তুলি দিয়ে মনের পর্দায় রূপায়িত করে নেয়। কুরআনের পরিভাষায় এ পর্যায়ের যাবতীয় কাজকে خَلْقٌ বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে بَرْأٌ শব্দ, এর মূল অর্থ– ভিন্ন করা, ছিন্ন করা, দীর্ঘ করা, ছিড়ে আলাদা করে দেওয়া। خَالِقٌ স্বীয় পরিকল্পিত চিত্রকে কার্যকর করে যে জিনিসের চিত্র সে চিন্তা করেছে তাকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হতে মুক্ত করে অস্তিত্বের আলোকে টেনে আনে। এ কারণে خَالِقٌ [খালেক] শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে بَارِئٌ শব্দ বলা হয়েছে এবং তা এ অর্থেই বলা হয়েছে। যেমন প্রকৌশলী প্রাসাদের যে চিত্র মানসপটে এঁকেছিল তদনুযায়ী সে যথাযথ পরিমাপ অনুযায়ী মাটির উপর চিত্র ও রেখা অংকন করে। তার উপর মূল ভিত্তি খোদাই করে প্রাচীর বানায় ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ একের পর এক করে যায়। এটাও ঠিক তেমনি।

তৃতীয় পর্যায়ে হলো তাসবীর تَصْوِيْر এর অর্থ– আকার, আকৃতি, রচনা, এখানে এর অর্থ একটি জিনিসকে তার চূড়ান্ত রূপে বানিয়ে দেওয়া। এ তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ও মানবীয় কাজের মধ্যে কোনোই সদৃশ নেই।

অতঃপর اَلْمُصَوِّرُ -এর অর্থ আকৃতি সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি দান করেছেন যার কারণে তা অপর একটি সৃষ্টি হতে অন্য প্রকার আকার আকৃতি ধারণ করে এবং তা চেনা যায়। পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতকে পৃথক পৃথক আকৃতি দ্বারা চেনা যায়। তা চাই আসমানি হোক চাই জমিনী হোক। অতঃপর তাতে প্রকারভেদে প্রত্যেক প্রকারের আকৃতি প্রকৃতি এবং মানবীয় একই জাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতির গঠন পদ্ধতির বিবর্তন, আর যে কোনো পুরুষ ও স্ত্রী জাতের চেহারার পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গঠন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এ সকল পরিবর্তন একমাত্র একই সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ কুদরতের বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাতে কারো কোনো ক্ষমতার যৌথ ব্যবহার করা হয়নি।

সুতরাং যেভাবে غَيْرُ اللّٰهِ-এর জন্য تَكَبُّر জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে تَصْوِيْر سَازِيْ তথা সৃষ্টিজগতের আকৃতি তৈরি করার ক্ষমতায়ও দ্বিতীয় কারো জন্য হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নয়। কারণ এগুলো আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট গুণ। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى : আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ভালো ভালো [উৎকৃষ্ট] নামসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কালামে আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের কোনো সংখ্যা নির্ধারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি, তবে সহীহ সনদ সম্পন্ন হাদীস শরীফে তার একটি সূচি পেশ করা হয়েছে। যেমন, তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে ৯৯টি নাম গণনা করা হয়েছে। তবে এগুলোতে সীমিত নয়, বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলিম ও ফকীহ, মুফাসসিরগণের মতে এসব নাম সাদৃশ্য ও তুলনাবিহীন বরং আল্লাহ তা'আলার নিজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে যে সকল নাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো আল্লাহর কাছে সাদৃশবিহীন অবস্থায় আছে বলে আমরা স্বীকার করি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞাত আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকবে। বিকৃতকারীদের ব্যবহৃত বিকৃত নামের দ্বারা তাঁকে ডাকবে না। তাঁর নামের বিকৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকারের মাধ্যমে অর্থের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, অথবা বাতিল প্রভুদের নাম ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার اَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-এর উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুনাজাতে মাকবুল নামক কিতাবের প্রথমাংশে মা'আরেফুল কোরআন গ্রন্থকারের একটি পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। -[মা'আরিফ]

আল্লাহকে এমন নামে ডাকা জায়েজ হবে কিনা যা তিনি ও তাঁর রাসূল ﷺ বলেননি : আল্লাহ তা'আলার গুণ প্রকাশক যে সকল নাম তিনি নিজের জন্য দাবি করেননি, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও দাবি করেননি, সে সকল নামে তাঁকে আহ্বান করা যাবে কি?

উক্ত প্রশ্নের সমাধানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর মত হলো, যে সকল নাম কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি, সে সকল নামে তাঁকে আহ্বান করা জায়েজ হবে না। তবে আরবি নামের অন্য ভাষায় অর্থকরণ ও ব্যাখ্যা করা অন্যকথা। কারণ অন্য নামে আল্লাহকে ডাকতে গেলে এমন নামে ডাকার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা তার ইজ্জত এবং সম্মানের উপযুক্ত নয়। এ কারণেই ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন- لَا يُوْصَفُ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ اَوْ وَصَفَهٗ بِهٖ رَسُوْلُهٗ لَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ

অর্থাৎ যে গুণবাচক নামে আল্লাহ নিজকে নামকরণ করেছেন বা তাঁর রাসূল তাঁকে নামকরণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য নামে তাঁকে নামকরণ করা যাবে না এবং এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের ব্যতিক্রম করা চলবে না। وَهٰكَذَا عَقِيْدَةُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ (র.)-এর অভিমত। (هٰكَذَا فِيْ عَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِ وَالْاِمَامِ الْمَاتُرِيْدِيْ - شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ وَغَيْرِهَا)

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُسَبِّحُ لَهٗ ..... الْحَكِيْمُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আসমান-জমিনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর তাসবীহ করে, আর তিনি অতীব প্রবল, মহাপরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।' অর্থাৎ কথা ও অবস্থার ভাষায় বলছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকারের দোষত্রুটি, দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার তাসবীহের আলোচনা করে এ সূরা আরম্ভ করা হয়েছিল, আবার তাসবীহের আলোচনার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তাসবীহ পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ এবং তাই মূল উদ্দেশ্য। -[সাবী]

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ : সূরা আল-মুমতাহিনাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ –

"যে সব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবি করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে।" উপরিউক্ত فَامْتَحِنُوْهُنَّ শব্দ হতে সূরার নামকরণ اَلْمُمْتَحِنَةُ (আল-মুমতাহিনাহ) করা হয়েছে। এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহিনাহ' করা হয়েছে অর্থাৎ ইমতিহান হতে ইসমে ফায়েল, যার অর্থ– পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা। আর কেউ কেউ এর উচ্চারণ মুমতাহানাহ করেছেন অর্থাৎ ইসমে মাফউল, যার অর্থ– সে স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

অত্র সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল মোয়াদ্দা। এতে ১৩টি আয়াত, ৩৪৮টি বাক্য এবং ১৫১০ টি অক্ষর রয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবিদার হলেও কাফেরদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, আর এ সূরায় মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা কাফিরদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। –[রুহুল মা'আনী]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় এমন দু'টি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে কাফেরদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটা জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ দু'টি ব্যাপার উল্লেখে এ কথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. এ সূরার প্রথমে শুরু হতে ৯ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া যিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তার নিন্দা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে– এ দুনিয়ার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং সম্পর্ক পরকালে কোনো কাজে আসবে না। পরকালে কেবল ঈমান এবং আমলে সালেহই কাজে আসবে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের আদর্শ হতে শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়েছে। –[সাফওয়া]

২. ১০ নং এবং ১১ নং আয়াত দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাটি ছিল এই যে, মক্কায় বহুসংখ্যক মুসলিম নারীর স্বামী কাফের ছিল। তারা কোনো না কোনো উপায়ে হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হতেন। অনুরূপভাবে বহুসংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফির আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কিনা? সে সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে সে সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখা।

৩. ১২ নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোক ইসলাম কবুল করবে তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সঙ্গে এ কথারও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলময় নিয়মনীতি, আইন-কানুন অনুসরণ ও পালন করে চলতে তারা বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

৪. সূরার শেষ আয়াত অর্থাৎ ১৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও প্রথম দিকের আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

সূরাটির শানে নুযূল : তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী ও খতীব গ্রন্থের বর্ণনা মতে উক্ত সূরার শানে নুযূল হচ্ছে– হযরত কোশাইরী ও ছা'আলাবী (রা.) বর্ণনা করেন ৮ম হিজরিতে হুযূর ﷺ মদীনা শরীফ হতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য গুপ্তভাবে কিছু সংখ্যক ছাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি হতে লাগলেন। সারাহ নামক একজন মহিলা ছিল। হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়ে উক্ত সারাহ নামক মহিলার মাধ্যমে একটি পত্র মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক মহিলাটি মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন এবং তাও অবহিত করে দিলেন যে, অমুক স্থানে এই এই আকৃতি প্রকৃতির বার্তাবাহক একটি মহিলাকে পাওয়া যাবে। তার নিকট অবশ্যই চিঠি রয়েছে। তাকে অবশ্যই ধরে আনতে হবে। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.)-কে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তাকে পাওয়া মাত্রই তার থেকে চিঠি নিয়ে আসবে। তখন হযরত আলী (রা.) উক্ত মহিলাকে যথাস্থানে গিয়ে পেলেন এবং চিঠি খোঁজ করলে প্রথমত মহিলাটি তা অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.) বললেন, আমরাও সত্য বলছি এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সত্যই বলেছেন, তোমার সাথে হাতিব (রা.)-এর লিখিত পত্র রয়েছে। সুতরাং তা তাড়াতাড়ি বের করে দাও। অন্যথায় তোমাকে উলঙ্গ করে চিঠি বের করবো।

এ ধমকি দেখে মহিলাটি ভয়ে তার চুলের খোপা হতে পত্রখানা বের করে দিলেন। অতঃপর হযরত আলী ও জোবায়ের (রা.) তা এনে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছালেন। এরপর হযরত হাতিব (রা.)-কে ডাকানো হলে তিনি উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত মিনতির সুরে শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার, মুনাফিক নই। দীন ইসলামের জন্য আমার আত্মা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ইসলামের সাথে শত্রুতার মানসে এ পত্র লিখিনি; বরং তার কারণ এই যে, আমার ছোট ছোট সন্তানগণ মক্কায় রয়ে গেছে। তাদের ভালোবাসার কারণে আমার হতে এহেন কার্য ঘটেছে? এ কাজের বদৌলতে আমার বাচ্চাকাচ্চাগণকে তারা রক্ষণাবেক্ষণ করতে মর্জি করবে। হযরত হাতিব (রা.)-এর বর্ণনা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নির্দেশ দেন তবে এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিতে চাই।

উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, ওমর এটা কখনো হয় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বদরের মুজাহিদগণের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়াহ আমার সাথে বদরের ময়দানে শরিক ছিল। আর বদরের অংশীদার সকলকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং আরও বলেছেন– اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ সুতরাং তাকে ক্ষমা করা যায়। এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) থেমে গেলেন এবং তার চক্ষু যুগল থেকে কান্নার পানি বের হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হযরত হাতিব (রা.) বলেন, মুসলমান ও ইসলামের ক্ষতির লক্ষ্যে আমি এ পত্র লিখিনি। সুতরাং হাতেব (রা.)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সূরা নাজিল হলো। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-মুমতাহিনাহ মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثَ عَشَرَ اٰيَةً : ১৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ تُوْصِلُوْنَ اِلَيْهِمْ قَصْدَ النَّبِىِّ ﷺ غَزْوَهُمُ الَّذِىْ اَسَرَّهُ اِلَيْكُمْ وَ وَرّٰى بِحُنَيْنٍ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَيْهِمْ كِتَابًا بِذٰلِكَ لِمَالِهِ عِنْدَهُمْ مِنَ الْاَوْلَادِ وَالْاَهْلِ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسْتَرَدَّهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ اَرْسَلَهُ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَهُ بِذٰلِكَ وَقَبِلَ عُذْرَ حَاطِبٍ فِيْهِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ج اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَالْقُرْاٰنِ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ مِنْ مَكَّةَ بِتَضْيِيْقِهِمْ عَلَيْكُمْ. اَنْ تُؤْمِنُوْا اَىْ لِاَجْلِ اَنْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا لِلْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِىْ.

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা সংবাদ প্রেরণ করবে পৌঁছাবে তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্কল্প বিষয়ে, মক্কাবাসী কাফিরগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা প্রসঙ্গে যা তিনি তোমাদেরকে গোপনভাবে অবহিত করেছেন এবং বাহ্যত খায়বরের দিকে 'তাওরিয়া'– ভান করেছেন। বন্ধুত্বের কারণে তোমাদের ও তাদের মধ্যে পরস্পর। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া এ বিষয়ে মক্কাবাসী কাফেরদের নিকট একটি চিঠি লিখেছিল। যেহেতু তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন মুশরিকদের সাথে ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে অবগত হয়ে উক্ত চিঠি ফেরত আনিয়ে নেন এবং হাতিবের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে অর্থাৎ দীন ইসলাম ও কুরআন মাজীদ। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে মক্কা হতে, তোমাদের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এ কারণে যে, তোমরা ঈমান আনয়ন করেছ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান আনয়নের কারণে। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি। যদি তোমরা বের হয়ে থাক জিহাদে জিহাদের জন্য আমার পথে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبْلَهُ اَىْ فَلَا تَتَّخِذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ اَىْ اِسْرَارَ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْهُدٰى وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسْطُ .

ইতঃপূর্বেকার বক্তব্য শর্তের জওয়াবের প্রতি নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে গোপনীয়ভাবে বন্ধুত্ব করেছ, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, আমি সম্যক অবহিত। আর তোমাদের মধ্য হতে যে তা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিকল্পনা গোপনে তাদেরকে খবর দিবে সে সরল পথ বিচ্যুত হবে হেদায়েতের পথ হতে বিভ্রান্ত হবে سَوَاءٌ শব্দটি মূলত 'মাঝামাঝি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : এ বাক্যটি تَتَّخِذُوْا -এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। তাকে اَوْلِيَاءَ -এর صِفَتْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলা যেতে পারে। তখন এ বাক্যটি বন্ধুত্বের কারণের ব্যাখ্যা হবে। একে جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ ও বলা যেতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ : এ বাক্যটি تُلْقُوْنَ -এর فَاعِلْ হতে বা لَاتَتَّخِذُوْا -এর فَاعِلْ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। একে جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ ও বলা যেতে পারে, তখন একে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনাকারী বাক্য বলতে হবে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ : জমহুর بِمَا جَاءَكُمْ অর্থাৎ ب সহকারে পড়েছেন। জুহদারী এবং আসেম হতে এক বর্ণনায় لَمَّا جَاءَكُمْ অর্থাৎ لَامْ সহকারে দেখা যায়।

قَوْلُهُ جِهَادًا وَابْتِغَاءً : এ শব্দদ্বয় মানসূব হওয়ার কারণ হলো, শব্দদ্বয় خَرَجْتُمْ ক্রিয়া হতে مَفْعُوْل لَهْ হয়েছে। অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ لِاَجْلِ الْجِهَادِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ অর্থাৎ যদি তোমরা জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো।
–[কাবীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ..... اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে নির্দেশ প্রদান করছেন, যেন তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রুদের সাথে বন্ধুসুলভ ভাব দেখায়ো না এবং তাদেরকে তোমরা সহায়ক মনে করিও না। আর বন্ধুত্বের কারণে তোমরা তাদেরকে সংবাদ আদান প্রদান করে থাক।

উক্ত আয়াতের ইঙ্গিতে এটাই প্রকাশিত হয় যে, কাফেরদের নিকট বার্তা সম্বলিত পত্র লিখন অর্থ তাদের সাথে বন্ধুত্বের পরিচয় দান করা মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ -শিরোনাম পেশ করে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর শত্রু ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা অমার্জনীয় অপরাধ এবং মুসলমানদের সাথে এটা মারাত্মক ধোঁকাবাজি, সুতরাং তোমরা তা হতে বেঁচে থাক।

আর এটাও বুঝিয়েছেন যে, যতক্ষণ কাফের কুফরির মধ্যে এবং মুসলমান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর বন্ধু হতে পারে না। কারণ মুসলমানগণ আল্লাহর বন্ধু হয়ে তাঁর শত্রুদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে– اَلْاِيْمَانُ وَالْكُفْرُ مُتَضَادَّانِ অথচ ঈমান কুফরির বিপরীত।

আর ঈমানদারগণকে বলা হয়েছে, تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ অর্থাৎ তোমরা কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্বের আচরণসুলভ বার্তা পাঠাও যদিও হযরত হাতিবের অন্তরে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের পরিচয় ছিল না। তথাপিও এ পত্র দ্বারা প্রকাশ্য বন্ধুত্বের পরিচয় বহন করে। সুতরাং মুসলমানদেরকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ তোমাদের সাথী সত্যই বলেছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ –[মা'আরিফ]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহর বাণী– قَوْلُهُ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -এর অর্থ প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ভাব পেশ করা। কারণ মূলত হযরত হাতিব -এর আত্মা বিশুদ্ধ ছিল, নিফাক তার ছিল না, এর প্রমাণ স্বয়ং মহানবী ﷺ -এর বাণী– اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ صَدَقَ এটাই তার মুসলমান থাকা ও সহীহ আত্মাসম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ। –[খতীব]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَقَدْ كَفَرُوْا .....اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ : উক্ত আয়াতে কাফেরগণ মুসলমানগণের শত্রু এবং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর শত্রু হওয়ার কারণ দর্শানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফেরগণ আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সত্যের নাফরমানি করেছে বিশেষত ঈমানদারদেরকে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বীয় মাতৃভূমি ও বাসস্থান হতে বিতাড়িত করে দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন করেছে, যিনি তোমাদের অর্থাৎ সকল ঈমানদার তথা সকল মানবজাতির প্রভু।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ (حَقٌّ) দ্বারা পবিত্র কুরআন অথবা ইসলাম উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আর তাদের মুসলমানদের সাথে শত্রুতার মূল কারণ এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানরা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করেছ। এতে ইহকালীন লাভ ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ কস্মিনকালেও ঈমান থাকা সত্ত্বে কাফেরদের সহচর ও বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) যে ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, কাফেরদের নিকট বার্তা পৌঁছিয়ে কিছু ইহসান করবো, যাতে তারা আমার পরিবার-পরিজনের উপর কিঞ্চিৎ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে, এ ধারণা সরাসরি বিভ্রান্তি মাত্র। কেননা কাফেরগণের সাথে তোমাদের ঈমানদারদের শত্রুতার একমাত্র কারণ যেহেতু ঈমান, আল্লাহ না করুক, তোমাদের ঈমান কখনো বিধ্বংস হওয়ার পূর্বে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের আশা পোষণ করা কেবল ধোঁকাবাজি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ ..... مَرْضَاتِيْ : আল্লাহ বলেন, যদি তোমাদের হিজরত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কাফির যে আল্লাহর দুশমন, তার থেকে কি করে তোমরা শান্তি ও সহানুভূতি আশা করতে পার।

উক্ত আয়াতাংশটি শর্তস্বরূপ, সুতরাং তার জাযা আবশ্যক। তবে তা কোথায় বা কি এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, পূর্ব বর্ণিত বাক্য لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ তার জাযা, অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন– তার জাযা উহ্য রয়েছে। আর উপরিউক্ত অংশ জাযা হলে তখন তার অর্থ এভাবে হবে যে,

لَا تَتَّخِذُوْا اَعْدَائِيْ اَوْلِيَاءَ اِنْ كُنْتُمْ اَوْلِيَائِيْ .

শত্রুতা ও ভালোবাসা পরস্পর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ কিভাবে বললেন? : এটার প্রতি উত্তরে বলতে হবে, কাফেরগণ ঈমানদারদের শত্রু কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের লক্ষ্যেই। তবুও দুনিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে ঈমানদারদের সাথে কাফেরদের ভালোবাসা স্থাপন করা জায়েজ রয়েছে। তাই আল্লাহ এটা হতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وَحْدَةَ النِّسْبَةِ مِنَ الْوَاحِدَةِ الثَّمَانِ وَحَيْثُ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ তাই قَوْلُهُ عَدُوِّيْ শব্দ বলে আল্লাহ ক্ষান্ত হতে পারেননি; বরং عَدُوَّكُمْ শব্দও উল্লেখ করেছেন, যাতে তাদের মরুয়াতের পরিচয় বিলীন হয়ে যায়, নতুবা عَدُوِّيْ শব্দ বলা দ্বারাই ঈমানদারদের শত্রু বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর এটাও বুঝাবার উদ্দেশ্য যে, তারা আল্লাহর শত্রু, ঈমানদারদের শত্রু হোক, বা না হোক। –[রুহুল বয়ান]

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হুকুম : কাফেরদের সাথে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন– লেনদেন, সামাজিক আচার-আচরণ, বেচাকেনা, সন্ধিচুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা বা তাদের সাথে আপোষ করা কোনোক্রমেই মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের চিরন্তন শত্রু। সুতরাং তারা কোনো দিনই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অধিক অবহিত রয়েছি। অথচ তোমরা ধারণা পোষণ করেছিলে যে, তোমরা ধূর্ত। অথচ তোমরা জেনে রাখবে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই আমার সামনে সমান। আর তোমরা যা অস্পষ্ট রাখবে তা আমি স্বীয় রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে দেবো। –[মাদারেক]

قَوْلُهُ اَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ এটা আল্লাহ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ হওয়ার জন্য দলিল স্বরূপ, যেভাবে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

এখানে اَعْلَمُ শব্দটিকে مُضَارِعْ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ -এর অর্থ করলে "আমি অবগত আছি" অর্থ হবে। অন্যথায় بِصِيْغَةِ تَفْضِيْلِ পড়লে অধিক অর্থে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ আমি সবচেয়ে অধিক অবগত আছি। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ .... سَوَاءَ السَّبِيْلِ : وَمَنْ يَفْعَلْهُ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ আগত বিষয়গুলো হতে যে কোনো একটি যেমন হতে পারে, তেমনি এক সাথে তিনটিও হতে পারে; ১. কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন; ২. ভালোবাসার বার্তা প্রেরণ, ৩. গোপনে পরামর্শ দান বা মুসলমানদের গোপন সংবাদাদি জানিয়ে দেওয়া। –[কাবীর]

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ বাক্যেরও দু'টি অর্থ হতে পারে–

এক. "সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।" এটা হযরত মুকাতিল (র.)-এর অভিমত।

দুই. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হলো, اِنَّهُ عَدَلَ عَنْ قَصْدِ الْاِيْمَانِ فِيْ اِعْتِقَادِهِ অর্থাৎ সে তার আকীদায় ঈমানের পথ হতে বিপথগামী হয়েছে।

অনুবাদ :

২. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَظْفَرُوا بِكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ بِالسَّبِّ وَالشَّتْمِ وَ وَدُّوا تَمَنَّوا لَوْ تَكْفُرُونَ .

২. তারা যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে তোমাদের উপর জয়লাভ করে তবে তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং তোমাদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করবে হত্যা ও প্রহারের মাধ্যমে ও জবান দরাজী করবে মন্দের সাথে গাল-মন্দ বলার মাধ্যমে। আর তারা কামনা করবে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও।

৩. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ قَرَابَتُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ج الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ لِأَجْلِهِمْ أَسْرَرْتُمُ الْخَبَرَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج يَفْصِلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ بَيْنَكُمْ ط وَبَيْنَهُمْ فَتَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

৩. তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিকটাত্মীয়গণ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের মুশরিক সন্তান-সন্ততিগণ, যাদের কারণে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন সংবাদ প্রেরণ করেছ পরকালীন শাস্তির মোকাবিলায়। কিয়ামতের দিন, আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন শব্দটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে। তখন তোমরা বেহেশতবাসী হবে আর তারা কাফেরদের সাথে দোজখবাসী হবে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, তা প্রত্যক্ষকারী।

৪. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ أَيْ بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ج مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاؤُا جَمْعُ بَرِيْءٍ كَظَرِيْفٍ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ أَنْكَرْنَاكُمْ . وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ وَاوًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ .

৪. তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে أُسْوَةٌ শব্দটি দু' স্থানেই হামযার মধ্যে যের ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, এর অর্থ আদর্শ। ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে অর্থাৎ তাঁর বাণী ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং যারা তার সঙ্গে রয়েছে মু'মিনগণ হতে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিল, আমরা সম্পর্কমুক্ত بُرَاؤُا শব্দটি ظَرِيْف -এর ওযনে بَرِيْءٌ -এর বহুবচন তোমাদের হতে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের হতে। আমরা তোমাদের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করেছি তোমাদের অস্বীকার করেছি। আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো সার্বক্ষণিক শব্দটি উভয় হামযা বহাল রেখে ও দ্বিতীয়টিকে ওয়াও দ্বারা পরিবর্তন করে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যাবৎ তোমরা একক আল্লাহর উপর ঈমান আন, তবে ব্যতিক্রম শুধু তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব ।

مُسْتَثْنٰى مِنْ اُسْوَةٍ اَىْ فَلَيْسَ لَكُمُ التَّأَسِّىْ بِهٖ فِىْ ذٰلِكَ بِاَنْ تَسْتَغْفِرُوْا لِلْكُفَّارِ وَقَوْلُهٗ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ اَىْ مِنْ عَذَابِهٖ وَثَوَابِهٖ مِنْ شَىْءٍ ط كَنّٰى بِهٖ عَنْ اَنَّهٗ لَايَمْلِكُ لَهٗ غَيْرُ الْاِسْتِغْفَارِ فَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلَيْهِ مُسْتَثْنٰى مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِهٖ مِمَّا يَتَاَسّٰى فِيْهِ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاسْتِغْفَارُهٗ قَبْلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ بَرَاءَةٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ مِنْ مَقُوْلِ الْخَلِيْلِ وَمَنْ مَّعَهٗ اَىْ وَقَالُوْا ـ

এটা اُسْوَةٌ হতে مُسْتَثْنٰى অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিনি তোমাদের আদর্শ নন যে, তোমরাও কাফেরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাঁর এ উক্তি যে, আর আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অধিকারী নই অর্থাৎ তাঁর শাস্তি ও ছওয়াবের ব্যাপারে। কোনো কিছুই এটা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুর অধিকারী নন। সুতরাং এ বক্তব্যটি পূর্বোক্ত لَاَسْتَغْفِرَنَّ-এর উপর عَطْف-এর অন্তর্ভুক্ত যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ বক্তব্যটি আয়াত قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا-এর ভিত্তিতে অনুসরণীয় ও আদর্শ। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনাটি– সে আল্লাহর শত্রু– এটা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেকার বিষয়। যেমন, সূরা বারাআতের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি ও তোমারই মুখাপেক্ষী হয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনগণের উক্তি। অর্থাৎ তাঁরা বলেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ বাক্যটিকে উহ্য جَوَابُ شَرْطٍ-এর উপর আতফ করা হয়েছে। অথবা একে পুরো جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ-এর উপর আতফ বলতে হবে, আবূ হাইয়ান একে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ : يَفْصِلُ শব্দটি জমহুর يُفْصَلُ অর্থাৎ يَاءْ তে ضَمَّةٌ এবং فَاءْ তে سَاكِنْ দিয়ে আর صَادْ এ فَتْح দিয়ে مَجْهُوْل করে পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এ কেরাতকে পছন্দ করেছেন।

আসেম একে يَفْصِلُ অর্থাৎ يَاءْ তে فَتْح এবং صَادْ এ كَسْرَةٌ দিয়ে مَعْرُوْف করে পড়েছেন।

আর হামযা এবং কেসায়ী يُفَصِّلُ অর্থাৎ يَاءْ তে ضَمَّةٌ. فَاءْ তে فَتْح এবং صَادْ এ- تَشْدِيْد যুক্ত كَسْرَةٌ দিয়ে পড়েছেন।

আলকামা نُفَصِّلُ অর্থাৎ نُوْنْ সহকারে صَادْ এ- كَسْرَةٌ দিয়ে পড়েছেন।

তালহা এবং নাখয়ী نُوْنْ সহকারে এবং صَادْ এ- تَشْدِيْد যুক্ত كَسْرَةٌ দিয়ে نُفَصِّلُ পড়েছেন।

কাতাদাহ এবং আবূ হাইওয়া يَاءْ ضَمَّةٌ যুক্ত এবং صَادْ এ- كَسْرَةٌ দিয়ে يُفْصِلُ পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : جُمْلَهٗ مُسْتَأْنِفَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয়গণ দ্বারা সেদিন কোনো ফল পাওয়া যাবে না [আবূ ইউসুফ] আর يَوْمَ الْقِيَامَةِ কে- لَنْ تَنْفَعَكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ করাও শুদ্ধ হবে। অর্থাৎ لَنْ تَنْفَعَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অথবা, তাকে পরবর্তী يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ করাও শুদ্ধ হবে। [জুমাল] সর্ব অবস্থায় يَوْمَ الْقِيَامَةِ টি ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ : وَالَّذِيْنَ مَعَهُ উক্তিটি اُسْوَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অথবা حَسَنَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ? অথবা, একে اُسْوَةٌ-এর صِفَتٌ বলতে হবে। অথবা, একে حَسَنَةٌ এ লুপ্ত ضَمِيْر হতে حَالٌ হয়েছে বলতে হবে। অথবা, كَانَ-এর خَبَرٌ বলতে হবে, অবশ্য তখন لَكُمْ ব্যাখ্যার জন্য হবে।

قَوْلُهُ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ : وَمَا اَمْلِكُ لَكَ এ উক্তিটিকে لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ-এর উপর عَطْف বলা যায়। তখন প্রশ্ন আসবে لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ উক্তিটির আদর্শ না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ উক্তিটির আদর্শ না হওয়ার কারণ কি? এটা একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর তাফসীরে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা শাওকানী এ উক্তিটিকে لَاَسْتَغْفِرَنَّ-এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলে দাবি করেছেন, তখন আয়াতের অর্থ হবে– কিন্তু হযরত ইবরাহীমের এ উক্তিতে তোমাদের জন্য কোনো আদর্শ নেই যে উক্তিতে তিনি নিজের পিতাকে বলেছেন, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তবে আমার অবস্থা এই যে, তুমি শিরক করলে আল্লাহর আজাব হতে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো না, অর্থাৎ তখন কেবল ক্ষমা প্রার্থনাটাই আদর্শ হতে ব্যতিক্রম হবে দ্বিতীয় উক্তিটি নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَنَا بُرَاَؤُا : بُرَاَؤُا শব্দটি بَرِيْءٌ-এর বহুবচন, সাধারণ কেরাত হলো بُرَاءُ - فُعَلَاءُ-এর মতো, ঈসা ইবনে ওমর এবং ইবনে ইসহাক একে بِرَاءٌ অর্থাৎ بَاءٌ তে كَسْرَةٌ যুক্ত করে فِعَالٌ-এর মতো পড়েছেন। এটা بِرَاءٌ - بُرَاءٌ - بَرَاءٌ ও পঠিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ .... تَكْفُرُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা এই যে, তারা পরাজিত অবস্থায়ও ঈমানদারগণকে অপ্রীতিকর আচরণ করতে থাকে। হে ঈমানদারগণ! যদি কখনো কোথাও তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের হাতে শক্তি আসে, তবে তারা মুসলমানদেরকে কষ্ট প্রদান করতে কখনো কমতি করবে না। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার লাঞ্ছনায় নিপতিত করবে। আর প্রথমে হত্যা ও মার-ধর করবে। অতঃপর মুসলমানদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করবে। এরপর তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ হওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

অর্থাৎ সুযোগ মিললে অশালীন কথা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় নিকৃষ্ট ব্যবহার তো করবেই এবং এহেন দুরবস্থা ব্যতীত তোমরা তাদের থেকে অন্যকোনো আশা পোষণ করতে পারবে না।

আর وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখনই তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করবে, তবে তা একমাত্র ঈমানের মূল্যের উপরই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফরিকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না। –[আশরাফী, মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : "তারা চায় যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও।" এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরিতে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। –[মা'আরেফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ ..... يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ (الاية) : এ আয়াতে হযরত হাতিব যে ওজর করেছিলেন এটা বলে যে, মক্কাতে তাঁর যে আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তানাদি রয়েছে তাদেরকে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তিনি কাফেরদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা অভিযানের গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন– তা খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যকার এ সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা ছিন্ন করে দেবেন।

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ বাক্যটির তিনটি অর্থ করা হয়েছে–

এক. তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহর অনুগতদেরকে জান্নাতে আর নাফরমানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

দুই. প্রচণ্ড ভয়ের কারণে সেদিন একে অপর হতে পালিয়ে যাবে। যেমন, অপর আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ "সেদিন লোক নিজের ভাই হতে পালিয়ে যাবে।" –[ফাতহুল কাদীর]

তিন. সে কঠিন দিবসে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন এবং কাফিরদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। অতঃপর মু'মিনদেরকে জান্নাতের নিয়ামতে আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের আজাবে প্রবেশ করানো হবে। –[ছাফওয়া]

قَوْلُهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ الخ : পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে বলা হয়েছে। এ আয়াত কয়টিতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে কি করতে হবে, সে বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আদর্শ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সাথীদের উদাহরণ পেশ করে মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, কেবল তোমাদেরকে কাফির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তোমাদের পূর্বের নবীগণ এবং তাঁদের সাহাবীগণও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এটা আল্লাহর বিধান, ঈমানের প্রমাণের জন্য এটা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ الخ : মহান আল্লাহ বলেন, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা স্মরণ করো। তোমাদের জন্য তাঁর ও তাঁর সাথীদের জীবনটি এক উত্তম আদর্শ স্বরূপ। যখন তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয়তার সকল বন্ধনের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, আমরা তোমাদের বন্ধুত্ব হতে দূরে সরে গেলাম। তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তোমাদের সকল তাগুত হতেও বিমুখ হয়ে গেলাম, তোমাদের নাফরমানি ও কুফরির কারণে এবং আমাদের ঈমানের কারণে তোমরা আমাদের জন্য চিরতরে শত্রু সেজে গেলে। তবে যখন তোমরা মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাসী হবে তখন পুনরায় তোমরা আমাদের জন্য পূর্ণ আত্মীয়তার বন্ধনে আসবে।

উক্ত আয়াতে হযরত হাতিব (রা.)-কে তাওবীখ (تَوْبِيْخ) করা হয়েছে যে, মুসলমান হয়ে অমুসলমানদের জন্য কিভাবে আত্মীয়তা বহাল রাখার আশা পোষণ করতে পারে।

আয়াতে اُسْوَةٌ অর্থ কি? : اُسْوَةٌ অর্থ- خَصْلَةٌ আদত, অভ্যাস আল্লামা রাগেব বলেন- اُسْوَةٌ ও اِسْوَةٌ শব্দদ্বয় قُدْوَةٌ فِىْ قِدْوَةٍ -এর ন্যায়, অর্থাৎ তা এমন এক গুণাবলি বা অবস্থার নাম, যা অন্যের চরিত্রে ফুটে উঠে এবং যাতে মানুষ অন্যের অনুসরণ করতে আকৃষ্ট হয়। চাই তা উত্তম হোক অথবা অধম হোক, সৎপথের পক্ষে হোক বা অসৎ পথের পক্ষে হোক। যদি উক্ত গুণাবলি উত্তম পথের সন্ধান দেয়, তাকে اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ বা উত্তম আদর্শ বলা হয়। كَمَا قَالَ تَعَالٰى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ আর যদি তা নিকৃষ্ট পথের সন্ধান দেয়, তাহলে তাকে اُسْوَةٌ سَيِّئَةٌ নিকৃষ্ট আদর্শ বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ : আল্লামা জালালুদ্দিনের মতে- وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী মুসলমানগণকে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর ইবনে যায়েদের মতে وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ দ্বারা পূর্বেকার নবীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ شَرَائِعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا فِيْهِمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ : এ আয়াতটি পূর্বের শরিয়তের যেসব সংবাদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দিয়েছেন তা আমাদের জন্য শরিয়ত হওয়ার দলিল : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত বা আদর্শ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্বের শরিয়তগুলোর যেসব সংবাদাদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আমাদের জন্যও শরিয়ত তথা পালনীয়। -[কুরতুবী]

لِقَوْمِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরে সাবীতে বর্ণনা করা হয়েছে- اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ দ্বারা তদানীন্তন বাদশাহ নমরূদকে এবং তার দলকেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ وَحْدَهٗ শব্দ কেন বললেন? : তার উত্তরে বলা হবে যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ মানা যাবে; বরং তার অর্থ এই যে, আল্লাহকে একক বলে মানতে হবে, তার কোন শরিক নেই। আর সে যুগের কিছু ঈমানদার এমন ছিল যে, আল্লাহকে স্বীকার করত কিন্তু তার সমকক্ষতাকেও সাথে সাথে স্বীকার করত। আবার নবীগণকে অবমাননা করত। ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, বেহেশত ও দোজখ ইত্যাদিকে বিশ্বাস করত না। অথচ ঈমান বিল্লাহ বলতে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে, ফেরেশতা, আসমানি সকল কিতাব ও সকল রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস, অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহ ও আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সকল বিষয়ের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান। যা তাদের মধ্যে ছিল না, তাই وَحْدَهٗ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ঈমানে মুফাসসাল ও কুরআনের আয়াতের অনুসরণ একমাত্র ঈমান بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ -এর পরিচায়ক হতে পারে। যেমন প্রকৃত ঈমানদারগণের উক্তি আল্লাহ নকল করে বলেন- كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সকল কিছুর উপর আমরা ঈমান এনেছি।

قَوْلُهُ كَفَرْنَا بِكُمْ : كَفَرْنَا بِكُمْ তথা আমরা তোমাদের সাথে কুফরি করেছি। অর্থাৎ তোমাদের কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং তোমরা হক পথে আছ এ দাবি আমরা অস্বীকার করি। কোনো কোনো মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, তোমরা যেসব মূর্তির প্রতি ঈমান এনেছ আমরা তার সাথে কুফরি করেছি। –[কুরতুবী]

আল্লামা শওকানী (র.)-এর আরো একটা তাফসীর করে বলেছেন, আমরা তোমাদের দীন অস্বীকারকারী। –[ফাতহুল কাদীর]

وَحْدَهُ **বলার ফায়দা :** ঈমান কেবল এক আল্লাহর উপর আনলে চলে না, আরো অনেক কিছুর উপর আনতে হয়, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ "সকলেই আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। তাহলে এখানে কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলার ফায়দা কি? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবীগণ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ এ সবের প্রতি ঈমান আনলেই কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান পূর্ণ হায়। এ সব অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বলা মিথ্যা দাবি। সুতরাং এখানে "যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে", এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে কেবল আল্লাহকেই যতক্ষণ পর্যন্ত ইলাহ এবং মাবুদ স্বীকার না করবে, কারণ আল্লাহর সাথে আরো কিছুকে ইলাহ মানা হলে আল্লাহর প্রতি ঈমান শুদ্ধ হয় না। কেননা এটাই তো আসল শিরক। মুশরিক কি কখনো মু'মিন হতে পারে? –[কাবীর]

قَوْلُهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ .... مِنْ شَيْءٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে "আমি অবশ্যই তোমার জন্য [আল্লাহর কাছে] ক্ষমা প্রার্থনা করবো" এ আদর্শের ব্যতিক্রম।

এখানে একটি সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ এবং সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। সূরা তাওবায় তার উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারে যে, মুশরিক পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা মিল্লাতে ইবরাহীমী বা ইবরাহীমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং তা জায়েজ হওয়া উচিত। তাই একে ইবরাহীমী আদর্শের ব্যতিক্রম ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ জরুরি; কিন্তু তাঁর এ কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য নয়। এটাই হলো اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওজর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন অথবা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন এ বিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। –[মা'আরেফুল কোরআন, কাবীর, সাফওয়া]

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য দোয়া করার কারণ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা যখন তাঁকে ঘর হতে বহিষ্কার করেন তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যথা আল্লাহ বলেন– مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ সে ভাষা উল্লেখ করে বলেন– سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। –[সূরা মারইয়াম : ৪৭]

وَفِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অন্য আয়াতে রয়েছে– হে প্রভু, আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদারকে কিয়ামতের দিবসের জন্য ক্ষমা করে দাও। –[সূরা ইবরাহীম : ৪১]

وَفِيْ اٰيَةٍ اَيْضًا : وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ - وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ.

অন্য আয়াতে আরো বলেন– হে প্রভু, আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন, তিনি অবশ্যই পথভ্রষ্ট ছিলেন, আমাকে কিয়ামতের দিন লজ্জিত করবেন না। [সূরা শু'আরা : ৮৬, ৮৭] এ দোয়া করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পূর্ব সময়ে। কিন্তু যখন তিনি স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার পিতা একজন নির্ঘাত মুশরিক লোক, তখন তিনি ক্ষমার দোয়া হতে বিমুখ হয়ে গেলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। যেমন, আল্লাহ বলেন– فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ

قَوْلُهُ رَبَّنَا عَلَيْكَ .... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হযরত ইবরাহীম এবং তার সঙ্গী সাথীদের প্রার্থনা ছিল "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার উপর নির্ভর করেছি ও তোমার মুখাপেক্ষী হয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।"

এ উক্তিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উক্তি বলে-তাফসীরবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন। আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ বলেছেন, মু'মিনদেরকে এ রকম বলতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদের হতে বিমুখ হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো, বল رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার উপরই নির্ভর করেছি।" –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

৫. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ لَاتُظْهِرُهُمْ عَلَيْنَا فَيَظُنُّوْآ اَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ فَيُفْتَنُوْا اَىْ تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ بِنَا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِكَ وَصُنْعِكَ

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য বিভ্রান্তির কারণ বানিয়ো না অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করো না। ফলে তারা নিজেদেরকেই হকপন্থিরূপে কল্পনা করবে ও বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। অর্থাৎ আমাদের কারণে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ও বিবেকশূন্য হয়ে পড়বে। আর আমাদেরকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় তোমার রাজত্ব ও ক্রিয়াকলাপে।

٦. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ جَوَابُ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ كُمْ بِاِعَادَةِ الْجَارِ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط اَىْ يَخَافُهُمَا اَوْ يَظُنُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَمَنْ يَتَوَلَّ بِاَنْ يُّوَالِىَ الْكُفَّارَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ عَنْ خَلْقِهٖ اَلْحَمِيْدُ لِاَهْلِ طَاعَتِهٖ ـ

৬. তোমাদের জন্য রয়েছে হে উম্মতে মুহাম্মদী! এটা উহ্য শপথের জবাব। তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ অর্থাৎ তোমরা যারা এটা كُمْ সর্বনাম হতে جَارْ-কে পুনরুল্লেখের প্রেক্ষিতে بَدَلُ اشْتِمَالٌ আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো। অর্থাৎ এতদুভয়কে ভয় করো অথবা ছওয়াব ও শাস্তির প্রতি আস্থা রাখো। আর যে ব্যক্তি বিমুখ হবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা জেনে রাখুক যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী স্বীয় সৃষ্টি হতে এবং প্রশংসিত তার আনুগত্যকারীদের নিকট।

٧. عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ طَاعَةً لِلّٰهِ تَعَالٰى مَوَدَّةً ط بِاَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْاِيْمَانِ فَيَصِيْرُوْا لَكُمْ اَوْلِيَآءَ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط عَلٰى ذٰلِكَ وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا سَلَفَ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

৭. সম্ভবত আল্লাহ অচিরেই সৃষ্টি করবেন তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বন্ধুত্ব তাদেরকে ঈমানের প্রতি হেদায়েত করার মাধ্যমে। তখন তারা তোমাদের বন্ধু হবে আল্লাহ শক্তিমান তার উপর। আর মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাই করেছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্য ও দয়াময় তাদের প্রতি।

৮. لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ بَدْلُ اِشْتِمَالٍ مِنَ الَّذِيْنَ وَتُقْسِطُوْا تَقْضُوْا اِلَيْهِمْ ط بِالْقِسْطِ اَىْ اَلْعَدْلِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ الْعَادِلِيْنَ ـ

৮. আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, তাদের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি কাফেরদের মধ্য হতে দীনের ব্যাপারে, আর তোমাদেরকে তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করতে এটা اَلَّذِيْنَ হতে بَدْل اِشْتِمَالْ এবং ন্যায়বিচার করবে সুবিচার করবে তাদের প্রতি ন্যায়দণ্ড তথা ন্যায় বিচার দ্বারা। আর এ আদেশ জিহাদ সংক্রান্ত আদেশের পূর্বেকার আদেশ নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন ন্যায় বিচারকারীগণ।

৯. اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَاوَنُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج بَدْلُ اِشْتِمَالٍ مِنَ الَّذِيْنَ اَىْ تَتَّخِذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

৯. আল্লাহ তো নিষেধ করেন তাদের প্রসঙ্গে যারা তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, আর তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে, আর প্রকাশ করেছে সহযোগিতা করেছে তোমাদের বহিষ্করণে যে, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। এটা اَلَّذِيْنَ হতে بَدْل اِشْتِمَالْ অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হতে বাধা দান করে। আর যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই অত্যাচারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথীদেরকে উত্তম আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তারা যে দোয়া করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে।

আর অত্র আয়াতেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আরো কিছু দোয়া স্থান পেয়েছে, যাতে করে সকল যুগের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এভাবে এ ভাষায় দোয়া করতে পারে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথীগণ প্রার্থনা করে বলেছিলেন- ওগো প্রভু! কাফেরদের মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা করো না। যাতে তারা আমাদেরকে অত্যাচার উৎপীড়ন এবং আমাদের সঙ্গে যথেচ্ছা আচরণ করে বেড়াতে সুযোগ পাবে, এমন অবস্থায় আমাদেরকে ফেলো না। অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ে তাদেরকে ছিনিমিনি খেলতে সুযোগ দিও না। তোমার এ ভক্ত অনুরক্ত বান্দাদেরকে তুমি তাদের অত্যাচারের কবল হতে রক্ষা করো। এটাই তোমার নিকটে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তুমি অশেষ জ্ঞান-বিবেচনা ও ক্ষমতার অধিকারী। -[তাফসীরে তাহির]

মু'মিনগণ কাফেরদের জন্য কিভাবে ফেতনার কারণ হবে? : আল্লাহ তা'আলা বলেন, [হযরত ইবরাহীম (আ.) আরো বলেছেন] "হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।"

ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের জন্য ফেতনার কারণ বিভিন্নভাবে হতে পারে :

১. কাফেররা মু'মিনদের উপর বিজয়ী হলে, তখন তারা একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলবে, আমরাই সত্যপথগামী তা না হলে আমরা কি মু'মিনদের উপর বিজয়ী হতে পারতাম। অতএব, আমরাই হকপন্থি। এটা ইমাম জুবায়ের (র.)-এর অভিমত।

২. মুসলমানরা তাদের ইসলামি চরিত্র আদব-আখলাক এবং নৈতিকতা হারিয়ে ফেললে তখন দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের মধ্যেও ঠিক সে চরিত্রই দেখতে পাবে যা ইসলাম বিরোধী সমাজে লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়। এর ফলে কাফেররা বলার সুযোগ পাবে যে, দীন ইসলামে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে আমাদের কুফরির উপর তারা অধিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হতে পারে।

৩. কাফেরদের দ্বারা মু'মিনগণ লাঞ্ছিত হলে বা মু'মিনদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো আজাব আসলে, তখন কাফেররা বলতে পারে, মুসলমানরা যদি সত্যপথগামী হতো তাহলে তারা লাঞ্ছিত হতো না বা তাদের উপর আল্লাহর আজাব আসত না। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

৪. কাফেররা মুসলমানদের তুলনায় অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী হলে তখন তারা বলতে পারে, তোমরা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলে তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? এভাবে মুসলমানদের দুরবস্থা কাফেরদের ফেতনার কারণ হতে পারে। –[কাবীর]

৫. এটাও হতে পারে যে, হে আমাদের রব, কাফিরদের আজাব দেওয়ার কারণ আমাদেরকে বানিও না। তখন এ আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তির অংশ হবে না। উম্মতে মুহাম্মদীকে এ দোয়া করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বুঝতে হবে। এ অভিমত মুজাহিদের। –[কাবীর]

৬. আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, কখনো কখনো বাতিলপন্থিদের পক্ষ থেকে সত্য অনুসারীদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা হয়, আর তা হয় মু'মিনদের দ্বারা সংঘটিত পাপাচারের কারণে তাদের জানা-অজানা গুনাহসমূহের কারণে, এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং বিপদমুক্ত হওয়াই হলো একমাত্র পথ। যেমন, হাদীসে এসেছে–

إِذَا عَصَانِيْ مَنْ يَعْرِفُنِيْ سَلَّطْتُ عَلَيْهِمْ مَنْ لَا يَعْرِفُنِيْ .

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ .... الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ الخ : উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তার আদর্শ ও তার অনুসারীদের আদর্শ অনুসরণের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের আশা রাখে, আর কিয়ামতের দিবসে মুক্তির আশা করে, আল্লাহর প্রসন্নতা এবং আখেরাতের সফলতা যাদের কাম্য, তাদের পক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাদের সঙ্গীদের মধ্যে অনুকরণীয় উন্নত আদর্শ রয়েছে। তারা যেন তা অবলম্বন করে চলে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি বিমুখ হয় তাতে, তবে সে নিজেরই সর্বনাশ করে আনবে। আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। তিনি যেমন চির বেনিয়াজ ও চির প্রশংসিত তেমনি চির বেপরোয়া ও চির প্রশংসিতই থাকবেন সন্দেহ নেই। –[তাহের]

আর আল্লাহর শত্রুদের সাথে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

قَوْلُهُ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا الخ -এর মধ্যে رَبَّنَا -কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : উক্ত আয়াতে رَبَّنَا الخ দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়েছে। আর দোয়ার মহলে সাধারণত কাকুতি-মিনতিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং যত কাকুতি-মিনতি দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করা হয়, আল্লাহ ততই তাড়াতাড়ি ডাকে সাড়া দেন। তাই আয়াতে رَبَّنَا -কে বারবার উল্লেখ করত নম্রতা দেখানো হয়েছে।

আর আল্লাহ ওয়ালাগণ যতই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে থাকে তাদের নিকট ততই মধুর লাগে ও আত্মার তৃপ্তি গ্রহণ করে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার সহচরগণও আল্লাহর প্রেমের সাগরে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ঈমানের প্রেম ও ভালোবাসার টানে আল্লাহকে বারংবার স্মরণ করে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ : এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা হয়েছে।

১. "আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত যে, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতঃই প্রশংসিত।"–[কুরতুবী, কাবীর]

২. তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থ করা হয়েছে, "আর যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, [এই নিষেধাজ্ঞার পরও] তার জানা উচিত যে, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন [তার এ বন্ধুত্বের দ্বারা আল্লাহর কিছু যায় আসে না] তিনি স্বপ্রশংসিত।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ الخ আয়াতটির শানে নুযূল : পূর্বের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা যদিও অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে আমল করতেছিলেন; কিন্তু তথাপি নিজেদের বাপ-মা, ভাই-বোন ও নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যে কত বড় কঠিন ও দুঃসহ কাজ এবং তার ফলে ঈমানদার লোকদের মনের উপর দিয়ে কি প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানতেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, সেদিন দূরে নয় যখন তোমাদের এসব আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা আগামীকাল ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। –[কুরতুবী, কাবীর, আসবাব]

এ কথাগুলো যখন বলা হয়েছিল তখন কারো বোধগম্য হচ্ছিল না যে, কিভাবে তা সম্ভব; কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই যখন মক্কা বিজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে চলে আসল তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, কুরাইশের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। যার ফলে মুসলমানরা স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন কিভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের বন্ধুত্বে পরিণত হচ্ছে।

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বুখারী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী কাবীলা হোদাইবিয়ার সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা হতে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু হাদিয়াও সাথে নিয়ে যান; কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সে হাদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূল ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞেস করেন– আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের, আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূল ﷺ বললেন, জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[আসবাব, মা'আরিফ, কাবীর]

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, হযরত আসমার জননী কাবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। –[ইবনে কাছীর, মা'আরিফ]

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং মুসলমানদেরকে দেশ হতে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি; আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরি। এতে জিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান, বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব, অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। –[মা'আরেফুল কোরআন, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسَى اللّٰهُ الخ : মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা ভীত হয়ো না। অচিরেই তোমাদের শত্রু কাফেরগণ ঈমান গ্রহণ করার পূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারে। তোমাদের জন্য তখন তারা বন্ধু হয়ে যাবে। তাদেরকে আজ যদিও শত্রু ভাবছ, তাদেরকে ঈমানদার বানানো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তাঁর দয়ার সাগর সকল ব্যক্তি ও বস্তুকেই পরিবর্তন করতে সমস্যা হয় না। সুতরাং মক্কা বিজয় করে তিনি বহুসংখ্যক কাফেরদেরকে মুসলমান বানিয়ে মুসলমানদের সাথী করে দিয়েছেন। ফলে কাফেরদের কুফরির শক্তি মুসলমানদের শক্তিতে পরিবর্তন হয়ে গেল। আর তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের জন্য জান-প্রাণ হয়ে গেল। এসবগুলোই আল্লাহর কুদরতের ফয়সালা মাত্র।

উক্ত আয়াতটি ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে তাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তদনুসারে প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে আমল করছিলেন। অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হওয়া এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি অর্জন করার লক্ষ্যে যখন ঈামন আনয়ন করেছিল। তখন তাদের সকল আত্মীয় স্বজন ও ভাই বন্ধুগণ তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এমতাবস্থায় ধর্ম রক্ষার্থে সকল আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। আপনজনের বিয়োগ ব্যথা যে কত বড় আঘাত হানে তা অবর্ণনীয়। ঈমানদারদের অন্তরে তখন কেমন আর্তনাদ বয়ে গিয়েছিল তা আল্লাহই ভালো জানতেন।

সুতরাং তাদের অন্তরে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলা عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ আয়াত নাজিল করলেন। আর এ আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর সকলেই ভাবনা করছিল যে, কিভাবে শত্রুগণ মিত্র হবে, কিভাবে কাফিরদের শত্রুতা বিদূরিত হয়ে মিত্রতা প্রকাশ পাবে এবং কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু স্বল্পকাল পরই যখন মক্কাভূমি মুসলমানদের মাধ্যমে বিজয় হলো এবং দলে দলে লোক মুসলমান হতে লাগল তখনই তারা অনুভব করতে পারল যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এখন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং শত্রুমিত্র হয়ে গেল, কাফেরগণ মুসলমানদের বন্ধু হয়ে গেল, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ ব্যথা দূরীভূত হলো। –[কাবীর, আসবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ ..... الْمُقْسِطِيْنَ : আল্লাহ উক্ত আয়াতে বলেন– যারা তোমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে শত্রু সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে যেসব লোক তোমাদেরকে হত্যাকার্যে লিপ্ত হয়নি, তোমাদেরকে দেশান্তরেও বাধ্য করেনি, তোমাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও করেনি, তোমরা তাদের সাথে আত্মীয়তার কারণে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের জন্য দূষণীয় কাজ নয়।

অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে কোনো বাধা নেই। সততা ও ন্যায়পরায়ণতাতো সকল কাফেরদের সাথে মানবিক কারণে করার নির্দেশ ইসলাম প্রদান করেছে, শত্রু, জিম্মি ও হরবী সকলেই এ ক্ষেত্রে সমান; বরং ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক চতুষ্পদ জন্তুদের সাথেও ইনসাফ করা আবশ্যক। কারণ আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -এর অনুপাতে শক্তি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাউকে চাপ সৃষ্টি করা জায়েজ হবে না। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ইহসান ও সদাচার বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। -[মা'আরিফ]

মুশরিক ও কাফিরদের হাদিয়া গ্রহণের হুকুম : উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রমাণিত হয় যে, হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.)-এর মাতা তার জন্য যে হাদিয়া নিয়ে সাক্ষাতে আসলেন হুযূর ﷺ তা ফিরিয়ে দিতে বলেননি। সুতরাং কাফেরদের হাদিয়া গ্রহণ করাও জায়েজ। আর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও হাদিয়া গ্রহণ করতেন। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ وَلَوْ جَرْعَةَ لَبَنٍ . (اَلْحَدِيْث) উক্ত হাদীসে কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে প্রভেদ বর্ণনা করা হয়নি।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের হুকুম : উক্ত আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তার কাফের মাতা-পিতা ও ভাই-বোন ইত্যাদির সেবা সহায়তা করা জায়েজ হবে। আর যদি তারা শত্রুতা পোষণ করে তবে তা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে ফকির মিসকিনদেরকেও সদকা খয়রাত করা যেতে পারে। যদি কাফেরগণ মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে ও নির্দেশ পালন করে ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাস করে তবে তাদের ক্ষেত্রে সদাচার করা আবশ্যক। ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য দুনিয়াবী কাজকর্ম ইত্যাদিও নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিম্মিদের ক্ষেত্রে বলেছেন- دِمَائُهُمْ كَدِمَائِكُمْ وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِكُمْ আর হুযূর ﷺ হোদাবিয়ার সন্ধি মুশরিকদের সাথে করেছেন। এটাও مُوَالَاةٌ জায়েজ হওয়ার একটি বিশেষ প্রমাণ। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের অগ্রাধিকার থাকবে, যেমন সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى . (اَلْحَدِيْث)

قَوْلُهُ اِنَّمَا يَنْهَاكُمْ .... فِي الدِّيْنِ (الْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সাহায্য করেছে। যারা এ জাতীয় লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা জালিম।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে লোকদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। সে ভুল ধারণাটি হলো, তাদের কাফের হওয়ার দরুনই বুঝি এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে আলোচ্য আয়াত কয়টিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাফের হওয়াই আসল কারণ নয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতা ও অত্যাচারমূলক আচরণে কারণেই সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই শত্রু কাফের ও অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের কর্তব্য। যেসব কাফের তাদের সাথে কোনোদিন খারাপ আচরণ করেনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা কর্তব্য। হযরত আবূ বকরের কন্যা হযরত আসমা (রা.) এবং তাঁর কাফের মাতার মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাই এ কথাটির সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা [পূর্বে তার উল্লেখ হয়েছে]।

এ ঘটনা হতে জানা যায় যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তার কাফের পিতা-মাতার খেদমত করা ও নিজের কাফের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা সম্পূর্ণ জায়েজ। যদি তারা ইসলামের শত্রু না হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে জিম্মি মিসকিন লোকদের প্রতিও দান-সদকা করা যেতে পারে। -[আহকামুল কুরআন, জাচ্ছাছ, রুহুল মা'আনী]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক কি রকম হবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার একটা মূল্যবান বিধান বিবৃত হয়েছে। সে বিধান হলো- সম্পর্কচ্ছেদ ও হানাহানি হবে বিশেষিত শত্রুতা এবং সীমালঙ্ঘনের অবস্থায়। আর যখন শত্রুতা থাকবে না, কোনো সীমালঙ্ঘিত হবে না, তখন যারা সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। মুয়ামালার ক্ষেত্রে এটাই হলো ইনসাফ। এ বিধানই হলো ইসলামের আন্তর্জাতিক শরয়ী বিধানের মূলভিত্তি। যে বিধানে মুসলমানদের সাথে অন্যসব মানুষের শান্তিময় অবস্থাকে আসল অবস্থা মনে করা হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন যুদ্ধ জাতীয় সীমালঙ্ঘন এবং তার প্রতিরোধের প্রয়োজন ছাড়া হয় না। অথবা, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর তা লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই হতে পারে। অথবা, দাওয়াতের স্বাধীনতা এবং আকীদার স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিসহ অবস্থানের জন্য হতে পারে। এ ছাড়া অন্যাবস্থায় এ বিধানের তাৎপর্য হলো শান্তি, ভালোবাসা, সদাচার এবং সমস্ত মানুষের সাথে ইনসাফ। -[যিলাল]

١٠. يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَلْسِنَتِهِنَّ مُهٰجِرٰتٍ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَنَّ مَنْ جَاۤءَ مِنْهُمْ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ يُرَدُّ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط بِالْحَلْفِ اَنَّهُنَّ مَا خَرَجْنَ اِلَّا رَغْبَةً فِي الْاِسْلَامِ لَا بُغْضًا لِاَزْوَاجِهِنَّ الْكُفَّارِ وَلَا عِشْقًا لِرِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَلِّفُهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ ظَنَنْتُمُوْهُنَّ بِالْحَلْفِ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ تَرُدُّوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ اَيْ اَعْطُوا الْكُفَّارَ اَزْوَاجَهُنَّ مَا اَنْفَقُوْا ط عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ بِشَرْطِهِ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط مُهُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ زَوْجَاتِكُمْ لِقَطْعِ اِسْلَامِكُمْ لَهَا بِشَرْطِهِ اَوِ اللَّاحِقَاتِ بِالْمُشْرِكِيْنَ مُرْتَدَّاتٍ لِقَطْعِ ارْتِدَادِهِنَّ نِكَاحَكُمْ بِشَرْطِهِ . وَاسْئَلُوْا اُطْلُبُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ فِي صُوْرَةِ الْاِرْتِدَادِ مِمَّنْ تَزَوَّجَهُنَّ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ط عَلَى الْمُهَاجِرَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَهُ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط بِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অনুবাদ :

১০. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট আগমন করে মু'মিনা স্ত্রীলোকগণ তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি মতো দেশত্যাগী হয়ে কাফিরগণ হতে, যখন তাদের সাথে এ মর্মে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি হয়েছে যে, তাদের নিকট হতে যে ব্যক্তি মু'মিনদের নিকট আগমন করবে, তাকে ফেরত পাঠানো হবে, এটার পর। তবে তোমরা সেই স্ত্রীদেরকে পরীক্ষা করো এরূপ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যে তারা ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বহির্গত হয়েছে, তাদের কাফের স্বামীগণের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা কোনো মুসলিম পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্তির কারণে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হতে এরূপ শপথই গ্রহণ করতেন। আল্লাহই তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অনন্তর তোমরা যদি জানতে পার শপথের কারণে তোমাদের ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা মু'মিন, তবে তাদেরকে ফেরত পাঠিও না ফিরিয়ে দিও না কাফেরদের নিকট। মু'মিন নারীগণ তাদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেরগণ মু'মিন নারীদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা তাদেরকে প্রদান করো অর্থাৎ তাদের কাফের স্বামীগণকে দাও যা তারা ব্যয় করেছে। উক্ত মু'মিন নারীগণের প্রতি মোহর ইত্যাদি। আর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করায় কোনো অপরাধ নেই উক্ত শর্ত সাপেক্ষে যখন তোমরা তাদের বিনিময় আদায় করেছ তাদের মোহর। আর তোমরা বজায় রেখো না تُمْسِكُوْا শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ সহকারে উভয় কেরাতেই পঠিত হয়েছে। কাফের নারীগণের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক কাফের স্ত্রীগণের সাথে। কারণ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ উক্ত সম্পর্ককে তার শর্তসহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অথবা সেই স্ত্রীগণ যারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছে। কারণ তাদের ধর্মত্যাগ তোমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনকে তার শর্তসহ ছিন্ন করে দিয়েছে। আর তোমরা দাবি করো ফেরত চাও যা তোমরা ব্যয় করেছ তাদের উপর মোহর ইত্যাদি। তারা যে সকল কাফেরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে তাদের নিকট হতে, স্ত্রী ধর্মত্যাগী হওয়ার ক্ষেত্রে। আর তারা দাবি করবে, যা তারা ব্যয় করেছে মুহাজির নারীগণের নিকট। যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদেরকে তা ফেরত দান করা হবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন এটার মাধ্যমে আল্লাহ সর্ববিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تُمْسِكُوْا : জমহুর এ শব্দটি إِمْسَاكٌ হতে উদ্ভূত হিসেবে تُمْسِكُوْا অর্থাৎ تَخْفِيْف করে পড়েছেন। আবূ ওবাইদও এ কেরাত পছন্দ করেছেন, অপর আয়াত فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -এর উপর ভিত্তি করে। অপরদিকে হাসান, আবূ আলিয়া ও আবূ আমর تُمَسِّكُوْا অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন। অর্থাৎ তারা তাকে (تُمَسِّكُوْا) উদ্ভূত মনে করেছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলমান এবং কুরাইশদের মধ্যে হোদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর প্রথম প্রথম মক্কা হতে পুরুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে আসছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেসব মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আত্মীয়দের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। পরে মুসলমান স্ত্রীলোকদের আগমন আরম্ভ হলে একটা নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাটি হলো স্ত্রীলোকদেরকেও তাদের আত্মীয় কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; না অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

সর্বপ্রথম কোন্ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

১. এক রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, মুসলমান সাঈদা বিনতে হারিছ কাফের সায়ফী ইবনে আনসারীর পত্নী ছিলেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে সায়ফীর নাম মাখযূমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এ মুসলমান মহিলা মক্কা হতে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে তাঁর স্বামীও হাজির হলো। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা আপনি এ শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তির কালি এখনও শুকায়নি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী, মা'আরিফ]

২. আর কোনো কোনো রেওয়ায়াত মতে, সর্বপ্রথম যে মহিলা হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন তিনি হলেন উকবা ইবনে মুয়াইতের কন্যা উম্মে কুলছূম (রা.)। তাঁর দুই ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ফেরত চাইলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

-[কুরতুবী, ইবনে কাছীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

এ দুই নারী ছাড়া আরো কয়েকজন নারী সে সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন বলে জানা যায়। হতে পারে এ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যাই হোক এ আয়াতগুলো যে এ সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোদায়বিয়ার ঘটনা : হোদায়বিয়া হেরেম শরীফের সীমানার একেবারে নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। বর্তমানে এটা শামসিয়া নামে পরিচিত। আবদ ইবনে হুমায়েদ, ইবনে জারীর, বায়হাকী প্রমুখের রেওয়ায়াতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে পবিত্র মক্কায় গমন করেছেন এবং ওমরা পালন করে মাথা মুড়িয়ে অথবা চুল ছোট করে নিয়েছেন। স্বপ্নের ঘটনাটি তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট ব্যক্ত করলে সকলে কা'বা ঘর জেয়ারত এবং বহুদিনের বঞ্চিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে সাথে সাথেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

পবিত্র জিলকাদ মাসে প্রাচীন আরবি প্রথানুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পুণ্যভূমি দর্শন এবং ওমরা হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত সাহাবী সহকারে মদীনা হতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন।

মুসনাদে আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রার প্রাক্কালে গোসল করলেন এবং নতুন পোশাক পরিধান করে নিজের কসওয়া নামীয় উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা এবং আনসার ও মদীনার পল্লী থেকে আগত বেদুইনের এক বিরাট দলও ছিল।

রাসূলে কারীম ﷺ যুলহুলাইফা নামক স্থান হতে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলে মক্কাবাসী জানতে পেরে মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কার সন্নিকটে খুযয়া গোত্রের বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার নিকট কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে অন্য পথ অনুসরণ করলেন এবং মক্কার তিন মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

হুযূর ﷺ পূর্বেই বাশার ইবনে সুফিয়ানকে দূত হিসেবে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি অতি সংগোপনে মক্কাবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। তিনি মক্কা শরীফ হতে এসে কাফিরদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হবেন, না যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবেন এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ নিলে সকলে এ উত্তর দিলেন যে, আমরা ওমরা করতে এসেছি যুদ্ধ করতে নয়। মক্কার কাফিরদের পক্ষ হতে উরওয়া ইবনে সাকাফী এসে হুযূর ﷺ-এর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে এসেছি। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুনরায় আবওয়া ইবনে মাসুদকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট পাঠাল। কিন্তু আবওয়ার দুর্ব্যবহারের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রথমে খোবাস এবং পরে হযরত ওসমান (রা.)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশ নেতাদের নিকট পাঠান। কিন্তু কাফেররা তাঁকে নজরবন্দি করে রাখলে জনরব উঠল যে, কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে।

এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে একত্রিত হয়ে জিহাদের জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে 'বাইআতুর রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। ভয়ে কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে মুক্তি দেয় এবং সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সুহাইলকে পাঠায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সানন্দে এ শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

সন্ধির শর্তাবলি এরূপ ছিল যে, আগামী দশ বৎসরের জন্য মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। তারা একে অপরের বিরোধিতায় লিপ্ত হবে না। এ বৎসর মুসলমারা ওমরা না করে চলে যাবে। আগামী বৎসর বিনা অস্ত্রে মক্কায় এসে ওমরা করে যেতে পারবে। মক্কার কোনো লোক মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে, পক্ষান্তরে মদীনার কোনো লোক মক্কায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। এভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ঘটনা সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের নিকট আসবে তখন তাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি) যাঁচাই-পরখ করে নাও, আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে, তারা মু'মিন তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিও না।"

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকগণ যদি মু'মিনা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না। এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, প্রশ্নগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. আল্লাহ তা'আলা কি এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সন্ধির শর্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে অমান্য করার নির্দেশ দিলেন?

২. নাকি সন্ধির শর্তের মধ্যে মহিলারা পড়ে না? তাহলে সন্ধির শর্ত কি রকম ছিল? এ দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব জানা গেলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরও সহজেই পাওয়া যাবে।

মহিলারাও পুরুষদের সাথে সন্ধিচুক্তির শর্তের মধ্যে শামিল কিনা? : এ প্রশ্নের জবাবে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। এক. হ্যাঁ, মহিলারাও চুক্তির শর্তের অন্তর্ভুক্ত। দুই. না মহিলারা চুক্তির শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। দু' রকমের মতামত হওয়ার কারণ হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে যত বর্ণনা আমরা পাই তার অধিকাংশই ভাব বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কে একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ- مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا

তোমাদের যে লোক আমাদের নিকট আসবে আমরা তাকে ফেরত পাঠাবো না, কিন্তু আমাদের যে লোক তোমাদের নিকট যাবে তোমরা তাকে ফেরত পাঠাবে।

কোনোটির ভাষা ছিল- وَمَنْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَصْحَابِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهٖ رَدَّهُ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহর নিকট তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যে লোক নিজের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আসবে তাকে তিনি ফেরত দিবেন।

আবার কোনোটিতে রয়েছে- مَنْ اَتٰى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهٖ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ

কুরাইশদের যে লোক মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই আসবে তাঁকে তিনি কুরাইশদের হাতে ফেরত দিবেন।

এ বর্ণনাসমূহের বাচনভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বর্ণনা সন্ধির মূলভাষা ও শব্দের অনুরূপ নয়। বর্ণনাকারী সন্ধির মূলকথা নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বিপুল সংখ্যক বর্ণনা এ ধরনের হওয়ার কারণে তাফসীরকার ও হাদীসবিদগণ সাধারণভাবেই মনে করে নিয়েছেন যে, সন্ধির শর্তসমূহে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ হিসেবে পুরুষদের ন্যায়

স্ত্রীলোকদেরও ফেরত দেওয়া উচিত। অতঃপর তাঁদের সম্মুখে আল্লাহর নির্দেশ আসল যে, মু'মিন স্ত্রীলোককে ফেরত দেওয়া যাবে না। তখন তাঁরা এটার ব্যাখ্যা করলেন– আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিন স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; কিন্তু এটা খুব সামান্য কথা নয়, এত সহজেই একথা মেনে নেওয়া যায় না। সন্ধি যদি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিল, তাহলে একপক্ষ হতে একতরফাভাবে সংশোধন করে নিবে কিংবা নিজস্বভাবে তার একটা অংশ বদলিয়ে দিবে এটা কিভাবে সঙ্গত মনে করা যেতে পারে? যদি ধরে নেওয়া যায় এটা করা হয়েছে তবুও কুরাইশের লোকেরা এতে কোনো আপত্তি করল না তাই বা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? কুরাইশরা তো রাসূলে কারীম ﷺ-এর ও মুসলমানদের এক একটি দোষ ধরার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে রয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ সন্ধি শর্তের বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছেন এ কথা তারা জানতে পারলে তো চিৎকার করে আরবের পথে-প্রান্তরে বলে বেড়াত; কিন্তু কুরআনের ফয়সালা সম্পর্কে প্রতিবাদ স্বরূপ টু শব্দটিও উচ্চারণ করেছে এমন কোনো বর্ণনাই কোথাও পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হলে সন্ধি-চুক্তির আসল শব্দ ও ভাষা সন্ধান করে এ জটিলতার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতো। কাজি আবূ বকর ইবনে আরাবী প্রমুখ এদিকে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের আপত্তি না জানানোর একটা যেনতেন ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি মু'জিযা হিসেবেই কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু এ ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা কিভাবে স্বস্তি পেলেন তাই আশ্চর্য।

আসল কথা হলো, সন্ধি-চুক্তির এ শর্তটি মুসলমানদের পক্ষ হতে নয়, কুরাইশ কাফেরদের পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ হতে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর সন্ধি-চুক্তিতে এ শব্দগুলো লিখেছিল–

عَلٰى اَنْ لَّا يَاْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আমাদের কোনো পুরুষ যদি আসে তোমাদের ধর্মমতের হলেও তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাবে।

সন্ধির এ কথাগুলো বুখারী শরীফে كِتَابُ الشُّرُوْطِ بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ সহীহ সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো رَجُلٌ শব্দটি 'ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহার করেছিল; কিন্তু এটা ছিল তার নিজের চিন্তা। সন্ধিতে رَجُلٌ শব্দ লিখা হয়েছিল। আরবি ভাষায় এ শব্দটি পুরুষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই উম্মে কুলছূম (রা.)-কে ফেরত নেওয়ার দাবি নিয়ে তাঁর ভাই যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো, (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুযায়ী) তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন كَانَ الشَّرْطُ فِى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ "শর্ত ছিল পুরুষদের সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নয়।" –(কাবীর, আহকামুল কুরআন)

ইমাম রাযী (র.) 'যাহ্হাক' -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সন্ধিচুক্তিতে মহিলাদের ব্যাপারে আলাদা একটা কথা ছিল, সে কথার শব্দাবলি এ রকম–

لَا تَاْتِيْكَ مِنَّا امْرَأَةٌ لَيْسَتْ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهَا اِلَيْنَا فَاِنْ دَخَلَتْ فِىْ دِيْنِكَ وَلَهَا زَوْجٌ رَدَدْتَ عَلٰى زَوْجِهَا مَا اَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ ذٰلِكَ –

অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমাদের কোনো মহিলা যদি আসে, যদি সে তোমাদের ধর্মমতের না হয় তাহলে সেই মহিলাকে আমাদের কাছে ফেরত দিবে। আর যদি সে তোমাদের দীন গ্রহণ করে থাকে এবং তার স্বামী [আমাদের কাছে] থাকে, তাহলে স্বামী যে দেন-মোহর দিয়েছিল তা ফেরত দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও এ রকম শর্ত ছিল।

এ মত অনুসারে আয়াতগুলো সন্ধিচুক্তির সমার্থবোধক এবং তার পুনরুল্লেখ মাত্র, এ মতই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। কারণ তা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওয়াদা পালন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। এক পক্ষের একক়ভাবে সন্ধিচুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাফ করা বা কোনো শর্ত বাতিল করা সম্ভব নয়। তা ইসলামের মূল শিক্ষারও পরিপন্থি, সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, এ আয়াতগুলো সন্ধিচুক্তির বিপরীত নয় বরং পরিপূরক। –[রাওয়ায়ে]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'মিন মুহাজির মহিলাদের কিভাবে পরীক্ষা করতেন? : যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসত তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, সে আল্লাহর তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালতের প্রতি ঈমানদার কিনা এবং কেবলমাত্র আল্লাহর এবং রাসূলের জন্যই দেশত্যাগ করেছেন কিনা? এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। স্বামী বিরাগী হয়ে ঘর হতে পালিয়ে এসেছে, নাকি এখানকার কোনো মুসলমানের প্রেমে পড়ে এসেছে অথবা অন্য কোনো বৈষয়িক স্বার্থ বা উদ্দেশ্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে– যেসব মহিলা এসব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিতে পারত কেবলমাত্র তাদেরকেই মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হতো, এতদ্ব্যতীত অন্য সকলকেই মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হতো। –[তাবারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ তাদের সামনে এ আয়াতগুলো পড়ে শুনাতেন। এটাই ছিল পরীক্ষা। আবার কেউ কেউ বলেছেন. তাদের ঈমানের পরীক্ষা হলো কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকৃতি মাত্র। −[ফাতহুল কাদীর]

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ-এর অর্থ : পূর্বে বলা হয়েছে− যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে আসবে, পরীক্ষা নেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, তারা মু'মিন তাহলে তাদেরকে আর তাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এখানে কেন ফেরত দেওয়া যাবে না তার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে, বলা হয়েছে, "না, তারা কাফেরদের জন্য হলাল, আর না কাফের পুরুষেরা তাদের জন্য হালাল।"

ইতঃপূর্বে মুসলমান কাফের-এর মধ্যে বিবাহ হতে পারত। এ আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে বিয়ে-শাদিকে হারাম ঘোষণা করা হলো।

এটা হতে এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, কোনো স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার কাফের স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক করে রাখতে হবে। ইসলামই হলো এটার কারণ। কোনো মুসলিম মহিলা কোনো কাফের স্বামীর জন্য হালাল নয়। −[ফাতহুল কাদীর]

মাসআলা : সুতরাং ধর্মত্যাগের সাথে সাথে বিবাহ সম্পর্কও ছেদন হয়ে যায়।

১. ইচ্ছাকৃত তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করতে হয় না। কাজির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন নষ্ট করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। এ কারণেই নারীদেরকে সন্ধিচুক্তি হতে পৃথক রাখা হয়েছে। তাই বলা হয়− فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ আল্লাহর কোনো কার্যই হিকমত হতে খালি নয়।

২. বিবাহিতা স্ত্রীলোক হিজরত করে দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে আসলে তার বিবাহ স্বতই ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর যে কোনো মুসলমান মোহরানা দিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

৩. যে পুরুষ মুসলমান হবে তার স্ত্রী কাফের থেকে গেলে তাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসলমান মুহাজির নারীর স্বামীদেরকে বিবাহের সময় বা পরে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছিল তা সবই ফিরিয়ে দাও। কারণ ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা যখন তাদের স্ত্রীদেরকে হারিয়েছে তখন সম্পদগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে উভয় রকমের ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ এমন যেন না হয় স্ত্রীও গেল মালও গেল।

এ নির্দেশ সেই মুহাজির মহিলাকে দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা মুসলমানদেরকে। সুতরাং এটা বায়তুল মাল হতে বা চাঁদা করে মুসলমানদেরকে আদায় করতে হবে। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ কথা স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হিজরত করে আগমনকারিণী মুসলমান নারীদের পূর্ব বিবাহ তাদের কাফের স্বামী হতে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং এ মহিলা ঐ কাফেরের জন্য হারাম হয়ে গেছে। এ আয়াতে সেই হুকুমটির পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, ঐ হিজরতকারিণী মহিলার বিবাহ মুসলমান পুরুষের সাথে সংঘটিত হতে পারে। যদিও সাবেক স্বামী জীবিত রয়েছে এবং সে এটাকে তালাকও দেয়নি, তথাপিও এমতাবস্থায় যেহেতু শরিয়তে ইসলাম তাদের বিবাহ বন্ধন বিনষ্ট করে দিয়েছে, তাই অন্য পুরুষ তাকে বিবাহ করা হালাল হবে। তবে স্ত্রীকে নতুনভাবে মোহর দেওয়া আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন−اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা মোহর দিবে তখন বিবাহ করতে পারবে। মূলত শব্দ দ্বারা মোহরকে বিবাহের জন্য শর্ত বুঝানো হয়নি। কারণ উম্মতে মুসলিমাহ-এর সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ মোহর-এর উপর মওকুফ বা মোহর বিবাহের শর্ত নয়। কিন্তু মোহর আদায় করা একান্ত আবশ্যক। সম্ভবত মোহরকে শর্ত হিসেবে এ জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাদেরকে তো কাফের স্বামী হতে মুক্ত করানোর জন্য মোহর দেওয়া হয়েছে। এটাই তার মোহরের জন্য যথেষ্ট, নতুন মোহরের আবশ্যক নেই; বরং জানতে হবে যে তাকে এখন বিবাহ করতে হলে নতুন মোহর দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : عِصَمٌ শব্দটি عِصْمَةٌ-এর বহুবচন, এটার আসল অর্থ− সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বুঝানো হয়েছে। আর كَوَافِرُ শব্দটি كَافِرَةٌ-এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হলো, "তোমরা কাফের নারীদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক বজায় রেখো না।"

এখানে যেসব মুসলমান কাফের মহিলাদেরকে নিজেদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁদেরকে সেসব কাফের মহিলাদেরকে মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যে সাহাবীর বিবাহে কোনো মুশরিক নারী ছিল তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর (রা.)-এর বিবাহে দু'জন মুশরিকা নারী ছিল, তিনি সে দু'জনকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পরিত্যাগ করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াতে কেবল মুশরিক নারীদেরকে মুসলমান পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে, আহলে কিতাব মহিলাদেরকে হারাম করা হয়নি। কিতাবী মহিলার স্বামী ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কারণ মুসলমান পুরুষ কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। -[কুরতুবী, মাআরিফ]

এ আয়াত হতে প্রাপ্ত শরয়ী বিধান :

১. কোনো স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্ত্রীলোক কাফের স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে, যেমন তার জন্য তার স্বামী হারাম হবে। لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ এবং তাদের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার কারণ :

ক. হানাফী মাযহাব মতে দেশ ভিন্ন হওয়া। অর্থাৎ একজন দারুল ইসলামে অপরজন দারুল হারবে হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর উভয় যদি দারুল ইসলামে হয় তখন কাফের স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্ক থাকবে। আর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

খ. ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ হলো ইসলাম, তবে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ করার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পূর্বসম্পর্ক টিকে থাকবে, আর গ্রহণ না করলে ছিন্ন হয়ে যাবে। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

২. পুরুষ ইসলাম গ্রহণের পরও তার স্ত্রী কাফের থেকে গেলে তাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা জায়েজ নয়। এটার দলিল কুরআনের এই আয়াত وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ অর্থাৎ কাফের মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

৩. যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসবে তার বিবাহ স্বতই ছিন্ন হয়ে যাবে। এখানে যেই মুসলমানই চাবে মোহরানা দিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

৪. দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মধ্যে যদি সন্ধি-সমঝোতার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে কাফেরদের যেসব স্ত্রী মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরত করে এসেছে তাদের মোহরানা মুসলমানদের পক্ষ হতে ফেরত দেওয়া এবং মুসলমানদের (বিবাহিতা) কাফের স্ত্রীদের যারা দারুল কুফরে রয়ে গেছে মোহরানা কাফেরদের নিকট হতে ফেরত পাওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামি রাষ্ট্রকে দারুল কুফরের রাষ্ট্রের সাথে একটা মীমাংসায় আসতে হবে।

قَوْلُهُ وَاسْئَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ الخ : অর্থাৎ মহিলাগণ মুসলমান হয়ে মক্কা হতে মদীনায় উপস্থিত হলে তাদেরকে মক্কায় পুনরায় পাঠানো যাবে না; কিন্তু ঐ সকল মুশরিক মহিলাগণের মুশরিক স্বামীগণ মোহর ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে যা প্রদান করেছে তাও তোমরা মুসলমানগণ তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে। আর তদ্রূপভাবে কোনো মুসলমান মহিলা (আল্লাহ না করুক) যদি মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে যায়, তবে তাদেরকে তোমরা মুসলমানগণ মোহর ইত্যাদির বিনিময় যা দান করেছিলে তাও কাফেরগণ হতে ফেরত চেয়ে নিবে।

এ বর্ণনাটি যদিও বলা হয়েছে, তবে কোনো মুসলমান মহিলা মুরতাদ হয়ে কাফেরের ধর্মমতে পুনরায় উপনীত হয়নি। তবে কিছু সংখ্যক কাফের মহিলার স্বামী ইসলাম গ্রহণের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং কাফির রয়ে গেছে। যদি এমন কেউ মুরতাদ হতো, তবে তার জন্য এ হুকুম বলবৎ থাকত। সুতরাং পক্ষদ্বয় থেকে যে মোহর ইত্যাদি দান করা হয়েছে সে ব্যাপারে উভয় পক্ষ সমঝোতায় বসে মীমাংসা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ব্যক্তি দুই দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তথা আদায়কৃত মোহরানাও পাবে না, স্ত্রীকেও পাবে না। এটা আল্লাহ পছন্দ করেননি। তা-ই মোহরানা ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটাই আল্লাহর প্রকৃত বিধান। তিনি তোমাদের উপর এ বিধান প্রণয়ন করেন। আর আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও মহাবিচারক।

١١. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اَيْ وَاحِدَةٌ فَاَكْثَرَ مِنْهُنَّ اَوْ شَيْءٌ مِنْ مُهُوْرِهِنَّ بِالذَّهَابِ اِلَى الْكُفَّارِ مُرْتَدَّاتٍ فَعَاقَبْتُمْ فَغَزَوْتُمْ وَغَنِمْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا لِفَوَاتِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ الْكُفَّارِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ وَقَدْ فَعَلَ الْمُؤْمِنُوْنَ مَآ اُمِرُوْا بِهٖ مِنَ الْاِيْتَاءِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّ ارْتَفَعَ هٰذَا الْحُكْمُ .

١٢. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ وَاْدِ الْبَنَاتِ اَيْ دَفْنِهِنَّ اَحْيَاءً خَوْفَ الْعَارِ وَالْفَقْرِ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ اَيْ بِوَلَدٍ مَلْقُوْطٍ يَنْسِبْنَهٗ اِلَى الزَّوْجِ . وَ وَصَفَ بِصِفَةِ الْوَلَدِ الْحَقِيْقِيِّ فَاِنَّ الْاُمَّ اِذَا وَضَعَتْهُ سَقَطَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ هُوَ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى كَتَرْكِ النِّيَاحَةِ وَتَمْزِيْقِ الثِّيَابِ وَجَزِّ الشَّعْرِ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَخَمْشِ الْوَجْهِ فَبَايِعْهُنَّ فَعَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ بِالْقَوْلِ وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অনুবাদ :

১১. আর যদি তোমাদের হাতছাড়া হয় তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হতে কেউ অর্থাৎ এক বা একাধিক, কিংবা তাদের মোহর হতে কোনো কিছু। গমনের কারণে কাফেরদের নিকট ধর্মত্যাগী হয়ে। অতঃপর তোমরা সুযোগ লাভ করেছ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার ফলে গনিমত স্বরূপ পেয়েছ তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়েছে তাদেরকে প্রদান করো গনিমত হতে সেই পরিমাণ যা তারা ব্যয় করেছে। যেহেতু কাফেরদের পক্ষ হতে তাদের তা হাতছাড়া হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর উপর তোমরা ঈমান রাখো মুসলমানগণ এ বিধানের উপর আমল করতে গিয়ে কাফের ও মু'মিনদেরকে স্ব-স্ব প্রাপ্য দান করে। অতঃপর এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

১২. হে রাসূল! যখন মু'মিন নারীগণ আপনার নিকট এসে বাইয়াত করে, এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না যেমন জাহিলিয়া যুগে কন্যা সন্তানকে জীবিত সমাধিস্থ করার প্রচলন ছিল। লজ্জা ও দারিদ্র্যের ভয়ে তাদেরকে জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করা হতো। আর তারা স্বয়ং জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না। অর্থাৎ 'লোকতা' তথা পথে পাওয়া সন্তানকে স্বামীর প্রতি সম্বন্ধ করে। এখানে প্রকৃত সন্তানের অর্থ প্রকাশক শব্দ এ জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যেহেতু মা যখন সন্তান প্রসব করে তখন উক্ত সন্তান তার সম্মুখেই জন্মলাভ করবে। আর সৎকর্মে আপনার অবাধ্যাচরণ করবে না বিধান সম্মত কাজ, যা আল্লাহর বিধানের সাথে সঙ্গত হবে। যেমন- গলা ফাটিয়ে কান্না, কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা, চুল কেটে ফেলা, মুখাবয়ব বিক্ষত করা ইত্যাদি কাজ হতে বিরত থাকবে। তবে আপনি তাদেরকে বাইয়াত করুন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে মহিলাগণের বাইয়াত করেন; কিন্তু তাদের কারো সাথে মুসাফাহা করেননি। আর আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) -এর মেয়ে উম্মুল হাকীম মুরতাদ হয়ে কাফেরদের সাথে যোগদান করেছে এবং বনী ছাকীফ-এর একজন পুরুষের সাথে বিবাহ করে ফেলেছে।

তার মূল কারণ এই ছিল যে, ধর্ম ত্যাগের কারণে যে সকল নারীগণের বিবাহ বন্ধন বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদেরকে দেন-মোহর ফেরত নেওয়া ও দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ তা অবমাননা করেনি; বরং যেভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই প্রতিপালন করেছিল। কিন্তু কাফেরগণ তা অমান্য করেছিল এবং মুরতাদ মহিলাদের মোহর মুসলমানদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করে। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ ..... مُؤْمِنُوْنَ আয়াত নাজিল করেন।

* আল্লামা কুরতুবী (র.)-এর মতে উক্ত মোহর ফেরত চেয়ে মুসলমানগণ কাফিরদের নিকট পত্র লিখেছিল। তারা প্রতি উত্তরে মোহর ফেরত দিতে অস্বীকার জানিয়ে বার্তা লিখলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

* মুজাহিদ ও ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, এ আয়াত উক্ত কাফেরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তিপত্রও ছিল না। তাদের নিকট যখন কোনো স্ত্রী লোক পালিয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ ..... فَعَاقَبْتُمْ (الْآيَةُ) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ (الْآيَةُ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটার অর্থ করেছেন, তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্যের কারো স্ত্রী যদি কাফেরদের কাছে পালিয়ে যায়, তাহলে যার স্ত্রী পালিয়ে গেছে তাকে গনিমত হতে ততটুকু অর্থ আদায় করে দাও, যতটুকু সে তার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে দিয়েছিল।

কেউ কেউ এটার অর্থ করেছেন, তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেওয়া মোহরানা হতে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের নিকট হতে ফেরত না পাও আর এরপরই তোমাদের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে যাদের স্ত্রীরা ঐদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে এতটা সম্পদ আদায় করে দাও যা তাদের দেওয়া মোহরানার সমান হবে।

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মুহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও যাদের স্ত্রী কাফেরদের কাছে রয়ে গেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

মুসলিম রমণী কি মুরতাদ হয়েছে, আর তারা কতজন? : কোনো মুসলমান মহিলা মুরতাদ হয়েছিল কি, হলে তারা কতজন ছিল? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, মাত্র আইয়াস ইবনে গমন এর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল, কিছুকাল পর তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে সর্বমোট ছয়জন মহিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। একজন উক্ত اُمُّ الْحَكَمِ ছিলেন, বাকি পাঁচজনকে হিজরতের সময়ই মক্কাতে আটক রাখা হয়েছিল। যখন وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখনও তারা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। ফলে তাদের স্বামীগণকে কাফেরগণ যা মোহর স্বরূপ দেওয়ার কথা ছিল তা না দেওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে গনিমতের মাল হতে তা দিয়ে দিলেন। এতে এ কথাই স্বীকৃত হলো যে, মাত্র একজনই মুরতাদ ছিল। বাকি পাঁচজন প্রথমেই কুফরির উপর রয়ে গেল এবং মুসলমানদের বিয়ে বন্ধন হতে পৃথক হয়ে গেল। -[মাযহারী, মা'আরিফ]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট দলে দলে লোকজন কুরাইশ বংশ হতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সাফা পর্বতের উপর নিজেই পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন, অতঃপর যখন মহিলাগণ বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসতে লাগল তখনই এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। -[আশরাফী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ইবনে জারীর, কাতাদাহ, ইবনে আবূ হাতিম হতে বিভিন্ন বর্ণনা মতে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কায় হযরত ওমর (রা.)-কে হুযূর ﷺ মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং মদীনায়ও হযরত ওমর (রা.)-কে একটি বাড়িতে আনসারদের নারীগণকে একসাথে করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং পরে বাইয়াত করার জন্য আদেশ প্রদান করেন, সে প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাজিল হয়।

'মু'মিনা মহিলারা আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করো' এ কথা কেন বলা হয়নি? : ইমাম রাযী (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এর কারণ দু'টি–

এক. এ আয়াতেই যেখানে 'শিরক করবে না বলা হয়েছে' এতে তাঁদের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের আবার পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুই. মুহাজির মহিলাগণ আসছিলেন 'দারুল হারব' হতে, যার ফলে তাঁদের ইসলামি শরিয়ত-এর জ্ঞান ছিল না, এ কারণেই তাদের পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু মু'মিনা মহিলাগণ দারুল ইসলামেই আছেন, তাঁরা ইসলামি বিধি-বিধান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অতএব, তাদের পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا : এখানে শিরক বলতে شِرْكٌ فِى الرَّبُوْبِيَّةِ এবং شِرْكٌ فِى الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা সর্বপ্রকারের শিরক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আল্লাহর সাথে কোনো রকমের শিরক তারা করবে না।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ শেষ হলে স্ত্রীলোকদের বাইয়াত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাফা পাহাড়ের উপর বসে থেকে হযরত ওমর (রা.)-কে স্ত্রীলোকদের বাইয়াত নিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন সেখানে হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উত্‌বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করে উপস্থিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে বাইয়াত করাচ্ছি এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করবে না। তখন হিন্দা মাথা তুলে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা মূর্তি পূজা করেছি, আপনি আমাদের উপর এমন এক শর্ত আরোপ করেছেন যা পুরুষদের উপর আরোপ করতে দেখিনি। আপনি পুরুষদের বাইয়াত নিয়েছেন কেবল ইসলাম এবং জিহাদের শর্তের ভিত্তিতে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চুরি করবে না, তখন হিন্দা বলল, আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমি তাকে না বলে তার সম্পদ হতে কিছু গ্রহণ করেছি, জানি না তা আমার জন্য হালাল না হারাম? হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু হাসলেন এবং তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, তুমি কি হিন্দা বিনতে উতবা? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী! আমাব অতীতের দোষ ক্ষমা করুন আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনা-ব্যভিচার করবে না। তখন হিন্দা বলল, স্বাধীন স্ত্রীলোক কি জেনা-ব্যভিচার করতে পারে? অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোনো স্বাধীনা মহিলা কখনো জেনা করে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না। এবার হিন্দা বলল, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ছোট হতে লালন-পালন করে বড় করেছি; কিন্তু বড় হবার পর আপনারা তাদেরকে হত্যা করলেন। আপনারা এবং তারা এ বিষয়ে ভালো জানেন। তার ছেলে হানযালা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) হাসতে হাসতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও একটু হাসলেন। অতঃপর বললেন, কোনো মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না। অর্থাৎ অন্য কোনো লোক দ্বারা গর্ভবতী হয়ে স্বামীর বলে চালিয়ে দেওয়া। তখন হিন্দা বলল, আল্লাহর কসম, মিথ্যা দোষারোপ করা একটা জঘন্য কাজ, আপনি আমাদেরকে উত্তম চরিত্র ও সৎপথের সন্ধানই দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো স্পষ্ট পরিচিত বিষয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এ কথা শুনে হিন্দা বলল, আল্লাহর কসম, আমরা এখানে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার মনোবৃত্তি নিয়ে বসিনি। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ : সন্তান হত্যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়া যুগে কন্যা সন্তানদেরকে অনেক লোকই জীবন্ত কবর দিত। অনেকেই এটাকে ছওয়াবের কাজ মনে করত। এ আয়াতে এটাকে নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া যে কোনো প্রকারে সন্তান হত্যা করাও এটার অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর মতে গর্ভপাত করানোও সন্তান হত্যার মধ্যে গণ্য। ফিক্‌হবিদদের মধ্যে অনেকেই ভ্রূণে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করানোকে হত্যার মধ্যে গণ্য হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। –[দুররুল মুখতার, ফিক্‌হুস সুন্নাহ, সুবুলুস সালাম]

قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ الخ : উক্ত بُهْتَانٌ-এর অর্থ– মিথ্যা তোহমত বা অপবাদ রটানো। بُهْتَانٌ শব্দের সাথে بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ-এর قَيْد লাগানো হয়েছে। অর্থ– হস্ত ও পদ -এর মধ্যস্থলের তোহমত যেন না দেয়। এ অপবাদ দেওয়া হতে এ কারণে নিষেধ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেকের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ নিজেই ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। সুতরাং গুনাহ করার সময় কিয়ামতের দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আর بُهْتَانٌ শব্দটি পুরুষ-নারী, মুসলিম, অমুসলিম [কাফের]-এর জন্যও ব্যবহার করা হারাম। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কাফেরের জন্যও হালাল নয়। সুতরাং নিজ স্বামীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া স্ত্রীর জন্য অতি জঘন্যতম অপরাধ হবে।

بِبُهْتَانٍ-এর এক অর্থ– চুগলখোরি অর্থাৎ এক ব্যক্তির কথা অপর ব্যক্তির নিকট বলা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) بُهْتَانٌ-এর অর্থ বলেছেন, এমন কোনো সন্তানকে স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত করো না যে সন্তান তার নয়।

বুহতান -এর পদ্ধতি : بُهْتَانٌ-এর পদ্ধতি বিবিধ হতে পারে–

১. স্ত্রী অন্য কারো সন্তান আনয়ন করে বলত যে, এটা তোমার ঔরসজাত সন্তান এবং এটা তোমার বংশ। –[কাবীর]

২. পর পুরুষের সাথে যৌন সংযোগ করে গর্ভধারণ করত, আর স্বামীর সাথেও সহবাস চলত যাতে সন্তান স্বামীর পক্ষ থেকেই বিবেচিত হতো। "كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ "اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ অর্থাৎ যেভাবে ফকীহগণ বলেছেন সন্তান বিছানা ওয়ালার জন্য নির্ধারিত। (মা'আরিফ) বর্তমানেও এমন নিকৃষ্টতম কুসংস্কার রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে স্ত্রীলোক কোনো বংশে এমন কোনো সন্তান নিয়ে আসে [প্রসব করে] যা সেই বংশীয় সন্তান নয়, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

قَوْلُهُ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ : এ সংক্ষিপ্ত কথাটিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আইনের ধারা বলা হয়েছে।

১. প্রথম ধারাটি এই যে, নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্যও 'ভালো কাজের আনুগত্য' হওয়ার শর্তাধীন। অথচ নবী করীম ﷺ কখনও অবৈধ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন এমন সন্দেহের এক বিন্দু অবকাশও তাঁর সম্পর্কে থাকতে পারে না। এটা হতে স্বতই একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা শক্তিরই আনুগত্য করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন ভালো কাজের আনুগত্য হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তখন বিনা শর্তে নিরঙ্কুশ আনুগত্য পেতে পারে এমন অধিকার কারো থাকতে পারে না। কাজেই আল্লাহর আইনের পরিপন্থি কারো কোনো হুকুম-নির্দেশ, আইন বা নিয়ম-বিধান কখনো মেনে নেওয়া যেতে পারে না। নবী করীম ﷺ এ কথাটি নিজ ভাষায় এভাবে বলেছেন– لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ "আল্লাহর নাফরমানি করে অন্য কারো আনুগত্য বা আইন-নির্দেশ মেনে নেওয়া যেতে পারে না। আনুগত্য করা যেতে পারে কেবল মাত্র ভালো বলে পরিচিত কাজে।" –[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

বস্তুত এ কথাটি ইসলামে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ভিত্তি প্রস্তর। প্রত্যেকটি কাজ যা ইসলামি আইনের বিপরীত তাই অপরাধ। এটা একটি মৌলিক নীতি। কাজেই এ ধরনের কোনো কাজ করার নির্দেশ অন্য কাউকেও দেওয়া কারো অধিকার নেই। ইসলামি আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজের নির্দেশ যে দেয় সে-ও অপরাধী। কোনো অধীনস্থ কর্মচারী এ কৈফিয়ত দিয়ে বেঁচে যেতে পারে না যে, তার উপরস্থ অফিসার তাকে এমন কাজের নির্দেশ দিয়েছিল, যা ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

২. আইনের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, এ আয়াতে পাঁচটি নেতিবাচক নির্দেশ দেওয়ার পর ইতিবাচক নির্দেশ মাত্র একটি দেওয়া হয়েছে। তা হলো সমগ্র নেক, ন্যায়সঙ্গত ও ভালো কাজে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশ অনুসরণ করা। এটার পূর্বে যেসব বড় বড় অন্যায় ও পাপ কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এমন যাতে ইসলাম-পূর্বকালের স্ত্রীলোকেরা জড়িত ছিল। এ বাইয়াতে তাদের নিকট হতে সেসব কাজ হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ভালো ও ন্যায়সঙ্গত কাজসমূহের কোনো তালিকা উল্লেখ করা হয়নি এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে এ ওয়াদা নেওয়া হয়নি যে, এসব কাজ করার নির্দেশ নবী করীম ﷺ দিলে তা তোমরা পালন করবে। এখন ভালো ও ন্যায়সঙ্গত কাজ যদি শুধু সেই কয়টি হয় যার উল্লেখ কুরআন মাজীদে রয়েছে, তাহলে এ পর্যায়ে প্রতিশ্রুতির ভাষা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি করবে না, কিংবা কুরআনী বিধানের নাফরমানি করবে না; কিন্তু তা করা হয়নি। এখানকার ভাষা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নেক কাজের নির্দেশ দিবেন তোমরা তাতে তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করবে না। এটা হতে একটি কথা স্বতই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সমাজ সংস্কারের জন্য নবী করীম ﷺ -কে বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ অবশ্যই পালনীয়−কুরআন মজীদে তার উল্লেখ থাকুক কি না-ই থাকুক।

এ আইনগত ক্ষমতা ও এখতিয়ারের ভিত্তিতে রাসূলে কারীম ﷺ বাইয়াত গ্রহণকালে তদানীন্তন আরবসমাজের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবস্থিত অনেক বড় বড় অন্যায় ও পাপ কাজ পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন এবং অনেক অনেক কাজের নির্দেশ দিলেন, কুরআন মাজীদে যার উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ فَبَايِعْهُنَّ : فَبَايِعْهُنَّ শব্দটি হলো তারকীবে جَوَابٌ অর্থাৎ এসব শর্তের ভিত্তিতে যদি তারা বাইয়াত গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তুমি তাদেরকে বাইয়াত করাও।

বাইয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি : মুফাস্সিরগণের মধ্যে বাইয়াতের পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর দেখা যায়−

১. কেউ কেউ বলেছেন, বাইয়াত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের হাতে হাত দিতেন না। একটা কাপড়ের এক মাথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে থাকত অপর মাথা মহিলাদের হাতে থাকত, এভাবেই বাইয়াত সম্পন্ন হতো।

২. আর কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইয়াতের শর্তগুলো নিজ মুখে বলতেন, তখন হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীলোকদের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। এটা কালবীর অভিমত।

৩. আবার কেউ কেউ বলেছেন, কেবল কথার মধ্যে সেই বাইয়াত গ্রহণ করা হতো।

৪. আর একদলের মতে এক বাটি পানিতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত ভিজাতেন পরে স্ত্রীলোকেরা ভিজাত।

তবে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বেগানা মহিলার হাতে হাত রাখেননি। অর্থাৎ আজনবী মহিলার সাথে মোসাফাহা করেননি।

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! বাইয়াত নেওয়ার সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাত কখনো কোনো মহিলার হাত স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তিনি নারী সমাজের বাইয়াত নেওয়ার সময় শুধু মুখে বলতেন যে, আমি তোমার নিকট হতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। −[বুখারী, ইবনে মাজাহ]

কখন কোথায় কতবার বাইয়াত করানো হয়েছিল? : হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা যা বুঝায় তাতেই প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে বাইয়াত মাত্র হোদায়বিয়া -এর পরেই হয়েছে যে কেবল তা নয়; বরং মক্কা বিজয়ের দিবসেও মুহাম্মদ ﷺ পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ করার পর সাফা পাহাড়ের উপর মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ বাইয়াতের শব্দাবলি বারংবার তেলাওয়াত করিয়ে সাফা পাহাড়ের নিম্নে একত্রিত মহিলাগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এভাবে আরো বিভিন্ন স্থানে বাইয়াত নেওয়া হয়। সুতরাং এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাইয়াতের ব্যাপারটি বারংবার সংঘটিত হয়েছে। −[মা'আরেফুল কুরআন]

অনুবাদ :

١٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُوْدُ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَىْ مِنْ ثَوَابِهَا مَعَ اِيْقَانِهِمْ بِهَا لِعِنَادِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهٖ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ الْكَائِنُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ اَىْ الْمَقْبُوْرِيْنَ مِنْ خَيْرِ الْاٰخِرَةِ اِذَا تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ مَقَاعِدُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ كَانُوْا اٰمَنُوْا وَمَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ النَّارِ .

১৩. হে ঈমানদারগণ! সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা ইহুদি সম্প্রদায়। তারা আখেরাত হতে হতাশ হয়েছে অর্থাৎ আখেরাতের ছওয়াব হতে, যদিও তারা তা দৃঢ়তা সহকারেই বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাদের শত্রুতার কারণে। যেমন হতাশ হয়েছে কাফেরগণ যারা অন্তর্ভুক্ত হবে কবরবাসীগণ হতে অর্থাৎ সমাধিস্থ অবস্থায়, তারা আখেরাতের কল্যাণ হতে হতাশ হবে। যখন তাদেরকে বেহেশতের ঠিকানা প্রদর্শিত হবে, যা তারা ঈমানদার হওয়ার ক্ষেত্রে লাভ করত এবং জাহান্নাম যাতে তারা অবস্থান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا ..... الْقُبُوْرِ আয়াতের শানে নুযূল : কিছু সংখ্যক গরিব ঈমানদারগণ জীবিকা নির্বাহের আশা ভরসায় ইহুদিগণের সাথে গভীর যোগাযোগ রাখতেন, এমনকি মুসলমানদের কিছু খোঁজ-খবর ইহুদিগণকে পৌঁছে দিতেন। তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[আশরাফী]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুসলমানদেরকে যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর আক্রোশ ও গজবের পাত্র কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নেই। কবর হতে কেউ জ্যান্ত হয়েও উঠতে পারেন বলে কাফেররা যেমন বিশ্বাস করে না, উল্লিখিত কাফেরজাতিও তেমনি আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। কবরে কাফেররা যেমন আল্লাহর রহমত হতে চির নিরাশ হয়ে গেছে, এরাও তদ্রূপ আখেরাতে আল্লাহর রহমত লাভে নিরাশ হয়ে রয়েছে।

অথবা, এই বলা যেতে পারে যে, যেভাবে কাফিরগণ স্বীয় মুরদাগণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, যাদের মৃত্যু হয়ে গেছে তারা চিরতরে তাদের হতে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গেছে। কারণ তাদের কিয়মাত সংঘটিত হওয়ার উপর বিশ্বাস নেই। তদ্রূপ ইহুদিগণ আখেরাতের ছওয়াব হতে নিরাশ হয়ে গেছে, কেননা জেনে শুনে সত্যকে তারা গোপন করেছে এবং নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করেছে। তাদের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, কিয়ামতে তাদের এটার উপর নির্ঘাত বিশ্বাস জন্মেছে সুতরাং তাহলে এমন বেঈমান গোষ্ঠির সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারিছ (রা.) কোনো কোনো ইহুদির সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন ফলে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে এরূপ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন।

-[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সেসব লোকদেরকে বন্ধু বানিয়ো না যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা গজব নাজিল করেছেন।"

এ সূরার প্রথমেই আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে বলা হয়েছিল, এখানে আবারও সব শেষ আয়াতেও মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে তারা যেন যেসব লোকদের উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে বন্ধু না বানায়। পুনর্বার আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এটার প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা। −[সাফওয়া]

قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? : এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন (র.)-এর মতে ইহুদি জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ শানে নুযূল প্রসঙ্গে তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২. অথবা, মক্কার মুশরিকগণ হতে পারে। কারণ সূরার প্রথমাংশে যেভাবে হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.)-কে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাও ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত মাত্র এবং শেষ সাবধানতা স্বরূপ।

৩. আবার অনেকেই আয়াতকে সাধারণ নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ হবে। এটাই অতি উত্তম ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হয়। কারণ যখন যারাই মুসলমান তথা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কিভাবে করা যাবে।

هٰكَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَكَلْبِىْ وَمُقَاتِلُ وَمَنْصُوْرُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ يَئِسُوْا مِنْ ..... اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ : এটার দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, তারা পরকালীন কল্যাণ ও ছওয়াব হতে তেমনিভাবে নিরাশাগ্রস্ত, যেমন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অমান্যকারী লোকেরা নিরাশাগ্রস্ত হয়ে থাকে একথা হতে যে, তাদের নিকট আত্মীয় লোকেরা যারা মরে গেছে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে কখনো পুনরুত্থিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, কাতাদাহ, যাহহাক (র.) প্রমুখ এ অর্থ বলেছেন।

এটার দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, তারা পরকালীন রহমত ও মাগফিরাত হতে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফেররা সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে নিরাশ। কেননা তারা যে আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে সে বিষয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল, মানসূর (র.) প্রমুখ হতে এ অর্থই বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। −[মাযহারী]

سُوْرَةُ الصَّفِّ : সূরা আস্-সাফ্ফ

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এখানকার صَفٌّ শব্দটি হতে অত্র সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আস্ সাফ্ফ' তথা এ সূরায় উল্লিখিত 'সাফ্ফ' শব্দের মাধ্যমে একে صَفٌّ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল হাওয়্যারিয়্যীন এবং একে সূরাতু ঈসাও বলা হয়। এতে ২ রুকূ', ১৪টি আয়াত ২২১টি বাক্য এবং ৯২৬টি অক্ষর রয়েছে। −[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি; কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাজিল হয়ে থাকবে। কেননা এতে যে অবস্থাবলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ১−৪ আয়াত কয়টি ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫−৭ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর উম্মতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দীন ইসলামের সাথে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয় যা হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল।

৮−৯ আয়াতে পুনঃ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও তাদের সাথে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন এটা পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই। আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন মহান রাসূলের প্রচারিত দীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই।

১০−১৩ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা। পরকালে এটার ফলশ্রুতিতে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং চির সুখের জান্নাত পাওয়া যাবে, আর দুনিয়াতেও বিজয় ও সাফল্য পাওয়া যাবে।

১৪ নম্বর আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা যেভাবে আল্লাহর পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে মু'মিনরাও যেন আল্লাহর আনসার ও সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কাফেরদের মোকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল।

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আস্-সাফ্‌ফ মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

اَرْبَعَ عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَجِيْئَ بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ.

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে اَللّٰه শব্দের ل হরফটি অতিরিক্ত। আর প্রাণীবাচক مَنْ অব্যয়টির পরিবর্তে অপ্রাণীবাচক مَا অব্যয়টি সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে বিজ্ঞানময় তাঁর সৃষ্টিকার্যে।

٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ اِذَا انْهَزَمْتُمْ بِاُحُدٍ.

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন বল জিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারে যা তোমরা কর না। যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় হয়েছে।

٣. كَبُرَ عَظُمَ مَقْتًا تَمْيِيْزٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا فَاعِلُ كَبُرَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

৩. এরূপ কথা জঘন্য বড়োই অসন্তোষজনক এটা تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত। আল্লাহর নিকট যে, তোমরা বলবে এটা كَبُرَ-এর فَاعِلْ যা তোমরা কর না।

٤. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ يَنْصُرُ وَيُكْرِمُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا حَالٌ اَىْ صَافِّيْنَ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ مُلْزَقٌ بَعْضُهُ اِلٰى بَعْضٍ ثَابِتٌ

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন সাহায্য করেন এবং সম্মানিত করেন। সেই সমস্ত লোককে যারা আল্লাহর রাহে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে এটা হালরূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যেন তারা সুদৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ একে অন্যের সাথে মিলিতভাবে, সুদৃঢ়।

٥. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ قَالُوْا اِنَّهٗ اٰدَرُ اَىْ مُنْتَفِخُ الْخُصْيَةِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَكَذَّبُوْهُ وَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط اَلْجُمْلَةُ حَالٌ وَالرَّسُوْلُ يُحْتَرَمُ فَلَمَّا زَاغُوْا عَدَلُوْا عَنِ الْحَقِّ بِاِيْذَائِهٖ اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط اَمَالَهَا عَنِ الْهُدٰى عَلٰى وُفْقِ مَا قَدَّرَهٗ فِى الْاَزَلِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ . الْكٰفِرِيْنَ فِىْ عِلْمِهٖ .

৫. আর স্মরণ করো যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো? লোকেরা বলাবলি শুরু করে যে, তাঁর একশিরা রোগ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর একটি অণ্ডকোষ অনেক বড় হয়েছে। বাস্তবে এমন কিছুই ছিল না। তারা মিথ্যা বলেছিল। অথচ قد অব্যয়টি গুরুত্বারোপের জন্য তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল বাক্যটি হাল রূপে ব্যবহৃত আর রাসূল হলেন অপরিহার্যরূপে সম্মান প্রদর্শনযোগ্য। অনন্তর যখন তারা বক্র পথ অবলম্বন করল হযরত মূসা (আ.)-কে কষ্ট দানের মাধ্যমে সত্য-বিচ্যুত হলো। তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন হিদায়েত বিমুখ করে দিলেন, তাদের ব্যাপারে সৃষ্টির আদিতে গৃহীত ফয়সালা মোতাবেক। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না যারা আল্লাহর ইলমে কাফেররূপে সাব্যস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا : صَفًّا শব্দটি مَصْدَرٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এতে فِعْلٌ ও مَفْعُوْلٌ উভয়ই مَحْذُوْفٌ রয়েছে। আসলে বাক্যটি ছিল يَصُفُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ صَفًّا কেউ কেউ صَفًّا শব্দটিকে مَصْدَرٌ যা حَالٌ -এর স্থানে বলে মনে করেন। তখন আসল عِبَارَتٌ হবে এ রকম صَافِّيْنَ اَوْ مَصْفُوْفِيْنَ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ : এ বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ - يُقَاتِلُوْنَ -এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে, صَفًّا -কে حَالٌ হিসাবে গ্রহণ করলে صَفًّا -এর ضَمِيْرٌ হতেও এ বাক্যটিকে حَالٌ মনে করে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলা যেতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يُقَاتِلُوْنَ : জমহুর يُقَاتِلُوْنَ শব্দটি مَعْرُوْفٌ পড়েছেন, আর যায়েদ ইবনে আলী তাকে مَجْهُوْلٌ পড়েছেন। এ শব্দটি يُقَتِّلُوْنَ অর্থাৎ تَشْدِيْدٌ যুক্ত করেও পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতসমূহের শানে নুযূল :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলের সাহাবীদের কয়েকজন বসে বলাবলি করছিলাম যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটা তা জানতে পারলে আমরা সেই আমল করতাম, তখন سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ সূরাটি পড়ে শুনান।
–[আসবাব, মা'আরিফ, ইবনে কাছীর]

২. এ প্রসঙ্গে অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বলাবলি করলেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি তা জানতে পারলে আমরা তার জন্য জান ও মাল সব কুরবানি করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি তা সম্বন্ধে অবহিত করলেন, এ কথা বলে "আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করেন।" একদিন যখন তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হলো তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চাতে ফিরে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। –[আসবাব]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَاتَفْعَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যত কর না?" এ আয়াতটি কোন্ প্রকারের লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে কয়েকটি মতামত লক্ষণীয়–

১. এ আয়াতটি একদল মু'মিন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে জানতে এবং তদনুযায়ী আমল করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ এবং اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা, কিন্তু আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাঁরা দুনিয়ার জীবনকেই বেশি ভালোবাসলেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এটা ঐ সব লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বলে 'আমরা যুদ্ধ করেছি' কিন্তু আসলে করেনি; 'তীর নিক্ষেপ করেছি' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে করেনি। 'এ কাজ করেছি' কিন্তু আসলে করেনি।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এটা মুনাফিকদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তারা যুদ্ধ কামনা করেছিল, কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন তখন তারা বলল, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ জিহাদ ফরজ করলেন। –[কাবীর]

৪. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতে যেসব লোক ওয়াদা পালন করে না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, মুখে যা বলে তার বিপরীত কাজ করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –(কাবীর, সাফওয়া) কাজেই সাচ্চা, নিষ্ঠাবান মুসলমানের কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। সে যা বলবে তাকে তা করে দেখাতে হবে। আর করার ইচ্ছা বা সাহস না করলে মুখেও তা করার কথা বলবে না। বলা এক আর করা অন্য, এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিদারের পক্ষে এরূপ বদ-স্বভাব কখনোই শোভন হতে পারে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, কারো মধ্যে এরূপ বদ-স্বভাবের অবস্থিতি এমন একটা নিদর্শন যা প্রমাণ করে যে, সে মুসলমান নয়– মুনাফিক। একটি হাদীসে বলা হয়েছে "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে পূরণ করে না এবং কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখলে তাতে বিশ্বাস ভঙ্গ করে।"

বস্তুত যারা ইসলামের জন্য আত্মদান বা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এমন সব কথা বলে বেড়ায় যা নিজেরা করে না এখানে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদের বিশেষভাবে তিরস্কার করেছেন। পরের আয়াতে আরো কড়া ভাষায় তাদের তিরস্কার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।

অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে সৎকাজ করতে বলবে আর নিজেরা করবে না, মন্দকাজ হতে বিরত থাকতে বলবে আর নিজের মন্দকাজ করবে– এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি ঘৃণ্য কাজ। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ الخ : আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ করতে পারবে বলে লড়াই হাঁকছে এতই যদি তোমাদের সখ হয়, তবে চল তোমাদেরকে বলে দেওয়া যাচ্ছে, শত্রু সম্মুখে সিসাবিগলিত সুশক্ত প্রাচীর সাদৃশ্য অনড় অবিচলিত থেকে সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই, করা তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। তোমাদের কয়জন এ আদর্শে অবিচল থাকতে পারবে ভেবে দেখ। কোনো সন্দেহ নেই।

সাহাবীগণের অনেকে এ অগ্নি পরীক্ষায় নিজকে খাঁটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, আবার দুর্বল ঈমানদারগণের কেউ কেউ বলেছেন– وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তারা বলেছিল যে, ওগো প্রভু! আমাদের উপর এখন কেন জিহাদ ফরজ করেছ, যদি আরো কিছুকাল আমাদেরকে সময় দিতে? –[তাহের]

সুতরাং আল্লাহর নিকট ঐ সকল লোকই প্রিয়তম যারা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় আল্লাহর كَلِمَةٌ -কে উচ্চ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ও সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং তাদের পদস্খলন যেন না ঘটে।

–[মা'আরিফ]

আয়াতে কারীমাটি মুজাহেদীনদের তিনটি বিশেষ গুণাবলিকে আবশ্যক করেছে : যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে তাদের তিনটি গুণাবলি এই–

এক. তারা গভীর চেতনা ও তীব্র উপলব্ধি সহকারে আল্লাহর পথে লড়াই করবে। এমন পথে লড়াই করে না, যা ফী সাবীলিল্লাহ পর্যায়ে পড়ে না।

দুই. তারা উচ্ছৃঙ্খলতা, সংগঠন বিরুদ্ধতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতায় নিমজ্জিত হবে না। তারা সুদৃঢ় সাংগঠনিকতা, সুসংবদ্ধতা ও নিয়মানুগত্যতা সহকারে কাতার বন্দী হয়ে লড়াই করতে থাকবে।

তিন. শত্রুদের মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য হবে। এই শেষ কথাটি অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত যুদ্ধ ময়দানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে কেবল সেই বাহিনীটিই দাঁড়াতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে।

১. উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র বর্তমান থাকা একান্ত আবশ্যক। বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সিপাহী সেই মান হতে বিচ্যুত হলে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি হতে পারে না। কেউ কাউকেও সম্মানের চোখে দেখবে না। ফলে পারস্পরিক কোন্দল ও সংঘর্ষতা হতে তারা রক্ষা পাবে না।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় সংকল্পই সমগ্র বাহিনীকে আত্মদান ও জীবন উৎসর্গকরণের দুর্জয় আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম। এর ফলেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্পাত কঠিন ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে অবিচল ও অটল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ সবের ভিত্তিতে হযরত নবী করীম ﷺ-এর মহান নেতৃত্বাধীনে এমন এক মহান সামরিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল যার সংঘর্ষে এসে তদানীন্তন দুনিয়ার প্রধান শক্তিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শত শত বৎসর পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার সম্মুখে টিকতে পারেনি।

হযরত ঈসা এবং মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলি আলোচনার কারণ : আল্লাহ তা'আলার কাছে মুজাহিদরাই সর্বাধিক প্রিয়–এ আলোচনার পর হযরত ঈসা এবং মূসা (আ.)-এর ঘটনা আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করে দেওয়া– এই বলে যে, তোমাদের উপরও আল্লাহর আজাব আসবে যদি তোমরাও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে সেরূপ আচরণ করা যেরূপ আচরণ করেছিল হযরত ঈসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত হযরত ঈসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে এবং এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর আজাব এসেছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

বনী ইসরাঈল কিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে কষ্ট দান করত? : বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-কে বিভিন্নভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, তাঁর সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করেছে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে তার কয়েকটা আলোচনা করা হলো। কখনো তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আবার কখনো বলেছে اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ কখনো বলেছে فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ হাদীস শরীফে আছে যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত হারূন (আ.)-কে হত্যা করার অভিযোগও এনেছিল। তাঁকে অণ্ডকোষের রোগে আক্রান্ত বলেও পরিহাস করেছে। বাইবেলেও ইহুদিদের নিজেদের বর্ণনা করা ইতিহাসও এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাবলি দ্বারা পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

কুরআন মজীদের এ স্থানে সেসব ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– মুসলমানদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। তারা যেন নিজেদের নবীর সাথে সেরূপ আচরণ না করে যা বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের নবীর সাথে করেছিল। নতুবা বনী ইসরাঈলীদের যে পরিণতি হয়েছে তা হতে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। –[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিভিন্ন মু'জিযা বনী ইসরাঈলের লোকেরা স্বচক্ষে দেখেছিল, যার ফলে তারা ভালো করেই জানত যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নবী ও রাসূল। তাঁর রিসালতের কারণে তাঁর প্রতি সদাচরণ করা হবে, এটাই ছিল যুক্তিযুক্ত; কিন্তু তা না করে তাঁর সাথে নানাভাবে উৎপীড়নমূলক আচরণ করা হয়েছে, সে কারণেই হযরত মূসা (আ.) স্বীয় জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা কেন আমাকে উৎপীড়িত কর? অথচ তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ -এর অর্থ : এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে–

১. তারা যখন সত্য পরিত্যাগ করে বক্রতা অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের দিলকে হিদায়েতের পথ হতে বাঁকা করে দিলেন।

২. যখন তারা আনুগত্য না করে বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে হেদায়েতের পথ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

৩. যখন তারা ঈমান গ্রহণ না করে বক্রতা অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের দিলকে ছওয়াবের পথ হতে বাঁকা করে দিলেন।

৪. যখন তারা তাদেরকে রাসূলের সম্মান এবং আল্লাহর আনুগত্যকরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা অমান্য করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরে গোমরাহী সৃষ্টি করে দিলেন তাদের এ কর্মের শাস্তি হিসেবে। −[কুরতুবী, কাবীর]

কেউ কেউ বলেছেন যে, যেসব লোক নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তাদেরকে জবরদস্তি সহজ সরল পথে পরিচালিত করা আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নয়। যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানি করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে তাদেরকে জোর করে হেদায়েত দানে বাধ্য করবেন− এটাও আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়। এটা হতে স্বতস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো ব্যক্তির বা কোনো জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর দিক হতে হয় না। সেই ব্যক্তি বা জাতিই সর্বপ্রথম এ পথে পা বাড়ায়। অবশ্য আল্লাহর বিধান এই যে, যে লোক গোমরাহী পছন্দ করে তিনি তাদের জন্য হিদায়েতের পথে চলার নয় গোমরাহীর পথে চলার উপায়-উপকরণই সংগ্রহ করেছেন। কেননা ব্যক্তির গোমরাহ হওয়ার স্বাধীনতাটুকু যেন সে পুরোপুরি ভোগ করতে পারে, তাই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহতো মানুষকে বাছাই ও গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। অতঃপর আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করা হবে কিনা এবং হেদায়েতের পথে চলা হবে কি বাঁকা-গোমরাহীর পথে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টির নিজেদের দায়িত্ব। এ বাছাই ও গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো বিশেষ জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য ও হেদায়েতের পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক গোমরাহী ও নাফরমানির দিকে ঠেলে দিবেন না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নাফরমানি করার এবং হেদায়েতের পথ পরিহার করে চলারই সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও হেদায়েতের পথে চলতে বাধ্য করবেন− এ নীতি আল্লাহর নয়। এতদসত্ত্বেও এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, যে লোক নিজের জন্য যে পথই গ্রহণ করুক না কেন কার্যত সেই পথে সে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা সেই পথে চলার জন্য জরুরি সামগ্রী সংগ্রহ করে দিবেন।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ বাক্যটির অর্থ : وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়েত দেন না।' এ কথাটির অর্থ হলো, যেসব লোক নিজেদের জন্য ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানির পথ বাছাই করে নিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য ও ফরমাবরদারির পথে চলার তৌফিক দেন না।

যুজাজ বলেছেন, এর অর্থ হলো 'যার সম্পর্কে আল্লাহর ইলমে রয়েছে যে, সে ফাসিক হবে তাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দান করবেন না। −[ফাতহুল কাদীর]

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলকে কষ্ট দান অতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ যা কুফরি ও দিলকে হিদায়েতের পথ হতে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়। −[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.)-কে বনী ইসরাঈগণ কি কষ্ট দিয়েছিল? : বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহর সত্য নবী ও তাদের উপর অনুগ্রহকারী জেনে কেমন করে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েছে, তাঁর সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করেছে কুরআন মাজীদের বহুস্থানে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে। যথা, সূরা বাক্বারাহ অংশে−

لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا .... يَعْتَدُوْنَ −

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِىَ الْاٰيَةَ −

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا الْاٰيَةَ (بَقَرَة)

اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا الْاٰيَةَ (اَعْرَاف)

وَيَقُوْلُوْنَ يُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ (اَعْرَاف)

ইত্যাদি আরো বহুবিধ আয়াত এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ বাক্যটির মহল্লে ই'রাব : وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি حَالٌ হওয়ার কারণে نَصَبْ (الاية) -এর স্থানে অবস্থিত।

অনুবাদ :

٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَقُلْ يَا قَوْمِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ لَهٗ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ قَبْلِىْ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَمَّا جَاءَهُمْ جَاءَ اَحْمَدُ الْكُفَّارَ بِالْبَيِّنٰتِ الْاٰيٰتِ وَالْعَلَامَاتِ قَالُوْا هٰذَا اَىِ الْمَجِيْءُ بِهٖ سِحْرٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ اَىِ الْجَائِىْ بِهٖ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ.

৬. আর স্মরণ করো যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! হে আমার সম্প্রদায় এ জন্য বলেনি, যেহেতু তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এবং সত্য প্রতিপন্নকারী যা আমার সম্মুখে রয়েছে আমার পূর্ব হতে তাওরাত গ্রন্থ এবং সেই রাসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দানকারী যিনি আমার পর আগমনকারী ও তাঁর নাম হবে আহমদ আল্লাহ তা'আলা বলেন অতঃপর যখন তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন কাফিরদের নিকট আহমদ ﷺ আগমন করলেন স্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ আয়াত ও নিদর্শনাবলিসহ তারা বলল, এটা তাঁর আনীত বস্তু যাদুমন্ত্র অপর কেরাতে سَاحِرٌ যাদুকর অর্থাৎ আগমনকারী, পঠিত হয়েছে যা সুস্পষ্ট প্রকাশ্য।

٧. وَمَنْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ اَشَدُّ ظُلْمًا مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وَ وَصْفِ اٰيَاتِهٖ بِالسِّحْرِ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৭. আর কে কেউই নয় অধিক অত্যাচারী জঘন্যরূপ জালিম সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটনা করে তাঁর প্রতি অংশীদার ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁর আয়াতকে যাদুরূপে আখ্যায়িত করে অথচ সে ইসলামের দিকে আহূত হয়েছে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না কাফিরদেকে।

٨. يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا مَنْصُوْبٌ بِاَنْ مُقَدَّرَةً وَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ نُوْرَ اللّٰهِ شَرْعَهٗ وَبَرَاهِيْنَهٗ بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَقْوَالِهِمْ اِنَّهٗ سِحْرٌ وَشِعْرٌ وَكَهَانَةٌ وَاللّٰهُ مُتِمٌّ مُظْهِرُ نُوْرِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ.

৮ তারা নির্বাপিত করতে চায় উহ্য اَنْ -এর দ্বারা يُطْفِئُوْا শব্দটি مَنْصُوْبٌ এবং ل হরফটি তন্মধ্যে অতিরিক্ত আল্লাহর নূরকে তাঁর শরিয়ত ও প্রমাণাদিকে তাদের মুখের ফুঁকের দ্বারা তাদের এ কথা দ্বারা যে, এটা যাদু, কবিতা ও গণকতা আর আল্লাহ পূর্ণতাদানকারী প্রকাশকারী তাঁর নূরকে এক কেরাতে مُتِمُّ نُوْرِهٖ ইযাফতের সাথে পঠিত হয়েছে। যদিও কাফিরগণ অপছন্দ করে তা।

٩. ذٰلِكَ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ يُعْلِيَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لَا جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ الْمُخَالِفَةِ لَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

৯ তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দীনসহ, তাকে প্রকাশিত করার জন্য শ্রেষ্ঠত্বদানের জন্য সকল দীনের উপর তার বিপরীত সমস্ত দীনের উপর যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا وَمُبَشِّرًا : مُصَدِّقًا ও مُبَشِّرًا শব্দদ্বয় حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উভয় শব্দই رَسُوْل-এর মধ্যে যে اِرْسَالْ অর্থ রয়েছে তা হতে حَال হয়েছে, অর্থাৎ

اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَيْكُمْ حَالَ كَوْنِىْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِمَنْ يَّأْتِىْ بَعْدِىْ .

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِىْ : নাফে', ইবনে কাছীর, আবূ আমর, সুলামী, যার ইবনে হোবাইশ ও আবূ বকর (রা.) হযরত আসেমের বরাত দিয়ে مِنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ ى তে فَتْح দিয়ে পড়েছেন। বাকি কারীগণ يَاءْ তে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

–[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ "سِحْرٌ مُّبِيْنٌ" : জমহুর سِحْر পড়েছেন, কিন্তু হামযা এবং কিসায়ী سَاحِر পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফতহুল কাবীর]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ : وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ : হযরত ইবনে কাছীর, হামযা ও কেসায়ী এবং হাফস (আসেম -এর সনদে) مُتِمُّ نُوْرِهِ অর্থাৎ اِضَافَتْ করে পড়েছেন। আর বাকি কারীগণ তাকে مُتِمٌّ অর্থাৎ تَنْوِيْن সহকারে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা যা সে বলেছিল– হে বনী ইসরাঈল!' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি তোমার উম্মতকে হযরত ঈসার সেই ঘটনা শুনাও যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তাওরাতে বর্ণিত গুণাবলি সম্বলিত সেই রাসূল আমিই।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর মতো 'হে আমার জাতি' না বলার কারণ হলো, হযরত ঈসার বনী ইসরাঈলের সাথে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, সে কারণেই তিনি হে বনী ইসরাঈল! বলে সম্বোধন করেছেন।

আয়াতে يٰقَوْمِ না বলে يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ বলার কারণ : এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) يٰقَوْمِ বলেননি; বরং يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ বলেছেন, এর কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলগণের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, তাই তিনি يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ বলেছেন। আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। –[কাবীর]

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ : অর্থাৎ "সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের যা আমার পূর্বে এসেছে।"

মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে, এ বাক্যটির তিনটি অর্থ। এ তিনটি অর্থই এখানে গ্রহণীয় এবং যথাযথ। একটি এই যে, আমি কোনো নতুন ও অভিনব নবী নই। আমি সেই দীন নিয়েই এসেছি যা হযরত মূসা (আ.) নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাওরাত প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে আসিনি; বরং তার সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি। আল্লাহর রাসূলগণ চিরকাল স্বীয় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ ও প্রকাশ করে থাকেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম। অতএব, তোমরা আমার রিসালাত সম্পর্কে কোনোরূপ সংশয় বা দ্বিধাবোধ করবে তার কোনোই কারণ নেই।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাওরাতে আমার আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তারই বাস্তবরূপে হয়ে আমি এসেছি। কাজেই তোমরা আমার বিরোধিতা তো করতেই পার না; বরং তার পরিবর্তে আমার সম্বর্ধনাই তোমাদের জানানো উচিত। তা এ হিসেবেও যে, অতীত কালের নবী-রাসূলগণ আমার যে আগমন সংবাদ দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আমি এসে গেছি।

এ বাক্যটি পরবর্তী বাক্যসমূহের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় একটি অর্থ নির্গত হয়। আর তা এই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেওয়া সুসংবাদের সত্যতা ও যথার্থতা আমি ঘোষণা করছি এবং আমি নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ শুনাচ্ছি। এ তৃতীয় অর্থের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটির ইঙ্গিত সেই সুসংবাদের দিকে যা হযরত মূসা (আ.) নিজ জাতির জনগণকে সম্বোধন করে ভাষণ দান প্রসঙ্গে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন :

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবেন, তারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করবে, কেননা হোব্রেধে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এ প্রার্থনাইতো করেছিলে– যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বর পুনবার শুনতে ও এ মহাগ্নি আর দেখতে না পাই পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিবো, আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করবো তা তিনি তাদেরকে বলবেন, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কর্ণপাত না করবে তার কাছে আমি পরিশোধ নিবো।" –[ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ– ১৮:১৫-১৯]

এটা তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো উপর খাটে না। এতে হযরত মূসা (আ.) নিজের জাতির জনগণকে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়েছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী বানাব। এক জাতির ভাইদের বলে সেই জাতিরই কোনো গোত্র বা বংশ-পরিবার বুঝানো হয়নি; বরং এর অর্থ অপর এমন কোনো জাতি যার সাথে তার নিকটবর্তী বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। স্বয়ং বনী ইসরাঈলের কোনো নবী আগমন সম্পর্কে যদি এ সুসংবাদ হতো, তাহলে বলা হতো– আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদের মধ্য হতে একজন নবী প্রতিষ্ঠিত করবো, কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে 'তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে' কাজেই বনী ইসমাঈলীদের ভাই বনী ইসরাঈল-ই হতে পারে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তাদের সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী বনী ইসাঈলের অপর কোনো নবী সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না এ কারণেও যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাঈল বংশে এ দু'জন নয় বহু সংখ্যক নবী এসেছেন। বাইবেল তাদের উল্লেখে পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

এ পর্যায়ে সুসংবাদে দ্বিতীয় বলা হয়েছে, যে নবী পাঠানো হবে তিনি হযরত মূসার মতো হবেন; কিন্তু আকার-আকৃতি-চেহারা ও জীবন অবস্থার দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা যে এটা নয়, তাতো সুস্পষ্ট। কেননা এসব দিক দিয়ে দুনিয়ার কোনো দুই ব্যক্তি একই রকম হয় না। নিছক নবুয়ত সংক্রান্ত গুণাবলির সাদৃশ্যও এ কথার উদ্দেশ্য নয়। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পরে আগত সমস্ত নবীই এ ব্যাপারে অভিন্ন। কাজেই কোনো একজন নবীর এমন কোনো বিশেষত্ব থাকতে পারে না, যে দিক দিয়ে তিনি তার মতো হবেন। এ দু'টি দিকের সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে তৃতীয় কোনো সাদৃশ্যের বিষয় হতে পারে এবং সেই দিকের বিশেষত্ব তাঁর অনন্য হওয়ার কথা বোধগম্য। আর তা একমাত্র ইহাই হতে পারে যে, সেই নবী এক নবতর স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শরিয়তের বিধান নিয়ে আগমনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মতো হবেন। আর এ বিশেষত্ব হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পূর্বে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন, তাঁরা সকলেই হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কেউই কোনো স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আসেননি।

قَوْلُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ الخ : আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার পর আসবেন, যার নাম হবে আহমদ। উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পরবর্তী সময়ে আগমনকারী নবীর নামটিও সুসংবাদরূপে শুনিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর নাম হবে আহমদ। আর সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এক নাম আহমদ বলে প্রমাণিত রয়েছে। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী গ্রন্থে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (র.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ অর্থাৎ 'আমার নাম মুহাম্মদ, আমার নাম আহমদ ও হাশির।' যুবাইর ইবনে মুতইম হতে ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও দারেমীও এ অর্থেরই বহু কয়টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নাম সুপরিচিত ছিল। হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) -এর কবিতার একটি ছত্র এর সাক্ষী, صَلَّى الْاِلٰهُ وَمَنْ تَحُفُّ بِعَرْشِهٖ * وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ اَحْمَدَ. অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর আরশের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত অসংখ্য ফেরেশতা ও সব পবিত্র আত্মা মহা বরকতওয়ালা আহমদের প্রতি দরূদ পাঠিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার মধ্যে হিকমত : এতে হিকমত এই যে, তা দ্বারা বনী ইসরাঈলদেরকে এই হেদায়েত দান করা হয়েছে, যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ তশরিফ আনয়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা তোমাদের উপর ফরজ হবে। আর সর্বদা তাঁর আনুগত্য করবে। আয়াতে বর্ণিত শব্দ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ দ্বারা এ বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে। তাতে আগমনকারী রাসূলের নাম আহমদ বলা হয়েছে। এটা ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নাম আরো অনেক ছিল। যেমন- مُزَّمِّلٌ ، يٰسٓ ، طٰهٰ ، نَذِيْرٌ ، بَشِيْرٌ ، مُدَّثِّرٌ ইত্যাদি কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

كَمَا قَالَ تَعَالٰى : طٰهٰ - مَآ اَنْزَلْنَا الخ - يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

ইনজীল কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ -এর নাম আহমদ বলে উল্লেখ করার কারণ : আরব দেশে পূর্বযুগ হতেই কোনো কোনো ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ রাখা হতো। সুতরাং মুহাম্মদ নামে বহু লোকই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আরবে আহমদ নামের প্রচলন ছিল না, তাই মুহাম্মদ ﷺ-কে অন্যান্য মুহাম্মদ নামক লোকদের হতে مَخْصُوْص করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম বলা প্রসঙ্গে عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ কেন বলেছিলেন? : হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের পরিচয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কারণ মূলত নিয়ম ছিল মাতাপিতার মিলনের ফলে সন্তান জন্ম হওয়া, যেভাবে সারা বিশ্বের মানবকুল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নীতির পরিবর্তন করেও যে আল্লাহ মূল উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন এটা দেখাবার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতাবিহীন অবস্থায় একমাত্র তাঁর মাতা বিবি মরিয়মের গর্ভ হতে সৃজন করেছেন, তাই কেবল মাতার সন্তান বলে মাতার সম্পর্ক ঠিক রেখে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলেছেন।

অথবা, এতে আরবের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আরববাসীদের নিয়ম ছিল সন্তানের সুপরিচিতির উদ্দেশ্যে সন্তানের পিতামাতার মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তির নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখত, যাতে সন্তানের পরিচিতির ক্ষেত্রে কোনো গণ্ডগোল না হয়। কারণ এক নামে বহু ব্যক্তির নাম রাখা হতো। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.)-কেও তাঁর সুপরিচিতির জন্য মাতার নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে।

অথবা, বনী ইসরাঈলের বংশীয় ইসলাম ও নবীদের শত্রুদের অপবাদ হতে রক্ষা করার জন্যই তাঁকে عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ বলা হয়েছে। কারণ বনী ইসরাঈলগণ বলেছিল اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তিন খোদার তৃতীয় খোদা। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র খোদা, হযরত মরিয়াম (আ.) আল্লাহর স্ত্রী খোদা, আল্লাহ তার স্বামী খোদা, (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) এ অপবাদ হতে বাঁচাবার জন্য এবং হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নবী এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বুঝানোর জন্য ইবনে মারইয়াম বলা হয়েছে। যাতে কেউ ইবনে আল্লাহ না মনে করে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- যখন হযবত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের নিকট অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন তখনই তারা তাকে প্রকাশ্য ধোঁকাবাজের ধোঁকা বলে গালি দিতে লাগল। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার এ আয়াতটির দু' প্রকার তাফসীর বর্ণনা করেন।

এক. হযরত ঈসা (আ.) যখন তাঁর উম্মতবর্গের নিকট তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণাদি নিয়ে এবং মু'জিযা পেশ করে তাদের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তারা তাদের মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখে বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু বা প্রতারণা মাত্র। আল্লামা শওকানীও এ তাফসীরকে পছন্দ করেছেন।

দুই. যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের কাছে আসল নিজ নবুয়তের প্রমাণাদি ও মু'জিযা সহকারে, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট প্রতারণা বা জাদু।

قَوْلُهٗ سِحْرٌ : মুফাস্সিরগণ سِحْر -এর অর্থ ধোঁকা বা দাগাবাজি করার অর্থ বলেছেন। سِحْر -এর হাকিকত সম্পর্কে মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

সুতরাং মোল্লা আলী কারী, মু'তাযিলাহ, আবূ জা'ফর ইস্তেবরাদী শাফেয়ী, আবূ বকর রাযী হানাফী, ইবনে হাযম যাহেরী (র.) -এর মতে سِحْر -এর কোনো অস্তিত্বই নেই: বরং এটা এক প্রকার ধারণা মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন- فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ অর্থাৎ তাদের রশি ও লাঠিসমূহ তার প্রতি হাউ হাউ করে তাদের سِحْر -এর কারণে অগ্রসর হয়েছিল। -[ইবনে কাছীর]

ইমাম নববী (র.) বলেন, তার এক প্রকার হাকিকত রয়েছে। একেবারেই বৃথা ও মিথ্যা নয়। জমহুর মুহাদ্দিসীনগণের মতামতও এই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْعَيْنُ حَقٌّ অন্য বর্ণনায় বলেন اَلسِّحْرُ حَقٌّ অর্থাৎ চক্ষুর কুদৃষ্টি ও জাদু প্রক্রিয়া সত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ج وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا (الاية) ও وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ অর্থাৎ বাবেল শহরের হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতা এর উপর যা অবতীর্ণ ... ...। আর তাগার গিরায় ফুঁকদানকারীদের কুকার্য হতে।

শরহে ফিক্‌হে আকবর গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الخ দ্বারা যেই سِحْر সম্বন্ধে বলা হয়েছিল তা ভিন্ন প্রকারের سِحْر সম্পর্কে বর্ণনা ছিল। মূল سِحْر সম্পর্কীয় আলোচনা সেখানে করা হয়নি।

سِحْر এবং كَرَامَات ও مُعْجِزَة -এর মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা মাযহারী (র.) বলেন, কার্য ও কথাবার্তায় বিশেষ কোনো নীতির মাধ্যমে আকস্মিক যা ঘটে থাকে, তাকে سِحْر বলা হয়। পক্ষান্তরে كَرَامَاتْ ও مُعْجِزَةْ হঠাৎ বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আকস্মিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বে হয়ে থাকে।

আর سِحْر সাধারণত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে। كَرَامَاتْ ও مُعْجِزَةْ কোনো শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমের অপেক্ষা করে না এবং কোনো বিশেষ কার্যাদির দ্বারা হয় না।

অথবা, জাদু সাধারণ লোকের মাধ্যমে হয়ে থাকে, আর مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ অসাধারণ লোক অর্থাৎ مُعْجِزَةْ নবীগণ হতে আর كَرَامَاتْ আওলিয়াগণ হতে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ যে নবী ও ওলী হতে যে সময় যার জন্য প্রয়োজন মনে করেন সে সময় ঐ নবী অথবা ওলী হতে مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ প্রকাশ করেন।

আর سِحْر -এর জন্য মোকাবিল আবশ্যক হয়, কিন্তু مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ -এর জন্য মোকাবিল আবশ্যক হয় না।

হানাফী মাযহাব অবলম্বকারীদের মতে سِحْر -এর কার্য فِسْق এবং শিক্ষা হারাম, কিন্তু কুফরি হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় অত্যাচারী আর কে হবে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছিল? এরূপ জালিমদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত দান করেন না।

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করার অর্থ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা নবুয়ত দাবিকারী বলে অভিহিত করা এবং নবীর প্রতি আল্লাহর যে কালাম নাজিল হয় তাকে নবীর স্বকল্পিত বলা।

وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ -এ يُدْعَىٰ শব্দটি অপর এক কেরাতে يَدَّعِىْ অর্থাৎ يَا، তে فَتْح এবং دَالْ -এ كَسْرَهْ তাশদীদ দিয়ে এবং عَيْن -এ كَسْرَه দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ সে দাবি করে, তখন পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, অথচ সে নিজেকে ইসলামি বলে দাবি করে। এরূপ জালিমকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত দান করেন না।

এ কথাটি আশ্চর্য হয়ে বলা হয়েছে সেই লোকদের সম্পর্কে যারা হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের মু'জিযাদি ও প্রমাণাদি দেখার পরও তাদের নবুয়ত অস্বীকার করছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন. একবার প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওহী আগমন বন্ধ ছিল। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ অন্যান্য মুশরিক ও কাফেরদের নিকট ফুটিয়ে তুলল যে, তোমরা একটি সুসংবাদ শুন এই যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে ধর্মমত নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর নিকট সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জাগতিক পথ রহিত হয়ে গেছে। এতে তাঁর কার্য খতম হয়ে যাবে। এখনই বুঝা যাবে কি করতে পারে। আল্লাহর আলোর পূর্ণতা এখানেই শেষ। এ কথাগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে ব্যথার সঞ্চার হলো, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ الخ নাজিল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ : অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক, কাফেরগণ নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে অর্থাৎ ইসলামকে নির্বাপিত করতে চায়। অর্থাৎ দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় করতে চায়।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, যেসব লোক কুরআনকে জাদু বলে ইসলামকে বাতিল করতে চায় তাদেরকে সেই লোকের সাথে তুলনা করে যে স্বীয় মুখের ফুৎকারে সূর্যের আলোকে নির্বাপিত করতে চায়, তাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। –[কাবীর]

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো তিনি তাঁর নূরকে অর্থাৎ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও প্রসারিত করবেন-ই, কাফেরদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"

অর্থাৎ গোটা বিশ্বে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিয়ে, দীনে ইসলামকে অন্যান্য দীনের উপর দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা বা ক্ষমতা দ্বারা বিজয়ী করে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও প্রসারিত করবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য জমিনকে একত্রিত করে দিয়েছিলেন, তখন আমি মাশরিক-মাগরিব [পূর্ব-পশ্চিম] সবই দেখেছি। আমার জন্য যতটুকু একত্রিত করা হয়েছিল সেসবের উপর অচিরেই আমার উম্মতের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। [মুসলিম] অর্থাৎ এ দীন অচিরেই পূর্ব-পশ্চিমে পৌছে যাবে।

আয়াতে আল্লাহর নূরের অর্থ : উক্ত আয়াতে نُوْرَ اللّٰهِ -এর মুফাস্‌সিরগণ কর্তৃক বিভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

১. نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা قُرْاٰن উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ اِبْطَالَ الْقُرْاٰنِ وَتَكْذِيْبَهٗ তারা আল্লাহর কুরআনকে বাতিল ও মিথ্যা বলতে চায়।

২. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা ইসলামকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তখন এর অর্থ সুদ্দী (র.)-এর মতে এই যে, তারা ইসলামের আওয়াজকে নিজ মুখেই উড়িয়ে দিতে চায়- يُرِيْدُوْنَ دَفْعَةَ الْكَلَامِ

৩. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য ছিল। যাহহাক (র.) বলেন, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ هَلَاكَهٗ بِالْاَرَاجِيْفِ হঠাৎ তাঁকে নিধন করতে চেয়েছেন।

৪. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা حُجَجُ اللّٰهِ وَ دَلَائِلُهٗ উদ্দেশ্য হবে, হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ اِبْطَالَهَا بِاِنْكَارِهِمْ وَتَكْذِيْبِهِمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহর নূরকে মিথ্যা সাব্যস্ত ও অস্বীকার করে বাতিল করতে চায়।

৫. ইবনে ইসা (র.) বলেন, তা একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ তা নির্বাপিত করতে চায় তখন সূর্যরশ্মির মতো তাকে নির্বাপিত করা কখনো সম্ভব নয়। তদ্রূপ যে তাকে বাতিল প্রমাণ করতে চাইবে তার পক্ষে বাতিল বলে একে প্রমাণ করা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। (জামাল) আল্লাহ যে নূরের পরিপূর্ণতার মূলেই রয়েছেন তা কে নিধন করবে?

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ .... الْحَقِّ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনিইতো নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সর্বপ্রকারের দীনের উপর বিজয়ী করে দেন। তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে কুরআন আর সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন সেই দীন অন্যান্য ধর্ম যেমন- ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ হলো দীন ইসলামকে বিজয়ী করা, দীন ইসলামের বিজয় কয়েক রকমের হতে পারে।

১. **সামরিক ও প্রশাসনিক জয় :** অর্থাৎ ইসলামপন্থিরাই ইসলামি বিধি-বিধান মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কুরআন আর সুন্নাহ-ই হবে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে, খুলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে এবং তারপরও এভাবে ইসলাম বিজয়ী ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবল ইসলামি বিধান মতোই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল, পরে বিভিন্ন কারণে ইসলাম আর বিজয়ী থাকেনি। অদূর ভবিষ্যতেও ইসলাম আবার বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যেই ইসলামের বিজয়ী হওয়ার আলামত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণী হলো–

إِنَّ اَوَّلَ دِيْنِكُمْ نُبُوَّةٌ وَ رَحْمَةٌ ، وَتَكُوْنُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ ، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ - تَكُوْنُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيًّا فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ؛ ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ تَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ، وَيُلْقِى الْاِسْلَامَ بِجِيْرَانِهِ فِى الْاَرْضِ يَرْضٰى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَاتَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرٍ اِلَّا صُبَّتْهُ مِدْرَارًا وَلَا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا وَلَا بَرَكَاتِهَا شَيْئًا اِلَّا اَخْرَجَتْهُ - (رواه احمد)

২. **মূলভিত্তি ও যুক্তিগত বিজয় :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত ইসলামের এ বিজয় রয়েছে, কারণ ইসলামে কুরআনের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী, ইসলামি আকীদা ত্রুটিহীন এবং ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখা দুর্বলতাহীন।

ক. কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদে প্রাপ্ত। কুরআনে আজ পর্যন্ত কোনো রকমের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতি সংঘটিত হয়নি। কুরআনের কোনো বক্তব্য বিজ্ঞানের ও সহীহ যুক্তির পরিপন্থি বলে প্রমাণিত হয়নি।

খ. ইসলামের আকীদা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থি নয়, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদে, ইহুদি ধর্মের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এবং অন্যান্য ধর্মের পৌত্তলিকতায় দেখা যায়।

গ. ইসলামি শরিয়ত এমন অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা অন্যান্য বিধানে নেই। যেমন–

১. ইসলামি শরিয়ত আল্লাহ প্রদত্ত, তাই তাতে কোনো বিশেষ শ্রেণি বা দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই।

২. ইসলামি শরিয়ত আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক উন্নয়নের পূর্ণ ব্যবস্থা সম্বলিত।

৩. দৃঢ় মূল ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. সহজ ও পালনীয়।

৫. ব্যক্তি ও জামাতের সমানভাবে স্বার্থ রক্ষাকারী।

৬. সব যুগে এবং সব সমাজে বাস্তবায়ন যোগ্য।

এ সব কারণেই ইসলাম আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আর এ কারণেই সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। মানুষ স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছে। অসংখ্য অমুসলিমও এটা স্বীকার করছে।

সুতরাং ইসলাম বিজয় হওয়া মানে দুনিয়া হতে অন্যান্য ধর্ম বিদায় গ্রহণ করা নয়। বিজয়ী হওয়া মানে ইসলামের প্রাধান্য থাকা, ইসলামপন্থিদের প্রাধান্য থাকা। –[কুরতুবী] দলিল-প্রমাণে বা শক্তি-সামর্থ্যে (সাফওয়া) অর্থাৎ মতবাদ হিসেবে অন্যান্য মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য থাকায় গোটা দুনিয়ায় আজ ইসলামকে মানবজাতির মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করার আলোচনা হচ্ছে। ধীরে ধীরে হলেও ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। তাই বলা যায় যে, ইসলাম মতবাদ হিসেবে এখনও দুনিয়ায় বিজয়ী রয়েছে।

অনুবাদ :

١٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ مُّؤْلِمٍ فَكَاَنَّهُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ .

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার প্রতি পথ-নির্দেশ দান করবো, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি হতে পীড়াদায়ক। অনন্তর যেন তারা বলেছে হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বলেন,

١١. تُؤْمِنُوْنَ تَدُوْمُوْنَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعَلُوْهُ .

১১ তোমরা ঈমান আনয়ন করবে ঈমানের উপর স্থিতিশীল থাকবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে, তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত হও যে, তা তোমাদের জন্য উত্তম। তবে তোমরা তা করো।

١٢. يَغْفِرْ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اِنْ تَفْعَلُوْهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط اِقَامَةٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

১২. আল্লাহ ক্ষমা করবেন এটা উহ্য শর্তের জবাব। অর্থাৎ যদি তোমরা তা কর, তবে ক্ষমা করবেন তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের প্রবিষ্ট করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত ও স্থায়ী জান্নাতের উত্তম নিবাসসমূহে স্থায়ী।

١٣. وَ يُؤْتِكُمْ نِعْمَةً اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ .

১৩. আর তোমাদেরকে দান করবেন নিয়ামত অপর একটি যা তোমরা ভালোবাস। আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করো। সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُؤْمِنُوْنَ فِى التَّرْكِيْبِ : আখফাশ বলেছেন, تُؤْمِنُوْنَ শব্দটি তারকীবে تِجَارَةٌ শব্দের عَطْف بَيَانْ হয়েছে। আল্লামা শওকানী (র)-এর মতে, তাকে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَهْ [যা পূর্বের বর্ণনাকারী] হিসেবে গ্রহণ করাই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَغْفِرْلَكُمْ : يَغْفِرْلَكُمْ শব্দ مَجْزُوْمْ হওয়ার দু'টি কারণ বলা হয়েছে।

১. تُؤْمِنُوْنَ-এর মধ্যে যে اَمْر উহ্য রয়েছে তার জবাব হওয়ার কারণে مَجْزُوْمْ হয়েছে।

২. يَغْفِرْلَكُمْ শব্দটি شَرْط مَحْذُوْف-এর জওয়াব হওয়ার কারণে مَجْزُوْمْ হয়েছে সেই شَرْط টি হলো اِنْ تُؤْمِنُوْا অর্থাৎ اِنْ تُؤْمِنُوْا يَغْفِرْلَكُمْ।

قَوْلُهُ تُؤْمِنُوْنَ : জমহুর তাকে تُؤْمِنُوْنَ পড়েছেন; কিন্তু ইবনে মাসউদ তাকে اٰمِنُوْا وَجَاهِدُوْا অর্থাৎ শব্দ দু'টিকে اَمْر হিসেবে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

يَغْفِرْ لَكُمْ -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর একে اِدْغَامْ হীন পড়েছেন; কিন্তু কোনো কোনো লোক رَاءْ -কে لَامْ -এর মধ্যে اِدْغَامْ করে পড়েছেন। আল্লামা শওকানী (র.)-এর মতে اِدْغَامْ হীন পড়াই উত্তম। কারণ رَاءْ হলো حَرْفُ مُتَكَرَّرْ সুতরাং لَامْ -এর মধ্যে তাকে اِدْغَامْ করা সমুচিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ الخ : আয়াতের শানে নুযূল :

ক. আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ হুযূর ﷺ -কে লক্ষ্য করে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি আমরা অবগত হতে পারতাম যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম কার্য কোনটি তবে আমরা তা অবশ্যই করতে থাকতাম। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

খ. আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছিলেন যে, এটা হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছিল। অর্থাৎ ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) একদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি স্বীয় স্ত্রী খাওলা (রা.)-কে তালাক দিয়ে দিবো এবং সর্বদা দিনে রোজা রাখবো এবং রাত্রি ভরে ইবাদতে মশগুল থাকবো, খাসি হয়ে যাবো, বৈরাগ্যতা অবলম্বন করবো, গোশত খাওয়া চিরদিনের জন্য আমার উপর হারাম করে দিবো। এটা শুনে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বললেন, আমার নীতি হলো, বিবাহ করা, আর ইসলাম কোনো বৈরাগ্যতাকে পছন্দ করে না। এটার পর ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-কে হুযূর ﷺ বলেছিলেন- اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنِّىْ অর্থাৎ বিবাহ করা আমার সুন্নত, সুতরাং যে আমার সুন্নতের বরখেলাফ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা উম্মত নয়। -[সাবী] [কাবীর গ্রন্থকারের মতে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনাকারী মুকাতিল ও ইবনে আব্বাস (রা.)।]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... تُنْجِيْكُمْ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আজাব হতে রক্ষা করবে?"

এখানে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে সে ব্যবসা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ব্যবসা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।" এর প্রমাণ মিলে تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ উক্তির মধ্যে। ব্যবসা হলো কোনো বস্তুর বিনিময়ে অন্যকোনো বস্তু গ্রহণ করা। ব্যবসা যেরূপ ব্যবসায়ীকে দারিদ্র্যের কষ্ট হতে মুক্ত রাখে, ঠিক তেমনি এ ব্যবসা অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদও মানুষকে আল্লাহর আজাব হতে মুক্ত রাখবে। -[কাবীর]

ব্যবসা এমন জিনিস যাতে মানুষ নিজের মূলধন, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে 'তিজারত' বা ব্যবসা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ পথে নিজের সর্বস্ব নিয়োজিত করলেই সেরূপ মুনাফা লাভ করতে পারবে যার কথা এর পরে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ..... كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- তোমাদের অশেষ লাভবান হওয়া ব্যবসার একটি স্তর হলো তোমরা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাঁর রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়তের উপর অকাট্য বিশ্বাস রাখবে। নিজেদের মাল ও প্রাণ দিয়ে হলেও ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলায় দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করো। কারণ এ ব্যবসা দুনিয়ার প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম। যদি তোমরা জ্ঞান ও বোধশক্তি রাখ।

উক্ত আয়াতে اِيْمَانٌ وَمُجَاهِدٌ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ -কে ব্যবসা বলা হয়েছে, কেননা যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সম্পদ লাভ হয় সেভাবেই ঈমান বহাল রেখে আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন স্থায়ী নিয়ামত অর্জন হয়। -[মা'আরিফ]

تُؤْمِنُوْنَ وَتُجَاهِدُوْنَ -কে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বলা হলো কেন? : তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, تُؤْمِنُوْنَ وَتُجَاهِدُوْنَ দ্বারা যে কাজ করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ অনুসরণ করার প্রতি আবশ্যকতা বুঝাবার জন্যই جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ব্যবহার করা হয়েছে। -[মাদারেক]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, জিহাদ তিন প্রকার : ১. جِهَادٌ بِالْهَوٰى অন্তরের সাথে জিহাদ করা, এটাই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। অর্থাৎ মনকে কু-প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখা। ২. جِهَادٌ بِالْخَلْقِ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সাথে জিহাদ করা ও তাদের উপর দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ৩. جِهَادٌ مَعَ عَدُوِّ اللّٰهِ আল্লাহর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা। তা হলো আল্লাহর দীন রক্ষার্থে জান-মাল কুরবানি করা। -[কাবীর]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : এর অর্থ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেন। একটি অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ২. দ্বিতীয় অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা তোমাদের জন্য তোমাদের জানমাল হতে উত্তম। ৩. তৃতীয় তোমদেরকে ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করা তোমাদের জন্য এ জীবনের সবকিছু হতে অধিক উত্তম। -[ছাওরী]

ঈমানদার লোকদের ঈমান আনার নির্দেশ দানের হেতু কি? : ঈমানদার লোকদেরকে 'ঈমান আন' বলা হলে স্বতই তার অর্থ হয়, 'খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও'। ঈমানের শুধু মৌখিক দাবিকেই যথেষ্ট মনে করো না, বরং যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছ, সেই জিনিসের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হও।

قَوْلُهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ (الاية) : আলোচ্য আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াত تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ যে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ তার জাবাব, কারণ তা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হলেও কিন্তু اَمْرٌ বা নির্দেশের অর্থ দান করে। অর্থাৎ তার অর্থ হলো- তোমরা আল্লাহর উপর ঈমন আনো, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যদি তোমরা তা কর, তাহলে (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যে সবের তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটা বিরাট সাফল্য। -[কাবীর]

এটা আলোচ্য ব্যবসার আসল লাভ। এটা পাওয়া যাবে পরকালের চিরন্তন জীবনে। একটি হলো, আল্লাহর আজাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়া ও সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয় হলো গুনাহ-খাতার ক্ষমা লাভ। আর তৃতীয় হলো, আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ যার নিয়ামতসমূহ অশেষ ও অবিনশ্বর।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاُخْرٰى ...... وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ الخ : اُخْرٰى ও نِعْمَةٌ-এর বিশেষণ, অর্থাৎ পরকালে আল্লাহর আজাব হতে নিষ্কৃতি গুনাহ ক্ষমা ও জান্নাত তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও এমন একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে যা তোমরা পছন্দ করবে। সেই নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।

اُخْرٰى শব্দটিকে ফাররা এবং আখফাশ تِجَارَةٌ শব্দের উপর عَطْف হিসেবে مَحَلًّا مَكْسُوْرٌ বলে দাবি করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে "তোমাদেরকে অন্য আর একটি নিয়ামতের কথা কি বলবো, যা তোমরা আখেরাতের ছওয়াবের সাথে ইহকালে চাইবে? সেই নিয়ামত হলো আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।"

পরকালের নিয়ামতের আলোচনার পর ইহকালীন নিয়ামতের আলোচনার হিকমত : পরকালের জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে, এরপর দুনিয়ার জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দুনিয়ার বিজয় ও সাফল্য আল্লাহ তা'আলার একটি অতি বড় নিয়ামত হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনদের নিকট গুরুত্ব এটার নয়; বরং পরকালীন সাফল্যই তাদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও কাম্য। সুতরাং পরকালীন সাফল্যের উল্লেখ আগে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

فَتْحٌ قَرِيْبٌ বলে কোন বিজয় বুঝানো হয়েছে? : 'নিকটবর্তী বিজয়' বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে পারস্য এবং রোম রাজ্যের বিজয় বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ মক্কা বিজয় বলে দাবি করেছেন। আর কোনো কোনো মুফাস্সির দুনিয়ার যে কোনো নিয়ামত ও বিজয় এর উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। আমাদের মতে দুনিয়ার যে কোনো বিজয় হতে পারে। কারণ পূর্বে আখেরাতের নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। তার মোকাবিলায় দুনিয়াবী নিয়ামতের আলোচনা প্রসঙ্গে فَتْحٌ قَرِيْبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার যে কোনো বিজয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৪. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ لِدِيْنِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ كَمَا كَانَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَذٰلِكَ الدَّالُّ عَلَيْهِ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اَىْ مَنِ الْاَنْصَارُ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ مَعِىْ مُتَوَجِّهًا اِلٰى نُصْرَةِ اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ وَالْحَوَارِيُّوْنَ اَصْفِيَاءُ عِيْسٰى عم وَهُمْ اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَكَانُوْا اِثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحُوْرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوْا قَصَّارِيْنَ يَحُوْرُوْنَ الثِّيَابَ يُبَيِّضُوْنَهَا فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِعِيْسٰى وَقَالُوْٓا اِنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ لِقَوْلِهِمْ اِنَّهٗ ابْنُ اللّٰهِ رَفَعَهٗ اِلَيْهِ فَاقْتَتَلَتِ الطَّائِفَتَانِ فَاَيَّدْنَا قَوَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ عَلٰى عَدُوِّهِمْ الطَّائِفَةِ الْكَافِرَةِ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ غَالِبِيْنَ .

অনুবাদ :

১৪. হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও তাঁর দীনের জন্য। এক কেরাতে اَنْصَارُ اللّٰهِ শব্দটি اِضَافَتْ-এর সাথে পঠিত হয়েছে। যদ্রূপ হাওয়ারীগণ এরূপ ছিল, যেমন পরবর্তী বাক্য তাই নির্দেশ করছে ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী কে? অর্থাৎ সে সাহায্যকারী কারা, যারা আমার সঙ্গী হবে আল্লাহর সাহায্যকারী হিসেবে। হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হাওয়ারী হলো, হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্বাচিত শিষ্যমণ্ডলী। তারাই প্রথম তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিল বারোজন। حَوَارِىٌّ শব্দটি حُوْر হতে নিষ্পন্ন, আর তা হলো নির্ভেজাল সাদা। মতান্তরে তারা ধোপা ছিল, যারা কাপড়কে ধৌত করে সাদা করত। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে একদল ঈমান আনয়ন করল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি। আর তারা বলে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁকে আকাশে জীবিতাবস্থায় উত্থিত করা হয়েছে। অপর একদল কুফরি করেছে যেহেতু তারা বলত, ঈসা আল্লাহর পুত্র, যাকে তিনি নিজের নিকট উত্থিত করেছেন। অতঃপর উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে অনন্তর আমি সাহায্য করেছি শক্তিশালী করেছি ঈমানদারদেরকে, দুই দলের মধ্য হতে তাদের শত্রুগণের উপর। কাফির দলের উপর। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে ظَاهِرِيْنَ শব্দটি غَالِبِيْنَ অর্থে ব্যবহৃত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَمَا قَالُوْا : كَمَا قَالُوْا শব্দে অবস্থিত ك বর্ণটি একটি مَصْدَرْ مَحْذُوْف-এর صِفَتْ হয়েছে। যার تَقْدِيْر হলো, كُوْنُوْا كَوْنًا كَمَا قَالَ আর কেউ কেউ এ كَافْ-কে একটা فِعْل উহ্য মেনে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলে মনে করেছেন।

-[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর সাহায্যকারী হও।" ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, 'এ আয়াতে তুলনা অর্থের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে' অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও যেমন হাওয়ারীগণ আল্লাহর সাহায্যকারী ছিলেন।" -[কাবীর]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এখানে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে যখন সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকুলের উপর অনির্ভরশীল, মুখাপেক্ষীহীন, সকলই তাঁর উপর নির্ভরশীল ও তাঁর মুখাপেক্ষী, তখন কোনো বান্দার পক্ষে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া কিরূপে সম্ভবপর? এ প্রশ্নের জবাবদান ও এ সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা এখানে আরো অধিক ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজের ব্যাপারে তাঁর কোনো বান্দার সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং এ লোকদেরকে সে কারণে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে মূলত এ কথা সত্য নয়- বস্তুত জীবনের যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে মানুষকে কুফর ও ঈমান, আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানি করার স্বাধীনতা দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমানদার ও অনুগত বানান না, বরং তাঁর নবী-রাসূল ও নিজের প্রেরিত কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে সত্য দীনের পথে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ-নসিহত শিক্ষাদান, বুঝানো ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করেন। এ উপদেশ-নসিহত শিক্ষাদানকে যে লোক নিজের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা-আগ্রহে কবুল করে সে মু'মিন। যে লোক কার্যত অনুগত হয়, সে মুসলিম, আবিদ ও 'কানিত'। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সে মুত্তাকী ব্যক্তি। যে লোক নেক আমলসমূহের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায় সে মুহসিন। আর এসব হতেও এক কদম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যে লোক এ শিক্ষাদান ও উপদেশ-নসিহতের সাহায্যে আল্লাহর বান্দাগণের সংশোধন বিধানের জন্য এবং কুফর ও ফাসিকীর পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে শুরু করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের 'সাহায্যকারী' বলে অভিহিত করেছেন।

এ ধরনের লোকদেরকে 'আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী' না বলে 'আল্লাহর সাহায্যকারী' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে- এটার দ্বারা তারা দীনের কাজে আরও বেশি অগ্রসর ও অনুপ্রাণিত হোক।

হাওয়ারী অর্থ ও তারা কারা? তাদের সংখ্যা কত ? : হওয়ারী حَوَارِىْ শব্দটি মূল حُوْرِىْ হতে উৎপত্তি অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ, (مُخْلِصْ) প্রকৃত বন্ধু, মুরুব্বি ইত্যাদি। ধোপাকে হাওয়ারী বলা হয়, যেহেতু তারা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে তোলে। খাঁটি ও অমিশ্রিত জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়, তখন বলা হবে এরা খাঁটি প্রকৃতভাবে মূসা (আ.)-এর উপর ঈমানদার।

আর যে আটা হতে চালনি দিয়ে ভূষি বের করা হয়, তাকে حُوَارِىْ (হুয়ারা) বলা হয়; সুতরাং এ দৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম বন্ধুকে এবং সমর্থক বা সাহায্যকারীকেও হাওয়ারী বলা হয়।

ইবনে সাইয়েদাহ বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সাহায্য করে, সে তার হাওয়ারী। -[লিসানুল আরব]

হাওয়ারীগণ সংখ্যায় বারোজন ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর خَاصْ খাদেম ও বন্ধুসুলভ লোক ছিলেন। যখন হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের নাফরমানি ও জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নিরাশ অবস্থায় বলে উঠলেন, হে মানব সকল! আল্লাহর পক্ষ হয়ে আমার সাহায্যকারী কেউ হতে পারবে কি? যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে? এবং আমার সহানুভূতি করবে? তখন উক্ত বারোজন বলল, আমরাই আপনার সাহায্যকারী। সুতরাং তারাই হযরত ঈসা (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিল এবং সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করতে লাগল। কিছু সংখ্যক ঈমান আনয়ন করল, আর কিছু লোক কাফেরই রয়ে গেল। মোটকথা, ধর্মীয় ব্যাপার ও পার্থক্যতার ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধল এবং শত্রুতা বেড়ে গেল। সর্বশেষ আল্লাহর পক্ষই জিতল।

আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর ঈমানদারগণের মধ্যেও তিন দল হয়ে গেল।

১. একপক্ষ বলল, نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ হযরত ঈসা (আ.) খোদা ছিলেন। কিছু দিনের জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন। অতঃপর পুনরায় নিজ বাসস্থানে চলে গেলেন।

২. আর একপক্ষ বলল, তিনি খোদা ছিলেন না; বরং খোদার পুত্র ছিলেন كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ পিতার আহ্বানে চলে গেলেন। -[উক্ত দুই দল কাফের হয়ে গেল]

৩. আর একপক্ষ আহলে হক ছিল। যারা বলতেন, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন, মাখলুকাতের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেভাবে অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ আগমন করেছেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর হেফাজতের উদ্দেশ্যে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। কাফের পক্ষ কিছু কাল পর্যন্ত সত্যবাদী পক্ষের উপর বিজয়ী রইল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন, তখনই উক্ত কাফের পক্ষের উপর ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করেন। -[খাযেন ও মাদারেক কাবীর]

হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতগণের মধ্যেই যুদ্ধ বেঁধেছিল আর তাদের ধর্মে এটা বৈধ ছিল কি? : এটার উত্তরে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার উম্মতের মধ্যে দুপক্ষ হয়ে গেল। একপক্ষ হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে মুশরিক হয়ে গেল, অপর পক্ষ প্রকৃত ঈমানের উপর স্থায়ী রইল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাসী ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ঈমানদার উম্মতগণের জয় তাঁর কাফের উম্মতগণের উপর হলো। তবে এ মত স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে জিহাদ ও হত্যার নির্দেশ ছিল না। তাই ঈমানদারগণের যুদ্ধ করার কথা কঠিন মনে হয়। -[রুহুল মা'আনী] তবে এটা হতে পারে যে, যুদ্ধের সূচনা কাফের নাসারাগণের পক্ষ থেকে হয়েছে। ঈমানদারগণ তখন তাকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়ে গেলেন। এ মর্মে বুঝলেন উম্মতে ঈসা (আ.)-এর মু'মিনগণ যুদ্ধ করেছিলেন, এ কথা সাব্যস্ত হয়ে যায় না। -[মা'আরিফ]

তাশবীহ দানের জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা কেন উল্লেখ করা হলো? : এর কারণ-

১. যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মত সম্পর্কে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলে বা উদাহরণ দিলে সহজবোধ্য হবে।

২. অথবা, হতে পারে বনী ইসরাঈলগণ যেহেতু আল্লাহর নিকট মূলত অধিক প্রিয় ছিল, সুতরাং প্রিয়পাত্রদের নাফরমানি অসহনীয়, তদ্রূপ উম্মতে মুহাম্মদীয়াহও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়, এদের নাফরমানিও অসহনীয় হবে। সুতরাং তারা যেন এ উদাহরণ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ .... فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল, অন্য আর একদল কুফরি করল, অতঃপর আমরা ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম। আর তারাই বিজয়ী হয়ে থাকল।" আয়াতের আলোচ্য অংশের এক তাফসীর জালালাইনে করা হয়েছে। এটার অপর এক তাফসীর হলো, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আসমানে তুলে নেওয়া হলো, তখন তাঁর উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল বলল, তিনি খোদা ছিলেন, অতঃপর তিনি উঠে গেছেন। এদেরকে ইয়াকূবিয়া বলা হয়। আর একদল বলল, খোদার সন্তান ছিলেন, খোদা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। এদেরকে নাস্তূরিয়া বলা হয়। আর একদল বলল, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন- এরাই হলেন মুসলিম। এসব দলের সাথে আরো অনেক লোক ভিড়ল। কাফির দল দু'টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাদেরকে দেশ হতে বিতাড়িত করল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত তারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত ছিলেন, অতঃপর তারা কাফেরদের উপর বিজয়ী হলেন। এটাই হলো "ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম" উক্তিটির তাৎপর্য। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সত্যতা বিধানের মাধ্যমে হযরত ঈসার প্রতি সত্যিকারের ঈমান আনয়নকারীদের বিজয় হলো। সুতরাং এ বিজয় দলিল প্রমাণের মাধ্যমেই বিজয়, অস্ত্রের বলে নয়। এটা যায়েদ ইবনে আলীর অভিমত। -[কাবীর]

কেউ কেউ বলেছেন, ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার জানিয়েছে ইহুদিরা এবং ঈমান এনেছে খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয়ই। আর আল্লাহ তা'আলা উভয় জাতিকে মসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকারকারী লোকদের উপর বিজয়ী করেছেন। এ কথাটি এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে এ কথার বিশ্বাস করানো যে, অতীতে যেভাবে হযরত ঈসার প্রতি ঈমানদার লোকেরা তাঁকে অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছিল অনুরূপভাবেই এখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমানদার ও তাঁর অনুসারী লোকেরা তাঁর অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী হবে।

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ : সূরা আল-জুমুআহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : নবম আয়াতের অংশ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এ সূরায় জুমার সালাতের বিধানও উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এটাতে আলোচিত বিষয়াদির দৃষ্টিতে 'জুমু'আহ' এটার সামষ্টিক শিরোনাম নয়. অন্যান্য সূরার মতো এখানেও একটি চিহ্ন হিসেবেই এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত; ১৮০টি বাক্য এবং ৭৪৮টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

আর অত্র সূরা মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রেরিত হওয়ার কথা ইরশাদ হয়েছে যে- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ الخ

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার প্রথম রুকুর আয়াতসমূহ ৭ম হিজরিতে নাজিল হয়েছে। আর সম্ভবত এটা 'খায়বার' বিজয়কালে কিংবা তারপর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে জারীর (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বসা অবস্থায় ছিলাম, সে সময়ই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আর ইতিহাস হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হোদায়বিয়া সন্ধির পর ও খায়বার বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী খায়বার বিজয় ৭ম হিজরির মহররমে আর ইবনে সা'দের বর্ণনানুযায়ী (ঐ বছরের) জামাদিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, অনুমান করা যায়, ইহুদিদের এ সর্বশেষ প্রাণকেন্দ্র জয় করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাজিল করে থাকবেন; কিন্তু এটা নাজিল হয় তখন, যখন খায়বার-এর পরিণতি দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদি বসতিগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় রুকুর আয়াতসমূহ হিজরতের পর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়েই প্রথম দিনে জুমার সালাত কায়েম করেছিলেন, তা স্পষ্ট বলছে যে, জুমা কায়েম হওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার পর তা অবশ্যই এমন কোনো সময় সংঘটিত হয়ে থাকবে যখন লোকেরা দীনি সভা সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখন পর্যন্ত পুরামাত্রায় শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

এ দুই রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ সম্পর্ক সামঞ্জস্যের কারণে তা এ সূরায় শামিল করে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের জন্য 'সাবত' বা শনিবারের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে জুমা দান করেছেন। তিনি মুসলমানগণকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছা করেছেন যে, তারা যেন জুমার সঙ্গে সেরূপ আচরণ না করে যা ইহুদিরা করেছে সাবতের সঙ্গে। এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল এবং তারা ঢোল-বাদ্যের আওয়াজ শুনা মাত্র বারোজন লোক ছাড়া উপস্থিত সমস্ত মুসল্লি মসজিদে নববী হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। অথচ এ সময় রাসূলে কারীম ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এ কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জুমার আজান হওয়ার পর সর্ব প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণ হারাম। এ সময় সমস্ত কাজ-কর্ম পরিহার করে আল্লাহর জিকির-এর জন্য দৌড়ে যাওয়া ঈমানদার লোকদের কর্তব্য। তবে সালাত শেষ হওয়ার পর নিজেদের কায়-কারবার চালাবার জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদের রয়েছে। জুমার সালাত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম সমন্বিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানানো যেত। কিংবা অন্য কোনো সূরায়ও তাকে শামিল করে দেওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তা করা হয়নি। তার পরিবর্তে বিশেষভাবে এ আয়াত কয়টিকে এখানে সে আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ইহুদিদের মর্মান্তিক দুঃখময় পরিণতির কার্যকারণ উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এটার অন্তর্নিহিত মূলকথা যা তাই আমরা উপরে লিখেছি।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : অত্র সূরার দু'টি রুকূ' রয়েছে এবং উভয় রুকূ' ভিন্ন ভিন্ন সময় নাজিল হয়েছে, তাই আলোচ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। এ দু'টি অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে বলেই এ দু'টি অংশকে একই সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় পৃথকভাবেই বুঝবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা অর্থাৎ আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি জগতের মতো তোমরা মানবজাতিও তাঁর গুণ কীর্তন বর্ণনা করো।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি এবং বহু কার্যাদির বিবরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং মানুষকে শিরক, বিদআত, জেনা, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি ও মানুষকে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেন। তাঁর এ কার্য সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী আগমনকারীদের জন্য বাস্তবায়ন হবে। এটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

৫ম আয়াতে আল্লাহ তাওরাতপ্রাপ্ত ইহুদিদেরকে তাদের কিতাবের আহকামসমূহকে বুঝে-শুনেও অবমাননা করার কারণে গাধার সাথে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্টির কথা বলেছেন।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সকল ইহুদি আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবি করে, তাদের সে দাবি সত্যায়িত করার মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের অত্র দাবি মিথ্যা ছিল, তাই তারা সে আকাঙ্ক্ষা জাহির করবে না। আল্লাহর এটা অজানা নয়। আর মুহাম্মদ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, তারা মৃত্যু হতে বাঁচতে যতই চেষ্টা করুক, মৃত্যু অবধারিত এটা শুনিয়ে দিন।

শেষ রুকূ'তে জুমার নামাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং জুমার আজান দেওয়ার পর যাবতীয় কার্যাদি ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জুমার দিকে সায়ী করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। আর নামাজান্তে দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম হালালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতি তারগীব দেওয়া হয়েছে। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম ও ধন-দৌলত হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অতি উত্তম।

سُوْرَةُ الْجُمْعَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-জুমু'আহ্ মদীনায় অবতীর্ণ

اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ يُنَزِّهُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ فِىْ ذِكْرِ مَا تَغْلِيْبٌ لِلْاَكْثَرِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْمُنَزَّهِ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فِىْ مُلْكِهٖ وَصُنْعِهٖ .

১. আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে পবিত্রতা বর্ণনা করে, لِلّٰهِ মধ্যকার ل হরফটি অতিরিক্ত যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অপ্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَا অব্যয়টিকে সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। যিনি অধিপতি, পবিত্র তাঁর শানের অনুপযোগী বস্তু হতে পবিত্র মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় তাঁর রাজত্ব ও সৃষ্টিকার্যে।

٢. هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ الْعَرَبِ وَالْاُمِّىُّ مَنْ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ كِتَابًا رَسُوْلًا مِنْهُمْ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ الْقُرْاٰنَ وَيُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ وَاِنَّهُمْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ مَجِيْئِهٖ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

২. তিনিই প্রেরণ করেছেন উম্মীগণের মধ্যে আরবদের মধ্যে। اَلْاُمِّىُّ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কোনো কিতাব পড়েনি এবং লিখেনি। তাদের মধ্য হতে রাসূল তিনি মুহাম্মদ ﷺ যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত আবৃত্তি করেন কুরআন। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন তাদেরকে শিরক হতে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে শিক্ষা দান করেন কিতাব কুরআন ও বিজ্ঞান তন্মধ্যকার আহকামসমূহ। যদিও اِنْ ছাকীলা হতে খফীফাকৃত, আর তার ইসমটি উহ্য অর্থাৎ وَاِنَّهُمْ ছিল। তারা ইতঃপূর্বে ছিল তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত প্রকাশ্য।

٣. وَاٰخَرِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الْأُمِّيِّيْنَ اَيِ الْمَوْجُوْدِيْنَ مِنْهُمْ وَالْاٰتِيْنَ مِنْهُمْ بَعْدَهُمْ لَمَّا لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط فِى السَّابِقَةِ وَالْفَضْلِ وَهُمُ التَّابِعُوْنَ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَيْهِمْ كَافٍ فِىْ بَيَانِ فَضْلِ الصَّحَابَةِ الْمَبْعُوْثِ فِيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ بُعِثَ اِلَيْهِمْ وَاٰمَنُوْا بِهٖ مِنْ جَمِيْعِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لِاَنَّ كُلَّ قَرْنٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَلِيْهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِهٖ وَصُنْعِهٖ .

৩. আর অন্যান্যের জন্য এটা اَلْاُمِّيِّيْنَ -এর প্রতি عَطْفٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিরাজকারীগণ এবং পরবর্তীতে আগমনকারীগণ তাদের মধ্যে হতে তাদের পরে যারা এখনো لَمَّا অব্যয়টি لَمْ অর্থে ব্যবহৃত। তাদের সাথে মিলিত হয়নি অগ্রবর্তীতা ও সম্মান-মর্যাদা বিবেচনায়। আর তাঁরা হলেন তাবেঈগণ। আর সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন, অন্যান্য যাদের নিকট তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানব ও জিনদের মধ্য হতে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী তাদের সকলের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য তাবেঈগণের উপর সংক্ষিপ্ত করাই যথেষ্ট। কেননা প্রত্যেক যুগই তৎসংশ্লিষ্ট পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় স্বীয় রাজত্বে ও সৃষ্টিকার্যে।

٤. ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ط النَّبِىَّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهٗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে। আর আল্লাহ সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَلْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ : জমহুর এ শব্দগুলোকে اَللّٰهِ শব্দের صِفَتٌ হিসেবে جَرّ দিয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ بَدَلْ হিসেবে جَرّ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। আর আবূ ওয়ায়েল ইবনে মাহারেব, আবুল আলীয়া, নসর ইবনে আসেম ও রুবা مُبْتَدَاْ مَحْذُوْف -এর خَبَرْ হিসেবে رَفْع দিয়ে اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পড়েছেন। -[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ الْقُدُّوْسِ : জমহুর اَلْقُدُّوْسِ -এর قَافْ -এ ضَمَّه দিয়ে পড়েছেন, আর যায়েদ ইবনে আলী قَافْ -এ فَتْح দিয়ে اَلْقَدُّوْس পড়েছেন।

قَوْلُهٗ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ فِى التَّرْكِيْبِ؟ : لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ বাক্যটি তারকীবে اٰخَرِيْنَ শব্দের صِفَتٌ হয়েছে অর্থাৎ আর অন্যান্য বা যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ ... الْحَكِيْمِ : পবিত্র কুরআনে যে সকল সূরা يُسَبِّحُ অথবা سَبَّحَ শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে, সে সকল সূরাগুলোকে مسبحات (মুসাব্বাহাত) বলা হয়। সে সকল শব্দগুলো দ্বারা আসমান ও জমিনে এবং তার মধ্যবর্তীতেও যত সৃষ্টিকুল রয়েছে, সকলের তাসবীহ পাঠ করার কথা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এ তাসবীহগুলো

কোনো কোনো সৃষ্টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করে থাকে। আর কোনোগুলো ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে। ভাষাহীন ও প্রাণহীনগণ অবস্থায় আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। আর প্রাণীজগৎ নিজ নিজ ভাষায় তা প্রকাশ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্য আয়াতে বলেন- وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টিই নিজ নিজ নীতিমালায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, কিন্তু মানুষ তা সম্পূর্ণ অনুভব করতে অক্ষম। কেননা অনুভূতিশক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার অবস্থা অনুপাতেই দিয়েছেন এবং তার অনুভূতি অথবা জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ বা তাঁকে স্মরণ করা আবশ্যক করে। তবে মানুষ তা শ্রবণ করতে পারে না।

আর অধিকাংশ সূরায় سَبَّحَ শব্দটি مَاضِىْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র দুটি سُوْرَةْ অর্থাৎ সূরা জুমু'আহ ও সূরা তাগাবুন -এর মধ্যে يُسَبِّحُ অর্থাৎ مُضَارِعْ ব্যবহার করা হয়েছে। মাযীর صِيْغَه গুলো قَطْعِيَت এবং يَقِيْن বুঝায়, আর মুযারের صِيْغَه গুলো دَوَامْ এবং اِسْتِمْرَارْ বুঝিয়ে থাকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাযী ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাত্র দু' জায়গায় مضارع ব্যবহার করা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ৪টি صِفَاتْ -এর বর্ণনা রয়েছে। এগুলো উক্ত সূরার বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। তা হলো اَلْمَلِكُ . اَلْقُدُّوْسُ . اَلْعَزِيْزُ . اَلْحَكِيْمُ . اَلْمَلِكُ রাজাধিরাজ, সকল সৃষ্টিকুলের বাদশাহ। (اَلْقُدُّوْسُ) আর মহান পবিত্র, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (اَلْعَزِيْزُ) বলে আল্লাহকে পরাক্রমশালী বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁর সাথে (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) যুদ্ধ করেও কেউ জয়ী হতে পারবে না। اَلْحَكِيْمُ অর্থাৎ তাঁর সকল কর্তৃত্ব বিবেক-বুদ্ধিসম্মত।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ ..... رَسُوْلًا مِّنْهُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি প্রেরণ করেছেন উম্মীগণের মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল। أُمِّىْ অর্থ-লেখাপড়া না জানা লোক। এখানে আরবজাতিকে উম্মী বলা হয়েছে। কারণ আরব জাতির অধিকসংখ্যক লোক লেখাপড়া জানত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজের অঙ্গুল দ্বারা নির্দেশ করে- মাস এ রকম এ রকম হয়ে থাকে। অতঃপর বলেছেন, আমরা হলাম উম্মী জাতি, হিসাবও জানি না, লিখতেও জানি না। যারা লেখাপড়া জানে না তাদেরকে উম্মী বলা হয়েছে, উম্মুন বা মায়ের উদর হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ লেখাপড়া পরিশ্রম করে শেখার পরই জানতে পারে।

এখানে উম্মী বলতে অ-ইসরাঈলীও হতে পারে। কারণ ইহুদিরা তাদের পরিভাষায় অ-ইহুদিদেরকে উম্মী বলত, যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে এ অবিশ্বাস পরায়ণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলত উম্মীদের (অ-ইহুদিদের) ধনমাল লুটে খাওয়ায় আমাদের কোনো বাধা নেই।

-[সূরা আলে ইমরান : ৭৫]

এ শব্দটি হিব্রু ভাষায় گوىم শব্দের সমার্থবোধক, বাইবেলে তার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে [GENTILES] এটার অর্থ-সমস্ত অ-ইহুদি কিংবা অ-ইসরাঈলী সমাজ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, উম্মী অর্থ যাদের কোনো কিতাব নেই, আর তাদের মধ্যে কোনো নবীও প্রেরিত হয়নি।

-[কাবীর]

رَسُوْلًا مِّنْهُمْ "তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল।" সে রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কারণ তিনি আরবের লেখাপড়া না জানা লোকদের মধ্যে একজন যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি অ-ইসরাঈলীও।

রাসূল ﷺ -কে উম্মীরূপে প্রেরণ করার হিকমত : আল্লাহ তা'আলা আরবের উম্মী লোকদের জন্য তাদের মধ্য হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেন, তাদেরকে তিনি আল্লাহর কালাম পড়ে শুনাবার জন্য এবং তাদেরকে শোধরাবার জন্য এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত, জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আরবের অশিক্ষিত এ জাতি আল্লাহর কিতাব এবং পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অতি অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সভ্যতা ও ভদ্রতা, নৈতিক আদর্শ ও মানবতায় বিশ্বের সকল জাতিকে ডিঙ্গিয়ে যায়। বিশ্ব সভ্যতায় সর্বশীর্ষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করে। اُمِّيّٖنَ শব্দটি اُمِّىٌّ -এর বহুবচন, অশিক্ষিত লোকদেরকে উম্মী বলা হয়। আরবের লোকেরা اُمِّىْ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, এমনকি কোনো আসমানি কিতাবও তাদের ছিল না। সামান্য লেখাপড়া জানে, অক্ষর জ্ঞান রাখে, এমন লোকও তাদের মধ্যে বিরল ছিল।

আর যে রাসূল প্রেরণ করেছেন তিনিও তাদের মধ্য হতে ছিলেন। অর্থাৎ উম্মী ছিলেন। উম্মী জাতির হেদায়েতের জন্য উম্মী নবী প্রেরণ করা এটা অতি হয়রানকারী বিষয়। আর যে নির্দেশনামা রাসূলের সোপর্দ করা হয়েছে, তা এমন একটি জ্ঞান ও শিক্ষার সংশোধনী যা কোনো উম্মী লোক বুঝতে পারবে না, আর কোনো উম্মী জাতিও তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। এটা একমাত্র আল্লাহর কুদরতের পূর্ণাঙ্গ নমুনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর مُعْجِزَه মাত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত এবং কুরআন আল্লাহর ওহী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। কারণ তিনি লেখাপড়া জানলে একটা জীবন-বিধান দান করার মধ্যে তেমন আশ্চর্যের কিছু থাকত না; কিন্তু উম্মী হয়েও ইসলামের মতো একটি জীবন-বিধান গোটা মানবজাতির সামনে পেশ করতে পারা, কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ গোটা মানবজাতির সামনে পেশ করে আবার সেখানে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা চাট্টিখানি কথা নয়। তিনি আল্লাহর নবী না হলে কুরআন আল্লাহর কিতাব না হলে অন্য কারো পক্ষে এ রকম জীবন বিধান দেওয়া ও কুরআনের মতো গ্রন্থ লেখা সম্ভব হচ্ছে না কেন? সুতরাং তিনি উম্মী হয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনি আল্লাহর নবী ও রাসূল, আর তাঁর আনীত ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কিতাব। –[তাফসীরে রূহুল কোরআন]

رَسُوْلًا مِّنْهُمْ উক্তি হতে আরো প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৃষ্টির উপাদান সাধারণ আরবজাতি তথা গোটা মানবজাতির সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্ন কিছুই নয়।

قَوْلُهُ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ .... وَالْحِكْمَةَ : আল্লাহ তা'আলা সে রাসূলের গুণাবলি আর পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে তাদেরকে তাঁর [আল্লাহর] আয়াত শুনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়।

اٰيَاتٌ অর্থ কুরআনের আয়াতও হতে পারে, আবার নবুয়তের প্রমাণ ও নিদর্শনাবলিও হতে পারে। –[কাবীর]

আর জীবন পরিশুদ্ধ করে অর্থ জীবনকে কুফর ও শিরকের গুনাহ হতে পাক-পবিত্র করে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটার অর্থ হলো– ঈমান দ্বারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেয়। আর সুদ্দী বলেছেন, وَيُزَكِّيْهِمْ-এর অর্থ হলো– তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ করেন। –[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, রূহুল কোরআন]

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ "এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন।" কিতাব অর্থ–কুরআন, কেউ কেউ লিখনও বলেছেন, আর হিকমত অর্থ হলো–সুন্নত বা হাদীস অথবা কুরআনী বিধি-বিধান। –[সাফওয়া, ফতহুল কাদীর]

এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ চারটি গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদেরকে একথা বলা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজগুলো করছেন তাতো নিঃসন্দেহে একজন রাসূলের কাজ। তিনি যেসব কাজ করছেন সেসব কাজই তো আগেকার রাসূলগণ করেছেন। আর এসব কাজের মাধ্যমেই তো রাসূলগণের রিসালাতের প্রমাণ মিলে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী মেনে নিতে তোমরা দ্বিধা করছ কেন? আসলে তাকে নবী মেনে নিতে তোমরা কেবল এ কারণে অস্বীকার করছ যে, তিনি এমন এক জাতির মধ্যে আসছেন যাদেরকে তোমরা উম্মী বল। এটা নিঃসন্দেহে চরম হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : উক্ত আয়াতে শব্দসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সাধারণত শব্দের তারতীব অনুসারে প্রথমত তেলাওয়াত (يَتْلُوْا) ও (وَيُعَلِّمُهُمْ) তৎপর তা'লীম এবং শেষে (وَيُزَكِّيْهِمْ) তাযকিয়া শব্দের ব্যবহার করা উত্তম হতো। কারণ يَتْلُوْا . وَيُزَكِّيْهِمْ . وَيُعَلِّمُهُمْ শব্দত্রয়ের وَظِيْفَه طَبْعِيْ এটাই যে, প্রথমত শব্দ শিক্ষা অতঃপর তার অর্থ শিক্ষা এবং পরিশেষে চরিত্র ও আমলের কার্যে নিয়োজিত হতে হয়। অন্যথায় শিক্ষাহীন আমল দ্বারা কোনো উপকৃত হওয়া খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনে হাকীম-এর অধিকাংশ স্থানেই তারতীব পরিবর্তন অর্থাৎ تِلَاوَت وَتَعْلِيْم -এর মাঝে تَزْكِيَه -কে ব্যবহার করা হয়েছে। এটার কারণ কি?

এটার উত্তরে রূহুল মা'আনী ও মা'আরিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি تَرْتِيْب طَبْعِيْ বা সাধারণ নিয়মের অনুসরণ করা হতো, তবে উক্ত তিন শব্দের مَفْهُوْم একই হয়ে যেত এবং বিষয় বুঝা যেত। যেমন হেকিমী গ্রন্থসমূহে কয়েকটি ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে এবং একই রোগের শেফা-এর জন্য ঐগুলোকে নির্ধারিত বলে বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, ঠিক এখানেও তদ্রূপ অর্থ। অর্থাৎ تِلَاوَتْ . تَعْلِيْم . تَزْكِيَه তিনটিই পৃথকভাবে আল্লাহর তিনটি নিয়ামত স্বরূপ, আর তিনটিকেই

পৃথক পৃথক فَرَائِض رِسَالَتْ রিসালাতের তিনটি দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে। যদি বর্ণিত তারতীব পরিবর্তন করে تَرْتِيْب طَبْعِى অনুসারে বলা হয়, তাহলে তিনটির সমষ্টিকে এক বলে বুঝার সম্ভাবনা থাকত এবং আল্লাহর মূল উদ্দেশ্যে আঘাত হতো। সুতরাং বর্ণিত تَرْتِيْب-ই সবচেয়ে উত্তম হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'এর পূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল, গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।' উক্ত আয়াতটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের আর একটি প্রমাণ– ইহুদিদের চক্ষু উন্মীলিত করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ লোকেরা শত শত বৎসর ধরে আরবের বিস্তীর্ণ ঊষর ধূসর প্রান্তরে বসবাস করছিল এবং আরবদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো একটি দিকও তাদের নিকট গোপন ছিল না। তাদের সে প্রাক্তন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে যে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বে এ জাতির যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, হে ইহুদিরা, তোমরা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ লোকদের কি অবস্থা ছিল, তা তোমরা নিজেরাই দেখতে পেয়েছ। আর ইসলাম গ্রহণের পর তাদের কি অবস্থা হয়েছে, তাও তোমরা দেখতে পেয়েছ। এ সঙ্গে যারা এখনও ইসলাম কবুল করেনি, তাদের অবস্থাও তোমাদের সম্মুখে স্পষ্ট ভাসছে। আর এদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তা একজন অন্ধ লোকও দেখতে পাচ্ছে। এরূপ পার্থক্য সৃষ্টি যে একজন নবীর মহান অবদান ছাড়া সম্ভব নয়, তা তোমাদেরকে বুঝাবার জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়? এবং এ পরিবর্তন ও পার্থক্য এতই বিরাট যে, এটার সম্মুখে অতীত নবী-রাসূলগণের কাজও ম্লান হয়ে গেছে।

এ আয়াত দ্বারা রাসূলের নবুয়ত কেবল আরবদের জন্য নির্দিষ্ট বলে দাবি করা শুদ্ধ নয় : ইহুদিরা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত কেবল আরবদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কারণ তাঁকে উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের এ দাবি শুদ্ধ নয়। কারণ কুরআনের অপর আয়াত وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ-এর অর্থ এটা নয় যে, "তোমার ডান হস্তে লিখনি" বাম হস্তে লিখেছ, বরং এটার অর্থ হলো 'তোমার স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখনি' ঠিক তেমনি بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ-এর অর্থ কেবল উম্মীদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে– এ অর্থও ঠিক নয়। তোমাদের এ কথার প্রমাণ হলো পরের আয়াত وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর কুরআনের অপর আয়াত যেখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে كَافَّةً لِلنَّاسِ অর্থ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্য। এটা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী হতেও প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি আরব ছাড়া অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির কাছেও ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। –[কাবীর] অতএব, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাত কেবল আরবদের জন্য বা অ-ইসরাঈলীদের জন্য একথা বলা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ .....(اَلْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর (এ রাসূলের আগমন) অন্যান্য সেসব লোকদের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি। আল্লাহ মহাশক্তিধর এবং সব কিছুর মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত।'

وَاٰخَرِيْنَ বাক্যটিকে اُمِّيِّيْنَ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে, অর্থাৎ অন্যান্য সেসব লোকদের জন্য এ রাসূল প্রেরিত হয়েছে যারা ...এ اٰخرين বাক্যটিকে يُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيْهِمْ শব্দদ্বয়ের هُمْ-এর উপরও عَطْف মনে করা যেতে পারে, তখন আয়াতের অর্থ হবে– এ রাসূল অন্যান্য সেসব লোকদেরকে শিক্ষা দেন এবং পবিত্র করে যারা এখনও বর্তমানদের সাথে মিলিত হয়নি। –[কুরতুবী]

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকেও এ রাসূল শিক্ষা দিবেন, অর্থাৎ তারা যে শিক্ষা পাবে তা রাসূলের শিক্ষা হবে।

হযরত ইকরামা এবং মুকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰخَرِيْنَ শব্দটি দ্বারা তাবেয়ীনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়। ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে সকলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আমর ইবনে সায়ীদ–ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ শব্দ দ্বারা অনারবদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আরবদের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বসা ছিলাম। হযরত সালমান ফারসী (রা.) আমাদের মাঝেই ছিলেন, এমন সময় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ আলোচ্য আয়াত পাঠ করলে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আলোচ্য আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? নবী করীম ﷺ কোনো জবাব

দিলেন না। লোকটি দুই বা তিনবার একই প্রশ্ন করল, তখন নবী করীম ﷺ হযরত সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে এরশাদ করলেন, যদি ঈমান সূরাইয়া নামক নক্ষত্রের নিকটও থাকে, তবে এ ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কিছু লোক তা অর্জন করবে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পারস্যের কিছু লোক এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যাদের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এবং হাদীস ও তাফসীরের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-কে। -[নূরুল কোরআন]

আয়াতটি কুরআনী মু'জিযা এবং নবুয়তের সত্যতার দলিল : এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অনারব অন্যান্য অনেক জাতি-গোষ্ঠি ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের কয়েক বছর পর কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনেক অনারব জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইসলাম প্রসারের ও প্রচারের এ কথা নিজ থেকে কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, এ দীনের দাওয়াতের প্রতি তার আস্থা যতই প্রবল হোক না কেন। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, কেবল যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী এমন কোনো উৎস হতে ঘোষিত হয়- যার হাতে সমগ্র ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হলো- এ ভবিষ্যদ্বাণী কোনো মানুষের নয় বরং মানব স্রষ্টা আল্লাহর। আর এটাও প্রমাণিত হলো যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ও নবী। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ .... الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তাঁর অপার ও অশেষ অনুগ্রহ মাত্র, তিনি যাকে চান, নিজ কৃপায় ধন্য করবেন। তাঁর ফজল, কৃপা ও অনুগ্রহের অন্ত নাই, তিনি মহান অনুগ্রহকারী। অর্থাৎ এমন অসামাজিক ও উম্মী জাতির মধ্যে এমন মহানবী সৃষ্টি করেছেন। যা শিক্ষা ও হেদায়েত অতীব উচ্চ মাত্রার বিপ্লবাত্মক, উপরন্তু তা সার্বজনীন বিশ্বব্যাপক ও চিরন্তন আদর্শের ধারক। তার ভিত্তিতে সমগ্রজাতি একত্রিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে এসব মূলনীতি হতে মানুষ হেদায়েত লাভ করতে পারে। বস্তুত এটা একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের অবদান। কোনো কৃত্রিমতাকারী মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন এমন মর্যাদা ও সম্মান কিছুতেই লাভ করতে পারবে না। আরবের মতো একটা অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশে তো দূরের কথা, দুনিয়ার বড় ও উন্নত জাতিরও কোনো সর্বাধিক, প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেও একটি জাতির এরূপ আমূল পরিবর্তন সাধন করা এবং সমগ্র জাতি একটি সভ্যতার ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে, এমন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ মূলনীতিসমূহ দুনিয়াতে উপস্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নয়। মূলত এটা একটি মু'জিযা বিশেষ, আল্লাহর কুদরতেই মু'জিযা বাস্তবায়িত হতে পারে।

فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে তাফসীরকারকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. মাদারেক গ্রন্থকার বলেন, فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তদানীন্তন আরবের উম্মীগণের বংশধর হিসেবে নবী করে পাঠানো, আর তাকে তদীয় উম্মীগণ ও তাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যও নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাদের উপর আল্লাহ যে রহম করেছেন, এটাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

খ. আবার কেউ কেউ বলেন, দীন ইসলাম একমাত্র মানুষের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ এবং ইসলাম গ্রহণ করাও আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই তাঁর অনুগ্রহের শামিল করেন। সুতরাং যাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন, সে জাতির জন্য ইসলাম একটি فَضْلُ اللّٰهِ স্বরূপ।

গ. কেউ কেউ বলেন, فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাত উভয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে এ মতামতটা অধিক পছন্দনীয় বলে মনে হয়। কারণ ইহুদিগণের ধারণা ছিল যে, তারাই কেবল আল্লাহর মনোনীত সম্প্রদায় এবং তারাই নবুয়ত ও রিসালাতের অধিকারী উক্ত আয়াতটি তাদের এ দাবির জবাব স্বরূপ। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ উম্মীদের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন, নবুয়ত ও রিসালাত তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এ নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই পছন্দ করতে পারেন। যেহেতু এতে কোনো জাতির ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোনো অধিকার নেই। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ -কেই এ فَضْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ নবুয়ত ও রিসালাতের উপযোগী মনে করে তাঁকে তা দান করেছেন।

অনুবাদ :

٥. مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ كُلِّفُوا الْعَمَلَ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا لَمْ يَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهَا مِنْ نَعْتِهِ ﷺ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط اَىْ كُتُبًا فِىْ عَدَمِ اِنْتِفَاعِهِ بِهَا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَلْمُصَدِّقَةِ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُحَمَّدٍ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ تَقْدِيْرُهٗ هٰذَا الْمَثَلُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৫. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তদুপর আমল করায় বাধ্য করা হয়েছে, অতঃপর তারা তা বহন করেনি তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচিতি ও প্রশংসা বিষয়ে যা কিছু উল্লিখিত আছে, তদুপর আমল করেনি এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেনি তাদের উদাহরণ সে গর্দভের ন্যায় যে পুস্তক বহন করে অর্থাৎ কিতাবসমূহ, তা দ্বারা তার কোনো উপকার সাধিত না হওয়ার বেলায়। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের উদাহরণ, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতা সাব্যস্ত হয়। এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ هٰذَا الْمَثَلُ আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না কাফিরদেরকে।

٦. قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ عَلٰى اَنَّ الْاَوَّلَ قَيْدٌ فِى الثَّانِىْ اَىْ اِنْ صَدَقْتُمْ فِىْ زَعْمِكُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ اللّٰهِ وَالْوَلِىُّ يُؤْثِرُ الْاٰخِرَةَ وَمَبْدَؤُهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ.

৬. আপনি বলুন, হে ইহুদিগণ! তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু; অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী ব্যতীত, তবে তোমরা মৃত্যু কামান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও মৃত্যু কামনার সাথে উভয় শর্ত সম্পর্কিত। এভাবে যে, প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় শর্তের জন্য قَيْد হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু, আর আল্লাহর বন্ধুগণ আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান করে, যার সূচনা হলো মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তা কামনা কর।

٧. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِىِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِكِذْبِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৭. কিন্তু তারা কখনো তার কামনা করবে না, তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে তাদের মিথ্যাশ্রয়ীতার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যে অবাধ্যচারিতা সাব্যস্ত হয়, তার কারণে। আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত কাফেরদের সম্পর্কে।

٨. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

৮. আপনি বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, নিশ্চয় তা এখানে ف হরফটি অতিরিক্ত তোমাদের সাথে সাক্ষাৎকারী। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে গোপন ও প্রকাশ্য। তখন তোমরা যা করেছ তা তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদেরকে তার প্রতিফল

তাহকীক ও তারকীব

কিভাবে مَثَلُ -কে بِئْسَ বিশেষণে বিশেষিত করা হলো ? : بِئْسَ বিশেষণটা বাহ্যত مَثَلُ -এর বিশেষণ হলেও তা قَوْم বা জাতির বিশেষণ। যেন বলা হয়েছে بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمًا مَثَلُهُمْ هٰكَذَا অর্থ নিকৃষ্ট 'কাউম' হলো সে 'কাউম' যাদের উদাহরণ এ রকম। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَحْمِلُ : يَحْمِلُ শব্দটি حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অথবা حِمَارٌ -এর صِفَتْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر কারণ, এ حِمَار কোনো নির্দিষ্ট 'হেমার' না হওয়াতে نَكِرَة -এর حُكْم তার উপর অর্পিত হতে পারে।

-[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

حُمِّلُوا التَّوْرٰة -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : حُمِّلُوْا শব্দটি حُمِّلُوْا অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে। আর حُمِلُوْا অর্থাৎ تَخْفِيْف করে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ : فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ -এর মধ্যে فَاء বর্ণের প্রবেশ শুদ্ধ হয়েছে এ কারণে যে, ان -এর اِسْم - مُتَضَمِّنْ مَعْنَى الشَّرْطِ হয়েছে। যেন বলা হয়েছে اِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ কেউ কেউ এ فَاء -কে অতিরিক্তও বলেছেন। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ" : জমহুর এ শব্দটিকে فَتَمَنَّوُا অর্থাৎ وَاوْ বর্ণে ضَمَّة দিয়ে পড়েছেন। ইবনে সুমাইকা তাকে فَتْح দিয়ে تَخْفِيْف করে فَتَمَنَّوُا পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বে ইহুদিদের হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের প্রতি ঈমান না আনার কারণ এবং তাদের দারি ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর তাদের দাবি ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে সে মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাতের সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি। তাওরাতের বিধি-বিধান ও শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করেনি, মেনে চলেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে গাধার সাথে তুলনা করেছেন যার পিঠে অনেক বই রক্ষিত আছে কিন্তু সে গাধা সেসব বইয়ের জ্ঞান হতে কিঞ্চিৎও ফায়দা লাভ করতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَثَلُ الَّذِيْنَ ... الْحِمَارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যেসব লোককে তাওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত সে গর্দভের ন্যায় যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ যেসব লোকদের উপর তাওরাত প্রচারের দায়িত্ব এবং তাওরাতের বিধি-বিধান ও শিক্ষা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা না দায়িত্ব পালন করল, আর না তাওরাতের বিধি-বিধান মেনে চলল, বিশেষত তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে এবং আগমনের পর তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা মানল না; বরং এ নবীর আগমনের পর সকলের আগে যারা তাওরাতের ধারক-বাহক হয়েও বিরুদ্ধাচরণ করল এবং তাঁর সাথে সর্ব প্রকার শত্রুতা আরম্ভ করল, তাদের উদাহরণ সে গর্দভের ন্যায় যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা না থাকার কারণে সে ঐসব কিতাব হতে কোনো রকমের ফায়দা হাসিল করতে পারে না; বরং এসব লোকেরা গর্দভের চেয়ে অধম, কারণ এদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জেনে-বুঝে এরা জ্ঞানার্জন হতে বিরত থাকছে। -[সাফওয়া, কুরতুবী] অতএব এরা আরো অধম ও নিকৃষ্ট। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "এটা হতেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সেসব লোকেরা যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে। এ ধরনের জালিম লোককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না।"

আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনবাণী সম্বলিত তাওরাতের আয়াতসমূহ অমান্য করেছে- হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এখানে আয়াত অর্থ পবিত্র কুরআনের আয়াত যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করা। -[রূহুল কোরআন]

অন্যান্য প্রাণীদের বাদ দিয়ে গর্দভকে নির্দিষ্ট করার হিকমত : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এটার পশ্চাতে কয়েকটি হিকমত রয়েছে-

১. এ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে ইহুদি জাতির অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এটা গর্দভকে নির্দিষ্টকরণ দ্বারা অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২. গাধা একটা নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত প্রাণী। এখানে উদাহরণের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি জাতিকে তা দ্বারা লাঞ্ছিত করা। সুতরাং গাধার উদাহরণ পেশ করলেই তা যথোপযুক্ত হয়। অন্য আরেক কারণ হলো, গাধার পিঠে বোঝা বহন করা সহজসাধ্য। কারণ গাধা শান্ত ও বাধ্য প্রাণী, ছোট বড় সকলেই সহজে গাধাকে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণেও অন্যান্য প্রাণী বাদ দিয়ে গাধার উদাহরণ পেশ করা হতে পারে।

৩. আরবি ভাষার ছন্দ-মিলের জন্যও হতে পারে। কারণ أَسْفَار আর حِمَارٌ -এর মধ্যে যে ছন্দ-মিল রয়েছে তা بِغَالٌ ও خَيْلٌ ইত্যাদি অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। সুতরাং এখানে এ ছন্দ-মিল ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে حِمَارٌ ব্যবহার করাই উত্তম। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ : كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ -এর অর্থ সাধারণত তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করেছে। অথবা اٰيٰتِ اللّٰهِ দ্বারা তাওরাতে বর্ণিত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোকে ইহুদিদের অবমাননা করার কথা বলা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলির বর্ণনাও বিদ্যমান ছিল।

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে তাফসীরে সাবী ও আরো অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইহুদিগণের জোর দাবি ছিল যে, তারাই আল্লাহর পুত্র জাতি ও আল্লাহর প্রিয়তম গোষ্ঠী। আর পরকালে এ জন্যই তারা ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় বেহেশ্তে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরকালে শাস্তি প্রদান করবেন না, কেবল শান্তির বাগানসমূহ তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। তাদের এ উক্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন- وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى الخ ـ نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ -তাদের এহেন অবান্তর ধারণাসমূহকে বাতিল ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহকে নাজিল করেন, আর মুহাম্মদ ﷺ -এর ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ..... صٰدِقِيْنَ : নির্লজ্জ ইহুদি জাতি কুফর ও শিরক আর চরিত্রহীনতা ও মূর্খতার কারণে, তারা আল্লাহর একমাত্র প্রিয়তম বান্দা হওয়ার দাবি করার প্রতিউত্তরে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলেন- হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ইহুদিগণকে বলে দিন যে, তোমাদের ধারণা মতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে, কেবলমাত্র তোমরাই আল্লাহর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কেউ আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী হবে না, তাহলে তোমরা এ দুঃখের মধ্যে কেন বসবাস করছ? এ কষ্টময় সংসারের ঝামেলায় কেন মরছ? বরং মৃত্যুর সদর পথে সোজাসুজি স্বর্গে চলে যাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করো, যাতে অতিসত্বর পৃথিবীর ঝামেলা হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। স্বর্গ সুখ যার ভাগ্যে সুনিশ্চিত সে দুঃখের সাগরে কি করে পড়ে থাকতে পারে। স্বর্গে প্রবেশের সদর দ্বার মৃত্যুর মধ্যেই তোমাদের দাবির সত্যতা প্রকাশ পাবে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র যথা অলী-আবদাল, পয়গাম্বরগণ প্রভুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ চিত্তে দ্রুত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় মৃত্যু কামনায় কুণ্ঠাবোধ করে না। মৃত্যুর পেয়ালা মধুর সুরার চেয়েও তাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا বলে সম্বোধন করার হিকমত : এখানে 'হে ইহুদিরা' বলা হয়নি- বলা হয়েছে 'হে লোকেরা যারা ইহুদি হয়ে গেছে' কিংবা যারা ইহুদিবাদ গ্রহণ করেছ। এরূপ বলার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং তা অবশ্যই অনুধাবনীয়। এরূপ বলার কারণ হচ্ছে- হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন মূলত তা দীন ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়। এ নবী-রাসূলগণের মধ্যে কেউই ইহুদি ছিলেন না। ইহুদিবাদ বলতে তাঁদের সময়ে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামের একটা ধর্ম বহু পরবর্তী কালের ফসল, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশের সম্পর্ক দেখে এ ধর্মের নাম ইয়াহুদ বা ইহুদি রাখা হয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পর রাষ্ট্র যখন দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন এ বংশের লোকেরা ইহুদিয়া নামক রাষ্ট্রের মালিক ও অধিপতি হয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলের অপর গোত্রসমূহ নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করে নিয়েছিল। সে রাষ্ট্রটি সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়েছিল। উত্তরকালে আসিরিয়ারা শুধু সামেরিয়াকে ধ্বংস করেনি; বরং এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলেছিল। অতঃপর কেবল মাত্র ইয়াহুদ ও এর সঙ্গে বিন ইয়ামীন-এর বংশই অবশিষ্ট থেকে গেল। এর উপর ইয়াহুদ বংশের অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকার কারণে তার জন্য শেষ কালে ইহুদি শব্দটি ব্যবহৃত হতে লাগল। এ বংশের পাদ্রী-পুরোহিত, রাব্বী ও আহবাররা নিজেদের চিন্তা-মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক-প্রবণতা অনুযায়ী আকিদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও ধর্মীয় নিয়ম প্রণালীর যে খোলস শত শত বছরকাল ধরে তৈরি করেছিল তার নামই ইহুদিয়াত বা ইহুদিধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হতে এটা গঠন শুরু হয় এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এটা গঠন হতে থাকে। মূলত আল্লাহর নবী-রাসূলগণের নিয়ে আসা হেদায়েতের খুব অল্প উপকরণই এতে শামিল হয়েছে। তার মূল প্রকৃতি অনেকখানি বিকৃত হয়ে গেছে। এ কারণে কুরআন মাজীদে বহু কয়টি স্থানে তাদেরকে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا 'যারা ইহুদি হয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত সব লোকই ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অ-ইসরাঈলী ইহুদি ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তারাও এতে গণ্য হতে লাগল। কুরআন মাজীদে যেখানে বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে 'হে বনী ইসরাঈল' বলা হয়েছে, আর যেখানে ইহুদি ধর্মের অনুসারী লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ : আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমাদের যদি এ আত্ম-অহঙ্কার থেকে থাকে যে, অন্যান্য সব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর 'আহলাদের দুলাল'.... ।"

এখানে ইহুদি জাতির আত্ম-অহঙ্কার ও অহমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত ও বাছাইকৃত সম্প্রদায় বলে দাবি করে তাঁর বন্ধুত্ব ও বিশেষ অনুগ্রহের হকদার ভাবত। তারা কখনোও বলত نَحْنُ اَبْنَآءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّآئُهٗ "আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" [আল-মায়িদা-১৮] আবার কখনো বলত لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا "ইহুদি ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [আল-বাক্বারা-১১১] আবার কখনো বলত لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ "দিন কতেক ব্যতীত আমাদের অগ্নি স্পর্শ করবে না।" -[আলে-ইমরান ২৪]

ইহুদিদের নিজেদের কিতাবসমূহেও এ ধরনের অনেক দাবির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তারা যে নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা লোক شَعْبُ اللّٰهِ الْمُخْتَارُ [Chosen people] মনে করে, অন্তত এতটুকু কথা তো সারা দুনিয়ার লোকদেরই জানা আছে। আল্লাহর সাথে তাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক অন্য কোনো জনগোষ্ঠির সাথে নেই। তাদের এ ধরনের আত্মম্ভরিতার কথাও কারো অজানা নয়। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ .... عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এরা কক্ষণই মৃত্যু কামনা করবে না, তারা যেসব কার্য-কলাপ করেছে সে কারণে। আর আল্লাহ এ জালিম লোকদেরকে খুব ভালো করেই জানেন।" অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর কিতাবের যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করেছে, যে বিধান ও আয়াত তাদের মনঃপূত নয় তা গোপন করেছে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করেছে, এসব কারণে তারা কখণও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ মৃত্যুর পরে এসব অপকর্মের কারণে কি কি শাস্তি ভোগ করতে হবে তা তাদের ভালো করেই জানা আছে। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, তাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না, কারণ তারা জানত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। সুতরাং তারা জানত যে, যদি তারা মৃত্যু কামনা করে তাহলে সাথে সাথেই তাদের মৃত্যু ঘটবে। এটা রাসূল ﷺ-এর একটি মু'জিযা। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, মৃত্যু কামনা করলে কোনো ইহুদি না মরে দুনিয়ার বুকে বাকি থাকত না। -[রূহুল মা'আনী]

মৃত্যু কামনার হুকুম : হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যখনই যার হায়াত শেষ হয়ে যাবে তখনই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কোনো কঠিন বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করে তাহলে যদি তখনই তার মৃত্যু নির্ধারিত না থাকে, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির বহির্ভূত কাজ হবে। এতে আল্লাহ নারাজ হবেন। যেমন হুযূর ﷺ বলেন- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَسْتَعْتِبَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ যদি সে নেক বান্দা হয়, তবে নেক বৃদ্ধি করতে পারছে। আর যদি গুনাগার হয়, তবে সে মৃত্যুর পর হয়তো ক্ষতির সম্মুখীন হবে। -[বুখারী]

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ ﷺ لَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার কারণে কিছুতেই মৃত্যুকামানা না করে। যদি সে একান্তই বলতে চায়, তাহলে যেন বলে- হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জীবন ধারণ সুখকর হয়, কল্যাণকর হয় ততদিন আপনি আমায় হায়াত দান করুন। আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আপনি আমার জীবন নাশ করুন। -[বুখারী ও মুসলিম]

মৃত্যু হতে পলায়ন করার অর্থ : মৃত্যু হতে পলায়ন করার অর্থ হলো মৃত্যুর নির্দেশের সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করা। অথবা যে সকল কার্য করতে গেলে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে, সে সকল কার্যে নিয়োগ হতে অস্বীকার করা। যেমন- جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর মৃত্যুকে ভয় করাও فِرَارٌ مِنَ الْمَوْتِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ .... فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ (الْاٰيَةَ) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "[হে মুহাম্মদ তুমি] তাদেরকে বলো, যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাচ্ছ তা তোমাদের নিকট আসবেই। অতঃপর তোমরা সে মহান সত্তার নিকট উপস্থিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তা সবই যা তোমরা করছিলে।" অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত বিকৃতির ফলে যে মৃত্যু হতে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ সে মৃত্যু অবশ্যই আসবে, পালাতে পারবে না। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কর্মই দেখানো হবে। অর্থাৎ তোমরা তাওরাতের যেসব আয়াত ও বিধান প্রচার-প্রকাশ করেছ তা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত যে আয়াতগুলো এবং অন্তরের যে বিশ্বাস তোমরা গোপন করেছ সবই তোমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে, অতঃপর সেসব অপকর্মের সাজা দেওয়া হবে। -[কাবীর]

অনুবাদ :

٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ بِمَعْنٰى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا فَامْضَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَيِ الصَّلٰوةِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ط اَيْ اُتْرُكُوْا عَقْدَهٗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ .

৯. হে ঈমানদারগণ! যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় জুমার দিনে এখানে مِنْ অব্যয়টি فِيْ অর্থে ব্যবহৃত। তখন তোমরা ধাবিত হও গমন করো আল্লাহর স্মরণের প্রতি অর্থাৎ সালাতের প্রতি। এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করো তা সংঘটন ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত হও যে, তা উত্তম, তবে তোমরা তা করো।

١٠. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ اَمْرُ اِبَاحَةٍ وَابْتَغُوْا اَيْ اُطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ عِيْرٌ وَضُرِبَ لِقُدُوْمِهَا الطَّبْلُ عَلَى الْعَادَةِ فَخَرَجَ لَهَا النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ اِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَ .

১০. অনন্তর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এটা মুবাহ সাব্যস্তকারী আদেশ। আর অন্বেষণ করো অর্থাৎ জীবিকার সন্ধান করো আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্য হতে। আর আল্লাহকে স্মরণ করো স্মরণ করো অধিক পরিমাণে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। কৃতকার্য হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, এ সময় বণিকদের একটি কাফেলা মদীনায় উপস্থিত হলো। আর প্রথানুযায়ী বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা ঘোষণা করে তবলা বাজানো হলো। তখন বারোজন লোক ব্যতীত সমস্ত লোক মসজিদ হতে বের হয়ে গেল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

١١. وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا اَيِ التِّجَارَةَ لِاَنَّهَا مَطْلُوْبُهُمْ دُوْنَ اللَّهْوِ وَتَرَكُوْكَ فِي الْخُطْبَةِ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ . يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهٗ اَيْ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

১১. যখন তারা কোনো ব্যবসায়ী কাফেলা কিংবা কৌতুকপ্রদ বস্তু দেখে, তখন তারা তার প্রতি ছুটে যায় অর্থাৎ ব্যবসার প্রতি, যেহেতু তা-ই তাদের লক্ষ্য, কৌতুক নয়। আর আপনাকে ত্যাগ করে খুতবার মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায়। আপনি বলুন, আল্লাহর নিকট যা আছে ছওয়াবের মধ্য হতে তা উত্তম যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের জন্য। কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দানকারী। বলা হয়ে থাকে যে, মানুষ তার পরিবার-পরিজনকে জীবিকা দান করে অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا نُوْدِىَ .... يَوْمِ الْجُمُعَةِ : اِذَا হলো حَرْف شَرْط আর نُوْدِىَ হলো فِعْل مَجْهُوْل এবং مِنْ হলো فِىْ -এর অর্থে অর্থাৎ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ; এ রকম অপর আয়াতেও مِنْ - فِىْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ فِى الْاَرْضِ -

আবুল বাকারের মতে مِنْ শব্দ تَبْعِيْضِيَّة -ও হতে পারে। তাফসীরে কাশ্‌শাফে এই مِنْ -কে اِذَا -এর بَيَانْ এবং تَفْسِيْر বলা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। সহীহ্ মত হলো এটাকে فِىْ -এর অর্থ নেওয়া।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا : اُذْكُرُوْا হলো فِعْل اَمْر আর وَاوْ হলো তা فَاعِلْ আর اَللّٰهَ শব্দটি مَنْصُوْبٌ আর كَثِيْرًا এক উহ্য مَفْعُوْل مُطْلَقْ -এর صِفَتْ যার عِبَارَتْ تَقْدِيْرِىْ হবে ذِكْرًا كَثِيْرًا আর عَلَى التَّعْظِيْمِ تَاْدُبًا একে সূরা আহযাবে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ : জমহুর جِيْم এবং مِيْم -এ ضَمَّه দিয়ে مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ পড়েছেন। যুহরী, আ'মাশ جِيْم -এ ضَمَّه আর مِيْم -এ سَاكِنْ যুক্ত করে جُمْعَة পড়েছেন, এটা তামীম গোত্রের لغة অনুযায়ী। আবুল আলীয়া, নাখয়ী جِيْم -এ ضَمَّه দিয়ে مِيْم -এ فَتَح দিয়ে جُمُعَه পড়েছেন। মোদ্দাকথা হলো, جُمُعَة -তে সর্বমোট তিন لُغَةْ রয়েছে।

قَوْلُهُ "وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا" : قَائِمًا শব্দটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب আর সাহেবে حَالْ হলেন নবী করীম ﷺ যার দিকে وَتَرَكُوْكَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত ইবারত হলো- تَرَكُوْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ حَالَ كَوْنِكَ قَائِمًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহ এবং তার পরবর্তী আয়াতে জুমার নামাজের বিধি-বিধান, আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য ঘোষণা দেওয়া হবে তখন আল্লাহর জিকির -এর দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান।" সালাতের ঘোষণা দ্বারা আজান বুঝানো হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য প্রত্যেকটি মসজিদে দেওয়া হয়। তবে এখানে দ্বিতীয় আযান যা খতীব মিম্বরের উপর বসার পর তাঁর সামনে দেওয়া হয় তা বুঝানো হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ -এর যুগে এ দ্বিতীয় আযান ছাড়া অন্য কোনো আযান জুমার নামাজের পূর্বে দেওয়া হতো না। রাসূল ﷺ মিম্বরের উপর উপবেশন করলেই হযরত বেলাল (রা.) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর যুগেও এ নিয়ম চালু ছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি মানুষকে জমায়েত করার উদ্দেশ্যে 'যাওরা' নামক বাজারের এক বাড়িতে আজান দিতে নির্দেশ দেন, আবার ইমাম মিম্বরের উপর বসার পর দ্বিতীয়বার তার সামনে আজান দিতে বলা হয়। -[রূহুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর, কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ : আয়াতে বর্ণিত نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ দ্বারা দ্বিতীয় আজান অর্থাৎ ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানের সময় মিম্বারের উপর বসা অবস্থায় যে আজান দেওয়া হয়, তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কেবল মাত্র খুতবা -এর আজানই দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাত্র একজন মুয়াজ্জিন ছিল, যখন তিনি মিম্বারের উপর উপবেশন করতেন তখন মসজিদের দরজায় মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে দিত। অতঃপর যখন মিম্বার হতে নেমে যেতেন, তখন নামাজ আরম্ভ করতেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.)-এর যুগ এমনিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে যখন মানুষ অধিকতর ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হলো, আর যোগাযোগের সমস্যা দেখা দিল, এমতাবস্থায় হযরত ওসমান (রা.) زوراء নামক স্থানে প্রথমবারের মতো আর একটি আজান দেওয়ার প্রথা চালু করলেন। সে আজান শুনে সকলেই নামাজের প্রতি দৌড়ে আসল। তবে কেউ কোনো কথা সমালোচনা করেননি। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) মিম্বারে দণ্ডায়মান হওয়ার পর তাঁর সম্মুখে পুনরায় আজান দেওয়া হলো। কিন্তু কেউই এতে দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং

রাসূলে কারীম ﷺ-এর বর্ণিত হাদীস শরীফের عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ-এর উপর আমল করলেন। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, আয়াতে نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ দ্বারা খুতবা-এর আজান উদ্দেশ্য। আর হানাফীগণের মতে প্রথম আজান উদ্দেশ্য। -[ইবনে আবী শায়বা কাবীর- হাশিয়ায়ে জালালাইন]

يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলে জুমার দিনের নামকরণ করার কারণ : জুমার দিনকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে- উক্ত দিনটি মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার দিন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একত্রিত হওয়ার জন্য উক্ত দিনটি নির্ধারিত করেছিলেন। সুতরাং প্রতি সপ্তাহে এ দিনটি একত্রিত বা মিলনের দিন। পূর্ববর্তী উম্মতগণের এ ভাগ্য হয় না, কেননা ইহুদিগণ শনিবারকে তাদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন নির্ধারিত করেছিল, নাসারাগণ রবিবারকে ধার্য করেছিল। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আল্লাহ তা'আলা শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন নির্ধারিত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

অজ্ঞতার যুগে শুক্রবারকে (يَوْم عَرُوْبَة) বলা হতো। সর্বপ্রথম কা'ব ইবনে লুয়াই নামক এক ব্যক্তি এ দিনকে জুমা বলে নাম দিয়েছেন। আর কুরাইশগণও উক্ত দিনে একত্রিত হতো এবং কা'ব ইবন লুয়াই তাদেরকে সম্বোধন করে খুতবা পেশ করতেন এবং এটা রাসূল ﷺ-এর আগমনের ৫০০ পাঁচ শত বছর পূর্বেকার ঘটনা ছিল।

কা'ব ইবনে লুয়াই হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দাদাবর্গের লোক ছিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি জাহেলিয়াতের যুগেও মূর্তি পূজা হতে রক্ষা পেয়েছেন, একত্ববাদের তৌফিক অর্জন করেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর অবির্ভাবের সু-সংবাদ মানুষকে শ্রবণ করিয়েছেন। কুরাইশ বংশে তাঁর বিশেষত্ব এমন ছিল যে, যদিও তিনি রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের ৫৬০ পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন তথাপিও তার মৃত্যুর সময়কাল হতে তা ঐতিহাসিকগণ গণনা করতে থাকে। আরবে প্রথমত বায়তুল্লার প্রথম ভিত্তির সময় হতে ঐতিহাসিক সন গণনা করা হয়েছিল, পরে কা'ব বিন লুয়াই এর মৃত্যুকাল হতে ঐতিহাসিক সন গণনা করা শুরু হয়। অতঃপর যখন এর ঘটনাটি ঘটে গেল তখন সে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সন গণনা আরম্ভ হলো। মূল কথা হলো, ইসলামের পূর্বে কা'ব ইবনে লুয়াই -এর সময়কাল হতেই। আরবে জুমার দিনের গুরুত্ব ছিল। -[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়য়েত মতে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হিজরতের পূর্বেই মদীনার আনসারগণ জুমার فَرْضِيَّتْ নাজিল হওয়ার পূর্বে থেকেই সেদিনের এহতেমাম করে উক্ত দিনের ইবাদত করা ও সকলের একত্রিত হওয়ার দিন ধার্য করেছিল। যেমনটি আব্দুর রায্যাক মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -[মাযহারী]

আর ইবনে খুযাইমাহ হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এ দিনে একত্রিত হয়েছেন, তাই এ দিনকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়।

কারো মতে, মহান আল্লাহ ছয় দিনে এ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ জুমার দিনেই তার পূর্ণতা লাভ করেছে, তাই একে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়েছে।

জুমার নামাজ কখন ফরজ হয়? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবূ মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা হতে জানা যায় জুমা ফরজ হওয়ার হুকুম হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা শরীফে থাকা কালেই নবী করীম ﷺ-এর প্রতি নাজিল হয়ে ছিল। কিন্তু তখন তিনি এ হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন না। কেননা মক্কা শরীফে তখন সামষ্টিক পর্যায়ে কোনো ইবাদত করা সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে যেসব লোক তাঁর পূর্বে মদীনায় পৌছেছিলেন তাদেরকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, মদীনায় যেন তারা জুমার সালাত কায়েম করে। এ আদেশ অনুযায়ী প্রথম হিজরতকারীদের নেতা হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম জুমার সালাত আদায় করেন। -[তাবারানী, দারে কুতনী]

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (র.) ও ইবনে সীরীন (রা.) বর্ণনা করেছেন, মদীনার আনসারগণ নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ পৌছারও পূর্বে নিজস্বভাবে সপ্তাহে একটি দিন সামষ্টিকভাবে ইবাদত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে তারা ইহুদিদের শনিবার ও খ্রিস্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুমার দিন বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং বনূ বায়াজা নামক অঞ্চলে হযরত আসয়াদ ইবনে জুরারাহ প্রথম জুমার সালাত কায়েম করেন। এ সালাতে ৪০ ব্যক্তি শরিক হয়েছিলেন।

-[মুসনাদে আহমদ আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবদুর রায্যাক, বায়হাকী]

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরতের পর মদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়টি কাজ করেছেন, জুমার সালাত আদায় করা তার অন্যতম। তিনি মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে সোমবার দিন মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা' নামক স্থানে উপস্থিত হন। চার দিন তিনি এখানে অবস্থান করেন। পঞ্চম দিন ছিল শুক্রবার। এই দিন সেখান হতে মদীনায় রওয়ানা হয়ে যান। পথে বনূ সালেম ইবনে আউফ গোত্রের বসতিতে উপনীত হলে জুমার সালাতের সময় উপস্থিত হলো। আর এখানে, তিনি প্রথম জুমার সালাত আদায় ক...
—[ইবনে হিশাম]

যিকরুল্লাহ বলতে কোন যিকির উদ্দেশ্য : অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে "যিকরুল্লাহ" মানে জুমার 'খোতবা'। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এখানে যিকরুল্লাহ বলে নামাজ বুঝানো হয়েছে। —[কাবীর]
আমাদের মতে খোতবা এবং নামাজ উভয়ই বুঝানো হয়েছে। কারণ, খুতবাও জুমার নামাজের অংশ। হযরত ওমর (রা.) জুমার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, وَاِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ "জুমার নামাজ সংক্ষিপ্ত [দুই রাকাতের] করা হয়েছে খুতবার কারণে।" সুতরাং খুতবার জন্যও দৌড়ে আসতে হবে। —[আহকামুল কোরআন লিল্ জাস্সাস]
سَعْى শব্দের অর্থ দৌড়ে আসা হলেও এখানে তার অর্থ হলো, গুরুত্ব সহকারে আসা। কারণ নামাজের জন্য দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। —[মা'আরিফ]
قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ : ذَرُوا الْبَيْعَ অর্থ– বিক্রয় বন্ধ করে দাও। উক্ত আয়াতে কেবল ذَرُوا الْبَيْعَ বলে بَيْع শব্দের উপর বর্ণনা ক্ষান্ত করা হয়েছে। شِرَاء শব্দকে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হলো بَيْع শব্দটি উল্টো অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ بَيْع وَشِرَاء উভয় অর্থই এ শব্দে নিহিত রয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় উভয় কার্য বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে। কারণ বিক্রয় বন্ধ করলে ক্রয় করাও বন্ধ হবে। অর্থাৎ বিক্রয় বন্ধ হওয়ার ফলে ক্রয়ের পন্থা বন্ধ হয়ে যাবে।
প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় হারাম, এটার ব্যাখ্যা কি? উক্ত আয়াতের উপর আমল করা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপর ফরজ। সুতরাং আয়াতের উপর এভাবে আমল করতে হবে যে, যখন আজান দেওয়া হবে, তখনই দোকানসমূহ বন্ধ করে দিবে। তাহলে গ্রাহকগণ ক্রয় করতে আসা বন্ধ করবে কারণ খরিদ্দারগণের কোনো নির্দিষ্ট নেই কে কখন আসবে তাও নির্ধারিত নেই এ কারণে তাদেরকে এ পদ্ধতি ব্যতীত ফিরানো সম্ভব নয়। —[মা'আরিফ]
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– জুমার আজান দেওয়ার পর সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় ও যাবতীয় কাজকর্ম হারাম হবে। জমহুর ও হানাফী মাজহাব অবলম্বনকারী তাফসীরকারকগণের মতে, আজান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা আয়াতে নাহী (نَهْى) - عَقْد بَيْع -এর উপর শামিল নয়। আর بَيْع -এর জন্য তা لَازِمْ ও নয়, বরং نَهْى টি خَارِجْ عَنِ الْعَقْدِ -
মালেকীগণ বলেন– নিকাহ, হেবা, সদকা ইত্যাদি ব্যতীত সর্বপ্রকার عَقْد এই সময় ফসখ বা নিষিদ্ধ হবে। তাই যদি বস্তুটি عَقْد -এরপর অথবা সেই সময়ই হাতে বহাল থাকে, তবে তা বিক্রেতাকে فَسْخ بَيْع বা فَسْخ عَقْد -এর কারণে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর বস্তুটি যদি বহাল না থাকে, তবে তার মূল্য বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে।
আতা (র.) বলেন– জুমার দিন প্রথম আজান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় কাজকর্ম, খেলাধুলা, নিদ্রা যাওয়া, স্ত্রী সহবাস করা, লেখাপড়া সবই হারাম হবে। —[আব্দুর রায্যাক]
মাদারেক গ্রন্থে বলা হয়েছে– যে সকল কার্য দ্বারা আল্লাহর স্মরণকার্যে বাধা আসে, অথবা নেশায় লিপ্ত হয়ে যায়, সে সকল কার্য করা আয়াত দ্বারা হারাম বুঝানো হয়েছে। আর بَيْع -কে আয়াতে নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ এই যে, উক্ত আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করার কাজ আরবে অধিক প্রচলিত ছিল, তাই بَيْع -কে উল্লেখ ও খাছ করা হয়েছে। —[কাবীর]
জুমার জামাতের জন্য শর্তাবলি এবং তাতে ইমামগণের মতভেদ :
ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত : ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ মুক্তাদী হওয়া আবশ্যক। কারণ سَعْى -এর অর্থে جَمْعِيَّتْ -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর جَمْعِيَّتْ হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিনজন হওয়া শর্ত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমাম ব্যতীত দু'জন মুক্তাদী আবশ্যক। কারণ جَمْع صَحِيْح মোট তিন-এর মধ্যে নিহিত। সুতরাং ইমামসহ তিনজন হলে চলবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্ধ ব্যক্তির জুমা আদায় করতে হয় না। জুমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা

দান করা অন্যতম শর্ত। কেননা নবী করীম ﷺ কখনো বিনা খুতবায় জুমা আদায় করেননি এবং তা قَبْلَ الصَّلٰوةِ হওয়া আবশ্যক। দু'টি খুতবা হতে হবে। খুতবা দানের উদ্দেশ্যে ইমাম মিম্বারের উপর উপবেশন করলে যাবতীয় কথাবার্তা ও এমনকি নামাজও বন্ধ করতে হবে। لِقَوْلِهٖ (ع) إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ আর জুমা জোহরের সময় পড়া আবশ্যক। জোহরের পরে বা পূর্বে পড়া জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে : ইমামসহ ৪০ জন লোক এমন হওয়া আবশ্যক যাদের উপর জুমা ফরজ। বিদেশ সফরকালে, কোনো স্থানে চারদিনের অথবা তার কম সময় অবস্থানের নিয়ত হলে, অথবা এমন যুদ্ধ বা রুগ্ণ হয় যানবাহনে বসেও জুমার জন্য যাওয়ার সক্ষমতা না থাকে, অন্ধ ব্যক্তিকে জুমার নামাজের জন্য নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তি না থাকলে, জান-মাল অথবা সম্মানের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা হয় তবে জুমা ফরজ নয়।

মালেকী মাযহাব মতে : زوال বা মধ্যাহ্ন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। দ্বিতীয় আজান হতে কেনাবেচা হারাম ও জুমার প্রতি সায়ী ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনাবেচা হলে তা বাতিল হবে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় তারা স্থায়ী হলে জুমা ফরজ হবে। অস্থায়ী বশতি যতই অধিক হোক তাদের উপর জুমা ফরজ নয়। আর জনসবসিতর অভ্যন্তরীণ অথবা তৎসংলগ্ন স্থানের মসজিদে জুমা জায়েজ হবে।

অধিকাংশ মালেকী মাজহাবীগণের মতে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়; বরং পাঞ্জেগানা জামাতের ব্যবস্থা না থাকলেও নির্মিত মসজিদে জুমা জায়েজ হবে। আর ইমাম ছাড়া ১২ জন বালেগ এমন হওয়া শর্ত যাদের উপর জুমা ফরজ।

হাম্বলী মাযহাব মতে : সূর্যোদয়ের খানিকটা পর হতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমা পড়া জায়েজ। তবে قَبْلَ الزَّوَالِ জায়েজ ও بَعْدَ الزَّوَالِ ওয়াজিব বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আজানের পর সংঘটিত বেচাকেনা সংঘটিত হয়নি বলে বিবেচিত হবে। বসতিগুলো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত হলেও স্থায়ী বসতি এলাকায় জুমা জায়েজ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শর্তাবলি মালেকী মাহাবের প্রায় অনুরূপ।

হযরত এরাক ইবনে মালিক (র.) জুমার নামাজ শেষ করার পর যখন মসজিদ হতে বের হয়ে আসতেন, তখন যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকর্মের বরকতের জন্য মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এ দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ . وَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ .
(رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ كَثِيْرٍ)

قَوْلُهٗ تَعَالٰى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার উদ্দেশ্যে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে গুরুত্ব সহকারে যাওয়া, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করা, যাবতীয় কাজ-কারবার ছেড়ে নামাজের দিকে যাওয়া তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর। তা বুঝতে যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাকো।

আলোচ্য আয়াতে জুমার নামাজের ফায়দা ও কল্যাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র ফায়দা বা লাভ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

১. জুমার নামাজ জামাতে পড়তে হয়, আর জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় সৃষ্টি করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং পারস্পরিক কল্যাণের বিনিময় করার উদ্দেশ্যে। এখানে মুসলমানরা একে অপরের সাথে পাশাপাশি দাঁড়ায়, রাষ্ট্রপ্রধান ফকির-মিসকিন যে কোনো নাগরিকের পাশে, ধনী দরিদ্রের পাশে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের পাশে দাঁড়ান। সকলেই একই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করে। সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের দাবি কেবল শ্লোগানেই থেকে যায়, যদি না তা মানুষের ব্যক্তি-জীবনে এবং চিন্তা-ভাবনায় বাস্তবায়িত হয়। ইসলাম নামাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করে থাকে।
২. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো নামাজের পূর্বে খুতবা দান। এ খুতবায় খতীব মুসল্লিদেরকে তাকওয়া ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানান। সামাজিক অনাচার-ব্যভিচার রোধ করার প্রতি উৎসাহ দান করেন। অনৈসলামিক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার উপদেশ দান করেন। শ্রোতাদের ব্যক্তি-জীবনে এর বিরাট প্রভাব থাকে, যা সৎ ব্যক্তি ও সৎ সমাজ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে।
৩. একত্রিত হয়ে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করলে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হলে আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হয়। এ কারণে জুমার খুতবায় দোয়া করা সুন্নত। ইমাম দোয়া করবে আর মুসল্লিগণ আমীন বলবে।

–[রূহুল কোরআন]

(الْآيَة) قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتِ ..... وَابْتَغُوا مِنْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অতঃপর সালাত যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো। আর আল্লাহকে খুব বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

"সালাত সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো" এটার অর্থ এ নয় যে, জুমার সালাত আদায় করার পরই দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকার সন্ধানে চেষ্টা-সাধনায় লেগে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। এটার অর্থ শুধু এতুটুকু যে, এটা করার অনুমিত আছে, নিষেধ নয়। জুমার আজান শুনামাত্র সব কাজ-কারবার পরিহার করার জন্য পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, সালাত সমাপ্ত হওয়ার পর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া ও নিজ নিজ কারবারে লেগে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্য রয়েছে। এ নির্দেশটি ঠিক এ নির্দেশের অনুরূপ, যেমন কুরআন মাজীদে ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করার পর বলা হয়েছে, فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেলবে তখন শিকার করো।' এর অর্থ এই নয় যে, ইহরাম খোলার পর অবশ্যই শিকার করতে হবে; বরং এর তাৎপর্য হলো, ইহরাম খুলে ফেলার পর শিকার করায় কোনো নিষেধ নেই। ইচ্ছা করলে শিকার করতে পার।

وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো" অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল রিজিক সন্ধান করতে থাকো। হালাল রুজিকে আল্লাহর অনুগ্রহ এ জন্য বলা হয়েছে যে, রিজিক মূলত আল্লাহরই দান, তাঁরই কল্যাণ। তদুপরি হালাল রিজিক আল্লাহর দয়া, রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া অর্জন করা কি সম্ভব? -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا : এর অর্থ "আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো" বিভিন্নভাবে রুজি-রোজগার করার অনুমতি দানের পর আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য এই যে, রুজি-রোজগারের যত উপায়-উপকরণ রয়েছে, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজ, লেনদেন ইত্যাদিতে আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তাঁর বিধান অনুযায়ী করবে। অতএব, কারো উপর জুলুম করবে না, ধোঁকাবাজি করবে না, মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিবে না, কারো কোনো ক্ষতি করবে না। এটা হলো অন্তরের ও কর্মের জিকির। এটা ছাড়া মুখেও আল্লাহ তা'আলার জিকির করতে থাকবে। এভাবে আল্লাহ জিকির করতে থাকলে "সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে" অর্থাৎ দুনিয়াতে রুজি-রোজগারে বরকত হবে। আর আখেরাতে তার বিনিময়ে ছওয়াব ও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

সাঈদ ইবনে জোবাইর (রা.) বলেছেন, আল্লাহর জিকির হলো তাঁর আনুগত্য। সুতরাং যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করল সে তাঁর জিকির করল। আর যে তাঁর আনুগত্য করল না সে বেশি বেশি তাসবীহ পড়লেও আল্লাহর জিকিরকারী হবে না।
-[সাফওয়া, হাশিয়ায়ে বায়হাকী]

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো হতে গৃহীত বিধানসমূহ :

১. কোন আজানের পর سَعْى বা গুরুত্ব সহকারে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব হবে? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে-

ক. এক দল আলিমের মতে, প্রথম আজানের সাথে সাথে 'সায়ী' ওয়াজিব। সুতরাং إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ এ نِدَاء -এর অর্থ প্রথম আযান, এটাই হানাফীদের অভিমত।

খ. অন্য দলের মতে, نِدَاء মানে ইমাম মিম্বরে বসার পর যে আজান দেওয়া হয় তাই উদ্দেশ্য। সুতরাং দ্বিতীয় আজানের পরই নামাজের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হবে। এটাই জমহুর ওলামার মাযহাব। আর হানাফী ইমামগণের দ্বিতীয় মত এ মতকেই গ্রহণীয় ও অগ্রাধিকার যোগ্য মনে করা হয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

২. আজানের সময় এবং আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য চুক্তি সহী-শুদ্ধ কিনা?

وَذَرُوا الْبَيْعَ বাক্য হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আজানের সময় এবং আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। কোনো রকমের চুক্তি সম্পাদন বা কোনো মুয়ামেলা নতুনভাবে গ্রহণ করা হারাম। হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ ক্রয়-বিক্রয় করলে তা জায়েজ হবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ-

ক. কোনো কোনো আলিমের মতে, এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না, কারণ এ ক্ষেত্রে নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে وَذَرُوا الْبَيْعَ দ্বারা।

খ. অধিকাংশ আলিমদের মতে, এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ ও শুদ্ধ, ফাসেদ নয়। এ ক্রয়-বিক্রয় জবরদখলকৃত জমিনে নামাজ পড়ার ন্যায় মাকরুহ হওয়া সত্ত্বেও সহীহ হবে।

৩. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত কি?

ক. কুরআনের আয়াত فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ হতে বুঝা যাচ্ছে যে, জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। কারণ ذِكْرِ اللّٰهِ -এর অর্থ শুধুমাত্র খুতবা বলা হোক অথবা খুতবা আর নামাজ উভয় বলা হোক খুতবা তাতে থাকছেই। সুতরাং খুতবা জুমার জন্য শর্ত। অন্য আর এক কারণ হলো, জুমার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে খুতবার উদ্দেশ্যে। অতএব খুতবা শর্ত হবে। এটা জমহুর -এর মাযহাব।

খ. হানাফী ইমাগণের মতে, জুমা সহীহ হওয়ার জন্য দেশীয় প্রথানুযায়ী যাকে খুতবা বলা হয় তেমন কোনো খুতবা শর্ত নয়। কারণ কুরআনে কেবল জিকির -এর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যাকে জিকির বলা চলে ততটুকু হলেই খুতবা আদায় হয়ে যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল হতে যে দীর্ঘ খুতবার প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে ওয়াজিব বা সুন্নত বলা যায়–এমন শর্ত বলা যাবে না, যা না হলে নামাজই শুদ্ধ হবে না।

৪. জুমার জামাতে কতজন লোক হলে জুমা শুদ্ধ হবে?

ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, জুমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাত শর্ত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً . مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

জুমা জামাত সহকারে সব মুসলমানের উপর ওয়াজিব হক। তবে চার শ্রেণির মানুষের উপর ওয়াজিব নয়– ক্রীতদাস, নারী, শিশু অথবা রুগ্‌ণব্যক্তি।

অন্য আর এক কারণ হলো, জুমা শব্দটি হতে বুঝা যাচ্ছে, এ নামাজে জামাত হতে হবে। তবে জামাত কতজনের হতে হবে তা না কুরআনে স্পষ্ট আছে না হাদীসে। এ কারণেই এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে।

ক. হানাফী ইমামগণ বলেছেন, ইমামসহ চারজন হতে হবে। হানাফীদের মধ্যে কেউ কেউ ইমামসহ তিন জনের কথা বলেছেন।

খ. শাফেয়ী এবং কতিপয় হানাফী ইমামগণ বলেছেন, কমপক্ষে ৪০ জন লোকের এক জামাত হতে হবে।

গ. মালেকী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে এমন এক জামায়াতের প্রয়োজন হবে যাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে; কিন্তু তিনজন চারজন লোক দ্বারা জামাত হতে পারবে না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন (র.) এ শেষোক্ত মাযহাবকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, বিভিন্ন দলিলের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে।

–[রাওয়ায়েউল বায়ান, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম]

জুমা ও জোহরের নামাজের মধ্যে পার্থক্য : জুমা ও জোহর নামাজের মধ্যে পার্থক্য এই যে জোহরের নামাজ [ফরজ] চার রাকাত, আর জুমার নামাজ দু' রাকাত। কারণ হুযূর ﷺ ও এই সালাত দু' রাকাতই আদায় করতেন। তবে জুমার নামাজের পূর্বে খুতবা (ভাষণ) পেশ করা হয়, কিন্তু জোহরের নামাজে কোনো খুতবা পেশ করা হয় না। তবে খুতবার মধ্যে দু' রাকাত নামাজের ছওয়াব পাওয়া যায়, তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন–

صَلٰوةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ . (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ لِلْجَصَّاصِ)

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ : জমহুর فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ এবং হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ই فَامْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ পড়েছেন। এ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, ইবনে মাসউদের কেরাত মূলত কেরাত নয়। আসলে তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে –ব্যাখ্যা করে কুরআন পড়া বৈধ।

–[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তারা যখন ব্যবসায়ী কাফেলা ও খেল-তামাশা দেখল তখন সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল, তাদেরকে বলো, আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অতি উত্তম রিজিকদাতা।"

আলোচ্য আয়াতে– যেসব সাহাবী রাসূল ﷺ-কে খুতবাদানে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলে গিয়েছিলেন তাদেরকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। সাহাবীদের দ্বারা যে ভুলটা সংঘটিত হয়েছিল, তা কি ধরনের ছিল তা এ আয়াত হতে

বুঝতে পারা যায়। আল্লাহ না করুন, এটা যদি ঈমানে অভাব ও পরকালের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দানের ইচ্ছামূলক অপরাধ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ-আক্রোশ ও প্রতিবাদের ভঙ্গি ভিন্নতর হতো, কিন্তু সেখানে এ পর্যায়ের কোনো অপরাধ বা ত্রুটি স্থান লাভ করেনি। যা কিছু হয়েছিল তা প্রশিক্ষণের অভাব জনিত করণে সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই প্রথমে শিক্ষাসুলভ কোমল সহানুভূতির ভঙ্গিতে জুমার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরে উপদেশের স্বরেও বুঝানো হয়েছে যে, জুম... খুতবা শ্রবণ এবং জুমার সালাত আদায় করাতে আল্লাহর নিকট তোমরা যে ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে, তা এ দুনিয়ার ব্যব... ও খেল-তামাশার তুলনায় অনেকগুণ বেশি উত্তম।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমা হতে নির্গত শরয়ী মাসআলাসমূহ : উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا শব্দ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে–

ক. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করতেন, সুতরাং দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোনো মত পার্থক্য নেই। বরং দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নত কি ওয়াজিব এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

খ. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া শর্ত, বসে খুতবা দেওয়া শুদ্ধ হবে না। কেননা কুরআনে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার কথা বলা আছে। আর নবী করীম ﷺ হতে হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) ও খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন।

গ. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নত। তিনি বলেন, কুরআনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং বর্ণনা রয়েছে, এতে শর্ত বুঝায় না, আর খোলাফায়ে রাশেদার দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া দ্বারাও শর্ত প্রমাণ হয় না; বরং তার জন্য نَصّ قَطْعِيّ আবশ্যকতা নেই। আর তা ছাড়া সাহাবীগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)ও খুতবা বসে দিতেন। দাঁড়ানো শর্ত হলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তা করতেন না। –[আয়াতুল আহকাম]

ঘ. আয়াতে তবলা বাজানোকে لَهْو বলা হয়েছে। لَهْو বলতে খেল-তামাশা ইত্যাদিকে বুঝায় لَهْو وَلَعِب থেকে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ আর অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ يُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ যারা لَهْو وَلَعِب খরিদ করেছে আল্লাহর পথ হতে গোমরাহ করার জন্য অজ্ঞানার্থে সুতরাং জ্ঞানবানগণ لَهْو وَلَعِب করতে পারেন না। আর তা দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং তা অবৈধ ও অশ্লীল কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. নবীগণের সম্মুখে অসম্মানসূচক আচরণ খুবই জঘন্যতম অপরাধ, কারণ নবীগণকে এহেন অবস্থায় রেখে যাওয়ার ফলে আল্লাহ তার প্রতি সতর্ক করে সরাসরি আয়াত নাজিল করেছেন।

দোয়া কবুলের বিশেষ সময় : অনেক হাদীস দ্বারা একথা স্বীকৃত যে, জুমার দিন এমন একটা সময় আছে যখন দোয়া কবুল হয়। এ সময়টি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালীন (র.) ফতহুল বারীতে জুমার দিনের ঐ সময়ের ব্যাপারে ৪০টি মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

* আল্লামা আলূসী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জুমার দিনের যে সময়টিতে আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করেন আমি আশা করি তা হলো যখন মোয়াজ্জিন জুমার নামাজের আজান দেয় অথবা ইমাম যখন মিম্বরে বসেন অথবা জুমার নামাজের জন্য যখন ইকামত দেওয়া হয়।
* তাউস ও মুজাহিদ (রা.) বলেছেন, সে সময়টি হলো আসরের পর মাগরিব পর্যন্ত।
* তত্ত্ব জ্ঞানীদের মতে লাইলাতুল কদর ও ইসমে আযমের মতো এটিও আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছেন।
* ইমাম জাযরী (র.)-এর মতে খুতবার জন্য ইমাম যখন আসেন তখন থেকে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টিতে।
* ইবনে খোযাইমা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সে সময়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জবাবে তিনি বলেছেন। আমি জানতাম কিন্তু এরপর আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন শবে-কদরের কথা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ : সূরা আল-মুনাফিকূন

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ হতে তার নামটি গৃহীত। মূলত তা এ সূরাটির নাম এবং তা আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কেননা এ গোটা সূরায় মুনাফিকদের আচরণ এবং কর্মনীতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ১৮০টি বাক্য ও ৭৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তন কালে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়, কিংবা মদীনায় পৌঁছে যাওয়ার পর পরই তা নাজিল হয়েছে। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরি সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ সূরাটি নাজিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সূরার বিষয়বস্তু :

এক : ১ থেকে ৮ নং আয়াত পর্যন্ত নিফাক আর মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বলা হয়েছে মুনাফিকরা যখন নবী করীম ﷺ -এর সামনে আসে তখন তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে; কিন্তু আসলে তারা তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না। অতঃপর নবী ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে তাদের মারাত্মক কথা,–"রাসূলের দাওয়াত, দীন অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে; তারা বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রাসূলের মুহাজির সাহাবীগণকে মদীনা হতে বের করে দিবে"–প্রসঙ্গে আলাচনা করা হয়েছে।

দুই : ৯ থেকে ১১নং আয়াতে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, সৌন্দর্য, ফ্যাশনে পড়ে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হতে দূরে সরে না যেতে বলা হয়েছে। যেমনটি মুনাফিকগণ সরে পড়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি হতে বিরত থাকা হলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, সময় থাকতে আল্লাহর পথে দান করো, সময় চলে গেলে আবার জীবন ফিরে চাইলেও পাওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর পথে দান না করার কারণে আফসোস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। –[সাফওয়া]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ঐতিহাসিক পটভূমি : যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে তার উল্লেখের পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক। কেননা, যে বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাজিল হয়, তা কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না। তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরায় একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং তা-ই শেষ পর্যন্ত সে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার কিছু দিন পূর্বে মদীনার প্রধান দু' বিবদমান গোত্র খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদীনার বাদশাহ বানাবার জন্য একমত হয়েছিল। ইতোমধ্যে উভয় গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদীনায় হিজরত করে চলে আসতে আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চলে আসলে মদীনার অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়ল। স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবশেষে সে-ই তার দলবল নিয়ে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরই রয়ে গেল। তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের ফলে সে মদীনার বাদশাহ হতে পারল না। এ কারণেই সে বিভিন্নভাবে ইসলাম, মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে জাল বুনতেছিল। তার এ সব ষড়যন্ত্র দিন দিন স্পষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের সামনে ধরা পড়ছিল। সে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলাতে লাগল, অনেক সময় প্রকাশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করল।

ষষ্ঠ হিজরি সনে সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বনূ মুস্তালিক অভিযানে অংশগ্রহণ করল। এ যুদ্ধে সে এমন দু'টি ঘটনা ঘটাল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারত; কিন্তু কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তার দরুন এ উভয় ফিতনার মূল উৎপাটন সম্ভব হয়েছিল। এ সূরাতে তন্মধ্যে একটি ফিতনার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ফিতনার আলোচনা সূরা নূরে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণ : মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শ্বে একটি জনবসতি অবস্থিত ছিল। বনূ মুস্তালিকদের পরাজিত করার পর মুসলিম বাহনী এখানেই অবস্থান করছিল। এ সময় হঠাৎ পানি নিয়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তাদের একজনের নাম ছিল জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মচারী। তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ

লোকটিই পালন করতেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবর আল-জুহানী। তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল। ঝগড়া মুখের তিক্ত কথাবার্তা ছাড়িয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জাহজাহ সিনানকে একটি লাথি মেরেছিলেন। প্রাচীন ইয়ামেনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এ ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন। তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, আর জাহাজাহ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলেন। ইবনে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনতে পেয়ে আউস ও খাযরাজের লোকদেরকে উসকানি দেওয়ার জন্য চিৎকার করে করে বলতে লাগল, শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য করো। অপর দিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বের হয়ে আসলেন। খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন। আর তা এমন এক স্থানে যেখানে অল্পদিন পূর্বেই তারা সকলেই সম্মিলিতভাবেই এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। চিৎকার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ বের হয়ে আসলেন এবং বললেন–

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ مَا لَكُمْ وَلِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ .

"এ বর্বতার চিৎকার কেন? তোমরা কোথায় আর এ জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায়? [অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য শোভা পায় না] তোমরা তা ত্যাগ করো। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ।"

তখন উভয় দিকের নেককার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন। সিনান জাহজাহকে মাফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন।

অতঃপর যার যার অন্তরে মুনাফেকী ছিল এমন প্রত্যেকটি লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট উপস্থিত হলো। তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বলল, এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল। তুমি প্রতিরোধ করতেও ছিলে; কিন্তু এখন মনে হয়েছে; তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাঙ্গালীদের সাহায্যকারী হয়ে গেছে। ইবনে উবাই আগে হতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এ কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, সব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম, তোমরাই এ লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধনমাল এদের মধ্যে বণ্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে-ফেঁপে খোদ আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করেছ তোমাকেই ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্য। এ উপমাটা আমাদের ও এ কুরাইশ কাঙ্গালদের [হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবীদের] সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, হাত গুটিয়ে নাও তখন তারা কোথাও থাকবে না। আল্লাহর শপথ মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের সম্মানিত পক্ষ, হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।

এ বৈঠকে ঘটনা বশত হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি এসব কথাবার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলে দিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি গিয়ে সমস্ত কথাবার্তা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট পেশ করে দিলেন। [অপর এক বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ নিজেই সব ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন।] নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞসা করলে তিনি আদ্যপ্রান্ত সব কিছু শুনিয়ে দিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি ইবনে উবাই-এর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবনে উবাই এ কথা বলেছে– এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে; কিন্তু হযরত যায়েদ এ কথার জবাবে বললেন, না হুযূর! আল্লাহর শপথ আমি তাকেই এসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করল। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এসব কথা কখনোই বলিনি। আনসারগণও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবত তার ভুল হয়েছে। ইবনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীতে একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। গোত্রের বয়োবৃদ্ধরাও হযরত যায়েদকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া সমীচীন মনে না হলে মুয়ায ইবনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বিশির, সাঈদ ইবনে মুয়ায, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা প্রমুখ আনসারদের মধ্য হতে কোনো একজন আনসারকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন; কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, না তা করো না। লোকেরা বলবে, দেখ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা

করাচ্ছেন। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখনো রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয়নি। ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা চলতে থাকলেন। লোকেরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। পরে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বস্তুত মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব লোকদের মন-মগজ থেকে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম ﷺ এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পথিমধ্যে আনসার সর্দার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না। আপনি কখনো এরূপ সময় সফর শুরু করতেন না। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তুমি শুননি? তোমাদের এ সাহেব কি কথাটি বলেছে? হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন– কোন সাহেব? বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি জবাবে বললেন, বলেছেন মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিতগণ হীন-নিকৃষ্টদের বহিষ্কৃত করবে। উসাইদ বললেন, আল্লাহর শপথ! সম্মানিত তো আপনি, আর হীন নিকৃষ্ট তো সে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হলো। লোকেরা ইবনে উবাইকে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রূপাত্মক স্বরে জবাব দিল, তোমরা বলেছ তার প্রতি ঈমান আনো, আমি ঈমান এনেছি। তোমরা বললে, নিজের ধনমালের যাকাত দাও, আমি যাকাতও দিয়েছি। এখনতো বাকি আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে সিজদা করবো। এসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তার পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বলেছেন, মদীনা পৌঁছে সম্মানিতগণ অসম্মানিতকে বহিষ্কার করবে। সম্মানিত আপনি না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল? তা এখন আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহর শপথ রাসূলে কারীম ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। একথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দেখে যাও, আমার নিজের পুত্রই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাল। নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজের ঘরে যেতে দেন। আব্দুল্লাহ এ কথা শুনে বললেন, নবী করীম ﷺ যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন। তখন নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! কি মনে কর তুমি, যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিলে তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠত; কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, আল্লাহর শপথ, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রাসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ। এ পটভূমিতে এ সূরাটি নাজিল হয় এবং নাজিল হয় সম্ভবত নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরে।

উপরোল্লিখিত ঘটনা হতে প্রাপ্ত ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি প্রশাসনিক ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো, প্রকৃত ইসলাম বা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

২. ইসলামে বর্ণবাদ, গোত্রীয়, দেশীয় ও বৈদেশিক জাতীয়তাবাদ-এর পার্থক্যকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

৩. ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার কোনো প্রকার উপমা বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় না।

৪. মুসলমানদের সর্বসাধারণের জন্য হিতকর কার্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

৫. মুসলমানদের পরস্পর ভুল ধারণা হতে রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম ﷺ-এর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর যারা তাঁকে অন্তরে বিশ্বাস করত এবং প্রকাশ্যে সমালোচনা করত সে অভিশপ্ত ইহুদিদের কথা আলোচিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবিদার; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরার শেষে নবী করীম ﷺ -এর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মুনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্মান করলেও তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি বা সম্মান না করা মুনাফেকীর লক্ষণ। এমন গর্হিত কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমানদের একান্তই কর্তব্য। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-মুনাফিক মদীনায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلٰى خِلَافِ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ فِيْمَا اَضْمَرُوْهُ مُخَالِفًا لِمَا قَالُوْهُ ـ

১. যখন মুনাফিকগণ আপনার নিকট আসে, তখন তারা বলে তাদের মুখে, তাদের অন্তরে যা আছে তার বিপরীতে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আর আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, জানেন নিশ্চয় মুনাফিকগণ মিথ্যাবাদী তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি বিপরীত তাদের অন্তরে তারা যা গোপন রেখেছেন তাতে।

٢. اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً سُتْرَةً عَنْ اَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَصَدُّوْا بِهَا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اَىْ عَنِ الْجِهَادِ فِيْهِمْ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

২. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করেছে। তাদের সম্পদ ও জীবন হতে অন্তরায়। আর তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। তাদের মধ্যে জিহাদ করা হতে নিঃসন্দেহে তারা যা করেছে, তা অতিশয় মন্দ।

٣. ذٰلِكَ اَىْ سُوْءُ عَمَلِهِمْ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِاللِّسَانِ ثُمَّ كَفَرُوْا بِالْقَلْبِ اَىْ اِسْتَمَرُّوْا عَلٰى كُفْرِهِمْ بِهٖ فَطُبِعَ خُتِمَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بِالْكُفْرِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ الْاِيْمَانَ ـ

৩. এটা অর্থাৎ তাদের মন্দকাজ এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে মৌখিকভাবে অতঃপর কুফরি করেছে অন্তরের সাথে। অর্থাৎ তারা কুফরির মধ্যে স্থিতিশীল থাকে। ফলে মোহর করে দেওয়া হয় সীল মেরে দেওয়া হয় তাদের অন্তরসমূহে কুফর-এর মাধ্যমে। সুতরাং তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না ঈমানকে।

٤. وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط لِجَمَالِهَا وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط لِفَصَاحَتِهِ كَاَنَّهُمْ مِنْ عَظَمِ اَجْسَامِهِمْ فِىْ تَرْكِ التَّفَهُّمِ خُشُبٌ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ وَضَمِّهَا مُّسَنَّدَةٌ ط مُمَالَةٌ اِلَى الْجِدَارِ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ تُصَاحُ كَنِدَاءٍ فِى الْعَسْكَرِ وَاِنْشَادِ ضَالَّةٍ عَلَيْهِمْ ط لِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الرُّعْبِ اَنْ يَنْزِلَ فِيْهِمْ مَا يُبِيْحُ دِمَاءَ هُمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَاِنَّهُمْ يُفْشُوْنَ سِرَّكَ لِلْكُفَّارِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَهْلَكَهُمْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ كَيْفَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بَعْدَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ ـ

অনুবাদ :

৪. আর আপনি যখন তাদের প্রতি তাকান, তখন তাদের দৈহিক আকৃতি আপনাকে বিস্মিত করে তার সৌন্দর্যের কারণে। আর যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা সাগ্রহে শ্রবণ করেন তার পাণ্ডিত্য ও লালিত্যের কারণে। তারা যেন যাদের দৈহিক বিশালতা সত্ত্বেও উপলব্ধি হীনতা বিচারে কাষ্ঠসমূহ خُشُبٌ শব্দটি ش সাকিন ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যা ঠেকানো হয়েছে দেওয়ালের সাথে ঠেকানো হয়েছে তারা সকল প্রকার শোরগোলকে মনে করে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, যেমন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কোনো ঘোষণা বা কোনো হারানো বিজ্ঞপ্তির কারণে হয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে ভয় থাকার কারণে তারা ধারণা করে যে, হয়তো আমাদের হত্যার ব্যাপারে কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। তারাই শত্রু, সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করুন কারণ তারাই আপনার গোপনীয়তা কাফেরদের নিকট ব্যক্ত করে দেয়। আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছে? প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও তারা কিরূপে ঈমান হতে বিমুখ হচ্ছে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ : اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ (الاية) হলো شَرْط আর তার জবাব হলো قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি جَوَابُ الشَّرْطِ আর حَالٌ আবার কেউ কেউ جَوَابُ الشَّرْطِ উহ্য বলে মনে করেন. তারা বলেন قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ আর কেউ কেউ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَائِلِيْنَ نَشْهَدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمْ হলো تَقْدِيْر উহ্য। اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً -কে জবাবে শর্ত মনে করেন, ইমাম শওকানী (র.) বলেন, তা আমাদের মতে ঠিক নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَيْمَانَهُمْ : জমহুর هَمْزَة তে فَتْح দিয়ে أَيْمَانَهُمْ পড়েছেন। আর হাসান (র.) তাতে كَسْرَة দিয়ে اِيْمَانَهُمْ পড়েছেন।

قَوْلُهُ "كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ" : এ বাক্যটি তারকীবে جُمْلَة مُسْتَانِفَة হতে পারে। আবার একে উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَر হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْب ও বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ "فَطُبِعَ" : জমহুর فَطُبِعَ শব্দটি مَجْهُوْل পড়েছেন। তখন عَلٰى قُلُوْبِهِمْ - جَار -এর مَجْرُوْر -কে نَائِبِ فَاعِلْ -এর قَائِم করা হবে। হযরত যায়েদ ইবনে আলী তাকে مَعْرُوْف করে পড়েছেন। তখন তার فَاعِل হবে طَبَعَ -এর ضَمِيْر যার مَرْجِع হলো مَقَام আল্লাহ তা'আলা। হযরত আ'মাশের কেরাতে তারই প্রমাণ মিলে, তিনি পড়েছেন فَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "خُشُبٌ" : জমহুর خَاء এবং شِيْن উভয় বর্ণে ضَمَّه দিয়ে خُشُبٌ পড়েছেন। আবূ আমর, কিসায়ী কেবল شِيْن -এ سَاكِنْ যুক্ত করে خُشْبٌ পড়েছেন। হযরত বারা ইবনে আযেবও এ রকমই পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন, কারণ এর একবচন হলো خَشَبَةٌ যেমন– بَدَنَةٌ ও بُدْنٌ আবূ খাতেম প্রথম কেরাত পছন্দ করেছেন, সাঈদ ইবনে জোবাইর ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) উভয় বর্ণে فَتْح দিয়ে خَشَبٌ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ যখন আপনার নিকট মুনাফিকগণ আসে তখন তারা বলে আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। কথাটি মূলত বাস্তব সত্য, তথাপিও আল্লাহ তা'আলা জেনে শুনে পুনঃ সাক্ষ্য দান করেছেন এবং সরাসরি বলেন– নিঃসন্দেহে আপনি সত্য রাসূল তবে মুনাফিকগণ মিথ্যুক, আপনি জেনে রাখুন! তারা আপনার রিসালাত সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দান করেছে, তাতে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ যা তারা মুখে বলে, এ কথা সত্য, তবে এ সত্যতাকে আন্তরিকতার সাথে তারা বিশ্বাস করে না।

বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে, সাক্ষ্য দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। একটি সে আসল কথা যা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আর অপরটি হলো সাক্ষ্যদানকৃত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতার নিজের বিশ্বাস। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তা যদি মূলত সত্য হয় আর সাক্ষ্যদাতার বিশ্বাসও তাই হয়, যা সে মুখে উচ্চারণ করছে তাহলে সাক্ষ্যদাতা সত্যবাদী বলে প্রতীয়মান হবে।

আর মিথ্যা বিষয়কে মিথ্যা হিসাবে সাক্ষ্য দানকারীকেও সত্যবাদী বলা হয়। কেননা সে নিজের বিশ্বাস প্রকাশে সত্যবাদী। অপর আরেক হিসাবে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে, কেননা যে বিষয়টি সত্য হওয়া সম্পর্কে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে তা মূলত মিথ্যা ও অসত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাবে যেমন একজন ইহুদি যদি তার ধর্মমতে বহাল থেকে ইসলামকে সে মানে বলে সাক্ষ্য দেয় তবে বিচারের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না, যদিও সে মূলত মিথ্যাবাদী হবে। কারণ সে ইসলামকে সত্য মেনে সত্য বলেনি; বরং না মেনে ও স্বীকার না করে মাত্র মুখে সত্য বলেছে। তদ্রূপভাবে মুনাফিকগণকে আল্লাহ মিথ্যাবদী বলেছে। আর মুশরিকরাও মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এভাবে বিশ্বাস দেখিয়েছিল।

অন্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ তারা শপথ করে বলে যে, তারা আপনাদের দলভুক্ত অথচ মূলত তারা এমন নয়। –[মা'আরেফুল কোরআন]

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ বাক্যটি جُمْلَه مُعْتَرِضَه হিসাবে পৃথকভাবে বর্ণনা করার হিকমত : উক্ত বাক্যটিকে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হিসাবে বর্ণনা করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরে ছাওরী গ্রন্থকার বলেন– যদি বাক্যটিকে তৎপূর্ববর্তী نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ -এর সাথে মিলিত হিসাবে বলা হতো, তাতে তাদের বর্ণিত বাক্যটি (نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ) মূলত মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াত, এ কারণেই পৃথক বাক্য হিসাবে বলা হয়েছে। –[সাবী]

এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান আসলে অন্তরের বিশ্বাস : মুনাফিকরা আসলেই বিশ্বাস করত না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; কিন্তু তারা মুখে মুখে হলফ করে বলত যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তাদের এরূপ আচরণকে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান মূলত অন্তরের বিশ্বাসের নাম। আর অন্তরের কথাটাই আসল কথা। বিশ্বাসের পরিপন্থি কথা মিথ্যা। –[কাবীর, কুরতুবী]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে। মানুষকে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, তারা আসলেই মু'মিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ "তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। আর এ উপায়ে তারা আল্লাহর শপথ হতে নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যান্যদেরও বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কতইনা নিকৃষ্ট তৎপরতা।"

اَلْاَيْمَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে শপথ বলতে– তারা নিজেদেরকে ঈমানদার প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সাধারণত যে কসম করে তাও হতে পারে। আর নিজেদের কোনো মুনাফেকীর কাজ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে যেসব কসম করে এ উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানরা যেন মনে করে না বসে যে, মুনাফেকীর কারণে তারা এরূপ কাজ করেছে– তাও হতে পারে। তারা মুনাফেকীর কারণে এ কাজ করেনি– কসম করে মুসলমানদেরকে এ বিশ্বাস করাতে চায়। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের দেওয়া সংবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যেসব কসম করেছিল– তাও বুঝানো হতে পারে। তার যে কোনো একটি বুঝানো হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সে সঙ্গে এটাও সম্ভব যে, তারা যে বলত 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল' এ কথাটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথ বলে গণ্য করেছেন।

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি'-কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শপথ হিসেবে গণ্যকরণ : মুনাফিকদের এ উক্তি 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল'-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথ বলে গণ্য করেছেন, এ সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ব্যতীত) সহ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম আউযায়ী (র.) তাকে শপথ বা ইয়ামীন মনে করেন।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা শপথ নয়। ইমাম মালিকের দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে– ১. একটি হলো তা শপথ। ২. 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলার সময় যদি শপথের নিয়ত করে, তাহলে শপথ হবে, নতুবা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি' এ স্পষ্ট শব্দগুলোও যদি বলা হয় তবুও তা সে ব্যক্তির শপথমূলক কথা বলে মনে করা যাবে না। অবশ্য সে যদি শপথ করার ইচ্ছা মনে নিয়ে এ কথা বলে, তাহলে অন্য কথা।
–[আহকামুল কোরআন–জাস্‌সাস, আহকামুল কোরআন–ইবনুল আরবী]

جُنَّةً -এর অর্থ : جُنَّةً অর্থ– ঢাল, লৌহবর্ম, যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের আঘাত হতে বাঁচার জন্য যা পরিধান করে থাকে। পবিত্র কুরআনে جُنَّةً শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা কাপড়ের মতো সাধারণ পর্দা চায় না। তারা মনে করে যে, তারা সর্বদা স্নায়ুযুদ্ধে রয়েছে, সুতরাং তাদের মনের অবস্থা গোপন করার জন্য পর্দার প্রয়োজন, তবে শর্ত হলো, সে পর্দা যুদ্ধ-সামগ্রী হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কুরআন جُنَّةً শব্দ মনোনীত করেছে, যাতে তাদের মনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
–[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : صَدُّوْا শব্দটি আরবি ভাষায় এক সঙ্গে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. নিজে বিরত থাকা। দুই. অন্যকে বাধা দিয়ে বিরত রাখা। প্রথম অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, 'তারা নিজেরা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকে।' অর্থাৎ তারা নিজেদের এসব কসমের সাহায্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেওয়ার পর, তারা নিজেদের জন্য ঈমানের দাবি অনুযায়ী কাজ না করার এবং বাস্তবে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ না করার সুবিধাদি বের করে নেয়। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, তারা অন্যান্য লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে দেয় না। অর্থাৎ তারা এসব মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার খেলায় মেতে থাকে। মুসলমান হয়ে মুসলিম সামাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপন তত্ত্ব জেনে শত্রুপক্ষকে সেসব বিষয়ে জানিয়ে দেয়। অমুসলিমদেরকে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে। তাদের খারাপ ধারণা উদ্রেক করে এবং সরল অন্তঃকরণের মুসলমানদের মনে নানারূপ শোবাহ-সন্দেহ ও ভুল ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন সব হাতিয়ার প্রয়োগ করে, যা একজন মুসলিম বেশধারী মুনাফিকই করতে পারে। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা সেসব হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে না।

মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলার কারণ : যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগেও আলোচনা করেছেন; কিন্তু কোথাও তাকে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেননি; কিন্তু এখানে নিকৃষ্ট বলার কারণ কি?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এখানে তাদের কর্মকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলার কারণ হলো, তাদের অন্তরের বিশ্বাস গোপন করার জন্য তারা মিথ্যা শপথের আশ্রয় নিয়েছে। আর এ মিথ্যা শপথ দ্বারা তারা তাদের ধন-সম্পদকে মুসলমানদের হাত হতে রক্ষা করেছে। এরূপ পন্থা অন্য কোথাও তারা গ্রহণ করেনি। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ : আল্লাহ বলেন, তাদের এমন জঘন্য আচরণের কারণ এই যে, তারা কেবল মাত্র মুখেই ঈমান গ্রহণ করেছে, অন্তর তাদের কুফরিতে ভরা। তাদের এ দাগাবাজীর ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই প্রকৃত ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। আর তারা ঈমান সম্পর্কীয় কোনো কিছুই বুঝে না।

অনবরত ও অত্যধিক পাপাচারে লিপ্ত থাকলে মানুষের অন্তর বিকৃত হয়ে যায়, সৎ ও মহৎ আর পুণ্য কাজের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, এমতাবস্থায় পাপ-পুণ্য ও হিতাহিত জ্ঞান বিবেচনার শক্তি কোথায় পাবে। –[তাহের]

কেউ কেউ এ আয়াতের তাৎপর্য এভাবে করেছেন যে, তারা যখন খুব ভালোভাবে বুঝে শুনে ঈমান না এনে অথবা কুফরির পথ অবলম্বন না করে মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করেছে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের অকৃত্রিম ও ভদ্র মানুষের আচরণ অবলম্বনের ক্ষমতাই হরণ করে নেওয়া হয়েছে। এ স্থলে তারা সুস্থ বুঝ ও সমঝের যোগ্যতাই হারিয়েছে। এ পথে চলতে তাদের মনে কখনো চেতনা জাগ্রত হয় না।

قَوْلُهُ تَعَالَى فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ الخ : فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ অর্থ "এ জন্য তাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে" এখন তারা কিছুই বুঝে না। এ কথার তাৎপর্য হলো, তারা যখন খুব ভালোভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমান আনা কিংবা সুস্পষ্ট কুফরির পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে এ মুনাফিকীর আচরণ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের অকৃত্রিম, সাচ্চা ও ভদ্র মানুষের আচরণ অবলম্বনের ক্ষমতাই হরণ করে নেওয়া হয়েছিল। এক্ষণে তারা সঠিক ও সুস্থ বুঝ-সমঝের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের নৈতিক চেতনাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ পথে চলতে তাদের মনে কখনো এ চেতনা জাগ্রত হয় না যে, দিন রাতের মিথ্যা ও সার্বক্ষণিক ধোঁকা প্রতারণা; কথা এবং কাজের চিরস্থায়ী বিরোধ ও পার্থক্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীনতম অবস্থা এবং এ অবস্থার মধ্যেই তারা নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে রেখেছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ..... لِقَوْلِهِمْ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কিছু আলামত ও আচরণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাদের প্রতি তাকালে তাদের অবয়ব তোমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর তারা কথা বললে তাদের কথা শুনতে মগ্ন হয়ে যাবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বড়ো স্বাস্থ্যবান সুডৌল দেহসম্পন্ন, সুদর্শন ও বাকপটু লোক ছিল। তার সঙ্গী-সাথীও এ গুণে গুণান্বিত ছিল। এরা সকলে মদীনার ধনী লোক ছিল। তারা যখন নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হতো, তখন সেখানে প্রাচীরের গায়ে বালিশ লাগিয়ে ঠেশ দিয়ে বসত ও বড় রসালো কথাবার্তা বলত। তাদের আকার-আকৃতি দেখে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে কেউ চিন্তা বা কল্পনা করতে পারতো না যে, এসব সম্মানিত ব্যক্তি চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও হীন হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করে বলেছেন, 'তারা যেন কাষ্ঠসমূহ যা দেওয়ালের সাথে ঠেকানো হয়েছে" অর্থাৎ এ লোকেরা যারা প্রাচীর গায়ে ঠেশ লাগিয়ে বসে, তারা আসলে মানুষ নয়। তারা নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। তারা কিছু জানেও না, কিছু বুঝেও না। তারা ফলদায়ক কাষ্ঠের মতোও নয়, সুতরাং উপকারহীন বস্তু মাত্র।

উপকারীবস্তুর সাথে তুলনা না করে প্রাচীরে লাগানো কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে তুলনা করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, তাতে এমন অনেক ফায়দা আছে যা অন্যত্র নেই।

১. তাফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে, ঈমান ও কল্যাণহীন অবস্থায় তাদেরকে মোটাতাজা, দেওয়ালে ঠেশ লাগানো শরীরগুলোকে, দেওয়ালে ঠেশ দেওয়া কাষ্ট খণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ কাষ্ঠ যদি কোনো কাজ দেয়ই তাহলে তা তখনই ছাদে, দেওয়ালে ও অন্যান্য লাভজনক স্থানে ব্যবহৃত হয়। আর যখন কোনো কাজ দেয় না, তখন তা প্রাচীরের সাথে ঠেশ লাগিয়ে ফেলে রাখা হয়, অতএব ফল না দেওয়া লাভহীন হওয়াতে তাদেরকে ঠেশ দেওয়া কাঠের সাথে তুলনা করেছেন। আর তার অর্থ ঠেশ লাগানো খোদাইকৃত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার সাথেও সৌন্দর্যে ও ফায়দাহীন হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তুলনা হতে পারে।
২. প্রাচীরে ঠেশ লাগানো শুকনা কাষ্ঠখণ্ডও আসলে কাঁচা গাছের ডাল ছিল, যা যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারযোগ্য ছিল। অতঃপর শুকিয়ে গিয়ে ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মুনাফিকরাও যে কোনো কল্যাণমূলক কাজের যোগ্য ছিল। অতঃপর তারা কল্যাণ-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।
৩. দেওয়ালের সাথে ঠেশ লাগানো কাঠের এক মাথা এক দিকে আর অন্য মাথা অন্য দিকেই থাকে। ঠিক তেমনি মুনাফিকদের অবস্থাও। কারণ মুনাফিকদের একদিক অর্থাৎ অন্তর কাফেরদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর অপর দিক অর্থাৎ বাহ্যিক দিক মুসলমানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। −[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেকটি জোর আওয়াজকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।" এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাদের অপরাধী মন-মানসিকতার পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া হয়েছে। তারা বাহ্যিক ঈমানের অন্তরাল সৃষ্টি করে মুনাফেকির যে মারাত্মক খেলায় মেতে রয়েছে, তা তারা খুব ভালো করেই জানত। এ কারণে যে কোনো সময় তারা ধরা পড়ে যায়, তাদের অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে; কিংবা তাদের কুটিল কারসাজি সহ্য করতে করতে মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ কোনো সময় ভেঙ্গে ক্রোধের বান ডেকে উঠে, সেজন্য প্রতি মুহূর্তেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে থাকত। বসতির কোনো একদিক দিয়েও কোনো উচ্চ ধ্বনি উঠলে কিংবা কোথাও কোনো কোলাহল শ্রুতিগোচর হলে তারা সংকুচিত হয়ে পড়ত। তারা মনে করত হয়তো দুর্ভাগ্যের নির্দিষ্ট মুহূর্তটি এসে পড়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ : "তারা পাকা শত্রু তাদের হতে সতর্ক হয়ে থাক।" অর্থাৎ তারা মুসলিম সমাজে লুকিয়ে থাকা গোপন শত্রু, আর গোপন শত্রু প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক হয়ে থাকে। কারণ গোপন শত্রু সমাজের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। −(রূহুল কোরআন) সুতরাং এদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থেকো। কারণ তারা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রকমের অঘটন বাঁধিয়ে দিতে পারে, যে কোনো সময় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالَى قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ : প্রকাশ্য অর্থে এ অংশে গজব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। মূলত তা একটি ঘোষণা মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের ক্রিয়া-কলাপের কারণে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর মার অবশ্যই পড়বে। এ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে আরবি কথন অনুযায়ী অভিশাপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা যেমন বলি লোকটি কেমন খারাপ, ওর সর্বনাশ হোক, সে ধ্বংস হয়ে যাক, যেমন−হাদীস শরীফে হুযূর ﷺ বলেছেন− رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ আবূ যরের নাক মাটি মিশ্রিত হোক, تَرِبَتْ يَدَاكَ তোমার হাত মাটি মিশ্রিত হোক। এ সকল বাক্য দ্বারা যেমন তিরস্কার করা হয়েছে তদ্রূপ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ শব্দ দ্বারাও তিরস্কার করা হয়েছে; কারো বিরুদ্ধে কোনো ধ্বংসাত্মক কথা বা বদদোয়া স্বরূপ নয়।

অনুবাদ :

٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مُعْتَذِرِيْنَ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ عَطَفُوْا رُؤُوْسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْ ذٰلِكَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ .

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আসো ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা ফিরিয়ে নেয় শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয় তাদের মস্তকসমূহ, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা ফিরে যায়। তা হতে বিমুখ হয় দাম্ভিকভাবে।

٦. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اِسْتَغْنٰى بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ .

৬. এটা সমান কথা যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এখানে هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ বিদ্যমান হেতু هَمْزَه وَصْل -এর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনি। কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

٧. هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لِاَصْحَابِهِمْ مِنَ الْاَنْصَارِ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط يَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالرِّزْقِ فَهُوَ الرَّازِقُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ .

৭. তারাই বলে তাদের সাথী আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের উপর ব্যয় করো না, যারা রাসূলের সঙ্গে রয়েছে মুহাজিরগণ হতে যাবৎ তারা সরে পড়ে তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহরই জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার জীবিকার ভাণ্ডার। সুতরাং তিনিই মুহাজির ও অন্যদের জীবিকা দানকারী। কিন্তু মুনাফিকগণ তা উপলব্ধি করে না

٨. يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اَىْ مِنْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ عَنَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط عَنَوْا بِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ الْغَلَبَةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

৮. তারা বলে, আমরা প্রত্যাবর্তন করলে বনী মুসতালিক যুদ্ধ হতে মদীনা হতে সবলগণ বের করবে। এটা দ্বারা তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করেছে। দুর্বলদেরকে তথা হতে এটা দ্বারা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করেছে। অথচ সম্মান তো আল্লাহরই জন্য শক্তি এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণের জন্য; কিন্তু মুনাফিকগণ জানে না তা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "يَصُدُّوْنَ" : يَصُدُّوْنَ ক্রিয়াটি حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কারণ رَأَيْتَهُمْ -এর رُؤْيَةٌ এখানে وَرَأَيْتَهُمْ صَادِّيْنَ مُسْتَكْبِرِيْنَ বা চাক্ষুষ দেখা। সুতরাং দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর প্রয়োজন নেই। তখন বাক্যটির অর্থ হবে- بَصَرِيَّة

قَوْلُهُ "وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ" : وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ বাক্যটি তারকীবে প্রথম حَالٌ -এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অর্থাৎ يَصُدُّوْنَ -এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ "لَوَّوْا" : জমহুর এ শব্দটিতে تَشْدِيْد যুক্ত করে لَوَّوْا পড়েছেন। আর নাফে' তাকে تَخْفِيْف করে لَوَوْا পড়েছেন। আবূ ওবাইদ প্রথম কেরাতকে পছন্দ করেছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "اَسْتَغْفَرْتَ" : জমহুর একে মদহীন কেবল একটা فَتْح বিশিষ্ট هَمْزَة দিয়ে এবং هَمْزَه إِسْتِفْهَامْ -কে حَذْف করে পড়েছেন। এ কারণে যে, أَمْ অব্যয়টি هَمْزَة إِسْتِفْهَامْ -এর উপস্থিতি বুঝাচ্ছে। আর ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' هَمْزَة অতঃপর اَلِفْ যুক্ত করে পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "يَنْفَضُّوْا" : জমহুর إِنْفِضَاضٌ হতে উদ্ভূত মনে করে يَنْفَضُّوْا পড়েছেন। যার অর্থ- ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর ফজল ইবনে ঈসা আর-রাকাসী اَنْفَضَ শব্দ হতে উদ্ভূত মনে করে يُنْفِضُوْا পড়েছেন। বলা হয় اَنْفَضَ الْقَوْمُ যখন তাদের মাল-পত্র ধ্বংস হয়ে যায়। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল :

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বলেছিল- لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিতদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবে, এ অসৎ আচরণের উপর ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকে যেতে বলা হয়েছিল; তখন সে এ কথার উপর মাথা ঝাঁকুনি দেয় এবং রাসূলের দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়-স্বজনদের ঈমানদার ব্যক্তিগণ তাকে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর আয়াতের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তুমি রাসূলের দরবারে যাও এবং তোমার গুনাহ মার্জনা করে নাও এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমার দোয়া করিয়ে নাও। তখন ইবনে উবাই বলল, واه واه হায় হায়! তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়নের জন্য বললে, তখন ঈমান এনেছি। অতঃপর যাকাত প্রদানের জন্য বলেছ, তাও ইচ্ছা অনিচ্ছায় পালন করেছি। এখন সর্বশেষ তোমাদের কথানুসারে মুহাম্মদকে সিজদা করতে বলতে চাও নাকি? তা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেন। -[আশরাফী, কাবীর, মা'আরিফ]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন উহুদের ময়দান হতে ইবনে উবাই বহুসংখ্যক (সাতশত -এর মতো) লোক নিয়ে ফিরে আসল, তখন মু'মিনরা তার সমালোচনা ও নিন্দা শুরু করল, তখন তার কোনো এক ভাই তাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট যাও এবং ক্ষমা চাও তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার জন্য দোয়া করবেন। তখন সে বলল, না আমি যাবো না, সে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক বা নাই করুক, এই বলে মাথা নেড়ে-ঝেড়ে হেলতে লাগল, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয় এ অবস্থার পর ইবনে উবাই অতিশয় মরে গেল।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর এদেরকে যখন বলা হয় আসো, তাহলে আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন, তখন তারা মাথা ঝাঁকানি দেয় ; আর তোমরা লক্ষ্য করেছ– তারা আসা হতে বড়োই অহমিকা সহকারে বিরত থাকে।"

অর্থাৎ তারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ইস্তিগফার এবং মাগফিরাত চাওয়ার জন্য আসে না; শুধু তাই নয়, মাগফিরাত বা ক্ষমা চাওয়ার কথা শুনতেই তাদের মধ্যে অহমিকা ও অহংকার প্রচণ্ড হয়ে উঠে এবং দাম্ভিকতা সহকারে তারা মাথা ঝাঁকানি দেয়। রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াকে তারা নিজেদের পক্ষে বড়োই অপমানকর মনে করে নিজ নিজ স্থানে শক্ত হয়ে বসে থাকে। তারা যে প্রকৃতই মু'মিন নয় তাদের এরূপ আচরণ হতে তা প্রকট হয়ে উঠে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে নবী! আপনি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন আর নাই করুন তাদের জন্য সমান কথা, আল্লাহ কখনই তাদেরকে মাফ করবেন না। আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনোই হেদায়েত দেন না।"

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, এ আয়াতটি সূরা তওবার আয়াত–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ . (اَلتَّوْبَةُ : ٨٠)

যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার প্রভু আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, আমি তাদের জন্য সত্তরবার মাগফিরাতের দোয়া করবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। অর্থাৎ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন যে, মুনাফেকী না ছাড়লে তাদেরকে কখনই ক্ষমা করা হবে না। কারণ "আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনই হেদায়েত দেন না।" সুতরাং বুঝা গেল যে, মাগফিরাতের দোয়া কেবলমাত্র হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। যারা স্বেচ্ছায় নাফরমানি আর ফাসেকীর পথ অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের জন্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ও যদি দোয়া করেন, সে দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। আর যারা হেদায়েত পেতে চায় না তাদেরকে হেদায়েত দান আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নয়। আল্লাহ তা'আলা র নিয়ম হলো, যে লোক হেদায়েত পেতে চায় তাকে হেদায়েত দান করা।

মুনাফিকদেরকে هِدَايَةٌ হতে বঞ্চিত করার কারণ : মুনাফিকদের হেদায়েত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে রুহুল বয়ান গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাদেরকে হেদায়েত নসিব করা (مُرْشِدٌ) আল্লাহর ইচ্ছা নেই অথবা আলমে আরওয়াহতে তাদের রূহসমূহে হেদায়েতের নূরের ঝলক পৌঁছেনি; তাই আল্লাহ বলেন– وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ –[রুহুল বয়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ .... حَتّٰى يَنْفَضُّوْا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা সে লোক যারা বলে যে, রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করে দাও, যাতে তারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।" এ বাক্যটি 'জুমলায়ে মুস্তানাফা' অর্থাৎ এখানে পূর্বোক্ত আয়াতের শেষাংশ 'আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনো হেদায়েত দেন না।' এর কারণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকগণ ফাসেক হওয়ার এবং ফাসেকদেরকে ক্ষমা না করার কারণ বলা হয়েছে যে, তারা তাদের আনসারী মু'মিন ভাইদেরকে বলে থাকে যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে যারা মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আস্তানা বেঁধেছে তাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান বন্ধ করে দাও। তাদের উপর যদি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ কর, তাহলে তারা মদীনা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে আর থাকবে না। একেকজন একেক দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ পরিকল্পনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং মু'মিনদেরকে অভয় দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের এ পরিকল্পনা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে। "অথচ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহই; কিন্তু এ মুনাফিকরা তা বুঝে না।" অর্থাৎ তারা আল্লাহর নিয়ম-নীতি বুঝে না, তিনি তো যারা তাঁর নাফরমানি করে তাদেরকেও রিজিক দান করেন, তাহলে কিভাবে তিনি যারা তাঁর বিধান মানে, বন্দেগি করে, তাদেরকে বঞ্চিত করবেন? সুতরাং তারা অর্থনৈতিক অবরোধ করে মু'মিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَئِنْ رَّجَعْنَا ...... مِنْهَا الْاَذَلَّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান হতে বহিষ্কৃত করবে।" এ উক্তি মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরকে অসম্মানিত আর নিজেকে এবং তার মুনাফিক সঙ্গী-সাথীদেরকে সম্মানিত ভেবে বলে, আমরা মদীনায় পৌঁছলে এ কুলাঙ্গারদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করবো। −[ফাতহুল কাদীর, রূহুল কোরআন, সাফওয়া]

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (র.) বলেন, আমি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রাসূলে কারীম ﷺ-কে বললাম এবং সে যখন তা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করল, আর সে জন্য 'কসম' করল, তখন আনসার সমাজের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা আর আমার নিজের চাচা আমাকে খুবই তিরস্কার করলেন। এমনকি আমিও যেন অনুভব করতে লাগলাম যে, নবী করীম ﷺ বুঝি আমাকে মিথ্যাবাদী ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এ কারণে আমার এত দুঃখ হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের ঘরে বসে রইলাম। পরে এ আয়াতটি যখন নাজিল হলো তখন রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি হাসতে হাসতে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, ছেলেটির কান সত্যই শুনেছিল, আল্লাহ নিজেই তার সত্যতা স্বীকার করেছেন। −[ইবনে জারীর, তিরমিযী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ ..... لَايَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথচ মান-মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মু'মিনদের জন্য; কিন্তু এ মুনাফিকরা (তা) জানে না।' আল্লাহর ইজ্জত ও মর্যাদা হলো আল্লাহর দীনের শত্রুদেরকে পরাজিত করা। আর রাসূলের ইজ্জত হলো অন্যান্য ধর্মের উপর তাঁর দীনকে বিজয়ী করা। আর মু'মিনদের ইজ্জত হলো শত্রুদের উপর তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতা দান করা। −[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আসমান ও জমিনের সমস্ত ধনভাণ্ডারের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ; জান্নাতের নিয়ামতসমূহ, বৃষ্টি, রিজিক, জমিনের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত সকল সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ এর অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার শান ও কুদরত সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেন সে-ই তা লাভ করে। যাকে আল্লাহ তা'আলা বঞ্চিত করেন কেউ তাকে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন কেউ তাকে অপমানিত করতে পারে না, আর যাকে তিনি অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না। কিন্তু এ নির্জলা সত্য মুনাফিকরা বুঝতে পারে না। −[নূরুল কোরআন]

لَايَعْلَمُوْنَ ও لَايَفْقَهُوْنَ -এর মধ্যকার পার্থক্য : لَايَفْقَهُوْنَ ও لَايَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ মানুষের রিজিকের জিম্মাদার হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সরাসরি প্রকৃত বিবেকের বিপরীতমুখি কথা। তার এ কথার প্রতি বিশ্বাস আসা বেকুফ হওয়ার নিদর্শন মাত্র। তাই প্রথম আয়াতে لَايَفْقَهُوْنَ বলেছেন।

আর দুনিয়াতে কখনো এক ব্যক্তি আবার কখনো অপর ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। তাতে যদি কোথাও তা ভুল ক্রমে ব্যতিক্রম হয়− তবে তা সম্বন্ধে অবগত না থাকা ব্যক্তির বে-খবর হওয়ার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। তাই শেষোক্ত আয়াতে لَايَعْلَمُوْنَ বলেছেন।

এ আয়াত মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার এক দলিল। কারণ এখানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনরাই শেষ পর্যন্ত ইজ্জত এবং সম্মানিত হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা কিছুদিন পরই প্রমাণিত হয়েছে। এ আয়াত যেদিন নাজিল হয় সেদিনও ইসলাম দুর্বল ছিল; কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর দীন বিজয়ী হলো। গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলাম একমাত্র বিজয়ী দীন হিসাবে ঘোষিত হলো। সমগ্র বাতিল, আল্লাহদ্রোহী শক্তি ইসলামের সামনে মাথা নত করল। রাসূলের ইন্তেকালের পর পারস্য সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যদ্বয় খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে চলে আসল। এরও পর দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক অংশ মুসলমানদের হাতে চলে আসল। এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করল যে, এটা কোনো মানুষের নয়, তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বাণী। আর এ বাণীর বাহক আল্লাহর রাসূল ﷺ।

−[রূহুল কোরআন]

অনুবাদ :

٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ تُشْغِلْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج الصَّلَوٰاتِ الْخَمْسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

৯. হে ঈমানদারগণ! যেন তোমাদেরকে উদাসীন না করে অমনোযোগী না করে তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর স্মরণ হতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হতে, আর যে ব্যক্তি এরূপ উদাসীন হবে, তরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

١٠. وَاَنْفِقُوْا فِى الزَّكَاةِ مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَآ بِمَعْنٰى هَلَّا اَوْلَا زَائِدَةٌ وَلَوْ لِلتَّمَنِّىْ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ اَتَصَدَّقُ بِالزَّكٰوةِ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ بِاَنْ اَحُجَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَا قَصَّرَ اَحَدٌ فِى الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ اِلَّا سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ .

১০. আর তোমরা ব্যয় করো জাকাত আদায়ে আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আগমন করার পূর্বে। অন্যথায় তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক যদি لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত অথবা لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত এবং لَوْ অব্যয়টি تَمَنِّىْ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য। আমাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দান কর, তবে আমি সদকা করবো অর্থাৎ আমি জাকাতের মাধ্যমে সদকা করবো। শব্দটি মূলত اَتَصَدَّقُ ছিল। মূল শব্দে تَاء হরফটিকে صَاد হরফের মধ্যে اِدْغَامْ করা হয়েছে এবং আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে হজব্রত পালন করবো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হজ ও জাকাতের মধ্যে ত্রুটি করবে সে অবশ্যই মৃত্যুকালে দুনিয়াতে আরও কিছুকাল থাকার আবেদন করবে।

١١. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

১১. কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকে অবকাশ দিবেন না। আর আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, তদ্বিষয়ে সম্যক অবহিত। শব্দটি يَاء ও تَاء যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "فَاَصَّدَّقَ" : فَاَصَّدَّقَ শব্দটি মূলত فَاَتَصَدَّقَ ছিল। জমহুর এর تَاء -কে صَادْ -এর মধ্যে اِدْغَامْ করে فَاَصَّدَّقَ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ এবং সাঈদ ইবনে জোবাইর (র.) اِدْغَامْ না করে فَاَتَصَدَّقَ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ "فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ" : فَاَصَّدَّقَ শব্দ مَنْصُوْب হয়েছে جَوَاب تَمَنِّىْ হিসাবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, لَوْلَا -এর মধ্যের لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং মূল হলো لَوْ اَخَّرْتَنِىْ فَاَصَّدَّقَ অর্থাৎ তখন فَاَصَّدَّقَ হবে مَحَلًّا مَجْزُوْم জমহুর এ اِنْ اَخَّرْتَنِىْ اَتَصَدَّقَ وَاَكُنْ -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف করে وَاَكُنْ শব্দটিকেও مَجْزُوْم পড়েছেন। যেন বলা হয়েছে فَاَصَّدَّقَ আবূ আমর ইবনে মুহাইমিন এবং মুজাহিদ وَاَكُوْنَ শব্দটিকে مَنْصُوْب পড়েছেন, فَاَصَّدَّقَ -এর উপর عَطْف করে যার ......

কারণ সুস্পষ্ট। আবূ ওবাইদ বলেছেন, আমি মাসহাফে ওসমানীতে এ শব্দটি وَاوْ হীনভাবে اَكُنْ দেখেছি। ওবাইদ ইবনে ওমাইর وَاَكُنْ-কে رَفْع দিয়ে جُمْلَه مُسْتَانِفَة হিসাবে পড়েছেন। অর্থাৎ وَاَنَا اَكُوْنُ -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "تَعْمَلُوْنَ" : জমহুর এ শব্দটিকে تَعْمَلُوْنَ পড়েছেন সম্বোধন হিসাবে। আবূ বকর আসেম হতে এবং সুলামী خَبَرْ হিসাবে يَعْمَلُوْنَ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ .... اَمْوَالُكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এ সূরার প্রথম রুকূ'তে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল হতে আত্মরক্ষা এবং অপর দিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল তার পশ্চাতে এ কারণই নিহিত ছিল। এ দ্বিতীয় রুকূ'তে খাঁটি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেও না। -[মা'আরিফ, কুরতুবী]

অন্যান্য বস্তু বাদ দিয়ে ধন-সম্পদ আর সন্তানাদির আলোচনার কারণ : যেসব জিনিস মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল করে তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ দু'টি- ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, তাই এ দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য সম্ভারই উদ্দেশ্য।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়; বরং এগুলো নিয়ে মশগুল থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েজ নয়, ওয়াজিবও হয়ে যায়; কিন্তু সর্বদা এ সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ বা জিকির হতে গাফিল না করে দেয়। এখানে আল্লাহর জিকিরের অর্থ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, কারো মতে হজ ও যাকাত এবং কারো মতে কুরআন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এখানে জিকিরের অর্থ যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। (কুরতুবী, মা'আরিফ!) আমাদের মতে শেষোক্ত অর্থই অধিক যুক্তি-সঙ্গত এবং গ্রহণীয়। কারণ সবই তো আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

মোদ্দাকথা, সাংসারিক কাজে এভাবে মাশগুল হয়ে যাওয়া যার কারণে আল্লাহকেই ভুলে যায়, ফরজ, ওয়াজিব কার্যে বিঘ্ন ঘটে, একজন মু'মিনের জন্য তা কখনো উচিত নয়। সে কারণে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'যারা সাংসারিক কাজে মাশগুল হয়ে আল্লাহর জিকির হতে গাফিল হয়ে পড়ে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنْفِقُوْا ... اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যে রিজিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর- তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে।' অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে আল্লাহর পথে অর্থাৎ যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করো। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, তার অর্থ 'জাকাত আদায় করো মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে।' কারণ মৃত্যু এসে গেলে তখন আল্লাহর পথে দান করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। সেই অবস্থায় আফসোস করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَيَقُوْلُ رَبِّ .... مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : মৃত্যুর ঘণ্টা বাজার পর যারা আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করেনি, তারা কি বলবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর একটু অবকাশ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'

অর্থাৎ মৃত্যু এসে পড়লে সকলেই আবারও সময় চাইবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে যে, সময় পেলে সদকা করবো এবং নেককার বনে যাবো। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, সব সীমালঙ্ঘনকারীই মৃত্যু আসলে লজ্জিত হয়ে পড়বে এবং অতীতের ভুল

শোধরাবার জন্য আরো সময় চাইবে। কিন্তু আফসোস! কোনো সময়ই তাদেরকে আর দেওয়া হবে না। তাদেরকে জবাবে বলা হবে, 'যখন কারো মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন আল্লাহ তাকে কখনো অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন।'

এখানে মৃত্যু আসার পূর্বে দান-সদকা করতে, ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ করার মতো সম্পদ রয়েছে, অথবা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো ধন-সম্পদ রয়েছে; কিন্তু সে হজ করল না, জাকাত দিল না, যখন তার মৃত্যু আসবে তখন সে পুনর্বার সময় চাইবে। এ কথা শুনে এক লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -কে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো (যা ইচ্ছা তা মনগড়া বলো না) সময় চাইবে তো কাফেররা! তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমার বক্তব্যের পক্ষে তোমাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করছি। এই বলে তিনি পড়লেন– وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ. –[সাফওয়া]

اِنْفَاقِ مَالْ -এর বর্ণনা পৃথকভাবে করার কারণ : আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ মা'আরিফ গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন–

১. আল্লাহ এবং তার আহকামগুলো অনুসরণে থেকে মানুষকে বিরত ও গাফেল রাখার কারণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান কারণ হলো "ধন-সম্পদ" তাই যে সকল ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা হয় যথা– জাকাত, হজ ইত্যাদি সে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করো, তবে ধ্বংস হবে না, আল্লাহর স্মরণ হতে বঞ্চিত থাকবে না। কারণ সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা বালা-মসিবত হতে রক্ষা পাওয়া যায়, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ সদকা বালা-মসিবত দূর করে এবং আল্লাহর গজব হতে রক্ষা করে।
২. দ্বিতীয় কারণটি হলো, মৃত্যুর নিশানা প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তে তা কারো ধারণা থাকে না, অথবা কারো শক্তির আওতাভুক্ত থাকে না যে, সে কাজা নামাজ অথবা রোজা ইত্যাদি আদায় করে নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অথবা, তার উপর ফরজ হজ কার্যটি সে এখন করে নিবে; বরং একমাত্র ধন-সম্পদ তখন তার সম্মুখে হাজির থাকে এবং তার এ বিশ্বাস নির্ঘাত এসে যায় যে, এ মাল তার এখনই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন তার হয়তো এ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হাতের মালগুলো ব্যয় করে হলেও ইবাদতে মালী-এর [অনাদায়ী] গুনাহ হতে পরিত্রাণ অর্জন করবে। তা اِنْفَاقِ مَالْ -কে পৃথকভাবে বিশেষ একটি ইবাদতের দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ : উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব ছিল, অথবা হজ ফরজ ছিল তা সে কিছুই আদায় করতে পারেনি। মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার সময় সে আল্লাহ তা'আলার সমীপে এ আকাঙ্ক্ষা জানাবে যে, হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াতে কিছু দিনের জন্য পুনরায় ফিরে যেতে চাই, তবে আমি সদকা-খয়রাত করবো এবং তোমার ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে পবিত্র হয়ে যাবো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ كُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ : অর্থাৎ আমাকে কিছু সময় দিলে এমন কতগুলো কাজ করবো, যাতে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ফরজ ওয়াজিব ইত্যাদি যা অনাদায়ী রয়ে গেছে তা পূরণ করে নির্ভীক হয়ে যাবো। তবে আল্লাহ তা'আলা কাউকেও কখনো তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়সীমা উপস্থিত হওয়ার পর জীবিত রাখবেন না; কারণ আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের সর্ব কাজের খবর রাখেন।

তাই কবি বলেছেন– در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری * وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگاری

অর্থাৎ যৌবনকালে তওবা করা পয়গাম্বরী নিশানা এবং অভ্যাস, আর বৃদ্ধকালে জালিম বাঘের শক্তি নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সে পরহেজগার হয়ে যায়।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ : সূরা আত্-তাগাবুন

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরায় বর্ণিত নয় নং আয়াত ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ -এর تَغَابُنْ শব্দ হতে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে। আর ধোঁকা বা প্রতারণা সাদৃশ্য হবে কিয়ামতের দিন, অর্থাৎ সেদিন ঈমানদারগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলো কাফেররা দখল করবে। অথবা তার বিপরীত হবে, আপাত দৃষ্টিতে তখন তা ধোঁকা বলে মনে হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কেও অত্র সূরায় রয়েছে। সে একটি বিষয়ের উপর পূর্ণ সূরার নাম করা হয়েছে। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ১৮টি আয়াত, ২৪১টি বাক্য এবং ১০৭০টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটির অবতীর্ণ কাল : হযরত মুকাতিল ও কালবী (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদীনায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, শুরু হতে ১৩নং আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী আর ১৪নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মাদানী; কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ পূর্ণ সূরাটিই মাদানী, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে তার নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলে একটা ধারণা এই হয় যে, সম্ভবত তা হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়ে থাকবে। এ কারণেই হয়তো তাতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এক : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের আলোচনার পর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে আর যারা তাঁকে স্বীকার করে না,তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আবার আল্লাহর সিফাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে অতীতের লোকদের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে যারা মানুষ নবী হওয়ার কারণে নবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের এ অস্বীকৃতির ফলে তাদের উপর যে আল্লাহর আজাব ও ক্ষোভ পতিত হয়েছিল, পরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তিন : ১১শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরআনের আহ্বান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং তাদের আনুগত্য হতে বিমুখ না হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদির শত্রুতা হতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শেষের দিকে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে দান-সদকা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ : হযরত কালবী, মুকাতিল (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা ও ইয়াসার (র.) বলেন, প্রথম থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কায় এবং বাকি অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে এ সূরা সম্পূর্ণটি মাদানী। তবে মূলত কখন কিভাবে নাজিল হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে যদিও কিছু বলা যায় না তথাপিও তার বিষয়বস্তু নিয়ে গভীর গবেষণা চালালে এ ধারণা জন্মে যে, তা মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হতে পারে। তাই তাতে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকারের সূরা হওয়ার ভাব প্রকাশিত হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) উভয় সূরার সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন যে, সূরা আল-মুনাফিকূনে মিথ্যুক মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতা এবং প্রতারণার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে যে, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ . অর্থাৎ 'আসমান জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন।'

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা। –[কাবীর]

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আত-তাগাবুন মক্কা অথবা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانِى عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৮ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج يُنَزِّهُهٗ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَاَتٰى بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। ل অক্ষরটি অতিরিক্ত। আর প্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَنْ -এর স্থলে অপ্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَا সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য বিবেচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং প্রশংসা তাঁরই নিমিত্ত। আর তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

٢. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط فِىْ اَصْلِ الْخِلْقَةِ ثُمَّ يُمِيْتُهُمْ وَيُعِيْدُهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় কাফের ও কতিপয় মু'মিন সৃষ্টিগতভাবে। অতঃপর তিনি তাদের মৃত্যুদান করেন এবং পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত করেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, তা সম্যকরূপে প্রত্যক্ষকারী।

٣. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اِذْ جَعَلَ شَكْلَ الْاٰدَمِيِّ اَحْسَنَ الْاَشْكَالِ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর তিনি তোমাদের আকৃতিকে উত্তম ও শোভনীয় করেছেন। কেননা মানবজাতিকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।

٤. يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ .

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি সমস্ত কিছুই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর ও প্রকাশ কর তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত তন্মধ্যে গোপন রহস্য ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্য হতে যা কিছু আছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ "فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ" : জমহুর صَادْ এ ضَمَّة দিয়ে فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ পড়েছেন। হযরত যায়েদ ইবনে আলী, আ'মাশ ও আবূ যাইদ (র.) صَادْ-এ كَسْرَه দিয়ে فَاَحْسَنَ صِوَرَكُمْ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلّٰهِ ...... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, ব্যক্তি-বস্তু, জীব-নির্জীব, পদার্থ-অপদার্থ, যতকিছু তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে। রাজত্ব ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব তাঁরই, তাই প্রশংসার অধিকারীও তিনিই। তাঁর শক্তি সর্ববিষয়ে ও সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী হতে মহাকাশের বিস্তৃতি পর্যন্ত যে দিকেই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না কেন, বিবেক-বুদ্ধি যদি তোমাদের থেকে থাকে, জ্ঞানান্ধ যদি তোমরা না হয়ে থাক, সজীবতা যদি তোমাদের মধ্যে বহাল থাকে, তবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, একটি অণু হতে আরম্ভ করে মহাকাশের বিশালাকায় স্থায়ী পথ ও নীহারিকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসই একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ও অবস্থিতির সত্যতার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। উপরন্তু এ সাক্ষ্যও দেয় যে, আল্লাহ সর্বপ্রকার দোষত্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি আর মানবীয় সকল পরিস্থিতি হতে মুক্ত বা পবিত্র। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ-নিষেধসমূহে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার সামান্য দোষ থাকার সম্ভাবনা যদি থাকত, তাহলে এ পূর্ণমানের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্বব্যবস্থা অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না। অনন্তকাল হতে এমন অবিচল ও ব্যতিক্রমহীন পন্থায় তার চলাও সম্ভব হতো না।

সুতরাং গোটা সৃষ্টিজাতির আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা ও বশ্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য। যেহেতু তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক ও বাদশাহ। সকল সৃষ্টি তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকা একান্ত উচিত। কারণ তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তির অধিকারী। তিনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন। তাঁর শক্তিকে কোনো শক্তি ক্ষীণ অথবা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত বা বাধা প্রদান করতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِيْ .... وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন , "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের কেউ মু'মিন।" এ কথাটির চারটি অর্থ হতে পারে এবং এ চারটি অর্থই এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক : তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তোমাদের কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথাকে অস্বীকার করে, আবার কেউ এ মহাসত্য মেনে নিচ্ছে।

দুই : তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা ইচ্ছা করলে কুফরি করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে ঈমানও গ্রহণ করতে পার। কোনো ব্যাপারেই তোমরা বাধ্য নও। আয়াতের শেষ অংশে এ অর্থের সমর্থন রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- "তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ দেখেন।" অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় কুফরি করছ কিংবা ঈমান গ্রহণ করছ আল্লাহ তা'আলা সবই লক্ষ্য করছেন।

তিন : আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ ও সৎ প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি এই হওয়া উচিত ছিল যে, তোমরা সকলে ঈমানের পথ অবলম্বন করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদের কিছু লোক ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, আর কিছু লোক কুফরি করেছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'সব সন্তানই সৎ প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নি-পূজক বানায়।'

চার : আল্লাহ তোমাদেরকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এনেছেন। তোমরা ছিলে না, পরে তোমরা হয়েছ। এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে চিন্তা করলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, তোমাদের এ অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার এক মহা দান। তা চিন্তা করে তোমাদের একদল ঈমান গ্রহণ করেছে। অপর একদল চিন্তা-ভাবনা না করে তাঁকে অস্বীকার করেছে। -[কুরতুবী]

মানুষদেরকে সৃষ্টি করার উপর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি : পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- কাফির ও মু'মিন, এতে প্রতীয়মান হলো যে, সকল আদম সন্তান একই ভ্রাতৃত্ব বিশেষ, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সে ভ্রাতৃত্বের প্রতিফল ও সংখ্যা মাত্র এবং এ ভ্রাতৃত্ববোধকে বিনষ্ট করার একমাত্র কারণ হলো কুফরি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাফির হয়ে গেছে সে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করেছে। বিশ্বের মানুষের মধ্যে পৃথকতা সৃষ্টি হয়েছে ঈমান ও কুফরির কারণেই। ভাষা, রং, বংশ, গোত্র, দেশ ইত্যাদির কোনো কিছুই মানুষকে পৃথক করার মূল কারণ হতে পারে না। একমাত্র মতবাদই পৃথক করতে সক্ষম।

অজ্ঞ যুগের বংশ ও গোত্রের পার্থক্য পার্টিগত ও দলগত বিভক্তির একমাত্র কারণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে দেশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণেও মানুষ বিভিন্নতর মতবাদে পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল পার্থক্যকে চিরতরে ভঙ্গ করে দিয়েছেন। মুসলমানদের দেশ ও জাতি, রং-রূপ, উঁচু-নীচু ভেদে সকলকে এক সারিতে সারিবদ্ধ করে দিয়েছেন. যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে সকল মুসলিম ভাই ভাই।' তদ্রূপভাবে اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ কাফিরগণও যে দেশ ও যে গোত্রের হোক না কেন, প্রত্যেক দলই একই সম্প্রদায় ভুক্ত।

পবিত্র কালামের উক্ত আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারী যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে কাফের ও মু'মিন এ দু' প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তাদের ভাষা ও রং -এর বিভিন্নতাকে কুরআনুল কারীম আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের বহু উপকরণ হিসাবে রেখে এক বিশেষ নিয়ামতের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাকে আদম সন্তানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়নি। ঈমান ও কুফরির দিক দিয়ে দু'সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হওয়া এটা একটি أَمْرٌ اِخْتِيَارِيٌّ কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টি أَمْرٌ اِخْتِيَارِيٌّ যদি কেউ একটি মতবাদ ত্যাগ করত অপর একটি মতবাদে প্রবেশ করতে চায়, তবে অতি সহজেই তার পক্ষে তা সম্ভব হবে। তবে বংশ, রং, ভাষা এবং দেশ পরিবর্তন করা তার একা খুশিমতেই সম্ভব নয়। অথবা, তার ইচ্ছাধীন সম্ভব নয়। তবে ভাষা ও দেশ পরিবর্তন করা যদিও সম্ভব, তথাপিও নিজ বংশ মর্যাদার পরিচয় বিসর্জন অথবা রং পরিবর্তন সম্ভব হয় না, স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়সমূহ অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের দেশে স্থান দান করা মোটেই সহ্য করে না, যদিও সে সেই (পরদেশের) ভাষা বলে অথবা তথায় বসবাস রত থাকুক না কেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ : "তিনি সৃষ্টি করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে।" এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে।

এক. তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সত্যই সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুই. এখানে بَاء হলো لَامْ -এর অর্থে। অর্থাৎ তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা সৎকর্ম করবে তাদেরকে সৎ প্রতিদান এবং যারা কুকর্ম করবে তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য। -[কুরতুবী]

আল্লামা শওকানী (র.) এতদ্ব্যতীত আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হলো 'তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ হিকমত সহকারে।'

قَوْلُهُ تَعَالَى وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اَلْاٰيَة : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং অতীব উত্তম বানিয়েছেন।"

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সম্মানিত করে আল্লাহ তা'আলা এত সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, সমস্ত মানবজাতি। সমস্ত মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা এত সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতি গ্রহণ করতে চায় না। মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মতো না করে দু' পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, তাকে এমন আকার-আকৃতি দান করেছেন যে, সে নিজেকে অন্য কোনো আকৃতিতে দেখতে চায় না।
-[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

কেউ কেউ বলেছেন, صُوْرَة তথা আকার-আকৃতি বলতে কেবলমাত্র বাহ্যিক চেহারই বুঝায় না; বরং মানুষের সমস্ত দৈহিক ও আঙ্গিক সংগঠন এবং এ দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যেসব শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা সবই এখানে বুঝাতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিশ্বলোকে সৃজন করেছেন এবং তাদের জীবনের নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত করেছেন। আর সে সময়ের জন্য প্রত্যেককে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য যুগে যুগে পয়গাম্বরগণকে পাঠিয়ে তাদেরকে সচেতন করেছেন। সুতরাং জীবনের শেষ প্রান্তে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে সকল হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন-

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ـ وَإِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ - وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ প্রত্যেকেই আল্লাহর সমীপে হাজির হতে হবে, আল্লাহর নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। অচিরেই তোমাদের সহজ হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى মানুষ কি মনে করে যে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?

আদম সন্তানদেরকে প্রথম দিনেই [রোযে আযলে] ৪ প্রকার সৃষ্টি করেছেন–

(١) خَلَقَ سَعِيْدًا فِى الْاَزَلِ وَيَظْهَرُ مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ عَلَيْهِ ـ

১. রোযে আযলেই তাকে নেককার করে সৃষ্টি করেছেন, মু'মিন হিসাবে দুনিয়াতে বসবাস করবে এবং মু'মিন হিসাবে মারা হবে।

(٢) كُتِبَ شَقِيًّا فِى الْاَزَلِ فَيَعِيْشُ كَافِرًا وَ يَمُوْتُ كَذٰلِكَ ـ

২. রোযে আযলেই বদবখত হিসাবে সৃজীত, কাফের হিসাবে জীবন যাপন করবে। কাফের হিসাবেই মৃত্যুবরণ করবে।

(٣) كُتِبَ سَعِيْدًا فِى الْاَزَلِ فَيَعِيْشُ كَافِرًا وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْاِيْمَانِ وَهٰذِهِ الثَّلَاثَةُ كَثِيْرَةُ الْوُقُوْعِ ـ

৩. নেককার হিসাবেই রোযে আযলে তার ভাগ্য নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাফেরের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। ঈমানদার হিসাবে ইন্তেকাল করবে। এ তিন প্রকৃতির লোক অধিক হবে।

(٤) وَشَخْصٌ يَعِيْشُ مُؤْمِنًا وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْكُفْرِ ـ

৪. ঈমানদার হিসাবে জীবন-যাপন করবে, কাফের হয়ে ইন্তেকাল হবে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) –[সাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ مَا فِى .... بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন কর আর যা কিছু প্রকাশ কর তা সবই তিনি জানেন। তিনি অন্তরসমূহের অবস্থাও জানেন।" অর্থাৎ এ বিশ্বলোকের এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। মানুষ যা প্রকাশ্যে করে, আর যা গোপনে করে সবই তাঁর জ্ঞাত। কোনো কিছুই তাঁর জানা বাহির্ভূত হতে পারে না। তিনি অন্তরের গোপন রহস্যসমূহ সম্বন্ধেও অবগত। সুতরাং তোমরা মানুষরা কিভাবে ভাবতে পার যে, তোমাদের প্রকাশ্য আমল সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ থাকবেন? তোমাদের আমল তাঁর কাছে গোপন থাকবে? –[সাফওয়া]

এ সত্যতা এবং বাস্তবতা যখন মানুষ জানতে পারে তখন সে নিজেকে ছোট ও হেয় মনে করে। কারণ মানুষ এ বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডের প্রকাশ্য অল্প-কিছু বিষয় সম্বন্ধেই কেবল জানে, বাকি সব রহস্য তার কাছে অজানা থাকে; কিন্তু আল্লাহর কাছে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না–তিনি সবই জানন। যেমনি তিনি মানুষ যা গোপনে করে আর যা প্রকাশ্যে করে সবই জানেন। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকা যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে নাফরমানি অবস্থায় দেখতে না পান। ফাসেকী ও ফাজেরীতে না দেখেন। –[রূহুল কোরআন]

৫. اَلَمْ يَأْتِكُمْ يَا كُفَّارُ مَكَّةَ نَبَأُ خَبَرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ عُقُوْبَةَ كُفْرِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ـ

৬. ذٰلِكَ اَىْ عَذَابُ الدُّنْيَا بِاَنَّهُ ضَمِيْرُ الشَّاْنِ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ عَلَى الْاِيْمَانِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط عَنْ اِيْمَانِهِمْ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ عَنْ خَلْقِهٖ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِىْ اَفْعَالِهٖ ـ

অনুবাদ :

৫. তোমাদের নিকট কি আগমন করেনি? হে মক্কাবাসী কাফেরগণ। বৃত্তান্ত সংবাদ পূর্ববর্তী কাফেরগণের। তারা তাদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছিল দুনিয়াতে তাদের কুফরির পরিণাম ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক।

৬. এটা পার্থিব শাস্তি এ জন্যই যে, সর্বনামটি ضَمِيْرُ الشَّاْنِ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করতেন ঈমান সম্পর্কিত প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণসহ। তখন তারা বলত, তবে কি মানুষই তা দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য করা হয়েছে আমাদেরকে পথের সন্ধান দান করবে? অতঃপর তারা কুফরি করল ও বিমুখ হলো ঈমান আনয়ন করা হতে। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তাদের ঈমান হতে আর আল্লাহ অভাবমুক্ত তাঁর সৃষ্টি হতে প্রশংসিত তাঁর কার্যাবলিতে প্রশংসিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَبَشَرٌ يَهْدُوْنَنَا : اَبَشَرٌ শব্দটি আরবি তারকীবে مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। কেউ কেউ তার مَرْفُوْع হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, اَبَشَرٌ শব্দটি একটি فِعْل مَحْذُوْف-এর فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। -[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ يَأْتِكُمْ ....الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ইতঃপূর্বে যারা কুফরি করেছে এবং তারপর নিজেদের কুকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে, তাদের কোনো খবর তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি? তাদের জন্য (পরকালেও) যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা তাদের নিজেদের কুকর্মের যে তিক্ত ফল ভোগ করেছে তা তাদের অপরাধের আসল শাস্তি ছিল না, পূর্ণ শাস্তিও ছিল না। আসল ও পূর্ণ শাস্তি তো তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে; কিন্তু দুনিয়াতে তাদের উপর যে আজাব এসেছে, তা হতে লোকেরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যেসব জাতি নিজেদের মা'বূদের বিরুদ্ধে কুফরিমূলক আচরণ অবলম্বন করেছে তারা ক্রমাগতভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন ও মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে।

وَبَالٌ-এর অর্থ :

اَصْلُ الْوَبَالِ الثِّقْلُ وَمِنْهُ الْوَبِيْلُ لِطَعَامٍ يَثْقُلُ عَلَى الْمِعْدَةِ وَالْوَابِلُ الْمَطَرُ الثَّقِيْلُ الْقِطَارُ اُسْتُعْمِلَ الْعُقُوْبَةَ لِاَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَى الْاِنْسَانِ ثِقْلًا مَعْنَوِيًّا ـ

মূলত ওয়াবাল অর্থ কঠিনতা, তা হতে বলা হয় وَبِيْل অর্থাৎ যে সকল খাদ্য হজম করা অত্যন্ত কঠিন, وَابِلٌ অর্থ- মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া। এখানে وَبَالٌ বলে শাস্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ শাস্তি যদিও বোঝা নয় তবুও রূপক অর্থে তা মারাত্মক বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالَى ذٰلِكَ بِأَنَّهُ ...... بِالْبَيِّنٰتِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন এ জন্য হয়েছে যে. তাদের নিকট তাদের নবী-রাসূলগণ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা বলেছে মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত দিবে নাকি? এভাবে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন আল্লাহও তাদের ব্যাপারে বে-পরোয়া হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ তো স্বতই পরোয়াহীন ও স্বীয় সত্তায় সুপ্রশংসিত।"

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا আয়াতে بَشَرٌ শব্দটি একবচন হলেও জিনস হিসেবে বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কুরআনের স্থানে স্থানে এ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, পরিতাপের বিষয় এখন মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয় এবং রিসালতের উচ্চ মর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূর এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল। -[মা'আরিফ]

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো একবার পড়ুন।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ : ١١٠)
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ـ (بَنِيْ اِسْرَائِيْل : ٩٣)
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ـ (اَلْبَرَاءَةُ : ١٤٨)

হাদীস শরীফে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজে ভুল হয়ে গেলে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, নামাজ কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘটনা অবহিত করার পর তিনি বললেন-

لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ : ٣١)

অর্থাৎ নামাজের ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করা হলে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম; কিন্তু আমিও তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যেরকম ভুলে যাও, ঠিক তেমনি আমিও ভুলে যাই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا : فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا -এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। এখানে দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক. 'তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।' অর্থাৎ রাসূলগণ যখন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন তখন তারা মানুষ বলে তাঁদেরকে রাসূল ও নবী বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করল। তারা মনে করত, মানুষ আবার রাসূল হবে কিভাবে? রাসূল হতে হলে মানুষ না হয়ে অন্য কোনো পবিত্র কিছু হতে হবে।

দুই. তখন তারা তাদের এ উক্তি (যে, 'মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত দিবে না কি?') দ্বারা কাফির হয়ে গেল। অর্থাৎ এই বলে রাসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের হয়ে গেল। -[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, কুরতুবী]

নবুয়ত ও বাশারিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য : بَشَرِيَّة আর নবুয়তের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, نُبُوَّة ـ بَشَرِيَّة -এর জন্য لَازِم নয়; বরং بَعْضُ الْبَشَرِ نَبِيٌّ وَاَكْثَرُ الْبَشَرِ لَيْسَ نَبِيٌّ -এর জন্য بَشَر ও نُبُوَّة নয় আবার مُنَافِيْ

কাফেরদের বাতিল ধারণা এই ছিল যে, نُبُوَّتْ ও رِسَالَتْ মানুষের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে না। এটা সত্য নয়। তবে আফসোসের বিষয় হলো, কিছু সংখ্যক মানুষ নবীদের ও রাসূলদেরকে بَشَرِيَّة হতে خَارِجْ মনে করে থাকেন। وَهٰذَا زَعْمٌ بَاطِلٌ তাও বাতিল ধারণা, কেননা স্বয়ং নবী করীম ﷺ বলেছেন- اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তবে পার্থক্য হলো যে, তোমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় না, আর আমার নিকট প্রেরণ করা হয়।

সুতরাং যারা نَبِيْ গণকে بَشَرْ বলে স্বীকার করেন না তাদেরকে এ বিবেক খরচ করা উচিত যে, মানুষের জন্য نُبُوَّة নিষিদ্ধ নয়, রিসালাতও নিষিদ্ধ নয়। আর রাসূল নূরের তৈরি, বরং রাসূল আল্লাহর নূর এবং রাসূলও বটে। তবে তাদের নূরকে সূর্য ও চেরাগের নূরের সাথে তুলনা করা মারাত্মক ভুল হবে। বলতে হবে তিনি نُوْرٌ مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ আল্লাহর নূরের অংশমাত্র। তাঁকে সে নূরের সংমিশ্রণে মানুষ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

অনুবাদ :

৭. زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُمْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ .

৭. কাফেরগণ ধারণা করে যে, اَنْ মুখাফ্ফাফা, তার اِسْم উহ্য অর্থাৎ اَنَّهُمْ তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর তা আল্লাহর পক্ষে অতিশয় সহজ।

৮. فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الْقُرْاٰنِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৮. অতএব, তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি আর সে জ্যোতির প্রতি কুরআন যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৯. اُذْكُرْ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط يَغْبِنُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ بِاَخْذِ مَنَازِلِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ فِى الْفِعْلَيْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

৯. স্মরণ কর যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সমাবেশ দিবসের জন্য কিয়ামতের দিন এটাই লাভ-লোকসানের দিন মু'মিনগণ কাফিরদেরকে লোকসানে ফেলে দিবে, বেহেশতে তাদের নিবাস ও স্ত্রীদেরকে অধিকার করে নেওয়ার মাধ্যমে, যা তারা ঈমান আনয়নের মাধ্যমে লাভ করতে পারত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করে দিবেন, আর তাকে প্রবিষ্ট করবেন অপর এক কেরাতে نُدْخِلْ ও نُكَفِّرْ উভয় ফে'লই নূনযোগে অর্থাৎ صِيْغَه مُتَكَلِّمْ-এর সাথে পঠিত হয়েছে। জান্নাতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিণীসমূহ প্রবাহিত, তারা তথায় চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহান সাফল্য।

১০. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِىَ .

১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে কুরআনকে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় চির অবস্থানকারী আর কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র তা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ : ইমাম যুজাজের মতে, لَتُبْعَثُنَّ ক্রিয়াই তার عَامِلْ তাফসীরে কাশশাফে لَتُنَبَّؤُنَّ-কে তার عَامِلْ বলা হয়েছে। অনেকেই خَبِيْر-কে তার عَامِلْ মনে করেছেন, কারণ তাতে তিরস্কারের অর্থ রয়েছে। যেন বলা হয়েছে وَاللّٰهُ مُعَاقِبُكُمْ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন তার عَامِلْ লুপ্ত রয়েছে। আর তা হলো اُذْكُرْ

–[ফাতহুলকাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ يَجْمَعُكُمْ : জমহুর يَجْمَعُكُمْ -এর يَا، তে فَتَح দিয়ে আর عَيْن -এ ضَمَّة দিয়ে পড়েছেন। আবূ আমর হতে এক বর্ণনায় عَيْن -কে سَاكِن করে পড়ার কথা জানা যায়। তবে تَخْفِيْف করা ছাড়া তার অন্য কোনো কারণ দেখা যায় না। এ تَخْفِيْف ও এখানে অপ্রয়োজনীয়। হযরত যায়েদ ইবনে আলী, শা'বী, ইয়াকূব ও নসর ইবনে আবী ইসহাক এবং জুহদারী (র.) يَجْمَعُكُمْ -এর পরিবর্তে نَجْمَعُكُمْ পড়েছেন।

قَوْلُهُ "يُكَفِّرْ وَيُدْخِلْهُ" : জমহুর উভয় শব্দ يَا، দ্বারা অর্থাৎ يُكَفِّرْ ও وَيُدْخِلْهُ পড়েছেন। নাফে' এবং ইবনে আমের উভয় স্থানে نُوْن দিয়ে نُكَفِّرْ ও وَنُدْخِلْهُ পড়েছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِيْنَ .... عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফেরদের দাবি ছিল যে, তাদেরকে কখনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে এ কারণেই বলেছেন যে, হে রাসূল! আপনি সে দুরাত্মা পাপাচারীদেরকে এ কথা বলে দিন যে, তোমরা যা ভাবনা করছ, তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ধারণা। তবে আমি আমার প্রভুর শপথ করে বলছি। তোমরা শুনে নাও, তোমরা জেনে নাও নিঃসন্দেহে তোমদেরকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে।

অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমরা কে কখন কি কি কাজ করে কি অর্জন করেছ। তোমরা পরকালকে অস্বীকার করলে চলবে না। অথচ যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সে মানুষদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়, বরং একেবারেই সহজসাধ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাদের এ ধারণাও কোনো যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে

وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۔ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - (يُوْنُس ٥٣)

আবার সূরা সাবায় বলা হয়েছে− وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ الخ - (سَبَا ٣)

পরকালে অবিশ্বাসীকে কসম করে পরকালের খবরদানের উপকারিতা : যে লোক পরকাল অস্বীকার করে, তাকে কসম করে পরকালের সংবাদদানে লাভ কি? এ কসমের কারণে সে কি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে যাবে?

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, নবী করীম ﷺ এমন লোকদের সামনে কথা বলেছেন, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানত যে, এ লোকটি সারা জীবনে কখনই মিথ্যা কথা বলেনি। এ কারণে মূলত তারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যত মিথ্যা কথাই প্রচার করুক না কেন, এরূপ সত্যবাদী ব্যক্তি আল্লাহর নামের কসম খেয়ে কখনো এমন কথা বলতে পারেন, যার প্রকৃত সত্য হওয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় নেই। এ রকম কথা তারা অন্তরে ধারণা পর্যন্ত করতে পারত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নবী করীম ﷺ কেবল পরকাল বিশ্বাসের কথাই বর্ণনা করছেন না; বরং সে জন্য তিনি অতীব অকাট্য দলিল-প্রমাণও পেশ করতেন; কিন্তু নবী ও অ-নবীর মধ্যে তো পার্থক্য আছে। এ পর্যায়ের বড় পার্থক্য হলো, একজন অ-নবী পরকালের সত্যতা পর্যায়ে যতটা অকাট্য দলিলই দিক না কেন তার সর্বাধিক লাভ এই হতে পারে যে, তার কারণে পরকাল না হওয়ার তুলনায় হওয়ার সম্ভাব্যতা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অধিক বিশ্বাস্য মনে হতে পারে; কিন্তু নবীর ব্যাপারটি এটা হতে ভিন্নতর, তাঁর স্থান একজন দার্শনিকের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হয়ে থাকে। নবীকে নিছক বিবেক-বুদ্ধিগত দলিল-প্রমাণের সাহায্যে পরকাল হওয়ার কথা বিশ্বাস করতে হয় না; বরং নবী তো পরকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং তা যে হবেই তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই বলতে পারেন। এ কারণেই একজন নবীই কসম করে এরূপ কথা বলতে পারেন, একজন দার্শনিক যুক্তিবাদী এ জন্য কসম খেতে পারেন না। কারণ তাতে কোনো লাভ নেই। −[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর এরূপ [পুনরুজ্জীবিত] করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।' অর্থাৎ এ বিশ্বলোক এবং তার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যার পক্ষে কঠিন হয়নি, আর যার পক্ষে এ দুনিয়ার মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন ছিল না; এ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করা ও তার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ করা তাঁর পক্ষে কেন অসম্ভব হবে? তার পরকাল হওয়ার দ্বিতীয় দলিল। −[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ ...... اَنْزَلْنَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতএব ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে নূরের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।'

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, পরকালীন জীবন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর বলা হয়েছে- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর নাজিলকৃত নূর তথা কুরআনের প্রতি ঈমান আনো, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পরকালীন জীবনে সুখ-শান্তি এবং মুক্তি চাইলে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে। অতঃপর وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ বলে বলা হয়েছে যে, কেবল মুখের ঈমান যথেষ্ট নয়, তার সাথে সাথে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমলও করতে হবে। ঈমানের দাবি অনুযায়ী তোমরা আমল করছ, না ঈমানের পরিপন্থি আমল করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবহিত।

এখানে পবিত্র কুরআনকে রূপকভাবে নূর বা আলো বলা হয়েছে, কারণ আলোর মাধ্যমে যেমন চতুষ্পার্শ্বের জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পবিত্র কুরআন দ্বারা গোমরাহীর অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

-[রূহুল কোরআন, কাবীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا আয়াতের ফায়দা : وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে (নূর) বলেছেন, কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ শেষ শরিয়তের বিধিবিধান সম্বলিত গ্রন্থ বাস্তবিক পক্ষে তৎপূর্ববর্তী বিধি-বিধান অপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যাতে কোনো কিছুই অস্পষ্ট নয়; বরং সর্ব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত كَمَا قَالَ تَعَالٰى هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ আর মূলত তা কুফর ও শিরক -এর যাবতীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে দেয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ সূর্য যেভাবে বিশ্বজগতের সব কিছুর উপর আলোক দান করে থাকে সেভাবে মুহাম্মদ ﷺ অর্থাৎ خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ -এর রিসালত দ্বারা তিনি সকল মানবজাতিকে হেদায়েতের নূরে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। আর যাদের রূহানী চক্ষু রয়েছে তাদের জন্য কুরআন নূর স্বরূপ কাজ করেছে। আর যাদের জন্য অন্তরচক্ষু নেই তাদের জন্য কুরআন নূর স্বরূপ কাজ করছে না। যেমন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)ও হুযূর ﷺ-কে সূর্য বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْاٰفَاقِ شَمْسٌ * وَشَمْسِىْ اَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ
فَاِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الصَّبَاحِ * وَشَمْسِىْ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অর্থাৎ 'আমার একটি সূর্য রয়েছে' আকাশেরও একটি সূর্য রয়েছে; তবে আকাশের সূর্য অপেক্ষা আমার সূর্য অতি উত্তম। আর আকাশের সূর্য উদিত হয় সুবহে সাদিকের পরপর; কিন্তু আমার সূর্য উদিত হয় ইশার নামাজের পর।' কারণ হাদীসে বলা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইশার নামাজের পর اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتٌ (رض) -এর কামরায় যেতেন এবং ইশার নামাজান্তেই সোহবত করতেন। অন্যান্য হাদীসে আরও এরূপ বহু বর্ণনা রয়েছে। আর পবিত্র কালামে মূলত রূপক অর্থে নূর বলা হয়েছে। কারণ বাতি হতে যেমনিভাবে আলোক পাওয়া যায়, তেমনিভাবে কুরআন হতে হেদায়েতের আলো পাওয়া যায়, যা অনুসারে জীবন পদ্ধতি পাওয়া যায়। -[রুহুল কোরআন, কাবীর, ফতহুল কাদীর]

আর নূর (نُوْرٌ) -এর হাকিকত এই যে, তা নিজে আলোকিত ও ظَاهِرْ এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম, কুরআন গ্রন্থটি স্বয়ং اِعْجَازْ হওয়ার কারণে رَوْشَنْ এবং ظَاهِرْ হওয়া স্পষ্ট কথা, তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ এবং আহকামে শরীয়াহ ও حَقَائِقِ عِلْمِ اٰخِرَتْ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগুলো পবিত্র কুরআন দ্বারা رَوْشَنْ ও স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই কুরআনকে نُوْر বলা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যখন একত্রিত হওয়ার দিন তিনি তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন।"

এখানে কিয়ামতের দিনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এক. "একত্রিত হওয়ার দিন।" **দুই.**"পরস্পরের হার-জিতের দিন।" কিয়ামত দিবসকে একত্রিতকরণের দিন বলা হয়েছে এ কারণে যে, প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সকলকে একই সময়ে জীবিত করে সেদিন একত্রিত করা হবে। কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ কথাটি অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যেমন- সূরা হুদ-এ বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ .

"সেদিনটি হবে এমন, যাতে সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে। অতঃপর সেদিন যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সম্মুখেই সংঘটিত হবে।" -[সূরা হুদ : ১০৩]

সূরা ওয়াকিয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ إِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ . অর্থাৎ "তাদেরকে বল, পূর্বে অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষকে নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা হবে।
-[সূরা ওয়াকি'আহ্ : ৪৯-৫০]

আর পরস্পর হার-জিতের দিন বলা হয়েছে এই কারণে যে, কিয়ামত দিবসে কাফেরগণ তথা নবুয়তে অস্বীকারকারীগণ নবুয়ত স্বীকারকারী ও আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সামনে হেরে যাবে। সেদিন এমন হারা হারবে যার পূর্ণতা বিধান আর কোনো দিন সম্ভব হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, একদল লোককে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে, অপর একদল লোক সেদিন জান্নাতে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত ভোগ করবে। তাই হলো তাগাবুন বা পরস্পর হার-জিত।

يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে- يَوْمُ التَّغَابُنِ নামকরণের কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীরের ইমামগণ বলেন, يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে- يَوْمُ التَّغَابُنِ -কে এ নামে ভূষিত করার কারণ হচ্ছে- সে غَبْن ও حَسْرَتْ কেবল কাফের ও ফাসিকগণই করবে না; বরং ঈমানদার নেক ব্যক্তিগণও এ মর্মে আক্ষেপ ও আফসোস করবে যে, হায়! যদি আমরা আরও অধিক পরিমাণে নেক আমল করতাম তবে বেহেশতে আরও উন্নতমানের ব্যবস্থাসমূহ পেতাম, কেননা আমরা জীবনে বহু সময় বৃথা কাটালাম। যথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اَلْحَدِيْثُ)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে- يَوْمُ التَّغَابُنِ এ কারণে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের স্বল্পতার উপর আফসোস করবে। যেভাবে আল্লাহ সূরা مَرْيَمَ এ- বলেছেন وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ রূহুল মা'আনীতে এর তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, সেদিন জালিম ও গুনাহগার লোকগণ নিজ নজ কৃতকর্মের উপর আক্ষেপ করবে, ঈমানদার নেককারগণ ইহসান -এর ক্ষেত্রে যে কমতি করেছেন তার উপর আফসোস করবে, তদ্রূপভাবে কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের স্বল্পতার উপর আফসোস করতে থাকবে। তাই يَوْمُ التَّغَابُنِ বলে কিয়ামতের দিনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করে থাকে ও নেক কাজ করে থাকে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ সব ঝেড়ে ফেলবেন এবং তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে সর্বদা বিভিন্ন প্রকার নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। এ সকল লোকেরা এতে সর্বদা বসবাস করতে থাকের। এটাই হলো তাদের বড় সাফল্য অর্জন।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন অর্থ "কেবল আল্লাহ এক আছেন" এ কথাই নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ ও নীতি অনুসারে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ ঈমানে মুফাসসাল আনতে হবে। এরূপ-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

অথবা, ঈমানের সমস্ত لَوَازِمَاتْ বা উপকরণগুলো পালন করতে হবে। অনুরূপভাবে নেক আমল করার অর্থ, শরিয়তভিত্তিক যা নেক আমল বলে গণ্য হবে, তাই করতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যেসব লোক কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা দোজখের অধিবাসী হবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনের স্থান।"

অর্থাৎ যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং অন্যান্য যেসব জিনিসের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য সেসবকে অস্বীকার করেছে। আর "আয়াতসমূহ" অর্থাৎ আল্লাহর, অস্তিত্বের, রাসূলের সত্যতার, পরকাল হওয়ার এবং কুরআনের ঐশীগ্রন্থ হওয়ার দলিল-প্রমাণসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অথবা, যারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহে যে বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন উদ্ধৃত হয়েছে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তাদেরকে দোজখের অধিবাসী হতে হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের এ পরিণাম হবে অতি খারাপ ও দুঃখময়। -[সাফওয়া, রূহুল কোরআন]

আল্লাহ তা'আলা এখানে নেককার আর বদকার উভয় শ্রেণির লোকের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, উপরে যে হার-জিতের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এ হার-জিত হবে ঈমান আর কুফরির কারণে। প্রথম শ্রেণিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করানো হবে এবং তাকে চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানানো হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١١. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِقَضَائِهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ فِىْ قَوْلِهِ اِنَّ الْمُصِيْبَةَ بِقَضَائِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ط لِلصَّبْرِ عَلَيْهَا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

১১. কোনো বিপদ আপতিত হয় না, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর ফয়সালায় আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তার এ উক্তিতে যে, বিপদাপদ আল্লাহর ফয়সালায় আসে। তিনি তার অন্তরকে পথ নির্দেশ দান করেন তদুপরি ধৈর্য ধারণে আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

١٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ.

১২. আর আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। অনন্তর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টরূপে প্রচার করা প্রকাশ্যভাবে।

١٣. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

১৩. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং মু'মিনগণের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

١٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج بِاَنْ تُطِيْعُوْهُمْ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْخَيْرِ كَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ فَاِنَّ سَبَبَ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ الْاِطَاعَةُ فِىْ ذٰلِكَ وَاِنْ تَعْفُوْا عَنْهُمْ فِىْ تَثْبِيْطِهِمْ اِيَّاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مُعْتَلِّيْنَ بِمَشَقَّةِ فِرَاقِكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণের মধ্য হতে তোমাদের শত্রু আছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করো জিহাদ ও হিজরত ইত্যাদি পুণ্য কাজ হতে বিরত থাকার প্রশ্নে তাদের মতামত মান্য করার ক্ষেত্রে। কারণ এরূপ মতামত মান্য করার প্রসঙ্গই অত্র আয়াতের শানে-নুযূল। আর যদি তোমরা মার্জনা কর তাদের তোমাদেরকে ঐ সকল পুণ্য কাজে বাধাদানের অপরাধ, তাদের বিয়োগ ব্যথা ও বিচ্ছেদ কষ্ট স্বীকারের প্রতি সদয় হয়ে আর তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

١٥. اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط لَكُمْ شَاغِلَةٌ عَنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَلَا تَفُوْتُوْهُ بِاشْتِغَالِكُمْ بِالْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ.

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততিগণ তো পরীক্ষা তোমাদের জন্য, যা তোমাদেরকে আখেরাতের পুণ্য কাজ হতে বিরতকারী। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার অতএব সম্পদ ও সন্তানের মোহে তা হাতছাড়া করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ : فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ হলো شَرْط আর এ শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। যার تَقْدِيْر হলো فَلَا بَأْسَ عَلَى الرَّسُوْلِ আর فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ বাক্যটি جَوَاب مَحْذُوْف-এর عِلَّة বা কারণ। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "يَهْدِ قَلْبَهُ" : জমহুর يَاء তে فَتْح এবং دَالْ-এ كَسْرَه দিয়ে يَهْدِيْ পড়েছেন। হযরত কাতাদাহ, আস্‌সুলামী, যাহ্‌হাক ও আবূ আবদুর রহমান يَاء তে ضَمَّه আর دَالْ-এ فَتْح দিয়ে অর্থাৎ مَجْهُوْل হিসেবে يُهْدَى পড়েছেন। আর হযরত তাল্‌হা ইবনে মুসাররফ, আ'রয, সাঈদ ইবনে জোবাইর, ইবনে হরমুয ও আযরাক يَاء-এর পরিবর্তে نُوْن দিয়ে نَهْدِيْ পড়েছেন। আর হযরত মালিক ইবনে দীনার, আমর ইবনে দীনার এবং ইকরামা يَهْدَأْ অর্থাৎ هَمْزَه سَاكِنَة সহ قَلْبُهُ-কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ عَدُوًّا : এটা তৎপূর্ববর্তী إِنَّ-এর اِسْم হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنَّ اللّٰهَ الخ : তার পূর্বে উল্লিখিত (اِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا) شَرْط-এর جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ "فَاحْذَرُوْهُمْ" : فَاحْذَرُوْهُمْ-এ যে ضَمِيْر রয়েছে তার مَرْجِع হলো, اَلْعَدُوُّ শব্দটি অথবা اَلْاَزْوَاجُ وَالْاَوْلَادُ-তবে একে مَرْجِع হিসেবে গ্রহণ করা হলে বলতে হবে যে, সব স্ত্রী এবং সব সন্তান শত্রু নয়। সুতরাং সব স্ত্রী এবং সন্তান হতে সতর্কও থাকতে হবে না। কেবল যেসব স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণ শত্রু হিসেবে গণ্য হবে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ضَمِيْر-এর مَرْجِع যদি عَدُوٌّ-কে গ্রহণ করা হয়, তখন প্রশ্ন আসে বহুবচন ব্যবহার করা কিভাবে সংগত হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, عَدُوٌّ শব্দটি এক, দুই এবং দুই-এর অধিক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বহুবচনের ضَمِيْر ব্যবহার করা সঙ্গত হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাজিল হয় : মনে রাখতে হবে যে, যে সময় এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল তখন মুসলমানদের জন্য বড়োই দুঃসময় ছিল। নানাবিধ বিপদ-আপদ চারদিক হতে তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলেছিল। মক্কায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁরা এসেছিলেন। আর মদীনায় যে সত্যপন্থি লোকেরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের উপর এসেছিল দ্বিগুণ মসিবত। একদিকে শত শত মুহাজিরকে আশ্রয় দানের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছিল। কেননা তাঁরা আরবের বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চল হতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের জনতা তাঁদেরকে নিপীড়ন দানে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠেছিল।

এ রকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মু'মিনদের ঈমান-আকীদায় কদরের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিপদ এখন তাদের উপর এসে পড়েছে তা আল্লাহর হুকুম ও অনুমতি ক্রমেই এসেছে। এমনি এমনি আসেনি। সুতরাং মসিবতের সময় আহাজারি না করে যেমন ধৈর্যধারণ করেন এবং তাঁরা যেন মনে করেন যে, এটা এক মহাপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন করে যেন তাঁরা সফলতা লাভ করেন। মু'মিনগণ এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পূর্ণ সফলতা সহকারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিস্ময় প্রকাশ করে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা দিতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَايَقْضِ اللّٰهُ لَهُ قَضَاءً اِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ . فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

অর্থাৎ মু'মিন লোকের অবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর! আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালাই করেন তা তার জন্য ভালোই হয়, বিপদে পড়লে ধৈর্য অবলম্বন করে, আর এটা তার জন্য ভালোই হয়। সফলতা লাভ হলে শোকর করে আর তাও তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা মু'মিন লোক ছাড়া আর কারো হয় না। -[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ تَعَالَى مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কারো উপর কোনো বিপদ পতিত হতে পারে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ এ কথাটি ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোথাও বিন্দুমাত্র কোনো কিছু ঘটতে পারে না। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কারো কোনো ক্ষতি বা লাভ কিছুই হতে পারে না। শান্তি ও অশান্তি আল্লাহর হাতেই নিহিত রয়েছে। যার ঈমান আল্লাহর উপর থাকে না, বিপদের মুহূর্তে তার অন্তরে সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থাই হয় না। যার তাকদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আল্লাহ তার প্রাণে শান্তি আনয়ন করে দেন। তখন সে মনে মনে ভাবতে থাকেন যা ঘটেছে তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে, আল্লাহ কারো কোনো ক্ষতি করেন না। যেমন তিনি বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ পাহাড় নড়তে পারে তার ঈমান নড়তে পারে না,

কোনো দুঃখ আসলে আল্লাহ ব্যতীত তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এ ধারণার দ্বারা বৃহৎ হতে বৃহত্তম দুঃখও সে কেটে উঠতে পারে। এটা একমাত্র ঈমানেরই প্রতিফল। এক কথায় বুঝে নিতে হবে বিপদাপদের প্রবল ঝঞ্ঝাব্যথায় মানুষকে যে জিনিস সঠিক পথে অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখে, কঠিন থেকে কঠিনতম বিপদও পদস্খলন ঘটায় না, তা-ই হলো ঈমান। যার অন্তরে এ ঈমান নেই সে বিপদাপদকে দুর্ঘটনা জনিত মনে করে এবং বৈষয়িক শক্তিগুলো এটা এনেছে অথবা রোধ করতে পারে মনে করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানে ও অন্তর হতে মানে যে, সব কিছুই আল্লাহর হাতে, তিনিই এ বিশ্বলোকের মালিক ও প্রশাসক, বিপদাপদ তাঁরই অনুমতিক্রমে আসে ও চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকেও ধৈর্য সহনশীলতা এবং আল্লাহর ফয়সালায় থাকার যোগ্যতা দান করেন। –[মা'আরিফ]

আর ঈমানদারদের লক্ষণ হলো, তারা যখন কোনো বিপদে পতিত হয় তখন তারা ইন্নালিল্লাহ বলে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন, আল্লাহ বলেন– اَلَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ - (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ١٥٧)

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু বিপদের দুর্বহ চাপে ঘাবড়ে গিয়ে এই আনুগত্য যদি পরিহার কর, তবে নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব হলো শুধু এতটুকু যে, তিনি সঠিক সত্য পথের সন্ধান তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিবেন। এটাই তাঁর দায়িত্ব আর রাসূল যে যে কাজ সুসম্পন্ন করেছেন, তা তো অনস্বীকার্য। –[তাহের, রুহুল কুরআন]

আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করো কুরআন অনুসরণ করে, রাসূলের আনুগত্য করো তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে; আর যদি আনুগত্য পরিহার কর তবে জেনে রাখো, রাসূলের দায়িত্ব হলো পৌঁছিয়ে দেওয়া।

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যেসব আদেশ-নিষেধ করেছেন, সর্বক্ষেত্রে তাঁদের আনুগত্য করো।

قَوْلُهُ اَطِيْعُوا الخ আয়াতে اَطِيْعُوْا-কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : উক্ত আয়াতে اَطِيْعُوْا শব্দটিকে اَمْر হিসেবে দু'বার উল্লেখ করার একটি কারণ এই হতে পারে যে, تَكْرَارٌ দ্বারা কোনো হুকুমের تَاكِيْد বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা বিধান রয়েছে اَلتَّكْرَارُ يَدُلُّ عَلَى التَّاكِيْد তাই, যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ ও ওয়াজিব, সেভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর اِطَاعَتْ-ও ওয়াজিব। অথবা, যারা কেবল হাদীস অনুসরণ করে, কুরআনকে অনুসরণ করে না। যথা– اَهْلِ حَدِيْث তারাও এ আয়াতের অনুসারে কুরআনের অনুসরণ না করলে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কুরআন ও হাদীস শরীফ উভয়কেই একই সাথে সমভাবে মেনে নিতে হবে। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদীস শরীফ। সুতরাং مُجْمَلْ ও مُفَسَّرْ উভয়কেই মানতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ .... الْمُؤْمِنُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তো তিনিই যিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। অতএব, ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা।"

আল্লামা সাবী (র.) বলেছেন, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর উপর ভরসা রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এখানে উম্মতকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করার এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। –[সাবী]

ইসলামের পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বা ভরসা হলো, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা রাখা। এ তাওয়াক্কুল ইবাদত, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির উপর এমন কোনো বিষয়ে গায়েবী ভরসা রাখা, যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই-তা সম্পূর্ণ শিরক। কারণ তাওয়াক্কুল ইবাদত, আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা শিরক। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই' এ বাক্যের পর 'মু'মিন লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা' এ বাক্য জুড়িয়ে দেওয়ার তাৎপর্য এটাই। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর উপরই মু'মিনদেরকে ভরসা রাখতে হবে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. ইমাম তিরমিযী ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বাসস্থান হতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এমতাস্থায় তাদের সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পুত্রগণ হায় হায় করে রোধন করতে লাগল, আরও বলতে লাগল, আমাদের কি উপায় হবে! আমাদের জীবন কিভাবে চলবে, আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? এসব ক্রন্দন ও শোকাক্রান্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি তাকিয়ে তারা তাদের সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাই তারা এ সময় হিজরত করেননি। পরবর্তী কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় হিজরত করে মদীনায় চলে আসলেন। মদীনায় এসে দেখলেন, তাদের পূর্বে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতকৃত সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সোহবত পেয়ে নবুয়তের আকর্ষণ গ্রহণ করে কেউ বা ফকীহ হলেন, আর কেউ বা অলী হয়ে গেলেন। এটা দেখে তারা তাঁদের ওই সকল স্ত্রী পুত্রগণকে সাজা দিতে ও মারধর করতে চাইলেন। কেউ কেউ খাদ্য

ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে চাইলেন, যা তাদেরকে হিজরত করার জন্য প্রথম বাধা দান করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মা'আরিফ, আসবাবুন নুযূল, মায়ালিমুত তানযীল, ফাতহুল কাদীর, তিরমিযী, হাকিম فِي الْمُسْتَدْرَك عَنِ ابْنِ عَبَّاس)

২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা.) -এর প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। তার ঘটনা এই ছিল যে, তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন, যখন কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের ডাক আসত তখন তিনি যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বাহির হতেন; কিন্তু স্ত্রী পুত্রের কেউই তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিত না। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে যেতেন না, কারণ বাচ্চা-কাচ্চাগণ বলতে থাকত যে, 'আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন, আমাদের কি উপায় হবে' এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন। -[রুহুল বয়ান, ইবনে কাছীর]

উভয় বর্ণনা-ই শানে নুযূল হতে পারে। উভয়ের حَاصِلٌ একই প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা আল্লাহর ফরজ আদায় করতে যে কেউ বাধা প্রদান করবে তারাই আল্লাহর শত্রু হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ... عَدُوًّا لَّكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।" এখানে পবিত্র কুরআন স্ত্রী এবং ছেলে-সন্তানদের যেসব প্রভাব মানুষের উপর পড়ে, যে প্রভাব মানুষকে ঈমানের দাবি ও কর্তব্য পালন হতে বিরত রাখে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তানদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা তোমাদেরকে ভালো ও মঙ্গলজনক কাজ হতে বিরত রাখে। তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, আবার কখনো দীনি কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে, কখনো ওয়াজিব আদায়করণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমাদের এসব স্ত্রী ও সন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শত্রু। সুতরাং এ জাতীয় শত্রুদের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

ঠিক তেমনি কখনো কখনো স্বামীরা স্ত্রীদেরকে দীনি কাজে বাধাদান করে, ওয়াজিব আদায় করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় এ জাতীয় স্বামীরাও স্ত্রীদের জন্য আসলে শত্রু। এ শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক। আয়াতের اَزْوَاج শব্দটি زَوْج -এর বহুবচন। এর অর্থ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই হতে পারে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের স্বামীগণ এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। -[নূরুল কোরআন]

মনে রাখতে হবে, কুরআনের কোনো আয়াত কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও তার হুকুম সাধারণ হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর জিকির ও দীনি কাজে বাধা দিবে, সেসব স্থানে আয়াতের হুকুম প্রয়োগ হবে। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا : আলোচ্য অংশের অর্থ হলো, "আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা অনুসরণ কর ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।" তার অর্থ এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্য, যেন তোমরা সতর্ক থাকো এবং দীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা করো। এটার মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে যার ফলে তোমাদের ও তাদের পারিবারিক জীবনই দুঃসহ হয়ে উঠবে, এটা কখনও উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা করা হলে দু'টি বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটি এই যে, এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় এই যে, এর কারণে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হতে পারে। আশে-পাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ ... اَجْرٌ عَظِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহই এমন সত্তা যাঁর নিকট বড় প্রতিফল রয়েছে।" অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি হলো [আল্লাহর পক্ষ হতে] তোমাদের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। তারা কখনো তোমাদেরকে হারাম উপার্জনের জন্য বাধ্য করে এবং আল্লাহর হক আদায় না করতে এবং নাফরমানির কাজে লিপ্ত হতে সাহায্য করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাফরমানিতে তাদের আনুগত্য করো না। আর মনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল- যা পাবে সে লোকেরা, যারা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিদের মহব্বতের উপর আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, রুহুল কোরআন]

মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানাদি মহা ফিতনা স্বরূপ : এ কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে- মানুষ অধিকাংশ গুনাহ ও হারাম কাজসমূহ বিশেষত সন্তানের মোহে পড়ে করতে বাধ্য হয়। একটি হাদীসে হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক লোক দেখে মানুষ বলবে اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ অর্থাৎ তার সন্তানগণ তার নেকসমূহ খেয়ে ফেলেছে। (رُوْح)
অপর একটি হাদীসে হযরত নবী করীম ﷺ বলেন- اَلْاَوْلَادُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ অর্থাৎ সন্তানগণ দুর্বলতা ও বখিলীর কারণ স্বরূপ, তাদের ভালোবাসায় মানুষ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা হতে বিরত থাকে। তাদের মমতায় মানুষ জিহাদ করা হতে বিমুখ হয়ে থাকে।
কতিপয় সালাফে সালিহীন বলেছেন, اَلْعِيَالُ سُوْسُ الطَّاعَاتِ পরিবার-পরিজন মানুষের নেক কাজসমূহকে ধ্বংস করার জন্য ঘুন স্বরূপ। যেভাবে ঘুন কাষ্ঠ অথবা ধান চাউলকে খেয়ে ধূলিতে পরিণত করে দেয়, তদ্রূপ সন্তানসন্ততি নেক কাজসমূহকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনষ্ট করে দেয়। -[মা'আরিফ]

অনুবাদ :

١٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَاسْمَعُوْا مَا اُمِرْتُمْ بِهِ سَمَاعَ قَبُوْلٍ وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا فِى الطَّاعَةِ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ط خَبَرُ يَكُنْ مُقَدَّرَةً جَوَابُ الْاَمْرِ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ .

১৬. তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো এটা اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর শ্রবণ করো যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করা। ও আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো পুণ্য কাজে তোমাদের নিজেদের কল্যাণে। এটা উহ্য يَكُنْ-এর خَبَرْ এবং جَوَاب اَمْر আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম কৃতকার্য।

١٧. اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ تَتَصَدَّقُوْا عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعِّفْهُ بِالتَّشْدِيْدِ بِالْوَاحِدَةِ عَشْرًا اِلٰى سَبْعِمِائَةٍ وَاَكْثَرَ وَهُوَ التَّصَدُّقُ عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ مُجَازٍ عَلَى الطَّاعَةِ حَلِيْمٌ فِى الْعِقَابِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর এভাবে যে, তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে সদকা করবে তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করবেন অপর এক কেরাতে শব্দটি তাশদীদযোগে يُضَعِّفْهُ পঠিত হয়েছে, একের বিনিময়ে দশ হতে সাতশত ও ততোধিক পর্যন্ত। আর উত্তম ঋণ হলো, সন্তুষ্টচিত্তে সদকা করা। আর তোমাদের কে ক্ষমা করবেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ইবাদতের প্রতিদান দানকারী ধৈর্যশীল পাপের শাস্তিদানে।

١٨. عٰلِمُ الْغَيْبِ السِّرِّ وَالشَّهَادَةِ الْعَلَانِيَةِ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ .

১৮. তিনি অদৃশ্য গোপন ও দৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাতা প্রকাশ্য মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে বিজ্ঞানময় তাঁর সৃষ্টিকর্মে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ : خَيْرًا শব্দটি একটি উহ্য فِعْل দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে, যা বুঝাচ্ছে اَنْفِقُوْا ক্রিয়াটি। যেমন, বলা হয়েছে اِئْتُوْنِى الْاِنْفَاقَ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ অথবা قَدِّمُوْا خَيْرًا لَهَا - এটা ইমাম সীবওয়াইহ-এর মত। ইমাম কিসায়ী আর ফাররার অভিমত হলো- خَيْر একটি উহ্য مَصْدَرْ-এর صِفَتْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। تَقْدِيْر হলো اِنْفَاقًا خَيْرًا - আবূ ওবাইদের মতে তা كَانَ مُقَدَّرَة-এর خَبَرْ সুতরাং مَنْصُوْب হয়েছে। تَقْدِيْر হলো يَكُنِ الْاِنْفَاقُ خَيْرًا لَكُمْ কূফীদের মতে তা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب আর কেউ কেউ তাকে اَنْفِقُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل بِهِ বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ اَنْفِقُوْا خَيْرًا । -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল ও ব্যাখ্যা : ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যখন আয়াত قَوْلُهُ تَعَالَى اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ নাজিল হলো, তখন হযরাতে সাহাবায়ে কেরামগণ দিবারাত্র ইবাদতে মশগুল থাকতে লাগলেন, এমনকি পা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। সিজদা করতে করতে কপালসমূহ পচে-গলে মাথার ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় সহজতার নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর পরিপূর্ণ হক আদায় করে ইবাদত করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে যতটুকু সম্ভব, শক্তি অনুসারে ইবাদত করে যাও। আল্লাহর সকল বিধান নতশিরে মেনে নাও। আর নিজেদের পরকালে আত্মার শান্তির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে যাও। আর সন্তানসন্ততির মালিক হয়ে কৃপণ হয়ো না। কেননা যারা কৃপণতা ত্যাগ করতে সক্ষম হবে তারাই আল্লাহর পথে সফল হবে। আল্লাহ তা'আলা কাউকেও শক্তি-সামর্থ্যের অধিক কোনো চাপ দেন না, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا তাই শক্তি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করলেই তাঁর হক আদায় হয়ে যাবে। -[আশরাফী, কাবীর]

আয়াতটি মানসূখ হওয়ার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটি مَنْسُوْخٌ নয় বরং مُحْكَمٌ হবে এবং তিনি উভয় আয়াতের মাঝে تَطْبِيْق তথা সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করেন যে, আয়াতদ্বয়ের মূল অর্থ হলো, আল্লাহকে তোমরা ভয় করো পরিপূর্ণভাবে যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। আর তার একটি দিক এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর ভয় অন্তরে রয়েছে এ প্রমাণ জিহাদ করে দেখিয়ে দাও। আর তোমাদের শক্তি মোতাবেক জিহাদ করো। কেননা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ অথা আল্লাহ কাউকেও সামর্থ্যের বাইরে কোনো নির্দেশ দেন না। তাকওয়ার হক এই হবে যে, যেমনিভাবে আল্লাহভীতি অর্জন করলে তাকওয়া আছে বলে আল্লাহ ভক্ত লোকগণ স্বীকার করে, সেভাবে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আর তা فَوْقَ الْاِسْتِطَاعَةِ হওয়া আবশ্যক নয়। -[খতীব, রূহুল মা'আনী]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি রহিতকরণ বিষয়টি সঠিক নয়। কারণ যেক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে ভয় করা اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর অর্থ নয়। কারণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللّٰهَ .... وَاَطِيْعُوْا : আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে তাদের কল্যাণের জন্য কয়েকটি নসিহত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "কাজেই তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের ধনমাল ব্যয় করো, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু সে লোকই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে।" অর্থাৎ সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধান পালনে বাধা দিতে না পারে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিকরণের পথে বাধা না হয়।

আলোচ্য আয়াতটি হযরত কাতাদাহ, রাবী ইবনে আনাস, সুদ্দী ও ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে কুরআনের অপর আয়াত اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর রহিতকারী। অর্থাৎ "তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাকো" এ আয়াত দ্বারা "আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর যেমন তাকে ভয় করা বাঞ্ছনীয়" আয়াত রহিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি মানসূখ হয়নি; কিন্তু حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর অর্থ হলো "আল্লাহর জন্য এমনভাবে জিহাদ করো যেমনভাবে জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়।" আর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেন কারো নিন্দা ও বাধা বিরত না রাখে। আর নিজের ও নিজেদের পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ক্ষতি হলেও যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। -[কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, রহিত হওয়ার কথা ঠিক নয়। কারণ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর অর্থ- যে ক্ষেত্রে সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রেও ভয় করা নয়। কারণ তা সাধ্যাতীত ও অসম্ভব। -[কাবীর]

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তা তোমরা ভালো করে কান পেতে শুনো এবং রাসূলের পক্ষ হতে যেসব আদেশ-নিষেধ আসে তার অনুগত হও। وَاَنْفِقُوْا অর্থাৎ নিজের ধন-মাল ব্যয় করো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এর অর্থ যাকাত আদায় করো। হযরত যাহ্হাক (র.) বলেছেন, এটার অর্থ– জিহাদে অর্থসম্পদ ব্যয় করো। ইমাম হাসানের মতে, এটার অর্থ– নিজের জন্য ব্যয় করো। আল্লামা কুরতুবীর মতে, সব ধরনের দান-সাদকা এর অন্তর্ভুক্ত; আর এটাই গ্রহণযোগ্য। পরিশেষে বলা হয়েছে, "এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" দান করার নির্দেশ দানের পর "এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর" বলাতে প্রমাণ হলো যে, মূলত দান-সদকা দাতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, গ্রহীতার জন্য নয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, কল্যাণমূলক খাতে দান-সাদকা গোটা সামজের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিয়ে আসে। দাতা সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে এ কল্যাণ তার জন্যও হয়ে থাকে। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ। অর্থাৎ যে লোক কৃপণতা এবং ধন-মালের লোভ-লালসা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ধন-মাল ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছ, সেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অন্তরের কৃপণতা দূর করতে পেরেছে, নিজেকে লোভ-লালসা মুক্ত বলে প্রমাণ করতে পেরেছে, শুধু তারাই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ تُقْرِضُوْا .... يُضٰعِفْهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসান দাও তবে তিনি তোমাদেরকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ অতীব মর্যাদা দানকারী ও ধৈর্যশীল।" এখানে ইহসানকে (যে কোনো কল্যাণমূলক পথে অর্থ ব্যয়কে) আল্লাহ তা'আলাকে করজ দেওয়া বলা হয়েছে। অথচ করজের প্রয়োজন হয় মুহতাজদের। আল্লাহ আসমান-জমিনের মালিক, বিশ্বলোকের কারো প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন। এভাবে বর্ণনা করার অর্থ হলো, ইহসান তথা দান-সদকাকরণের প্রতি উৎসাহ দান এবং মুহতাজদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রতি অনুপ্রাণিত করা। যে মানুষ আপন স্রষ্টাকে করজ দিতে কার্পণ্যতা করবে, যে স্রষ্টা তাকে ধন-মাল দিয়েছেন, যিনি আবার সে ধন-মাল কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিবেন, তার অতিরিক্ত– স্বীয় মাগফিরাতে তাকে শামিল করে নিবেন– সে মানুষ কতইনা দুর্ভাগা কতই না অপয়া! –[রূহুল কোরআন]

করযে হাসানা হলো, কারো মতে হালাল ধন-সম্পদ সদকা করা। আর কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, খুশিমনে নিষ্ঠার স্যথে দান করা। –[কাবীর]

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ : সূরা আত্-তালাক্ব

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আত-তালাক্ব। কেবল নামই নয়, এটার বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক। কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ সূরাকে اَلنِّسَاءُ الْقُصْرٰى তথা সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা নাম দিয়েছেন। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ২৪৭টি বাক্য এবং ১১৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরার আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি আল-বাক্বারার তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাজিল হয়েছে। যদিও নাজিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয়; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা আল-বাক্বারাতে দেওয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগল এবং কার্যতও তাদের ভুলভ্রান্তি দেখা যেতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ হেদায়েতসমূহ নাজিল করেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার সম্পূর্ণ অংশেই মূলত তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে-

১. তালাকে সুন্নী এবং তালাকে বিদ'য়ী সম্বন্ধে আলোচনা। এক পর্যায়ে দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে আর জীবনযাপন অসম্ভব মনে হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধান মতে, যথাসময়ে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো সহবাসহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

২. তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নিতান্ত প্রয়োজনেই এটা হালাল করা হয়েছে।

৩. ইদ্দতকে যথার্থভাবে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সময় দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আর যেন 'নসব' মিশ্রিত হয়ে না যায়।

৪. ইদ্দতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'আয়েসা' অর্থাৎ যে মহিলার ঋতু চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে পরিষ্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ-নিষেধও করা হয়েছে।

৫. এসব বিধি-বিধানের আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী কারো কোনো রকমের ক্ষতি না হয়।

৬. ইদ্দতের সময় 'নাফকা' আর 'সুকনা' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ও থাকার খরচ সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। -[সাফওয়া]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো স্ত্রী-পুত্রাদি আল্লাহ ও মানুষের শত্রু বটে। কখনও এটা তাদের ওয়াজিব হকসমূহ পালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত তখন তাতে প্রকাশ্য বিচ্ছেদও ঘটে যায়। সুতরাং অত্র সূরায় তালাকপ্রাপ্তা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণনা দ্বারা উক্ত শত্রুতার ধারণা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। যে বিচ্ছেদের অবস্থায়ও তাদের প্রকৃত হক আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। আর ঐক্যতার সময় তো সে হকসমূহ আদায় করা আরও অধিক ওয়াজিব ছিল। যেহেতু উক্ত নির্দেশসমূহের ভিতর দিয়ে চার স্থানে আল্লাহভীতির নির্দেশ ও তৎপ্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়গুলোর অবতারণা উক্ত নির্দেশ এবং উৎসাহ প্রদানের দৃঢ়তা সাবধানের জন্যই করা হয়েছে, এতদ্ভিন্ন তা দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব কাজ-কারবারেও শরিয়তের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে বসে যে, পার্থিব কাজকর্মে শরিয়ত পালন করা নিষ্প্রয়োজন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُرَادُ اُمَّتُهٗ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهٗ اَوْ قُلْ لَهُمْ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ اَرَدْتُّمُ الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِاَوَّلِهَا بِاَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ فِيْ طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّ فِيْهِ لِتَفْسِيْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج اِحْفَظُوْهَا لِتُرَاجِعُوْا قَبْلَ فَرَاغِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ اَطِيْعُوْهُ فِيْ اَمْرِهٖ وَنَهْيِهٖ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ زِنًا مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اَيْ بُيِّنَتْ اَوْ بَيِّنَةٍ فَيَخْرُجْنَ لِاِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ وَتِلْكَ الْمَذْكُوْرَاتُ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ الطَّلَاقِ اَمْرًا مُرَاجَعَةً فِيْمَا اِذَا كَانَ وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ .

অনুবাদ :

১. হে নবী! এটা দ্বারা স্বয়ং নবী ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ উদ্দেশ্য। যেমন, পরবর্তী বহুবচন শব্দ দ্বারা তার প্রতি নির্দেশ করছে; কিংবা বক্তব্যটি এরূপ হবে قُلْ لَهُمْ তাদেরকে বলুন। যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দান কর তালাক দানের ইচ্ছা কর। তবে তাদেরকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রদান করো। ইদ্দতের আগে এমন তুহুরে তালাক প্রদান করো, যে তুহুরে স্বীম-স্ত্রীর মিলন হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটার তাফসীর এরূপ করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখো তৎপতি লক্ষ্য রাখো, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা রাজয়াত করতে পার। আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করো। তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় তা হতে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, যদি তারা লিপ্ত হয় অশ্লীলতায় ব্যভিচারে প্রকাশ্য مُبَيِّنَةٍ শব্দটি ى অক্ষরে যবর ও যের যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীলতা বা বর্ণিত অশ্লীলতা। তবে সে ক্ষেত্রে হদ বা শরয়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য বের হবে। আর এগুলো উল্লিখিত আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, সে তার নিজ আত্মার উপরই অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এটার পরে তালাকের পরে কোনো উপায় করে দিবেন রাজয়াতের ব্যবস্থা করবেন, যেক্ষেত্রে তালাক এক বা দুই হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "مُبَيِّنَةٍ" : এ শব্দটি কেউ কেউ مُبَيِّنَةٌ অর্থাৎ اِسْمُ فَاعِلٍ হিসাবে পড়েছেন অর্থাৎ স্বয়ং অশ্লীল কাজ দেখলেই স্পষ্ট জানা যাবে যে, তা অশ্লীল। আর কেউ কেউ مُبَيَّنَةٌ অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ হিসাবে পড়েছেন। তখন অর্থ হলো- দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে যে, উক্ত কাজ অশ্লীল। -[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ আয়াতের শানে নুযূল :

১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রাজয়াত করেছিলেন।

কাতাদাহ হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিলে তিনি পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয় তুমি রাজয়াত করো। কারণ সে সারা দিন রোজা রাখে আর সারা রাত নফল ইবাদত করে। সে জান্নাতে তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল থাকবে।

২. কালবী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে কিছু গোপন কথা বলেন, হযরত হাফসা (রা.) সে কথাগুলো হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলে দিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে একটি তালাক দিলেন, তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

৩. সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্বন্ধে নাজিল হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের সময় এক তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এবং যতদিন পর্যন্ত সে পবিত্র না হবে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী বানিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবার স্রাব হতে পবিত্র হলে, যদি ইচ্ছা হয় তখন তালাক দিতে পরামর্শ দিলেন। এমন পবিত্র অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি। এটা হচ্ছে সে ইদ্দত যার জন্য তালাক দিতে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا النَّبِيُّ .. بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সকল উম্মতগণকে সম্বোধন করেছেন। কারণ, طَلَّقْتُمْ শব্দটিকে جَمْع নেওয়া হয়েছে। হে নবী, যখন আপনারা আপনাদের স্ত্রীগণকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের অনুসরণে তালাক দিবেন অর্থাৎ এমন طُهْر -এর মধ্যে তালাকটি হতে হবে, যে তুহুরে সহবাস হয়নি। (هٰكَذَا كَمَا رَوَى الشَّيْخَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) আর তালাকের পর ইদ্দতসমূহ গণনা করা যাতে ইদ্দতের মধ্যেই তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হও। আল্লাহর নির্দেশ পালনে যাথাযথ তাঁকে ভয় করো।

আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের করে দিও না, আর তারাও যেন সেচ্ছায় বের না হয়। হ্যাঁ, তবে যদি তারা ব্যভিচার বা জেনা করে বসে তবে জেনার শাস্তি গ্রহণের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া এ নির্দেশের অন্তর্গত হবে না। উল্লিখিত আলোচনাকে আল্লাহর নির্দেশাবলি ও সীমারেখা বলা হয়েছে। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তবে তারা স্বীয় সত্তার উপরই জুলুম করল। হে রাসূল! আপনি অবগত নন যে, আল্লাহ তা'আলা এরপর কি নির্দেশ জারি করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধনে নির্দিষ্ট করার কারণ : উক্ত আয়াতে কেবল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে খেতাব করা হয়েছে। এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন, তিনি رَئِيْسُ الْكَامِلِ পরিপূর্ণ নেতা, পূর্ণ নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ইহকালে ও পরকালে কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নেতাকে লক্ষ্য করলে সকল দলভুক্ত লোকজন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। -[সাবী]

অথবা, এটা দ্বারা (خِطَابُ عُمُوْمِيْ) আম ও খাস সকলকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সময়কালীন হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হুযূর ﷺ খাস এবং উম্মত সকল আম। অথবা, হুযূর ﷺ-কে মাতবূ' (مَتْبُوْعٌ) হিসাবে এবং উম্মতকে তাবে' (تَابِعٌ) হিসাবে শামিল করা হয়েছে।

আর একে বলা হয় (تَغْلِيْبُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْغَائِبِ) অনুপস্থিতগণের উপর উপস্থিতকে প্রাধান্য দেওয়া। সুতরাং এ হিসাবে অর্থ হবে- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا طَلَّقْتُمْ الخ অথবা اِذَا طَلَّقْتَ اَنْتَ وَاُمَّتُكَ

কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার বলেন, عَامٌ خِطَابٌ-এর কারণ এই যে, হুযূর ﷺ তাঁর উম্মতগণের জন্য যেহেতু ইমাম এবং (مُقْتَدِىْ) অনুসরণীয়, তাই ইমামকে বলার অর্থই মুক্তাদিগণকে বলা। মূলত হুযূর ﷺ-কে বলা উদ্দেশ্য নয়। كَمَا يُقَالُ لِرَئِيْسِ الْقَوْمِ افْعَلُوْا كَيْتَ وَكَيْتَ যেমন- يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ الخ -[কাবীর]

অর্থাৎ এটাও বলা হয়েছে যে, خِطَابٌ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ ﷺ-কে করা হয়েছে, তবে خِطَابٌ-এর মধ্যে أَمْرٌ-কে حَذْفٌ করা হয়েছে, সুতরাং অর্থ হবে يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأُمَّتِكَ إِذَا طَلَّقْتُمْ الخ অথবা يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا هَمَمْتُمُ الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوْهُنَّ الخ

অথবা, এটাও বলা যাবে যে, خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوَّلًا وَاٰخِرًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কেই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এটাতে বহুবচন শব্দের মাধ্যমে خِطَابٌ করার কারণ হলো, নবীর বিশেষত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

অথবা, নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞানকে গোটা উম্মতের জ্ঞানের সমতুল্য করে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ নবীকে নির্দেশ যা দেওয়া হয়েছে, তাই উম্মতগণ পালন করতে বাধ্য থাকবে। [তবে নবীর জন্য নির্দিষ্ট কার্যসমূহ নয়।]

অথবা, [কুরতুবী (র.) বলেন,] এখানে عَامٌ خِطَابٌ করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন নবী ও তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করেন, তখন يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ الخ - يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ - يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ইত্যাদি অর্থাৎ يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ দ্বারা خِطَابٌ করে থাকেন। আর যখন কেবল নবীর জন্য خُصُوْص خِطَابٌ হয় তখন الرَّسُوْلُ বলে خِطَابٌ করে থাকেন। যথা- يٰأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ ইত্যাদি।

-[বাহরুল মুহীত, কাবীর, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, আহকামুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এর অর্থ- "তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও।" এ কথাটির দু'টি তাৎপর্য রয়েছে।

১. ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায়, তালাক দিবে এমন সময় যে সময় হতে তাদের ইদ্দত শুরু হতে পারে। অর্থাৎ যে তুহুরে [স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায়] স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম হয়নি সে রকম তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দিবে। এ তুহুরে তালাক দিলে পরবর্তী হায়েয হতে স্ত্রীর ইদ্দত আরম্ভ হতে পারবে। আর এটার প্রয়োগ হবে সেসব স্ত্রীর ব্যাপারে যাদের সাথে স্বামীর সঙ্গম হয়েছে, যাদের হায়েয হয় এবং যাদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. এর দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো, তালাক দিলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিও না; বরং এক বা বেশির পক্ষে দু'তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো। কেননা এ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ তোমার রয়েছে। এ দৃষ্টিতে সেসব স্বামীসঙ্গম পাওয়া স্ত্রীদের ব্যাপারেও এ আয়াতের প্রয়োগ সম্ভব যাদের হায়েয আছে, যাতের হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এখনও যাদের হায়েয আসতে শুরু করেনি। অথবা, তালাকের সময় যাদের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানা গেছে।

তালাককে সুন্নী আর বিদয়ীতে বিভক্তিকরণ : উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী তালাক দেওয়াকে সুন্নী তালাক বলা হয়, অর্থাৎ যে তুহুরে স্ত্রীর সংগম হয়নি সে তুহুরে তালাক দেওয়া অথবা গর্ভবতী হওয়ার কথা অবগতির পর তালাক দেওয়া, আর একসাথে তিন তালাক না দেওয়াকে সুন্নী তালাক বলা হয়।

আর যদি যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়েছে সে তুহুরে তালাক দেওয়া হয়, অথবা হায়েযের সময় তালাক দেওয়া হয়, অথবা একসাথে তিন তালাক দেওয়া হয়, তাহলে এ তালাক হবে بِدْعِيْ তালাক। -[আহকামুল কোরআন-সাবূনী]

এর কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে হাদীস, যাতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে হায়েযের সময় তালাক দিলে রাজয়াত করতে নির্দেশ দেন।

সুন্নতের পরিপন্থি তালাক কি পতিত হয়? : এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, সুন্নত নিয়মের পরিপন্থি তালাক কেউ দিলে তা পতিত হবে। তবে এভাবে তালাক দেওয়ার জন্য দাতা গুনাহগার হবে। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক লোক নবী করীম ﷺ -এর সামনে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল, এটা দেখে নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও তোমরা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করছ? এটা হতে বুঝা যায় যে, তালাক পতিত হবে, না হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রকম কথা বলতেন না। অপর এক হাদীসে ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ

وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ "তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যা দৃঢ় চিত্তে দিলেও পড়ে, খেলা করে দিলেও পড়ে, তা হলো বিবাহ, তালাক ও রাজয়াত। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

অপর এক হাদীসে আছে যে, এক লোক তাঁর স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিল, এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, মাত্র তিনটি তালাক দ্বারাই স্ত্রী তার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর সে সঙ্গে আল্লাহর নাফরমানীও হয়েছে। আর অবশিষ্ট ৯৯৭ তালাক জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের নিদর্শন স্বরূপ রয়েগেছে। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে আজাব দিবেন কিংবা ক্ষমা করে দিবেন। -[কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা কি নিজ প্রয়োজনে বাড়ি হতে বের হতে পারে? : পবিত্র কুরআনের আয়াত لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ হতে বুঝা যায় যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যতদিন পর্যন্ত তাঁর ইদ্দত শেষ না হবে নিজের বাড়ি (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যে বাড়িতে বসবাস করত সে বাড়ি) হতে বের হবে না। যদি সে বিনা প্রয়োজনে বের হয়ে পড়ে, তাহলে গুনাহগার হবে; কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে না। আর স্বামীর পক্ষেও তাকে বাড়ি হতে বের করে দেওয়া বৈধ নয়। তবে স্ত্রীর কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকলে তখন বের হতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. হানাফী ইমামগণের মতে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা রাতে বা দিনে কোনো প্রয়োজনেও বের হতে পারবে না। তবে স্বামীর মৃত্যু জনিত কারণে ইদ্দত পালনাকারিণী মহিলা দিনের বেলায় প্রয়োজনে বাড়ি হতে বের হতে পারবে।

খ. ইমাম মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, প্রয়োজনে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা দিনের বেলায় বাড়ি হতে বাইরে যেতে পারবে। তবে রাতের বেলায় তাকে অবশ্যই বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা দিনে-রাতে কখনও কোনো প্রয়োজনেও বাড়ি হতে বের হতে পারবে না। তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা দিনের বেলায় বের হতে পারবে না। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ-এর তাৎপর্য কি? এবং مُّبَيِّنَةٍ শব্দের সম্পর্ক কিসের সাথে? : বিভিন্ন ফিকহবিদগণ এর কয়েকটি তাৎপর্য বলেছেন-

হযরত হাসান বসরী, আমের, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহহাক, মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ ও লাইস (র.) বলেন, 'সুস্পষ্ট অন্যায়' বলতে বদকারী ও ব্যভিচারী বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ অশ্লীল ও খারাপ কথাবার্তা, ঝগড়াঝাড়ি। অর্থাৎ তালাকের পরও যদি স্ত্রীর মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি ভালো না হয়; বরং ইদ্দত পালন কালেও যদি সে স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে ঝগড়া-ঝাটি ও গালাগালি করতে থাকে [তবে বের করে দেওয়া যাবে]।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এর অর্থ- বিদ্রোহ। অর্থাৎ স্ত্রীকে যদি বিদ্রোহের কারণে তালাক দেওয়া হয়ে থাকে এবং ইদ্দত পালন কালেও সে স্বামীর বিদ্রোহ করা হতে বিরত না হয়।

তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, সুদ্দী, ইবনে সায়েব ও ইব্রাহীম নখয়ী (র.) বলেন, এর অর্থ ঘর হতে স্ত্রীর বের হয়ে চলে যাওয়া। এটা একটা সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করার শামিল। আর যে বলা হয়েছে- 'আর না তারা নিজেরা ঘর হতে বের হয়ে যাবে, তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করে বসে'- এটা এমন ধরনের কথা, যেমন কেউ বলে "তুমি কাউকে গালি দিও না তবে যদি অশালীন হয়ে গিয়ে থাকে।"

এ চারটি মতের প্রথমোক্ত তিনটি মত অনুযায়ী اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ-এর সম্পর্ক বা تَعَلُّقٌ হলো لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ-এর সাথে। আর এ বাক্যের অর্থ হলো, সে যদি চরিত্রহীনতা, বা খারাপ কথাবার্তা, কিংবা বিদ্রোহ করার অপরাধ করে, তবে তাকে ঘর হতে বের করে দেওয়া জায়েজ হবে। আর চতুর্থ মতের দৃষ্টিতে এ কথাটির সম্পর্ক وَلَا يَخْرُجْنَ -এর সঙ্গে এবং এর তাৎপর্য এই যে, তারা যদি ঘর হতে বের হয়ে যায়, তবে তারা সুস্পষ্ট অন্যায় করবে। -[রাওয়ায়ে, কাবীর, কুরতুবী]

এ শেষোক্ত মতই ইমাম আবূ হানীফার অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফের মত হলো, হাসান বসরী ও যায়েদ ইবনে আসলামের মতোই। অর্থাৎ জেনা-ব্যভিচার করলে তখন হদ কায়েম করার জন্য বাড়ি হতে বের করা হবে।

আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেছেন, আয়াতের শব্দগুলোর অর্থ উপরোক্ত সবই হতে পারে। সুতরাং এসব কারণে তাদেরকে বাড়ি হতে বের করে দেওয়া যাবে। আর এসব কারণ অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত হবে। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ الخ : মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে حُدُوْدُ اللّٰهِ দ্বারা শরয়ী বিধিবিধানসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তালাক সম্পর্কীয় মাসআলাগুলোকেই حُدُوْدُ اللّٰهِ বলা হয়েছে, وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনাসমূহের ব্যতিক্রম কোনো কাজ করে, তবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ সে স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করল। তবে এটাতে আল্লাহর অথবা ইসলামের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ـ (اَلْحَدِيْثُ)

অর্থাৎ এ লোকসানটি ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতই ভোগ করতে হবে। পরকালীন বা ধর্মীয় লোকসান অর্থাৎ গুনাহের বোঝা পোহাবে আর তার শাস্তি ভোগ করবে।

ইহকালীন ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ যে ব্যক্তি শরয়ী হেদায়েতের বিপরীতভাবে তালাক দিবে, তবে সে তিন তালাক প্রদান করে ফেলল। যার ফলে পুনরায় ওই স্ত্রীকে رَجْعَةٌ অথবা নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরায়ে রাখতে পারবে না। আর সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর আফসোস করতে থাকে এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। বিশেষত একটি ছোট সন্তান থাকা অবস্থায় যদি তালাক প্রদান করে, তবে তার ইহকালীন কষ্ট ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের অত্র অঞ্চলে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অত্যাচার ও কষ্টদানের উদ্দেশ্যেই তালাক দেওয়া হয়, তবে এতে পুরুষটি অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا : আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তুমি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত উক্ত রাগান্বিত অবস্থার পর অন্য আরও দ্বিতীয় অবস্থা বা হুকুম প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ স্ত্রীর মাধ্যমে যে শান্তি পেতে, সন্তানগণের লালনপালনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাকে তালাক দানের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দিয়েছ। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাকে বায়েনা প্রদান করো না, বরং رَجْعِىْ তালাক দান করা, যাতে رَجْعَةٌ করার ব্যবস্থা হতে পারে। رَجْعَةٌ করা দ্বারা পূর্ব বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে।

উক্ত আয়াতে اَمْرًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা সম্পর্কে আল্লামা জালাল উদ্দিন (র.) বলেন, তা দ্বারা رَجْعَةٌ করার নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম হাসান, নাখয়ী ও শায়বী (রা.) হতে হযরত আবদ ইবনে হোমাইদ (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে اَمْرًا দ্বারা مُرَاجَعَتْ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কথার ভিত্তিতে سَلَفُ صَالِحِيْن গণ বলেন, তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলাগণকে سُكْنٰى দেওয়া ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ও سُكْنٰى পাবে না।

মাসনদে আহমদ ও তাবারানী গ্রন্থে ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে–

اِنَّمَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهٗ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا نَفْقَةَ وَلَا سُكْنٰى ـ

অর্থাৎ তালাকে رَجْعِىْ প্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ স্বামীর পক্ষ হতে পাবে, আর তালাকে বায়েনাপ্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ ইত্যাদি কিছুই পাবে না। –[কাবীর]

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা ঘর হতে বের হওয়া জায়েজ হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ : وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الخ - আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাফসীরকারক ও ফকীহগণ যে সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কখনো নিজ স্বামী-স্ত্রীর বাড়ি হতে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও [বাইরে] যেতে পারবে না। নিষ্প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া গুনাহের কারণ হবে। তবে স্ত্রী বিশেষ প্রয়োজন বশত কোথাও যেতে পারবে না তাতে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

তালাকে رجعى ও তালাকে বায়েনাপ্রাপ্তা মহিলা স্বীয় বাসস্থানেই (স্বামীর ঘরে), অথবা ভাড়া নেওয়া ঘরে, অথবা স্বীয় মালিকানা ঘরে, অথবা ধারকৃত ঘরে ইদ্দত পালন করতে হবে। হানাফী ইমামগণের মত এটাই। তবে ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী দিবা রাতে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে, তবে ঘরে রাত যাপন করা আবশ্যক বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, مُعْتَدَّةْ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا বা بَائِنَةْ অথবা مُعْتَدَّةْ رَجْعِيَّةْ কেউই কখনো কোনো ক্রমেই বের হতে পারবে না।

হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন।

اِنَّ رِجَالًا اسْتَشْهَدُوْا بِاُحُدٍ فَقَالَ نِسَائُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَسْتَوْحِشُ فِىْ بُيُوْتِنَا اَفَبِيْتُ عِنْدَ اَحَدٍ لَنَا فَاَذِنَ لَهُنَّ اَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ اِحْدٰيهُنَّ فَاِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِىْ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اِلٰى بَيْتِهَا - اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِىِّ - (عُمْدَةُ الرِّعَايَةْ)

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক পুরুষ উহুদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করলে তাদের স্ত্রীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে রাত যাপনের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পরস্পরের সাথে দিবাভাগে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেন এবং রাতে নিজ ঘরে রাত যাপনের হুকুম দেন। সুতরাং দিবাভাগে বা রাতে অন্যত্রে প্রয়োজনে গমন করার বৈধতা প্রকাশ পেল। তবে যদি স্বামীর ঘরে বসবাস করার দ্বারা মান-সম্মানের আশঙ্কাজনক হয় অথবা স্বামী বের করে দেয়, অথবা সম্পদ ধ্বংস করার সম্ভাবনা থাকে তবে বের হওয়ার বৈধতা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সুবিধা মতো উপযুক্ত স্থানে عِدَّتْ পালন করবে।

তবে স্বামীর ঘর যদি সংকীর্ণ হয়, তবে স্ত্রী পর্দা ব্যবহার করে রাত যাপন করবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্যত্র থাকাই উত্তম হবে। তদ্রূপ ফসখে নিকাহ -এর ইদ্দত পালনেও, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সত্যবাদী বা বিশ্বস্ত মহিলার দায়িত্বে স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা করে দেওয়া উত্তম হবে। -(عُمْدَةُ الرِّعَايَةْ)

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا কথাটি কিসের দলিল হিসাবে ব্যবহৃত? : এর অর্থ হলো, "তোমরা জান না সম্ভবত আল্লাহ তারপর (মিল-মিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় হয়তো লজ্জিত হতে পারে এবং ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে, (এটা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হবে)। এতে প্রমাণ হয় যে, তালাক দানের মোস্তাহাব নিয়ম হলো, আলাদা আলাদাভাবে তালাক দেওয়া, একসাথে তিন তালাক না দেওয়া। আবূ ইসহাক (র.) বলেন, একই সময় যদি তিন তালাক দেওয়া হয় তাহলে, لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "সম্ভবত আল্লাহ কোনো মিলমিশের ব্যবস্থা সৃষ্ট করে দিবেন" এ উক্তির কোনো মানে হতে পারে না। অর্থাৎ পুনর্বার রাজয়াত করার সুযোগ না থাকার কারণে মিলমিশের আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না। -[কাবীর]

মোদ্দাকথা হলো, আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, একসাথে তিন তালাক না দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তালাক দেওয়া সুন্নত।

অনুবাদ :

٢. وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أُتْرُكُوهُنَّ حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفِرَاقِ وَأَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط لَا لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

২. অনন্তর যখন তাদের সময়কাল আসন্ন হবে তাদের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদেরকে রেখে দিবে তাদের সাথে রাজয়াত করত সঙ্গতভাবে কোনোরূপ ক্ষতি সাধন ব্যতীত। অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করো সঙ্গতভাবে তাদের ইদ্দত পূর্ণ করা অবধি তাদের পরিত্যাগ করো এবং রাজয়াতের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিসাধন করো না। আর তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো রাজয়াত বা পরিত্যাগ করার উপর। আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দান করো বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে নয়। এটা দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দিবেন দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদাপদ হতে।

٣. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط يَخْطُرُ بِبَالِهِ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فِيْ أُمُوْرِهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط كَافِيْهِ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ مُرَادِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْإِضَافَةِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَرَخَاءٍ وَشِدَّةٍ قَدْرًا مِيْقَاتًا .

৩. আর তাকে জীবিকা দান করবেন তার ধারণাতীত উৎস হতে অন্তরে কল্পনা হয়নি এমনভাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার ব্যাপারসমূহে তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট তাকে যথেষ্টরূপে সাহায্যকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কার্য পূর্ণকারী তাঁর সঙ্কল্প অপর এক কেরাতে শব্দটি إِضَافَتْ -এর সাথে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ স্থির করেছেন প্রত্যেক বস্তুর জন্য যেমন স্বাচ্ছন্দ্য ও অনটন নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট সময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ : জমহুর بَالِغٌ أَمْرَهُ অর্থাৎ بَالِغٌ -এ তানবীন আর أَمْرَهُ তে نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। আর হাফস إِضَافَتْ করে পড়েছেন। ইবনে আবূ আবলা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ এবং আবূ আমর (র.) এক বর্ণনায় بَالِغٌ -এ তানবীন দিয়ে এবং أَمْرُهُ তে رَفْع দিয়ে بَالِغٌ أَمْرُهُ পড়েছেন। অর্থাৎ أَمْرُهُ -কে بَالِغٌ -এর فَاعِلٌ হিসাবে পড়েছেন। অথবা أَمْرُهُ -কে مُبْتَدَأٌ আর بَالِغٌ -কে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হিসাবে পড়েছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা مُؤَخَّرٌ যেসব কাজ করতে ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই করেন, কোনো কিছুই তাঁকে দুর্বল করতে পারে না। কোনো কিছু অপূর্ণও থাকে না। তৃতীয় কেরায়াত অনুযায়ী বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়-বাস্তবায়নযোগ্য। কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না। আর মুফাযযল بَالِغًا অর্থাৎ حَالٌ হিসাবে পড়েছেন। তখন قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا -কে إِنَّ -এর خَبَرْ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ ...... وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যখন তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীদেরকে রাজয়ী তালাক দিয়ে থাক এবং স্ত্রীগণ ইদ্দত শেষ করার নিকটবর্তী হয়ে আসে, তখন তোমরা অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে, যদি তাদেরকে রাজয়াত করে রাখা উত্তম বা সমীচীন মনে কর, তবে সুন্নত নিয়মানুসারে তাদেরকে রেখে দাও। আর যদি ছেড়ে দেওয়া উত্তম মনে কর, তাহলেও সুরীতির ভিত্তিতেই ছেড়ে দিবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী রাখা একান্ত আবশ্যক। সে সাক্ষীগণ অতি ন্যায্য বিচারক বা সৎব্যক্তি হতে হবে। উক্ত উপদেশাবলি পরকালীন শান্তিকামীদের জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে।

أَجَلَهُنَّ-এর অর্থ : উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَجَلَهُنَّ শব্দ দ্বারা ইদ্দতের অর্থ নেওয়া হয়েছে, যা হানাফীগণের মতে তিন حَيْض অথবা তিন মাস নির্ধারিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ মহিলাগণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করবে। আর হানাফীগণ ইদ্দত طُهْر দ্বারা গণনা করেছেন এবং قُرُوْء অর্থ طُهْر নিয়েছেন।

আর بُلُوْغ أَجَل অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। অর্থাৎ ইদ্দত কয়েকদিন তথা ৬, ৭ বা ৮ দিন বাকি থাকে।

هٰذَا حُكْمٌ خَامِسٌ لِلطَّلَاقِ এটা তালাক সম্পর্কীয় ৫ম হুকুম অর্থাৎ বলা হয়েছে, رَجْعَةٌ-এর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা। ৬ষ্ঠ নম্বরে বলা হয়েছে রাখা সমীচীন না হলে বিধান মতে ত্যাগ করে দেওয়া। ৭ম নম্বরে বলা হয়েছে, দু'জন সত্য লোককে সাক্ষী রাখা। ৮ম নম্বরে বলা হয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সাক্ষী রাখবে, কোনো বান্দার উদ্দেশ্যে নয়।

রাজয়াত এবং বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানোর হুকুম : আলোচ্য আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে রাজয়াত করতে নতুবা বিচ্ছিন্ন করে দিতে বলা হয়েছে। আর এ উভয় কাজে সাক্ষ্য বানাতে বলা হয়েছে, এর প্রেক্ষিতে এ নির্দেশ ওয়াজিব না মোস্তাহাবের জন্য সে ব্যাপারে ইমামাদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, বিচ্ছিন্নকরণ এবং রাজয়াতকরণ উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব। কারণ আল্লাহর বাণী وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ "যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষ্য রাখো" এ নির্দেশের ফলে সাক্ষ্য বানানো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তেমনি এখানে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে রাজয়াত করতে বলেছেন, অতঃপর সাক্ষ্য বানাতে বলেছেন, তা হতে বুঝা যায় যে, সাক্ষ্য রাখার পূর্বে রাজয়াত করলে জায়েজ হবে। কারণ তাতে সাক্ষ্য গ্রহণকে রাজয়াত বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়নি। এটা ইমাম মালিক এবং আহমদ ও শাফেয়ীর উভয়ের দু' মতের একমত।

খ. ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) অন্য মতে বলেছেন, রাজয়াতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানো ওয়াজিব, আর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রাক্কালে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

সাক্ষ্য বানানোর লাভ বা ফায়দা : সাক্ষ্য না বানালে তালাক হবে না বা রাজায়াত শুদ্ধ হবে না এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদও শুদ্ধ হবে না-এমন কথা যখন নয়, অর্থাৎ সাক্ষ্য বানানো যখন এসব কাজের জন্য জরুরি নয় তখন সাক্ষ্য বানানোর লাভ কোথায়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। কেননা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো একটি পক্ষ পরে কোনো ব্যাপারে অস্বীকার করে বসতে পারে, যা ঝগড়ার কারণ হতে পারে এবং তার ফলে সহজে মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এ পরিস্থিতি যাতে না হতে পারে সে জন্যই সাক্ষ্য রাখার এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সন্দেহের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, সাক্ষ্য বানানোতে লাভ হলো- দু' জনের কেউই যেন কোনো কিছু পরে অস্বীকার করতে না পারে। আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলে যেন স্বামীকে কোনো তোহমত বা অভিযোগের সম্মুখীন না হতে হয়। আর এ অবস্থাও যেন না হয় যে, দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেল তখন অন্যজন মিরাস পাওয়ার আশায় স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহালের দাবি করল। আরো বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে। যেন স্ত্রী রাজয়াত অস্বীকার করে ইদ্দত শেষে অন্যস্থানে বিবাহ বসতে না পারে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا : উক্ত আয়াতের অর্থ "যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো না কোনো পথ করে দিবেন।"

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো, যে লোক ইদ্দতের জন্য তালাক দিবে- অর্থাৎ যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়নি; সে তুহুরে তালাক দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাজয়াত করার পথ খুলে দিবেন। অন্যরা বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো যে কোনো বিপদ সংকুল অবস্থা হতে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। কলবী বলেছেন, যে লোক মসিবতে ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হতে জান্নাতে যাবার পথ খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, এর অর্থ দুনিয়ার সন্দেহসমূহ হতে, মৃত্যুর যন্ত্রণা হতে এবং কিয়ামত দিবসের কঠোরতা হতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দিবেন।

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ : অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ আয়াতটি এবং তার পরের আয়াত হযরত আউফ ইবনে মালিক আল-আশজায়ী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর এক ছেলে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং নিজের দুঃখ আর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন। এ কথা শুনে তাকে বললেন. আল্লাহকে ভয় করো, আর ধৈর্য অবলম্বন করো এবং বেশি বেশি لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ো। তখন লোকটি তা করতে থাকেন। একদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন তখনই তাঁর সন্তান চলে আসল। শত্রুরা তাঁকে ভুলে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় সে শত্রুদের একশত উট নিয়ে চলে আসল। তখন তিনি (পিতা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সব ঘটনা বললেন এবং এ উটগুলো খেতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খেতে বললেন। তখনই وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ আয়াতটি নাজিল হলো। [এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় কিছুটা রদ বদল রয়েছে।] -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আয়াতে কারীমা হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : শানে নুযূলে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, যদি কোনো মুসলমান কাফিরদের নিকট (قَيْد) আটকা পড়ে যায়, অতঃপর তাদের কোনো সম্পদ নিয়ে পলায়ন করে আসতে পারে, তবে তা مَالُ غَنِيْمَتْ -এর حُكْم অনুসারে তার পাঁচ ভাগের এক অংশ بَيْتُ الْمَالِ -এ সোপর্দ করা وَاجِبْ নয়। কেননা উক্ত مَالِكُ الْاَشْجَعِىْ -এর পুত্র যে উট বা বকরি নিয়ে পালিয়ে আসছিল সেগুলো সম্পূর্ণ তাদেরকে স্বীয় কাজে ব্যয় করতে বলেছেন। ফকীহগণ বলেন, যদি কোনো মুসলমান চুপিসারে শত্রুদের রাষ্ট্রে বিনা নির্দেশে ঢুকে যায় এবং কাফেরদের দেশ হতে তাদের কোনো মালামাল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তবে উক্ত হাদীসের আলোকে তা মুসলমানদের খাওয়া বৈধ হবে। আর তা হতে بَيْتُ الْمَالِ -এ কোনো অংশ দেওয়া আবশ্যক নয়।

তবে যদি কোনো মুসলমান কাফেরদের দেশে (دَارُ الْحَرْبِ) যাওয়ার জন্য ভিসা ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে যায়, তখন তাদের অনুমতিবিহীন কোনো সম্পদ নিয়ে আসা জায়েজ হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে مُعَاهَدَةْ বা চুক্তিপত্র হয়েছে বলেই ভিসার মাধ্যমে আগমন প্রস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা আমানতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো কাফের থেকে কোনো মুসলমান নির্দেশবিহীন কোনো বস্তু হরণ করলে ওয়াদা ভঙ্গ করার দায়ে আবদ্ধ হবে। আর ওয়াদা ভঙ্গ করা شَرْعًا হারাম বলা হয়েছে।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বহু কাফের বহু আমানত রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের মুহূর্তে সেগুলো হযরত আলী (রা.) -এর নিকট বুঝিয়ে দিয়ে হিজরত করেছেন, তবে আমানত খেয়ানত করেননি। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ الخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহ তার সকল ক্ষুদ্র ও মহাগুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলো সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবেন। কেননা তিনি তার সকল কার্য যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করেই থাকেন। তিনি সকল বিষয়ের জন্য একটি اِنْدَازْ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা অনুসারেই সকল কার্য করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا
অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাঁর হক অনুসারে তাওয়াক্কুল করতে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক প্রদান করতেন, যেভাবে পক্ষীদেরকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালবেলায় স্বীয় বাসা হতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় পেট পুরিয়ে বাসায় ফিরে আসে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يَدْخُلُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ اُمَّتِىْ كُلُّهُمْ مُتَوَكِّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ (اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ) অর্থাৎ সত্তর হাজার তাওক্কুলকারী আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে।

তাওয়াক্কুল-এর অর্থ : تَوَكُّلْ -এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিকৃত সকল বিষয় ও ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে; বরং সকল বিষয়ের সকল উপকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে বসে থাকবে। এটাই تَوَكُّلْ -এর মূল অর্থ। তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ . وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْآ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ :

٤. وَالّٰـتِى بِـهَـمْـزَةٍ وَيَـاءٍ وَبِـلَا يَـاءٍ فِـى الْمَوْضَعَيْنِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِىْ عِدَّتِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰـتِىْ لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالْمَسْئَلَتَانِ فِىْ غَيْرِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَمَّا هُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ مَا فِىْ اٰيَةِ الْبَقَرَةِ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اِنْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ مُطَلَّقَاتٍ اَوْ مُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

৪. আর যে সকল স্ত্রী শব্দটি উভয় ক্ষেত্রেই হামযা ও ইয়া এবং ইয়া ব্যতীত উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। নিরাশ হয়েছে ঋতুস্রাব হতে اَلْمَحِيْض শব্দটি حَيْض অর্থে ব্যবহৃত তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হতে, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তাদের ইদ্দত প্রশ্নে সন্দিহান হও তবে তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। আর যে সকল স্ত্রী এখনও ঋতুবতী হয়নি স্বল্প বয়স্কতার কারণে, তাদের ইদ্দতও তিন মাস। আর এ উভয় মাসআলা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন তাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করেনি। অর্থাৎ তালাকের ইদ্দত, স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত নয়; কিন্তু স্বামী মৃত্যুর ক্ষেত্রে এরূপ স্ত্রীলোকের ইদ্দত চার মাস দশ দিন। যেমন, সূরা বাক্বারায় يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا। উল্লিখিত হয়েছে। আর গর্ভবতী মহিলাগণের ইদ্দতকাল ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময়কাল যদিও সে তালাকপ্রাপ্তা কিংবা স্বামী মৃত হোক তাদের গর্ভ খালাস পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

٥. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْعِدَّةِ اَمْرُ اللّٰهِ حُكْمُهٗ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا ـ

৫. এটা ইদ্দত সম্পর্কে উল্লিখিত বিধান আল্লাহর বিধান আদেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করে দিবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَئِسْنَ : জমহুর এটাকে يَئِسْنَ অর্থাৎ فِعْل مَاضِى হিসাবে পড়েছেন। আবার তাকে يَيْئِسْنَ অর্থাৎ দুই يَاءٌ দিয়ে مُضَارِعْ হিসাবেও পঠিত হয়েছে। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী, বাহরুল মুহীত]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى حَمْلَهُنَّ : জমহুর حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ একবচন পড়েছেন, আর যাহহাক তাকে اَحْمَالَهُنَّ অর্থাৎ বহুবচন করে পড়েছেন। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يُعْظِمْ : জমহুর তাকে اَعْظَمَ-এর مُضَارِعْ হিসাবে يُعْظِمْ পড়েছেন। আর আ'মাশ نُعْظِمْ পড়েছেন। অর্থাৎ يَاءٌ-এর স্থানে نُوْنٌ দিয়ে পড়েছেন। আর ইবনে মাকহাম يُعَظِّمْ অর্থাৎ ظَاءٌ তে تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ হলো مُبْتَدَأٌ আর اَجَلُهُنَّ হলো مُبْتَدَأٌ ثَانِيْ আর اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হলো مُبْتَدَأٌ ثَانِيْ -এর خَبَرْ - مُبْتَدَأٌ ثَانِيْ -এর সাথে তার خَبَرٌ মিলে مُبْتَدَأٌ اَوَّلْ -এর خَبَرْ হয়েছে। আর اَجَلُهُنَّ -কে اُولَاتُ হতে بَدَلْ اِشْتِمَالٌ -ও বলা যেতে পারে। তখন اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হবে خَبَرْ । -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল :

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে মহিলার হায়েজ হয় তার ইদ্দত সম্পর্কে তো জানতে পেরেছি; কিন্তু যাদের হায়েজ হয় না তাদের ইদ্দত কি রকম? তখন وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ আয়াতটি নাজিল হয়। -[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রাওয়ায়ে]

২. হাকিম, ইবনে জারীর, তাবারী এবং বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা বাক্বারায় তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং স্বামীমৃত মহিলাদের ইদ্দত সম্বলিত আয়াত নাজিল হলো, তখন উবাই ইবনে কা'ব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ মদীনার কিছু মহিলা বলছেন যে, কিছু কিছু মহিলা এখনও এমন রয়ে গেছে যাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন কোন মহিলা সম্বন্ধে বলা হয়নি? তখন তিনি বললেন, ছোট এবং বড় (অর্থাৎ যাদের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে) আর গর্ভবতী মহিলা। তখনই এ আয়াতটি নাজিল হয়। -[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

৩. ইমাম বাগবী, ওয়াহেদী ও খাযেন (র.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতটি নাজিল হলো, তখন খালেদ ইবনে আন-নো'মান আনসারী (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেসব মহিলার হায়েজ হয় না, আর যাদের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত কি রকম? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।
-[রাওয়ায়ে, কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

মুজাহিদের মতে, এ আয়াত যেসব মহিলার ইস্তেহাযার কারণে হায়েজের রক্ত না রোগের রক্ত জানা যায় না, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ : ইমাম জাস্সাস (র.) বলেছেন, এর অর্থ 'আয়েসা' হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ হতে পারে না, কারণ আমরা কোনো মহিলা 'আয়েসা'র বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ করলে বলিনা যে, তার ইদ্দত তিন মাস। অতঃপর তিনি বলেন, এখানে সন্দেহ বা اِرْتِيَابٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করে। সুতরাং এর অর্থ হলো, তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক হায়েজ হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে [তোমরা জেনে রেখো যে,] তাদের ইদ্দত তিন মাস।

ইমাম তাবারীও এ অর্থকেই গ্রহণ করেছেন, গ্রন্থকারেরও এ অভিমত, ইমাম তাবারী বলেন, 'যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, আর তোমরা তাদের হুকুম কি তা না জানতে পার, তাহলে জেনে রাখো যে, তাদের হুকুম হলো তাদের ইদ্দত তিন মাস।'

হযরত ইকরামা এবং কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, 'রীবা' বা সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত হলো সে রুগ্‌ণ মহিলা, যার হায়েজ ঠিক থাকে না। মাসের প্রথম দিকে কয়েকবার হয়েজ হয়, আবার কতেক মাসে একবারও হয়।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, 'যদি তোমাদের ইয়াকীন হয়' এ শব্দটি পরস্পর বিরোধী অর্থ দানকারী শব্দসমূহের মধ্যে একটি। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, জাস্সাস, কাবীর, রাওয়ায়ে]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ : وَالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ হলো مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرْ উহ্য রাখা হয়েছে। আর তা হলো فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ যাদের এখনও হায়েজ আসেনি তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। অর্থাৎ হায়েজ অল্পবয়স্কতার কারণে আসেনি, কিংবা অনেক স্ত্রীলোকের যেমন বহু বিলম্বে হায়েজ হয়, এমনিভাবে সারা জীবনে হায়েজ হয় না এমন স্ত্রীলোক কমই হয়ে থাকে। যা হোক না কেন সব অবস্থাই এ ধরনের স্ত্রীলোকের ইদ্দত তা-ই যা হায়েজ হওয়া হতে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দত। অর্থাৎ তালাকের সময় হতে তিন মাস।

এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় সে স্ত্রীলোকের যার সাথে স্বামী নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হয়েছে। কারণ নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। -[আল-আহযাব-৪৯]

এ কারণে যেসব স্ত্রীলোকের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত বর্ণনা করার সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, এ বয়সে স্ত্রীলোকের শুধু বিবাহ দেওয়াই জায়েজ নয়; বরং তার সাথে স্বামীর নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়াও জায়েজ। ফলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে যাকে জায়েজ বলা হয়েছে তাকে নিষিদ্ধ করার সাহাস বা অধিকার কোনো মুসলমানেরই হতে পারে না।

যে স্ত্রীলোকের হায়েজ আসা শুরু হয়নি, তাকে যদি তালাক দেওয়া হয় এবং পরে ইদ্দত পালনকালে তার হায়েজ এসে পড়ে, তাহলে সে সেই হায়েজ হতেই ইদ্দত পালন শুরু করবে এবং হায়েজ সম্পন্না স্ত্রীলোকের মতোই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। -[কুরতুবী]

কোন সময় থেকে ইদ্দত পালন করবে? : চন্দ্র মাসের শুরুতে তালাক দেওয়া হলে চন্দ্র দেখা অনুযায়ী তালাকের সময় বা ইদ্দত হিসাব করতে হবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত।

আর যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ৩০ দিনের মাস গণনা করে তিনটি ইদ্দত পালন করতে হবে।

যে সকল স্ত্রীলোকের হায়েজ হওয়ার মধ্যে অনিয়মতা দেখা দিয়েছে, তাদের ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.)-এর মতে যদি مُطَلَّقَةٌ মহিলাটির ২/১টি হায়েজ আসার পর হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইকরামাহ ও কাতাদাহ (রা.) বলেন, যে স্ত্রীর সারা বছরও হায়েজ হয়নি, তার ইদ্দত তিন মাস। হযরত তাউস (রা.) বলেন, যে স্ত্রীলোকের বছরে মাত্র একবার হায়েজ হয়েছে তার ইদ্দত তিন হায়েজ।

হযরত ওসমান, আলী, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)ও এ মত প্রকাশ করেন।

ইমাম মালিক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, ওসমান, আলী ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর মতো মত প্রকাশ করে বলেন, যে স্ত্রীর বছরে মাত্র একবার হায়েজ হয়েছে তার ইদ্দত তিন হায়েজ পালন করতে হবে। তিনি হাব্বান নামক এক ব্যক্তির ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। ঘটনাটি এই- হাব্বান নামক জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেন, তখন স্ত্রী তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিল, এমতাবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু স্ত্রীর হায়েজ হয়নি। তারপর হাব্বান মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির মিরাসের দাবি করল।

এ মামলা হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট পেশ হলে তিনি হযরত আলী ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এর পরামর্শক্রমে উক্ত স্ত্রীকে মিরাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক করলেন। কারণ স্ত্রী আয়েসাও নয় আবার সগীরাহও নয়; সুতরাং স্ত্রীর হায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় স্ত্রী এক হায়েজের লক্ষ্যে স্বামীর স্ত্রীর রূপে গণ্য রয়েছে, তাই মিরাস পাবে।

হানাফী মাযহাব অবলম্বীগণ বলেন, যে স্ত্রীর হায়েজ আগমন বন্ধ হয়নি; বরং তাতে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তালাক হয়ে গেলে সে তিন হায়েজ অনুপাতে ইদ্দত পালন করতে হবে। কারণ উক্ত মহিলা সগীরা ও আয়েসা কোনো এক প্রকারের নয়। হ্যাঁ, তবে একেবারেই যদি حَيْضٌ বন্ধ হয়ে আয়েসা হয় অথবা অনুপযুক্তা হয়, তবে ইদ্দত তিন হায়েজ পালন করবে।

ইমাম শাফেয়ী, সাবী, লাইস, হযরত আলী ও ওসমান (রা.) -এর মতও এটাই।

হাম্বলী মাযহাব অবলম্বনকারীগণের অভিমত হলো, যে স্ত্রীলোকের ইদ্দত হায়েজ হিসাবে গণনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সে ইদ্দতের মধ্যে হায়েজ হয়নি, যদি এমন স্ত্রীলোক হয় (অর্থাৎ হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়) তবে সে আয়েসা মহিলার ন্যায় ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি অজ্ঞাত কারণে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন প্রথমত ৯ মাস অতিবাহিত করবে, পরে আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর হায়েজ বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হলে হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হায়েজ হিসেবে ইদ্দত পালন করবে।

(اَلْاِنْصَافُ فِیْ مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلَافِ عَلٰی مَذْهَبِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ)

আল-আহযাব গ্রন্থের বর্ণনায় বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর خَلْوَتْ صَحِيْحَةٌ নিবিড় একাকিত্বে মিলন হয়ে থাকলে عِدَّتْ পালন করা আবশ্যক, অন্যথায় عِدَّتْ পালন জরুরি নয়। -[আল-আহযাব- ৪৯]

মৃত্যুর ইদ্দতের সাথে গর্ভবতী থাকলে তার হুকুম : হামল ও ওফাতের ইদ্দত একত্রিত হলে, তখন কিভাবে ইদ্দত পালন করতে হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এ মতবিরোধের একমাত্র কারণ হলো, সূরা আল-বাক্বারা -এর ২৩৪ নং আয়াতে স্বামীমৃত স্ত্রীর ইদ্দত। স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন পালন করতে বলা হয়েছে। সাধারণ বিধবা ও গর্ভাবস্থায় বিধবা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে এ ইদ্দত প্রযোজ্য হবে কিনা তা এখানে বিস্তারিত বলা হয়নি। স্বামীমৃত স্ত্রীর ইদ্দত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا الاية আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে। (وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الاية এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) এভাবে মাসআলা বের করেছেন ও বলেছেন যে, গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত শেষ হবে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দত দু'টি মিয়াদের মধ্যে দীর্ঘতম মেয়াদ। অর্থাৎ গর্ভবতী ও তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যা দীর্ঘতম হয় তাই পালন করতে হবে। যাথ- ৪ মাস ১০ দিনের মধ্যে যদি গর্ভখালাস হয়ে যায়, তাহলে এটাই ইদ্দত। আর যদি ৪ মাস ১০ দিনের মধ্যে গর্ভখালাস না হয়, তবে যত দিনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তত দিনই ইদ্দত। এতে ১২ মাস প্রয়োজন হলে ১২ মাসই পালন করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সূরা আত-তালাক্বের এ আয়াত وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ সূরা বাক্বারাহ-এর আয়াতের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতকে পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, গর্ভবতী বিধবার জন্য ইদ্দত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা হোক, কিংবা বিধবা হোক, গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, সূরা ত্বালাক্বের আয়াতটি নাজিলকালে আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত ছিলাম। যখন তা নাজিল হয়, তখন আমি হুযূরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি তালাকপ্রাপ্তা বিধবা ও গর্ভবতী সকলের জন্য? তখন হুযূর ﷺ জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

অপর একটি বর্ণনায় এর স্বপক্ষে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ اَنْ تَضَعَ مَا فِىْ بَطْنِهَا ইবনে জারীরা ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার (র.)ও এ মত পেশ করেন।

এটা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যায় সুবাইয়া আসলামীয়ার ঘটনা হতে, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল। সে গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরই [কোনো কোনো বর্ণনায় ২০ দিন, কোনোটিতে ২৩ দিন, কোনোটিতে ২৫ দিন, কোনোটিতে ৪০ দিন, আবার কোনোটিতে ৩৫ দিন বলা হয়েছে।] তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। নবী করীম ﷺ-এর নিকট তার ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাকে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দিলেন। -[বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

মুসলিম শরীফে স্বয়ং সুবাইয়া আসলামিয়ার এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, আমি হযরত সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজের সময় আমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়, তখন আমি গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর আমার সন্তান প্রসব হয়। তখন একজন বলল, তুমি চার মাস দশ দিনের পূর্বে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি ফতোয়া দিলেন, 'তুমি সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইদ্দত মুক্ত হয়েছ এবং ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পার।' বুখারী শরীফেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হয়েছে। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ বারবার দানের কারণ : আবূ হাইয়ান বলেছেন, যেহেতু এখানে তালাক এবং তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধানের আলোচনা হয়েছে, আর স্বামীরা সাধারণত ঘৃণা এবং হিংসা প্রবণ হয়েই স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে থাকেন। সেহেতু কোনো কোনো বাক্যের বা বিষয়ের আলোচনার পর বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তালাকদাতা স্বামী কখনও কখনও স্ত্রী সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা প্রচার করে থাকে, যার ফলে স্ত্রীর সম্মানহানী ঘটে এবং তার পাণি-প্রার্থীরা ফিরে যায়, তারা মনে করে- পূর্বের স্বামী এ স্ত্রী লোকটির বড় কোনো দোষের কারণে তাকে তালাক দিয়েছে। এসব কারণেই বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে স্ত্রীগণের অধিকার আদায় এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বামীরা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে কষ্ট না দেয় এবং তাদের প্রাপ্য তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করলে আল্লাহ তাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে অধিক পরিমাণে ছওয়াব দিবেন।

-[রাওয়ায়েউল বয়ান]

٦. اَسْكِنُوْهُنَّ اَىِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ اَىْ بَعْضَ مَسَاكِنِكُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ اَىْ سَعَتِكُمْ عَطْفُ بَيَانٍ اَوْ بَدْلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِاِعَادَةِ الْجَارِ وَتَقْدِيْرِ مُضَافٍ اَىْ اَمْكِنَةِ سَعَتِكُمْ لَا مَا دُوْنَهَا وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط اَلْمَسَاكِنَ فَيَحْتَجْنَ اِلَى الْخُرُوْجِ اَوِالنَّفْقَةَ فَيَفْتَدِيْنَ مِنْكُمْ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ اَوْلَادَكُمْ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ج عَلَى الْاِرْضَاعِ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ج بِجَمِيْلٍ فِىْ حَقِّ الْاَوْلَادِ بِالتَّوَافُقِ عَلٰى اَجْرٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِرْضَاعِ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ تَضَايَقْتُمْ فِى الْاِرْضَاعِ فَامْتَنَعَ الْاَبُ مِنَ الْاُجْرَةِ وَالْاُمُّ مِنْ فِعْلِهِ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ لِلْاَبِ اُخْرٰى وَلَا تُكْرَهُ الْاُمُّ عَلٰى اِرْضَاعِهِ.

٧. لِيُنْفِقْ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ ط اَىْ عَلٰى قَدْرِهِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتَاهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا وَقَدْ جَعَلَهٗ بِالْفُتُوْحِ.

অনুবাদ :

৬. তোমরা তাদেরকে বাসস্থান দান করো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণকে যেথায় তোমরা বসবাস কর অর্থাৎ তোমাদের বাসগৃহ মধ্য হতে কোনো বাসগৃহে তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের জন্য সম্ভব, এটা عَطْفُ بَيَانٍ অথবা পূর্ববর্তী বক্তব্যের بَدْل হরফে জার পুনরুল্লেখ করে অথবা مُضَافٌ উহ্য সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ তোমাদের সামর্থ্যানুরূপ বাসগৃহ দান করো, তদপেক্ষা নিম্নমানের নয়। আর তাদেরকে উত্যক্ত করো না, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য সঙ্কীর্ণ বাসস্থান দেওয়ার মাধ্যমে, যাতে সে বের হতে বাধ্য হয়, কিংবা নাফকা দান ক্ষেত্রে যাতে সে তোমাদের নিকট হতে ফিদিয়া গ্রহণে বাধ্য হয়। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তারা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করো। অনন্তর তারা যদি তোমাদের পক্ষ হতে স্তন্য দান করে তোমাদের সন্তানকে তার স্তন হতে দুগ্ধ পান করায় তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দান করো। স্তন্যদানের বিনিময়ে আর তোমাদের মধ্যে পরামর্শ করো এবং তাদের মধ্যে সঙ্গতভাবে উত্তমরূপে, সন্তানের কল্যাণ বিষয়ে স্তন্য দানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর একমত হওয়ার মাধ্যমে। আর যদি তোমরা অনমনীয় হও স্তন্য দান প্রশ্নে সঙ্কটে পতিত হও, এভাবে যে, পিতা পারিশ্রমিক দানে অস্বীকৃত হয় এবং মা স্তন্য দানে অনীহা প্রকাশ করে তবে তার পক্ষে স্তন্য দান করবে পিতার পক্ষে অন্য কোনো নারী মাকে স্তন্য দানে বাধ্য করা হবে না।

৭. যেন ব্যয় করে তালাকপ্রাপ্তা ও স্তন্য দানকারিণীগণের জন্য সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী। আর যার উপর সীমিত হয়েছে সঙ্কীর্ণ হয়েছে তার জীবিকা, তবে সে যেন ব্যয় করে যা তাকে দান করেছেন দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ সে পরিমাণে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দান করেছেন, তিনি তার উপর তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা আরোপ করেন না। অচিরেই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন। বিজয়সমূহ মাধ্যমে আল্লাহ সে অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حُكْمُ النَّفَقَةِ : স্ত্রীর জন্য স্বামীর সামর্থ্যানুসারে نَفَقَةٌ -এর ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

قَوْلُهُ مِنْ وُجْدِكُمْ : জমহুর مِنْ وُجْدِكُمْ -এর وَاوْ এ- ضَمَّةٌ দিয়ে مِنْ وُجْدِكُمْ পড়েছেন। হাসান বসরী এবং আরো অনেকেই وَاوْ এ- فَتْحٌ দিয়ে مِنْ وَجْدِكُمْ পড়েছেন। আর ইবনে মাকছাম এবং আরো অনেকেই وَاوْ এ- كَسْرَةٌ দিয়ে مِنْ وِجْدِكُمْ পড়েছেন। এভাবে এ শব্দটিকে তিন রকম পড়া হয়েছে। -[রাওয়ায়ে, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ "لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ" : জমহুর لِيُنْفِقْ অর্থাৎ لَامْ اَمْر হিসাবে পড়েছেন। আর আবূ মা'আজ لِيُنْفِقَ -এর কেরাত বর্ণনা করেছেন, لَامْ -কে لَامْ كَيْ হিসাবে পড়ে قَافْ এ- فَتْحٌ দিয়ে পড়া। তখন একটি جُمْلَةٌ مَحْذُوْفٌ -এর সাথে এর সম্পর্ক হবে, যার تَقْدِيْر হবে- شَرَعْنَا ذٰلِكَ لِيُنْفِقَ । -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী, যাদুল মাসীর, বাহার]

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ : জমহুর একে قُدِرَ পড়েছেন অর্থাৎ مُخَفَّفٌ করে পড়েছেন, আর ইবনে আবূ আয়লা تَشْدِيْد যুক্ত করে قُدِّرَ পড়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব قَدَّرَ পড়েছেন। অর্থাৎ قَافْ এ- ضَمَّةٌ আর دَالْ এ- تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَسْكِنُوْهُنَّ ...... لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদেরকে (ইদ্দতের সময়কালে) সেস্থানে থাকতে দাও যেখানে তোমরা বসবাস কর, যে রকম স্থানই তোমাদের হোক না কেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না। আর তারা যদি গর্ভধারিণী হয়, তাহলে তাদের ব্যয়ভার বহন করো, সে সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তাদের গর্ভ প্রসব হয়।"

এক. এ ব্যাপারে সব ফিক্হবিদই এক মত যে, স্ত্রীকে যদি রিজয়ী তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোশ দেওয়ার দাযিত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে।

দুই. আর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাকে রেজয়ী তালাক দেওয়া হোক কিংবা তিন তালাকই দেওয়া হয়ে থাকুক, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার বসবাস ও খোরপোশ দেওয়ার দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে। এতে ফিক্হবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তিন. যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী নয়, তাকে যদি তিন তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, সে স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোশের ব্যাপারে ফিক্হবিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ক. কিছু সংখ্যক ফিক্হবিদদের মত হলো, সে থাকা-খাওয়া-পরা সব কিছুই পাবে। হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আলী ইবনে হোসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন), কাযী শুরাইহ ও ইমাম নাখয়ী (র.) এ মত দিয়েছেন। হানাফী মাযহাব এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং হাসান ইবনে সালেহও এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত দলিলসমূহ পেশ করে থাকেন-

১. পবিত্র কুরআনে বাসস্থান দিতে বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, "কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না" খাওয়া-পরা না দেওয়ার চেয়ে আর বড় কষ্ট কি হতে পারে?

২. দারাকুতনীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ" অর্থাৎ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।

৩. কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে ফাতিমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীসটিকে হযরত ওমর (রা.) এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন যে, আমরা একজন স্ত্রীলোকের কথায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুন্নতকে ত্যাগ করতে পারি না। এটা হতে প্রমাণিত হয়, হযরত ওমর (রা.) নিশ্চিত জানতেন যে, এ ধরনের স্ত্রীকে বাসস্থান ও খোরপোশ দেওয়াই রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুন্নত। ফলে এ সব হাদীস হতে আলোচ্য মতের সমর্থন পাওয়া যায়; বরং হযরত ইব্রাহীম নাখয়ীর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস প্রত্যাখ্যান করার সময় বলেছেন- سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ. "আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি- এ ধরনের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।"

এ মতাবলম্বীরা এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তি পেশ করেছে, যা ফিক্হ এবং তাফসীরের কিতাবগুলোতে রয়েছে।

খ. অন্য কতিপয় ফিক্‌হবিদ বলেন, তিন তালাকে বায়েন দেওয়া স্ত্রী বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী, কিন্তু খাওয়া-পরা পাওয়ার অধিকারী হবে না। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সুলাইমান, ইয়াসার, আতা, শা'বী, আওযায়ী, লাইস, আবূ ওবাইদ (রা.) প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকও এ মত গ্রহণ করেছেন। তারা তাঁদের মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যখন বসবাসের স্থানের আলোচনা করেছেন, তখন তাকে সব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য মুতলাক রেখেছেন। আর যখন খাওয়া-পরা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তখন কিন্তু গর্ভের শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং তা হতে বুঝা গেল যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য নাফকা বা খাওয়া-পরা স্বামীকে দিতে হবে না।

গ. আর কিছু সংখ্যক ফিকহবিদ বলেন, তিন তালাকে বায়েন দেওয়া স্ত্রী না বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী, না খাওয়া-পরা পাওয়ার। হাসান বসরী, হাম্মাদ ইবনে আবূ লাইলা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আবূ ছাওর প্রমুখের এ মত। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাসের এ মত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত গ্রহণ করেছেন।

এ মতের একটি দলিল হলো, কুরআন মাজীদের এ আয়াত لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি জান না আল্লাহ তা'আলা হয়তো এরপর মিলমিশের কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিতে পারেন।"

এ আয়াত হতে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এ আয়াতটি রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে– বায়েন তালাকপ্রাপ্তার জন্য নয়। এ কারণে তালাকপ্রাপ্তার জন্য ঘরে থাকার যে অধিকার, তাও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য নির্দিষ্ট।

ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার খোরপোশের জন্য কিছু খরচও দিয়েছিলেন, যা অপর্যাপ্ত ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, তা আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবগত করবো। সত্যই আমি যদি খাওয়া-পরার হকদার হয়ে থাকি তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে নিবো। আর যদি হকদার না হই তাহলে কিছুই নিবো না। তিনি বলেন, তা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবগত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنٰى "তোমার জন্য না খাওয়া পরার খরচ আছে না বসবাসের স্থান।"

আমরা আগেই বলেছি, হযরত ওমর (রা.) এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন এবং তিনি প্রত্যাখ্যানের প্রাক্কালে একথাও বলেছিলেন যে, আমি এক মহিলার কথা গ্রহণ করে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত ত্যাগ করতে পারি না। অতঃপর তিনি বলেছেন– আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোশ পাবে। তা ছাড়া আরো অনেক কারণে এ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করা যেতে পারে না। –[রাওয়ায়ে, জাস্‌সাস, ফাতহুল কাদীর]

চার. যে স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সে স্ত্রীলোক কি খাওয়া-পরার খরচ পাবে, না পাবে না এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ক. হযরত আলী, ইবনে ওমর, ইবনে মাসউদ (রা.), কাযী শুরাইহ, ইমাম নাখয়ী, শা'বী, হাম্মাদ ইবনে আবূ লাইলা ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) এবং আরও আনেকেই বলেছেন যে, স্বামীর যাবতীয় সম্পদ হতে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাকে খাওয়া-পরার খরচ দিতে হবে।

খ. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (রা.) বলেন, মৃতের সম্পত্তিতে তার জন্য না থাকার স্থান পাওয়ার অধিকার আছে, না খাওয়া-পরা পাওয়ার। কেননা মৃত্যুর পর মৃতের কোনো মালিকানাই নেই। অতঃপর তা সবই ওয়ারিশানদের সম্পত্তি। তাদের সম্পত্তি হতে গর্ভবতী বিধবার খরচাদি বহন করা কি করে ওয়াজিব হতে পারে? [হেদায়া জাস্‌সাস] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত দিয়েছেন। –[আল-ইনসাফ]

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাঁর খরচাদি প্রাপ্য নয়। তবে সে থাকার স্থান পেতে পারে। [মুগনী-উল মুহতাজ] তিনি দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন–হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফুরাইয়া বিনতে মালিকের একটি ঘটনাকে। ঘটনাটি এই যে, তাঁর স্বামী যখন শহীদ হলেন, তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে হুকুম দিলেন যে, স্বামীর ঘরেই ইদ্দতকাল অতিবাহিত করবে। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] তিনি দারাকুতনীর একটি বর্ণনাকেও দলিল বানিয়েছেন। বর্ণনাটি এই– রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, لَيْسَ لِلْحَامِلِ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ অর্থাৎ বিধবা গর্ভবতীর খরচাদি পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। ইমাম মালিক (র.)ও এ মত প্রকাশ করেছেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ .... بِمَعْرُوْفٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পরে সে যদি তোমাদের জন্য [সন্তানকে] দুধ পান করায় তবে তার পারিশ্রমিক তাদেরকে দাও এবং [পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি] ভালোভাবে পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও।" এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তখন সে নবজাতক সন্তানকে কে দুধ পান করাবে? এ সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে- যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে সে পর্যন্ত সন্তানকে দুধপান করানো স্ত্রীর জিম্মায় ওয়াজিব, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ অর্থাৎ "মায়েরা তাদের সন্তনদেরকে দুধ পান করাবে।" সুতরাং ওয়াজিব কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক নিতে পারবে না, ইদ্দতকালও যেহেতু বিবাহ-কালের মধ্যেই গণ্য সেহেতু ইদ্দতকালেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তখন [স্ত্রী চাইলে] স্তন্য দানের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়াকে আলোচ্য আয়াতে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, এ নির্দেশ হতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিকথা জানা যায়-

১. স্ত্রী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। নতুবা তা কোনো শিশুকে সেবন করাবার জন্য মূল্য গ্রহণ করার অধিকারী হতো না।

২. সন্তান প্রসব হওয়ার পরই সে যখন তার পূর্ব স্বামীর বিবাহ হতে মুক্ত হয়ে গেল, তখন শিশুকে দুধ পান করাতে সে আইনত বাধ্য নয়। পিতা যদি তার দুধ শিশুকে খাওয়াতে চায় এবং সেও তাতে রাজি থাকে, তবে সে শিশুকে দুধ খাওয়াবে এবং সেজন্য সে মজুরি গ্রহণ করার অধিকারী হবে।

৩. পিতাও এ মায়ের দুধই শিশুকে সেবন করাতে আইনত বাধ্য নয়।

৪. সন্তানের খরচাদি বহন করা পিতার দায়িত্ব।

৫. শিশুকে দুধ খাওয়াবার সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য অধিকারী তার মা। অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা দুধ খাওয়াবার কাজ গ্রহণ করা যেতে পারে কেবলমাত্র তখন, যখন সন্তানের মা নিজে দুধ খাওয়াতে রাজি না হবে, কিংবা সে জন্য এমন পরিমাণ মজুরি দাবি করবে যা দেওয়া পিতার সামর্থ্যের বাইরে।

৬. এটা হতেই ষষ্ঠ নীতি এই জানা যায় যে, অন্য স্ত্রীলোককেও যদি অনুরূপ পরিমাণ দিতে হয় যা শিশুর মা দাবি করেছে, তাহলে মায়ের অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ .... اُخْرٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কিন্তু তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে সন্তানকে অপর কোনো স্ত্রীলোকের দুধ খাওয়াবে।" অর্থাৎ অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যে, যে পারিশ্রমিক মা চাইল তা আদায় করা পিতার পক্ষে অসম্ভব অথবা দেশের প্রচলিত নিয়মের তুলনায় বেশি; অথবা, পিতা যদি কোনো পারিশ্রমিকই দিতে রাজি না হয়, তখন অন্য কোনো স্ত্রীলোককে দুধ পান করানোর জন্য ঠিক করা যেতে পারে।

হযরত আবূ হাইয়ান (র.) বলেছেন, এখানে মা'কে সূক্ষ্ম ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে, যেমন তুমি কোনো লোককে কোনো কাজ করতে বললে, আর সে লোক সে কাজ করতে চাইল না, তখন তুমি তাকে বলে থাক-ঠিক আছে অন্য কাউকে দিয়ে করানো হবে। এ কথা বলে বুঝানো হয় যে, এ কাজ পড়ে থকবে না- কেউ না কেউ তা আদায় করবেই; কিন্তু এ অস্বীকৃতির কারণে তুমি দুঃখিত।

হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, মা দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানালে সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা করা হবে। আর যদি সেও রাজি না হয় তাহলে মাকে দুধ পান করাতে বাধ্য করা হবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। -[সাফওয়া]

উক্ত আয়াত সম্পর্কিত একটি মাসআলা : সন্তানের মাতা ব্যতীত অন্য মহিলা হতে স্তন্য পান সাব্যস্ত হয়ে গেলে তখন স্তন্য দানকারিণী সন্তানের মাতার ক্রোড়ে রেখেই দুগ্ধপান করানো ওয়াজিব। কারণ বিভিন্ন সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ রয়েছে যে, সন্তানের মাতার উপরই তার লালনপালনের ভার ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়া জায়েজ হবে না। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ ...... بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অর্থ-সামর্থ্য অনুসারে নিজ নিজ সন্তানের দুগ্ধপানের খরচাদি এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণের খোরপোশ ইত্যাদি বহন করবে তা দ্বারা একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর খোর-পোশ ইত্যাদি বহন করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থার কোনো প্রকার অনুসরণ করা আবশ্যক নয়; বরং স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। সুতরাং স্বামী যদি সম্পদশালী হয়, তবে উন্নত ধরনের ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব। যদি এক্ষেত্রে স্ত্রী দরিদ্র হয় তথাপিও কম দিতে পারবে না। আর যদি স্বামী গরিব ও সম্পদহীন হয় তখন গরীবানা অবস্থার খোরপোশ প্রদান করবে। স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবও এটাই। অন্যান্য ফকীহগণের অভিমত অবশ্য ভিন্ন ধরনের রয়েছে।
–[তাফসীরে মাযহারী]

পূর্বোক্ত বাক্যের অতিরিক্ত আরও ব্যাখ্যা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকেও তার শক্তি-সামর্থ্য হতে অধিক কষ্ট প্রদান করেন না। তাই যার যখন যতটুকু ক্ষমতা থাকে সে অনুযায়ী তার স্ত্রীর উপর খরচ করতে হবে। স্ত্রীগণ যেন স্বামীর ক্ষমতা ও প্রদান কৃত অর্থ-সম্পদের উপর খুশি থাকে, কখনও অসন্তুষ্ট না হয়। এ কথার تَلْقِيْن ও শিক্ষা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কঠিন ও দুরবস্থা হতে সচ্ছল অবস্থা ফিরিয়ে দিবেন। সুতরাং কেউ যেন এ ধারণা না করে যে, বর্তমান দুরবস্থা সর্বদাই থাকবে; বরং শান্তি ও অশান্তি সবই আল্লাহর হস্তে, ধন-সম্পদ সবই আল্লাহর ধনভাণ্ডার হতে বণ্টিত হয়ে থাকে। তাঁর ধন-ভাণ্ডারের কমতি নেই।
–[মা'আরিফ]

বি. দ্র. উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওই সকল স্বামীগণকে আল্লাহর পক্ষ হতে সচ্ছলতা পাওয়ার অঙ্গীকার ও ইশারা প্রদান করেছেন। যারা স্বীয় স্ত্রীগণকে সামর্থ্যানুযায়ী ভরণপোষণ উত্তম মতে দেওয়ার চেষ্টায় থাকে এবং স্ত্রীদেরকে কষ্ট দানের উদ্দেশ্যও না থাকে। –[রূহুল মা'আনী]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ الخ আয়াত সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা :

ক. যেহেতু আয়াতে কারীমা -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবাহকারী পুরুষ, তাই সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব একমাত্র স্বামী বা পিতার উপর ন্যস্ত।

খ. ব্যক্তির অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষীতে স্ত্রী ও সন্তানদের অন্নবস্ত্রের তারতম্য হতে পারে।

গ. ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থার অনুসরণ করা হবে, স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। কেননা মোহরের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। যেমন, প্রবাদ রয়েছে اَلْمَالُ غَادٍ وَ رَاحٍ অর্থাৎ মাল কখনো আসে কখনো যায়, এর কোনো ধর্তব্য নেই।

ঘ. স্বামীর অসচ্ছলতার উপর ভিত্তি করে বিবাহ সম্পর্ক নষ্ট করা চলবে না। কারণ আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ সে কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। সুতরাং ভরণপোষণের কঠিনতার দরুন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। –[আহকামে কুরআন, কুরতুবী]

নফকাহ -এর অর্থ এবং তার হুকুম : نَفَقَةٌ শব্দটি اِنْفَاقٌ হতে নির্গত, অর্থ– খরচ করা। সাধারণত نَفَقَةٌ তাকেই বলা হয় যা দ্বারা জীবন রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ যা খাওয়ার পর বেঁচে থাকা যায় এবং শরীর ও শক্তি রক্ষা থাকে। পবিত্র কুরআনে তাকে রিজিক বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٨. وَكَاَيِّنْ هِيَ كَافُ الْجَرِّ دَخَلَتْ عَلٰى اَيِّ بِمَعْنٰى كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَيْ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْقُرٰى عَتَتْ عَصَتْ يَعْنِىْ اَهْلُهَا عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ لَمْ تَجِئْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا فَظِيْعًا وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ

৮. আর কত এটা জরদানকারী كَافْ যা كَمْ অর্থে ব্যবহৃত اَيِّ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে জনপদ অর্থাৎ অনেক জনপদ বিরুদ্ধাচারণ করেছে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে অর্থাৎ তার অধিবাসীগণ তাদের প্রতিপালকের বিধান ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের, ফলে আমি তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করেছি আখেরাতে, যদিও তা এখনও আসেনি, তথাপি তা কার্যকর হওয়া অবশ্যম্ভাবী হিসাবে অতীতকালীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কঠিন হিসাব এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছি نُكْرًا শব্দটি ك -এ সাকিন ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কঠোর তা দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি উদ্দেশ্যে।

٩. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا عُقُوْبَتَهٗ وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا خَسَارًا وَهَلَاكًا

৯. ফলে তারা আস্বাদন করেছে তাদের কৃতকর্মের মন্দফল তার পরিণতি ও শাস্তি। আর তাদের কর্মপরিণাম ছিল ক্ষতিগ্রস্ততা ক্ষতি ও ধ্বংস।

١٠. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا تَكْرِيْرُ الْوَعِيْدِ تَاكِيْدٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ صلے اَصْحَابَ الْعُقُوْلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج نَعْتٌ لِلْمُنَادٰى اَوْ بَيَانٌ لَّهٗ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا هُوَ الْقُرْاٰنُ ـ

১০. আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন দ্বিতীয়বার ভয় প্রদর্শন تاكيد -এর জন্য। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান। যারা ঈমান আনয়ন করেছে এটা منادى -এর বিশেষণ অথবা তার বিবরণ। আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন তা হলো কুরআন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْقَرْيَةُ : প্রশ্ন. اَلْقَرْيَةُ বলে اَهْلُ الْقَرْيَةِ কিভাবে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে? : **উত্তর** : প্রকাশ থাকে যে, قَرْيَةٌ শব্দ বলে উক্ত অংশে اَهْلُ الْقَرْيَةِ -কে উদ্দেশ্য করা, এটা বালাগাতের একটি নীতির ভিত্তিতে শুদ্ধ হয়েছে; বরং উত্তম হয়েছে। একে مَجَازٌ مُرْسَلٌ বলা হয়। اِرَادَةُ صَاحِبِ الْمَحَلِّ مِنْ اِطْلَاقِ الْمَحَلِّ অর্থাৎ মহল বর্ণনা করে صَاحِبٌ মহল উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এগুলো কুরআনের ঊর্ধ্বতন বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। কুরআন মাজীদ এ প্রকার بَلَاغَتْ وَفَصَاحَتْ দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে, যা اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ -এর বিষয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তারকীবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে اَعْنِىْ ক্রিয়াকে مَحْذُوْفٌ রেখে। অথবা, يٰاُولِى الْاَلْبَابِ -এর যে مُنَادٰى তার بَيَانٌ হবে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অথবা, তার عَطْفُ بَيَانٍ হিসাবে। অথবা, نَعْتٌ হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ .... فَحَاسَبْنَاهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অনেক জনবসতি এমন রয়েছে যারা নিজেদের প্রতিপালক এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের আইন-বিধানকে অমান্য করেছে, ফলে আমি তাদের উপর হতে অত্যন্ত কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।"

গ্রন্থকার আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের আইন-বিধান অমান্য করার কারণে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করণের মাধ্যমে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন।

এর তাফসীরে হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের হিসাব নিয়াছেন, অতঃপর তাদের কঠোর আজাব দিয়েছেন। অতঃপর আখেরাতেও তাদেরকে কঠোর আজাব দেওয়া হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, দুনিয়াতে ক্ষুধা, খরা বা অনাবৃষ্টি, মাসখ, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে কঠোর আজাব দেওয়া হয়েছে এবং আখেরাতেও তাদের কঠোর হিসাব নেওয়া হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُضَارِعُ-এর স্থলে مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ দোষী সম্প্রদায়ের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন- তাতো মূলত আখেরাতেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এখানে যেভাবে فِعْل مَاضِىْ-এর শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন এতে বুঝা যায় যে, তা করে ফেলেছেন। যেমন বলেছেন فَحَاسَبْنَاهَا وَعَذَّبْنَاهَا এতে فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করা تَحَقُّقْ وُقُوْع অথবা تَيَقُّنْ-এর দৃষ্টিতে হয়েছে। অর্থাৎ পরকালে তাদের এ সকল কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই مَاضِىْ-এর صِيْغَةْ দ্বারা বলা হয়েছে। যেভাবে দুনিয়াতে কেউ কোনো বস্তু পাওয়ার উপর নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলে সে অনেক সময় বলে থাকে- তা পেয়েছি অথচ পাবে, এখনও তা পায়নি। আল্লাহও এভাবেই বলেছেন। অথবা, فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ এই যে, হিসাব অর্থ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বিনা প্রশ্নেই তার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অথবা, فِعْل مَاضِىْ নেওয়ার কারণ এইও হতে পারে যে, হিসাব-কিতাব যদিও আখেরাতে হবে তবে দুনিয়াতে সে সম্পর্কে আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং হিসাব-নিকাশের জন্য লিপিবদ্ধ করাই যথেষ্ট এটাকেই فَحَاسَبْنَاهَا وَعَذَّبْنَاهَا বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন- দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বহু কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। তার উদাহরণে কেউ কেউ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মাসখ, হত্যা হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বলেছেন এবং পরকালেও কঠোর আজাব দেওয়া হবে এবং কঠোরভাবে হিসাবও পুনরায় নেওয়া হবে। তাই فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করা হয়েছে। -[মা'আরিফ ও ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَذَاقَتْ وَبَالَ .... عَاقِبَةُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিপূর্ণ হয়ে গেল।" অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের বিধি-বিধান না মানা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করার ফলে তাদের এ কৃতকর্মের ফল তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। আর এ ফল ছিল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকর। তাতো তারা দুনিয়াতে ভোগ করেছে। আখেরাতেও তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। আখেরাতের এ আজাবের কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। অতঃপর মু'মিন বান্দাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর আজাবের সম্মুখীন হতে না হয়। কারণ, তাকওয়ার মূলকথা হলো, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলা। যেহেতু পূর্বের লোকদের উপর এ কাজ না করার ফলে আজাব এসেছে, সেহেতু তোমাদের উপরও আজাব আসবে যদি তোমরাও তাদের মতো আচরণ কর। সুতরাং সাবধান! হে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, তোমরা যা কর বুদ্ধি-বিবেচনা করে যাঁচাই-বাছাই করে করো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاتَّقُوا اللّٰهَ .... الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এর অর্থ- "অতএব তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করো, হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি একটা উপদেশ নাজিল করেছেন।"

গ্রন্থকারের মতে এখানে জিকির বা উপদেশ অর্থ হলো পবিত্র কুরআন। আল্লামা যুজাজ (র.) বলেছেন, জিকির অবতীর্ণ করা হতে প্রমাণিত হয় যে, জিকিরের সাথে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের কাছে কুরআন এবং রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। আর কেউ কেউ এখানে জিকির বলতে রাসূলকে বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন। সুতরাং অধিক সংখ্যক মুফাসসিরের মতে, এখানে জিকির বলতে আল-কুরআন আর রাসূল বলতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا .... اِلَيْكُمْ ذِكْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতে নাফরমানদেরকে শাস্তি দিয়েছেন বলা হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ক্ষান্ত হননি; বরং পরবর্তী কালের জন্যও তিনি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য নিকৃষ্টতম শাস্তির সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং যাদের জ্ঞান-বিবেচনা ও হুঁশ রয়েছে তাদেরকে সতর্কবাণী শুনিয়ে বলা হয়েছে– হে জ্ঞানীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ 'আল-কুরআন' নাজিল করেছেন।

আয়াতে বর্ণিত ذِكْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ও তাতে মতভেদ : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার উক্ত আয়াতে বর্ণিত ذِكْرًا শব্দটি দ্বারা কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ ذِكْرًا বলতে স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-কে বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর সত্তাই ছিল পরিপূর্ণ উপদেশ অথবা ذِكْرُ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করার কারণে তিনি স্বয়ং ذِكْرُ اللّٰهِ হয়ে গেছেন, তাই ذِكْرًا দ্বারা রাসূলকে উদ্দেশ্য করা সঠিক হবে। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, ذِكْر অর্থ شَرَفٌ উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ اَىْ شَرَفٌ لَّكَ وَكَرَامَةٌ لَّكَ اَوْ ذُوالشَّرَفِ وَالْمَجْدِ عِنْدَ اللّٰهِ তবে তা এ মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ নিশ্চয়ই আপনি مُذَكِّرٌ উপদেশ দানকারী। আপনি তাদের উপর দারোগা নন। আর ذِكْر দ্বারা কুরআন অর্থ নেওয়া সঠিক হবে। কারণ অন্য আয়াতে কুরআনকে সরাসরি ذِكْر বলেছেন– كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ

আর আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে ذِكْرُ اللّٰهِ অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ.)।

هُوَ جِبْرِيْلُ بَدْلًا مِنْ ذِكْرًا لِاَنَّهٗ وَصْفُهٗ بِتِلَاوَةِ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَكَانَ اِنْزَالُهٗ فِىْ مَعْنٰى اِنْزَالِ الذِّكْرِ فَصَحَّ اِبْدَالُهٗ مِنْهُ (جُمَلْ)

١١. رَسُوْلاً اَیْ مُحَمَّدًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَیْ وَاَرْسَلَ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بَعْدَ مَجِيْءِ الذِّكْرِ وَالرَّسُوْلِ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ الَّذِیْ كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَى النُّوْرِ ط الْاِيْمَانِ الَّذِیْ قَامَ بِهِمْ بَعْدَ الْكُفْرِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا هُوَ رِزْقُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ لَا يَنْقَطِعُ نَعِيْمُهَا .

অনুবাদ :

১১. আর তিনি প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ رَسُوْلًا শব্দটি উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ وَاَرْسَلَ আর তিনি প্রেরণ করেছেন। যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করেন مبينت শব্দটি ى -এর মধ্যে যবর ও যের যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যেমন, ইতঃপূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে বের করার জন্য উপদেশ ও রাসূল আগমনের পর অন্ধকার হতে কুফর হতে, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল আলোর দিকে ঈমানের দিকে, কুফরির পর তারা যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাকে প্রবিষ্ট করা হবে শব্দটি অপর এক কেরাতে ن যোগে نُدْخِلْهُ পঠিত হয়েছে। জান্নাতে, যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন। তা জান্নাতের জীবিকা, যার নিয়ামত কখনো বন্ধ ও স্থগিত হবে না।

١٢. اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَعْنِیْ سَبْعَ اَرَضِيْنَ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ الْوَحْیُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَنْزِلُ بِهٖ جِبْرَئِيْلُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اِلَى الْاَرْضِ السَّابِعَةِ لِتَعْلَمُوْا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَیْ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ الْخَلْقِ وَالتَّنْزِيْلِ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا .

১২. আল্লাহই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীও তাদের অনুরূপে অর্থাৎ সপ্ত জমিন। অবতারিত হয় তাঁর আদেশ ঐশী প্রত্যাদেশ। তাদের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে। হযরত জিবরাঈল (আ.) সপ্তম আকাশ হতে সপ্তম জমিনে তা অবতীর্ণ করেন। যাতে তোমরা জানতে পার এটা একটি উহ্য বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ الْخَلْقِ وَالتَّنْزِيْلِ -এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সৃষ্টি অবতরণ জ্ঞাত করেছেন। যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا : قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا বাক্যটি حَالْ مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে হওয়ার কারণে, আর حَالْ হয়েছে خَالِدِيْنَ-এর ضَمِيْر হতে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ : اَللّٰهُ শব্দটি আলোচ্য বাক্যে مُبْتَدَأْ হয়েছে। আর اَلَّذِىْ শব্দটি اِسْمُ مَوْصُوْل এবং তার صِلَةْ মিলে خَبَرٌ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اٰيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ : জমহুর তাকে مُبَيَّنٰتٍ অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْل-এর صِيْغَهْ হিসাবে পড়েছেন। যার অর্থ- আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনে আমের, হাফসা, কিসায়ী اِسْمُ فَاعِلْ-এর صِيْغَهْ হিসাবে مُبَيِّنٰتٍ পড়েছেন। অর্থাৎ আয়াতসমূহই মানুষের যেসব বিধান প্রয়োজন সেসব বিধান বর্ণনা করে, আহকাম জানিয়ে দেয়। আবূ হাতিম ও আবূ ওবাইদ প্রথম কেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। কারণ সেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে বলা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُدْخِلْهُ : জমহুর তাকে يَاء দিয়ে يُدْخِلْهُ পড়েছেন। নাফে' এবং ইবনে আমের نُوْن দিয়ে نُدْخِلْهُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ رَسُوْلًا : তাফসীর (جُمَل) গ্রন্থে তাফসীরকারগণের মাধ্যমে رَسُوْلًا শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার কারণ মোট নয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. যুজাজ নাহবী বলেন, رَسُوْلًا-এর পূর্বে একটি মাসদার مَحْذُوْف مَنْوِىْ মেনে তা হতে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে অর্থাৎ اَرْسَلَ رَسُوْلًا
২. পূর্ববর্তী ذِكْرًا শব্দকে مُبْدَلْ مِنْهُ এবং رَسُوْلًا-কে بَدَلْ মেনে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলা হয়েছে।
৩. اِنْزِلْ বা اُذْكُرْ হতে بَدَلْ হয়েছে তখন মূল ইবারত হবে اِنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ عَلٰى حَذْفِ مُضَافٍ مِنَ الْاَوَّلِ অর্থাৎ اِنْزِلْ وَاذْكُرْ رَسُوْلًا
৪. তদ্রূপ اِنْزِلْ وَاذْكُرْ-এর প্রথমটিকে مَحْذُوْف মেনে رَسُوْلًا-কে نَعْتٌ এবং اِنْزِلْ وَاذْكُرْ-কে مَنْعُوْتٌ মানতে হবে।
৫. اِنْزِلْ وَاذْكُرْ-এর দ্বিতীয় শব্দ হতে رَسُوْلًا-কে بَدَلْ মানতে হবে। তখন عِبَارَتْ হবে- ذِكْرًا ذَا رَسُوْلٍ
৬. رَسُوْلًا টি কেবলমাত্র উল্লিখিত ذِكْرًا হতে نَعْتٌ হবে এবং مُضَافْ مَحْذُوْف মানবে। অর্থাৎ ذِكْرًاذا رَسُوْلًا
৭. رَسُوْلًا অর্থাৎ رِسَالَةً তখন رَسُوْلًا টি بَدَلْ صَرِيْح হবে, কোনো تَاوِيْل-এর প্রয়োজন হবে না। আর কারো কারো মতে, তা بَيَانْ হবে।
৮. অথবা, اَرْسَلَ-কে উহ্য মেনে رَسُوْلًا-কে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে এবং اَرْسَلَ হতে فِعْل اَرْسَلَ-কে مَفْعُوْل مُطْلَق হবে।
৯. اِغْرَاءْ-কে فِعْل স্বরূপ মেনে তা হতে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে। অর্থাৎ উহ্য اِبْتَغُوْا وَالْزِمُوْا رَسُوْلًا অর্থাৎ مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِغْرَاءِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى رَسُوْلًا يَتْلُوْا .... مُبَيِّنٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে তোমাদের নিকট নবী ও রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর দেওয়া পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান তোমাদেরকে শুনানোর জন্য। পবিত্র কুরআনের এসব বিধান-যাতে হালাল-হারাম সম্পর্কীয় সব আহকামই রয়েছে। যদি তোমরা তা মেনে চল, রাসূলের আনুগত্য কর এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন কর তাহলে তোমরা গোমরাহীর অন্ধকার হতে ইসলাম ও ঈমানের আলোতে বের হয়ে আসতে পারবে। তোমাদেরকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে পবিত্র কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

ওলামায়ে কেরামগণ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, "মূর্খতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে জ্ঞান ও অবহিতির আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডলে বের করে আনার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে। যে প্রসঙ্গে এ বাক্যটি বলা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার গুরুত্ব ও যথার্থতা পুরাপুরিভাবে বুঝতে পারা যায় যদি তালাক, ইদ্দত, ব্যয়-ভার, খোরপোশ ইত্যাদি বহন সংক্রান্ত দুনিয়ার অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক বিধানসমূহ তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করা যায়। কেননা এ

তুলনামূলক অধ্যয়ন হতে জানা যাবে যে, বারবার পরিবর্তন ও নিত্য-নতুন আইন-বিধান রচনা করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো একটা জাতিও বিবেক ও যুক্তিসম্মত স্বাভাবিক ও সমাজের জন্য সাধারণভাবে কল্যাণকর এমন কোনো আইন-বিধান রচনা করতে সক্ষম হয়নি। যেমন এ কিতাব এবং এর বহনকারী রাসূলে কারীম ﷺ দেড় হাজার বছর পূর্বে দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন বা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দেওয়া বিধানে কখনো কোনো পুনর্বিবেচনা বা রদবদল করার প্রয়োজনবোধ হয়নি এবং কখনো তা হবেও না।

قَوْلُهُ تَعَالَى اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ الخ : এ আয়াত দ্বারা এ কথাতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যেভাবে আসমান ৭টি জমিনও ৭টি, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আল্লাহ তিনিই যিনি ৭ স্তবক আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মাঝেই ওহী নাজিল হয়ে থাকে। এতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানবজাতি যেন জেনে নেয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেকটি বস্তুর উপর আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি দ্বারা বেষ্টনী রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُّؤْمِنْ .... يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর যে কেউই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন, যার নিচ হতে ঝরনাধারাসমূহ সদা প্রবহমান থাকবে। এরা তাতে চিরকাল ও সব সময়ই বসবাস করবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা অতীব উত্তম রিজিক রেখে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে– তাতে ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ও কদরের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নেক আমল করবে, অর্থাৎ কেবল ঈমান যথেষ্ট নয়, পরবর্তীতে বর্ণিত ফলাফল ভোগ করার যোগ্য হওয়ার জন্য ঈমানের দাবি হলো নেক আমল করা, যারা ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলও করবে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে এমন জান্নাত যার অট্টালিকাসমূহের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। সেখান হতে তাদেরকে আর কখনো বের হতে হবে না। আর কোনো দিন তাদের মৃত্যুও হবে না। আর সেখানে তাদের জন্য অতি সুস্বাদু ও মজাদার খাবার রয়েছে।

আল্লামা তাবারী (র.) বলেছেন, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা রিজিক প্রশস্ত করবেন। আর সে রিজিক হবে খাদ্য ও পানীয় জাতীয় এবং এমন সব বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নেক বান্দা ও আওলিয়াগণের জন্য রেখেছেন। –[সাফওয়া]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ সবের প্রমাণ হিসাবে নিজের কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনও সে পরিমাণে [সৃষ্টি করেছেন] এ সবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান এবং সব কিছুই তাঁর গোচরীভূত।

মুফাসসিরগণের মধ্যে আসমান যে সাতটি, সে ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাপারে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

এক. জমিনও আসমানের ন্যায় সাতটি, এ মতই কুরআন-হাদীসের আলোকে অধিক গ্রহণযোগ্য।

দুই. জমিন একটি তবে আলোচ্য আয়াতে যে জমিনও তদ্রূপ বলা হয়েছে, তার অর্থ সৃষ্টিকৌশল, নিয়ম-শৃঙ্খলা এর দিক দিয়ে জমিনও আসমানের ন্যায়– সংখ্যার দিক দিয়ে নয়। –[সাফওয়া, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] .

এ প্রসঙ্গে মুফতি শফী (র.) তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে বলেছেন, اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ এ আয়াত হতে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি জমিনও তেমনি সাতটি। এখন সপ্ত জমিন কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে-নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে-নিচে স্তরে স্তরে থাকে তবে সপ্ত আকাশের প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে তেমনি প্রত্যেক দুই জমিনের মধ্যখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কিনা, তাতে কোনো সৃষ্টিজীব আছে কিনা? অথবা সপ্ত জমিন পরস্পর গ্রথিত কিনা? এ সব প্রশ্নের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ, আবার কেউ কেউ মিথ্যা মনগড়া বলে দাবি করেছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। –[মা'আরেফুল কোরআন]

ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, مِثْلَهُنَّ "তার মতো" বলে এ কথা বুঝানো হয়নি যে, যতসংখ্যক আকাশ ততসংখ্যক পৃথিবীও বানানো হয়েছে; বরং একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন কতগুলো আকাশ বানানো হয়েছে তেমনি কতিপয় পৃথিবীও বানানো হয়েছে। আর "পৃথিবী পর্যায়" অর্থ এ পৃথিবী যাতে মানুষ বসবাস করে এটা যেমন এখানে অবস্থিত সব কিছুর জন্য বিছানার মতো বা দোলনার মতো হয়ে আছে অনুরূপভাবে এ মহাবিশ্বলোকে আল্লাহ তা'আলা আরো অনেক পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন। তাও সেখানে অবস্থিত সব কিছুর জন্য বিছানার মতো অনুকূল সুবিধাজনক ও দোলনার মতো আরামদায়ক; বরং কুরআনে কোনো

কোনো স্থানে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে– জীবন্ত সৃষ্টি কেবল এ পৃথিবীতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয় তা ঠিক বা চূড়ান্ত কথা নয়। উচ্চতর জাগতেও জীবন্ত সত্তার অবস্থিতি রয়েছে। অন্য কথায় আকাশলোকে এই যে লক্ষ কোটি তারকা-নক্ষত্র-উপগ্রহ দেখা যায়, এসব নিতান্তই শূন্য ও বিরান হয়ে যায়নি; বরং পৃথিবীর ন্যায় তাতেও এমন বহু স্থান রয়েছে যাতে শত শত দুনিয়া আবাদ হয়ে আছে।

প্রাচীনকালের তাফসীরকারকদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এমন একজন মুফাসসির যিনি সে যুগে এ তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করেছেন, যে যুগের মানুষ ধারণা পর্যন্ত করতে পারত না যে, এ সৃষ্টিলোকে আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহলোক এবং আরো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি বসবাস করতে পারে। বর্তমানের এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান রয়েছে। আজ হতে ১৪ শত বছর পূর্বেকার লোকদের জন্য এ কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির লোকদের নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। কেননা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাবেয়ী মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট এ আয়াতটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– "এ আয়াতের তাফসীর আমি যদি তোমাদের নিকট বলি, তাহলে (আমার আশঙ্কা হয় যে,) তোমরা হয়তো কাফের হয়ে যাবে। আর তোমাদের সে কুফর হবে এই যে, তোমরা তাকে অসত্য মনে করে বসবে।" সাঈদ ইবনে জোবাইর হতেও প্রায় অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনানুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এর তাৎপর্য আমি যদি তোমাদেরকে বলি তাহলে তোমরা যে কাফের হয়ে যাবে না তার ভরসা কি আছে? তা সত্ত্বেও ইবনে জরীর, ইবনে আবূ হাতিম, হাকেম ও বায়হাকী তার كِتَابُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ও شُعَبُ الْاِيْمَانِ গ্রন্থে আবুয যোহা'র মাধ্যমে শব্দের ও ভাষার পার্থক্য সহকারে হযরত ইবনে আব্বাসের এ তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন–

فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمَ وَنُوحٌ كَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى

অর্থাৎ "অন্যান্য পৃথিবীতে তোমাদের নবীর মতো নবী আছেন, আদমের মতো আদম আছেন, নূহের মতো নূহ, ইব্‌রাহীমের মতো ইব্‌রাহীম ও ঈসার মতো ঈসা রয়েছেন।" হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে ও ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন, এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ। অবশ্য আমার জানা মতে আবুয যোহা ভিন্ন অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এ কারণে নিতান্তই বিরল ও অপরিচিত কথা। অন্যান্য কতিপয় আলিম তা অসত্য ও মনগড়া বলে ঘোষণা করেছেন। আর মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর মাউযূআতে কাবীর [১৯ পৃ.] গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করে তাকে মনগড়া বলেছেন এবং লিখেছেন, তা যদি ইবনে আব্বাসের বর্ণনা হয়েও থাকে তবুও তা ইসরাঈলী কিংবদন্তি বিশেষ। কিন্তু আসল কথা হলো, এ কথাটি তাদের বিবেকবুদ্ধির অগম্য বলেই তাঁরা তাকে مَوْضُوْعٌ বা মনগড়া বলেছেন। নতুবা তাকে মনগড়া বলার কোনো কারণ নেই। কেননা এতে বিবেকবুদ্ধির বিপরীত কোনো কথাই নেই। আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন "তাকে সহীহ মনে করে নেওয়ার পথে না বিবেকবুদ্ধিগত কোনো বাধা আছে, না শরিয়াতের দিক দিয়ে কোনো কারণ আছে। এটার অর্থ হলো প্রত্যেকটি পৃথিবীতেই একটি সৃষ্টি রয়েছে যা তার একটা মূল উৎসের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, আমাদের এ পৃথিবীতে সমস্ত বনী আদম হযরত আদমের বংশোদ্ভূত এবং প্রত্যেকটি পৃথিবীতে এমন সব ব্যক্তিও রয়েছে যারা নিজের মধ্যে অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, যেমন আমাদের এখানে হযরত নূহ ও ইব্‌রাহীম (আ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মর্যাদাবান। তারপর আল্লামা আলূসী (র.) আরও লিখেছেন– সম্ভবত পৃথিবী সাতটিরও বেশি হবে এবং অনুরূপভাবে আকাশমণ্ডলও কেবল সাতটি নাও হতে পারে। সাত এটা পূর্ণ সংখ্যা। এ সংখ্যাটির স্পষ্ট উল্লেখ একথা অনিবার্য হয়ে পড়েনি যে, পৃথিবী এ সংখ্যার বেশি হতে পারবে না।"

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, এক একটি আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বছরের। এ সম্পর্কে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন هُوَ مِنْ بَابِ التَّقْرِيْبِ لِلْاَفْهَامِ অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, ঠিক পরিমাপ করেই এ দূরত্বের পরিমাণ বলা হয়েছে; বরং এরূপ বলা হয়েছে লোকদেরকে দূরত্ব সম্পর্কে একটা মোটামুটি বোধগম্য ভাষায় ধারণা দেওয়ার জন্য যেন লোকেরা সহজে বুঝতে পারে, এখানে উল্লেখ্য আমেরিকার টিভড উমরযরর্টধমভ নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, আমাদের এ পৃথিবীটি যে ছায়াপথে অবস্থিত কেবলমাত্র তার মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, যেসবের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের এ পৃথিবীর সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। আর সেসবের মধ্যেও প্রাণী ও জীবের বসবাস করার খুব সম্ভাবনা রয়েছে।

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ : সূরা আত-তাহরীম

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহীত। এটি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয়। এরূপ নামকরণের অর্থ হলো, এটা সেই সূরা যাতে 'তাহ্‌রীম' (হারামকরণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ৩৪৯টি বাক্য ও ১০৬০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় তাহরীম তথা কোনো কিছু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হেরেমভুক্ত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন হযরত সফীয়া (রা.), আরেকজন হলেন হযরত মারিয়ায়ে কিবতীয়া (রা.)। খায়বর বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত সফীয়ার বিবাহ হয়। এ খায়বার বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে ৭ম হিজরিতে মিসর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এ সব ঐতিহাসিক ঘটনা হতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরির কোনো এক সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিলের কয়েকটি শানে নুযূল রয়েছে। যথা–

১. বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন হযরত হাফসার দিন আসল, তিনি তাঁর মাতাপিতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা.) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসার ঘরে হযরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাফছা চলে আসলে তাঁর ঘরে হযরত মারিয়াসহ রাসূল ﷺ -কে দেখতে পেলেন। এটা দেখে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন, এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম। এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকেও দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে গেলে হযরত হাফসা এ সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দেন। এটা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে শপথ করলেন যে, আগামী এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের হতে আলাদা থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ আয়াতটি নাজিল করলেন। –[সাফওয়া, আসবাব, কুরতুবী, তাবারী, সাবী]

২. সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই স্ত্রীগণের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নবের কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছেই আসবেন সেই বলবে, আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। [মাগাফীর হলো এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা] সে মতে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না আমিতো মধু পান করেছি। সে স্ত্রী বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফীর বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল এ কারণেই মধু দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হতে সযত্নে বেঁচে থাকতেন, তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব মনঃক্ষুণ্ন হবে চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করবার জন্যও বলেছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর কাছে বলে দিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[মা'আরিফ, আসবাব]

কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত সাওদার কাছে, আর কোনো কোনো রিওয়ায়াতে হযরত হাফসার কাছে মধু পান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার কারণ উভয় ঘটনা হতে পারে। (আসবাব, সুয়ূতী) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণ হতে সনদের দিক দিয়ে অধিক সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হলেও মুফাসসিরগণের কাছে প্রথম কারণটিই অধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় কারণটিকে অনেকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম কারণকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ বলে মত পোষণ করেছেন।

১. মধু পান হারামকরণের মাধ্যমে নবীজী কোনো স্ত্রীকে খুশি করতে চেয়েছিলেন এটা অবান্তর। মধু পান হারাম করেছিলেন মূলত দুর্গন্ধের কথা শুনে-স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। সুতরাং স্ত্রীকে খুশি করানোর জন্য মারিয়াকে হারাম করাই যুক্তিসঙ্গত।

২. আলোচ্য সূরায় রাসূলের স্ত্রীদের প্রতি যে কঠোর হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে ঈর্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। মধু পান হারাম করার কারণে স্ত্রীদেরকে এ রকম কঠোর হুশিয়ারী দান অসম্ভব মনে হয়। এ সব কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন,

كَوْنُ قَضِيَّةِ شُرْبِ الْعَسَلِ سَبَبًا لِلنُّزُوْلِ فِيْهِ نَظَرٌ .

অর্থাৎ মধুপানের ব্যাপারটিকে সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর মাঝে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ-এর পবিত্রা স্ত্রীদের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে– হারাম-হালাল বা জায়েজ ও নাজায়েজ সম্পর্কে সীমা নির্ধারণ করার বিশেষ ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হস্তে সুনিশ্চিতরূপে নিবদ্ধ রয়েছে, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, নবীর হাতেও এটার এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহর ইঙ্গিত ব্যতীত নবীও নিজ ক্ষমতা বলে কোনো হালালকে হারাম করার ক্ষমতা পাননি। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো কাজ করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, মানবসমাজে একজন নবীর মর্যাদা অতি উচ্চে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো জঘন্য ঘটনা ঘটানো তেমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। তবে নবীগণের সামান্যতম অপরাধও জঘন্য অপরাধের কারণ। যেহেতু তাদের কার্যাবলি জগতের জন্য নিখুঁত দলিল-প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য। তাই নবীগণের প্রতি রাব্বুল আলামীনের তীব্র দৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জীবনে কোনো কলঙ্ক আসতে দেওয়া হয়নি। যদিও কোথাও পদস্খলন ঘটতে চায় তাও তৎক্ষণাৎ শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলামের আইন কেবল কুরআনের নির্দেশই নয়; বরং নবীর পালনীয় আদর্শও ইসলামের আইন। সুতরাং তা সঠিকরূপে বান্দাদের নিকট যেন পৌঁছতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকলে মূলত তা আল্লাহ ও সকল ফেরেশতাগণ পর্যন্ত অবগত হয়ে গেছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ যেন পরস্পর হিংসা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে। নবীর কোনো আচরণ তাদের নিকট অপছন্দনীয় হলে সেজন্য নবীর পক্ষে স্ত্রীগণের তোয়াক্কা করতে হবে না।

ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান স্ত্রীদের অপেক্ষা আরো অধিক উত্তম স্ত্রী ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। নবীর স্ত্রীগণকে এতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ঈমানদারগণের প্রতি সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে এবং ঈমানদারগণের সন্তানসন্তানাদি সহ যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালীন দোজখের শাস্তি হতে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জন্যই সমানভাবে কার্যকরি করে।

পরবর্তী আয়াতে কাফিরগণকে সতর্ক করা হয়েছে। কাফিররা যতই পরকালকে অস্বীকার করুক না কেন একদিন তা সত্য প্রমাণিত হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করা আবশ্যক। ভালো কাজের প্রতিদান ভালো এবং মন্দ কাজের প্রতিফল নিতান্ত মন্দ হবে।

তৎপরবর্তী আয়াতে সকল ঈমানদারকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করলে খাঁটি মনেই প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নবীর সংশ্রবে থাকলে পরকালে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে।

এরপর কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং ফিরআউনের স্ত্রীর করুণ ঘটনা বলে সূরা তাহরীম শেষ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও বিশেষত নারী জাতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কিভাবে অর্জিত হয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে এ সূরায়। এ পর্যায়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, পরস্পরের হক আদায়ের প্রেরণা একান্ত অনুসরণীয় মূলনীতি। –[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج مِنْ اُمَّتِكَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ لَمَّا وَاقَعَهَا فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ غَائِبَةً فَجَاءَتْ وَشَقَّ عَلَيْهَا كَوْنُ ذٰلِكَ فِيْ بَيْتِهَا وَعَلٰى فِرَاشِهَا حَيْثُ قُلْتَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيَّ تَبْتَغِيْ بِتَحْرِيْمِهَا مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط اَيْ رِضَاهُنَّ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ غَفَرَلَكَ هٰذَا التَّحْرِيْمَ.

১. হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তাকে হারাম করছেন কেন? অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়াকে, যে আপনার জন্য বৈধ। হাফসা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে আপনি তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন। আর সে যখন ফিরে এসে দেখল যে, এ সব কিছু তার আবাসগৃহে এবং তারই শয্যায় সংঘটিত হয়েছে। তার নিকট এটা বিরক্তিকর মনে হলো। তখন আপনি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছেন, 'আমার জন্য সে অর্থাৎ মারিয়া হারাম আপনি কি চাচ্ছেন তাকে হারাম করার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি অর্থাৎ তাদের খুশি ও সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আপনার এ হারাম করা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٢. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ شَرَعَ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج تَحْلِيْلَهَا بِالْكَفَّارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ وَمِنَ الْاَيْمَانِ تَحْرِيْمُ الْاَمَةِ وَهَلْ كَفَّرَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُقَاتِلُ اَعْتَقَ رَقَبَةً فِيْ تَحْرِيْمِ مَارِيَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمْ يُكَفِّرْ لِاَنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ط نَاصِرُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বিধান রেখেছেন তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভ করার সূরা মায়িদায় উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে তা ভঙ্গ করার ব্যবস্থা করেছেন। দাসীটিকে হারাম করাও শপথের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কাফ্ফারা আদায় করেছেন কিনা? মুকাতিল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি মারিয়াকে হারাম করার বিষয়ে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন। আর হাসানের বর্ণনা মোতাবেক তিনি এ জন্য কোনো কাফ্ফারা আদায় করেননি। যেহেতু এটা তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের সহায় সাহায্যকারী আর তিনিই সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ : تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ বাক্যাংশটি তারকীবে فَرَضَ ক্রিয়ার **مَفْعُوْل** হয়েছে। এ কারণে তা منصوب হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ : আলোচ্য বাক্যটি তারকীবে جُمْلَة مُسْتَانِفَة নতুবা مُفَسِّرَة এবং تَحْرِيْم -এর তাফসীর বা ব্যাখ্যাদানকারী বাক্য। অথবা একে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলতে হবে, تُحَرِّمُ -এর فَاعِلْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ : জমহুর এটাকে تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ পড়েছেন, অন্য এক কেরাতে تَحِلَّةَ كَفَّارَةِ اَيْمَانِكُمْ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ كَفَّارَة শব্দটি বৃদ্ধি করে পঠিত হয়েছে। -[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ .... تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ (اَلْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! তুমি কেন সে জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এ জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও? "আল্লাহ মহাক্ষমাকারী, বিশেষ অনুগ্রহ দানকারী।'

অর্থাৎ হে নবী আপনি আল্লাহর হালাল করা জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার যে কাজটি করেছেন তা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেছেন। এটা হতে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা বা এখতিয়ার কারো থাকতে পারে না, এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এরও এ ক্ষমতা নেই।

تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ : এর তাৎপর্য হলো নবী করীম ﷺ যে কাজটি করেছিলেন সে ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়াই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সাথে সাথে নবীর স্ত্রীগণকেও সতর্ক করে দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবীর স্ত্রী হওয়ার ফলে তাঁদের উপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তাঁরা পুরোপুরি অনুধাবন করেননি। এর ফলে তাঁরা নবী ﷺ-এর দ্বারা এমন একটা কাজ করিয়েছেন যার কারণে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারত।

তাসহীলে বলা হয়েছে, 'তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?' এর অর্থ হলো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে হযরত হাফসার সন্তুষ্টি চাও। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা দাসী হারামকরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছে। কারণ মধু হারামকরণ দ্বারা স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা করেননি। মধু হারাম করেছেন দুর্গন্ধের কথা শুনে। -[সাফওয়া]

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা নবীর জন্য যা হালাল করেছিলেন তা নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার ফলে নবীকে যে তিরস্কার করা হয়েছে তা হতে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এটা দ্বারা শাস্তি দিবেন। সে সন্দেহ দূর করে নবী করীম ﷺ-এর মনে প্রশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও দয়াময়। -[রূহুল কোরআন]

নবী করীম ﷺ মধু নাকি মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে হারাম করেছেন? : এ প্রশ্নে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাসী মারিয়া কিবতিয়াকে তার জন্য হারাম করার প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেছিলেন। -[তাফসীরে কাবীর]

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ দ্বারা মধুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ মধু খাওয়া পরবর্তী সময়ের জন্য হারাম করেছিলেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইবনে মারদুবিয়া আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রকাশ করে বলেন, مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّة -কেই হুযূর ﷺ হারাম করেছিলেন, কেননা ঘটনাটি হযরত হাফসা (রা.) এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে ঘটনার শব্দগুলো ছিল-

وَشَقَّ عَلَيْهَا فَعَاتَبَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَفْعَلُ هٰذَا مِنْ دُوْنِ نِسَائِكَ قَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ اُحَرِّمَهَا فَلَا اَقْرَبُهَا قَالَتْ بَلٰى فَحَرَّمَهَا .

ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ يَطَأُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهٖ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتّٰى حَرَّمَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ (الاية) অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ-এর একটি দাসী ছিল, যার সাথে তিনি যৌন সম্পর্ক রাখতেন, হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা.)-এর কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি দাসীকে নিজের জন্য হারাম করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা মধু পান করাকে হারাম করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাওলা দিয়ে বলা হয়েছে-

وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَوَاطَئَتْ بِهٖ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ فَقُلْنَ لَهُ اِنَّا نَشُمُّ مِنْكَ رِيْحَ الْمَغَافِيْرِ فَحَرَّمَ الْعَسَلَ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ .

আল্লামা নববী (র.) বলেন- اَلصَّحِيْحُ اَنَّهُ نَزَلَتْ فِىْ قِصَّةِ الْعَسَلِ لَا فِىْ قِصَّةِ الْمَارِيَةِ মধু সম্পর্কীয় ঘটনাটির প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত নাজিল হওয়া বিশুদ্ধ কথা, মারিয়া কিবতিয়াকে হারাম করা প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হওয়া বিশুদ্ধ কথা নয়।

صَحِيْحَيْن -এর বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বর্ণনা রয়েছে (আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা ব্যতীত) সেগুলোর সনদ বিশুদ্ধ নয় বলে তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেন। আর সেগুলোর অধিকাংশেই مَارِيَة قِبْطِيَّة -কে হারাম করার প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর صَحِيْحَيْن -এর কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে وَاللّٰهِ لَا اَشْرَبُهُ 'আল্লাহর শপথ করে বলি আমি আর কখনো মধু পান করবো না।' কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ 'কখনো মধু পান করবো না আর আমি তার উপর শপথ করেছি। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ 'কখনো ভবিষ্যতে আর তার প্রতি দৃষ্টিও করবো না।' তাফসীরকারগণের মতামতের সার ও নিয়ম স্বরূপ এটাই বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মধু খাওয়াকে হারাম করেছেন বলে শপথ করার উপর আয়াত لِمَ تُحَرِّمُ الخ অবতীর্ণ হয়েছে। مَارِيَةُ الْقِبْطِيَة -কে হারাম করার উপর আয়াত নাজিল হওয়ার বর্ণনাগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। (حَاشِيَةُ الْجَلَالَيْنِ)

কোনো হারাম বস্তুকে হালাল অথবা হালাল বস্তুকে হারাম বলে নিজের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়ার হুকুম প্রসঙ্গে : যদি কেউ আল্লাহর কোনো (حَلَال قَطْعِىْ) সরাসরি হালাল বস্তুকে عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত করে, তবে এটা কুফরি ও কবীরা গুনাহ হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (اِسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ وَعَكْسُهُ كُفْرٌ)

আর যদি عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত না করে থাকে এবং নিষ্প্রয়োজনে ও অহেতুকভাবে হালাল বস্তুকে কেবল নিজের জন্য হারাম বলে শপথ করে থাকে, তবে এমন শপথ ভঙ্গ করা ও তার কাফ্‌ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো প্রয়োজন অথবা مَصْلَحَت -এর খাতিরে অথবা স্বীয় কল্যাণার্থে এরূপ করা হয়ে থাকে, তবে উত্তম হবে না, জায়েজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আর عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত যদি না করে থাকে এবং শপথও তার হারামের উপর না করে থাকে বরং সর্বকালে তা হতে বিরত থাকে অথবা বিরত থাকার জন্য এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তা হতে বিরত থাকা ثَوَابٌ -এর কারণ হবে। তবে তা رَهْبَانِيَّتْ বা بِدْعَتْ অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থি ও বৈরাগ্যতা হবে। শরিয়তে ইসলাম বৈরাগ্যতা ও বিদআতকে খুবই নিন্দা করেছে। আর যদি নিজস্ব কোনো রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অথবা বিশেষ সুবিধার্থে হালাল বস্তু হতে বিরত থেকে থাকে, ছওয়াব মনে করে নয়, তাহলে بِلَا كَرَاهَتٍ جَائِزٌ হবে। কোনো কোনো সুফীগণও এরূপ করে থাকতেন। -[মা'আরেফ]

নবী বলে সম্বোধন করা হতে প্রমাণ হয় যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী : আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নবী ও রাসূলকে যখন কুরআনে সম্বোধন করেছেন, তখন হে নূহ! হে ইবরাহীম! হে মূসা! এভাবে তাঁদের নাম নিয়ে সম্বোধন করেছেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যখনই সম্বোধন করেছেন তখন তাঁকে নাম নিয়ে সম্বোধন না করে; বরং 'হে নবী!' বা 'হে রাসূল'! বলে সম্বোধন করেছেন। এটা হতে স্বতই প্রমাণ হয় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ শ্রেষ্ঠ নবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। -[সাফওয়া]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত হালাল জিনিসকে হারাম বলে বিশ্বাস করেননি, হারাম বলে ঘোষণাও করেননি। তিনি যা করেছিলেন তা হলো, যে জিনিস আসলেই তাঁর জন্য হালাল সে জিনিসের উপভোগ হতে নিজেকে বিরত রাখার সংকল্প। এটাকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের জন্য হারাম করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথমে নবী বলে সম্বোধন করে অতঃপর হারাম আখ্যা দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, যা তিনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছেন তা বড় কোনো অপরাধ না হলেও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ .... اَيْمَانِكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের সহায়, তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ কাফ্‌ফারা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কসম হতে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। অতএব, আপনি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেওয়ার জন্য যে কসম করেছেন তা কাফ্‌ফারা আদায় করার মাধ্যমে ভঙ্গ করে দিন।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন আসে তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করতে গিয়ে কি কসম করেছিলেন? অথবা মধু খাবেন না বলে ঘোষণা দানের সময় কি কসম করেছিলেন? নাকি হারাম করে নেওয়াকেই কসম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে?

মধু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন- فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ "অতঃপর আমি এটা কখনই পান করবো না, আমি কসম খেলাম।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যে বর্ণনাটি ইবনুল মুনযির ইবনে আবূ হাতিম, তাবারানী ও ইবনে মারদুবিয়া উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ ভাষায় কথাটি উদ্ধৃত রয়েছে- وَاللّٰهِ لَا أَشْرَبُهُ 'আল্লাহর নামে শপথ করছি আমি তা পান করবো না।'

আলোচ্য বর্ণনা হতে জানা গেল যে, মধু হারাম করার ফলে হারাম হয়ে যায়নি; কিন্তু হারাম করার সাথে সাথে শপথ করার কারণে, সে শপথের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আলোচ্য আয়াতে কাফ্ফারা আদায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাকি রইল হযরত মারিয়াকে হারাম করার ব্যাপারটি। আলোচ্য সূরাটি যদি হযরত মারিয়াকে হারাম করার কারণেই নাজিল হয়েছে এ কথা বলা হয়, তাহলে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো, হযরত মারিয়াকে হারাম করা সংক্রান্ত কোনো বর্ণনায় হারাম করার আগে-পরে কসমও করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রশ্ন আসে কেবল হারাম করে নেওয়াটাই কি কসম খাওয়ার সমতুল্য ও সমার্থবোধক? কসম শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক, আর এ কারণেই কি বলা হয়েছে قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ আয়াতটি।

এই প্রশ্নের জবাবে ফিকহবিদদের মধ্যে নিম্নরূপ মতভেদ রয়েছে-

১. কিছু সংখ্যক ফিকহবিদ বলেন, শুধু হারাম করে নেওয়াই কসম নয়। কেউ কোনো জিনিস স্ত্রী হোক বা অন্য কোনো হালাল জিনিস কসম না খেয়েও নিজের জন্য হারাম করে নিলে এটা একটা তাৎপর্যহীন কাজ হবে। এতে কাফ্ফারা দেওয়া কর্তব্য হবে না। কাফ্ফারা ছাড়াই সে তার ব্যবহার পুনরায় করতে পারে, যা সে হারাম করে নিয়েছিল। মাসরূক, শা'বী, রাবীয়া ও আবূ সালমা এ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে জারীর ও যাহেরী ফিক্হবিদগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো জিনিস শুধু হারাম করে নিলে তা কসম সমতুল্য, যখন এটা করার সময় কসম শব্দ উচ্চারণ করা হবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূলে কারীম ﷺ যেহেতু হালাল জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসমও খেয়েছিলেন। বেশ কয়টি বর্ণনায় (মধু হারাম করা সংক্রান্ত বিষয়ে) এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বলেছেন, আমি কসমের বাধ্যবাধকতা হতে বের হওয়ার যে পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আপনি তদনুযায়ী আমল করুন।

[[আলোচ্য সূরাটি হযরত মারিয়াকে হারাম করাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে, এ কথা বললে তবে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। কারণ, সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম খেয়েছিলেন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।]

২. অপর কিছু লোক বলেন, কসম শব্দ উচ্চারণ না করে কোনো জিনিস হারাম করে নেওয়াটাই কসম সমতুল্য নয়; কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্নতর।

কোনো কাপড় বা খাদ্য জাতীয় জিনিসকে যদি কেউ নিজের জন্য হারাম করে নেয়, তবে তা তাৎপর্যহীন ব্যাপার। কোনোরূপ কাফ্ফারা দেওয়া ছাড়াই সে তা ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু স্ত্রী বা ক্রীতদাসীকে যদি কেউ বলে যে, তার সাথে সঙ্গম করা তার জন্য হারাম, তবে তা হারাম হবে না; কিন্তু তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বে কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা দিতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের এ মতও সমস্যা মুক্ত নয়। মালেকী মাযহাবের মতও প্রায় এরূপ। -[আহকামুল কোরআন-ইবনে আরাবী]

৩. তৃতীয় দলটি অর্থাৎ ফিক্হবিদগণ বলেন, কোনো জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়াই কসমের ব্যাপার হলে স্বতই কসম হয়ে যায়। কসম শব্দ উচ্চারণ করা হোক আর না-ই হোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত আয়েশা, হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। যদিও হযরত ইবনে আব্বাসের অপর একটি মতও বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলো, إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 'কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে হারাম করে নেয় তবে তা কিছুই নয়- অর্থহীন কথা' কিন্তু এটার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বলে যে, এটার অর্থ তাঁর মতে তালাক নয়, এটা কসম মাত্র। আর তাতে কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, হারাম করা হলে কাফফারা দিতে হবে। আর নাসায়ী গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাসের নিকট যখন এ মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, সে তোমার প্রতি হারাম তো নয়, তবে তোমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ইবনে জরীরের বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাসের কথার শব্দ হলো, "লোকেরা যদি নিজের প্রতি কোনো জিনিস হারাম করে নেয় যা

আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, তাহলে তার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা কর্তব্য।" হযরত হাসান বসরী, আতা, তাউস, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, ইবনুয্ যুবাইর এবং কাতাদা (র.)-এরও এ মত। হানাফী মাযহাবেও এ মত গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) বলেন, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো হতে বুঝা যায় না যে, রাসূলে কারীম ﷺ হারাম করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসমও খেয়েছিলেন, এই কারণে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, হারাম করাটাই কসম। কেননা এরপরই আল্লাহ হারাম করার ব্যাপারে কসমের কাফ্‌ফারা দেওয়া ওয়াজিব বলেছেন। পরে আবার ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) বলেছেন, হানাফী মাযহাবে হারাম করাটাকে কসম গণ্য করা হয়েছে তখন, যখন তার সঙ্গে তালাকের নিয়ত না হবে। কেউ যদি স্ত্রীকে 'হারাম' বলে তবে তার অর্থ হবে সে যেন বলেছে, "আল্লাহর কসম আমি তোমার নিকট যাবো না।" এ কারণে সে যেন 'ঈলা' করল, আর কেউ যদি কোনো খাদ্য-পানীয় জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয় তবে সে যেন বলেছে, "আল্লাহর কসম আমি তা ব্যবহার করবো না।" কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন, আপনি সে জিনিস হারাম করেন কেন, যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন? তারপর বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা হতে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা হারাম করাকেই কসম বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ফলে হারাম করা স্বীয় তাৎপর্য ও শরিয়তী ফয়সালা অনুযায়ী কসমের সমতুল্য হয়ে গেছে।

এখানে একথাও বলে রাখা ভাল যে, স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য জিনিস হারাম করে নেওয়ার মধ্যে ফিকাহবিদদের মতে শরিয়তী হুকুমে পার্থক্য রয়েছে।

হানাফীদের মত হলো, তালাকের নিয়ত ছাড়াই যদি কেউ স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয় কিংবা কসম খায় যে, সে তার সাথে সঙ্গম করবে না, তাহলে এটাকে 'ঈলা' (إِيْلَاء) বলা হবে। এরূপ করা হলে তার সাথে সঙ্গমের পূর্বে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর সে যদি তালাকের নিয়তে এরূপ বলে থাকে যে, তুমি আমার জন্য হারাম, তাহলে তার নিয়ত কি ছিল তা জানতে হবে। তিন তালাকের নিয়ত থাকলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর তার কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত থাকলে তা এক তালাক হোক কিংবা দুই তালাক, উভয় অবস্থাতেই এক তালাক হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে যে, আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে গেছে, তবে এটা তার স্ত্রীর উপর তখন পর্যন্ত আরোপ হবে না যতক্ষণ সে স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করার নিয়তে এটা না বলে থাকবে। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হারাম করে নেওয়া হলে সে তা তখন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় না করবে।

–[বাদায়েউস-সানায়ে, হেদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কোরআন– জাস্‌সাস]

قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ .... الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেথায় শপথ ভঙ্গ করা আবশ্যকীয় অথবা উত্তম হবে, এমন অবস্থাসমূহের ক্ষেত্রে তোমাদের শপথসমূহ হতে হালাল হওয়া অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বের করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তোমাদের কার্য নির্বাহক আর তিনি মহাজ্ঞানী ও মহান হিকমতের অধিকারী।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরূপ বলেছেন যে, হে ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গের নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অর্থাৎ কসমের কাফ্‌ফারা যদি আদায় করে দেয় তবে তা ভঙ্গ করা জায়েজ হবে। আর আল্লাহ তোমাদের মালিক আর তিনিই সব কিছু সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত এবং আকল ও হিকমতের অধিকারী।

মূলকথা হলো, তোমাদের কসম হতে নিষ্কৃতি বা নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা কাফ্‌ফারা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ ধার্য করে দিয়েছেন, অতএব নবী করীম ﷺ -কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কাফফারা আদায় করে শপথ ভঙ্গ করে নিন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও হিকমত অনুসারেই কসমের কাফফারা ধার্য করেছেন। এটা আপনাদের জন্য খুবই সহজ ব্যবস্থা।

تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ -এর মর্মার্থ : تَحِلَّةَ শব্দটি মূলত تَحْلِلَةَ ছিল, দু'টি لَامْ একত্র হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির মধ্যে ইদ্‌গাম করা হয়েছে। বাবে تَفْعِيْل -এর مَصْدَرٌ অর্থ হলো খুলে দেওয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের বিধান দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে শপথকে যেন একটি গিট্টার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কাফ্‌ফারা দানকে যেন খোলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ কাফ্‌ফারার মধ্যে লোকেরা যা নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল তা হালাল হয়ে যায়।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাফ্ফারার বর্ণনা দিয়েছেন সূরা মায়েদায়। এখানে তিনি স্বীয় নবীকে শপথের কাফ্ফারা আদায় করত স্বীয় দাসীর প্রতি মুরাজায়াত করার নির্দেশ দিলে তিনি গোলাম আজাদ করে মুরাজায়াত করেছিলেন।

ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন, এ আয়াত হতে বুঝা গেল যে, কোনো লোকেরই আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার নেই। –[ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতকে ভিত্তি করে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যে লোক স্বীয় দাসী বা স্ত্রীকে বা অপর কোনো খাদ্যবস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিল তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নিজের জন্য হারাম করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তালাক বা আজাদ করার উদ্দেশ্যে হারাম করে থাকলে তা কার্যকর হবে। –[ইবনে কাছীর]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন কিনা? : গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো কাফ্ফারা আদায় করেননি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ মাসুম, তাঁর আগের পরের সব কিছুই মাফ। শেখ মুহাম্মদ আলী ছায়েছ এটা উল্লেখ করে বলেছেন, এটা এমন এক যুক্তি যা গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ কাফ্ফারা হিসেবে একজন ক্রীতদাস আজাদ করেছিলেন। মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন। আল্লামা কুরতুবী এ দ্বিতীয় মতকে অধিক সহীহ বলে দাবি করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমরা পূর্বে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন দাস মুক্ত করে কাফ্ফারা আদায় করেছেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এটা ইমাম শা'বীরও অভিমত বলে দাবি করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

اَلْيَمِيْنُ-এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ : يَمِيْنٌ শব্দটি একবচন, তার বহুবচন হলো اَيْمَانٌ-এর শাব্দিক অর্থ– শপথ করা, কসম করা, কোনো কিছুকে গ্রহণ করা বা না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

যথা– وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই এ কাজ করবো। تَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُكَ قَطُّ আল্লাহর কসম আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না ইত্যাদি।

يَمِيْن-এর প্রকারভেদ : يَمِيْن বা শপথ তিন প্রকার। যথা– ১. لَغْو ২. مُنْعَقَدْ ৩. غَمُوْس - নিম্নে এদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো,

১. يَمِيْن لَغْو [নিরর্থক শপথ] يَمِيْن لَغْو-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেন– যে ব্যক্তি কোনো হালাল বস্তুর উপর কসম খায়, তাকে (يَمِيْن لَغْو) বলা হয়।

মুজাহিদ (র.) বলেন– ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন ক্রেতা বলে– আল্লাহর শপথ আমি কখনো খরিদ করবো না। বিক্রেতা বলে– আল্লাহর শপথ আমি কখনো বিক্রয় করবো না।

হযরত ইব্রাহীম নাখ্য়ী (র.) বলেন, কেউ যদি শপথ করাকে কথার বা বাক্যের ভঙ্গিমা বা নীতি বাক্য বানিয়ে নেয়, তাকে يَمِيْن لَغْو বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.) غالب گمان অনুসারে শপথ করাকে يَمِيْن لَغْو বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ব্যক্তি অনিচ্ছায় যে শপথ করে, তাই (يَمِيْن لَغْو) যথা– وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ কেউ বলেন, اَللَّغْوُ فِى الْيَمِيْنِ السَّاقِطُ الَّذِىْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ حُكْمٌ.

মুজাহিদ (র.) বলেন– اَنْ يَحْلِفَ عَلٰى شَيْءٍ يَظُنُّ اَنَّهٗ كَذٰلِكَ وَلَيْسَ كَمَا يَظُنُّ অর্থাৎ ধারণানুসারে সত্য বলে কোনো কিছুর উপর শপথ করা যা তার ধারণার মূলত ব্যতিক্রম।

২. يَمِيْن مُنْعَقَدَه (ইয়ামীনে মুনআকাদাহ) যে কথার উপর শপথ করা হয়ে থাকে, তা পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প থাকে যদি, তবে তাকে يَمِيْن مُنْعَقَدَه বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ করাকে يَمِيْن مُنْعَقَدَة বলে।

৩. يَمِيْن غَمُوْس (ইয়ামীনে গুমূস) জেনে শুনে কোনো কিছুর উপর অথবা কোনো ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করাকে يَمِيْن غَمُوْس বলা হয়।

كَفَّارَه يَمِيْن শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গ :

يَمِيْن لَغْو -এর কোনো কাফ্ফারা শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়নি এবং তাতে বিশেষ কোনো গুনাহও হয় না। তবে তা (شَرْعًا مَكْرُوْه) শরিয়তে মাকরূহ বলা হয়েছে– كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ الخ

يَمِيْن مُنْعَقِدَه -এর কাফ্ফারা প্রদান করা আবশ্যক, অন্যথায় গুনাহ হবে।

كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ الخ ـ

يَمِيْن غَمُوْس -এর কোনো কাফ্ফারা নির্ধারিত নেই, তবে তার مُرْتَكِبْ মারাত্মক গুনাহগার হবে। এ রূপে শপথ করার জন্য (تَوْبَه وَاسْتِغْفَارْ) তাওবা ও ইস্তেগফার করলে গুনাহ মাফ হতে পারে। অন্যথা আল্লাহর দরবারে কিয়ামতে পাকড়াও করা হবে। –[হাকীমুল উম্মত থানবী (র.)]

কসমের কাফ্ফারা সম্পর্কীয় শরয়ী বিধি-বিধান হলো এই যে,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ـ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ الْاٰيَة ـ (مَائِدَه)

আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা কোনো শপথ করে থাক, তখন তার কাফ্ফারা হলো, তোমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত মধ্যম মূল্যের খাদ্য তালিকা অনুসারে দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাইয়ে দেওয়া, অথবা তাদেরকে কাপড় প্রদান করা, অথবা একটি দাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে তা করতে পারবে না তিনটি রোজা রাখাই তার জন্য কসমের কাফফারা। তোমাদের এ কাফফারা তখনই আদায় করতে হবে যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ করে ফেলবে।

কাফফরা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে এখতিয়ার স্বরূপ নির্ধারিত করেছেন– অর্থাৎ দশ জন মিসকিনকে মধ্যম পদ্ধতির খাওয়া খাইয়ে দেওয়া অথবা, তাদেরকে কাপড় দেওয়া, অথবা দাসমুক্ত করা, এদের মধ্যে যে কোনো একটি আদায় করলেই চলবে, আর উপরিউক্ত তিনটির কোনটিই যদি না হয় তবে তিনটি রোজা রাখা আবশ্যক।

(هٰكَذَا قَالَ فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ وَحَاشِيَةِ الْجَلَالَيْنِ مِنْ تَفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ)

খাদ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ্দ অর্থাৎ (نصف صاع) অর্ধ সা' আটা বা চাউল প্রদান করবে।

আর যদি কাপড় প্রদান করে, তাহলে তা এমন হতে হবে যাতে শরীর ছতর ঢাকা সম্ভব হয়। হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) এ ক্ষেত্রে বলেতেন যে, পরনের জন্য একটি এবং গায়ের জন্য একটি মোট দু'টি কাপড় দিতে হবে। يَعْنِىْ اِزَار وَقَمِيْص اَوْرِدَاء وَكِسَاء আর হানাফীগণের মতে একই মিসকিনকে দশদিনে ঐ খাদ্য অথবা কাপড় দান করাও জায়েজ হবে, এটা اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

কারণ, এতে মূল উদ্দেশ্য হলো মিসকিনদের প্রয়োজনপূর্ণ করা। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এ মত প্রকাশ করেছেন যে, একই ব্যক্তিকে দশদিনে উক্ত খাদ্য দান করলে বা কাপড় প্রদান করলে হুকুম আদায় হবে না। আর تَحْرِيْر رَقَبَة -এর ক্ষেত্রে কেবল গোলাম আজাদ করাই যথেষ্ট হবে, এতে কাফির বা মু'মিন হওয়ার যেহেতু কোনো قَيْد লাগানো হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ [হাশিয়ায়ে জালালাইন, কাবীর] এটাই হানাফীদের অভিমত। এমনিভাবে উল্লেখ রয়েছে, ظِهَر এবং قَتْل -এর كَفَّارَه ও মুতলাকভাবে যে কোনো গোলাম আজাদ করলে যথেষ্ট হবে। আর চতুর্থ নম্বরের কাফফারা হলো তিনটি রোজা রাখা। এটা তখনই কর্যকর করবে। উল্লিখিত তিনটির কোনো একটিও আদায় করা সম্ভব না হয়।

আর রোজা আদায়ের ক্ষেত্রে تَتَابُعْ তথা লাগাতার তিনটি রোজা রাখা হানাফীগণের মতে আবশ্যক, শাফেয়ীদের মতে আবশ্যক নয়।

হানাফীদের মতে রোজা লাগাতার আদায় করার শর্ত এ জন্য যে, হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর قِرَاءَة মতে যেহেতু আমাদের তেলাওয়াত চলে থাকে এবং সে কেরাতে تَتَابُعْ শর্ত বলা হয়েছে–

كَقَوْلِهٖ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

অনুবাদ :

٣. وَ اذْكُرْ اِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ هِىَ حَفْصَةُ حَدِيْثًا ج هُوَ تَحْرِيْمُ مَارِيَةَ وَقَالَ لَهَا لَاتُفْشِيْهِ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ عَائِشَةَ ظَنًّا مِنْهَا اَنْ لَا حَرَجَ فِىْ ذٰلِكَ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ اِطَّلَعَهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنَبَّاِ بِهٖ عَرَّفَ بَعْضَهٗ لِحَفْصَةَ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ج تَكَرُّمًا مِنْهُ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ اَىِ اللّٰهُ.

৩. আর স্মরণ করো যখন নবী তাঁর কোনো এক স্ত্রীর নিকট গোপনে বলেছিলেন সে হচ্ছে হাফসা (রা.) একটি কথা তা হলো, মারিয়া কিবতীয়াকে হারাম করা এবং তিনি হাফসা (রা.)-কে বলেছিলেন, এটা কাউকেও বলো না। অতঃপর যখন সে এটা অন্যকে বলে দিল আয়েশা (রা.)-কে এ ধারণায় যে, এতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহ তাঁর নিকট প্রকাশ করে দিলেন তাঁকে অবহিত করলেন সে বিষয় বলে দেওয়া বিষয়, তখন তিনি এ সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করলেন হাফসা (রা.)-এর নিকট আর কিছু হতে বিরত থাকলেন স্বীয় সৌজন্যবোধের কারণে। অনন্তর যখন তিনি তা তাঁর সে স্ত্রীকে জানালেন, সে বলল, আপনাকে কে এ সংবাদ দিয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা সংবাদ দান করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা।

٤. اَنْ تَتُوْبَآ اَىْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا مَالَتْ اِلٰى تَحْرِيْمِ مَارِيَةَ اَىْ سَرَّكُمَا ذٰلِكَ مَعَ كَرَاهَةِ النَّبِىِّ ﷺ لَهٗ وَ ذٰلِكَ ذَنْبٌ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَىْ تَقَبَّلَا وَاَطْلَقَ قُلُوْبَ عَلٰى قَلْبَيْنِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهٖ لِاسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَثْنِيَتَيْنِ فِيْمَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَاِنْ تَظَاهَرَا بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْاَصْلِ فِى الظَّاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِدُوْنِهَا تَتَعَاوَنَا عَلَيْهِ اَىِ النَّبِىِّ فِيْمَا يَكْرَهُهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ فَصْلٌ مَوْلٰهُ نَاصِرُهٗ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَحَلِّ اِسْمِ اِنَّ فَيَكُوْنُوْنَ نَاصِرِيْهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ نَصْرِ اللّٰهِ وَالْمَذْكُوْرِيْنَ ظَهِيْرٌ ظُهَرَاءُ اَعْوَانٌ لَهٗ فِىْ نَصْرِهٖ عَلَيْكُمَا

৪. যদি তোমরা উভয় প্রত্যাবর্তন কর অর্থাৎ হাফসা ও আয়েশা। আল্লাহর দিকে, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে মারিয়াকে হারাম করার প্রতি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ এটা তোমাদেরকে আনন্দিত করেছে, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ হারাম করা কষ্টকর ছিল। আর এটাও এক প্রকার অপরাধ। এখানে শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের তওবা আল্লাহ কবুল করে নিবেন। আর এখানে দু'টি অন্তরের উপর বহুবচনীয় শব্দ قُلُوْبٌ প্রয়োগ করা হয়েছে قَلْبَيْنِ ব্যবহার করা হয়নি, দু'টি দ্বিবচন একত্রিত হওয়া কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে। যেখানে উভয় মিলিয়ে একটি শব্দতুল্য। আর যদি তোমরা পরস্পর পোষকতা (বিক্ষোভ) কর এ শব্দটি تَتَظَاهَرَا ছিল, মূল শব্দে দ্বিতীয় تَاء কে ظَا-এর মধ্যে اِدْغَامٌ করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে উক্ত تَاء ব্যতীত পঠিত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর সে বিষয়ে যা তিনি অপছন্দ করেন। তবে আল্লাহ তিনিই এটা ضَمِيْر فَصْل তাঁর বন্ধু সাহায্যকারী। আর জিবরাঈল এবং পুণ্যবান মু'মিনগণ আবূ বকর ও ওমর (রা.)। এটা اِنَّ-এর ইসমের مَحَلّ-এর প্রতি আতফ হয়েছে। সুতরাং এতদুভয়ও তাঁর সাহায্যকারী। আর অন্যান্য ফেরেশতাগণ অতঃপর আল্লাহ ও উল্লিখিত সাহায্যকারীগণের সাহায্যের পর তাঁর সাহায্যকারী ظَهِيْرٌ শব্দটি ظُهَرَاءُ -এর অর্থে ব্যবহৃত। তোমাদের মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

৫. عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَیْ طَلَّقَ النَّبِیُّ اَزْوَاجَهٗ اَنْ یُّبْدِلَهٗٓ بِالتَّشْدِیْدِ وَالتَّخْفِیْفِ اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ خَبَرُ عَسٰى وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ وَلَمْ یَقَعِ التَّبْدِیْلُ لِعَدَمِ وُقُوْعِ الشَّرْطِ مُسْلِمٰتٍ مُقِرَّاتٍ بِالْاِسْلَامِ مُؤْمِنٰتٍ مُخْلِصَاتٍ قٰنِتٰتٍ مُطِیْعَاتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ صَائِمَاتٍ اَوْ مُهَاجِرَاتٍ ثَیِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ـ

৫. অতি সত্বর তার প্রভু, যদি তিনি তালাক প্রদান করেন তোমাদেরকে, অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করেন, তাঁকে পরিবর্তে দিয়ে দিবেন (یُّبْدِلَهٗ শব্দটি) তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পাঠ করা হয়েছে। এমন স্ত্রীগণ যা তোমাদের তুলনায় অধিক উত্তম হবে, خَیْرًا مِّنْكُنَّ টি عَسٰى-এর خَبَر হয়েছে, আর পূর্ণ বাক্যটি شَرْط-এর جَوَاب-এ পতিত হয়েছে। আর যেহেতু شَرْط পাওয়া যায়নি, সুতরাং পরিবর্তিতকরণ কার্যকরী লাভ করেনি। যারা ইসলাম গ্রহণকারিণী, ইসলামের সম্মুখে আত্মসমর্পণকারিণী, ঈমান আনয়ন-কারিণী, প্রকৃত ঈমান গ্রহণকারিণী আনুগত্যকারিণী, আনুগত্য তওবাকারিণী ইবাদতকারিণী, রোজা পালনকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অথবা হিজরতকারিণী, কতক বিধবা এবং কতক কুমারী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

جِبْرِیْلُ শব্দটি কিসের উপর আতফ করা হয়েছে? : جِبْرِیْلُ শব্দটি مَوْلَاهُ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হবে, আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিবরাঈল তাঁর সাহায্যকারী। এ অবস্থায় مَوْلَاهُ-এর উপর وَقْف করা ঠিক হবে না। جِبْرِیْلُ-এর উপর وَقْف করতে হবে। তখন وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ হবে مُبْتَدَأ আর وَالْمَلٰٓئِكَةُ হবে তার مَعْطُوْف আর ظَهِیْرًا হবে خَبَر -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ : জমহুর একে نَبَّأَتْ পড়েছেন, আর তাল্হা ইবনে মুসাররেফ একে فَلَمَّا اَنْبَاَتْ بِهٖ পড়েছেন। আসলে এর দু'টি لُغَةٌ রয়েছে। এক اَنْبَأَ অপরটি হলো نَبَّأَ -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ عَرَّفَ بَعْضَهٗ : জমহুর তাকে تَعْرِیْف হতে উদ্ভূত হিসেবে عَرَّفَ অর্থাৎ رَاء-কে تَشْدِیْد যুক্ত করে পড়েছেন। আর আলী, তালহা, ইবনে মুসাররেফ, আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী, হাসান, কাতাদাহ এবং কিসায়ী عَرَفَ تَخْفِیْف করে পড়েছেন। আবূ ওবাইদ, আবূ হাতিম প্রথমোক্ত কেরাতটি পছন্দ করেছেন وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ আর কিছু জানাননি। আর যদি শব্দটি عَرَفَ হতো তাহলে وَاَنْكَرَ بَعْضًا হতো। -[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ اِنْ تَظَاهَرَا عَلَیْهِ : জমহুর দু'টি تَاء-এর মধ্য হতে একটি تَاء-কে حَذْف করে অতঃপর تَخْفِیْف করে تَظَاهَرَ পড়েছেন। ইকরামা শব্দটি মূলত যে রকম ছিল সে রকম রেখে تَتَظَاهَرَا পড়েছেন। হাসান, আবূ রেযা, নাফে, আসেম এক বর্ণনানুযায়ী ظَاء এবং هَاء-কে تَشْدِیْد যুক্ত করে এবং اَلِف বাদ দিয়ে تَظَّهَّرَا পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِیْثًا-এ حَدِیْث বলতে কি বুঝানো হয়েছে? : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার বলেছেন, এখানে 'হাদীস' বলতে হযরত মারিয়াকে হারাম করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর একজন স্ত্রী বলতে হযরত হাফসা (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত হাফসার কাছে হযরত মারিয়াকে হারাম করার ঘটনা বা ব্যাপারটি অন্য কাউকেও না বলার অনুরোধ করেছিলেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এখানে حَدِیْثًا-এর অর্থ মধু হারাম করার ব্যাপারটিও হতে পারে। অর্থাৎ হযরত হাফসাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি এটা প্রকাশ করে না দেন। ইমাম কালবী (র.) বলেছেন, হযরত হাফসার কাছে রাসূলে কারীম ﷺ একথা গোপন রেখেছিলেন যে, আমার পরে তোমার পিতা এবং আয়েশার পিতা আমার উম্মতের জন্য খলীফা হবে। হযরত হাফসা এ গোপন সংবাদ হযরত আয়েশাকে বলে দিলে এটা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে অবহিত করেন।

بَعْضِ أَزْوَاجِه দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে بَعْضِ أَزْوَاجِه দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে হযরত হাফসা (রা.) বিনতে ওমরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তিনি بَعْضِ أَزْوَاجِه -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন هِيَ حَفْصَة হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ মত প্রকাশ করেছেন।

আর আল্লামা জিয়া উদ্দীন তার মুখতারাহ গ্রন্থে ইব্‌নে ওমর (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে بَعْضِ أَزْوَاجِه -এর তাফসীরে বলেছেন قَالَ النَّبِيُّ لِحَفْصَةَ لَا تُخْبِرِيْ أَحَدًا الخ এটা দ্বারাও হযরত হাফসা (রা.) -এর কথাই প্রকাশ পায়।

ইবনে মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ রূপই বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে যা বলেন তা এই–

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ دَخَلَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُخْبِرِيْ عَائِشَةَ حَتّٰى أُبَشِّرَكِ بِبِشَارَةٍ فَإِنَّ أَبَاكِ يَلِي الْأَمْرَ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ إِذَا نَامَتْ فَذَهَبَتْ حَفْصَةُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ هٰكَذَا فِيْ حَاشِيَةِ جَلَالَيْنِ ٦٤ ـ

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِه حَدِيْثًا : উক্ত আয়াতে حَدِيْثًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইব্‌নে আদী, আবূ নুয়াইম ও ইব্‌নে আসাকের, হযরত আলী ও ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, হযরত হাফসা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পর হযরত আবূ বকর অতঃপর হযরত ওমর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হবেন, তবে এ কথা কারো নিকট প্রকাশ করবে না। এটাকে ভিত্তি করে হযরত আলী ও হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলতেন– وَاللّٰهِ إِمَارَةُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْكِتَابِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِه অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীর নিকট গুপ্ত স্বরে যেহেতু বলেছেন, সেহেতু (আল্লাহর শপথ) আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর খিলাফত আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এভাবেই কালবী উল্লেখ করেছেন।

আল্লামাহ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) حَدِيْثًا দ্বারা হযরত মারিয়া কিবতিয়াকে হারাম করার কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (بِقَوْلِهِ هُوَ تَحْرِيْمُ مَارِيَةَ)

আবার কেউ কেউ (অধিকাংশ বর্ণনা মতে) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর গৃহে যে মধু পান করেছিলেন যা অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকট খারাপ মনে হলো এবং তিনি অন্যান্য সকল স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ভবিষ্যতে কখনো মধু পান করবেন না বলে শপথ করেছিলেন এবং এ কথা কারো নিকট না বলার জন্য যে উপদেশ দান করেছেন, [যাতে যয়নব (রা.)-এর অন্তরে ব্যথা না লাগে] সে কথাকেই حَدِيْثًا বলে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ মতটিকে বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত বলে মনে করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার হযরত আয়েশা (রা.)-এর কিসসা– যা শানে নুযূলের পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রতি حَدِيْثًا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ঘটনায় হুযূর ﷺ যে বলেছিলেন, 'এটা কারো নিকট প্রচার করো না' তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা-ই ছিল হুযূর ﷺ -এর মধু পান করার ঘটনা, অথবা মধু হারাম করার ঘটনা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَرَّفَ بَعْضَهُ ... بَعْضٍ (الْآيَة) : অর্থাৎ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং তখন স্ত্রী বললেন, কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? তিনি বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ তিনিই আমাকে অবহিত করেছেন। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে নবী করীম ﷺ হযরত হাফসাকে তিরস্কার করলেন, কিন্তু সব কথার উল্লেখ করলেন না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভদ্রতা এবং লজ্জাশীলতা। কারণ ভদ্রলোকদের অভ্যাসই হলো দোষ-ত্রুটি মাফ করা এবং বেশি তিরস্কার না করা।

খাযেন বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত হাফসা (রা.) যে হযরত আয়েশা (রা.)-কে নবীর নিজের জন্য মারিয়াকে হারাম করার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন সে ব্যাপার অবগত করলেন; কিন্তু খেলাফত সংক্রান্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা মানুষের মধ্যে জানাজানি হোক এটা চাইতেন না। (সাফওয়া) এ কথা শুনে হযরত হাফসা জানতে চাইলেন নবী করীম ﷺ-এর কাছে, আপনাকে এ কথা কে বলেছেন? এ কথা জানতে চাওয়ার কারণ হলো, হযরত হাফসা হযরত আয়েশাকে এসব কথা বলার পর কাউকেও না জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এসব কথা শুনতে পেয়ে মনে করলেন, আয়েশা (রা.) বুঝি নিষেধ করা সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ -কে এ সব কথা বলে

দিয়েছেন। এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বললেন, মহান আল্লাহই এসব কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তখন হযরত হাফসা চুপ করেছিলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। -[সাফওয়া]

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে যে, গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক দিতে বিরত রাখেন এবং বলেছেন যে, হযরত হাফসা (রা.) অনেক নামাজ পড়েন এবং রোজা রাখেন। তাঁর নাম আপনার স্ত্রীগণের তালিকায় লিখিত রয়েছে। -[মাযহারী, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর।" এরপর তওবা করলে কি হবে তা বলা হয়নি। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে শর্তের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে সে জওয়াবে শর্ত হলো تُقْبَلَا "দু'জনের (তওবাই) কবুল করা হবে।" আল্লামা সাবূনী (র.) বলেছেন, এর জবাব হলো, كَانَ خَيْرٌ لَّكُمَا "তোমাদের দু'জনের জন্যই কল্যাণকর হবে। নবীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করার চেয়ে।"

إِنْ تَتُوبَا -এর মধ্যে مُخَاطَبْ দু'জন কারা? : পবিত্র কুরআনে أَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتْ গণের মধ্য থেকে দু'জনের প্রসঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধু পান করাও তা হারাম করার প্রসঙ্গে হয়েছে এবং যে দু'জন পরস্পর সহযোগী হয়ে তাঁর ব্যাপারে অপছন্দনীয় কথা রটালেন। তারা দু'জন কে ছিলেন এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে অবশ্যই বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।

বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে (ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন,) বহুদিন যাবৎ আমার অন্তরে এ প্রেরণা জেগেছে যে, এই দু'জন মহিলা সম্পর্কে (যাদেরকে সূরা তাহরীমে (إِنْ تَتُوبَا) দ্বারা خِطَابْ করা হয়েছে) হযরত ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করবো এবং জেনে নেবো। অতঃপর একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হজকার্য সমাপনে ভ্রমণে বের হলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। পথিমধ্যে একবার তিনি قَضَاءِ حَاجَتْ -এর প্রয়োজনে জঙ্গলে গেলেন, আবার ফিরে আসলেন।

অতঃপর আমি তাঁর অজুর জন্য তৈরিকৃত পানি নিয়ে অজু করাতে করাতে প্রশ্ন করলাম যে, হযরত যে দু'জন মহিলার প্রসঙ্গে (إِنْ تَتُوبَا) আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তারা কারা? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, কি আশ্চর্যের বিষয়! আপনার কি অবগতি নেই যে, সে দু'জন মহিলা হযরত 'হাফসা ও হযরত আয়েশা' (রা.) ছিলেন, অতঃপর এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) আরো কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন, যা তাফসীরে মাযহারী নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। (هٰكَذَا فِىْ مَعَارِفِ الْقُرْاٰنِ)

إِنْ تَتُوبَا -এর মধ্যে যে তওবা করতে বলা হয়েছে তার কারণ فَقَدْ صَغَتْ -এর মধ্যে যে فَاء অক্ষর নেওয়া হয়েছে তাকে تَعْلِيْلِيَّةْ বলা হয়েছে আর এ تَعْلِيْل টি শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবারত হবে-

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ لِأَجْلِ الذَّنْبِ الَّذِىْ صَدَرَ مِنْكُمَا وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (جَمَلْ)

অর্থাৎ তোমাদের দু'জন হতে যে গুনাহের কার্য প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে তোমাদের দু'জনের তওবা করা আবশ্যক। আর সে গুনাহটি হলো (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) তোমাদের দু'জনের অন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বেঁকে গেছে।

قُلُوْبْ শব্দটি تَثْنِيَةْ ব্যবহার না করে جَمْع ব্যবহার করার কারণ : এর একটি কারণ জালালাইন গ্রন্থকারের পক্ষ হতে এই বলা হয়েছে যে, যদি দু'টি تَثْنِيَه -এর শব্দ একই কালিমার রূপ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে দুই كَلِمَه হিসেবে একই সাথে ব্যবহার করা আরবি ভাষায় কঠিন।

مِنْ شَانِ الْعَرَبِ إِذَا ذَكَرُوا الشَّيْئَيْنِ مِنْ اِثْنَيْنِ جَمَعُوْهُمَا لِأَنَّهُ لَايُشْكِلُ (فَرُوِىَ اِجْتِمَاعُ الْمُتَجَانِسَيْنِ فِىْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ) وَأَيْضًا إِذَا اُضِيْفَ التَّثْنِيَةُ إِلَى التَّثْنِيَةِ يُسْتَعْمَلُ الْأَوَّلُ بِالْجَمْعِيَّةِ .

অর্থাৎ আরবদের নিয়ম হলো, যখন দু'টি বস্তু একই রূপের দু'জনের পক্ষ থেকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বহুবচন ব্যবহার করতে হয়। কেননা এতে ভাষার সহজতা পাওয়া যায়। আর একটি নিয়ম হলো, যখন একটি تَثْنِيَه -কে অপর تَثْنِيَه -এর দিকে اِضَافَتْ করতে হয়, তখন প্রথম تَثْنِيَه -কে جَمْع ব্যবহার করতে হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا : صَغَتْ শব্দটি صَغْوٌ শব্দমূল হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ- বাঁকা হয়ে যাওয়া, উল্টে যাওয়া, বা ডিগবাজী খাওয়া। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) ও হযরত শাহ রফী উদ্দীন (র.) এর যে উর্দু অনুবাদ করেছেন তার অর্থ হলো- বস্তুত তোমাদের দু'জনের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে আর হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ,

সুফিয়ান ছাওরী ও যাহহাক (রা.) উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য লিখেছেন এভাবে যে, فَقَدْ زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের অন্তর সত্য-সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ইমাম রাযী (র.) এ ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

عَدَلَتْ وَمَالَتْ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ حَقُّ الرَّسُوْلِ ﷺ .

অর্থাৎ সে সত্য অধিকার হতে সরে গেছে আর সে অধিকার হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকার। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– مَالَتْ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ مُوَافَقَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ وَكَرَاهَةَ مَا يَكْرَهُهُ إِلَى مُخَالَفَتِهِ অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্য ছিল, রাসূলে কারীম ﷺ যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা। আর তিনি যা অপছন্দ করেন তার অপছন্দের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা :

কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের অন্তর তাঁর সাথে সহযোগিতা ও সাদৃশ্য রক্ষা করা হতে সরে গেছে এবং তার বিরুদ্ধতার দিকে ঝুঁকে গেছে।

إِنْ تَتُوبَا-এর جَزَاء কি? : إِنْ تَتُوبَا শর্তের جَزَاء প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, جواب الشرط محذوف জওয়াবে শর্ত বা شَرْط-এর جَزَاء উহ্য রয়েছে, আর তা হলো تَقَبَّلَا তওবা কবুল হবে। তাফসীরে خطيب গ্রন্থে বলা হয়েছে, তা হলো– إِنْ تَتُوبَا كَانَ خَيْرًا لَكُمَا অর্থাৎ كَانَ خَيْرًا لَكُمَا

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ الخ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাফসীরকারের মতামত : মা'আরেফ গ্রন্থকার উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন– যদি তোমরা তওবা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাজি না কর, তবে এ কথা বুঝে নিও না যে, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে। কেননা আল্লাহ তো তার মাওলা ও জিম্মাদার রয়েছেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) ও সকল নেককার মুসলমান এবং তাদের পর সকল ফেরেশতা যাঁর বন্ধুত্বে ও সাহায্যে নিয়োজিত রয়েছে, কে তার কি ক্ষতি করতে পারবে? লোকসান ও ক্ষতি যা-ই হবে তা তোমাদেরই হবে।

কোনো কোনো গ্রন্থকার বলেন, تَظَاهُر শব্দটির অর্থ হলো– কারো বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতা করা, অথবা কারো বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এ অংশের যে অনুবাদ করেছেন তার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানসিক কষ্ট দানে তোমরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে থাক। শাহ আব্দুল কাদিরের অনুবাদের অর্থ হলো– তোমরা যদি চড়াও হয়ে বস তার উপর।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর মতে وَإِنْ تَظَاهَرَا-এর অনুবাদের অর্থ হলো– তোমরা দু'জন যদি নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে এভাবে কর্মতৎপরতা করতে থাক।

মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (র.) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, তোমরা দু'জন যদি এভাবে কর্মতৎপরতা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাক।

قَوْلُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এরা দু'জনই বৃহৎশক্তি। এরা যেখানে থাকবেন বাকি ঈমানদারগণের কথা উল্লেখ না করলেও তাঁরা تَبَعًا রয়েছেন। দু'জন বলে সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়। এদের সাথে সকল ঈমানদারগণই রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার نُصْرَة বা সাহায্যই সর্ববৃহৎ ও যথেষ্ট সাহায্য। তদুপরী অন্যান্যের সাহায্যের কথা বর্ণনা করার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে? : এ প্রশ্নের উত্তরে তাফসীর সাবী গ্রন্থকার বলেন– আল্লাহর সাহায্য একাই যথেষ্ট, তবুও অন্যান্য ঈমানদারগণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সম্মান মহান আকারে প্রদর্শন করিয়েছেন। অপর দিকে ঈমানদারদের মন যোগানোও উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণ যেন রাসূলের প্রতি এবং তাঁর আনীত ইসলাম ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। নতুবা আল্লাহর সাহায্যের তুলনায় অন্য কারো সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তাঁর নবীকে সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং ফেরেশ্তা ও ঈমানদারগণকে সঙ্গে মিলানো প্রকাশ্য একটা অসিলা মাত্র। কেননা দুনিয়া হলো دَارُ الْأَسْبَابِ আর ফেরেশতার সাহায্য মহান আল্লাহর সরাসরি সাহায্য এবং ঈমানদারগণের দ্বারা সাহায্য করা তাও আল্লাহর সাহায্য, তবে এটা একটা বিশেষ নিয়মনীতির মাধ্যম মাত্র। কারণ সব কাজেই এক একটা নিয়মনীতি রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى عَسٰى رَبُّهُ ..... أَزْوَاجًا خَيْرًا (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অসম্ভব নয় যে, নবী যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়ে দিবেন যারা তোমাদের চাইতে উত্তম হবে। সত্যিকার মুসলমান, আনুগত্যশীল, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সওম পালনকারিণী, কুমারী হোক কিংবা স্বামীপ্রাপ্তা।"

এটা হতে জানা গেল যে, কেবল হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-এরই অপরাধ ছিল না, অন্যান্যরাও কিছু না কিছু অপরাধী ছিলেন। এ কারণে এ দু'জনের পরে এ আয়াতে অন্যান্য স্ত্রীগণকেও সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের এমন কি বড় অপরাধ ছিল, যার কারণে তাদেরকে এত কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে? কুরআন মাজীদে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, শানে নুযূলে বর্ণিত দু'টি কারণের যে কোনো একটি কারণকে কেন্দ্র করে কি তাদেরকে এ সতর্ক করা হয়েছে? না আরো কারণ ছিল?

হাফেয বদরুদ্দিন আইনী (র.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে হযরত আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একটি দলে স্বয়ং হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত সাওদা ও হযরত সফিয়া (রা.) ছিলেন, আরেকটি দলে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা ও অবশিষ্ট বিবিগণ।

বুখারী শরীফের এক বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ পারস্পরিক ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে জোট বেঁধে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছিলেন।

আর একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণ জোট বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজেদের 'নাফ্কার' [পারিবারিক খরচাদি] দাবি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ২৮-২৯ আয়াত নাজিল করেছিলেন। —[কুরতুবী]

এসব বর্ণনা সামনে রাখলে তখন নবী পরিবারে কি ঘটেছিল যার ফলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হস্তক্ষেপ করে নবীর স্ত্রীগণকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করলেন তা জানা যায়। নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ যদিও সমাজের সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তো ছিলেন মানুষ। অতএব, মানবীয় প্রকৃতির ভিত্তিতে তাঁদের দ্বারা এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যা সাধারণ মানবীয় জীবনে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দান করেছিলেন, তাঁর মান ও মর্যাদার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবন যখন বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করে নবী পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস পেলেন এবং তাঁদেরকে সংশোধন করে দিলেন।

উক্ত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত হয়ে থাকে এ কথার প্রতি যে, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ উপরোল্লিখিত (مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ الخ) গুণাবলিতে গুণান্বিত ছিলেন না, এর উত্তর কি হবে? : এর তাৎপর্য এভাবে করা যায় যে, মূলত সে যুগে নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ উল্লিখিত গুণাবলিতে গুণান্বিত ছিলেন বটে। তবে তাঁদের সাময়িক কিছু আচরণের দরুন নবীর মনে যে ব্যথার উদ্রেক হয়েছে তা আল্লাহর সহ্য হয়নি। সুতরাং তা দূর করার জন্য তাঁদেরকে মৃদু ভাষায় সতর্ক করে এ কথার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে, উল্লিখিত গুণাবলি তোমাদের মধ্যে আরো অধিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করো। একবার ভুল করলে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। সংশোধন না করলে স্বীয় মর্যাদা ও আত্মা মাটি হয়ে যায়। যাতে নবী পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। মুসলিম উম্মাহ এ শিক্ষা গ্রহণ করে সংশোধন হতে সক্ষম হয়।

নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করেছেন কিনা? আর তার পরিবর্তনে তাঁকে স্ত্রী দেওয়া হয় কিনা?: এর উত্তর তাফসীরকার وَلَمْ يَقَعِ التَّبْدِيْلُ لِعَدَمِ وُقُوْعِ الشَّرْطِ বলে দিয়েছেন। সাবী গ্রন্থকার বলেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবহৃত تَرَجِّىْ সমূহ تَحْقِيْق-এর জন্য ব্যবহৃত। তবে এখানে তা (تَحْقِيْق) হাসিল হয়নি। কেননা تَرَجِّىْ টি شَرْط-এর সাথে مُعَلَّقٌ রয়েছে। আর إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ তাই নবী করীম ﷺ স্ত্রীগণকে তালাক দেননি এবং তার পরিবর্তনও দেওয়া হয়নি। সুতরাং عَسٰى টি উক্ত আয়াতে تَخْوِيْف-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ عَسٰى رَبُّهٗ الخ বলে তাঁদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আরো বাড়লে তোমরা নবুয়তের স্ত্রীত্বের লিষ্ট বহির্ভূত হয়ে যাবে। সুতরাং নিজকে শোধরিয়ে নাও। —[সাবী]

অনুবাদ :

٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ بِالْحَمْلِ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ الْكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ كَاَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِىْ اَنَّهَا مُفْرِطَةُ الْحَرَارَةِ تَتَّقِدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تَتَّقِدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهٖ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ خَزَنَتُهَا عِدَّتُهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا سَيَاْتِىْ فِى الْمُدَّثِّرِ غِلَاظٌ مِنْ غِلَظِ الْقَلْبِ شِدَادٌ فِى الْبَطْشِ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ بَدَلٌ مِنَ الْجَلَالَةِ اَىْ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ تَاكِيْدٌ وَالْاٰيَةُ تَخْوِيْفٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْاِرْتِدَادِ وَلِلْمُنَافِقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ دُوْنَ قُلُوْبِهِمْ.

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আল্লাহর আনুগত্যে প্রস্তুত করে অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ কাফিরগণ এবং প্রস্তর যেমন, তাদের প্রস্তর নির্মিত মূর্তিসমূহ। অর্থাৎ সে আগুন চরম উত্তপ্ত হবে, যা এদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত করা হবে। দুনিয়ার আগুনের ন্যায় নয় যে, লাকড়ি ইত্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়। যেহেতু নিযুক্ত রয়েছে ফেরেশতাগণ তার রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ তাদের সংখ্যা উনিশ। যেমন সূরা মুদ্দাসসির -এর মধ্যে আলোচনা আসছে। নির্মম হৃদয় নির্মম হৃদয়ের অধিকারীগণ হতে কঠোর স্বভাবে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে। যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন এটা اَللّٰهُ হতে بَدَلْ হয়েছে অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। আর তারা তাই করে, যা করতে তারা আদিষ্ট হয় এ বাক্যটি তাকীদরূপে ব্যবহৃত। এটা দ্বারা মু'মিনদেরকে মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য এবং মুনাফিকদেরকেও ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যারা শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের দাবি করে, আন্তরিকভাবে নয়।

٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ عِنْدَ دُخُوْلِهِمُ النَّارَ اَىْ لِاَنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ.

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করো না দোজখে প্রবেশ করাকালে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলা হবে। অর্থাৎ যেহেতু তা তোমাদের উপকারে আসবে না। তোমরা তো প্রতিফলপ্রাপ্ত হবে তা-ই যা তোমরা আমল করতে অর্থাৎ তার প্রতিফল।

তাহকীক ও তারকীব

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ -এর মধ্যে مَا -এর অবস্থান কি? : مَا اَمَرَهُمْ -এর মধ্যে مَا টি مَوْصُوْلَة হতে পারে। তখন তার صِلَة -কে مَحْذُوْف বলতে হবে। অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ اَمَرَهُمْ بِهٖ এ مَا -কে مَصْدَرْ -ও বলা যেতে পারে, তখন تَقْدِيْر হবে- لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ اَمْرَهٗ

তখন اَمَرَهُمْ -কে اَللّٰهَ শব্দ হতে بَدَل اِشْتِمَالْ বলতে হবে। অথবা مَا-কে حَرْف جَرّ - فِىْ -এর পরিবর্তে বলতে হবে। অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهٖ এখানে مَا-কে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলা যেতে পারে। بَدَل হিসেবে, তখন عِبَارَة হবে, لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ اَمْرَهٗ –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ : قُوْآ اَنْفُسَكُمْ এটা জমহুরের কেরাত। অপর এক কেরাতে قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلُوْكُمْ পড়া হয়েছে, قُوْآ-এর ضَمِيْر-এর উপর عَطْف করে উভয়ের মধ্যে مَفْعُوْل থাকার কারণে আতফকরণ ভালো হয়েছে। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বে তওবা করতে এবং আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে মু'মিনদেরকে হেদায়েতের পথে চলতে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে নিজের বাড়ির প্রতি দৃষ্টি দিতে এবং নিজ স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদেরকে সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে দীনি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা স্বীয় সত্তা ও পরিজনকে দোজখ হতে বাঁচাও। কেবল নিজেরাই আল্লাহর আজাব হতে বেঁচে থাকবে, ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল এতটুকুর মধ্যে সীমিত নয়; বরং সকল মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, পরিবার ও বংশের নেতৃত্বের ভার তার উপর অর্পিত হয়েছে। সে পরিবার ও পরিজনের এবং বংশধরদেরকে সাধ্যমতো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর পছন্দানুসারে জীবন যাপন করার মতো বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাও তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার পক্ষে যতটা সম্ভব তাদেরকে সেদিক হতে ফিরিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকবে। সন্তানাদি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সচ্ছল হবে পিতাগণের কেবল সেই চিন্তাই হওয়া উচিত নয়; বরং জাহান্নামের ইন্ধন হওয়া হতে বিরত রাখার জন্য তা অপেক্ষা বেশি চিন্তা করতে হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। দেশ প্রশাসক ও রক্ষক, সে তার প্রজা সাধারণের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ নিজের ঘরের লোকজনের রক্ষক এবং সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়ী। অতএব, সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।

আল্লাহর বাণী وَاَهْلِيْكُمْ-এর মধ্যকার اَلْاَهْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে اَهْلِيْكُمْ-এর মধ্যে اَهْل وَعِيَال অর্থাৎ স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও সকল সন্তানসন্ততি, গোলাম-বাঁদি, বর্তমান চাকর-চাকরানিসহ সবই শামিল রয়েছে।

হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আরজ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচানোর কথা তো বুঝে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের গুনাহ হতে বাঁচতে হবে এবং আল্লাহর আহকামসমূহের অনুসরণ করতে হবে; কিন্তু اَهْل وَعِيَال-কে আমরা কিভাবে জাহান্নাম হতে রক্ষা করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তার নিয়ম এই যে, তোমাদেরকে যে কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকেও তোমরা সে কাজ হতে বিরত রেখো। আর যা করার জন্য তোমরা নির্দেশিত হয়েছ তাদেরকেও তা করার জন্য আদেশ করো। তবে এ নীতি তাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করতে পারবে। -[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি আমাদেরকে দাওয়াতের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে প্রথমে নিজেকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তির দায়িত্ব কেবল এটা নয় যে, সে নিজেই আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে চাইবে; বরং নিজের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও সাধ্যমতো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর পছন্দমতো বানাতে চেষ্টা করবে। এ হতে বুঝা গেল যে, দাওয়াতী কাজ প্রথমে নিজের পরিবার-পরিজন হতে শুরু হবে। প্রথমে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে কেবলমাত্র

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সচ্ছল করার চেষ্টা করা কর্তব্য মনে না করে এটা অপেক্ষা অধিক বেশি চিন্তা করতে হবে তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়া থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে। এ কথাটি কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'ভয় প্রদর্শন করো তোমার নিকটবর্তী স্বজনদেরকে' আর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا - তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজে তাতে অটল থাকো।"

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর তাৎপর্য : অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। জাহান্নাম জ্বালানো হবে কাফের এবং পাথর দিয়ে। গ্রন্থকার বলেছেন, কাফেরদের মূর্তি দ্বারা– যা পাথর দ্বারা তৈরি। সুতরাং জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো হবে না। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইমাম মুহাম্মদ, আল-বাকের ও সুদ্দী (র.) বলেন, এটা হবে গন্ধকের প্রস্তর। আমাদের মনে হয় এটা হবে পাথুরে কয়লা। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে হয়তো মানুষের কাছে পাথর ইন্ধন হওয়ার বিষয়টি আশ্চর্যজনক ছিল; কিন্তু কুরআন নাজিল হওয়ার অনেকদিন পর পাথুরে কয়লা আবিষ্কার হওয়ার পর এটা আর কারো কাছে আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না। সাধারণ আগুন হতে পাথুরে কয়লার আগুনের উত্তাপ যে অনেক বেশি এটাও কারো অজানা নয়। যে পাথুরে কয়লা দিয়ে জাহান্নামের ইন্ধন দেওয়া হবে তা যে কত শক্তিশালী হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, হে কাফের গোষ্ঠী, তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় আজ কোনো বাহানা পেশ করো না, কারণ সে বাহানা আজ কোনো কাজে আসবে না। তোমরা দুনিয়াতে যে সকল কাজকর্ম করছিলে তারই কেবল প্রতিফল আজ দেওয়া হবে।

পূর্বোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেরা এবং নিজেদের সকল আত্মীয়-স্বজন কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি হতে দুনিয়াতে থাকতেই রক্ষা পাওয়ার সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয়। আর এ আয়াতে কাফেরদেরকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে যে, তারাও যেন কুফরির উপর অচেতন অবস্থায় বসে না থাকে। এতে তাদের কোনো ফল হবে না। এ হতে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহকে ভুলে গেলে কারো নিস্তার নেই, সুতরাং প্রত্যেকেই যেন নিজেদের বাঁচার পথ অবলম্বন করে নেয়। নতুবা পরে সময় পার হয়ে গেলে কোনো কিছুতেই কোনো শান্তির আশা করা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন– مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (اَلْحَدِيْث) অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর সরঞ্জাম যোগাড় করে নাও। আরো বলেছেন مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তার কিয়ামত তখনই আরম্ভ হয়ে যায়। মৃত্যুমুখে পতিত হলে যদি কেউ বলে যে, لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ হে আল্লাহ! আমাকে যদি আরো কিছু সময় প্রদান করতে, তাহলে আমি দান-খয়রাত ইত্যাদি করে নিতাম এবং নেককার হয়ে আসতে পারতাম তবে তাও শোনা হবে না।

অনুবাদ :

৮. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا صَادِقَةً بِاَنْ لَّا يُعَادَ اِلَى الذَّنْبِ وَلَا يُرَادَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ عَسٰى رَبُّكُمْ تُرَجِّيْهِ تَقَعُ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ بِاِدْخَالِ النَّارِ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَمَامَهُمْ وَ يَكُوْنُ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مُسْتَانِفٌ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُنَافِقُوْنَ يُطْفَأُ نُوْرُهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا ج رَبَّنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা نَصُوحًا শব্দটি ن হরফটিতে যবর ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। বিশুদ্ধ তওবা, এরূপে যে, পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হবে না এবং পুনর্লিপ্ততার ইচ্ছাও করবে না। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক আশা, যা বাস্তবায়িত হবে। তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবিষ্ট করবেন জান্নাতে উদ্যানে যার পাদদেশে শ্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে নবী ﷺ-কে এবং তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে তাদের সম্মুখে অগ্রভাগে। আর হবে তাদের ডানে, তারা বলবে এটা مُسْتَانِفَه বাক্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর মুনাফিকদের জ্যোতি নিভে যাবে। আর আমাদেরকে ক্ষমা করুন হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

৯. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنٰفِقِيْنَ بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط بِالْاِنْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ .

৯. হে নবী! জিহাদ করুন কাফেরদের সাথে তরবারির মাধ্যমে আর মুনাফিকদের সাথে জবান ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা। এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন ধমকানো ও বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা কতই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র তা।

১০. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَةَ نُوْحٍ وَامْرَاَةَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فِي الدِّيْنِ اِذْ كَفَرَتَا .

১০. আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। তারা আমার বান্দাগণের মধ্য হতে দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে ছিল; কিন্তু তারা উভয়ে তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দীনের বিবেচনায়, যেহেতু তারা কাফের হয়েছিল।

وَكَانَتِ امْرَأَةُ نُوحٍ وَاسْمُهَا وَاهِلَةُ تَقُولُ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ مَجْنُونٌ وَامْرَأَةُ لُوطٍ وَاسْمُهَا وَاعِلَةُ تَدُلُّ عَلَى اِضْيَافِهِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ لَيْلًا بِإِيْقَادِ النَّارِ وَنَهَارًا بِالتَّدْخِيْنِ فَلَمْ يُغْنِيَا أَيْ نُوحٌ وَلُوطٌ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَقِيْلَ لَهُمَا ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ مِنْ كُفَّارِ قَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ لُوطٍ.

হযরত নূহ (আ.) -এর স্ত্রী যার নাম ছিল ওয়াহেলা। সে তার সম্প্রদায়কে বলত, নূহ তো উন্মাদ হয়ে গেছে। আর হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা। সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রাতে আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং দিনে আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে ধোঁয়া সৃষ্টি করে সংবাদ দান করত। বস্তুত তারা উভয়ে উপকারে আসেনি নূহ ও লূত তাদের জন্য আল্লাহ হতে তাঁর শাস্তি হতে। আর বলা হলো তাদেরকে তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাফেরগণের সাথে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيُدْخِلَكُمْ : يُدْخِلَكُمْ শব্দটি يُكَفِّرَ-এর উপর عَطْف হয়েছে, অতএব يُكَفِّرَ যে اَنْ দ্বারা مَنْصُوب হয়েছে ঠিক একই اَنْ দ্বারা يُدْخِلَكُمْ ও مَنْصُوب হয়েছে। يُدْخِلَكُمْ-কে জমহুর نَصْب দিয়ে পড়েছেন। অন্য আরেক কেরাতে مَحَلّ-এর উপর عَطْف করে جَزْم দিয়ে يُدْخِلْكُمْ পঠিত হয়েছে। যেন বলা হয়েছে- تُوبُوا يُوجِبُ تَكْفِيْرَ سَيِّئَاتِكُمْ عَلٰى وَيُدْخِلْكُمْ.

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ : اَلَّذِيْنَ শব্দটি اَلنَّبِيّ-এর উপর عَطْف হয়েছে। কেউ কেউ اَلَّذِيْنَ-কে مُبْتَدَأ আর نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ-কে তার خَبَر হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে প্রথম মতটাই উত্তম। তখন نُوْرُهُمْ جُمْلَةٌ يَسْعٰى বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوب হবে حَال হওয়ার কারণে। অথবা, তাকে এদের অবস্থার বর্ণনা দানের উদ্দেশ্যে مُسْتَانِفَه বলতে হবে। আর يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا الخ টি حَال হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوب হয়েছে। اَلَّذِيْنَ-কে مُبْتَدَأ বলা হলে এ বাক্যটিকে তার দ্বিতীয় خَبَر বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ضَرَبَ اللّٰهُ ...... وَامْرَأَةَ لُوطٍ : ضَرَبَ হলো فِعْل আর اَللّٰهُ শব্দটি তার فَاعِل আর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا শব্দটি ضَرَبَ-এর সাথে مُتَعَلِّق - اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ হলো ضَرَبَ-এর مَفْعُول اَوَّل আর مَثَلًا হলো তার مَفْعُول ثَانِيْ এখানে مَفْعُول اَوَّل-কে تَاخِيْر করা হয়েছে যাতে তার ব্যাখ্যাদানকারী বাক্যাবলি তার সাথে মিলিত হতে পারে। আর اِمْرَأَةَ-কে مَثَلًا-এর بَدَل-ও বলা যেতে পারে, যদি একটি مُضَاف-কে مَحْذُوْف মানা হয়। অর্থাৎ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا مِثْلَ اِمْرَأَةِ نُوحٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর সম্মুখে সত্য এবং পাকা-পোক্তভাবে তওবা করো। (থানবী) আর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশুদ্ধ মনে আল্লাহর দরবারে তওবা করো।

তওবার অর্থ : তওবা শব্দের শাব্দিক অর্থ– ফিরে আসা অর্থাৎ গুনাহসমূহ হতে ফিরে আসা। আর কুরআন ও সুন্নাহ -এর ব্যবহার বিধি মতে, ব্যক্তি স্বীয় অতীত জীবনে কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জিত হওয়া আর ভবিষ্যতে তার নিকটেও না যাওয়ার উপর দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে তওবা বলা হয়।

نَصُوْح নাসূহ শব্দের অর্থ : نَصُوْح শব্দটি আরবি, এটি نَصَحَ وَنَصِيْحَتً মাসদার হতে যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে خَالِصْ বা প্রকৃত করা। আর যদি نَصَاحَتً হতে مُشْتَقْ মানা হয় তখন অর্থ হবে, কাপড় সেলাই করা ও তাতে জোড়া লাগানো।

প্রথমোক্ত অর্থের দৃষ্টিতে نَصُوْح -এর অর্থ হলো, ব্যক্তি رِيَاء অথবা লোক দেখানো হতে خَالِصْ হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তি হতে বাঁচার জন্য কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জিত হয়ে তা ছেড়ে দেওয়া।

আর দ্বিতীয় অর্থে نَصُوْح -এর অর্থ হবে গুনাহের কারণে নেক আমলের যে আবরণ কেটে গেছে তাকে তওবার মাধ্যমে জোড়া দেওয়া। (فَيُقَالُ نَصَاحَةُ الثَّوْبِ)

তওবায়ে নাসূহা -এর সংজ্ঞা : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ব্যক্তি তার অতীত জীবনে কৃত যাবতীয় গুনাহের উপর লজ্জাবোধ করে ভবিষ্যতে তাতে পদার্পণ না করার দৃঢ় ইচ্ছা করা।

কালবী (র.) বলেন, তওবায়ে নাসূহা তাকে বলা হয়, যাতে ভাষায় اِسْتِغْفَارْ করা হয় এবং আন্তরিকভাবে লজ্জাবোধ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজকে সে গুনাহের কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

ইসলামি শরিয়তে এর তাৎপর্য হলো, এমন তওবা যাতে তিনটি শর্ত একত্রিত হবে, ১. গুনাহ হতে বিরত হওয়া, ২. অতীতে যে গুনাহ করা হয়েছে তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ৩. আর ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর কখনো না করার সংকল্প করা। যদি কোনো মানুষের হক আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে চতুর্থ আরেকটি শর্ত বেড়ে যাবে। তা হলো মালিককে বা তার ওয়ারিসকে হক আদায় করে দেওয়া অথবা তার কাছে গিয়ে মাফ করিয়ে নেওয়া। –[রূহুল মা'আনী, সাফওয়া]

ইবনে আবূ হাতিম জির ইবনে হোবাইশের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'বের নিকট تَوْبَةً نَصُوْحًا শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ -এর নিকট এ প্রশ্নই করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'এর তাৎপর্য হলো, তোমার দ্বারা যখন কোনো অপরাধ হয়ে যায় তখন নিজের গুনাহের কারণে তুমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও এবং এ লজ্জা সহকারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। আর ভবিষ্যতে কখনো এ কাজ করো না।' হযরত ওমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এ তাৎপর্যই বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনা মতে হযরত ওমর (রা.) 'তাওবাতান নাসূহা'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, তওবা করার পর পুনরায় সে গুনাহ করা তো দূরের কথা তা করার ইচ্ছা পর্যন্ত করবে না। –[ইবনে জারীর]

হযরত আলী (রা.) একবার একজন বেদুঈনকে খুব দ্রুত তওবা-ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'এটা মিথ্যুকদের তওবা।' সে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে খাঁটি তওবা কি? বললেন, তার সাথে ছয়টি জিনিস থাকা আবশ্যক– ক. যা ঘটে গেছে তার জন্য লজ্জিত হবে। খ. নিজের যেসব কর্তব্যে অবহেলা দেখেছ তা রীতিমতো আদায় করবে। গ. যার হক নষ্ট বা হরণ করেছ তা ফিরিয়ে দিবে। ঘ. যাকে কষ্ট দিয়েছ তার নিকট ক্ষমা চাবে। ঙ. ভবিষ্যতে এ গুনাহ না করার দৃঢ়সংকল্প করবে এবং চ. নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিঃশেষিত করবে যেভাবে তুমি তাকে আজ পর্যন্ত নাফরমানির কাজে অভ্যস্ত বানিয়ে রেখেছ। তাকে আল্লাহর আনুগত্যের তিক্তরস পান করাবে– যেরকম তাকে তুমি আজ পর্যন্ত নাফরমানির মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছিলে। –[কাশশাফ, রুহুল মা'আনী, মা'আরেফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ ... كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : অর্থাৎ আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আমলনামা হতে গুনাহসমূহ মোচন করে দিবেন, আর তোমাদেরকে ঐ বাগিচাসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, সেদিন আল্লাহ দুরাচার কাফেরদেরকে দিকে দিকে বিভিন্ন প্রকারের লাঞ্ছনা দিবেন। আর ঈমানদারগণকে কখনো লজ্জিত করবেন না। আর তাদের নেক কার্যসমূহ এবং সততার কারণে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি তাদের অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বামে, ছুটতে থাকবে। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের প্রভুর নিকট আরজ করবে– হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের নূরকে পূর্ণত্ব দাও। আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম।

عَسٰى শব্দের তাৎপর্য : এটা মূলত فِعْل مُقَارِبْ তাফসীরকারগণের মতে عَسٰى শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, আশা করা যায়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকলে ওয়াদার অর্থ নেওয়া হয়, যা বাস্তবায়ন হওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকে না। যেভাবে قُرْاٰن كَرِيْم -এর মধ্যে لَعَلَّ শব্দটি يَقِيْنِيْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহর তা'আলা عَسٰى শব্দ ব্যবহার করে وَعْدَه উদ্দেশ্য করে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, তওবা হোক অথবা বান্দাগণের অন্য কোনো নেককাজ হোক, কোনো কিছুই বেহেশতের মূল্য হতে পারে না, আর আল্লাহ তা'আলার উপরও এটা আবশ্যক বা ওয়াজিব হয়ে যায় না যে, সে নেককাজকারী অথবা তওবাকারীকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দিতেই হবে; বরং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। আল্লাহর উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়।

كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْعَقَائِدِ وَمَا هُوَ الْاَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى .

কেননা নেক আমলের প্রতিদান প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ দুনিয়াতে যাবতীয় নেয়ামতের মাধ্যমে কিছু কিছু প্রদান করেন, তার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহর নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেহেশ্‌ত পাওয়াও আবশ্যক নয়; বরং আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকেও তার কোনো আমল নাজাত দান করতে পারবে না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ আপনাকেও নাজাত দান করবে না? হুযূর ﷺ বললেন না, আমাকেও পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার মাধ্যমে নাজাত দান না করবেন ততক্ষণ আমিও নাজাত পাবো না। -[বুখারী ও মুসলিম, মাযহারী]

তবে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করতেই হবে এবং ক্ষমা পাওয়ার আশায় কোনো গুনাহ করা কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় হবে না।

فِىْ حَاشِيَةِ الْجَلَالَيْنِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ وَفِىْ عَسٰى اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ هٰذَا التَّرَجِّىْ وَاجِبُ الْوُقُوْعِ .

জালালাইনের হাশিয়াতে বলা হয়েছে, কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে عَسٰى শব্দের ইশারায় এ আশা কার্যত পরিণত করা ওয়াজিবতুল্য। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করবেনই।

নূর তো কোনো রূহসম্পন্ন জন্তু নয় তথাপিও نُوْرُهُمْ يَسْعٰى কিভাবে বলা হয়েছে? যা জন্তু জগতের কার্য : এর উত্তরে বলা হবে, যদিও নূর কোনো জন্তু নয় তথাপিও এটা জন্তু সাদৃশ্য হওয়া আবশ্যক নয়। এটা আল্লাহর কুদরতি এক প্রকার শক্তি বা সৃষ্টি, আল্লাহর হুকুমে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আবেদগণের সাথে এসে সংমিশ্রিত হয়। যেমনি মানুষের শারীরিক শক্তি এবং রং, রূপ ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টিগত, এটাও এরূপ। আল্লাহর কুদরতি শক্তিতে এটা নড়াচড়া ও চকচক করতে থাকবে, যেভাবে আয়না ইত্যাদির আলো চকচক করতে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব কিছু নয়। গুনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যেরূপ তার শরীর বিশ্রি রং ধারণ করে এটাও সেরূপ মনে করবে। হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ অর্থাৎ নামাজ নূর স্বরূপ, আর কবিগণ বলেছেন- ظلمت دل نور کرتی ہے نماز * نور ایماں دل میں بھرتی ہے نماز

অর্থাৎ অন্তরের অন্ধকারকে নামাজ আলোকিত করে তোলে। আর ঈমানের নূরকে নামাজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

বুজুর্গানে দীনগণ অথবা আল্লাহর ওলীগণ, গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে যখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতেন তখন তাদের সম্মুখে আসমান, জমিনে লম্বালম্বি লাইটের আলোর ন্যায় আলোকবর্তিকা উপস্থিত হতো। এর হাজারও প্রমাণ কারো নিকট অজানা নয়। সুতরাং ঐ আলোকবর্তিকা যেভাবে আগমন করা সম্ভব সেভাবে نُوْرُهُمْ يَسْعٰى কথাটাও বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

মু'মিনগণ কোথায় رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا বলবে : তাফসীরে দুররে মানছূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে কিছু না কিছু নূর প্রদান করা হবে। যখন পুলসিরাতের নিকট পৌছবে তখন মুনাফিকদের নূরগুলো নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং ঈমানদারগণের নূর তখনও বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় দেখে মু'মিনগণ আল্লাহর সমীপে দোয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ! মুনাফিকদের ন্যায় আমাদের নূরও যেন নির্বাপিত না হয়ে যায়। -[মা'আরেফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسٰى رَبُّكُمْ ..... سَيِّاٰتِكُمْ : এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সকল صَغِيْرَه ও كَبِيْرَه গুনাহ মাফ হবে বলে আশা করা যায়। কেননা সগীরা গুনাহগুলো নেককাজ দ্বারা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলে কুরআনের আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। كَمَا قَالَ تَعَالٰى اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ আর হাদীস শরীফের বর্ণনানুসারে كَبِيْرَه গুনাহসমূহ তওবা দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার আশা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তওবা করলে যেহেতু আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলেছেন, এতে গুনাহসমূহ দাখিল হবে। যার কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে তার সগীরা গুনাহ ক্ষমা بِطَرِيْقِ اَوْلٰى করা হবে।

আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একজন লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করার মনস্কামনা জানাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে প্রশ্ন করল যে, এতে আমার অতীত গুনাহসমূহ মাফ হবে? হুযূর ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে আবার প্রশ্ন করল, আমি যে হত্যাকাণ্ডসমূহ করেছি তা কি ক্ষমা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ আয়াত নাজিল করেন-

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

সুতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতে كَبِيْرَه ও صَغِيْرَه সকল গুনাহই ক্ষমা করে দিবেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ...... وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, হে নবী! এ কাফের মুশরিক ও মুনাফিকরা যদি ধর্মের পথে ফিরে না আসে, তবে আপনারা কাফের ও মুনাফিকদের মোকাবিলায় জিহাদ পরিচালনা করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। দুনিয়াতে তো তারা এভাবে সাজাপ্রাপ্ত হবেই। আর পরকালীন জীবনেও তাদের ঠিকানা এবং বাসস্থান দোজখের অগ্নিকুণ্ডে নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, দোজখ সর্বনিকৃষ্টতম স্থান। –[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী]

তাফসীরকারদের মতে, ইসলামের শত্রু দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি বাহির হতে ইসলামের সরাসরি বিপক্ষে কাজ করে থাকে। তারা হলো কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়। অপর শ্রেণি ভিতরগতভাবে ইসলামের সাথে শত্রুতা করে থাকে। তারা হলো, মুনাফিক সম্প্রদায়।

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, কাফেরদের সাথে অস্ত্রসস্ত্র বা তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ করতে এবং মুনাফিকদের সাথে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জিহাদ করতে হুযূর ﷺ -কে বলা হয়েছে এবং উভয় পক্ষের সাথেই কঠোরতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কারো মতে, দাওয়াতে ইসলাম এবং শরয়ী আহকামসমূহ বাস্তবায়নে তাদের সাথে কঠোরতা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে, حُدُوْد شَرْعِيَّة বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে। কারণ তারা এমন সব কাজকর্ম করত যাতে তাদের উপর শরিয়তের শাস্তি কায়েম করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। –[ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, কথাবার্তায় তাদের সাথে কঠোর হওয়া তথা কখনো শালীনতা, ভদ্রতা, নম্রতার ব্যবহার দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে মনের শক্তির দিক দিয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

আর কারো মতে, মুনাফিকদের সাথে যদি প্রয়োজন হয় তবে কথাবার্তার পরিস্থিতি অনুসারে তরবারিও ব্যবহার করা বৈধ হবে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থে এটাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। –[খাতীব]

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللّٰهُ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শেষ যুগের কাফের ও নাফরমানদেরকে বুঝানোর জন্য আমার নবী হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করছি যে, সে দু'জন স্ত্রীলোক যদিও আমার বিশিষ্ট এবং উচ্চ মর্যাদাশীল দু'জন নবীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর যখন তারা স্ব-স্ব স্বামীর সাথে ধোঁকাবাজির কাজ করেছিল। আর তাঁদেরকে সত্য নবী হিসেবে জেনে শুনেও আনুগত্য দেখায়নি। তাই আমার দুই নেক বান্দা আল্লাহর সমীপে সে স্ত্রীগণের কোনো উপকার করতে পারেননি। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব, কিয়ামতের দিবসে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হবে যে, জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। এটাই তোমাদের বাসস্থান।

উদাহরণ পেশের কারণ : এ উদাহরণটি পেশ করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এ কথা ভালোভাবে বুঝে নেয় যে, নিজে কোনো সৎকর্ম না করে কেবল সৎ লোকদের সহচরে বসবাস করলেই পরকালে আল্লাহর আজাব হতে নাজাত পাওয়া যাবে না। যদি তা-ই হতো তবে হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীগণকেও নাজাত দেওয়া হতো। অসৎকাজের পরিণতি কোনো দিন ভালো হয় না। জাহান্নামের কাজ করে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করা যায় না।

উক্ত সূরা তাহরীমের শেষাংশে মোট ৪ জন মহিলার সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে– ১. হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী, ২. হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী, ৩. ফিরাউনের স্ত্রী, ৪. হযরত মরিয়ম (আ.)। এখানে দু'জনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ জনের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলা হবে।

تَنْبِيْه **[সতর্কবাণী] :** সবগুলোর বর্ণনাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানদারের ঈমানের বরকতে কোনো কাফের উপকৃত হতে পারে না। তদ্রূপ কোনো কাফেরের কুফরির কারণে ঈমানদারের কোনো ক্ষতি হতে পারে না।

সুতরাং কোনো নবীগণের অথবা اَوْلِيَاءِ كِرَامْ-এর স্ত্রীগণ যেন এ মর্মে গাফেল না হয়ে যায় যে, আমাদের স্বামীদের কারণে আমরা রক্ষা পাবো। আর কোনো কাফের যেন এ ধারণা না করে যে, আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা আমরা রক্ষা পাবো বা স্ত্রী যেন এ ধারণা না করে যে, তার নাফরমান স্বামী তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে।

قَوْلُهُ فَخَانَتَاهُمَا : নবীগণের স্ত্রীদের জন্য কর্তব্য এই ছিল যে, তাদের স্বামী যেহেতু নবী, তাই তাদের অনুসরণ করা। কিন্তু অনুসরণ ও অনুগমন তারা করেনি। এটাই ছিল দোষ। তাই গ্রন্থকার فَخَانَتَاهُمَا -এর তাফসীর করেছেন فِى الدِّيْنِ ধর্মের লক্ষ্যে। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- إِنَّهُ مَا زَنَتْ اِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ নবীগণের স্ত্রীগণ কখনো (না'উযুবিল্লাহ) জেনা করেননি। [সাবী] আর মূলত এ দু'জন মহিলা (হযরত নূহ ও লূত (আ.)-এর স্ত্রী) হযরত নূহ ও লূত (আ.)-এর দীন কবুল করেনি। তদুপরি দীনের সমকালীন শত্রুদের সহযোগিতা করেছিল।

কালবী (র.) বলেন, তাদের খেয়ানত হলো نِفَاقِىْ অর্থাৎ ঈমান প্রকাশ করত আর নেফাক গোপন রাখত।

وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ خِيَانَةَ اِمْرَأَةِ نُوْحٍ قَوْلُهَا اِنَّهُ مَجْنُوْنٌ وَخِيَانَةُ اِمْرَأَةِ لُوْطٍ . دَلَالَتُهَا عَلٰى ضَيْفِهِ (كَبِيْر)

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীগণের নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কাবীর ও মা'আরেফ গ্রন্থকার এবং জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, হযরত নূহ (আ.) -এর স্ত্রীর নাম ছিল (وَاهِلَةٌ) আর হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পরই হাশরের পূর্বে জান্নাত অথবা জাহান্নামের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ হুযূর ﷺ বলেছেন, (اَلْحَدِيْثُ) مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখনই যেন তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামতও এটাই। -[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী]

আয়াতটি একটি সূক্ষ্ম তাম্বীহ এর প্রতি ইঙ্গিত করছে : তা হলো হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-এর প্রতি সূক্ষ্ম ইশারা অর্থাৎ যেন হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.)-কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপক্ষে যে উভয়ে যোগসাজস বা পরামর্শ করেছ তা হতে তোমরা স্ব-স্ব দায়িত্বে হেফাজত হয়ে যাও এবং এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো।

আর পরোক্ষভাবে জগতের সকল নারীদেরকেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি নেক স্ত্রী হতে চাও তবে কোনো কালেও স্বামীর অসন্তুষ্টিকর কোনো কাজ করতে যেয়ো না। নতুবা জাহান্নামী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। -[মাওলানা আশরাফী আলী থানবী]

শায়খ মাওলানা আব্দুল হক (র.) বলেন, হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.) এরপর কখনো ঈর্ষান্বিত হয়েও প্রিয়নবী হযরত ﷺ -এর আনুগত্যে বিন্দুমাত্রও মৃত্যু পর্যন্ত ব্যতিক্রম করেননি। -[মাওলানা আশরাফী আলী থানবী]

এ আয়াতে قِيْلَ শব্দটিকে فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ : এর এক কারণ এই হতে পারে যে, মৃত্যুকালে তাদেরকে সত্যই বলা হয়েছে যে, اُدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ দোজখে প্রবেশকারীদের সাথে দোজখে প্রবেশ করো। অথবা হিসাব-নিকাসের পর কিয়ামতে তাদেরকে বলা হবে, এর অর্থ হলো- تَحَقُّق وُقُوْع যদি تَحَقُّق وُقُوْع হয় তখন فِعْل مَاضِىْ -এর صِيْغَه ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কালামে পাকে এরূপ বহু ব্যবহার রয়েছে।

كَقَوْلِهِ تَعَالٰى قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ . وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ : অর্থাৎ দু'জনকেই বলা হয়েছে যে, "আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ করো।" এ কথাটি মৃত্যুর প্রাক্কালে তাদেরকে বলা হয়েছে। অথবা পরকালে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে, কাফের, মুশরিক ও নাফরমানদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। এ কথাটি তাদেরকে অবশ্যই বলা হবে। এটা বুঝানোর জন্য এখানে 'مَاضِىْ' বা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١١. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَءَةَ فِرْعَوْنَ م اٰمَنَتْ بِمُوْسٰى وَاسْمُهَا اٰسِيَةُ فَعَذَّبَهَا فِرْعَوْنُ بِاَنْ اَوْتَدَ يَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاَلْقٰى عَلٰى صَدْرِهَا رَحٰى عَظِيْمَةً وَاسْتَقْبَلَ بِهَا الشَّمْسَ فَكَانَتْ اِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ اِذْ قَالَتْ فِىْ حَالِ التَّعْذِيْبِ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ فَكَشَفَ لَهَا فَرَأَتْهُ فَسَهَلَ عَلَيْهَا التَّعْذِيْبُ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَعْذِيْبِهِ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ اَهْلِ دِيْنِهِ فَقَبَضَ اللّٰهُ رُوْحَهَا وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ رُفِعَتْ اِلَى الْجَنَّةِ حَيَّةً فَهِىَ تَاْكُلُ وَتَشْرَبُ

১১. আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য উপস্থাপন করছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল আসিয়া। ফিরআউন তাঁকে হস্ত ও পদে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে এবং তাঁর বক্ষে প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে শাস্তি প্রদান করে। আর তাকে প্রখর উত্তপ্ত রৌদ্রে শুইয়ে রাখে। যখন শাস্তি দাতারা তার থেকে পৃথক হয়ে চলে যেত তখন ফেরেশতাগণ এসে তাঁকে ছায়া দান করত। যখন সে বলেছিল শাস্তি দানকালীন অবস্থায় হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো তখন তাঁর সম্মুখে বেহেশত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ফলে তাঁর নিকট শাস্তি সহজসাধ্য অনুভূত হতে লাগল। এবং আমাকে মুক্তি দান কর ফিরআউন ও তার কর্ম হতে তার শাস্তি হতে আর আমাকে মুক্তি দান করো জালিম সম্প্রদায় হতে যারা ফিরাউনের মত অনুসরণ করে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ কবজ করে নেন। আর ইবনে কায়সানের মতে তাঁকে জীবিতাবস্থায় জান্নাতে উত্তোলন করে নেওয়া হয়, তিনি তথায় পানাহার করেন।

١٢. وَمَرْيَمَ عَطْفٌ عَلٰى اِمْرَاَةَ فِرْعَوْنَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا حَفِظَتْهُ فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا اَىْ جِبْرَئِيْلَ حَيْثُ نَفَخَ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا بِخَلْقِ اللّٰهِ فِعْلَهُ الْوَاصِلَ اِلٰى فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسٰى وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا بِشَرَائِعِهِ وَكُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ مِنَ الْقَوْمِ الْمُطِيْعِيْنَ.

১২. আর মরিয়ম এটা اِمْرَاَةَ فِرْعَوْنَ-এর উপর عَطْفٌ ইমরান কন্যা, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল তাকে হেফাজত করেছে অনন্তর আমি তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর আঁচলে ফুঁকে দেন। আল্লাহর হুকুমে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুঁকের প্রভাব জরায়ুতে গিয়ে পৌছায় এবং তিনি ঈসা (আ.)-কে গর্ভ ধারণ করেন। আর সে সত্যারোপ করে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহে তাঁর বিধানসমূহে এবং তাঁর কিতাবসমূহে যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে ছিল অনুগতগণের অন্তর্ভুক্ত আনুগত্যকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا : জমহুর تَشْدِيْد যুক্ত করে صَدَّقَتْ পড়েছেন। হামযা আল-উমরী, ইয়াকূব, কাতাদাহ, আবূ মিজলায এবং আসেমের এক বর্ণনায় تَخْفِيْف করে صَدَقَتْ পড়েছেন। كَلِمَاتِ শব্দটিকে জমহুর বহুবচন হিসেবে بِكَلِمَاتِ পড়েছেন। আর হাসান, মুজাহিদ, জুহদারী একবচন হিসেবে بِكَلِمَةِ পড়েছেন। তেমনি كِتَابِهِ শব্দটি كُتُبِهِ পঠিত হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللّٰهُ .... فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ মু'মিনদের জন্য ফিরআউন পত্নীর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, সে যখন বলল "হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হতে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের হাত হতে মুক্তি দিন।"
আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ফেরাউনের স্ত্রীকে মু'মিন মহিলাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তিনি দুনিয়ার বুকে সে যুগের সর্বাধিক বড় সম্রাটের স্ত্রী ছিলেন। অট্টালিকায় বসবাস করতেন এবং দুনিয়ার নানা ভোগ-বিলাসের কোনো অভাব সেখানে ছিল না; কিন্তু এসব ভোগ-বিলাস বাদ দিয়ে তিনি গ্রহণ করলেন ঈমানের পথ– আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তা। এ কারণেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন ও শাস্তি। এসব জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ঈমানের পথ পরিহার করেননি। দীন হতে বিচ্যুত হননি। আল্লাহ তা'আলার কাছে চেয়েছেন, তাঁর সন্নিকটে জান্নাতে একটা ঘর। আবেদন জানিয়েছেন ফেরাউনের শিরক কুফরি-এর জুলুম-অত্যাচার হতে মুক্তিদানের। হযরত হাসান বসরী (র.) এবং ইবনে কায়সান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি বর্তমানে সেখানে পানাহার করছেন। তিনি ফেরাউনের মতো খোদাদ্রোহীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। ঈমান এবং ইহসানে অটল থাকার কারণে পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। অতএব, কোনো ভালো লোক বা খারাপ লোকের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্কের কারণে কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না। পরকালে মুক্তি এবং বিপর্যয় আসবে একমাত্র বান্দার আমল এবং ঈমানের উপর নির্ভর করে। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল কোরআন]
এখানে নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণকেও এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এ মহিলা ফেরাউনের মতো খোদাদ্রোহীর স্ত্রী হয়েও যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হযরত মূসা (আ.)-এর আনুগত্য করতে পারে, নানা ধরনের নির্যাতনে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর আস্থা রেখে মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে তারা কেন যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে বিচ্যুত হবে? তারা কেন এ দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য নবীকে কষ্ট দিবে, পরকালের সুখ-শান্তিকে কেন ভুলে যাবে?
এখানে বলে রাখা ভালো যে, এ সূরা নাজিল হওয়ার পর বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, নবীর স্ত্রীগণ আর কখনো নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ করেননি।
رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "হে আমার প্রতিপালক আমার জন্য তোমার সন্নিকটে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো।" কোনো কোনো আলিম বলেছেন, এ কথাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, তিনি বাড়ি চাওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিবেশী হিসেবে কামনা করেছেন। এখানে আরো জানা যায় যে, তিনি পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী ছিলেন। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ : আল্লাহ বলেন, "আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের দৃষ্টান্ত এই যে, সে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। পরে আমি তাঁর ভিতরে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকেছিলাম এবং সে স্বীয় রবের বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা স্বীকার করল। আর আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল।"
وَمَرْيَمَ- কে اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ -এর উপর আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইমরানের কন্যা মরিয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন এবং ইহুদিদের নির্যাতন ও জুলুমের মোকাবিলায় তাঁর ধৈর্যের উদাহরণ দিচ্ছেন, হযরত মরিয়ম মু'মিন মহিলাদের জন্য ইখলাস লিল্লাহ এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বন্দেগিকরণের এক উঁচু ধরনের উদাহরণ এবং উত্তম আদর্শ।
আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ দু'স্ত্রীলোক পাক-পবিত্র, মু'মিন, সত্যবাদী এবং ইবাদতকারিণীদের জন্য দু'টি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দু'টি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা পেশ করেছেন নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণের সামনে। এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে। এ দু'জন স্ত্রীলোক সর্ব যুগের এবং সর্বস্থানের মু'মিন মহিলাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। –[যিলাল]
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا এ কথা বলে ইহুদিদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ইহুদিরা প্রচার করত যে, তাঁর গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম অবৈধভাবে [নাউযুবিল্লাহ] হয়েছে। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এ মিথ্যাবাদী লোকদের এ মিথ্যা কথাকে বুহতানে আযীম– "একটি বিরাট মিথ্যা দোষারোপ" বলা হয়েছে।
চারজন মহিলার পরিপূর্ণতা : নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, কামেল পুরুষতো অনেক রয়েছে কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে চারজন হলো কামেল– ১. আসিয়া বিনতে মোযাহেম ফিরাউনের স্ত্রী, ২. মারইয়াম বিনতে ইমরান, ৩. খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ এবং ৪. ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ ﷺ। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট শুনেছি, পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক ছিল মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক হলো খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ। –[নূরুল কোরআন]